১৯শ বর্ষ

ফাল্গুন ১৩২৮—মাঘ ১৩২৯

সম্পাদক—

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্‌-এ, বি-এল্‌

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র

প্রকাশক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়

অর্চ্চনা-কার্য্যালয়—

পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চ্চনা-পোষ্ট, কলিকাতা।

সম্পাদকীয় বিভাগ—৪০ নং চাবাধোবাপাড়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯শ বর্ষের সূচী

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১৯শ ভাগ] } ফাল্গুন, ১৩২৮। { [১ম সংখ্যা

দুইটী নারী চিত্র।

[শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী]

তিলোত্তমা ও আয়েষা প্রণয়ের দুইটি আদর্শ মূর্ত্তি। দুই-ই সুন্দর, দুই-ই আকাঙ্ক্ষিত। তিলোত্তমা সরস্বতীর মত মৃদুস্রোতা—আয়েষা যমুনার মত স্রোতস্বতী। তিলোত্তমা পল্লীশ্রী—আয়েষা রাজলক্ষ্মী। প্রথমটি স্ফুটনোন্মুখী নব মল্লিকা, দ্বিতীয়টি পূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদল। একটি পূর্ণচন্দ্রের বিমল প্রভা; অন্যটী বালসূর্য্যের বিমল রশ্মি। এ স্বপ্নের ফুল, ও আরাধনার ফল। এটি আবেশ, ঐটী সুখ, শিরীষ সুকুমারী তিলোত্তমা দেখিবার জিনিষ, আদরের বস্তু। জ্যোতির্ম্ময়ী আয়েষা স্পর্শের সামগ্রী, ভোগের মূর্ত্তি। তিলোত্তমা বুদ্বুদের মত ফুটে; আয়েষা উৎসের মত ছুটে।

তিলোত্তমা।

তিলোত্তমা নামটী সার্থক, বিশ্বের সমগ্র সৌন্দর্য্যের তিল তিল করিয়া আহরণে তবে এই মূর্ত্তির নির্ম্মাণ। কবির সৃষ্ট এই চিত্রখানি স্বর্গের অপ্সরার স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। সৌন্দর্য্যের মানসী প্রতিমা মর্ত্ত্যের অধিবাসিনী যা যেন নামিয়া আসিয়াছে। ইহার সঙ্গে পারিজাতের সংগ্র সৌরভ, নয়নে নন্দন নিকুঞ্জের শ্যামশোভা, বাক্যে বীর মৃদুল ঝঙ্কার। আর প্রেমে অমৃতের মধুর স্বাদ। ইহার ছায়াতল মৌন সৌন্দর্য্য যেন ধরার নহে।

অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মে তিলোত্তমা সমধিক লজ্জাবতী প্রথমাবতীর্ণ যৌবনমদন বিকারা মুগ্ধা নায়িকা।

> প্রথমাবতীর্ণ যৌবনমদনবিকারা রতৌ বামা।
> কথিতা মৃদুশ্চ মানে সমধিক লজ্জাবতী মুগ্ধা॥
>
> —সাহিত্য দর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদ।

তিলোত্তমা ষোড়শী; প্রথম যৌবনাবির্ভাবে রমণীয়া। ভাবে কিশোরী, মুখশ্রীতে বালিকা মাত্র। আর অভিমানে অতিমৃদু। প্রণয়ে নিরভিমানিনী।

প্রণয়ে নিরভিমানিনী সংসারে বড় দুর্লভ। পাশ্চাত্য সাহিত্যে দেসদিমনা চরিত্রটি নিরভিমানের আদর্শ চিত্র। পিতার অভিশাপের তীব্র দাহে সে কোমল কুসুম অকালে শুকাইয়া গেল, আর তিলোত্তমা মরণের মুখ হইতে ফিরিয়া আসিল। নিরভিমানিতা যে আদর্শ প্রণয়ের লক্ষণ—ইহা কবির নিজেরই উক্তি। প্রেমাস্পদের সুখ যেখানে কাঙ্ক্ষিত, আপন স্বার্থ যেস্থলে বিসর্জ্জিত—সেই স্থানেই নিরভিমানিতা সম্ভব। সংসারে ইহা স্বাভাবিক নহে। আত্মদানই সেখানে প্রকৃত আত্মবিসর্জ্জন বা আত্মত্যাগের নামান্তর মাত্র।

অভিমান সাধারণতঃ প্রণয়েরই লক্ষণ। ইহারও

দুইটী দিক্, দুইটী আদর্শ। এক ভ্রমর, আর শ্রীরাধা *। প্রণয় যেখানে যত প্রবল, অভিমানও সেখানে তত অধিক। প্রণয়ী তেমন ভাল বাসিল না, তেমন আদর করিল না, সে আত্মহারা ভাব দেখাইল না --অমনই অভিমান। মতে মত মিলিল না, আচরণে ঔদাসীন্য প্রকাশ পাইল— অমনই অভিমান। অত্যাসক্তি—সে ত সন্দেহের অতীত।

তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য বাসন্তীমল্লিকার মত নবস্ফুট, ব্রীড়াসঙ্কুচিত, কোমল, পরিমলময় বলিয়া তাহার প্রেমও চন্দ্রকিরণের মত শীতল,কোমল ও [illegible]। তাই সে প্রেমে মাধুর্য্য আছে, কিন্তু দাহ নাই; আবেশ আছে, কিন্তু উন্মত্ততা নাই। মগ্নপ্রেমের বিপুল আত্মবিস্মরণ আছে, কিন্তু তাহার প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসময় কলকল ধ্বনি নাই।

তিলোত্তমা একাধারে বালিকা, কিশোরী এবং নবীনা যুবতী। প্রকৃতি বড় কোমল ও সরল। শিক্ষা সংসর্গে গ্রন্থাধ্যয়নে সে কোমলতা, সে সরলতা হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। বয়সের ধর্ম্মে যৌবন-সুলভ চাতুর্য্য ও কৌটিল্য কিছুমাত্র জন্মে নাই, দেহে যৌবনের শ্যামশোভা পুষ্পিত; মুখখানি কিন্তু বালিকার মত নির্ম্মল ও সুকুমার। প্রকৃতির কোমলতায় অভিজ্ঞান শকুন্তলের অনুসূয়া, বৃত্রসংহারের ইন্দুবালা, বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনী, সীতারামের রমা তিলোত্তমার অনুরূপা। সরমে কুণ্ঠিত, ভয়ে আত্মহারা, মিলন সুখে বিবশ, প্রণয়ে নিরভিমান, বিরহে জীবন্মৃত—সে চরিত্রের তুলনা কোথায়?

প্রথমাবতীর্ণ যৌবন মদনবিকারা, নবপ্রণয়বতী, মুগ্ধা তিলোত্তমার প্রেমে সংযমের আশা করাই বৃথা। প্রথম দর্শনেই যে অবগুণ্ঠনের কিয়দংশ অপসৃত করিয়া জগৎসিংহের প্রতি অনিমেষ লোচনে চাহিয়াছিল, না ভাবিয়া না চিন্তিয়া একেবারে প্রাণপণ নিবেদন করিয়া দিয়া আত্মহারা হইয়া ভালবাসিয়াছিল, ক্ষণেকের মিলনেই অদর্শনাশঙ্কায় আপনাভোলা হইয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিল। মরণের কোলে একেবারে ঢলিয়া পড়িয়াও তথাপি যে সেই জগৎসিংহগতপ্রাণা হইয়া সেই চিন্তায় নিমগ্না ছিল;—তার কাছে আয়েষার মত চিত্ত বলের আশা করাই বৃথা। হৃদয়ের টানে, ভাবের স্রোতে গা ভাসাইয়া বহিয়া যাওয়াই এক জাতীয় প্রকৃতির ধর্ম্ম। তিলোত্তমা সেই জাতীয় নারী।

তিলোত্তমার প্রেম কতকটা রূপজ, কতকটা বা অহেতুক। কবিগণ রূপজ প্রেমকে মদনশরজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ও আর অহেতুক প্রেম ভবভূতির ভাষায় চক্ষুরাগ বা তারামৈত্রিক নামে অভিহিত হইয়াছে। সংযমানভ্যস্তা কোমলহৃদয়া ভাবময়ী বলিয়াই তিলোত্তমা প্রথম প্রণয়েই তাই এমত বিহ্বলা, এরূপ অধীরা হইয়া পড়িয়াছে।

তিলোত্তমার রূপালোক বালেন্দু জ্যোতির মত সুবিমল, সুমধুর ও সুশীতল। সে রূপালোকে প্রেমের খেলা খেলে কিন্তু সংসারের কার্য্য বড় হয় না। তাহার কৃষ্ণতার নয়ন যেমন স্নিগ্ধ, তেমনি শান্ত। সে চক্ষুতে যৌবন সুলভ চাপল্য ও চাতুর্য্য ছিল না। বিদ্যুদ্দামস্ফুরণ চকিত কটাক্ষ খেলিত না। হাব, ভাব, বিলাস, বিভ্রম, ভ্রুভঙ্গী দেখা যাইত না। তাহা সায়াহ্ণ আকাশের মত সুন্দর। সে দৃষ্টিতে বিমল স্নেহ, স্বর্গের অমৃত যেন ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িত। তার গতি স্থির কিন্তু গজেন্দ্রগতির সহিত উপমিত নহে। সে তন্বী, গজেন্দ্রগমনা নহে। ভালবাসার রেখা তাহার কোমল হৃদয়ে দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হইয়া গেল; মদনের শর অবসর বুঝিয়া সে তীক্ষ্ণ লৌহশলাকার ন্যায় মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইয়া রহিল। এত সরলা—ভালবাসিবার পূর্ব্বে কোন বিচারই করিল না। এমত বালিকা—লতা পাতা লিখিয়া বসে। এরূপ বিহ্বলা—জগৎসিংহ নাম লিখিয়া লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া বসে। এত লাজুকা—ভয়ে লজ্জায় চোর হইয়া যায়। এত বিভোরা—গীতগোবিন্দ পড়িতে পড়িতে সলজ্জ ঈষৎ হাসিয়া পুস্তক ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। তিলোত্তমার প্রাণ বড় দুর্ব্বল, বড় ভয়াতুর। মোগলাক্রমণ সংবাদ শ্রবণ মাত্র অমনই চীৎকার করিয়া পালঙ্কের উপর মূর্চ্ছাপ্রাপ্তা হইল। বড় ভাবময়ী সে—তাই বীণার ঝঙ্কারের মত প্রিয়তমের কণ্ঠলগ্না হইল, কিন্তু তেরীধ্বনির মত বীরের উৎসাহ বর্দ্ধন করিল না। যুদ্ধের শেষে শান্তির মত শ্রান্তিশয়নে বিশ্রান্তির মত সে মনো-

---

* অর্চ্চনা ১৩২০।২১ বা ২২ সাল। শ্রীরাধাতত্ত্ব, নব্যভারত ১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ।

হারিণী হইল, কিন্তু বীরত্বের সহায় রূপা হইয়া সংসারে কর্ম্মময়ী হইতে পারিল না। রাজপুতনার বীরনারী বাঙ্গলার জল-বাতাসের গুণে বাঙ্গালীর মেয়ে হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আয়েষা।

আয়েষা স্থিরা, ধীরা, সংযত-হৃদয়া ও মহীয়সী নারী। বেহেস্তার বাণী মূর্ত্তি ধরিয়া যেন এই মর্ত্ত্যে অবতীর্ণা। মুখে দেবীর করুণা, অঙ্গে সাম্রাজ্ঞীর ভঙ্গী। সেই উন্নত আকার, সেই সুপরিপুষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সেই নবসূর্য্যকরোজ্জ্বল বর্ণ, সেই মহিমময় পদবিন্যাস সাম্রাজ্ঞীর উপযুক্ত।

অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুশাসনে আয়েষা মধ্যশ্রেণীর নায়িকা। প্ররূঢ়-স্মর-যৌবনা, ঈষৎ প্রগল্‌ভ বচনা মধ্যম ব্রীড়িতা নারীই মধ্যানায়িকা। তিলোত্তমা নব প্রস্ফুটিতা, আয়েষা পূর্ণ প্রস্ফুটিতা। আয়েষা দ্বাবিংশতি বৎসরের পরিপূর্ণ যৌবনা। আয়েষার বাক্য বীণাধ্বনিবৎ সুস্পষ্ট, কিন্তু স্থানবিশেষে ঈষৎ প্রগল্‌ভ। না—নির্লজ্জা; না—তিলোত্তমাবৎ সমধিক লজ্জাবতী।

আয়েষার সৌন্দর্য্য নবরবিকর ফুল্ল জলনলিনীর ন্যায় সুবিকাসিত, সুবাসিত, রসপরিপূর্ণ, কোমল অথচ উজ্জ্বল। [illegible] সূর্য্য রশ্মির ন্যায় প্রদীপ্ত [illegible]। যাহাতে পড়ে, তাহাই যেন হাসিতে থাকে। রাজোদ্যানের রসোরা গোলাপ। ধ্যানলভ্যা আরাধ্যা মূর্ত্তি। প্রথম দর্শনেই জগৎসিংহের নিকট দেবকন্যাবৎ প্রতীয়মানা। জগৎসিংহ তাহার বায়ুকম্পিত নীলোৎপল দল তুল্য কটাক্ষের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন। তার লীলাময় সঙ্গীত মধুর পদবিন্যাস, বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ মেঘবৎ চঞ্চল হাসি, আর লাবণ্যময় গ্রীবা-ভঙ্গী তাহাকে অলোকসামান্য বিশেষত্বের অধিকারিণী করিয়া তুলিয়াছে। তাহার অন্তঃকরণ কুসুমের মত কোমল, আবার কদাচিৎ প্রয়োজন-বাধে বজ্রবৎ কঠোর; তরুর মত সহিষ্ণু, স্বভাবতঃ করুণা-রূপা। আঘাতে ক্বচিৎ অসহিষ্ণু, প্রখর জ্বালাময়ী।

আয়েষা জগৎসিংহকে দেখিবা মাত্র তিলোত্তমার মত ভালবাসে নাই—তাহার রূপসৌন্দর্য্যে আকৃষ্টা হইয়া একেবারে প্রাণ মন নিবেদন করিয়া বসে নাই। এ ভালবাসা এককালে এক দিনে জন্মে নাই। ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া আপনার প্রভাব বিস্তার করে। ছদ্মবেশে গোপনে প্রবেশ করিয়া শেষে অকস্মাৎ আপনার প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়া দেয়। বন্দীরাজপুত্রের প্রতি করুণা, মুমূর্ষুর প্রতি সহানুভূতি, ব্যথিতের প্রতি সান্ত্বনাই ক্রমে ভালবাসায় পরিণত হয়। আয়েষা জানিত, পীড়িতকে সেবা করা, ব্যথিতকে সান্ত্বনা দেওয়া, বিপদে সাহায্য করা রমণীর ধর্ম্ম। ওসমানের অনুরোধও উপরোক্ত হেতুতে আয়েষা রোগীর ভার [illegible] করুণায়, সমবেদনায় তাহার নারীহৃদয় দিনে দিনে দ্রবীভূত হইতে লাগিল। সুপুরুষ সংস্পর্শে দেবকান্তি রাজপুত্রের সাহচর্য্যে সেই দ্রবীভাব অনুরাগে পরিণত হইল। মৃত্যুর কোলে শুইয়া জগৎসিংহ যখন আয়েষাকে সান্ত্বনার মত আঁকড়াইয়া ধরিত, তখন তাহার চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া যাইত। বড় আগ্রহে ব্যথা-কাতর রাজপুত্র যখন আয়েষার কর দুটী গ্রহণ করিত, তখন তার নারীহৃদয় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিত, যৌবনের বৃত্তিগুলি জাগিয়া উঠিয়া মাথা খাড়া দিত। আয়েষা তাহার বিস্ফারিত তৃষাতুর দৃষ্টি দ্বারা পলে পলে রাত্রিদিন রাজকুমারের রূপ-মদিরা পান করিতে লাগিল। তাহার মন সেই মদিরাপানে ভিতরে ভিতরে বিহ্বল হইয়া উঠিল। স্নানের সময় উত্তীর্ণ না হইলে আর স্নান করিতে যাওয়া ঘটিত না। মাতার নিকট তাড়া না আসিলে পীড়িতের সান্নিধ্য ত্যাগ করা হইত না।

আয়েষা প্রতিদানের আশা না করিয়া ভালবাসিয়াছিল। জানিয়া শুনিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া ত আর ভালবাসে নাই। নতুবা যেখানে মিলনের আশা নাই, সেখানে বুদ্ধিমতী হইয়া কেন সে ভালবাসিবে? আয়েষা ইচ্ছা করিয়া সাধ করিয়া তাহার সর্ব্বস্বের পুষ্পাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হয় নাই। ভাবের স্রোতেই সে ভাসিয়া গেল।

আয়েষা ভাবময়ী অথচ কর্ম্মময়ী। সে যেমন বীণার ঝঙ্কারের মত কণ্ঠে থাকার যোগ্যা, তেমনই ভেরীধ্বনির মত বীরের উৎসাহবর্দ্ধিকা। আয়েষা বৃদ্ধাবসানে শান্তি, যুবা-বিভাবে উত্তেজনী। গৃহে গৃহলক্ষ্মী, রাজ্যে রাজলক্ষ্মী, সংগ্রামে বিজয়লক্ষ্মী।

তিলোত্তমা।

যে তিলোত্তমা পিতৃগৃহে নবমল্লিকার মত মন্দবায়ু হিল্লোলে বিধুত হইয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত, আর আজ সে কতলুখাঁর গৃহে বন্দিনী। নৈদাঘ ঝটিকাতে অবলম্বিত বৃক্ষ হইতে ভূতল শায়িত লতার অবস্থায় উপনীতা। মুখের সে জ্যোৎস্না মধুর হাসি কান্নায় পর্য্যবসিত, চক্ষুর সে ধীর প্রশান্ত দৃষ্টি নৈরাশ্য ভারে এবং বেদনায় অবনমিত। বিষাদপ্রতিমা কোমলপ্রাণা বালা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শয্যায় অবসন্ন ভাবে শায়িতা।

দুঃখে পড়িলে মানুষের অনেক শিক্ষা জন্মে, পরিবর্ত্তন হয়। দুঃখ শোক মানুষকে নূতন রকমে গড়িয়া থাকে। তিলোত্তমা আর সে হাস্যময়ী বালিকা নাই, লজ্জাশীলা নবপ্রণয়িনী নহে। দেখিলে বোধ হয় দশ বৎসর বয়স বৃদ্ধি পাইয়াছে। কতলুখাঁর জন্মদিনের মহোৎসবে যোগ দিবার জন্য বিমলা বেশ বিন্যাস করিয়া তিলোত্তমার কক্ষে উপস্থিতা। সে সাজসজ্জা তিলোত্তমার সহ্য হইল না। কহিল, "তবে মা এ সকল অলঙ্কার খুলিয়া ফেল! আমার চক্ষুশূল হইয়াছে।" তিলোত্তমার এ করুণচিত্র কুমারসম্ভবের রতির অবস্থা স্মরণ করাইয়া দেয়।

গত এব ন তে নিবর্ত্ততে স সখা দীপ ইবানীলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্য মামবি সহ্য ব্যসনেন ধূমিতাং॥

(৪র্থ পরিচ্ছেদ)

বিমলা আজ প্রতিশোধ দিতে কৃতসংকল্পা—তাই রূপের ফাঁদ পাতিয়াছে। নবাবকে সেই ফাঁদে ফেলিয়া পতিহত্যার প্রতিশোধ দিয়া স্বর্গগত পতির তৃপ্তি বিধান করিবে। বিমলা তিলোত্তমাকে ওস্মান্ দত্ত মুক্তি চিহ্ন স্বরূপ অঙ্গুরী দিয়া তৎ সাহায্যে এ রাক্ষসী পুরী ত্যাগ করিয়া অভিরাম স্বামীর কুটীরে যাইবার পরামর্শ দিয়া গেল। আশমানী অভিরাম স্বামীর প্রেরিত হইয়া নবাবান্তঃপুরে নূতন পরিচারিকা রূপে প্রবেশ করিয়াছে। সেই আশমানী দ্বারা অভিরাম স্বামী বিমলার সহিত সংবাদ আদান প্রদানাদি করিতেন।

তিলোত্তমার বড় সাধ জানিয়া লয় যে, রাজপুত্র কি অবস্থায় আছেন। মায়ের কাছে (বিমাতা) প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইল, জগৎসিংহ দুর্গ মধ্যেই আছেন এবং শারীরিক ভালই আছেন। তখন তিলোত্তমা বাষ্পাকুললোচনা হইয়া ভাবিতে বসিল। "রাজপুত্র আমার জন্য কারাগারে বন্দী! কেমন সে কারাগার! আচ্ছা, এ অঙ্গুরী দ্বারা তাঁহার উদ্ধারের কৌশল করা হয় না? একবার তাঁহার সাক্ষাত মেলে না?"

তিলোত্তমা অঙ্গুরী লইয়া—পা কাঁপে, হৃদয় কাঁপে, মুখ শুকায়—তবু চলিতে লাগিল। প্রহরীর "কোথায় লইয়া যাইব" এই কথার উত্তরে কোনরূপে অর্দ্ধস্ফুট "জগৎসিংহ" কথাটি উচ্চারণ করিল। তৎপরে প্রহরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যন্ত্র-চালিত পুত্তলির মত কারাগার দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল। পা আর সরে না। কবাটে মাথাটি রক্ষা করিয়া কোন মতে দাঁড়াইয়া রহিল। একবার মনে করিল "ফিরিয়া যাই" কিন্তু ফিরিতেও পা উঠে না। তখন তিলোত্তমার "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থা। (কুমারসম্ভব ৫ম সর্গ শেষ)।

তারপর জগৎসিংহের নয়নে নয়ন মিলিল। তিলোত্তমা বেতসলতার মত কাঁপিয়া উঠিয়া সম্মুখে ঢলিয়া পড়িবার মত হইল। জগৎসিংহ পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইল। অমনই তিলোত্তমার দেহ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। ক্ষণপ্রস্ফুটিত হৃৎপদ্ম সঙ্গে সঙ্গে শুকাইয়া [illegible] বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা" এই নিষ্প্রণয় সম্বোধনে "এখানে কি অভিপ্রায়ে" এই সাবধান ব্যবহারে তিলোত্তমার মাথা ঘুরিয়া গেল। কক্ষ, প্রাচীর, শয্যা, প্রদীপ যেন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিলোত্তমার বাক্‌শক্তি তখন লুপ্ত, ইন্দ্রিয় অসাড়, চিত্ত বিমূঢ়; সে কথার উত্তর দিবে কি? এ যেন স্বপ্নের মত। তারপর যেই শুনিল "তুমি ফিরিয়া যাও, পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হও", তখন আর ভ্রম রহিল না; বৃক্ষচ্যুত বল্লীবৎ নিঃসঙ্গ হইয়া সে স্বর্ণপ্রতিমা ভূতলে পতিত হইল।

ভবভূতির সীতা পতি-কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিতা হইয়া দুঃখশোক সংবরণে অসমর্থা হইয়া সজ্ঞানে গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দেন। আর তিলোত্তমা মানসিক বেদনায় বিগতচেতনা হইয়া অজ্ঞানে ধরার বক্ষে লুটাইয়া পড়ে। ভবভূতির সীতা * কালি-

---

* পরিপাণ্ডুদুর্ব্বলকপোলসুন্দরং দধতী বিলোলকবরীকমাননং।
করুণস্য মূর্ত্তিরথবা শরীরিণী বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী॥

দাসের শকুন্তলা * কোন উপায়ে অবসন্ন প্রাণটি ধরিয়া রাখিয়াছিল; তিলোত্তমা কিন্তু সে দুঃখ শোক সহ্য করিয়া কোন মতেই আপনার প্রাণকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। একেবারে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল। জগৎসিংহের প্রণয়বারি সেচনে সে নিদাঘতপ্তা বল্লরী ধীরে ধীরে বাঁচিয়া উঠিল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপটী বিন্দু বিন্দু তৈল সঞ্চারে আবার হাসিয়া উঠিল। প্রণয়ই পরম ঔষধ, মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র †। কুমার জগৎসিংহ আসিয়াছেন শুনিয়া তিলোত্তমা কি করিল? শুধু নিমীলিত নয়নপদ্ম উন্মীলিত করিয়া একদৃষ্টে জগৎসিংহের প্রতি চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি কোমল, কেবল স্নেহব্যঞ্জক। তিরস্করণাভিলাষের চিহ্নমাত্রে বর্জ্জিত।

তিলোত্তমা ভালবাসার ক্রীড়না; খেলিবার সামগ্রী। তাহার প্রেম-প্রতিম মুখখানি সংসারের অনেক জ্বালা যন্ত্রণার কষ্ট ভুলাইয়া দেয়। কর্ম্মজগতে সে তত কর্ম্মময়ী হইতে আইসে নাই। এ যে কবিতার রাণী, স্বপ্নের ছবি, হৃদয়ের বিশ্রামরূপা। ধনাঢ্যের গৃহে থাকিয়া সহচরীদের সাহচর্য্যেও তিলোত্তমার সরল বুদ্ধি তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। অধ্যয়নে প্রকৃতির সারল্য কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। বুদ্ধিতে সে আয়েষার নিকট বালিকা মাত্র। আয়েষা যখন বহুমূল্য অলঙ্কারে মনোমত সাজাইয়া তিলোত্তমাকে বলিয়াছিল, "তুমি যে রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ সকল তাঁর চরণরেণুর তুল্য নহে।" এ কথার ভিতর তিলোত্তমা প্রবেশ করিতে পারিল না। "*** আর আমার—তোমার সার রত্ন" বলিতে বলিতে আয়েষার যখন কণ্ঠরোধ হইল, নয়নপল্লব জলভার স্তম্ভিত হইয়া কাঁপিতে লাগিল, তখনও তিলোত্তমা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সমদুঃখিনীর ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল মাত্র—"কাঁদিতেছ কেন?" তার পর দরদরধারে নয়নবারি স্রোত বহিতে লাগিল। তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতবেগে সে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল—তবুও তিলোত্তমার মনে কোনরূপ সংশয়ের রেখাটুকুও ফুটিল না। এমন সরল অন্তর লাভ করা অনেক তপস্যার ফল। খেলার পুতুলের মত তিলোত্তমাকে দিয়া মিলনের সাধ মেটে—তাই তিলোত্তমা সংযম ও সহিষ্ণুতার মূর্ত্তি হইল না। সংযম ও সহিষ্ণুতার বলে আয়েষার মত বাঁচিয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। জগৎসিংহকে পতিরূপে পাইয়া তিলোত্তমা কৃতার্থা হইল। "প্রিয়েষু সৌভাগ্য ফলা হি চারুতা"।

* বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি॥

† অবেব নূনং কল্যাণি সঞ্জীবয় জগৎপতিং।
প্রিয়স্পর্শো হি পাণিস্তে তত্রৈষ নিরতো ভব॥

আয়েষা।

আয়েষা কোমলা ও তেজস্বিনী। বালসূর্য্য প্রভাসদৃশী হইয়াও কার্য্যক্ষেত্রে নৈদাঘ সূর্য্যরশ্মি। কারাগারে আয়েষা যখন কোনরূপ দ্বিধা সঙ্কোচ না করিয়া স্নেহময়ী রমণীর মত মূর্চ্ছিতা তিলোত্তমাকে কোলে তুলিয়া লইল—প্রেমময়ী নারীর ন্যায় কোমল করপল্লবে রাজপুত্রের করপল্লব গ্রহণ করিল—রাজপুত্রের ব্যথা দর্শনে কাতরা হইয়া দরদরধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল—সে কোমল মূর্ত্তি। করপল্লবে কবোষ্ণবারি বিন্দুপাত অনুভব করিয়া জগৎসিংহ যখন সবিস্ময়ে আয়েষাকে কহিল, "তুমি কাঁদিতেছ আয়েষা?" তখন আয়েষা সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। ধীরে ধীরে গোলাপ ফুলটি নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া ফেলিল মাত্র—এ প্রেমিকা মূর্ত্তি। 'আপনি' স্থলে এই 'তুমি' সম্বোধনে আয়েষা বুঝিল, জগৎসিংহ তাহাকে আপন ভাবিয়া লইয়াছে। আয়েষা ইষ্টদেবী ভবানীর মত জগৎসিংহকে মুক্তি দিবার প্রস্তাব করিল। তাঁহাকে বিপন্ন করিয়া জগৎসিংহ মুক্তি চাহেনা—দেখিয়া আয়েষার চক্ষে দরদর বারিধারা বহিল—এ করুণাময়ী দেবীমূর্ত্তি।

আয়েষা ওসমানকে স্নেহময়ী ভগিনীর মত স্নেহ করিয়া আসিয়াছে। তাহাকে বিবাহ করিবে—এ ইচ্ছা সে পোষণ করে নাই। ওসমান যে প্রণয়িনী জ্ঞানে তাহাকে ভালবাসে, তাহা আয়েষা জানিত। আয়েষা যখন জগৎসিংহের হাতখানি আকুল আগ্রহে ধরিল, দরদর ধারায় যেরূপ কান্না কাঁদিল, তাহাতেই তাহার প্রেম ব্যক্ত হয়। তিলোত্তমাকে হৃদয় দান না করিলে আয়েষার আকর্ষণে অবশ্যই জগৎসিংহ তাহাকেই মন প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন।

আয়েষা যদি জগৎসিংহের প্রেমলাভ করিত, তাহাদের মিলনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিষম বাধা না থাকিত—তাহা হইলে আয়েষার প্রেম এমত নিঃস্বার্থ হইতে পারিত না। অবস্থা অন্যরূপ ঘুরিয়া যাইত।

আয়েষার অশ্রু তখনও শুকায় নাই, এমন সময় কারাগারে ওসমানের মূর্ত্তি দেখা গেল। ওসমান্ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ক্রোধ-কম্পিত স্বরে কহিল, "নবাবপুত্রি, এ উত্তম"।

ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া, কথার অভিপ্রায় বুঝিয়া আয়েষার মুখ রক্তবর্ণ হইল। কোন মতে ধৈর্য্য ধরিয়া স্থিরস্বরে উত্তর দিল, "কি উত্তম ওসমান?"

"নিশীথে একাকিনী বন্দী সহবাস নবাবপুত্রীর পক্ষে উত্তম?" আয়েষার কর্ণে কে যেন তপ্ত সলিলধারা ঢালিয়া দিল। এ তিরস্কার তাহার পবিত্র চিত্তে সহ্য হইল না। এ হিংস্রবাণী তাহাকে উত্তেজিতা করিয়া তুলিল। প্রত্যেক বিশেষণটি কদর্থের ইঙ্গিতে সার্থক হইয়াছে, বলিবার ভঙ্গী কুৎসিত ব্যঙ্গে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

"আমার কর্ম্ম উত্তম কি অধম, সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।" নবাবপুত্রী নবাবপুত্রীর মত উত্তর দিল। ওসমানের ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "আর আমিই যদি জিজ্ঞাসা করি?" আয়েষার বিশাল লোচন তখন আরও বর্দ্ধিতায়তন হইল, মুখপদ্ম আরও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। স্বর গর্ব্বিত ও গম্ভীর হইয়া আসিল—তখন তেজস্বিনী মূর্ত্তি। তখন তেজস্বিনী নারী মস্তকের একদেশ হেলাইয়া, তরঙ্গান্দোলিত শৈবালদলবৎ হৃদয় উৎকম্পিত করিয়া আয়েষা ওসমানকে কহিল, "এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর"।

সেই মুহূর্ত্তে যেন কক্ষমধ্যে বজ্রপতন হইল। আয়েষার নীরব রোদনের কারণ জগৎসিংহের চক্ষে স্পষ্ট প্রতিভাত হইল। তিল তিল করিয়া অনেক দিনের অনেক ব্যবহার, অনেক কথা স্মৃতিপথে আসিল। ওসমান অবিশ্বাসিনী ভাবিয়াছিল বলিয়া আয়েষার ভিতরকার সুপ্ত তেজ জাগিয়া উঠিল। সতীত্বের উপর আঘাতের মত বড় আঘাত মেয়ে মানুষের আর নাই। সেই নারী সম্মানে ঘা লাগিয়াছে, নারী হৃদয় মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল। উত্তেজনার বশে তাহার রুদ্ধ ভালবাসা প্রকাশ হইল। ভাবের মূর্ত্তি ভাষায় ফুটিয়া উঠিল। আয়েষার চক্ষু ফাটিয়া তপ্ত অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। ক্রমে তাহার সেই জ্বালাময়ী মূর্ত্তি আবার কোমল ভাব ধারণ করিল। আয়েষা অশ্রু মুছিল। যে আয়েষা আবার সেই আয়েষা হইল। কেবল একটি জলোচ্ছ্বাস নদীর উপর দিয়া বহিয়া গেল। মাত্র একটি ভূমিকম্প ধরার আপাদ মস্তক টলাইয়া দিয়া গেল। প্রবল ঝটিকাবসানে প্রকৃতির মত কক্ষের অবস্থা নিথর ভাব ধারণ করিল।

ওসমান কথা কহিবে কি? তাহার সামান্য সংশয় যে আজ সত্য হইবে, ইহা যে স্বপ্নেরও অগোচর। যে আশালতার মূলে এতদিন ওসমান জলসেচন করিয়া আসিয়াছে, আজ যে তাহা সমূলে উন্মূলিত হইবে তাহা যে ভাবনারও অতীত। আয়েষা অনুতপ্তা হইয়া স্নেহময়ী ভগিনীর মত কত স্নেহের সান্ত্বনাবাণী কহিল। দাসীর আগমনের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই আয়েষা চলিয়া গেল। ওসমানের হৃদয়ের আগুন আর নিবিল না। সে কিয়ৎক্ষণ বিহ্বলের মত অপেক্ষা করিয়া নিজ মন্দিরে প্রস্থান করিল।

সেই রাত্রেই কতলুখাঁর বক্ষে আমূল ছুরিকা বসাইয়া বিমলা পতিহত্যার প্রতিশোধ লইল। আহত নবাব মৃত্যু-শয্যায় পড়িয়া রহিল।

মুমূর্ষু পিতার মস্তক ক্রোড়ে করিয়া আয়েষা নিঃশব্দে উপবিষ্টা। নয়নাশ্রুধারায় মুখখানি পরিপ্লাবিত। সে মূর্ত্তি স্থির, গম্ভীর ও নিষ্পন্দ। জগৎসিংহ তথায় আহূত হইয়া উপস্থিত হইল। সন্ধি প্রার্থনায় কতকটা সম্মত হইলে নবাবের মৃত্যু-পীড়িত মুখ প্রদীপ্ত হইল। সেই সাংঘাতিক মুহূর্ত্তেও আয়েষার কি সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখা গেল। পিতার কাণে ক্ষীণে কণ্ঠে কি বলিয়া দিল, অমনই নবাব সেই মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যেও বলিয়া গেল, "বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা সাক্ষী তুমি দেখিও"। এই উপকার করিয়া নবাব মৃত্যুকালে একটি বড় পুণ্য করিয়া গেল। আয়েষার নাম মুখে উচ্চারণ করিতে করিতে নবাবের নির্জ্জীব মস্তক ভূমে লুটাইয়া পড়িল। আয়েষা কাঁদিল না, মূর্চ্ছিত হইল না;

কেবল শোকভার-স্তম্ভিত হইয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল।

এইবার জগৎসিংহের শিবির ভঙ্গোদ্যোগ হইতে লাগিল। প্রস্থান সময়ে আয়েষার সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলেও আয়েষা সাক্ষাৎ করিল না। ওসমানের হৃদয়ের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে, সে ব্যথা পাইবে—তাই আয়েষা পাষাণীর মত সাক্ষাৎ না করার কষ্ট সহ্য করিয়া লইল। আত্ম-ধৈর্য্যের প্রতি অবিশ্বাসিনী বলিয়া যে সে সাক্ষাৎ করিল না, তাহা নহে। তবে বারান্তরে সাক্ষাতের সে বড় আর প্রত্যাশা করে না। নারীহৃদয় দুর্দ্দমনীয়, অধিক সাহস অনুচিত—এ আশঙ্কা তাহার ছিল। তবে এই প্রদেশে যদি জগৎসিংহ বিবাহ করেন, তবে যেন আয়েষাকে সংবাদ দেওয়া হয়—এইমাত্র তার অনুরোধ ছিল।

বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিতা হইয়া আয়েষা মনের মত তিলোত্তমাকে সাজাইবে বলিয়া অন্যজনদুর্লভ হীরকাদি খচিত রত্নালঙ্কার গড়াইয়া লইয়া গেল। মনের মত সাজাইয়া, তিলোত্তমার সরল প্রেম-প্রতিম মুখখানি তুলিয়া ধরিল। এ মুখ দেখিয়া প্রাণেশ্বর মনঃপীড়া পাইবেন না ভাবিয়া আশ্বস্তা হইল। "যখন বিধাতা অন্যরূপ (আয়েষার জগৎসিংহ মিলন) ঘটাইলেন না, তখন ইহার দ্বারা তিনি সুখী হউন" আয়েষা এই প্রার্থনাই করিল।

পূর্ব্বে নবাবপুত্রী বলিয়া বন্দী রাজপুত্রকে আয়েষা তুমি সম্বোধনই করিত, আর আজ জগৎসিংহের সে প্রেমাকাঙ্খিনী দাসী হইয়া কেমন করিয়া তুমি সম্বোধন করিবে? জগৎসিংহ আপনি স্থলে তুমি ধরিল। আয়েষা তুমি স্থলে আপনি ধরিল।

আয়েষা সংযমে, সহিষ্ণুতায় এবং স্বার্থত্যাগে আদর্শ; তবু সে হৃদয়ে নারী, রক্তমাংসে গড়া মানবী। "আমার—তোমার সাররত্ন" বলিতে গিয়া তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। প্রেমিকা যুবতী ব্যর্থ জীবনভারে পীড়িতা হইয়া যদি কাঁদিয়াই থাকে—তাহাতে তাহার নারীত্বই পরিস্ফুট হৃদয়বত্তাই প্রকাশিত হইয়াছে। সে ত পাষাণ নির্ম্মিতা নহে, যে তাহার সান্ধ্য সমীরণ কম্পিত নীলোৎপলবৎ চক্ষু অশ্রুভরে একদিনও টলমল করিবে না? তৃষাতুর বিশুষ্ক অধর প্রণয়বারি পান লালসায় ক্ষণেকের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে না?

নিরাশ প্রণয়িনী বলিয়াই সে সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী। তিলোত্তমাকে বঞ্চিতা করিয়া, প্রাণেশ্বরের ধর্ম্ম লোপ করাইয়া নিজের সুখভোগ বা স্বার্থ সিদ্ধি সে চাহে না। ওসমানের হৃদয়ে ব্যথা দিয়া সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিতেই সে সম্মতা হয় নাই। প্রলোভনের বস্তু বলিয়া গরলাধার অঙ্গুরীয়টি পর্য্যন্ত জলে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিল।

প্রলোভন জয়ই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। সংযম ও সহিষ্ণুতা ত্যাগই মানুষের বরণীয়। প্রলোভন জয়ে প্রতাপ একদিকে আদর্শ। আয়েষা অন্যদিকে আদর্শ। প্রতাপ, শৈবলিনীর প্রণয় যাচ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিয়া শৈবলিনীর মঙ্গলের জন্য তাহারই কথায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া দেবতা। আর আয়েষা দুর্ব্বলহৃদয়া নারী হইয়া স্মৃতিমাত্র সম্বল করিয়া সারা জীবন সন্ন্যাসিনী জীবন কাটাইয়া দিল বলিয়া দেবী। প্রতাপ কঠিনচেতা বীর হইয়াও "রূপসী" বিবাহ করিল। আয়েষা কোন দিনই বিবাহের কল্পনা পর্য্যন্ত করিল না। আবার জগৎসিংহের স্মৃতি আয়েষার জীবনের বন্ধনী। শৈবলিনীর স্মৃতি প্রতাপের পাপবৎ পরিত্যাজ্য।

চিত্তজয়ে প্রলোভনজয়ে যদি পুণ্য থাকে তবে আমরাও বলি "সে স্বর্গ আয়েষা তোমার! তোমার এই নিঃস্বার্থ প্রেমের পুরস্কার পরলোকে। ইহলোকে—যতদিন বঙ্গ সাহিত্যে জীবনের, ততদিন তোমার যশ জনে জনে কীর্ত্তন করিবে। আশীর্ব্বাদ করিও দেবী, যেন তোমার মত সংযম ও স্বার্থত্যাগ লাভ করিয়া ভারতের নর নারী ধন্য হয়।"

কথা-সাহিত্যের এক পৃষ্ঠা।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ]

কথা-সাহিত্যের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। বিষ্ণু-শর্ম্মা এই শ্রেণীর সাহিত্যের আদি লেখক। তাঁহার 'পঞ্চতন্ত্র' বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আসিয়া ও পরে য়ুরোপের নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। আকাশ-কুসুমের যে কথাটি তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহাই এই প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়। মানুষ কল্পনার সাহায্যে যত কিছু সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মধ্যে আকাশ-কুসুমের মত মনোহর আর একটিও জিনিষ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নন্দনের পারিজাত শচীরই উপভোগ্য। মর্ত্ত্যলোকে আকাশ-কুসুম সকলের পক্ষেই সুলভ। মনরূপ বৃক্ষে এই পুষ্পের বিকশিত সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিষ্ণুশর্ম্মা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যে দেশের আকাশের গায়ে আলোক-ছায়ার খেলা কবি-হৃদয়ে ভাবের সঞ্চার করে, যে দেশে সন্ধ্যা সমাগমে অগণিত তারার ফুল ফুটিয়া ভাবুকের চক্ষে প্রকৃতিদেবীর কবরীতে প্রসাধন কলার আশ্চর্য্য নৈপুণ্য বিকাশ করে, সে দেশের আশা মরীচিকা ভ্রান্ত মানবের অলস চিন্তা যে আকাশ-কুসুম রচনা করিবে ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। পঞ্চতন্ত্রে লিখিত আছে যে, স্বভাবকৃপণ নামে ব্রাহ্মণ ভিক্ষালব্ধ শক্তুতে (ছাতু) পূর্ণ ভাণ্ডটি নাগদণ্ডে (গোঁজ) ঝুলাইয়া রাখিয়া তাহার অধোদেশে শয়ন করিয়া সেই ভাণ্ডের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। যদি কখনে দেশে দুর্ভিক্ষ হয় তাহা হইলে এই শক্তুপূর্ণ ভাণ্ড একশত রৌপ্য মুদ্রায় বিক্রয় করা যাইতে পারে। সেই অর্থে দুইটি অজা ক্রয় করিলে ছয় মাসে তাহারা প্রসব করিবার পর বৎস বিক্রয় করিয়া গাভী ক্রয় করিব ও উক্তরূপে গাভী ও গোবৎস বিক্রয় করিয়া মহিষ ও তৎপরে অশ্ব ক্রয় করা যাইবে। এইরূপে পশ্বাদি ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া প্রভূত ধনশালী হইয়া চতুঃশালা গৃহ নির্ম্মাণ করিব। তাহার পর কোনও ব্রাহ্মণ আমার সেই গৃহে আসিয়া তাঁহার প্রাপ্তবয়স্কা রূপবতী কন্যাকে দান করিবেন। যথা-কালে আমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। আমি তাহার নাম সোমশর্ম্মা রাখিব। সোমশর্ম্মা যখন হামাগুড়ি দিয়া চলিতে শিখিবে তখন আমি একদিন অশ্বশালার নিকট বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতে থাকিলে সে আমাকে দেখিয়া তাহার মাতার নিকট হইতে হামাগুড়ি দিয়া পলাইয়া আসিবে। আমি কোপাবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিব, "বালককে গ্রহণ কর।" ব্রাহ্মণী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকাতে আমার কথা শুনিতে পাইবে না। তখন আমি দাঁড়াইয়া উঠিব এবং তাহাকে পাদপ্রহার করিব। স্বভাবকৃপণ এরূপ চিন্তামগ্ন হইয়া আকাশ-কুসুম রচনা করিতেছিলেন যে, তিনি সত্য সত্যই পাদপ্রহার দ্বারা সেই শক্তুপূর্ণ ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং ঘটস্থ শক্তু দ্বারা স্নাত হওয়াতে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেলেন।

ম্যাক্‌ডনেল (Macdonell) প্রমুখ প্রাচীন সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের সমালোচকগণ পঞ্চতন্ত্রে বৌদ্ধ যুগের প্রভাব অনুভব করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার ইহাতে বৈদিক যুগের প্রভাবও লক্ষ্য করিয়াছেন। ফল কথা, পঞ্চতন্ত্রে প্রাচীন হিন্দু সমাজের অনেক তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। আকাশ-কুসুমের কথা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে; প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণেরা বৈশ্যজনোচিত পশ্বাদির ব্যবসা করিতেন এবং ভারতবর্ষে তখন দুর্ভিক্ষের প্রকোপ মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পাইত। স্বভাবকৃপণের হস্তে ব্রাহ্মণীর নির্য্যাতনের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইতে হয়। হিতোপদেশে স্বভাবকৃপণের কথাটি অন্য ভাবে লিখিত হইয়াছে। "যে ভবিষ্যত বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন হইয়া সুখ অনুভব করে, সেই ব্যক্তি ভাণ্ড ভগ্ন করিয়া এক ব্রাহ্মণের ন্যায় অপমানিত হয়। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিরূপ? দূরদর্শী কহিতে লাগিল—দেবকোট্ট নগরে দেবশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ আছে। মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন ঐ ব্রাহ্মণ শক্তু পরিপূর্ণ একখানি শরা পাইল। পরে সেই শরাখানি লইয়া ঐ

ব্রাহ্মণ রৌদ্রের উত্তাপে ক্লান্ত হইয়া কোন কুম্ভকারের ভাণ্ড পরিপূর্ণ মণ্ডপ মধ্যে শয়ন করিল। পরে শক্তু রক্ষা করিবার নিমিত্ত হস্তে দণ্ড লইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, যদি আমি শক্তু পূর্ণ শরাখানি বিক্রয় করিয়া দশকড়া কড়ি পাই, তবে ঐ কড়ি-দ্বারাই এখন ঘট শরা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া নানা প্রকারে বৃদ্ধি করিয়া বাণিজ্য দ্বারা লক্ষসংখ্যক ধনলাভ করিয়া একেবারে চারিটি বিবাহ করিব। পরে যখন ঐ সপত্নীগণ পরস্পর ঈর্ষ্যাবশতঃ কলহ করিবে তখন আমি ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত সপত্নীগুলিকেই যষ্টিদ্বারা প্রহার করিব— এই বলিতে বলিতে সে যষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহাতে শরা-খানি খণ্ড খণ্ড হইল, ভাণ্ডগুলিও ভগ্ন হইল। তখন ভাণ্ড ভঙ্গের শব্দ শ্রবণ করিয়া কুম্ভকার গলাধাক্কা দিয়া ব্রাহ্মণকে মণ্ডপ হইতে বহিষ্কৃত করিল।" হিতোপদেশ যে সময়ে রচিত হয় সে সময়ে বহুবিবাহ এ দেশে যেমন প্রচলিত ছিল, স্ত্রীগণের অবস্থাও যে অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশে লিখিত আকাশ-কুসুমের কথাটি য়ুরোপীয় ভাষায় গোয়ালিনীর দুগ্ধ ভাণ্ডের গল্পে পরিণত হইয়াছে। ফরাসী পণ্ডিত লা ফন্টেন যে তাঁহার গল্পমালার জন্য ভারতীয় কথা-সাহিত্যের নিকট ঋণী তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। এক গোপকুমারী দুগ্ধভাণ্ড মাথায় করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইবার সময় পথে আকাশ-কুসুম রচনা করে। এই দুগ্ধভাণ্ড বিক্রয় করিয়া আমি যাহা প্রাপ্ত হইব তদ্দ্বারা ডিম্ব ক্রয় করিব। ডিম্ব হইতে মোরগের বাচ্ছা হইবে এবং সেগুলি বড় হইলে বিক্রয় করিয়া মে মাসের উৎসবের দিনে আমি সবুজ রঙের একটি নূতন পোষাক কিনিব। সেই পোষাক পরিয়া আমি হাটে যাইব। সেখানে বহুলোকে আমাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিবে। আমি গর্ব্বিতভাবে ঘাড় ফিরাইয়া সেই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া গোপ-কুমারী যেমন তাহার গ্রীবা সবেগে ফিরাইল অমনি দুগ্ধভাণ্ড তাহার মাথা হইতে ভূমিতে পড়িয়া গেল ও সেই সঙ্গে তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।'

যে দেশের কবি সাহস করিয়া বলিতে পারেন,— "বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ, ধ'রে দিতে পারি চাঁদ", সে দেশের কথা-সাহিত্যে আকাশ-কুসুমের বিবরণ সম্বন্ধে কতকটা মৌলিকতার আশা করা যাইতে পারে। বাস্তবিক, দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে আকাশ-কুসুমের যে কথাটি আছে তাহা পাঠ করিলে কবির রসিকতায় নূতনত্বের একটু পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে দান-যজ্ঞ করিবেন শুনিয়া গৌড়দেশ হইতে নানাশাস্ত্রে জ্ঞানবান্ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সেথায় গমন করিলেন।

"দ্বিজে দেখি জ্ঞানবান্, ভক্তিভাবে ভগবান,
করেন মধুর সম্ভাষণ॥
বসাইয়া রত্নাসনে, বিচার দ্বিজের সনে,
করেন কমলাকান্ত কত।
দেখে দ্বিজের বিদ্যাসাধ্য, হরপূজ্য বড় বাধ্য,
প্রশংসা করেন শত শত॥"

ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ প্রীত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার এইবার ভাগ্যোদয় হইবে।

"যত অগণ্য ভাট অগ্রদানী, ইহাদিগে চক্রপাণি,
দান করিছেন হাজার টাকা বসি।
আমাকে দিতে পারে না অল্প, চৌষট্টি হাজার ন্যূন কল্প,
অনুমান বরং কিছু বেশী॥
জন পচিশেক কোমর বন্ধ, সঙ্গে যদি দেন গোবিন্দ,
সন্ধ্যা পথে অনেকগুলি টাকা।
মাটীর ঘরে ত হবে না গাড়া, সমুখ দরজায় ইটপোড়া,
হয় কিরূপ মুস্কিলের লেখা॥"

শ্রীকৃষ্ণ মনে ভাবিলেন যে, এমন গুণবান ব্রাহ্মণকে রাজ্য দিলেও তাঁহার গুণের শোধ হয় না।

"কহেন মাধব রঙ্গে, এসো হে দ্বিজ তোমার সঙ্গে,
কোলাকুলী করি, মহাশয়॥
বলে নানা মিষ্ট বোল, তুষ্ট হয়ে দেন কোল,
কৃষ্ণ তারে সভা বিদ্যমানে।
দেখে ভাল বাসাবাসী, আহ্লাদে রাখিতে হাসি,
পারে না দ্বিজ আবার ভাবে মনে॥

আমার সঙ্গে যত সখ্য, তবে আমাকে দু'তিন লক্ষ,
টাকা দিবেন আর কি তার কথা।
এইরূপে যায় দিন সকল, আবার উঠে দিলেন কোল,
কৃষ্ণ করে কত রসিকতা॥"

শেষে যখন ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, যজ্ঞ প্রায় শেষ হইয়া আসিল অথচ তাঁহাকে দানের নামমাত্র নাই, তখন তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

"না জানি কি দেন গোপাল, আটকপালের যেমন কপাল,
কোলেতে বিদায় পাছে হই॥
দ্বিজ বলে আসি প্রভু, কৃষ্ণ বলে আসুন প্রভু,
দ্বিজ বলে, তবেই দফা সাঙ্গ।
বড় আশা করিলাম মনে, কোথা রাজা কোথায় বনে,
বক্ষে বহে নয়নে তরঙ্গ॥
বিদরিয়া যায় হিয়ে, দ্বারের বাহিরে গিয়ে,
বলেরে বিধি এই ছিল তোর মনে।
হেঁটে মলাম মাসাবধি, মাসাটাও পেতাম যদি,
ঘরে গিয়ে মুখ দেখাই কেমনে॥"

রবীন্দ্রনাথের "পুরস্কার" নামক কৌতুকময় কবিতায় দাশরথি রায়ের এই আকাশ-কুসুমের কথার প্রতিধ্বনি শুনিয়া বিস্মিত হইতে হয়। রায়ের দরিদ্র ব্রাহ্মণের মত রবীন্দ্রনাথের দরিদ্র কবি-ও স্ত্রীর অনুরোধে রাজদ্বারে পুরস্কারের লোভে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দাশরথি রায় লিখিয়াছেন,—

"কুরুক্ষেত্রে বার্ত্তা শুনি,
কহে সেই দ্বিজ রমণী,
ওহে কান্ত সহেনা সহেনা।
কত কাল কাটাব কান্ত,
দন্তে আর দিয়া দন্ত,
অন্নাভাবে অন্ত্যের যন্ত্রণা॥
আমার কর অনুগ্রহ,
করগে দান পরিগ্রহ,
সুখে কিছুদিন করি পতির সেবা।
লইতে দান সেই রাজ্য,
যাও ওহে ভট্টাচার্য্য,
দশে কর্ম্ম করিলে দোষে কেবা॥
রক্ষে করিবে পরকাল,
ভিক্ষা কর চিরকাল,
পুণ্য পথে আছ নিরবধি।
তুমি যে কর ধর্ম্মাচার,
পাত্রাপাত্র সুবিচার,
দেখিয়া ভাল করেন কৈ বিধি॥"

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়,
রচিতেছ বসি' পুঁথি বড় বড়,
মাথার উপরে বাড়ি পড়-পড়
তার সঙ্গে খোঁজ রাখ কি!
গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব,
মাথা ও মুণ্ড, ছাই ও ভস্ম,
না মিলে শস্যকণা।
অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা,
নিশি দিন ধরে' একি ছেলে খেলা,
ভারতীরে ছাড়ি ধর এই বেলা
লক্ষ্মীর উপাসনা!
ওগো ফেলে দাও পুঁথি ও লেখনী,
যা করিতে হয় করহ এখনি,
এত শিখিয়াছ এটুকু শেখনি
কিসে কড়ি আসে দুটো।"

দাশরথি রায়ের শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রাহ্মণকে কোল দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের রাজাও তেমনি তাঁহার কবিকে আলিঙ্গন করিয়াছেন।

"পুলকিত রাজা আঁখি ছল ছল,
আসন ছাড়িয়া নামিলা ভূতল,
দু'বাহু বাড়ায়ে পরাণ উতল
কবিরে লইলা বুকে;
কহিলা, ধন্য, কবিগো ধন্য,
আনন্দে মন সমাচ্ছন্ন,
তোমারে কি আমি কহিব অন্য,
চিরদিন থাক সুখে।"

দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে বর্ণিত দানযজ্ঞে যেমন সকলে

শ্রীকৃষ্ণের নিকট ধন পাইল, রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও তেমনি সকলে রাজার নিকট পুরস্কার ও দক্ষিণা পাইল। রায়ের ব্রাহ্মণ যেমন শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে শূন্য হাতে চলিয়া আসেন, রবীন্দ্রনাথের কবিও তেমনি ভাবে ফিরিয়া আসেন। তবে, রবীন্দ্রনাথের কবি কিছু না পাইয়া রাজার নিকট হইতে একখানি মালা হস্তগত করিয়া ছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র কবির স্ত্রীদ্বয় উৎসুক চিত্তে নিজ নিজ স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। দাশরথি রায়ের আকাশ-কুসুম রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূল কি না, আমরা জানি না। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় অনুপ্রাসের এত ছড়া-ছড়ি, ছন্দ এরূপ শিথিল, ভাব স্থানে স্থানে এমন হালকা সুরে গ্রথিত যে আমাদের সন্দেহ হয় কবি দাশরথি রায়ের পাঁচালি পাঠ করিয়া এই কবিতা রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ আকাশ-কুসুম রচনায় সিদ্ধহস্ত হইলেও বোধ হয় তিনি অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের আশানুরূপ সাফল্য লাভ করেন নাই। তবে, এ কথাও সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের কল্পনা পাঁচালির আদর্শ হইতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। রবীন্দ্রনাথ যে কেবল আকাশ-কুসুম রচনা করিয়াছেন তাহা নহে। তিনি আকাশ-কুসুম বলে স্বপন চয়ন ও অনেক সময়ে বাতাসে স্বপন বপন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ "কাল্পনিক" নামক কবিতায় লিখিয়াছেন,—

"আমি　　কেবলি স্বপন করেছি বপন
　　　　বাতাসে,—
তাই　　আকাশ-কুসুম করিনু চয়ন
　　　　হতাশে!"

* * * *

বিষ্ণুশর্ম্মার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষ কল্পনার বলে সাহিত্য-জগতে যত আকাশ-কুসুম রচনা করিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। ভারতবর্ষের সাহিত্যাকাশ যে এই কল্পিত কুসুমের সৌরভে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে তাহার কারণ এদেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কল্পনা যেরূপ অনায়াস স্ফূর্ত্তিতে কথা-সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়, সেরূপ বোধ হয় আজ কোনও দেশে সম্ভবপর নয়। বিষ্ণুশর্ম্মার লেখাতে রসিকতার সহিত নীতি-শিক্ষা জড়িত। দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে রসিকতার ভিতর শ্রীকৃষ্ণর সর্ব্বজ্ঞতার প্রমাণ প্রকটিত। রবীন্দ্রনাথের রচনায় কবি-কল্পনা বিকশিত। সমসাময়িক সমাজের অবস্থাও যে আকাশ-কুসুমের কথাতে কতকটা প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার সন্দেহমাত্র নাই। বিষ্ণুশর্ম্মা ও দাশরথি রায়ের সময়ে সমাজে যে দারিদ্র্য-ব্যাধি দেখা দিয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথের সময়ে কবি-যশঃ-প্রার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

একলক্ষ্য।

[শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ]

সব জল ধারা　　মিশে প্রণালীতে
　　সব পয়োনালী হ্রদে,
নদ নদী দিয়া　　সব হ্রদে যোগ
　　নদী মিলে মহা নদে।
সব মহানদ　　উপনদী সহ
　　সিন্ধুতে একাকার,

সিন্ধুরা সব　　বিশ্ব ভরিয়া
　　রচে মহা পারাবার।
সব উপাসনা　　সব নিবেদন
　　একে গিয়ে মিশে শেষে.
মহা সিন্ধুতে　　একই মহাবারী
　　বিঘোষিত দেশে দেশে।

নির্য্যাতন।

[শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম-এ, বি-এল]

১

আমি তার একজন অন্তরঙ্গ ছিলাম। অনেক দিন ভুগিতে ভুগিতে সে একবারেই বিছানার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল।

আমি গিয়া কাছে বসিতেই সে দুই হাতে বুক চাপিয়া কাশিয়া উঠিল। আমি নিরুপায় হইয়া পাখাটা তুলিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম, ঘরে আর কেউ ছিল না।

একটু শান্ত হইয়া বিনয় খুব ধীরে ধীরে কহিল— দেখ ভাই আমি আর বাঁচিব না। আমি তাহাকে কথা বলিতে নিষেধ করিলাম। 'ভয় করিস্ না, সাহস কর' ইত্যাদি অনেক প্রবোধ দিলাম। সে একটু হাসিতে চেষ্টা করিল।

সন্ধ্যা হয় হয় দেখিয়া কহিলাম, আজ তবে আসি। কাল সকালে এসে দেখে যাব আবার।

বিনয় অতি কষ্টে শীর্ণ হাত দুইখানি উঠাইয়া নমস্কার করিল। বুঝিলাম সে এ অভাগা বন্ধুর নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিতেছে। আমি প্রতিনমস্কার করিয়া তাহার হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে যথাসাধ্য ভরসা দিলাম। সে কিন্তু আমার হাতখানি টানিয়া তাহার বালিশটার নীচে গুঁজিয়া দিল। বালিশের নীচে ভাল করিয়া হাত দিতেই একটা বালি কাগজের মোটা খাতা পাইলাম, তার উপরে লাল পেন্সিলে মোটা হরফে লেখা ছিল— গোপনীয়, পড়িবেন না।

বিনয়ের মুখের দিকে চাহিতেই সে হাত তুলিয়া ঠোঁট উঁচু করিয়া জানাইল আমি যেন বইখানি লইয়া যাই। তার পর অতি কষ্টে পাশ ফিরিয়া একটা অর্দ্ধভগ্ন মৃত্তিকা পাত্রে তাহার মুখভরা পিক ফেলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল 'তুই পড়িস। আমি—" আর বলিতে পারিল না, এলাইয়া পড়িল। আমি পাখাটা উঠাইয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। মিনিট পাঁচেক পর বিনয় প্রকৃতিস্থ হইল। কেমন একটা উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বিনয়ের ভাই বোন বাপ মা অর্থাৎ বিমাতা অনেকেই ছিল। তবে নিজের মায়ের পেটের ভাই বোন কেউ ছিল না। তবুও এমন অবস্থাতে যে বাড়ীর একটা প্রাণীও তাহার কাছে আসিয়া বসে নাই, কেবল সেই কথাটাই মনে হইতে লাগিল।

এমন সময় একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া বিনয়ের মাতা ঘরে ঢুকিলেন। তাহার মাথার দুই হাত দূরে ডিবাটা রাখিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন। আমিও বিনয়ের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। সে কেবল অনিমেষ নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। "কাল সকালে আবার আসব, কিছু ভয় নাই", বলিয়া আমি ঘরের চৌকাঠ পার হইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

পরের দিন আটটার সময় বিনয়দের বাড়ী প্রবেশ করিতেই দেখিলাম গ্রামের যত রামা শ্যামা তাহাদের উঠানে একত্র হইয়া নানা রকমের তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে। আর কিসের একটা খট্ খট্ শব্দ বাড়ীর পশ্চাৎ দিক হইতে ভাসিয়া আসিতেছে।

উঠানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বারেন্দায় বসিয়া বিনয়ের পিতা তামাক খাইতেছেন। তখন বিনয়ের মাতা আসিয়া কহিলেন—"আমি আর পারিনাক। ছেলে-গুলোর মুখেই বা এখন কি দেই আর এত রাজ্যের কাঠই বা আমি কোত্থেকে জোটাই ?"

দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও আমি বুঝিতে পারি নাই যে বিনয় আর নাই। তাই বিনয়ের ঘরটায় প্রবেশ করিতে গেলাম। তখন তাহার বিমাতা কহিলেন, "ও ঘরে আর নাই গেলি কেশব।" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কেন! বিনয় ?" বিমাতা তুলসীতলার দিকে অঙ্গুলী দেখাইলেন। সেখানে দেখিলাম চাটাইয়ে মোড়া কি একটা যেন পড়িয়া রহিয়াছে। এমন সময় বিনয়ের পিতার হাত হইতে হুকাটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভেউ ভেউ করিয়া

কাঁদিয়া উঠিয়া কহিলেন—কেশব রে! আমার বিনয় চলে গেছে। সে আর নাই রে!

আমি ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিলাম। পুত্র-হারা পিতাকে সান্ত্বনা দিবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

বিনয়ের মৃত্যুতে আমাদের সমবয়সীরা সকলেই কহিল—ও এবার বাঁচল। বুড়ারাও কেউ কেউ কহিলেন, এইবার ছেলেটার হাড়ে বাতাস লাগবে।

গৃহে প্রবেশ করিতেই গিন্নি কহিলেন, "নদীর ধারে বসে বুঝি কবিতা লেখা হচ্ছিল? তোমার চা যে একবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কার কলসীর জল আজ তোমার মন কেড়ে নিয়েছিল?"

আমি বিরক্ত হইয়াই কহিলাম, "তোমার কি আক্কেল! সময় অসময় জ্ঞান নাই। সব সময়েই কেবল ঠাট্টা আর ঠাট্টা।"

কেমন যেন একটা করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আমি চেয়ার টেবিলে বসিয়া আর শান্তি পাইলাম না। শয়ন কক্ষে গিয়া অসংযত বিছানায় উবুড় হইয়া শুইয়া পড়িলাম। পোড়া চোখের জল আর বাধা মানিল না।

একটু পরেই শুনিলাম গিন্নি ভকুকে কহিতেছেন "হেই! বাবু কাঁহা গয়া?" "নেহি দেখা মাইজী" বলিয়া ভকু যেন কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেল। আর একটু পরেই একখানি কোমল হস্তের স্পর্শ কপালে অনুভব করিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই শুনিলাম—ওমা! এ আবার কি হলো, নাও উঠ একবার। বালিশের মধ্যে চোখ ঘসিয়া উঠিয়া পড়িলাম। গিন্নি কহিলেন, "তোমাকে নিয়ে আর পারচি না। কি হয়েছে বল দেখি।" অতি কষ্টে কহিলাম—বিনয় আজ জন্মের মত চোখ বুজেছে!

গিন্নি আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "তা শোক করচো কেন তার জন্য? সে ত রক্ষাই পেল এক রকম। ভালই হয়েচে তার। আহা! মানুষটা কি ভোগটাই না ভুগেছে!"

তারপর সেখানেই খাবার আর চা লইয়া আসিয়া গিন্নি কহিলেন, "নাও, উঠে খেয়ে ফেল।" আমি বলিলাম, "তোমার চা-টাও নিয়ে এস এখানে। একলা বসলে আজ আর মুখ দিয়ে ওসব গলবে না।" কোনও আপত্তি না করিয়া সে তার চা ও খাবার লইয়া আসিয়া আমার কাছেই বসিয়া পড়িল।

২

বিনয়ের কথাটা ভুলিতেই পারিতেছিলাম না। এক সপ্তাহ পরে রাত্রে শুইতে গিয়া গিন্নিকে কহিলাম—দেখ, বিনয় একটা খাতা দিয়া গেছে। আমি পড়তেই পাচ্ছি না। তুমি একটু পড়বে? "দাও না" বলিয়া গিন্নি খাতাটা আমার হাত হইতে লইয়া কহিলেন, "দেখচ, পয়সার অভাবে বেচারী বালি কাগজে পেন্সিল দিয়ে লিখেচে। ওকে বোধ হয় ওর বাপ মা পয়সা-টয়সা কিছু দিত না। আর আর ছেলেদের গায় ত সিল্কের পাঞ্জাবী, ভেলভেটের জামা, জরী-পেড়ে কাপড় হামেসা দেখতুম।"

আমি কহিলাম, "মানুষের হাতের সব আঙ্গুলই কি আর সমান থাকে?" সরলা কহিল, "তা ঠিক। আমি মরে গেলে তুমি যখন আবার বিয়ে করবে তখন তুমিও আমার পেটের ছেলে মেয়েকে বিনয়ের বাপের মতই দেখবে শুনবে। পরের ঘরের মেয়ের দরদ্ না হতে পারে। কিন্তু তোমরা নিজের ছেলে মেয়েকে ভোল কেমন করে বল দেখি?"

আমি তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া একটু আদর করিয়া কহিলাম—তোমার যেমন বুদ্ধি! সবাই বুঝি আবার বিয়ে করে, আর সবাই বুঝি নিজের ছেলে মেয়েকে এমনি করে পথে বসায়?

দেখিলাম সরলার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং বালিশের নীচে খাতাটা রাখিয়া সেদিনকার মত ঘুমান গেল।

পরের দিন বিছানায় শুইয়া খবরের কাগজ দেখচি আর চুরটটা টানচি। এমন সময় গিন্নি কহিলেন,—দেখি খাতাটা। বালিশের নীচ হইতে খাতাটা টানিয়া বাহির করিয়া দিলাম। টেবিলের কাছে বসিয়া গিন্নি পড়িতে লাগিলেন।

বিনয়ের খাতা

আমি যে বেশী দিন বাঁচব না তা আমি জানি, কেউ হয় ত জানতে চাইবে আমার এই পোড়া ব্যায়রাম কি করে হলো। তাই একটু লিখে রাখচি। যারা এখনও সংসার-চক্রে পড়ে নাই তাদের হয়ত উপকার হ'তে পারে।

বাবা তখন নগরবাড়ীতে চাকরী করেন। আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। যায়গাটা ম্যালেরিয়ার জন্য বিখ্যাত। আমি প্রতি মাসেই দুইবার করিয়া জ্বরে পড়িতাম। অবশ্য ম্যালেরিয়া, যখন তখন ডাক্তার কবিরাজ আসবেই বা কেন, ঔষধ পত্রই বা খাওয়ান হবে কেন? পোষ্টাফিসের কুই-নাইন কয়েক পুরিয়া বাবা লইয়া আসিতেন। আমি নিজেই সেগুলিকে বড়ী পাকাইয়া ঠাণ্ডা জলের সহিত খাইয়া ফেলিতাম। সাধারণতঃ জ্বর তিন দিন থাকিত। প্রথম দিন খাওয়া ত একবারেই বন্ধ। দ্বিতীয় দিন দুপুরে এক বাটী নুন বার্লি খাইতাম। সে বার্লির উপর দেখিতাম কেমন যেন কফের মত কি ভাসিতেছে, আর গন্ধটাও কেমন যেন উগ্র কুম্‌ কুমে ধরণের হইত। মা বলিতেন—"উপরে যেটা ভাসচে ওটা হচ্ছে সর। দুধের যেমন সর থাকে ঠিক তেমনি। আর রং আর গন্ধটা তা হচ্ছে কড়াইএর দরুণ। তরকারির কড়াইটাতে রান্না হয়েচে তাই ওরকম হয়েচে। আমার ঐ বার্লি খাইতে বসিয়া প্রায়ই বমি আসিত। তখন মা একটা নেবুর পাতা আর থোকার এক টুকরা মিশ্রি আনিয়া দিতেন। সেইটুকুর সাহায্যে কোনও মতে বার্লি খাইয়া ফেলিতাম। তার পর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাইয়া শুইয়া পড়িতাম। তোমরা হয় ত বলবে, গরম জল খেতে না কেন? কিন্তু গরম জল পাব কোথায় যে খাব? বাড়ীর কাছে সীতাকুণ্ড থাকলে তবু একটা উপায় থাকত। যাক্‌, সেদিন আর কোনও খাবার জুটিত না। পরের দিন বড় আশা করিয়া থাকিতাম যে ভাত খাব। দশটার সময় বাবা আসিয়া পেটে হাত দিয়া কহিতেন, একটু জ্বরভাব আছে। আজ আর ভাত খেয়ে কাজ নাই। মা আসিয়া কহিতেন—আমি আর দুপুরবেলা বার্লি জ্বাল দিতে পারব না। কিন্তু একটার সময় বার্লি নিয়ে এসে তিনিই আবার বলিতেন—নে খেয়ে ফেল।

তখন পর্য্যন্তও আমার মুখ ধোয়া হয় নাই। সকলে যার যার কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকিত। আমায় একঘটি জল দেওয়ার অবকাশ কাহারও মিলিত না। তাই বার্লি লইয়া আসিলে মাকে বলিতাম, "একটু জল যদি দিতেন তবে মুখটা ধুয়ে নিতাম।" তিনি বলিতেন, "এখন আবার গেলাস মাজবে কে বল দেখি?" আমি একটু হাসিয়াই কহিতাম, "তা, ঘটিতে করে দিলেই চলবে।" মা তখন কূয়া হইতে এক ঘটি ঠাণ্ডা জল তুলিয়া আনিয়া দিতেন। বার্লি খাওয়ার একটু নুন দিয়া দাঁত ঘসিয়া কোনও মতে বার্লিটা খাইয়া ফেলিতাম। অতিরিক্ত কুই-নাইন খাওয়াতে মাথা তখন বন্‌-বন্‌ করিয়া ঘুরিয়া উঠিত। তাই তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িতাম।

সে বিছানাটারও যে হাল ছিল তা বলতে বাস্তবিকই লজ্জা হয়। বালিশটার ছিল না খোল। মাথায় দেওয়া সরিষার তেলটুকু বালিশের গায় লাগিয়া লাগিয়া তাহাকে তেলপক্ক করিয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং সময় অসময়ে পিপড়া বাবাজীদের সেখানে শুভাগমন হইত, আর তাহারা নানা প্রকারে আমার সহিত রহস্য জুড়িয়া দিত। বিছানার চাদর ছিল মাত্র একটা। সেটা কোনও দিন ধোবাবাড়ী যাইত কি না সন্দেহ। ছোট বোনটী আসিয়া কোনও ক্রমে চাদরটা নষ্ট করিলে মা সেটাকে জল-কাচা করিয়া রৌদ্রে দিতেন।

যাক্‌, জ্বরের কথা বলিতেছিলাম তাই বলি এখন। পরের দিন বড়ই ক্ষিদে পাইত। চারটী ভাত খাইবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিত। কখন যে ভাত হইবে সেই শুভক্ষণের জন্য চাহিয়া রহিতাম। প্রায় আটটার সময় বাবা আসিয়া পেটে হাত দিয়া দেখিতেন জ্বর আছে কিনা। সেদিন জ্বর থাকিত না। তিনিও তাই কহিতেন। কিন্তু ঐ সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিতেন, পায়খানা কেমন হইয়াছে। আমি মাথা নীচু করিয়া কহিতাম পায়খানা হয় নাই। মনে মনে ভাবিতাম কিছু না খেলে বুঝি আবার পায়খানা হয়? তখন বাবা কহিতেন—আজের দিনটা যদি না খেয়ে থাকতে পারতিস তবে একবারে সেরে যেত। সে কথা শুনিয়া আমার চোখ দিয়া জল বাহির হইত। মা রান্নার নিকট

দাঁড়াইয়া সব দেখিতেন শুনিতেন। তিনি বলিতেন, কি খাবে ও? বাবা কহিতেন—রুটী করে দিও। ও রুটী আর ডালের ঝোল খাবে। মা আর কিছুই না বলিয়া চলিয়া যাইতেন।

সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গেলে তবে হবে রুটী! তাই আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া থাকিতাম। সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে মা ডাকিতেন—বিনয়, আয় খেয়ে যা। রান্না ঘরটী উঠানের অপর পার্শ্বে ছিল, কোন মতে ফেলিতে ঢুলিতে আমি রান্নাঘরে গিয়া বসিতাম। আমার সম্মুখে খানিকটা ঠাণ্ডা ভাত রাখিয়া মা কহিতেন—নে, ভাতই খা। কি আবার রুটী খাবি।

আমি একটু ইতস্ততঃ করিতে থাকিলে, কিম্বা বাবার কথা কহিলে মা কহিতেন—ভয় নেই তোর। খেয়ে ফেল। আমার ঠিক ভয় না হইলেও দ্বিধা হইত। তারপর ভাত খাইয়া আশ্বস্ত হইতাম।

আমার বৈমাত্র ভাই-বোনেরা যখন অসুখে পড়িত তখন ব্যবস্থা ছিল অন্য রকমের। তাহাদের জন্য বিস্কুট কিস্‌মিস্ বেদানা আসিত। আর তাদের বার্লিকে সুমিষ্ট করিবার জন্য দুধ মিশ্রির ব্যবস্থা হইত। ডাক্তারও ডাকা হইত। আর কুইনাইন আসিত ট্যাবলয়েড্ মার্কা, খাইতে একটুও বিস্বাদ লাগিত না। মন প্রবোধ মানিত না তাই ওদের সঙ্গে দুই একবার তুলনা করিয়া বসিতাম।

এইরূপ মাসের পর মাস ভুগিতে লাগিলাম। পেটের পিলে ক্রমেই ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তবুও ক্লাসের মধ্যে সকল পরীক্ষাতেই আমিই প্রায় প্রথম হইতাম। এমন সময় আমার ভয়ানক ভাবে পেটের অসুখ দেখা দিল। পেটের অসুখ সামান্য ব্যারাম। তার আবার ওষুধ লাগবে কেন? খেতে-পরতেই সেরে যাবে। কোনও অত্যাচার করিতাম না, তবুও যে কেন পেটের অসুখ এত ঘন ঘন হাওয়া সুরু হইল তাহা প্রথমতঃ বুঝিলাম না। কিন্তু একদিন পেটের অসুখের কারণটা ঐ অল্প বয়সেই ধরিয়া ফেলিলাম। সে কারণ দূর করিবার সাধ্য আমার ছিল না একেবারেই। তাই কোনও উপকার হইল না।

সেদিন ছিল আমাদের পরীক্ষা। ঘণ্টা বাজে বাজে তাই রান্নাঘরে গিয়া বসিয়া মাকে ভাত দিতে কহিলাম। ভাত কিন্তু উনানের উপর তখন টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছিল। ভাতটাকে দুই তিনবার নাড়িয়া মা নামাইয়া ফেলিলেন। নিকটেই একটা বড় বাটীতে জল দেওয়া বাসী ভাত ছিল। সেই ভাতটা জল ঝাড়িয়া ভাতের ডেগে মা ধীরে ধীরে ফেলিয়া দিলেন। তারপর ফেন গালিয়া সেই ডেগের উপরকার ভাতটা আমাকে দিলেন। আমার পেটের অসুখ, তবুও ঐ ভাতটা আমাকে খাইতে হইল। ভাতের চেহারা দেখিয়াই বুঝিলাম কোন্ ভাতটা আমার পাতে পড়িল। এমন সময় আমার ছোট ভাইটী আসিয়া খাইতে বসিল। তাহাকে কিন্তু ডেগ কাৎ করিয়া উপরের ভাত সরাইয়া নীচ হইতে ভাত দেওয়া হইল।

তখন হইতে যেদিনই ভাত হওয়ার পূর্ব্বে গিয়া খাইতে বসিতাম সে দিনই ঐ পান্ত ভাতের নূতন সংস্কার হওয়াটা চোখে পড়িয়া যাইত। আর ভাগ্যক্রমে আসিয়া পড়িত সেটা আমারি পাতে। আমি মাথা নীচু করিয়া কোনও মতে খাইয়া উঠিতাম। মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিতে পারিতাম না, সুতরাং পেটের অসুখ সারিবে কেমন করিয়া?

এতেও যে আমার কঠিন ব্যারামটা হইয়াছে তা নয়। এটার সূত্রপাত কেমন করিয়া হইল তাহাই এখন বলিব।

আমাদের যে চাকরটা ছিল, সে রাত্রে তার নিজের বাড়ী চলিয়া যাইত, নয় নিকটে যে স্কুলটা ছিল সেখানেই রাত্রি কাটাইত। এই চাকরটা বড়ই জুয়া খেলিত। এক দিন সে আর আসিল না। শুনিলাম আর এক যায়গায় চাকরী লইয়া সে চলিয়া গিয়াছে। তার তিন দিন পর মথুরচন্দ্র আসিয়া আমাদের বাসায় চাকরী গ্রহণ করিল। তখন শীতকাল।

এতদিন আমি পৃথক একটা ঘরে একলা থাকিতাম। ভয় করিত নিশ্চয়ই। কিন্তু কি করিব? রাত্রে যেদিন প্রায়খানা পাইত সেদিন বড়ই মুস্কিলে পড়িতাম। না থাকিত একটা দেশলাই, না থাকিত একটা লণ্ঠন। যাক্, এখন মথুরের কথাই বলি। রাত্রের আহার শেষ হইলে বাবা কহিলেন—তোর বিছানাটা ত বড়ই আর লেপটাও ত ছোট নয়। তা মথুর তোর এখানেই শোবে।

চাকরের সঙ্গে এক বিছানায় শুইতে হইবে শুনিয়া যা' রাগ হইল তা বলিয়া আর কাজ নাই। বাবা চলিয়া গেলে মনে হইল আমার মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে দেখতাম এ ব্যবস্থাটা হ'তে পারতো কি না।

যা' হউক, মথুর আসিয়া যখন আমার পাশে আমারি লেপের তলায় শুইল তখন একটা উৎকট ঘৃণায় আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিতে লাগিল। তার সেই লম্বা দাড়ী, মুখের উৎকট গন্ধ আর খক্‌ খক্‌ কাশী আমাকে সারা রাত্রি জ্বালাতন করিয়া মারিল। পরের দিন সকালে বাবা আসিয়া কহিলেন—মথুর, তুমি এত কাশ কেন? মথুর তামাক বাড়াইয়া দিয়া কহিল—কর্ত্তা, আমার যে হাঁপানি আছে।

তারপর ধুতুরার পাতা আরও অনেক হিজিবিজি শুকাইয়া সেইগুলো কল্কের মধ্যে দিয়া প্রতিদিন রাত্রে খাওয়ার পর মথুরচন্দ্র টানিত। একটা বিশ্রী গন্ধে সমস্ত ঘরটা ভরিয়া উঠিত। সারা রাত্রি মথুরচন্দ্রের কাশের বিশ্রাম ছিল না। কফও উঠিত। তা সে কফ্‌টা শুইয়া শুইয়াই বেড়ার গায় থু থু করিয়া ফেলিত। তিন চার দিনেই বেড়ার গায় পচা কফ্‌ এত জমিয়া গেল যে দুর্গন্ধের জন্য ঘরে আর তিষ্ঠান গেল না। বাবা ঘরে আসিয়া নাকে কাপড় দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। মা আসিয়া কহিলেন—ঘরটায় ইন্দুর-টিন্দুর মরেছে বোধ হয়। আমি মাথা নীচু করিয়া একটু মনে মনে হাসিলাম মাত্র।

আর না থাকিতে পারিয়া মথুরকে কহিলাম—মথুরদা, তোমার কাশের জন্য ত আর থাকা যায় না। ঐ বেড়াটা তুমি ধুয়ে দাও।

স্কুল হইতে আসিয়া দেখিলাম মথুর কথাটা শুনিয়াছে। সে বেড়াটা ধুইয়া তার উপর গোবরের ছিটে দিয়া বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। গন্ধটা তবুও যায় নাই।

তিন চার দিন পরে আমি শুইয়া লেপটা কেবল মাথার উপর টানিয়া দিয়াছি অমনই বুঝিলাম কপালে যেন কি একটা ঠাণ্ডা জিনিস লাগিয়া গেল। হাত দিতেই বুঝিলাম জিনিসটা কি। লেপের গায়ও দেখিলাম ঐ বস্তুটা একগাদা লাগিয়া রহিয়াছে। কি যে বিশ্রী লাগিল তা আর কি বলিব। তাড়াতাড়ি উঠিয়া কোন মতে জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলাম। তবুও মনে হইল যেন লাগিয়াই রহিয়াছে। সাবান ছিল না কোন কালেই। থাকিলে যে সেটাকে ব্যবহারে লাগাইতাম সে বুদ্ধিটা ছিল।

সেদিন হইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, প্রাণ যায় তবুও ও লেপটা আর ব্যবহার করিব না। কাপড় ও র‍্যাপারটা গায় জড়াইয়া কোনও মতে পড়িয়া থাকিতাম। শীতে সমস্ত শরীর হি হি করিয়া কাঁপিতে থাকিত।

এইরূপে ছয় মাস কাটিয়া গেল। আমি আবার জ্বরে পড়িলাম। সঙ্গে সঙ্গে কাশিও দেখা দিল। তবুও মথুরচন্দ্র আমার কাছে শুইতে লাগিল। পোনর দিন পর জ্বর ছাড়িল বটে কিন্তু কাশিটা লাগিয়াই রহিল। তখন হইতে প্রতি রাত্রেই আমরা দুইজনে মিলিয়া খক্‌ খক্‌ করিতাম।

বাবা একদিন আসিয়া বলিলেন, "তোরা কি মনে করেছিস্‌। আমাদের কি ঘুমুতে দিবি না?"

আরও একমাস কাটিয়া গেল। কাশটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া আমার কণ্ঠে বসিয়া পড়িল। এমন সময় মথুর আসিয়া বাবাকে কহিল, সে আর চাকুরী করিবে না, বাড়ী যাইবে। তার জীব নাকি অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। সে আর ঠিক থাকিতে পারিতেছে না।

মথুরচন্দ্র গেল বটে, কিন্তু আমার কাশটা আর সারিল না। ক্রমেই খারাপ হইয়া উঠিল।

এখন যা অবস্থা তা ত সকলেই দেখচে। আমি যে আর কদিন বাঁচব তা আমি টের-পেয়েছি।

এইখানেই গিন্নি আসিয়া পড়িলেন। চাহিয়া দেখিলাম তাহার দুই গণ্ড চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য আমিও চোখের জল আমাইয়া রাখিতে পারি নাই।

ঝড়ের দেবতা।

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

১

ঝঞ্ঝা ঝড়ের দেবতা যেটি, বাসটী তাহার কোন্ দূরে!
চক্রবালের অন্তরালে, মেরুর-মেঘের সিন্দুরে।
আন্দোলিয়া আস্‌বে সে কি রঙ্গে আকাশ গঙ্গাকে,
লঙ্ঘি' তুঙ্গ 'গৌরীশৃঙ্গ' কিম্বা 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'কে?

২

সুদূরবিন্ধী আকাশচুম্বি গিরির শিখর উৎপাটি'
ভীষণ কারার পাষাণ কবাট ঝনঝনিয়া উদ্‌ঘাটি'
দিন দাবানল সৃষ্টি করি' সুরের অবঘট্টনে,
সপ্ত সাগর ক্ষিপ্ত করে আবর্ত্তনের নর্ত্তনে।

৩

রক্ত বীজের রক্ত ফোটে শ্মশান কালীর খর্পরে,
আকাশি-বুড়ীর চরকা ঘোরে বীভৎস ভীম ঘর্ঘরে,
সৌর লোকের শিরায় শিরায় হয় যে সে সুর স্পন্দিত
হিংস্র সিংহ ব্যাঘ্র বৃন্দ মন্দ্র মন্ত্রে নন্দিত।

৪

সর্জ্জ বনে তূর্য্য দিয়ে ছুটছে বিরাট মূর্ত্তিতে
রুদ্র দেবের তাণ্ডবে তার ক্ষীণ ডমরুর সুর দিতে।
স্বর যে তাহার নিত্য যুক্ত শাশ্বতেরি স্বন্দনে,
খর্ব্ব তারে করবো না আর ছন্দ অভিনন্দনে।

বিদায়।

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(২০)

সুখদা কিছুতেই অনিলকে আয়ত্তে আনিতে পারিলেন না। সে এখন বাহিরে রীতিমত মদের আস্তানা বসাইয়াছে; সেখানে দিনরাত মদের স্রোত চলিতেছে। বন্ধুবান্ধবের বিকট চীৎকারে বহির্ব্বাটি নিয়ত প্রতিধ্বনিত, সুখদার আর সেদিকে যাইবার যো নাই।

যত তিনি অনিলকে আয়ত্তে আনিতে পারিতেছিলেন না, ততই তিনি রাগিয়া উঠিতেছিলেন। কি যে করিবেন তাহা ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। তাঁহার যত রাগ সব পড়িয়াছিল পূর্ণিমা ও কাত্যায়নীর উপর।

পূর্ণিমা যাইবে বলিয়া সব ঠিক করিয়াছিল। তাহার ভাই যখন লইতে আসিলেন তখন সুখদা জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার অনুমতি না লইয়া পৌত্রবধূ ভ্রাতাকে আনাইয়াছে ইহা মনে করিয়া তিনি নিজেকে দারুণ অপমানিত মনে করিলেন। তিনি কি এ সংসারের কেহ না? তাঁহাকে আর কেহ মানিতে চায় না? তিনি আগেই জানিতেন যাহার পুত্র পুত্রবধূ তাহারই হইবে, তবু কেন যে উহাদের আপন করিতে গিয়াছিলেন ইহা ভাবিয়া তিনি হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন।

তখনি মনে একটী সত্য জাগিয়া উঠিল, নন্দ তাঁহারই হাতে পুত্র, পুত্রবধূ এবং স্ত্রীকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অধিকারে অন্য জনের হস্তার্পণ সম্পূর্ণ অবৈধ। তিনি ইহা কখনই সহ্য করিতে পারিবেন না?

তিনি পূর্ণিমার পিত্রালয়ে গমন বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার ভ্রাতাকে অত্যন্ত কঠোর কথা বলিয়া অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। পূর্ণিমার উপর তাঁহার আরও বেশী করিয়া আক্রোশ চলিল। এই হতভাগিনীই তো ভরা নৌকা ডুবাইল; নৌকা ডুবাইয়া এখন পলায়ন করিবে? কখনও না।

পুত্রের শোচনীয় অধঃপতনে কাত্যায়নী বড় নিরাশ্বাস

হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক একদিন প্রার্থনান্তে তাঁহার চোখে জলধারাও দেখা যাইত।

সে দিন বাসন্তী পূর্ণিমার নিশা। অনাবিল শুভ্র চাঁদের আলোয় চারিদিক ঝলসাইয়া উঠিয়াছে। বাড়ীর সম্মুখে পুষ্পোদ্যানে প্রস্ফুটিত হেনাগাছের মাঝে গা লুকাইয়া একটা কোকিল অবিরত ডাকিতেছিল। ঝর ঝর করিয়া বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাস বহিয়া যাইতেছিল।

অনেক রাত পর্য্যন্ত মদ চলিয়াছিল, তাহার পর একে একে বন্ধুবর্গ চলিয়া গেল, জ্ঞানহারা অনিল মেঝেয় একা পড়িয়াছিল।

নরকের দৃশ্য সেখানে বিরাজিত। এরূপ স্থান দেখিলে নরক বই আর কিছু বলা যাইতে পারে না। বাসনার আগুন একবার বুকে জ্বলিলে আর কিছুতেই নিভিতে চাহে না, তাহার শেষ পরিণাম এই নরক। অনিলের কি ছিল না? বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য, দেবসম পিতা-মাতা, প্রেমময়ী অতুল রূপবতী পত্নী সবই তো ছিল, কিন্তু সে যে বাসনার আগুন বুকে জ্বালিয়াছিল, তাহা নিভাইবার জন্য তাহার এই বিষপান! আগুন কি নিভিল? আগুন তো নিভিল না—আরও জ্বলিল। আগুন যত জ্বলিতে লাগিল সে ততই নরকে ডুবিতে লাগিল। এক বাসনাকে নিবৃত্ত করিতে গিয়া সে শত বাসনার সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। হয়ও তাহাই বটে। আমরা একটা অভাবকে আর একটা কিছু দিয়া পূর্ণ করিতে গিয়া আরও অভাবের জ্বালা বাড়াইয়া তুলি। আমরা যদি আগের অভাবটা গোড়ায় নষ্ট করিয়া ফেলি তবে আমাদের শত সহস্র অভাবের জ্বালা তো সহ্য করিতে হয় না।

ধীরে ধীরে একটী দেবীমূর্ত্তি সেই নরকের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এ দেবী মা কাত্যায়নী। আজ তিনি সকলের অজ্ঞাতে পুত্রকে ফিরাইবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন। সে তো গিয়াছেই, যদি এখনও তাহার মনকে একটু ফিরাইতে পারেন। মাতৃহৃদয়ের আশা নষ্ট হইয়াও নষ্ট হয় না, কারণ মাতৃহৃদয় নিয়ত স্নেহপ্রবণ। স্নেহ উচ্চ, নীচ ক্ষেত্রাক্ষেত্র বিবেচনা করে না।

অনিলের মলিন মুখখানার পানে চাহিয়া কাত্যায়নী চোখের জল সামলাইতে পারিলেন না। তাঁহার গণ্ড বহিয়া দরদর ধারে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আগে তিনি একদিনও অনিলের মত্ততাবস্থা দেখেন নাই।

তিনি কোনও দিকে না চাহিয়া অনিলের মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া বসিলেন। তাঁহার নিমীলিত নয়নপ্রান্ত বহিয়া জল গড়াইতেছিল, সযত্নে তাহা নিজের অঞ্চলে মুছাইয়া দিয়া অতৃপ্ত নেত্রে পুত্রের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। নিজের পুত্র-মুখ আশা মিটাইয়া দেখা তাঁহার জীবনে এই প্রথম। তাঁহার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া অনিলের মুখের উপর পড়িতেছিল।

অজ্ঞান অবস্থাতেও অনিল বেশ বুঝিতে পারিল তাহার মাথা কাহার কোমল অঙ্কে স্থাপিত; জগতের সুখ শান্তি যেন এই অঙ্কেই আছে। সে বড় শান্তি পাইল, তাই একটুও নড়িল না, একটুও আপত্তি করিল না, তেমনি ভাবেই পড়িয়া রহিল।

সহসা তাহার মনে হইল আমার ললাটের উপর কাহার চোখের জল ফোঁটার পর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে চোখ চাহিবার জন্য চেষ্টা করিল—পারিল না। মাথা ঘুরিয়া উঠিল, ধড়ফড় করিয়া সে উঠিয়া পড়িল—"কল্যাণি —কল্যাণি, এসেছো—তুমি এসেছো?"

কাত্যায়নী চোখ মুছিয়া ধীর স্বরে বলিলেন, "অনিল, আমি তোর মা।"

"মা—মা—"

অনিল মাতার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। "মা আবার আমায় কোলে তুলে নাও; আবার দু ফোঁটা চোখের জল—মাত্র দু ফোঁটা চোখের জল আমার মাথার উপরে ফেল মা। আমি বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি মা, আমার বুকে হাত দাও মা—"

মা তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন, তাহার মুখখানা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, "এই যে বাবা, এই যে আমি তোকে বুকের মধ্যে চেপে ধরেছি। কি যন্ত্রণা হচ্ছে অনিল, আমায় সব কথা বল, আমি সব বুঝি। আমি জানছি তুই আমারই ছেলে, আর কারো নোস। পর তোকে টেনে নিলেও আবার

আমারই কাছে তুই ফিরে আসবি। তোকে সবাই এখন ঘৃণা করবে, আমি তোকে ঘৃণা করব না বাবা, তুই এখন আমার একার।"

অনিল ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কাত্যায়নী নিজের চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, "তুই বুদ্ধিমান, সবই তো বুঝতে পারছিস বাবা, এতে যে কত যন্ত্রণা তাও তো জানতে পারছিস, তবে কেন এ ছাই খাচ্ছিস? এখনও ছেড়ে দেনা কেন?"

অনিল মাথা নাড়িল। সংশয়ে কাত্যায়নী বলিলেন, "কি বলছিস—ছাড়তে পারবি নে?"

অনিল নীরব হইয়া রহিল। মা তাহার বক্ষে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "দেখ্ দেখি বাবা, কি চেহারা হয়েছে তোর! এমন চেহারা কি তোর ছিল? তোর এমন স্বাস্থ্য হেলায় নষ্ট করলি অনিল? কিসের অভাব ছিল তোর, কি দুঃখে তুই নিজকে এমন করে এ নরকে ডুবালি? আমি শুনেছি তুই কল্যাণীকে বিয়ে করতে একবার ইচ্ছা করেছিলি, সেই জন্যেই কি—বিয়ে করতে পারলিনে বলেই কি এই কাজ করলি? আমার কাছে এ সময় কিছু লুকাসনে অনিল, একটা কথা বাদ দিস নে। আমি তোর মুখে তোর সব কথা শুনতে চাই। বল বাবা, কেন আর আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিস?"

অনিল মুখ তুলিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "মা, আমি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করেছি। কেমন করে কোন্ মুখে তোমার সামনে সে সব কথা বলব মা? আমি তিলে তিলে বিষপান করছি, আমায় মরতে হবে, আমি আর বেশী দিন বাঁচব না। মরব বলে অতিরিক্ত মদ খাচ্ছি। জানো তো মা, অতিরিক্ত মদ খেলে মানুষ শীঘ্র মরে যায়। আমি যে মহাপাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। আমি প্রায়শ্চিত্ত করব মা। বড় জ্বালা—আমি জ্বলে মরলুম

মা সব বুঝিতে পারিলেন। অনুশোচনায় হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি জানিতেন সুখদাই তাঁহার পুত্রের হৃদয়ে কল্যাণীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আগে অনিল কল্যাণীকে চিনিত না, জানিত না। কি কুক্ষণে কল্যাণীর মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেছে, কিছুতেই সে আর সে দাগ উঠাইতে পারে নাই। সেই দাগ মুছিবার চেষ্টায় সে এই বিষপান করিয়াছে। নিজের জীবনে সে বীতস্পৃহ হইয়াছে।

জীবনকালের মাঝে অনেক সুন্দর মুখ চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া আসে আবার অনন্তে লীন হইয়া যায়, কিন্তু কখন কোন মুহূর্ত্তে কোন্ একখানা মুখ যে হৃদয়ে গাঢ় অঙ্কিত হইয়া যায় তাহা বলা যায় না। সারা জীবনকালের মাঝে সে মুখখানা আর মুছা যায় না। কাজে বিশ্রামে সকল সময়েই সেই একখানা মুখ হৃদয়ে জাগিয়া থাকে। অনিলের জীবনেও অনেক মুখ আসিয়াছে গিয়াছে, কিন্তু সেই একখানা মুখ এমনভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে যাহা তাহার মৃত্যু সময়েও জাগিয়া থাকিবে। কেহ বা পুরস্কার পায়, তাহার সংখ্যা খুব কম, হাহাকারই করে বেশী লোকে, অনিল তাহার মধ্যে একটী।

কাত্যায়নী রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত কিসের বাবা? যদিই মনে মনে কোন পাপ করে থাকিস, জীবনের গতি পরিবর্ত্তন করে ফেল, সেই যে আসল প্রায়শ্চিত্ত। এ যে আত্মহত্যা করছিস তুই। এক পাপ হ'তে উদ্ধার পেতে গিয়ে আর এক মহাপাপে ডুবতে যাচ্ছিস যে। অনিল, আমার কথা রাখ বাবা, আমার পানে একবার চা'। আমি তোর বড় অভাগিনী মা! মনে কর, আমার দিন কি ভাবে কেটেছে। আমায় একটু সুখী কর, আমায় মুখভরে দু'দিন মা বলে ডাক।"

অনিল মায়ের বুকে মুখ রাখিল—"মা, আসলে যদি, আর কিছুদিন আগে কেন আসলে না? আমি আর বাঁচব না মা, আমার কঠিন ব্যারাম হয়েছে। আমার লিভারে বড় ব্যথা হয়েছে, বোধ হয় পেকেছে।"

"লিভার পেকেছে"—কাত্যায়নী চমকাইয়া উঠিলেন, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন, "অনিল—অনিল।"

অনিল মাতার কণ্ঠ দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া একবার মাত্র বলিল—"মা।"

(২১)

কল্যাণীকে এ বাড়ীতে আসিতে দেখিয়া সুরমা আনিয়া

গেল। কি বলিবে, কি করিয়া যে বিবাদ বাধাইবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না।

গম্ভীর প্রকৃতি সত্যেন্দ্র পড়িবার গৃহে একটা চেয়ারে বসিয়া টেবলে পা দুইখানা তুলিয়া দিয়া মিল্টনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট'খানা খুব মনোযোগ সহকারে পড়িতেছিলেন। সুরমা ঝড়ের মত গৃহে প্রবেশ করিয়া বিনা ভূমিকাতেই বলিল, "তোমার ও বই-টইগুলো বন্ধ কর বলছি। দিন রাত হাঁ করে কেবল বই পড়ছেন। এদিকে সংসারে যে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার ঠিক রাখছেন না।"

সত্যেন্দ্র বই মুড়িয়া স্ত্রীর পানে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "কি হয়েছে?"

সুরমা ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "হয়েছে আমার মরণ, তোমায় মুখ-অগ্নি করতে হবে তাই ডাকতে এসেছি। ভাই, ওদিকে যাচ্ছে-তাই কাণ্ড করছে, লোকে ছি ছি করছে যে।"

সত্যেন্দ্র। কি কাণ্ড করছে?

সুরমা দ্বিগুণ ঝাঁজের সঙ্গে বলিল, "কানে তুলো দিয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাক। দেখ গে তোমার ভাই কল্যাণীকে এনে নিজেদের ঘরে রেখেছেন। গ্রামের মধ্যে ছোট লোকদের বাড়ী বাড়ী দু'জনে যাচ্ছে। সেবা— না কি মাথা মুণ্ড করছে। ভদ্র সমাজে তো মুখ পাবার যো নেই, এখন ছোটলোক নইলে আর চলবে কি করে? লোকে কত কথা যে বলছে তা কি বলব? ছি ছিক্কারে দেশ একেবারে ভরে উঠেছে। মা গো মা, ঢের ঢের মেয়েমানুষও তো দেখেছি, এমন বেহায়া বদ মেয়েমানুষ তো জীবনে দেখিনি। মুখ একেবারে হাসালে গো একেবারে হাসালে।"

সত্যেন্দ্র স্থির ভাবে বলিলেন, "তাতে আমি কি করব?"

সুরমা বলিল, "তুমি কি করবে? ভাইকে শাসন করতে পারবে না?"

সত্যেন্দ্র। সে ভিন্ন হয়ে গেছে, তার সঙ্গে তো আমার কোনও সম্পর্ক এখন নেই। এখন শাসন করতে গেলে সে এ কথা নিশ্চয়ই বলতে পারে।

সুরমা চুপ করিয়া গেল, একটু পরে বলিল, "তা তুমি এ কথা তো বলতে পার, কল্যাণীকে বাড়ীতে এনে রাখা কতদূর অনুচিত।"

সত্যেন্দ্র। তাও বলা আমার সাজে না।

সুরমা রাগত ভাবে বলিল, "তবে সে যা খুসী তাই করুক, আমি কিছু বলব না।"

সে ফিরিয়া গেল।

বিকাল বেলায় রবীন সত্যেন্দ্রের নিকট আসিল। তখন সত্যেন্দ্র বেড়াইতে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন। রবীন বলিল, "আমার আজ একশ টাকা লাগবে দাদা, সেটা এখনি দিলে ভাল হয়।"

সত্যেন্দ্র ব্রাশ দিয়া জামা ঝাড়িতে ঝাড়িতে একটু বিরক্তি সহকারে বলিলেন, "সকল সময়ে আমি টাকা দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারিনে।"

রবীন শান্ত ভাবে বলিল, "কবে দিতে পারবেন?"

সত্যেন্দ্র ভ্রাতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার টাকার এত দরকার কিসে?"

রবীন তেমনি ভাবে বলিল, "আমার দরকার আছে।"

চটিয়া উঠিয়া সত্যেন্দ্র বলিলেন, "দরকার তো তোমার প্রতি কথায়। আমি যখন টাকা দেবার কর্ত্তা, তখন অবশ্য এটা জানা দরকার আমার কেন তুমি টাকা নেবে?"

রবীন আর কথা কাটাকাটি না করিয়া বলিল, "আমায় কতকগুলো ঔষধ আনাতে হবে টাকা চাচ্ছি তার জন্যে।"

"তুমি কি আজকাল ডাক্তার হয়ে পড়েছো নাকি?" সত্যেন্দ্রের মুখে ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল।

রবীন বলিল, "দরকার হলে হ'তে হয় বটে।"

সত্যেন্দ্র বলিলেন, "শুনলুম একটী নার্সও পেয়েছো। বেশ বেশ; দেশটাকে ম্যালেরিয়া আর অন্য রোগের হাত হতে বাঁচাবে দেখছি তোমরা। টাকা যা চাও কাল পাবে, আজ এখন কোনও মতেই হতে পারছে না।"

খুব তাড়াতাড়ি তিনি বাহির হইয়া গেলেন। রবীন বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিল।

দিন দিন তাহাদের নামে কলঙ্ক খুব বেশী করিয়াই বাহির হইতে লাগিল, কিন্তু রবীন সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। তাহার সাহস দেখিয়া কল্যাণীও অনেকটা সাহস পাইল।

গ্রামের মধ্যে তিন ভাগ লোক ইহাদের বিপক্ষ, এক ভাগ মাত্র তাহাদের স্বপক্ষে আসিয়াছে। যে এক ভাগ লোক

আসিয়াছে তাহারা অতি দরিদ্র এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বী। মুসলমানই তাহাদের মধ্যে বেশী।

সেদিন যখন কল্যাণী অতি প্রাতে স্নানান্তে বাড়ীতে ফিরিতেছিল, সেই সময় পথের উপরে তাহার বাল্যসখী চন্দ্রার সহিত দেখা হইল। চন্দ্রা বিবাহ হইয়া অবধি শ্বশুরালয়ে ছিল, আসিয়া যখন কল্যাণীর সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা করিল তখন শুনিল কল্যাণীর সংস্পর্শে যে যাইবে সে জাতি হারাইবে।

চন্দ্রা নিরস্ত হইল, কিন্তু তাহার প্রাণের টান গেল না। সে বাস্তবিক কল্যাণীকে ভালবাসিত, কল্যাণীর অনিন্দ্য স্বভাব সে চিনিত। সে জানিত এ সকলই মিথ্যা কথা, কিন্তু তথাপি সাহস করিতে পারিল না। পথে ঘাটে যদি তাহার দেখা পাওয়া যায় এই আশায় সে উন্মুখ থাকিত, কিন্তু কল্যাণীর দেখা পাওয়াই ভার ছিল।

কাল সারারাত্রি কল্যাণীকে একটী মুসলমানের মাতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাটাইতে হইয়াছে। আজ বৃদ্ধাকে অনেক সুস্থ দেখিয়া নিশ্চিন্ত প্রাণে সে একেবারে স্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। চন্দ্রাকে সম্মুখে দেখিয়া সে পাশ কাটাইয়া যাইতেছিল, কিন্তু চন্দ্রা একেবারে তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল।

বিস্মিতা কল্যাণী তাহার মুখের পানে ভাল করিয়া চাহিল। কই, সে মুখে তো কোন ঘৃণার ভাব নাই। সেই ছোটবেলাকার প্রীতি সে মুখে উছলাইয়া উঠিতেছে। গভীর স্বরে চন্দ্রা ডাকিল—"কল্যাণী।"

কল্যাণী সে কণ্ঠে স্নেহ অনুভব করিল। যে হরিশবাবু সমাজের নেতা—যিনি তাহাকে এক কথায় সমাজচ্যুত করিলেন, তাঁহারই একমাত্র বড় আদরের কন্যা চন্দ্রা, সে কি সত্যই কল্যাণীর অযথা কলঙ্কে ব্যথিত হইয়াছে

চন্দ্রা বলিল, "আমায় সামনে দেখেও তুই পাশ কাটিয়ে পালাচ্ছিলি কল্যাণ? আমি না তোর বোনের মতন? আমারই সঙ্গে না তুই খেলা করেছিস? তুই আজ সে সব কথা কি ভুলে গেছিস ভাই?"

"দিদি"—কল্যাণী তাহার বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিয়া বলিল; "আমি তোমায় ভুলিনি, কখনও ভুলতে পারবও না। আমি পাশ কাটাচ্ছিলুম কারণ তুমি হরিশ কাকার মেয়ে।"

চন্দ্রা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি তা বুঝেছি। আমি বড় ব্যথা পেয়েছি কল্যাণ—কেউ তোকে চিনেও চেনে নি। কিন্তু এই ভেবে মনকে প্রবোধ দি, আগুন কখনও ছাই ঢাকা হয়ে থাকবে না, ছাইকেও উজ্জ্বল করে সে ফুটে উঠবে। ছাইও তখন আগুনে পড়ে আপনাকে ধন্য মনে করবে। ভাবনা কি বোন! নির্ভর করেছিস তো? সব ঢেলে দিস ভাই, দেখবি সব সার্থক হবে।"

কল্যাণী ধীরে ধীরে বলিল, "সব ঢেলে দিছি দিদি, সব দিছি। আমার মান অপমান, আমার লজ্জা ভয় সব তার পরে দেছি, সে এখন যা করবে তাই হবে। আগে বুঝতে পারিনি তাই কেঁদেছিলুম, এখন আর না দিদি। আমি এক মহান্ গুরু পেয়েছি, তিনিই আমায় পথ দেখিয়েছেন, তিনি আমায় দেবতা নির্দ্দেশ করেছেন। আমার গুরু নির্ব্বিকার, তাঁর সাহসে আমার সাহস হয়েছে।"

চন্দ্রা। কে তোর গুরু কল্যাণী—রবীন কি?

কল্যাণী। হ্যাঁ—তিনিই।

চন্দ্রা নীরব হইয়া একদৃষ্টে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল, যেন তাহার হৃদয়ভাব জানিবার চেষ্টা করিল। একটু পরে বলিল, "সত্যি কথা বলবি কল্যাণী—মিথ্যা বলবি নে?"

কল্যাণী। মিথ্যা কথা প্রায় বলিনি দিদি, তাতো জানো।

চন্দ্রা। তুই রবীনকে ভালবাসিস নি কি?

কল্যাণী স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁ, সেই ভালবাসাই তো আমায় মুক্তি দেছে দিদি। আমার সৌভাগ্য যে আমি তাঁকে ভালবাসতে পেরেছি, তিনিও আমার ভালবাসা গ্রহণ করেছেন। তবে লোকে যে ভাবে বলছে সে ভাবে নয়—মাতৃভাবে। তিনি সন্তান বলে আমার কাছে ভালবাসার প্রার্থী হয়েছেন। তিনি আমায় ভুল পথ হতে ফিরিয়ে সত্যপথে এনেছেন, আমার জীবনকে সুষমাময় করে তুলেছেন। আমি তাঁর লক্ষ্যে নিজের লক্ষ্য স্থির করেছি, তাঁর পেছনে চলেছি, তিনি

আমায় পথ দেখিয়ে আগে আগে চলেছেন। বড় সত্যি কথা এটা, যথার্থ পথ দেখাতে পারে ভালবাসার পাত্র, যদি সে যথার্থ মানুষ হয়! সে যদি নীচ হয়, তার উপাসিকাও নীচ হবে। আমি যথার্থ এই ভেবে মনে গর্ব্ব অনুভব করছি—আমি যাকে ভালবাসি, সে নীচ নয়, সে মহৎ—সে যথার্থ উঁচু—সেই মানুষ।"

তাহার কণ্ঠস্বর এমন সতেজ—এমন পরিষ্কার, চন্দ্রা তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গেল। একটু থামিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তোকে আমার আশীর্ব্বাদ করবার অধিকার আছে কল্যাণ, কারণ আমি তোর চেয়ে দুই বছরের বড়। আমি আশীর্ব্বাদ করছি তোর লক্ষ্য ঠিক থাক, তোর পথ সরল হয়ে যাক। যারা তোর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা তোর পদানত হবে এ বিশ্বাস রাখ। ভয় করিস নে, এগিয়ে যা।"

পথে লোক আসিতেছে দেখিয়া কল্যাণী বলিল, "আর না দিদি, তুমি চলে যাও। যখন সময় হবে তখন আবার আমরা পাশাপাশি বোনের মত দাঁড়াতে পারব—এখনও সময় হয় নি। তোমার আশীর্ব্বাদ সফল হোক দিদি।"

চন্দ্রা তাহার শুভ্র ললাটে একটা চুম্বন দিয়া ছাড়িয়া দিল। কল্যাণী তাহার পদধূলি লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, চন্দ্রা তাহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল।

ক্রমশঃ।

দেশীয় ভৈষজ্য তত্ত্ব।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত এল, এম্‌, বি]

"ত্রিফলা"।

আজকাল ত্রিফলা প্রায় সকলের নিকটই সুপরিচিত। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই তিনটী দ্রব্যের মিশ্রণকে ত্রিফলা বলে। আমি নিম্নে এই তিনটী দ্রব্যের পৃথক পৃথক পরিচয় ও ইহাদের তিনটীর মিলিত গুণ-পরিচয় প্রদান করিলাম।

হরীতকী।

"পপাত বিন্দুর্ম্মেদিন্যাং শক্রস্য পিবতোঽমৃতম্।
ততো দিব্যাং সমুৎপন্না সপ্তজাতির্হরীতকী॥
হরীতক্যভয়া পথ্যা কায়স্থা পূতনামৃতা।
হৈমবত্যব্যথা চাপি চেতকী শ্রেয়সী শিবা॥
বয়স্থা বিজয়া চাপি জীবন্তী রোহিণীতি চ।"

একদিন ইন্দ্র অমৃত পান করিতেছিলেন, ঐ অমৃত হইতে একবিন্দু ভূমিতে নিপতিত হইলে সেই অমৃতবিন্দু হইতে হরীতকীর উৎপত্তি হইয়াছে। সপ্তপ্রকার হরীতকী দ্রব্য-সম্ভূত। হরীতকী, অভয়া, পথ্যা, কায়স্থা, পূতনা, অমৃতা, হৈমবতী, অব্যথা, চেতকী, শ্রেয়সী, শিবা, বয়স্থা, জীবন্তী, বিজয়া ও রোহিণী, এইগুলি হরীতকীর নাম।

হরীতকীকে বাঙ্গালায় হর্ত্তকী, হিন্দিতে হর বা হরেড়া, মহারাষ্ট্রে হিরড়া, কর্ণাটে অনিলে, উৎকলে হরিড়া ও করেড়া, দাক্ষিণাত্যে কলরা ও তামিলী দেশে কড়কৈ বলিয়া থাকে।

আর্য্য জাতির নিকট হরীতকী পূর্ব্বে অত্যন্ত সমাদর লাভ করিয়াছিল। আজকাল যাগ-যজ্ঞ, ব্রতাদিতে প্রথমেই হরীতকীর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। হরীতকীর সমাদরের কথা এস্থলে দু' চারিটী উল্লেখ করিলাম।

"হরীতকী ভুঙ্ক্ষ রাজন মাতেব হিতকারিণী।
কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী॥"

হে রাজন! হরীতকী ভক্ষণ করুন, ইহা মাতার ন্যায় হিতকারিণী। মাতাকেও কদাচিৎ কুপিতা হইতে দেখা যায়, কিন্তু উদরস্থ হরীতকী কুপিত হয় না।

"হরস্য ভবনে জাতা হরিতা চ স্বভাবতঃ।
হরতে সর্ব্বরোগাংশ্চ তেন নাম্না হরীতকী॥"

হরের অর্থাৎ মহাদেবের ভবনে জাত, স্বভাবতঃ হরিদ্রা-বর্ণ ও সর্ব্বরোগ হরণ করিয়া থাকে বলিয়া হরীতকী নাম হইয়াছে।

হরীতকীর প্রকার ভেদ। বিজয়া, রোহিণী, পুতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী, এই সাত প্রকার হরীতকী। বিজয়ার আকৃতি শিরাবিহীন অথচ গোল। রোহিণী গোল। পুতনা সূক্ষ্ম, অথচ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বীজ ও স্বল্পত্বক্‌বিশিষ্ট। অমৃতা স্থূলত্বচা অর্থাৎ মাংসবহুল ক্ষুদ্র বীজ বিশিষ্টা। অভয়া পঞ্চরেখা বিশিষ্টা। জীবন্তীর বর্ণ সুবর্ণ বিশিষ্ট ও চেতকী তিনটী রেখাযুক্তা। সপ্ত জাতির হরীতকী এইরূপ সপ্ত প্রকার আকৃতি হইয়া থাকে।

"বিজয়া সর্ব্বরোগেষু রোহিণী ব্রণহারিণী।
প্রলেপে পুতনা যোজ্যা শোধনর্থেহমৃতাহিতা॥
অক্ষিরোগেহভয়া শস্তা জীবন্তী সর্ব্বরোগহৃত।
চূর্ণার্থে চেতকী শস্তা যথাযুক্তং প্রযোজয়েৎ॥"

বিজয়া সকল প্রকার রোগে প্রশস্ত। রোহিণী ব্রণ নিবারণকারিণী। পুতনা প্রলেপে উপকারী। অমৃতা সংশোধনের পক্ষে হিতকর। অভয়া চক্ষু রোগে ব্যবহৃত হয়। জীবন্তী সমস্ত রোগের উপকারক এবং চূর্ণার্থে চেতকী প্রশস্ত।

"কাচিদাস্বাদমাত্রেণ কাচিদ্‌গন্ধেন ভেদয়েৎ।
কাচিৎ স্পর্শেন দৃষ্ট্যান্যা চতুর্দ্ধা ভেদয়েচ্ছিবা॥"

কোন কোন হরীতকী ভক্ষণ করিলে, কোন কোন হরীতকীর আঘ্রাণে, কোন কোন হরীতকীর স্পর্শনে এবং কোন কোন হরীতকীর দর্শনে মলভেদ হইয়া থাকে।

"চেতকী পাদপচ্ছায়ামুপসর্পন্তি যে নরাঃ।
ভিদ্যন্তে তৎক্ষণাদেব পশুপক্ষি মৃগাদয়ঃ॥
চেতকী তু ধৃতা হস্তে যাবত্তিষ্ঠন্তি দেহিনঃ।
তাবদ্ভিদ্যেত বেগৈস্তু প্রভাবান্নাত্র সংশয়ঃ॥
তৃষ্ণার্ত্ত সুকুমারাণাং কৃশানাং ভেষজদ্বিষাম্।
চেতকী পরমা শস্তা হিতা সুখ বিরেচনী॥"

মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও মৃগ প্রভৃতি যে কোন প্রাণী যদি চেতকী নামিকা হরীতকী বৃক্ষের ছায়াতে গমনাগমন করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মলভেদ হয়। চেতকী নামক হরীতকী হস্তে ধারণ করিলে তাহার প্রভাবে প্রবলবেগে তরল মলভেদ হয়, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। অতএব তৃষ্ণার্ত্ত; সুকুমার কৃশ, এবং যাহাদের ঔষধের প্রতি বিদ্বেষ, শাস্ত্রকার তাহাদের পক্ষে চেতকী সুবিরেচনের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়াছেন।

আমাদের দেশে একটী গল্প আছে যে, একদেশে এক প্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র, লেখাপড়া শিক্ষা করে নাই। কবিরাজ মহাশয়ের অন্তিমকালে তাঁর পুত্র দেখিলেন, যে বাবার তো অন্তিমকাল উপস্থিত, এদিকে আমি কিছুই শিক্ষা করিলাম না, সংসার চলিবে কি করিয়া? এই সব চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহার পিতার নিকট গিয়া বলিলেন, 'বাবা, আমি ত কিছুই জানি না—আপনি আমাকে কিছু কবিরাজী শিক্ষা দিয়া যান।' তাঁর পিতা সেই কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'বৎস! আমার ত জীবন শেষ হইয়া আসিল। আমি আর দু' চার ঘণ্টার ভিতর মারা যাইব। এই অন্তিমকালে তোমাকে আর কি শিক্ষা দিয়া যাইব? তবে তুমি এক কাজ কর—হরীতকী চূর্ণ করিয়া সকল রোগীকেই ব্যবস্থা করিবে।' তিনি তো এই বলিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইলেন। তাঁর পুত্র পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সকল রোগেই হরীতকী চূর্ণ ব্যবহার করিতেন।

এমন সময় সেই দেশের রাজকন্যার অসুখ করিলে, রাজা মহাশয় অনেক বড় বড় কবিরাজ দেখাইয়াও যখন তাঁহার কন্যার রোগ আরোগ্য করিতে পারিলেন না, সেই সময় তিনি প্রচার করিলেন, যিনি আমার কন্যার রোগ আরোগ্য করিতে পারিবেন, তিনি আমার কন্যালাভ করিবেন ও অর্দ্ধেক রাজত্ব পাইবেন। এই শুনিয়া একদিন সেই কবিরাজ মহাশয় রাজার নিকট গিয়া বলিলেন—"রাজা মহাশয়! আমি আপনার কন্যার রোগ আরাম করিব।" তাঁহার কথামত রাজা তাঁহার কন্যার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন।

কবিরাজের ভাগ্যবলেই হোক, আর হরীতকীর গুণেই হোক, রাজকন্যার রোগ ভাল হইল। তারপর রাজ-কন্যার সঙ্গে কবিরাজের বিবাহ হইয়া যাইল ও রাজা তাঁহাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দান করিলেন।

তার কিছুদিন পরে অন্য এক দেশের রাজা সেই রাজাকে জানাইলেন যে, আপনি যদি আপনার রাজত্বের

কর আমাকে না দেন, তাহা হইলে আমি বলপূর্ব্বক আপনার রাজ্য আক্রমণ করিব। রাজা তো এই সংবাদ শুনিয়া ভাবিয়াই অস্থির। তিনি তাঁহার অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। তাঁহারা সকলে বলিলেন, কর দেয়া হউক, কারণ আমাদের সৈন্যবল কম; যুদ্ধে আমরা পরাস্ত হইব। তারপর রাজা কবিরাজকে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। কবিরাজ বলিলেন, সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি বা কর কিছুতেই বিনা যুদ্ধে দেওয়া হইবে না। সেই কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, আপনি কি বলিতেছেন? আমাদের সৈন্যবল যে খুব কম। আমরা কিরূপে যুদ্ধ করিব? কবিরাজ বলিলেন, আমি যা বলি তাই করুন; আপনার কোন চিন্তা নাই।

তারপর কবিরাজ বলিলেন, নদীর ধারে হরীতকীর বাগান প্রস্তুত করুন। কবিরাজের কথামত হরীতকীর বাগান প্রস্তুত হইল; যুদ্ধারম্ভ হইল। যুদ্ধের পূর্ব্বদিন কবিরাজ তাঁহার সৈন্যগণকে খুব করিয়া হরীতকী খাওয়াইয়া দিলেন। প্রাতঃকালে সৈন্যগণ দাস্ত পরিষ্কারের জন্য বাগানে দাস্ত পরিষ্কার করিতে গেল। কিন্তু সৈন্যগণের দাস্ত আর পরিষ্কার হয় না। দাস্ত পরিষ্কার করিয়া আসে, আবার দাস্ত করিতে যায়: এইরূপে সমস্ত দিনেও যখন দাস্ত পরিষ্কার কার্য্য শেষ হইল না, দেখিয়া বিপক্ষ সৈন্যগণ ভাবিল, উহাদের সৈন্যবল তো কম নহে। একদল দাস্ত করিতে যায় আবার একদল আসে; সমস্ত দিনেও উহাদের দাস্তকার্য্য শেষ হইল না। সুতরাং উহাদের সৈন্যবল অনেক, আমরা উহাদের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইব সন্দেহ নাই। অতএব যুদ্ধে কাজ নাই--ভালয় ভালয় দেশে ফিরিয়া যাই। তারপর বিপক্ষ-সৈন্যদল বিনাযুদ্ধে নিজের দেশে ফিরিয়া যাইল।

> "হরীতকী পঞ্চরসা লবণাতুবরা পরম্।
> রূক্ষোষ্ণা দীপনা মেধ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী॥
> চক্ষুষ্যা লঘুরায়ুষ্যা বৃংহনী চানুলোমিনী।
> শ্বাস কাস প্রমেহার্শঃ কুষ্ঠশোথোদরক্রমীন॥
> বৈস্বর্য্য গ্রহণীরোগ বিবন্ধ বিষমজ্বরম্।
> গুল্মাধ্মান তৃষাচ্ছর্দ্দি হিক্কাকণ্ডু হৃদাময়ান্॥
> কামলাং শূলমানাহং প্লীহানঞ্চ যকৃত্তথা।
> অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছঞ্চ মূত্রাঘাতঞ্চ নাশয়েৎ॥"

হরীতকী লবণ রস ভিন্ন পঞ্চরস যুক্ত অর্থাৎ মধুর, অম্ল, তিক্ত, কটু ও কষায় রস যুক্ত। ইহা রুক্ষ উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি দীপ্তিকর, মেধাজনক, মধুর, বিপাক, রসায়ন চক্ষুর হিতকর, লঘু, আয়ুষ্কর, মাংসবর্দ্ধক, অনুলোমক এবং শ্বাস, কাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, শোথ, উদরকৃমি, বিস্বরতা, গ্রহণীরোগ, বিবন্ধ, বিষমজ্বর, উদরআধ্মান, পিপাসা, বমি, হিক্কা, কণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা, যকৃৎ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ এবং মূত্রাঘাত নষ্ট করিয়া থাকে।

হরীতকী মধুর, তিক্ত ও কষায় রসদ্বারা পিত্ত নষ্ট করে, কটু, তিক্ত ও কষায় রসদ্বারা কফ নষ্ট করে ও অম্ল রসদ্বারা বায়ু নষ্ট করে।

হরীতকীর মজ্জাতে মধুর রস, স্নায়ুতে অম্ল রস, বৃন্তে তিক্তরস, ত্বকে কটু রস এবং অস্থি অর্থাৎ বীজেতে কষায় রস অবস্থিত।

> "নবা স্নিগ্ধা ঘনা বৃত্তা গুর্ব্বীক্ষিপ্তা চ যাম্ভসি।
> নিমজ্জেৎ সা প্রশস্তা চ কথিতাতিগুণপ্রদা॥
> নবাদিগুণ যুক্তত্বং তথৈকত্র দ্বিকর্ষতা।
> হরীতক্যাঃ ফলে যত্র দ্বয়ং তচ্ছ্রেষ্ঠমুচ্যতে॥"

যে হরীতকী নূতন, স্নিগ্ধ, কঠিন, গোল, ভারযুক্ত এবং যাহা জলে নিক্ষেপ করিলে মগ্ন হইয়া যায়, তাহাই প্রশস্ত ও অত্যন্ত গুণকারক। যে হরীতকী পূর্ব্বোক্ত নূতন ও স্নিগ্ধাদিগুণসমন্বিত এবং যাহার একটীর পরিমাণ দুইকর্ষ সেই সমস্ত গুণ যে হরীতকীতে বর্ত্তমান সেই হরীতকী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

> "চর্ব্বিতা বর্দ্ধয়ত্যাগ্নং পেষিতা মলশোধিনী।
> স্বিন্না সংগ্রাহিনী পথ্যাভৃষ্টা প্রোক্তাত্রিদোষনুৎ॥"

হরীতকী চর্ব্বণ করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, পেষণ করিয়া সেবনে মলশোধিত হয় ও সিদ্ধ করিয়া সেবনে মলরোধ হয়, ভর্জ্জিত হরীতকী সেবনে ত্রিদোষ নষ্ট হয়।

> "উন্মিলিনী বুদ্ধিবলেন্দ্রিয়ানাং নির্ম্মূলিনী পিত্তকফানিলানাম্।
> বিস্রংসিনী মূত্রশকৃম্মলানাং হরীতকীস্যাৎ সহভোজনেন॥

অন্নপানকৃতান্ দোষান্ বাতপিত্ত কফোদ্ভবান্।
হরীতকী হরত্যাশু ভুক্তস্যো পরিযোজিতা ॥
লবণেন কফং হন্তি পিত্তং হন্তি সশর্করা।
ঘৃতেন বাতজান্ রোগান্ সর্ব্বরোগান্ গুড়ান্বিতা ॥"

আহারের সহিত হরীতকী সেবনে বুদ্ধি ও বল এবং ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পিত্ত, কফ ও বায়ু বিনষ্ট হয়—এবং মূত্র, পুরীষ ও শারীরিক মলসমূহ বিনির্গত হয়। আহার অন্তে হরীতকী সেবনে অন্নপানকৃত দোষবশতঃ বাত পিত্ত কফ জন্য পীড়া সত্বরই আরোগ্য হয়। হরীতকী লবণের সহিত ভক্ষণে কফ ; চিনির সহিত ভক্ষণে পিত্ত, ঘৃতসহ সেবনে বাতজ রোগ ও গুড়ের সহিত সেবনে সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

হরীতকী এবংবিধ গুণযুক্ত হইলেও স্থল বিশেষে হরীতকী প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

"তৃষ্ণায়াং মুখশোষে চ হনুস্তম্ভে গলগ্রহে।
নবজ্বরে তথা ক্ষীণে গর্ভিণ্যাং ন প্রশস্যতে ॥"

তৃষ্ণারোগে, মুখশোষে, হনুস্তম্ভে (Lock Jaw) গলগ্রহে (Wryneck) ও নবজ্বরে, এবং ক্ষীণব্যক্তি ও গর্ভিনীর পক্ষে হরীতকী প্রশস্ত নহে।

হরীতকী একটী 'রসায়ন'। রসায়ন ইচ্ছুক ব্যক্তি বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম, এই ছয় ঋতুতে যথা-ক্রমে সৈন্ধব, চিনি, শুঁঠ, পিপুল, মধু ও গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিবে।

(ক্রমশঃ)

নবীন লেখকের পৃষ্ঠা

নিষ্কর্ম্মা।

[শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত]

(১)

প্রভাত-সূর্য্যের কিরণ সবে মাত্র প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িয়াছে। রান্নাঘরের দাবার এক পার্শ্বে উবু হইয়া বসিয়া, আহার করিতে করিতে মাণিক ভগিনীর উদ্দেশে কহিল, "হাঁড়িতে আর পান্তা আছে দিদি?"

অদূরেই বঁটি পাতিয়া সরসী তরকারী কুটিতেছিল, উত্তরে তীব্রকণ্ঠে ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, "কেন, এখনও পেট ভরে নি বুঝি?"

ভাতের গ্রাস চর্ব্বণ করিতে করিতে মাণিক সপ্রতিভ মুখে বলিল, "হুঁ।"

"এক কাঁসি পান্তা দিলুম তা' খেয়েও পেট ভরল না? কি রাক্ষুসে খাওয়া বাবা!"—বলিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, বঁটি কাৎ করিয়া রাখিয়া সরসী উঠিতে যাইতেছিল, কি ভাবিয়া সহসা বসিয়া পড়িয়া ক্রুদ্ধস্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "বলি, গিলতে পারিস তো খুব দেখ্‌চি—একটি ক্ষুদে রাক্ষস বল্লেই হয়। কিন্তু চিরকালটা এ খাওয়া জোগাবে কে শুনি?"

মাণিক এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিবার প্রয়োজন বোধ না করিয়া নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিল।

উত্তর না পাইয়া সরসী উত্তেজিত হইয়া কহিল, "চুপ করে রইলি যে? কথাটা কাণেই গেল না বুঝি?"

মাণিক তথাপি অবিচলিত চিত্তে আহার করিতে লাগিল।

সরসী অসহ্য ক্রোধে মুখ বিকৃত করিয়া সপ্তমে চেঁচাইয়া উঠিল, "গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে আর কদ্দিন চলবে শুনি? কায কর্ম্ম করা-টরা হবে না নাকি? ভারী আমার পয়সা দেখেছিস্ ; না?"

মাণিক এবারও একটুও চঞ্চল হইল না, খানিকক্ষণ শূন্য পাতের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া শেষে একটু ক্ষুণ্ণ-চিত্তে বলিল, "হাঁড়িতে আর পান্তা নেই নাকি দিদি?"

অগত্যা সরসী রাগে গজ্ গজ্ করিতে করিতে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল, এবং খানিক পরে প্রচুর পরিমাণ পান্তা আনিয়া রাগ করিয়া সমস্তটা তাহার পাতে ঢালিয়া দিয়া বলিল, "অম্নি খেতে হবে কিন্তু, তরকারী আর নেই কিছু।—পারবি তো?"

"গোটা দুই কাঁচা লঙ্কা দিলেই হবে।"—বলিয়া লবণ সংযোগে মাণিক ভাত মাখিতে প্রবৃত্ত হইল।

সরসী গোটাকতক কাঁচা লঙ্কা আনিয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে আহার সমাপ্ত করিয়া মাণিক প্রসন্নমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। সরসী পুনরায় স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "খাওয়া তো হয়েছে, উঠোনটা এবার একটু ঝাঁট দিয়ে দেতো। আমি ততক্ষণ রান্নার যোগাড়টা দেখিগে।"

মাণিক সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া হাত ধুইতে অগ্রসর হইতেছিল, সরসী পিছু ডাকিয়া বলিল, "হ্যাঁ ছাখ্, আজ একটু সকাল করে বাড়ী ফিরিস্। উঠোনে কাঠগুলো জড় করা রয়েছে, চ্যালা করে দিতে হবে, নইলে ওবেলায় রান্নার ভারী অসুবিধে হবে।—বুঝলি?"

আজ নূতন নয়, ভৃত্য সৃষ্টিধরের অনুপস্থিতিতে তাহার প্রায় সমস্ত কাযই মাণিককে সম্পন্ন করিতে হয়।

(২)

অল্পবয়সে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া মাণিক ভগিনীর আশ্রয়ে আসিয়াছে প্রায় পাঁচ বৎসর। ভগিনীর অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, সংসারে তাহার কোন অভাব অভিযোগ ছিল না। কিন্তু তথাপি এই পিতৃ-মাতৃহীন ভাইটিকে প্রতিপালন করিতে তাহার বিরক্তির সীমা ছিল না। অবশ্য মাণিক যে বসিয়া খাইত, এমন নহে; সরসী যতটা সম্ভব মাণিকের কাছে কায আদায় করিয়া লইতে ছাড়িত না। মাণিক কিন্তু এজন্য ক্ষুণ্ণ ছিল না, হাসিয়া খেলিয়া পরম আনন্দে দিনগুলি কাটাইয়া দিতেছিল।

অপরাহ্ণ বেলায় মাণিক প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিবামাত্র সরসীর কাংস্য কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল;—

"বলি, এতক্ষণ হচ্ছিল কি? আমি কি তোর বাঁধা মাইনের দাসী নাকি যে হাঁড়ি কোলে কোরে সারাদিন রান্নাঘরটিতে বসে থাকবো! বাড়ীশুদ্ধ সবার খাওয়া হয়ে গেল, বাবুর আর দেখা নেই।—জানে কিনা, বাঁধা ভাত আছে, নিশ্চিন্তি হয়ে হেথা হোথা ফুর্ত্তি করে বেড়ানো হচ্ছে।"

ভগিনীর সগর্জ্জন তিরস্কারে ভ্রুক্ষেপমাত্র না করিয়া, মাণিক অগ্রসর হইয়া রান্নাঘরের দাবার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "একটু তেল দাও দিদি। সারাদিন চান করা হয় নি, নেয়ে আসি।"

সরসী উনানে মৃত্তিকা লেপন করিতে করিতে, কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "এতক্ষণ ছিলি কোথা শুনি?"

"ছিষ্টিদার ছেলেকে দেখতে গিয়েছিলুম, ওলাউঠো হয়েছে তার। অবস্থা ভারী খারাপ, তাই এতক্ষণ সেখানে বসেছিলুম। আহা, ছেলেটার কি কষ্ট—দেখে চোখ ফেটে জল এল। গেল বছর ছিষ্টিদার ছোট মেয়েটি ঐ রোগে মারা গিয়েছিল।—ছিষ্টিদার বৌ তো কেঁদেকেটে সমস্ত দিন মুখে কিছু দেয়নি, ছিষ্টিদা পাগলের মত হয়ে গেছে।"—বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্তভাবে তাড়া দিয়া বলিল, "চট্ করে তেল দাও দিদি, নেয়ে খেয়ে সেখানে আবার যেতে হবে কিনা। ঠিকমত তদারক না হলে ছেলেটাকে বাঁচানো দুর্ঘট হয়ে উঠবে।"

সরসী মৃত্তিকালিপ্ত হাত ধুইতে ধুইতে শ্লেষের স্বরে বলিল, "ইঃ, কি আমার কাযের লায়েক রে! নিজের ঘরের কায পড়ে রইল, তার ঠিক নেই, পরের ঘরে কায খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে! উঠোনে কাঠগুলো পড়ে রয়েছে, সেই কখন্ বলেছি চ্যালা করে দিতে, তা' বাবুর খেয়াল নেই—বলে, নিজের বোন ভাত পায় না, পরের তরে মোণ্ডা!"

মাণিক হাসিয়া বলিল, "তেলটা দাও তো আগে, নেয়ে এসে না হয় কাঠগুলো চ্যালা করে দিচ্ছি। কুড়ুলটা বের করে রেখো।" বলিয়া সরসীপ্রদত্ত তৈল মস্তকে লেপন করিতে করিতে পুষ্করিণী ঘাটের দিকে দ্রুত পদচালনা করিল।

আহারান্তে মাণিক যখন সৃষ্টিধরের বাড়ীর দিকে রওনা হইতেছিল, গোপাল কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার

হাত ধরিয়া বলিল, "কোথা যাচ্ছ মামা, আমি যাব তোমার সঙ্গে।"

মাণিক মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইয়া বলিল, "না না, তুই ছেলেমানুষ, তোর সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না।"

গোপাল তাহার হাতটা চাপিয়া রাখিয়া আব্দার ধরিয়া বলিল, "আমি যাব, আমায় নিয়ে চল মামা—একলাটি ভাল লাগে না আমার।"

মাণিক আরও দু'একবার তাহাকে বুঝাইয়া বলিয়া নিরস্ত করিতে না পারিয়া অগত্যা বলিল, "আচ্ছা, চল্ আমার সঙ্গে, তবে সেখানে দুষ্টুমি করতে পাবিনে কিন্তু—তাদের বাড়ী অসুখ কিনা।"

উত্তরে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া গোপাল মামার সহিত অগ্রসর হইল।

রোগীর অবস্থা ভাল দেখিয়া, মাণিক গোপালকে সঙ্গে করিয়া যখন বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন রাত অনেক হইয়াছে। দরজার কাছেই সরসী তাহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। বাড়ীতে পা দিতেই মাণিককে স্তম্ভিত করিয়া দিয়া, ক্রোধারক্ত চক্ষু মেলিয়া সগর্জ্জনে বলিয়া উঠিল, "বলি মাণ্‌কে, তুই যে শেষ কংস-মামা হয়ে উঠলি রে! দুধের বাছা আমার, রোগে ভুগে ভুগে মরতেই তো বসেছে, তাকে কিনা ধরে বেঁধে মরণের মুখে নিয়ে গিইছিলি! ছোঁয়াচে রোগ, ধরলে কি আর রক্ষে আছে!—কি নিষ্ঠুর রে তুই!"

মাণিক বিপন্ন ভাবে কি বলিতে যাইতেছিল, সরসী পুত্রের গণ্ডদেশে ঠাস্ করিয়া একটা চড় বসাইয়া দিয়া ক্রুদ্ধ-পদে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া গেল।

(৩)

সরসী যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল, ঘটিল তাহাই। পরদিন সকাল হইতেই গোপালের বিসূচিকা দেখা দিল। গোপালের পিতা বাড়ী ছিলেন না, কি-একটা কাযে পূর্ব্ব-দিন গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন, দিন চারেক পরে ফিরিবার কথা আছে। রান্নাঘরের দাবায় পা ছড়াইয়া বসিয়া সরসী চীৎকারে ও ক্রন্দনে পাড়া মাথায় করিয়া তুলিতেছিল।

"ওরে, আমি এ যে খাল কেটে কুমীর এনে জিয়োলুম রে!—মামা হয়ে এমন শত্রুতা করতে আছে কি রে! তোর প্রাণে কি একটু দয়ামায়া নেই রে! ওরে গোপাল যে আমার আঁধার ঘরের মাণিক রে, তার ওপর তোর শনিদৃষ্টি পড়ল কেন রে!"—

গোপালের রোগ যন্ত্রণা কাতর মুখের পানে চাহিয়া মাণিক তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেছিল। তাহারও মনে হইতেছিল, তাহারই অপরাধে গোপাল এই দুরন্ত ব্যাধির কবলে পড়িয়াছে। সে যদি কাল উহাকে সঙ্গে করিয়া সৃষ্টিধরের বাড়ীতে না যাইত, তবে তো ইহা ঘটিতে পারিত না। মনে মনে সে অনুক্ষণ কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিতে লাগিল, হে ঠাকুর, গোপালকে নীরোগ করিয়া দাও, গোপালের অসুখ না হয় আমাকে দিও, গোপাল সারিয়া উঠুক, হে ঠাকুর!

চিকিৎসার ত্রুটি হইল না। গ্রামান্তর হইতে মাণিক পাশকরা ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার পরীক্ষান্তে ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। মাণিক আহার নিদ্রা ভুলিয়া দিবারাত্র গোপালের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিল। রোগীর পরিচর্য্যা করিতে চিরদিনই সে অভ্যস্ত; আজ সে পূর্ণ উদ্যমে গোপালের সেবাভার স্বহস্তে গ্রহণ করিল। তাহার আক্লান্ত সেবা ও কাতর মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া তাহাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে সরসীর প্রকৃতই মায়া হইতেছিল, তাই সে এ কয়দিন চুপ করিয়াই রহিল।

(৪)

মাণিকের কাতর প্রার্থনা বিফল হইল না। গোপাল আরোগ্যলাভ করিয়াছে, এবং আজ তিন দিন হইল, তাহার ব্যাধি মাণিকের শরীরে আবির্ভাব করিয়াছে।

আজ অপরাহ্ন হইতেই মাণিকের অবস্থা ক্রমেই শঙ্কটাপন্ন হইতেছিল। চিকিৎসক পূর্ব্বেই তাহার আরোগ্য সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। গৃহকোণে রোগশয্যায় মাণিক ছটফট করিতেছিল। পার্শ্বে বসিয়া সৃষ্টিধর—উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল দৃষ্টি লইয়া তাহার রোগশীর্ণ যন্ত্রণা-কাতর মুখের প্রত্যেক বিকৃতিটি লক্ষ্য করিতেছিল।

মাণিক চোখ মেলিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "গোপাল কোথায়, জানো ছিষ্টিদা ?"

"পূবের ঘরে ঘুমুচ্ছে।"

"তাকে একটিবার ডেকে দেবে ?"

"দিই", বলিয়া সৃষ্টিধর উঠিতেছিল, মাণিক অকস্মাৎ শঙ্কিতস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, "না না, কায নেই তাকে এখানে এনে, আবার যদি এ রোগ হয় তার !"—বলিতে বলিতে উত্তেজনায় সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়াছিল, সৃষ্টিধর তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া বলিল, "একটু স্থির হয়ে ঘুমোও দাদা, দেখবে এখন গোপালকে পরে, তার জন্যে ভাবনা কি !"

উত্তরে কিছুই না বলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস টানিয়া মাণিক অবসন্নভাবে চক্ষু মুদিল।

সৃষ্টিধর তাহার পায়ে হাত বুলাইতে গিয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—সমস্ত হিম হইয়া গেছে !

ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া, মাণিকের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গোপাল যখন রোদনরুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল, "মামা, ও মামা, শুনচো," তাহার বহু পূর্ব্বেই, নিষ্কর্ম্মা জীবনের পরিসমাপ্তি করিয়া মাণিকের আত্মা অনন্তের অজ্ঞাত পথে যাত্রা করিয়াছে !

কবিতা-কুঞ্জ।

প্রতীক্ষা।

[শ্রীনেপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ।]

কোন্ জননীর বক্ষহারা !
আয় অসান্ত পাগলপারা
বজ্ররথে ঝড়ের বুকে ছুটে ;
ভাঙ্‌রে বাঁধন পাঁজর ছিঁড়ে,
জ্বালিয়ে আগুন হৃদয় ঘিরে
বিশ্বজয়ী নে রে আমায় লুটে !

পাগল রে তোর পরশ লাগি
অনেক নিশি ছিলেম জাগি
হারিয়ে চেতন কোন্ যে নিবিড় সুখে,
আজকে আমার সকল হিয়া
উঠ্‌ল ব্যাকুল মুঞ্জরিয়া
শোণিত ধারা ফেনিয়ে ওঠে বুকে !

বিদ্যুতেরি ঝলক হানি
ঘুচিয়ে আমার সকল গ্লানি
আয় রে বুকে আঁধার-পুরের রাজা !
উড়িয়ে ধ্বজা গগন জুড়ে,
কাঁপিয়ে ভুবন গভীর সুরে,
মুক্তি বিষাণ আমার প্রাণে বাজা !

আরতি।

[শ্রীজগদীশচন্দ্র দাস।]

এত ভালবাস প্রভু দূরে দূরে কেন তবু
এস এস হৃদয়ের মাঝে।
এস চির অভিরাম এস নটবর শ্যাম
এস মন-বিমোহন সাজে।
আমার নয়নে চুপে ফুটাও তোমার রূপে
চারু ছবি বিশ্ব-সুশোভন।
কণ্ঠ রসনায় মম ছুটাও নির্ঝর সম
তব নাম সঙ্গীত মোহন।
আমার শ্রবণ ভরি' শুনাও হে বংশীধারী
সে মধুর বাঁশরীর তান,
ছুটিত যে ধ্বনি শুনি ব্রজগোপ সীমন্তিনী
ব'য়ে যেত যমুনা উজান।
দাও নাসিকায় মম লক্ষ পারিজাত সম
মদির তোমারি অঙ্গ গন্ধ—
সর্ব্বাঙ্গে জাগুক মম তব স্পর্শ সুধাসম
চির অতুলন প্রেমানন্দ।
আমার এ করযুগ জন্ম জন্ম যুগ যুগ
সেবুক চরণ দু'টী তব—

অধরে প্রেমের হাসি, মস্তকে আশীষ রাশি
কলুষ করুক পরাভব।
হৃদয়ের বৃত্তিগুলি আপন আসক্তি ভুলি,
তোমাতে হইয়া থাক লীন,
আকুল-বাসনা শুধু নিয়ত জাগুক বঁধু
তোমারে হেরিতে রাত্রি দিন।
আমায় দিওনা মুক্তি দাও শুধু প্রেম-ভক্তি
অলস অবশ করি রাখ,
আমারে পাগল কর, তব নামে ধন্য কর
তুমি শুধু মোর হ'য়ে থাক।

বিশ্ব-রূপ।

[শ্রীবুদ্ধদেব বসু]

আজি, প্রাণের বীণা উঠ্‌ল বেজে
কাহার পরশে!
আঁখি মেলে নিদ্রা হ'তে
উঠ্‌ল হরষে!
মুক্ত আকাশ মাঝে,
লুপ্ত বাতাস মাঝে,
লিপ্ত হ'য়ে সুপ্তি হ'তে
মুক্তি পেয়েছে,
রূপের মাঝে স্থান চেয়েছে,
আসন চেয়েছে!

হাটের ঠেলাঠেলা ছেড়ে
আয়রে চ'লে মন,
আয়রে হেথা, সেথায় পাবি
তাঁহার দরশন!
বিমল গতি নদীর স্রোতে
আয়রে ভেসে সেথান হ'তে
আপনারে তুই বিছিয়ে দে রে
বিশ্বরূপের মাঝে,
আপন হারা হ'য়ে হ'য়ে
এমন ঊষা সাঁঝে।

তরুর ছায়ে পাখীর গানে
মিশিয়ে দে রে প্রাণ,
তোল্ রে বেঁধে আমার তোর ও
ব্যর্থ বীণা খান!
কোলাহলের মাঝে রে আর,
পাবি নে তুই সাড়া তাঁহার,
বিজন স্থানে গোপনেতে
সাধন কর তাঁরি,
লক্ষ ধ'রে চল্‌রে ছুটে
খোল বন্ধ-দ্বার!

রূপের মাঝে আপন-ভোলা
আপন হারা হ'য়ে,
পাখীর গানে নদীর তানে
চল্ রে ধীরে ব'য়ে!
মুক্ত গগন পটে যেতে,
বায়ুর সাথে যেতে যেতে
বিশ্ব-রূপে মুগ্ধ হ'য়ে
চল্ রে ধীরে চল্,
ভাবনাহীন চিন্তাবিহীন
হাসিয়া খলখল!

দুই স্রোত।

[শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ।]

যে নয়ন ঝরে ওগো বিদায়ের ক্ষণে,
সেই পুনঃ ভিজে উঠে শুভ আগমনে।
বিষাদেও যেই অশ্রু আনন্দেও সেই,
আকারে প্রকারে দুয়ে কোন ভেদ নেই।
একই বুকে জেগে উঠে বিষাদ-হরষ,
একই তন্ত্রী ভিন্ন ভাবে করে যে-পরশ।
বুঝিনে কেমনে হৃদি একস্থান হ'তে
এক পথে আনে দুই ভিন্ন রূপ স্রোতে।

মনে প্রাণে।

[শ্রীহৃষিকেশ মল্লিক।]

হৃদয় মরুর কোন্ নিভৃত প্রদেশে
পরিশ্রান্ত, পথভ্রান্ত ফিরিতেছে "মন"—
চির পিপাসিত চিত হতাশের বেশে
আশা মরীচিকা পাছু ধায় অনুক্ষণ।
কতবার কতবার নিদাঘ তপনে
কি দারুণ তপ্ত বায়ু বহে হৃদি মাঝে—
মরমে মূরছি মন তাহার দাহনে
কভু কোথা মৃতপ্রায় শোচনীয় সাজে।
অনন্ত পথের যাত্রী "প্রাণ" ছুটে এসে
পিছু পিছু কানে কানে বলে "ওরে মন
কেন রে ভ্রমিস্ বৃথা মরুময় দেশে
এরূপে পাবিনি তুই সাধনার ধন।
মোর সনে ঐক্যে যদি ঘটে পরমাদ—
বিফল হইবে তোর শত আর্ত্তনাদ!"

ঊষা।

[শ্রীসরোজকুমার সেন।]

ধরণীতে ছিল সে কি লুকাইয়ে আঁধারে?
কে তুমি জাগালে তারে আলোকের জুয়ারে!
নীহারে করুণা ঝরে মৃদু মৃদু পরশে,
পবনে নিকুঞ্জগীতি কি যে প্রীতি বরষে?
আধ আধ হাসি অই ফুটে ওঠে কাননে,
আঁচলের ছায়া যেন জ্যোতি-মাখা কিরণে!
শিথিল অলক দুলে চপলা সে বালিকা—
ঝরা ফুলে গাঁথিতেছে কি মোহন মালিকা!
স্বরগের গানে গানে বীণাখানি বাজায়ে
অমরার ঊষা এল ধরাখানি সাজায়ে।

প্রতীক্ষায়।

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।]

আমি কত আর রব বসিয়া
পথে চাহিয়া!
আপনার মনে বাজাইয়া বাঁশী
কত আর মুখে আনি মিছে হাসি
আপনারে শুধু ভালবাসি বাসি
কত আর যাব গাহিয়া!
তুমি এস মোর জীবনে
প্রীতি-গীতি-রূপ প্লাবনে!
ভরি দাও প্রাণ রূপে রসে তব'
ফুটাও কুসুম নিতি নব নব
স্বার্থ-দ্বেষের কণ্টক সব
ফুলে ফুলে দাও ছাইয়া।

বসন্ত প্রভাতে।

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ।]

আজ সকালবেলা বকুল বেলার
গন্ধ ও কি আসে!
আজ কোন্ রূপসী পল্লীবালা
আমায় ভালবাসে!
আজ তরুণ ঊষার অরুণ কিরণ
পাঠায় মোরে কি নিমন্ত্রণ?
ঐ কোন্ যাদুকরী আমায় ঘিরি'
মৃদু মন্দ হাসে।

এ কার রক্ত চেলি থর বিথরে
ঢেউ দিয়ে যায় প্রাণের পরে?
ও কার হাতের কাঁকন্ প্রেম-নিবেদন্
জানায় মধুর ভাবে?

আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভি।

যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রাচীন ভারতের গবেষণা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভি তাঁহাদের অন্যতম। কবিবর রবীন্দ্রনাথ বোলপুর, শান্তি-নিকেতনে 'বিশ্বভারতী' নামে যে আন্তর্জাতিক বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আচার্য্য লেভি সেখানে অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন, ইহা অনেকেই জানেন। ডিসেম্বর মাসের 'মডার্ণ রিভিউ'-পত্রে এই জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের জীবন-কথার আলোচনা হইয়াছে। নিম্নে তাহার সারাংশের অনুবাদ দেওয়া হইল।

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরীতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৮ শে মার্চ্চ তারিখে সিলভ্যাঁ লেভি জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ পরিসমাপ্ত হইয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুরূহ পরীক্ষা তিনি এমনি সহজে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন যে, সতীর্থগণের বিস্ময় ও অভিভাবকগণের হর্ষের অবধি ছিল না। এই সময়েই তাঁহার গ্রীক আদি প্রাচীন ভাষা শিখিবার আন্তরিক আগ্রহ দেখা যায়। এমন কি, এই জন্যই তিনি এথেন্সের এক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এই সময়ে কোনো এক হিতৈষী বন্ধুর প্রণোদনায় ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তখন James Darmestater নামক জনৈক পণ্ডিত "অবেস্তা" সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিলেন। তিনি সিলভ্যাঁ লেভিকে সহকারিরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু ইরাণের ঐতিহাসিক আলোচনায় তাঁহার লোভ হইল না। Bergaigne নামক একজন প্রাচ্যতত্ত্বজ্ঞ বৈদিক-সাহিত্যের আলোচনা করিতেছিলেন। লেভি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র আয়ত্ত করিলেন। কিন্তু সাধারণ ছাত্রের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পড়িয়া তিনি সংস্কৃত-ভাষায় প্রবেশলাভ করেন নাই। অধ্যক্ষ Bergaigne কাম্বোজের অনেক প্রাচীন-লিপি আবিষ্কার করেন। এই সব লিপি হইতে তাঁহার পাঠ্যারম্ভ হইল। প্রাচীন যুগেই ভারতবর্ষের বাহিরে যে বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সিলভ্যাঁ লেভি, ভারতের সেই ব্যাপক সভ্যতার সহিত গোড়া হইতেই পরিচিত হইয়াছিলেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে একখানি কাগজে সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। ইহার পর Ecole des Hautes Etudes বিদ্যালয়ে তাঁহার অধ্যাপনার সূচনা। এই সময়ে সিলভ্যাঁ লেভির বয়স তেইশ বৎসর মাত্র। তরুণ অধ্যাপকের অধ্যাপনায় আকৃষ্ট হইয়া যে সকল জ্ঞান-পিপাসু শিক্ষার্থী তাঁহার নিকটে সমাগত হন, তন্মধ্যে কেহ কেহ পরে প্রাচ্যদেশ-সংক্রান্ত গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ A. Meillet এবং বৌদ্ধশিল্প ও স্থাপত্যকলাবিশারদ Foucher প্রমুখ পণ্ডিতগণ লেভির ভক্ত শিষ্য।

অধ্যাপক লেভি যখন পরিপূর্ণ উদ্যমে অধ্যাপনায় নিযুক্ত, তখন তাঁহার আচার্য্যস্থানীয় Bergaigne পরলোক গমন করেন। ইহাতে তিনি ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়েন, কিন্তু M. Emilsenart-এর সান্ত্বনায় তাঁহাকে নববলে ও নবোৎসাহে মাতাইয়া তুলিল, তিনি আবার সতেজে গবেষণার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ইউরোপীয় সমাজে ভারতীয় সভ্যতার পূর্ণ পরিচয় দানই অতঃপর তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়া উঠিল। এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে, ভারতীয় সভ্যতার গুণমুগ্ধ আচার্য্য Bergaigne-এর মৃত্যুর পর, লেভি তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লেভি সাহিত্যাচার্য্য উপাধি লাভ করেন। ভারতের নাট্যকলা-সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের উদ্ভব এই সময়ে। হিন্দুর নাট্যশালা-সম্বন্ধে এরূপ উচ্চাঙ্গের রচনা ফরাসী-সাহিত্যে আর নাই। এই সময়েই তিনি প্যারী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, সাহিত্যের Faculty-র অন্যতম সদস্য এবং Ecole des Hautes Etudes-এর

পরিচালক পদে বৃত হন। College de France-এর সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়াছিলেন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে। ইহাই তাঁহার জ্ঞানগবেষণার চরম পুরস্কার। ত্রিশ বৎসরের যুবকের পক্ষে এই প্রবীণোচিত পদলাভ যে তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক, তাহার সন্দেহ নাই।

এই সময়েই লেভির কর্ম্মময় জীবন পরিপূর্ণ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। তিনি বেদান্ত ও উত্তর চরিত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন। প্রিয়দর্শী অশোকের শিলালিপির আলোচনাও এই সময়ে, আর এই সময়েই তাঁহার লিখিত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ Grande Encyclopaedie নামক বিশ্বকোষে স্থানলাভ করিয়াছে।

তিনি যে কেবল নিজেই জ্ঞানানুশীলন করিয়া তুষ্ট ছিলেন, তাহা নহে। সংস্কৃত, পালি, চৈনিক ও তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য তিনি একটি ক্লাসও খুলিয়াছিলেন। এই সময়েই তাঁহার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণার জন্য করাসী চন্দননগরে একটি বিদ্যালয় খুলিবার সঙ্কল্প হইয়াছিল। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ১৮৯৭—৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া Ecole Francais L' Extreme নামক শিক্ষায়তনের ভিত্তিস্থাপন করেন।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা যে ভারতবর্ষের ভৌগলিক সীমায় আবদ্ধ ছিল না, ইহা তিনি বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান। তিনি অশ্বঘোষ রচিত বুদ্ধচরিতের সমালোচক। ১৮৯৭—৯৮ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন সহকর্ম্মীর সহিত তাঁহার ভারতবর্ষ, নেপাল, ইন্দো-চীন এবং জাপান পরিভ্রমণ শেষ হয়। দেশ-ভ্রমণের ফলে প্রাচ্যজগৎ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের পরিধি আরও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। দেশে ফিরিয়া লেভি কয়েকখানি সাময়িক পত্রে সিংহলে ভারতীয় প্রভাব সম্বন্ধে কতকগুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেন। এই সব রচনার প্রভাবে এসিয়া সম্বন্ধে ইউরোপের ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। তাঁহার গবেষণার ফলে প্রাচীন যুগের অনেক গুপ্তরহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তিনি ধম্মপদ, শকুন্তলা এবং কৌটিকর্ণ অবদান সম্বন্ধে কতকগুলি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

১৯০৮ খৃঃ অব্দে তিনি নেপালের ইতিহাস প্রকাশ করেন। সেই বৎসরই তাঁহার সহকর্ম্মী Pelliot মধ্য এশিয়ায় অভিযান করেন। মধ্য এসিয়া হইতে অনেক পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত হইয়া আসিলে, লেভির তত্ত্বাবধানে মধ্যএসিয়ার আবিষ্কৃত পুঁথিগুলি অধ্যয়নের জন্য একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী গঠিত হয়। ফলে মধ্য এসিয়ার ভাষা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইল। লেভি Societe Linguistique নামক ভাষাতথ্য সমিতির সভাপতির পদে বৃত হইলেন। ফরাসী দেশের অনেক সভাসমিতির সহিত তাঁহার সংযোগ স্থাপিত হইল। তিনি এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় উপনীত হইয়াও জ্ঞানানুশীলনের জন্য যে অসাধারণ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়াবহ।

ভারতীয় যুবকগণকে ঐতিহাসিক গবেষণা শিক্ষা দিবার জন্য তিনি কষ্ট স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বোলপুর আশ্রমের তিনি আচার্য্যের পদ গ্রহণ করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের পথ সুগম করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কিরূপ, তাঁহার স্বলিখিত রচনা হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন, "পারস্য হইতে চীনসাগর, সাইবিরিয়ার তুষারাবৃত সীমান্ত হইতে জাভা ও বোর্ণিও দ্বীপপুঞ্জ, ওসেনিয়া হইতে সকোট্রা পর্য্যন্ত, ভারতীয় সভ্যতার 'জ্ঞান ধর্ম্ম পুণ্য কাহিনী' বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ মানবজাতির এক চতুর্থাংশ লোকের উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। অজ্ঞানতাবশতঃই জগতের ইতিহাসে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয় নাই। এখন এই অন্ধতা দূর করিবার সময় আসিয়াছে। আর ভারতবর্ষ যে বিশ্বমানবতার প্রতিনিধি, তাহারও বিচারের প্রয়োজন হইয়াছে।"

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে "প্রাচীন ভারতের ইতিহাস" বাহির হইয়াছে, তাহার লেখক Vincent Smith. লেখক বলেন যে, ইংরাজের আগমনের পূর্ব্বে ভারতীয় ইতিহাসের কোন "ঐক্যের" চিহ্ন পরিলক্ষিত

হয় নাই। এইখানেই অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভির সহিত তাঁহার মতদ্বৈধ হইয়াছে। Smith সাহেবের গবেষণায় মৌলিকত্ব নাই, তিনি দশজনের মতামত সংগ্রহ করিয়া ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু অধ্যাপক লেভি স্বয়ং মূল সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া ভারতীয় ইতিহাসের উপাদানে ঐক্যের সন্ধান পাইয়াছেন।

Smith-সাহেব অনেক স্থানেই ইতিহাসের অঙ্গহানি করিয়াছেন, হয়ত তাহা তাঁহার ইচ্ছাকৃত নহে—অজ্ঞানতা-বশতঃ। যে সব ভারতীয় ছাত্র Smith-সাহেবের গ্রন্থ পড়িয়া ভারতের ইতিহাস-সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন, আচার্য্য লেভির প্রবন্ধাবলী পাঠ করিলে তাঁহাদের সে ভ্রান্তি দূর হইবে। আচার্য্য লেভি ঐতিহাসিক গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। বৈদিক যুগের ক্রিয়াকাণ্ড, হিন্দু-নাটকের ইতিহাস, বৌদ্ধযুগের আলোচনা, নেপালের ইতিহাস, ভারতের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তৃতি এবং মূল ধম্মপদ সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা মৌলিকতায় ও ঐতিহাসিকতায় আদর্শস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

আচার্য্য লেভির সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার লেখার চেয়েও তিনি অনেক উচ্চে। তিনি তপস্বীর ন্যায় ভারতীয় ইতিহাসের ধ্যান-ধারণায় নিরত আছেন; তাঁহাকে নবীন ভারতের তত্ত্বান্বেষিগণের আদর্শ পুরুষ বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। জগতের ইতিহাসে ভারতবর্ষের স্থান কোথায়, তাহা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন :—

"ভারতবাসীর বহুমুখী প্রতিভা ও মূলগত ঐক্য তাহাকে সভ্যজাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করিবেই। ভারতীয় সভ্যতা স্বতন্ত্র ও মৌলিক, ত্রিশ শতাব্দী ব্যাপিয়া উহা নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যেও অবিচলিত আছে। বৈদেশিক সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়াও তাহা বিবর্ণ হয় নাই, পরন্তু বিজাতীয় সম্পদ নিজের অঙ্গীভূত করিয়া প্রভাবশালী হইয়াছে। তাঁহার চোখের উপর দিয়া ক্রমাগত গ্রীক, সিথায়, আফগান ও মোগলবাহিনীর প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে স্থির। এমন কি ইংরাজের অভিযানও তাহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। ভারত তাহার আদর্শকে অচ্যুত রাখিয়াছে।"

—শিক্ষক, পৌষ ১৩২৮।

কাব্যপুরুষের উৎপত্তি।

[অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

কিছুদিন পূর্ব্বে মহাকবি রাজশেখরের বিরচিত "কাব্যমীমাংসা" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গায়কবাড ওরিয়েণ্টাল সিরিজের প্রথম গ্রন্থ। প্রকাশস্থান—সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী, বরদা। এই গ্রন্থে কাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী নূতন আখ্যায়িকা নিবদ্ধ আছে, সেই কথাই আজ "অর্চ্চনা"র পাঠক পাঠিকার সম্মুখে উপস্থাপিত করিব।

শ্রীকণ্ঠ প্রথমে পরমেষ্ঠী, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি তাঁহার চতুঃষষ্টি শিষ্যদিগকে কাব্য-কথার উপদেশ করেন। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা আবার তাঁহার সঙ্কল্পজাত সন্তানদিগকে সেই কাব্যবিদ্যার শিক্ষা দেন। তন্মধ্যে 'কাব্যপুরুষ' ছিলেন—সর্ব্বপ্রধান। কাজেই প্রজাপতি ব্রহ্মা, সর্ব্বসিদ্ধান্তজ্ঞ এই কাব্য পুরুষকেই ত্রিলোকে কাব্য বিদ্যার প্রচারের জন্য নিয়োগ করেন। অষ্টাদশাধিকরণী কাব্যবিদ্যা মধ্যে নিম্নলিখিত এক একটী অধিকরণ এক একজন ছাত্র, কাব্যপুরুষের নিকট হইতে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সহস্রাক্ষ—কবিরহস্য, উক্তিগর্ভ—ঔক্তিক, সুবর্ণনাভ—রীতিনির্ণয়, প্রচেতায়ন—আনুপ্রাসিক, চিত্রাঙ্গদ—যমক ও চিত্র, শেষ—শব্দশ্লেষ, পুলস্ত্য—বাস্তব, ঔপকায়ন—ঔপম্য, পারাশর—অতিশয়, উতথ্য—অর্থশ্লেষ, কুবের—উভয়ালঙ্কারিক, কামদেব—বৈনোদিক, ভরত

—রূপকনিরূপণীয়, নন্দিকেশ্বর—রসাধিকারিক, ধিষণ—দোষাধিকরণ, উপমন্যু—গুণৌপাদানিক, কুচমার—ঔপনিষদিক।

ব্রহ্মার সম্বন্ধ প্রভাবে কিরূপে 'কাব্যপুরুষে'র উৎপত্তি হইল, এ সম্বন্ধে কবি রাজশেখর, 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমে লিখিয়াছেন,—

"এবং গুরুভ্যো গিরঃ পুণ্যাঃ পুরাণীঃ শৃণুমঃ স্ম, যৎকিল ধিষণং শিষ্যাঃ কথাপ্রসঙ্গে পপ্রচ্ছুঃ কীদৃশঃ পুনরসৌ সারস্বতেয়ঃ কাব্যপুরুষো ভবো গুরুঃ? ইতি। স তান্ বৃহস্পতি রূচে।"

গুরু-সম্প্রদায়ের কাছে পবিত্র পুরাতন এইরূপ কথা শুনিয়াছি যে, বৃহস্পতিকে তাঁহার শিষ্যবর্গ কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, আপনাদের গুরু, সরস্বতীর বরপুত্র কাব্যপুরুষ কিরূপ ছিলেন? তখন বৃহস্পতি তাঁহাদিগকে বলিলেন,—

পূর্ব্বকালে দেবী সরস্বতী, পুত্র-কামনায় হিমালয়ে তপস্যা করিতেছিলেন। ব্রহ্মা প্রীতচিত্তে তাঁহাকে বলিলেন, 'পুত্রং তে সৃজামি'—তোমার পুত্র সৃষ্টি করিলাম। ইহার পর সরস্বতী, 'কাব্যপুরুষ'কে প্রসব করিলেন। সে উঠিয়াই সরস্বতীর পাদস্পর্শ করিয়া এই ছন্দোময়ী বাণী উচ্চারণ করিল—

"যদেতদ্ বাঙ্ময়ং বিশ্বমর্থমূর্ত্ত্যা বিবর্ত্ততে।
সোঽস্মি কাব্যপুমানম্ব পাদৌ বন্দেয় তাবকৌ॥"

"যাহার জন্য এই বাঙ্ময় বিশ্ব, অর্থমূর্ত্তিতে বিবর্ত্তিত হইতেছে, অম্ব, আমি সেই কাব্য পুরুষ, আপনার চরণ যুগল বন্দনা করি।"

বেদে যে ছন্দের উপলব্ধি করিয়াছিলেন, লৌকিক ভাষায় সেই ছন্দঃ শুনিয়া সরস্বতী সানন্দে কাব্যপুরুষকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—"বৎস, তুমি ছন্দোময়ী বাণী প্রণয়ন করিয়া বাগ্‌দেবতা আমাকেও জয় করিলে। লোকে যথার্থই বলে,—'পুত্রাৎ পরাজয়ো দ্বিতীয়ং পুত্রজন্ম'—পুত্রের নিকট পরাজয়, দ্বিতীয় পুত্রজন্ম। তোমার জন্মের পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ গদ্যই দেখিয়াছিলেন—পদ্য দেখেন নাই। এখন তোমার পর হইতে ছন্দোবিশিষ্ট বাক্যের প্রবর্ত্তন হইল। ধন্য তোমার জন্ম! শব্দ এবং অর্থ তোমার শরীর; সংস্কৃত ভাষা, প্রাকৃত ভাষা, অপভ্রংশ ভাষা, পৈশাচী ভাষা ও মিশ্রভাষা যথাক্রমে তোমার মুখ, বাহু, জঘন, চরণ ও বক্ষঃস্থল। রস তোমার আত্মা। অনুপ্রাস উপমাদি তোমাকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। এখন তুমি খেলা কর।" এই বলিয়া সরস্বতী সেই কাব্যপুরুষকে গণ্ড-শৈলতলে স্থাপন করিয়া ব্যোমগঙ্গায় স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে মহামুনি শুক্রাচার্য্য, কুশ ও সমিধ আহরণের জন্য নিঃসৃত হইয়াছিলেন, তিনি দেখিলেন, রৌদ্রের তাপে একটী ছেলে পড়িয়া রহিয়াছে। 'এ অনাথ বালকটী কা'র' ইহা ভাবিয়া তিনি তাহাকে নিজের আশ্রমে লইয়া গেলেন। অল্পক্ষণেই আশ্বস্ত হইয়া সেই সারস্বত 'কাব্যপুরুষ', শুক্রাচার্য্যের চিত্তে ছন্দোময়ী বাণী সঞ্চারিত করিলেন এবং তাঁহার কাছে অধ্যয়ন করিলেই যে বিদ্যার্থীরা 'সুমেধাঃ' হইবে, এইরূপ আদেশ করিলেন। সেই দিন হইতেই শুক্রাচার্য্যের নাম হইল—'কবি'।

কিছুক্ষণ পরে বাগ্‌দেবী সরস্বতী ফিরিয়া আসিয়া সেখানে পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময়ে সহসা সমাগত মহর্ষি বাল্মীকি, বাগ্‌দেবীর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্যের আশ্রম দেখাইয়া দিলেন। সরস্বতী সেখানে পুত্রকে দেখিতে পাইয়া শিরশ্চুম্বন করিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন এবং মহর্ষি বাল্মীকিকেও নিভৃতে পদ্য রচনায় দীক্ষিত করিলেন।

তার পর একদিন মহর্ষি তমসা নদীর তীরে দেখিতে পাইলেন যে, নিষাদের বাণে সহচরী নিহত হওয়ায় ক্রৌঞ্চ যুবা, করুণ স্বরে কাঁদিতেছে। এই দৃশ্যে তিনি শোকাকুল হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন,—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কাম মোহিতম্॥"

অনেকের বিশ্বাস যে, উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকটাই প্রথম কবিতা। কিন্তু রাজশেখরের এই 'কাব্য মীমাংসা' গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার অনেক পূর্ব্বে সারস্বতেয় কাব্যপুরুষ—"যদেতদ্ বাঙ্ময়ং বিশ্বং..." ইত্যাদি শ্লোক উচ্চা-

রূপ করিয়া বাগ্‌দেবী সরস্বতীকেও বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

এই সারস্বতের কাব্যপুরুষের সহিত বিদর্ভদেশে বৎসগুল্ম নগরে ঔমেয়ী সাহিত্য-বিদ্যাবধূর গান্ধর্ব্ব বিবাহ হয়। ইনি উমার সঙ্কল্প-প্রভবা কন্যা, তাই ইঁহার নাম—ঔমেয়ী। নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া এই বধূবর, যেখানে গৌরী এবং সরস্বতী দুই জনে বিরাজিত ছিলেন; সেই হিমালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। দম্পতি, প্রণাম করিলে তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন যে, "তোমরা চিরকাল কবির হৃদয়ে বাস করিবে।" রাজশেখর, কাব্যপুরুষের এই উৎপত্তি বৃত্তান্ত শ্রবণের ফল-শ্রুতিতে লিখিয়াছেন,—

"ইত্যেষ কাব্যপুরুষঃ পুরা সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা।
এবং বিভজ্য জানানঃ প্রেত্য চেহ চ নন্দতি॥"

শিশুদের খাদ্য সম্বন্ধে একটী কথা।

[শ্রীমাধবচন্দ্র মিত্র]

মাতৃদুগ্ধই যে শিশুর পক্ষে আদর্শ খাদ্য,এ বিষয়ে ভগবান যেমন নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, বৈজ্ঞানিকগণও স্থির সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। দুগ্ধের ভিতর ছানা, মাখন, চিনি ও জল রাসায়নিক উপায় দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি মানুষের শরীর গঠন করে ও দেহে কার্য্যশক্তি সঞ্চার করে। কিন্তু দুগ্ধের ভিতর আর একটী জিনিষ আবিষ্কার হইয়াছে; ইহাকে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বাহির করা যায় না, কিন্তু জীব-শরীরের উপর পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহার অভাব হইলে দেহ রোগাক্রান্ত এবং ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া আসিতে থাকে। ইহাকে ইংরাজি ভাষায় ভিটামিন বলে। ইহার রাসায়নিক উপাদান আবিষ্কৃত হয় নাই বটে, কিন্তু ইহা যে কেমন ভাবে অশরীরি অবস্থায় খাদ্যের ভিতর অবস্থান করে গবেষণার বিষয়। রন্ধনাদি ব্যাপার দ্বারা ইহা খাদ্য হইতে একেবারে বিতাড়িত হয় না, কিন্তু ইহার শক্তি অনেকটা কমিয়া যায়।

উদ্ভিদের ভিতর এই ভিটামিন জন্মে এবং জীবদেহ তথা হইতে ইহা গ্রহণ করে। দুগ্ধের ভিতর এইরূপে ভিটামিন চলিয়া আসে। কিন্তু শাকসবজি প্রভৃতির ভিতর হইতে যদি কম পরিমাণে ভিটামিন মাতৃদেহে নীত হয় দুগ্ধেও ইহা কম পরিমাণে দেখা যায়। সুতরাং শিশুর দেহ রোগশূন্য ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইলে ভিটামিন গ্রহণ সম্বন্ধে মাতার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মাতৃদেবীদের অবগতির জন্য ভিটামিন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল। ভিটামিন দুগ্ধে, চর্ব্বিতে, ডিমে, শাকসবজিতে ও পাতার কুঁড়িতে, তৈলাক্ত মৎস্যে, অঙ্কুরিত বীজে, বাদামে, লেবুতে, টোমাটোতে, কলা প্রভৃতি ফলে প্রচুর পরিমাণে আছে। যাহারা মাংস খাইতে চায় তাহাদের জানা উচিত যে চর্ব্বিতে, কলিজাতে, মেটেতে ভিটামিন পাওয়া যায়। মাতারা সন্তানদের পুষ্ট করিতে চাহিলে তাহাদের খাদ্য নির্ব্বাচন এই তালিকা দেখিয়া করিবেন। তাঁহারা স্মরণ করিবেন যে, কৌটাবদ্ধ যে সব খাদ্য পাওয়া যায় তাহাতে ক্ষারজাতীয় পদার্থ দ্বারা খাদ্য বেশীদিন অবিকৃত রাখিবার উপায় করা হয়, কিন্তু ইহাতে ভিটামিন নষ্ট হইয়া যায়। যে সব মাতা অনেক সন্তান প্রসব করিয়াছেন এবং যাঁহাদের দেহ রোগে রক্তশূন্য হইয়া আসিয়াছে, তাঁহাদের দুগ্ধে ভিটামিন কম দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের ভিটামিন সংযুক্ত খাদ্য সম্বন্ধে মনোযোগী হওয়া উচিত। যখন তাঁহাদের স্তন দুগ্ধ কমিয়া আসিতে থাকে, তখন সন্তানকে গোদুগ্ধ খাওয়াইতে পারেন। এই গোদুগ্ধে মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা মাখন ও চিনি কিছু কম আছে। যখন গোদুগ্ধ শিশুকে খাওয়ান হয় তখন মনোযোগী হওয়া উচিত যে, গাভী কিরূপ খাদ্য পাইতেছে। তখন গো

মাতার স্বাস্থ্যভিত্তিক, এবং তাহার খাদ্যে কিরূপ ভিটামিন আছে যত্ন লওয়া উচিত। কলিকাতা প্রভৃতি সহরের গাভীতে শুক্না বিচালী চর্ব্বণ করিয়া দিন কাটায়, সবুজ তৃণের সহিত ইহাদের সাক্ষাৎ হয় না, সুতরাং বিবেচনা করা যাইতে পারে ইহাদের দুগ্ধে ভিটামিন কত কম পরিমাণে অবস্থান করে। এই দুগ্ধ শিশুদের পান করিতে দিলে ভিটামিন অতি সামান্যই পাওয়া যায়। তাহার উপর আবার সেই দুগ্ধ বিশেষ ভাবে জ্বাল দেওয়া হয়। এটা মনে রাখা উচিত যতই বেশী জ্বাল দেওয়া যাইবে ভিটামিন তত কমিতে থাকে। যখন শিশুর দাঁত উঠিতে থাকে তখন এই গরম দুগ্ধের সহিত ডিম গুলিয়া দিলে প্রচুর ভিটামিন প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কমলা লেবু শিশুদিগকে দিলে এ বিষয়ে সাহায্য হয় এবং টোমাটোর রসও বিশেষ উপকারী।

গাভীকে সবুজ ঘাস খাওয়ানর চেষ্টা করা উচিত। যদি এসব সম্ভব না হয়, তবে সহরের বাজারের দুগ্ধের উপর আস্থা করা উচিত নহে। শিশুকে পল্লীগ্রামের দিকে লইয়া যাওয়া উচিত। সেখানে গাভী প্রচুর সবুজ তৃণ পল্লব ভক্ষণ করে এবং দুগ্ধে প্রচুর ভিটামিন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

ব্যর্থতা—ছোট গল্পের বই—শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও ৫০ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট্ হইতে শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৸০ বার আনা।

এই ক্ষুদ্র গল্পপুস্তকখানি 'ব্যর্থতা', 'কমলা' ও "প্রত্যাবর্ত্তন' শীর্ষক তিনটী স্বতন্ত্র ছোট গল্পের সমষ্টি। কিন্তু গল্পত্রয়ের পরস্পরে এমন একটা সংযোগ আছে যাহাতে প্রত্যেকটী আকারে বিভিন্ন হইলেও এক, তাই 'ব্যর্থতা' নামকরণটী সুনির্ব্বাচিত হইয়াছে। নায়ক-নায়িকার চরিত্রগুলি ব্যথায় ভরা। লেখক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন ব্যথায় তাহাদিগকে শান্তি দিতে, বিপথে পথ দেখাইতে, তাহাদের কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্ধারণ করিতে।

একান্ত অসহায় হিন্দু বিধবা কেমন করিয়া আত্মসম্ভ্রম বজায় রাখিয়া স্বাবলম্বনে দিনপাত করিতে সমর্থ হয়, গ্রন্থকার তাহা নিপুণভাবে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। বর্ত্তমান চরকা প্রচলন যুগে এই গল্প-রচনার উদ্দেশ্যটুকু সফল হইবে।

পতি-পরিত্যক্তা স্ত্রীও যে একান্ত অসহায় নহেন, তিনিও যে ধর্ম্মপথে থাকিয়া জীবনের কর্ত্তব্য-গুলি সুসম্পাদিত করিতে পারেন 'কমলা'-চরিত্রটী তাহার উদাহরণ।

প্রথম গল্পে গ্রন্থকার পাপ করিয়াছেন—সম্ভবতঃ নিজের অজ্ঞাতসারে কন্যাস্থানীয়া ইন্দিরাকে নায়ক নরেশচন্দ্রের প্রণয়পাত্রী করিয়া সৃষ্টি করিয়া। আশা করি, ৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ পাঠ করিয়া লেখক পর-সংস্করণে এই ত্রুটী সংশোধন করিয়া লইবেন।

বর্ষায় ব্যাঙের ছাতার মত বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিনিয়তঃ অসার গল্প গজাইয়া উঠিতেছে। এই অপাঠ্য গল্প সাহিত্য-যুগে দু' একটী ভাল গল্প পাইলে আনন্দ হয়। সমালোচ্য পুস্তকখানি পাঠে দেশের অনেক উপকার হইবে, সেইজন্য ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

১৯শ ভাগ] } চৈত্র, ১৩২৮। { [২য় সংখ্যা

ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে ভারতের কথা।

[সেক্ষপীয়র—মিল্টন]

(শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ, বি-এল)

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সেক্ষপীয়রের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। তিনি ভারতবর্ষকে সমগ্র আসিয়া ভূ-খণ্ড বা প্রাচ্য-জগৎ ধরিয়া লইয়া ষ্টিফানো মাতালের মুখ দিয়া বলিয়াছেন—"Do you put tricks upon us with savages and men of Ind?" (Tempest II, 2. 62)। ইণ্ড নামক দেশের লোকেরা যে অসভ্য এ কথা কবি অন্যত্র বলিয়াছেন। "Like a rude man of Inde." (Love's Labour's Lost IV. 3. 222)। সেক্ষপীয়রের সময়ে ইণ্ড বা ইণ্ডিজ বলিলে পূর্ব্ব-ইণ্ড অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া মালয় উপদ্বীপ পর্যান্ত সমুদয় ভূভাগ ও পশ্চিম-ইণ্ড বা আমেরিকা বুঝাইত। এই ব্যাপক অর্থে সেক্ষপীয়র ইণ্ড ও ইণ্ডিজ শব্দ কয়েকবার ব্যবহার করিয়াছেন। "Where America, the Indies?"—(Comedy of Errors III. 2. 137)। "Our King has all the Indies in his arms"—(King Henry VIII—IV. 1. 45)।

"From the east to western Ind,
No jewel is like Rosalind
(As You Like It III. 2. 94)

সেক্ষপীয়রের সময়ে ইণ্ডিয়া অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও ইণ্ডিজ যে ধনরত্নের জন্য বিখ্যাত ছিল ইহার প্রমাণ কবির অনেকগুলি নাটকে পাওয়া যায়। সেক্ষপীয়রের সমসাময়িক ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সময় হইতেই ইংরাজগণ আমেরিকা ও প্রাচ্য দেশসমূহে যে বাণিজ্য বিস্তার করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কবির সমসাময়িক এই ঘটনাবলীর প্রভাব সেইজন্য আমরা তাঁহার নাটকে অনুভব করি। ভারতবর্ষের খনিজ ধনরাশির উল্লেখ করিয়া সেক্ষপীয়র বলিয়াছেন,—"As bountiful as the mines of India (I King Henry IV—III. 1. 169)। ভারতের মণিরত্নাদির কথা স্মরণ করিয়া কবি লিখিয়াছেন,—"Her bed is India; there she lies a pearl." (Troilus and Cressida I. 1. 105)। সেক্ষপীয়রের ন্যায় প্রতিভাশালী কবির কল্পনা যে ভারতের ঐশ্বর্য্যের কথা লইয়া বারংবার আলোচনা করিয়াছে, তাহার কারণ কবির সমসাময়িক সমাজে তৎসম্বন্ধে বিস্তর সংবাদ প্রচারিত হওয়াতে হাটে ঘাটে রঙ্গালয়ে সকলেই ঐ কথার চর্চ্চা করিয়া বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করিত।

এতদ্ব্যতীত, ফরাসীর সৌভাগ্য-রবি ইংরাজ জাতির হৃদয়ে যে আশা সঞ্চারিত করিয়াছিল তাহার আশ্রয় স্বরূপ ভারত-সাম্রাজ্যের চিত্র ইংরাজের মানস-চক্ষে ফুটিয়া উঠিতেছিল। জাতীয়-হৃদয়ের ঈর্ষ্যা আশা ও আকাঙ্ক্ষার দিক লক্ষ্য রাখিয়া সেক্ষপীয়র লিখিয়াছেন,—

"Today the French
All clinquant, all in gold, like heathen gods,
Shown down the English ; and to-morrow they
Made Britain India"
(King Henry VII—I. I. 421)

সেক্ষপীয়রের সময়ে য়ুরোপীয়েরা উভয় ইণ্ডিজের অন্তর্গত দেশসমূহ আবিষ্কার করিয়া মানচিত্রে তাহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছিলেন। কবি এই ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া ব্যঙ্গ রচনা করিয়াছেন। "He does smile his face into more lines than are in the new map with the augmentation of the Indies." (Twelfth Night III. 2. 88)। অন্তানুবাদ—তিনি হাসিলে তাঁহার মুখমণ্ডলে এত বেশী রেখা ফুটিয়া উঠে যে, ইণ্ডিজ জুড়িয়া দিয়া যে নূতন মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতেও তত রেখা দেখা যায় না। সেক্ষপীয়র রসতত্ত্বের গুরু ছিলেন। তাঁহার নাট্য-কাব্যে যেখানে যে-ভাবে ভারতের উল্লেখ করিতে পারা যায়, সেখানে সেইভাবে তিনি উল্লেখ করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহার সমকালে ইণ্ডিজের সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্য যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল তাহাতে ইংরাজের জাতীয়-হৃদয় যে নাট্য-সাহিত্যের ভিতর দিয়া বিকশিত হইবে ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইংরাজ বণিকের উচ্চাভিলাষ অমর কবি কেমন সুন্দর ভাবে একটি ছত্রে বর্ণন করিয়াছেন! "Here's another letter to her : she bears the purse too ; she is a region in Guiana ; all gold and bounty : I will be cheator to them both, and they shall be exchequers to me : they shall be my East and West Indies, and I will trade to them both." (The Merry Wives of Windsor I. 3. 77)।

সেক্ষপীয়রের নাটকগুলির রচনাকাল ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অতি সামান্য তথ্য কবি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে স্থায়ীরূপে অধিষ্ঠিত হইলে ইংরাজেরা এদেশ সম্বন্ধে অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে অভিনীত মিল্টনের "কোমস" নামক কাব্যে আমরা ইণ্ডদেশের উল্লেখ দেখিতে পাই। "Twixt Africa and Ind, I'll find him out" (৬০৫ ছত্র)। উক্ত কাব্যে প্রভাতবর্ণন করিয়া কবি লিখিয়াছেন,—

"Ere the blabbing eastern scout,
The nice morn on the Indian steep,
From her cabined loop hole peep,
And to the tell-tale Sun descry
Our concealed solemnity."—(১৩৮ ছত্র)

এই শ্লোকে কবি বলিতেছেন যে, প্রভাত যেন দুর্গ-রক্ষকের ন্যায় গৃহের দেয়ালে ছিদ্রের ভিতর দিয়া দেখিতেছেন আর তিনি এইরূপে ভারতবর্ষের অত্যুচ্চ কোনও পর্ব্বতের শিখরে যাহা দেখিলেন সূর্য্যকে তাহা জানাইয়া দিলেন।

মিল্টনের "প্যারাডাইজ লষ্ট" নামক মহাকাব্য ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই মহাকাব্যের প্রথম সর্গের ৭৮১ ছত্রে কবি লিখিয়াছেন,—"pygmean race beyond the Indian mount"—মিল্টন বোধ হয় হিমালয় পর্ব্বতের কথাই এইস্থলে বলিয়াছেন। প্যারাডাইজ লষ্টের দ্বিতীয় সর্গের সূচনাতে কবি ইণ্ড দেশের ঋদ্ধির কথা লিখিয়াছেন। "The wealth of Ormus and of Ind" (২ ছত্র)। পঞ্চম সর্গের ৩৩৯ ছত্রে পূর্ব্ব ও পশ্চিম ইণ্ডিয়ার উল্লেখ করিয়া সেক্ষপীয়রের ন্যায় ইণ্ডিজের আভাস দিয়া মিল্টন লিখিয়াছেন,—"In India East or West." মিল্টনের ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বিষয় চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্যারাডাইজ লষ্টে প্রাচ্য জগতের অনেক স্থানের উল্লেখ আছে। আসিয়া ভূ-খণ্ডের কথা মিল্টন কয়েকবার লিখিয়াছেন। বাইবেল ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত প্রাচ্যের প্রায়

কোনও স্থান উল্লেখ করিতে কবি ভুলেন নাই। একথা বলিলে সামান্য অত্যুক্তি হয় মাত্র। তাতার ও চীনদেশের কথাও উক্ত মহাকাব্যে আছে। মিল্টন "প্যারাডাইজ রিগেণ্ড" নামক তাঁহার দ্বিতীয় মহাকাব্যে যেখানে সেকেন্দার কর্ত্তৃক আসিয়া জয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, সেস্থলে তিনি যে ভারতবর্ষ আক্রমণের কথা ইঙ্গিতে বলিয়াছেন, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

"The son
Of Macedonian Philip ere these
Won Asia"—
(Paradise Regained III. 33)

প্যারাডাইজ রিগেণ্ডে শয়তানের ভ্রমণ বৃত্তান্তে পৃথিবীর নানাস্থানের উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষ, মালয় উপদ্বীপ ও সিংহলের কথা একটি শ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

"From the Asian kings (and Parthian among these)
From India and the Golden Chersoness,
And utmost Indian isle Taprobane,
Dusk faces with white silken turbans wreathed"—
(Paradise Regained IV. 73)

এই শ্লোকে 'টেপ্রোবেন' অর্থাৎ সিংহল ও 'গোল্ডেন চারশনেশ' অর্থাৎ মালয় উপদ্বীপের যে উল্লেখ দেখা যাইতেছে তৎসম্বন্ধে মিল্টনের টীকাকারগণ বলেন যে, রোমান সম্রাট অগষ্টস্ কিম্বা টাইবেরিয়সের নিকট ভারতবর্ষ হইতে রাজদূত গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সিংহল ও মালয় উপদ্বীপ হইতে গমন করেন নাই। 'গোল্ডেন চারশনেশ' বা মালয় উপদ্বীপের উল্লেখ মিল্টন একাধিকবার করিয়াছেন। আগ্রা, লাহোর ও মোগল সম্রাটের কথাও কবি শুনিয়াছিলেন।

"and thence
To Agra and Lahore of Great Mogul,
Down to the golden Chersonese"—
(Paradise Lost XI. 390)

কালিদাস মেঘদূত নামক কাব্যে যেমন যক্ষের মুখ দিয়া ভারতের নানাস্থানের উল্লেখ করিয়া শেষে অলকার বর্ণনা করিয়াছেন, মিল্টনও সেইরূপ 'প্যারাডাইজ লষ্ট' ও 'প্যারাডাইজ রিগেণ্ডে' যখনই দূরতম স্থানে কাব্যের কোনও পাত্রকে গমন করিতে হইয়াছে সেই উপলক্ষে পৃথিবীর প্রধান স্থান সকলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গঙ্গা ও সিন্ধুনদের উল্লেখ করিয়া কবি প্রকারান্তরে ভারতের প্রধান নদ-নদীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। "As far as Indus east"—(Paradise Regained III. 272) "Ganges or Hydaspes Indian streams" (Paradise Lost III. 436) "thence to the land where flows Ganges and Indus" (Paradise Lost IX. 82) মিল্টন বাঙ্গালা দেশেরও উল্লেখ করিয়াছেন। "Close sailing from Bengala" (Paradise Lost II. 638) মিল্টনের সময়ে ভারতবর্ষের সহিত ইংরাজবণিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত করাতে ইংরাজি ভাষার সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্যে ভারতের বিখ্যাত নদি নদী ও স্থানসমূহের এত বেশী উল্লেখ দেখা যায়। তবে, মিল্টন যে কেবল সমসাময়িক ইংরাজ পর্য্যটকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করিবার কোনও কারণ নাই। তিনি লাটিন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। রোমান গ্রন্থকারগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা কথা লিখিয়া রাখিয়াছেন। মিল্টন সেই সকল পাঠ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাহারও নিদর্শন তাঁহার কাব্যে পাওয়া যায়। এমন কি, যেখানে প্লিনি (Pliny) ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, মিল্টনও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া সেই ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ণনা-বিশেষ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে প্যারাডাইজ লষ্ট হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল :—

"So counselled he, and both together went
Into the thickest wood. There soon they chose
The fig-tree—not that kind for fruit renowned,
But such as, at this day, to Indians known,
In Malabar or Decan spreads her arms
Branching so broad and long that in the ground

The bended twigs take root, and daughters grow
About the mother tree, a pillared shade
High overarched, and echoing walks between :
There oft the Indian herdsmen, shunning heat,
Shelters in cool, and tends its pasturing herds
At loop-holes cut through thickest shade. Those leaves
They gathered, broad as Amazonian targe,
And with what skill they had together sewed,
To gird their waists"—
(Paradise Lost IX. 1099).

আদম ও হবা জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদ করিবার পর যাহা করিয়াছিলেন তাহা বর্ণন করিয়া মিল্টন বলিতেছেন যে, তাঁহারা নগ্নতা আচ্ছাদন করিবার জন্য নিবিড় বনমধ্যে গমন করিলেন এবং যে বটবৃক্ষ ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে অসংখ্য ঝুরিদ্বারা রক্ষিত সুদীর্ঘ-শাখায় পরিশোভিত হইয়া ছায়াশীতল বনপথের সৃষ্টি করিয়া থাকে, সেই প্রকার বটবৃক্ষের প্রকাণ্ড পত্রসকল আহরণ করিয়া সেগুলিকে যে কোনও উপায়ে সীবন পূর্ব্বক তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিলেন। বলা বাহুল্য, কদলীবৃক্ষের সুবৃহৎ পত্রকে বটবৃক্ষের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পত্রের স্থানে কল্পনা করিয়া মিল্টন যে ভুল করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি নিজে দায়ী নহেন। উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিদ্‌ রোমান পণ্ডিত প্লিনির (২৩—৭৯ খৃষ্টাব্দ) প্রাকৃতিক ইতিহাসে এই ভুল আছে। মিল্টনের সমসাময়িক ইংরাজপণ্ডিত জিরার্ড (Gerard) প্লিনির যে অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহাতেও এই ভুল রহিয়া গিয়াছিল। মিল্টনের টীকাকারগণ বটপত্র সম্বন্ধে কবির এই ভ্রমের উল্লেখ করিলেও ইংরাজি সাহিত্যের সুবিখ্যাত সমালোচক ষ্টপফোর্ড ব্রুক (Stopford Brooke) মিল্টনের রচনাভঙ্গী সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন,—"It is like the fig-tree he describes."—ইংরাজি ভাষার সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য যে কবি লিখিয়াছেন তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভার চিত্র যে ভারতের বটবৃক্ষের অনুরূপ ইহা ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। বাস্তবিক, ইংরাজ বণিক যে সময়ে ভারতবর্ষ হইতে ধনরত্নাদি স্বদেশে লইয়া গিয়া জাতীয় ধনাগার পরিপূর্ণ করিতেছিলেন, ইংরাজ কবি সেই সময়ে ইংলণ্ডের কাব্য-ভাণ্ডারে ভারতের খণ্ড-চিত্র সংগ্রহ করিতেছিলেন। আমরা ইতিহাস পাঠ না করিয়াও কেবল ইংরাজি কাব্য-সাহিত্য হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা উপাদেয় তথ্যের সংবাদ পাইতে পারি। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর যে চিত্রাবলী ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে তাহাতে এমন একটি আশ্চর্য্য ধারাবাহিকতা লক্ষিত হয় যে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বিদায়।

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(২২)

কাত্যায়নী যে অনিলের নিকটে গিয়াছিলেন তাহা সুখদার নিকটে গোপন রহিল না। তিনি রাগে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। সকলেই তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইতেছে ইহাও কি সম্ভব? তিনি যত সকলকে নিজের মুঠার মধ্যে রাখিতে চান, ততই সকলে তাঁহার হাত ছাড়াইয়া পলাইতেছে।

তিনি যখন কাত্যায়নীর গৃহে সশব্দে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন কাত্যায়নী পূজার গৃহে গলায় কাপড় দিয়া পড়িয়াছিলেন। আজ পূজা করা তাঁহার হয় নাই, পূজার সাজ অমনিই পড়িয়া আছে। কি করিলে ঠাকুর—কি করিলে—এই কথাটাই তাঁহার বক্ষ ভেদ করিয়া কেবল বাহির হইতেছিল। তাঁহার চোখ দিয়া সঙ্গে সঙ্গে অজস্র ধারে অশ্রুধারা ঝরিতেছিল।

পিছনে কাত্যায়নীর পদশব্দ পাইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। গণ্ডদেশপ্রবাহি অশ্রুমালা মুছিয়া তিনি চাহিলেন। সুখদা গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "বউ, অনিলকে কি এমনি করেই আমার বুক হ'তে ছিনিয়ে নিলে ?"

কাত্যায়নী কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "ভুল মা ভুল। অনিল আমার কাছেও আসে নি। যদি আমার কাছেও ধরা দিত—তা হলেও যে আমি তাকে রক্ষা করতে পারতুম। সে ধরা দিলে না মা, সে আমারও হাত এড়িয়ে চলে গেল। এখন সে মরণের পথে দাঁড়িয়েছে মা, যদি তাকে বাঁচাতে চাও, তবে চিকিৎসা করাও। তোমার পায়ে পড়ি মা, কলকাতা হ'তে ডাক্তার আনাও, নয় তাকে কলকাতায় নিয়ে চল, নচেৎ তাকে আর বাঁচাতে পারব না।"

সুখদা দমিয়া গেলেন—"কি হয়েছে তার ?"

কাত্যায়নী রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তার লীভারে ব্যথা হয়েছে, অতিরিক্ত মদ খাওয়ায় লীভার বোধ হয় পেকেছে।"

সুখদার চোখের সম্মুখে পৃথিবী ঘুরিয়া উঠিল, তিনি দরজা চাপিয়া ধরিলেন—নচেৎ বোধ হয় পড়িয়া যাইতেন।

হঠাৎ সচকিত ভাবে তিনি বহির্বাটী অভিমুখে ছুটিলেন।

অনিল তখন যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল। লীভারে ব্যথা অনেক দিন হইয়াছে, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া সে আরও মদ খাইয়াছে। ব্যথা বাড়িয়া উঠিল, তখন যন্ত্রণা নিবারণের জন্য মদ খাইতে লাগিল। আজ ভোর হইতে অসহ্য যন্ত্রণা ধরিয়াছে, সে অস্ফুট চীৎকার করিতেছিল।

সুখদা দরজায় দাঁড়াইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর অগ্রসর হইয়া তাহার বিছানার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। পদশব্দ পাইয়া অনিল চোখ মেলিল, তাহার চোখ দিয়া দুই বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল।

"কাঁদছিস কেন দাদা ?" সুখদা তাহার চোখ মুছাইয়া দিলেন, নিজের চোখকে কোনমতে তিনি সামলাইয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না।

অনিল একটাও কথা কহিতে পারিল না।

সুখদা বাহিরে আসিয়া দেওয়ানকে ডাক্তার আনিতে আদেশ দিলেন। বাড়ীময় একটা বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। কাত্যায়নী পুত্রের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন।

আর পূর্ণিমা! তাহার যন্ত্রণা কি বর্ণনা করিবার? তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জাগিয়াছিল তাহার জন্যই অনিল অত্যন্ত মদ খাইয়াছে, তাহার জন্যই সে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

ঠাকুরঘরে গিয়া সে গলায় কাপড় দিয়া লুটাইয়া পড়িল—ভাল করে দাও ঠাকুর—ভাল করে দাও, যদি প্রাণ বিনিময়ে কোন প্রাণ দিতে হয়, আমি আমার এ তুচ্ছ হীন প্রাণ দিতে রাজি আছি। আমার বেঁচে থেকে লাভ কি ঠাকুর? যে জীবন অমূল্য তাই রক্ষা কর।

ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিলেন; মদ বন্ধ করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। অনিল মাথা নাড়িল—"না তা হবে না, আমি ওষুধ খাব না, মদ আমার চাই-ই, মদ না হলে আমি বাঁচব না।"

সুখদা স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া গিয়া তীব্রকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিলেন—"অনিল!"

কাঁদিয়া কাত্যায়নী বলিলেন, "তোমার পায় পড়ি মা, এখন কঠোর ব্যবহার করো না, তাতে আরও কুফল হবে, ওর মনে আরও আঘাত লাগবে। এখন মিষ্ট কথায় ওর মনকে প্রফুল্ল করে রাখতে হবে, মিষ্ট কথা বলে ওষুধ খাওয়াতে হবে।"

সুখদা চোখে অগ্নি বর্ষণ করিয়া বলিলেন, "বউ মা, তুমিই আগাগোড়া প্রশ্রয় দিয়ে ছেলেটাকে মাটী করলে। আমি সাধে তোমায় ডাইনি বলি। তোমারই নিশ্বাস লেগে অনিল মরতে বসেছে; তোমার নিশ্বাস এমনই ভয়ানক—এমনই বিষাক্ত জেনে রেখো। তুমি ওর কাছে থাকলে কখনও ভাল হতে পারবে না তা আমি বলে দিচ্ছি। আমি আদেশ করছি, তোমাকে এখনি এ ঘর ছেড়ে যেতে হবে, আমি নিজে সেবা করব, তোমার সেবার দরকার নেই,

কাত্যায়নীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সুখদা ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন, "যাও বলছি।"

অনিল চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় বাস্তবিক সে ঘুমাইতেছে। কিন্তু সে ঘুমায় নাই, স্তিমিত ভাবে পড়িয়াছিল। সুখদার কঠোর আদেশ কানে আসিবা মাত্র সে চাহিল—"কে যাবে?"

সুখদা ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তোর মা।"

"না—মা আমার কাছে থাকবে। মা, আমার মাথা তোমার কোলে তুলে নিয়ে আমার বুকে একটু হাত বুলিয়ে দাও তো।"

অনিল মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে চক্ষু মুদিল। সুখদার বুকের মধ্যে নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। হরিবোল হরি, ছেলে মায়ের, মা ছেলের; তিনি কোথাকার কে? তাঁহার সকল আশাই তো ফুরাইয়া গেছে, একটা আশা যাহা ছিল তাহাও গেল। পুত্রবধূকে তিনি বরাবর এই একটা প্রধান অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ সে এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আর কি তাঁহাকে মানিবে?

সুখদা একবার তীব্র নেত্রে চাহিয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দিনের পর দিন আসিল, অনিলের অবস্থাও ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল।

রবীন যে মুহূর্ত্তে বাল্যবন্ধু অনিলের এই সাংঘাতিক ব্যারামের খবর পাইল, সেই মুহূর্ত্তেই আসিয়া পড়িল। জীর্ণ শীর্ণ দেহ অনিলকে দেখিয়া সে চোখের জল সামলাইতে পারিল না।

অনিল তাহাকে দেখিয়া বাস্তবিক একটু শান্তি পাইল। তাহার মনে পড়িল, যখন সে ক্রমাগত মদের নরকে ডুবিয়া যাইতেছিল তখন রবীন একদিন তাহাকে উপদেশ দিয়া ফিরাইতে আসিয়াছিল, কিন্তু সে তাহার একটা কথাও শুনে নাই। অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াই রবীন ফিরিয়া গিয়াছিল কিন্তু বলিয়া গিয়াছিল, "একদিন এমন আসতে পারে অনিল যেদিন আমার কথাগুলো বুঝবে, সেই দিন আবার আমায় চাইবে।"

ব্যারামে পড়িয়া অনিলের মনে রবীনের কথাগুলি উদয় হইয়াছিল। একবার রবীনকে দেখিবার জন্য—তাহার সহিত শেষ দুইটা কথা কহিবার জন্য সে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সে তাহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিল, কিন্তু রবীন তখন এখানে ছিল না, সে কলিকাতায় গিয়াছিল, আজ প্রাতে ফিরিয়া অনিলের অসুখ শুনিয়াই আসিয়াছে।

রবীন অনিলের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "কেমন আছ ভাই?"

অনিল একটু ম্লান হাসিল মাত্র।

রবীন বলিল, "হাসলে যে?"

অনিল ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "ভাই, মরণের দ্বারে যে, তাকে জিজ্ঞাসা করাই বোকামী। আমি এখন যাচ্ছি যে, আমাকে আর জিজ্ঞাসা করছো কেন?"

রবীন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাত্যায়নীর পানে চাহিয়া বলিল, "মা, কলকাতায় নিয়ে যান নি কেন?"

কাত্যায়নী রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "অনিল যাবে না।"

রবীন অনিলের পানে ফিরিয়া বলিল, "কলকাতায় যাও নি কেন অনিল? সেখানে গেলে যে ভাল হয়ে যেতে।"

অনিল তাহার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "বেঁচে আমার লাভ কি ভাই? বাঁচবে তারা, যারা ভাল হবে, নিজের জীবন উন্নত করতে পারবে। আমি বাঁচলেও যে কোনও ফল হবে না। দিন দিন এ আগুনে কেবল ঘি ঢালা—আগুন আরও জ্বলবে—আমি আরও জ্বলব। আমি ইচ্ছা করেই যে মরছি ভাই!"

রবীন বিস্ময়ে বলিল, "ইচ্ছা করে?"

অনিল কাত্যায়নীর পানে চাহিয়া বলিল, "মা, তুমি উঠে যাও।"

কাত্যায়নী চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া গেলেন। অনিল রবীনের পানে ফিরিয়া বলিল, "মরণের দুয়ারে দাঁড়িয়ে মিছে কথা বলব না রবীন। আমি কল্যাণীকে ভালবেসেছি, সেই ভালবাসাই আমার মৃত্যুর কারণ।"

এক নিমেষে রবীন সব বুঝিতে পারিল। তাহার চোখের সম্মুখে অনেকদিন পূর্ব্ব হইতে পাতলা একটা কালো পর্দা দোদুল্যমান ছিল, আজ তাহা অনিলের এই একটা কথায়

সরিয়া গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে মৃদু কণ্ঠে বলিল, "হতভাগা—"

"হতভাগা—বাস্তবিকই আমি বড় হতভাগা ভাই—"

অনিল কনুইয়ের উপর ভর দিয়া উঠিতে গেল। উদরে ব্যথা লাগিতেই অস্ফুট একটা রব করিয়া সে শুইয়া পড়িয়া হাঁফাইতে লাগিল। রবীন তাড়াতাড়ি তাহাকে বাতাস করিতে করিতে তিরস্কারের সুরে বলিল, "ওকি, অমন করে উঠছো কেন বল তো? তোমায় বারবার বলছি, সাবধান, একটুও নড়ো না। নড়া একেবারে তোমার নিষেধ, তা তুমি কেন শুনতে চাও না?"

অনিল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি তো মরবই ভাই, তবে এতটা সাবধানতার দরকার কি?"

রবীন রাগত ভাবে বলিল, "কে তোমাকে ঠিক করে বলবে যে তুমি মরবেই? বেশী পাগলামী কোরো না। যা বলছিলে বল। কল্যাণীকে ভালবেসেছিলে, তাকে পাওনি তাই তুমি মদ খেয়েছো, তাই তুমি মরবে? এটা যে তোমার ছেলেমানুষী করা। ভালবাসে না কে কাকে বল তো? সবাই সবাইকে ভালবাসে, তা বলে' কে তোমার মত মদ খায়, তোমার মত মরব মরব বলে' লাফায়?"

অনিল ধীর সুরে বলিল, "আমি যে তাকে চাই রবীন।"

রবীন। "বেশ, আমি তাকে এখনি আনছি।"

রোগীর বুকের রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল, মুখখানা ঘোর লাল হইয়া অমনি সাদা হইয়া গেল, রুদ্ধশ্বাসে সে বলিল, "কাকে? কাকে আনবে?"

প্রশান্ত ভাবে রবীন বলিল, "কল্যাণীকে। শুনলুম তুমি কারও হাতে ওষুধ খাও না. সে তোমায় ওষুধ খাওয়াবে, সে তোমায় বাঁচাবে। যদি সে তোমায় বাঁচাতে পারে তবে ধর্ম্মানুসারে তুমি তারই। তুমিও সেটা প্রতিজ্ঞা কর, কারণ সে তোমার প্রাণকে কিনে নেবার জন্যেই আসবে।"

অনিল দুই হাতে মুখ ঢাকিল। "না না রবীন, তাকে এনো না—তাকে আমি চাই নে। আমি মহাপাপী, আমি তাকে ভুলতে—"

রবীন বলিল, "তুমি তাকে ভুলতে পারনি, সে তো ভাল কথাই। তুমি না চাইলেও সে আসবে। কারণ তার কাজই দুস্থ রোগীর সেবা করা, তার প্রাণকে কিনে নেওয়া। সে কাজ করতে এসেছে যখন, তখন তাকে কাজ দেওয়াই উচিত। তুমি একটু থাকো, আমি তাকে এখনি নিয়ে আসছি।"

কাত্যায়নীকে ডাকিয়া সে বলিল, "মা, আপনার শরীর বড় খারাপ হয়ে গেছে। সময়ে খাওয়া, ঘুম কিছু হচ্ছে না। আমি একটী সেবাকারিণী আনতে চাই, সে সেবা করবে, আপনার কিছু ভাবতে হবে না। আমি আজই কলকাতা হ'তে বড় ডাক্তার আনছি। কিছু ভয় নেই, আপনার ছেলে শীগগির ভাল হয়ে যাবে।"

আনন্দে মাতার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

ঘণ্টাখানেক পরেই রবীন কল্যাণীকে সঙ্গে লইয়া যখন ফিরিল, তখন কাত্যায়নী ও সুখদা একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সুখদা জনশ্রুতি কতকটা শুনিয়াছিলেন, তাই মুখ বিকৃত করিয়া গোপনে বলিলেন, "এ ছুঁড়িকে সঙ্গে করে আনার মানে কি? ওকে বাড়ীতে আসতে দেওয়াই অনুচিত।"

কাত্যায়নী একটা কথাও বলিলেন না। রবীন দুপুরের ট্রেনে ডাক্তার আনিতে কলিকাতায় চলিয়া গেল, রাত্রে ডাক্তার লইয়া ফিরিল।

যথারীতি এবার চিকিৎসা চলিতে লাগিল, কাত্যায়নী ও সুখদা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, যে অনিল তাঁহাদের হাতে কিছুতেই ঔষধ সেবন করিতেছিল না সেই অনিলই এখন কল্যাণীর হাতে বিনা প্রতিবাদে ঔষধ খাইতেছে। কল্যাণী তাহাকে যেরূপ ভাবে রাখিতেছে, সে সেইরূপ ভাবেই থাকিতেছে।

পূর্ণিমা মাঝে মাঝে জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিয়া যাইত। কল্যাণীর সেবা দেখিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

কিন্তু না, কিছুতেই কিছু হইল না, অনিল ভাল হইতে পারিল না। দিন দিন তাহার অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল; অবশেষে একদিন ডাক্তার জবাব দিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

বাড়ীতে রোদনের রোল উঠিয়া গেল। পূর্ণিমা ঠাকুর-ঘরে ঠাকুরের সামনে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া রহিল, মাতা কাত্যায়নী পুত্রের মাথা কোলে করিয়া নিঃশব্দে চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। সুখদা প্রাঙ্গণে পড়িয়া আছ-ড়াইতে লাগিলেন। অনিল এ জীবনের খেলা শেষ করিয়া ধীরে ধীরে মৃত্যু-নদীর ও পারে বিশ্রাম লাভ করিতে চলিয়া গেল।

কল্যাণী চোখ মুছিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিজের গৃহে ফিরিয়া গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহাকে ভালবাসিয়াই যে এই হতভাগ্য যুবক এমন করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল, ইহা ভাবিয়া সে কিছুতেই শান্তি পাইল না। সে-ই যে অনিলের মৃত্যুর কারণ, ইহা মনে করিয়া কাঁদিয়া সে ভগবানকে ডাকিয়া বলিল, "আমায় কেন যাবার আদেশ দিলে না দেব, তাকে কেন নিলে? আমার চেয়ে তাকে দিয়েই যে তোমার অনেক বেশী কাজ হ'তো।"

(২৩)

কল্যাণীর অসাধারণ আত্মত্যাগ ক্রমে ক্রমে সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। কেহ না ডাকিলেও কল্যাণী কাহারও বিপদ শুনিলে সেখানে গিয়া পড়িত। কাহারও পানে চাহিত না, কাহারও কথা শুনিত না, নিজের মনে নিজের কাজ করিত, তাহার পর নিজের গৃহে ফিরিয়া যাইত। কাহারও কথার উপর নিজেকে স্থাপন করিত না।

রবীন দেখিয়া বড় আনন্দিত হইল। তাহার উপদেশ উপযুক্ত পাত্রে পড়িয়াছে, লোকে আজ কাল আর নিন্দা লইয়া দিনপাত করিতেছে না, প্রশংসা নিন্দা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। আজ কল্যাণী সকলের মা। যাহারা তাহাকে সমাজচ্যুত করিয়াছিল তাহারা জানিয়াছে কল্যাণী বাস্ত-বিকই সমাজচ্যুত—কারণ সমাজ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, সে বহু উর্দ্ধে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কোমল দয়াপূর্ণ হৃদয়খানি এবং হাত দুটি এই সমাজের আবর্জনা দূর করিতে ব্যস্ত।

চন্দ্রার ভবিষ্যৎ গণনা সফল হইয়াছে। এবার যখন চন্দ্রা শ্বশুরালয় হইতে আসিল, তখন ভারী খুসি হইয়া উঠিল। আজ সে প্রকাশ্যেই কল্যাণীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আজ তুই সকলের পূজনীয়া, সকলের মা কল্যাণ, কিন্তু আমার কাছে তুই কি?"

কল্যাণী তাহার পায়ের ধুলা মাথায় দিয়া বলিল, "আমি তোমার ছোট বোন দিদি। এরা আমায় যখন ঘৃণা করে দূরে তাড়িয়েছিল, তুমি আমায় তখনও এমনি করে জড়িয়ে ধরেছিলে, তা আমি ভুলব না। আমি তোমার কাছে চির অবনতা দিদি।"

কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে রবীন পশ্চিমে যাইবার ইচ্ছা করিতেছিল। সত্যেন্দ্র যখন ভ্রাতার মহত্ব জানিতে পারি-লেন, তখন তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে ভ্রাতার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইলেন। রবীন ভ্রাতার পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিল।

সুশীলা কাশীবাস করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া-ছিলেন; রবীনও তাঁহার সহিত কাশীবাস করিবে বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া বসিল। যখন অনেক বুঝাইয়াও তাহাকে নিরস্ত করা গেল না, তখন সুশীলা অগত্যা রাজি হইলেন।

কল্যাণী তখনও সে কথা শুনে নাই। রবীন কল্যাণীকে এ সংবাদ দিবার জন্য বাহির হইল, কারণ কাল ভোরের ট্রেনেই কাশী রওনা হইতে হইবে।

কল্যাণীর বাড়ীতে গিয়া সে কল্যাণীকে দেখিতে পাইল না। পাশাপাশি কয়েকটা বাড়ীতে খোঁজ করিল—কল্যাণী সেখানে নাই। একজন বলিল, "তিনি নদীতে গেছেন।"

গ্রাম হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে নদী। তখন সন্ধ্যা আগত। সম্মুখে নদীর ওপারে আকাশের গায় নানা বর্ণের মেঘগুলি কি সুন্দর দেখাইতেছে। সূর্য্য কালো মেঘের আড়ালে অনেকক্ষণ লুকাইয়াছে, সেই কালো মেঘের পাশ দিয়া লাল আভা ছুটিয়া সারা ঘাট মাঠ ভাসাইয়া তুলিয়াছে। তর তর করিয়া আশ্বিনের গঙ্গা ভাসিয়া যাই-তেছে—তাহার উপর দিয়া ক্ষুদ্র তরণী কোথা হইতে কোথায় যাইতেছে কে জানে। ওপারে যখন সন্ধ্যার ম্লান আঁধার ঘনাইয়া আসিয়াছে, এপারে তখন অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিমাভায় সব উজ্জ্বল।

কল্যাণী ঘাটের উপর বসিয়া। দুখানা স্থলপদ্মনিন্ত পা জলে রহিয়াছে, পাশে ঘড়াটা রহিয়াছে। তাহার

মাথার কাপড় খসিয়া গিয়াছে, বাতাসে তাহার রুক্ষ চুলগুলি উড়িতেছিল।

হঠাৎ পিছনে রবীনের সাড়া পাইয়া সে চমকাইয়া মুখ তুলিল, তাহার পর মাথায় কাপড় টানিয়া দিল।

রবীন বলিল, "সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এখনো ঘাটে একা বসে কেন কল্যাণী ?"

কল্যাণী স্থির দৃষ্টি সম্মুখে রাখিয়া উত্তর করিল, "বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছি রবি দা, তাই বিশ্রাম করতে এসেছি। এমন বিশ্রামের জায়গা আর নেই। ওই দেখ রবি দা, চিতা জ্বলছে দেখ।"

বাস্তবিক দক্ষিণ দিকে শ্মশানে একটী চিতা তখন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল।

রবীন বলিল, "এই বড় শান্তিপ্রদ জায়গা কল্যাণী। বড় শ্রান্ত হয়ে এসে মানুষ জুড়ায় এখানে। আমি একটা কথা বলবার জন্যে তোমায় অনেক খুঁজেছি।"

কল্যাণী। কি কথা ?

রবীন। আমি মাসীমাকে নিয়ে কাল ভোরেই কাশী চলে যাচ্ছি। সম্ভব আর আসব না, ওখানেই থাকব। তোমাকে আর বলবার অবকাশ পাব না বলেই বলতে এসেছি।

কল্যাণী স্থির দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া শান্ত ভাবে বলিল, "আমি ?"

বিস্মিত রবীন বলিল, "তুমি কি কল্যাণী ?"

কল্যাণী। আমি কোথায় থাকব ?

রবীন। এখানে।

কল্যাণী মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল।

রবীন বলিল, "কেন কল্যাণী—এখানে থাকতে কি ভয় করবে তোমার ? আমাকে ভালবাসো বলে আমায় ছাড়তে কি কষ্ট হচ্ছে ? আমার প্রতিরূপ এই যে সহস্র সহস্র জীব তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি। তুমি কি কাজ ছাড়বে ভাবছো কল্যাণী ?"

অস্ফুট স্বরে কল্যাণী বলিল, "না, কিন্তু যদি না পারি রবি দা ?"

রবীন। পারবে না ? কেন পারবে না কল্যাণী ? এদেরকে আমার স্বরূপ বলেই মনে কর না কেন ? ক্ষুদ্র আমি, আমাতে এখনও তোমার অনন্ত প্রেম কেন রুদ্ধ করে রাখছো কল্যাণী ? তোমার ও প্রেম পেলে যে সমস্ত জগতের লোক বেঁচে যাবে। মাতৃরূপা তুমি, পূর্ণভাবে আপনাকে বিকাশ কর, অমন করে আপনার মধ্যে আপনাকে লুকিয়ে রেখো না। তুমি জেনো, আমি যেখানেই থাকি না কেন তোমার কাজ জানতে পারব। তুমি যাদের সেবা করবে তাদের মধ্যেও যে আমি আছি কল্যাণী।"

কল্যাণী চোখ তুলিয়া আবার তাহার পানে চাহিল। এই তো দেবতা, এই যে চোখে স্নিগ্ধ শান্ত দৃষ্টি। পদে পদে কল্যাণীর দোষ উপেক্ষা করিতেছেন, পদে পদে তাহাকে সতর্ক করিতেছেন। কল্যাণী তুচ্ছ চিন্তাকে লইয়া ভুলিয়া আছে, সত্যকে সে তো এখনও চিনিতে পারে নাই।

সে রবীনের পদতলে লুটাইয়া পড়িল, তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমায় মাপ কর রবি দা, আমি এখনও চিত্ত বশ করতে পারি নি। যদি তা পারতুম তবে তোমার যাবার নাম শুনে আমার মন এমন হয়ে যাবে কেন। তুমি যাও রবি দা, আমি শক্ত হয়েছি, আর ভুলব না। আমার কাজ আমি ঠিক করে যাব। তুমি যেখানেই থাক মাঝে মাঝে এক একবার এসে দেখে যেয়ো। আমি যদি কখনও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি তোমায় ডাকব, তুমি আসবে তো ?"

রবীন বলিল, "আসব! নিশ্চয়ই আমাকে আসতে হবে। তোমার মনে একটু দুর্ব্বলতা এখনও আছে দেখেই আমি সরে যেতে চাচ্ছি কল্যাণী।"

কল্যাণী মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "না—আর নেই রবি দা—আর নেই। কি করলে প্রত্যয় করবে বল, আমি তাই করব।"

রবীন। তুমি নিজের মুখে বলতে পার তুমি আমার মা ?

কল্যাণী। শতবার সহস্রবার বলছি রবি দা, আমি তোমার মা—তুমি আমার ছেলে। ভোরে ঘুম হ'তে উঠে

সারাদিন আমি মনে করি—আমি তোমার মা তুমি আমার ছেলে।

রবীন প্রফুল্ল মুখে বলিল—"তবে দাঁড়াও কল্যাণী তোমার পায়ের ধূলো আমায় নিতে দাও। জগতে যেন বাস্তবিকই আঁকা থাকে তুমি আমার মা—আমি তোমার ছেলে। আমার অভাব আর তোমার বোধ হবে না তো?"

কল্যাণী। না।

রবীন বলিল, "ঘরে যাও, রাত হয়ে এলো।"

আর একটাও কথা না কহিয়া কল্যাণী জল লইয়া উঠিয়া গেল।

রবীন একটু পরে বাড়ী চলিয়া গেল।

* * * *

পরদিন শেষ রাত্রে সুশীলা কল্যাণীর নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। কল্যাণী তাঁহার চরণে প্রণাম করিল—তিনি সজল চোখে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "মা তোকে নিয়ে যাবার আমার ভারি ইচ্ছে ছিল তার কারণ তোর মা নেই, তোর আর কেউ নেই; কিন্তু রবীন তোকে নিয়ে যেতে চায় না। সে বলছে তোর কর্ম্মক্ষেত্র এখানেই, কাজ করতেই তোর আসা। তোর কাজ থেকে সে তোকে সরাতে চায় না। আমাকে এর জন্যে দোষ দিস নে মা।"

কল্যাণী দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "না মা দোষ দেব না। বাস্তবিকই আমার অনেক কাজ এখনো বাকি। এই তো সবে কাজে হাত দিয়েছি, এখন ছেড়ে গেলে সব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন নিজের কাজ সেরে আপনার সঙ্গে অনন্তে মিশতে পারি।"

রবীনের পায়ের ধূলা তুলিয়া সে যখন মাথায় দিল তখন রবীন গম্ভীর ভাবে বলিল, "কর্ত্তব্য ঠিক মনে থাকবে তো কল্যাণী?"

কল্যাণী উত্তর দিল, "ঠিক মনে থাকবে রবি দা।"

উষার আলো যখন ধরার বুকে কোমল আভা ফুটাইয়া তুলিতেছিল, সেই সময় গ্রামের দুইটী বড় আপনার লোক গ্রাম হইতে চিরকালের মত চলিয়া গেল।

রবীন চলিয়া গেল বটে, কিন্তু সে একটী অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়া গেল। সে কীর্ত্তি কল্যাণী। সে রবীনেরই শক্তি। রবীন তাহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিল। তাহাকে নিজের সব দিয়া সে সরিয়া গেল। পাছে কল্যাণীর চিত্ত অসংযত হইয়া পড়ে তাহাই রবীনের প্রধান চিন্তা ছিল, সে দেখিতেছিল কল্যাণী প্রাণপণে আপনাকে স্থির করিতে চেষ্টা করিতেছে, ইহাতে তাহার অনেকটা সময় বৃথা অপব্যয় হয়। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য রবীন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জন্মভূমির মায়া কাটাইল।

সমাপ্ত।

উৎসব।

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।]

(রাগ পঞ্চম—একতালা)

আকাশে বাতাসে আলোকে পুলকে
উৎসব এ কি ভূলোকময়!
মুঞ্জরে কলি গুঞ্জরে অলি
ঝঙ্কারে শ্যামা পিক কুহরয়!
প্রভাতে অরুণ ঢালিল কিরণ
মেলিয়া তাহার আঁচল হিরণ
শশী তারা রাতে দীপ লয়ে হাতে
আরতি জ্বালিল গগনময়!

এ ভবের নাটে কত দিনে রাতে
কত খেলা হল জীবনময়—
কত সুখে দুখে কত শোকে তাপে
ফুরাল এ মধু-লীলাভিনয়!
সকলি তাঁহার করুণা আশীষ
তিনি চির-রাজা করুণাময়।
তাঁরে ল'য়ে বুকে এস হাসিমুখে
গাই সুখে দুখে তাঁরি জয় জয়॥

শিশুরক্ষা।

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্যবিশারদ।]

ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের মেয়েরা অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক বয়সে সন্তানের মুখ দেখিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের দেশে "দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতঃ ঊর্দ্ধং রজস্বলা"—মেয়েরা অতি অল্প বয়সেই সন্তানের মা হইয়া পড়েন। এই অল্পবয়স্ক মেয়েরা শিশুরক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাঁহাদের অজ্ঞতার ফলে কত শিশু যে অকালে মহাপ্রয়াণ করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে যে স্থানে শত করা ৮টি মাত্র শিশু মারা যায়, এ দেশে সেই স্থানে শত করা ৪৮টি শিশু অতি শৈশবেই ভবের খেলা সাঙ্গ করে।

পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও শিশুমৃত্যুর হার কত কম, নিম্নে তাহাও দেখাইতেছি :—

স্কটলণ্ড	...	...	প্রতিসহস্রে	১১০
আয়র্লণ্ড	...	...	„	৯৭
অষ্ট্রেলিয়া	...	...	„	৭২
নিউজিলণ্ড	...	...	„	৫৯
অষ্ট্রিয়া	...	...	„	১৮০
ফ্রান্স	...	...	„	৭৮
প্রুষিয়া	...	...	„	১৪৬
বেল্‌জিয়াম	...	...	„	১২০
ডেন্‌মার্ক	...	...	„	৯৩
সুইডেন	...	...	„	৭১
নরওয়ে	...	...	„	৬৮
ইটালী	...	...	„	১৩০
জাপান	...	...	„	১৫৭

এ দেশের মেয়েদের মধ্যে শিশুরক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তার করিতে না পারিলে কিছুতেই আমাদের দেশের শিশুমড়ক নিবারিত হইতে পারে না। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকাদিতে শিশুরক্ষা সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পুনঃ পুনঃ আলোচিত হওয়া উচিত। প্রত্যেক গৃহস্থের মেয়েরা যাহাতে ঐ সকল সন্দর্ভ পাঠ করেন এবং সন্দর্ভ লিখিত উপদেশগুলি পালন করেন, তদ্বিষয়ে গৃহস্বামীকে যত্নবান্ হইতে হইবে।

আজ কাল আমাদের মেয়েরা অনেকেই কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিতেছেন। তাঁহারা অনেক সময়ই নাটক-নভেল পাঠ করিয়া কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। নাটক-নভেল ছাড়িয়া তাঁহারা যদি শিশুরক্ষা সম্বন্ধে অন্ততঃ মোটামুটি বিষয়গুলিও জানিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দেশের যথেষ্ট মঙ্গল হয়;—তাঁহাদেরও বুকজুড়ান ধনকে যমের করে অর্পণ করিয়া কঠোর বিয়োগ-বেদনায় আর্ত্তনাদ করিতে হয় না।

শিশুরক্ষা সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য বিষয়, শিশুর বাসগৃহ :—সূতিকাগারই নবজাত শিশুর প্রথম বাসগৃহ। এদেশে সাধারণতঃ যে ভাবে সূতিকাগার নির্ম্মিত হয়, তাহাতে তাহাকে "যমাগার" বলিলে বোধ হয় কোন দোষ হয় না। আমাদের দেশে একটা কুসংস্কার আছে যে, সূতিকাগার হইলেই ঐ স্থান অশুদ্ধ হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই গৃহপ্রাঙ্গণে শীত-বাত-সমাক্রান্ত, শুষ্কপত্রাচ্ছাদিত এক দারুণ অস্বাস্থ্যকর স্থানে শিশুর প্রথম বাসগৃহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। নবনীত-কোমল-কান্তি শিশুর শক্তি কতটুকু? ক্ষুদ্র শিশু সারারাত্রি হিমভোগ করিয়া অথবা আর্দ্র ভূমিতে পড়িয়া থাকিয়া প্রায়ই স্বরভঙ্গ, জ্বর, বাত, পক্ষাঘাত, ধনুষ্টঙ্কার অথবা ইরিসিপেলাস্ রোগে মারা পড়ে*; আর ভ্রমান্ধ মাতাপিতা শিশুকে পেঁচোয় পাইয়াছিল বলিয়া মনকে প্রবোধ দেন।

* ধনুষ্টঙ্কার রোগে শিশুর চোয়াল বন্ধ হইয়া যায়। তখন শিশু আর স্তন্য পান করিতে পারে না। ইরিসিপেলাস্ রোগে অত্যন্ত জ্বর

বাড়ীর মধ্যে যে ঘরখানি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, যাহার মেঝে বেশ খট্‌খটে এবং যে ঘরে বাতালোক সমানভাবে প্রবেশ করে, সেই ঘরই সূতিকাগারের উপযুক্ত। ঘরে আবশ্যক পরিমাণ বাতালোক প্রবেশ করিতে না পারিলে, ঘর নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে। কাযে কাযেই তন্মধ্যে নবজাত শিশুকে রাখিলে শিশুর স্বাস্থ্য কখনই ভাল থাকিতে পারে না। এক সময়ে বিলাতের কোন এক সরকারি প্রসবাগারে প্রথম প্রথম ভূমিষ্ট হইবার পর অনেক শিশু সপ্তাহকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তথাকার প্রথিতনামা চিকিৎসকগণ জানিতে পারিলেন যে, ঐ গৃহে আবশ্যক বায়ু প্রবেশের অভাব হইতেছে। ঐ অভাব দূরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মৃত্যুসংখ্যাও অনেক হ্রাস হইয়া পড়িল।

বাহিরে সূতিকাগার প্রস্তুত করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। স্থানটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, খট্‌খটে ও প্রশস্ত হওয়া উচিত। উহার নিকটে কোন দুর্গন্ধময় স্থান অথবা পশুশালা থাকিবে না।* ঘরখানি দৈর্ঘ্যে দশ বার হাত এবং প্রস্থে পাঁচ ছয় হাত হইলে ভাল হয়। ঘর এরূপ ভাবে প্রস্তুত করিবে যাহাতে তন্মধ্যে বায়ু যাতায়াতের ব্যাঘাত না ঘটে; যেন উহাতে রুজু রুজু অন্ততঃ দুইটি জানালা থাকে।

আমাদের দেশে সূতিকাগৃহে আগুন রাখিবার একটি প্রথা আছে। মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসে গৃহবায়ু যেরূপ দূষিত হয়, ঘরে আগুন জ্বালিয়া রাখিলেও গৃহাভ্যন্তরস্থ বাতাস সেইরূপ দূষিত হইয়া থাকে। বায়ুস্থ অক্সিজেন্ আমাদের জীবন রক্ষা করে। ঘরে আগুন জ্বালিয়া রাখিলে আমাদের প্রাণ স্বরূপ ঐ অক্সিজেন্ গ্যাস নিয়ত দগ্ধ হইয়া বায়ুকে দূষিত করিয়া ফেলে। তবে যে সকল ঘরে বায়ু গমনাগমনের যথেষ্ট পথ মুক্ত আছে, সে সকল ঘরে গুল বা কয়লার আগুন রাখিলে বিশেষ ক্ষতি না হইতে পারে; কিন্তু যাহাতে ঐ আগুন হইতে ধূমোৎপত্তি না হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দরজা জানালা আবদ্ধ ঘরে কয়লা পুড়াইলে উহা হইতে কার্ব্বণ মনক্সাইড নামক বাষ্প উত্থিত হইয়া ঘরে জমা হইতে থাকে। ঐ বাষ্প অতিশয় বিষাক্ত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার জনৈক আত্মীয়ের বাড়ীতে সূতিকাঘরে কয়লার আগুন জ্বালিয়া সমস্ত বায়ু-পথ বন্ধ করিয়া রাত্রিতে প্রসূতি, শিশু ও ধাত্রী শয়ন করিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ধাত্রী ডাকিয়া বলিল, প্রসূতি অজ্ঞান হইয়াছেন। তখন দ্বার খুলিয়া দেখা গেল সমস্ত ঘর ধূমে পরিপূর্ণ; প্রসূতি জ্ঞানহারা অবস্থায় পড়িয়া আছেন। অতি কষ্টে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করা গিয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় নব কুমারের কোন অনিষ্ট-পাত হয় নাই।

সূতিকাঘর হইতে বাহির হইয়া শিশু যে গৃহে বাস করিবে, সে ঘরখানিও বাতালোক পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। ঘরে পর্য্যাপ্ত আলোক-বায়ু প্রবেশ করিতে না পারিলে শিশু দিন দিন মলিন, কৃশ ও স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া পড়ে।

রাত্রিতেও শিশুর শয়ন-কক্ষের সমস্ত বায়ু-পথগুলি একেবারে বন্ধ করিয়া রাখিবে না। তবে যাহাতে শিশুর গাত্রে কোন প্রকারে ঠাণ্ডা না লাগে সে পক্ষে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শিশুর দেহ উপযুক্ত বস্ত্রের দ্বারা ভালরূপ আবৃত রাখিয়া ঘরের অপর পার্শ্বের একটি জানালা খুলিয়া দিবে। বাসগৃহ অযথা গরম রাখিলে শিশু একটু বাহিরে খোলা বাতাসে আসিলেই সর্দ্দি, কাশি প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

শিশুর গৃহে বহুলোকে শয়ন করা উচিত নহে। ঐ ঘরে কতকগুলি অনাবশ্যক সামগ্রী রাখাও ভাল নহে। ঘরখানি সর্ব্বদা পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করিবে। জল

হয় এবং শিশুর গাত্রের কোন এক স্থানের চর্ম্ম রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। ঐ আক্রান্ত স্থান ক্রমে বিস্তীর্ণ হইতে থাকে।

নাড়ীকাটার দোষে অথবা নাভীক্ষত অপরিষ্কৃত রাখিলেও নবজাত শিশুদিগের এই দুইটী রোগ হইতে পারে। পল্লীগ্রামে সচরাচর যে এক খণ্ড চেঁচাড়ির দ্বারা শিশুর নাড়ীকাটা হয়, সে প্রথা অত্যন্ত ঘৃণনীয়। একখানি নূতন তীক্ষ্ণধার কাঁচি ফুটন্ত জলে কিছুক্ষণ নিমজ্জিত রাখিয়া তদ্দ্বারা নাড়ীচ্ছেদ করিবে। নাভীক্ষত অনাবৃত রাখিবে না;—এক খণ্ড লিণ্টে বোরিক এসিডের মলম মাখাইয়া ক্ষতে লাগাইয়া রাখিবে।

* ধনুষ্টঙ্কার রোগের জীবাণু পশুর মলে বিশেষতঃ অশ্ববিষ্ঠায় অনেক সময় আত্মগোপন করিয়া থাকে।

কথা, শিশুকে মলমূত্র দূষিত, বাতালোক হীন এক দুর্গন্ধময় গৃহে বাস করাইলে তাহার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের আশা বৃথা।

শিশুরক্ষা সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তব্য বিষয়, শিশুর শয্যা ঃ—শিশুর শয্যাগুলিও সর্ব্বক্ষণ পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। আমাদের দেশের মেয়েদের এ সম্বন্ধে একেবারেই দৃষ্টি নাই বলিলে হয়। সূতিকাগারে শিশুর ভাগ্যে দুই একখানি মলিন কন্থা ও ছিন্ন বস্ত্র ভিন্ন বড় কিছু মিলে না। প্রসূতি নিজেও যে বস্ত্রখানি পরিধান করিয়া থাকেন তাহাও মসিকৃষ্ণবর্ণ। কোন নবীনা ইংরাজ জননীর সূতিকাগৃহে গিয়া তাহাকে কখনই নবপ্রসূ বলিয়া মনে করা যায় না। অপর পক্ষে এতদ্দেশীয় প্রসূতিগণের প্রসবাগারে প্রবেশ করিলে মুহূর্ত্তকালও থাকিতে ইচ্ছা হয় না।

অপরিস্কৃত শয্যা-বসন হইতে অনেক প্রকার রোগ জন্মে। পূর্ব্বে যে ধনুষ্টঙ্কার ও ইরিসেপেলাস্ রোগের কথা বলিয়াছি,—যে দুই রোগকে মেয়েরা সাধারণতঃ পেঁচোয় পাওয়া রোগ বলিয়া থাকেন,—অপরিস্কৃত শয্যা-বসনই তাহার অন্যতম কারণ। ঐ সকল মলিন বসনে রোগ জীবাণু লিপ্ত থাকা অসম্ভব নহে।

শিশুর বিছানা বালিশ প্রচুর থাকা চাই। মলমূত্র দ্বারা অথবা অন্য কারণে শয্যা মলিন হইলে তৎক্ষণাৎ উহা উঠাইয়া লইবে এবং একটি নূতন শয্যা পাতিয়া দিবে।

শয্যাগুলি প্রত্যহ রৌদ্রতপ্ত করা এবং দুই এক দিন অন্তর সাবান-জলে ধৌত করা প্রয়োজন। মূত্রসিক্ত বিছানা কেবলমাত্র রৌদ্রতপ্ত করিলে ব্যবহারযোগ্য হয় না। সেগুলি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া রৌদ্রে দেওয়া উচিত।

সিক্ত শয্যায় পড়িয়া থাকিলে শিশুর সর্দ্দি, কাশি, জ্বর প্রভৃতি পীড়া হয়। অনেক নিদ্রালু মাতা—সারা রাত্রি ঘুম ঘোরে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকেন। কোলের শিশু শয্যায় মলমূত্র ত্যাগ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার উপরে ঘুমাইয়া পড়ে। এই সকল হতভাগ্য শিশুর সর্দ্দি, কাশি, চুলকানি, পাচড়া নিয়তই লাগিয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

প্রত্যাখ্যান।

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ]

—বসন্ত, এস না আর
লয়ে তব কলগীতি, পত্র পুষ্প ভার—
সে যবে গিয়াছে চলে'! দখিনা পবন
থাক রুদ্ধ চিরকাল! সে ছিল যখন—
তোমরা আসিতে হায় দিনে দু'শ বার—
ক্ষণে ক্ষণে শিহরণ—পুলক সঞ্চার!

যৌবন-নিকুঞ্জ মম হইয়ে শ্রীহীন
পড়িয়া রয়েছে আজি! কেবল কঠিন
নীরস কর্ত্তব্যগুলো আমারে ঘিরিয়া
করিতেছে অট্টহাস মথিয়া পীড়িয়া—
(মরণ হয় না তবু!)—তাহার উপর
আমারে করিছে খিন্ন দীর্ণ নিরন্তর
দারিদ্র্য-অভাব—আরো সহস্র যন্ত্রণা—
প্রেম প্রীতি অনুরাগ কবিত্ব কল্পনা
পুড়িয়া হয়েছে ছাই!

যদি কভু চাহি
অতীতের পানে—সত্য বটে, উঠে গাহি
আমার পরাণ পিক্—মুমূর্ষু কাতর—
কিন্তু মুহূর্ত্তের মাঝে ছিন্ন কণ্ঠস্বর
পড়ে সে লুটায়ে ভূমে!

—তাই বলি আজ
বসন্ত, এস না তুমি! শীতের আঁধার
আমারে থাকুক ঘিরি'! সে যদি আবার
ফিরে আসে কোন দিন—আসিও তখন
লয়ে তব পত্র পুষ্প কূজন গুঞ্জন!

উপহার।

[শ্রীমতী চারুলতা দেবী]

(১)

সুষমা টেবিলের কাছে বসিয়া লিখিতেছিল। মণিকা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল,—"এ যে কবিতা! দেখি, দেখি।" সুষমার হাত হইতে খাতাটা কাড়িয়া লইয়া, প্রথম দিকটায় চোখ বুলাইয়া শেষকালে সে আবৃত্তি করিতে লাগিল,—

"ক্ষুদ্র আমি তৃণমাঝে মিশাইয়ে যাই,
মনে রেখো, ভুল না আমারে,
দিবসের শ্রান্তি-শেষে বিশ্রামের পথে
ভেবো সখি, বারেকের তরে।
কাব্যের কানন-মাঝে ফুটে কত ফুল,
তুলে আমি দু'একটি তার,
বিষাদ-মথিত চিতে গাঁথিয়ে মালিকা
আসিয়াছি দিতে উপহার।
কি দিতে সমর্থ আমি বিনা এই হার?
মনে রেখো শুধু এই মিনতি আমার।"

"রচনাটা তোমার নিজের?"

গম্ভীর মুখে সুষমা বলিল, "না, চুরী।"

"রাগ কোরোনা ভাই, সত্যিই আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে তুমি লিখ্‌তে পারো।"

"বিশ্বাসে দরকার নাই"—বলিয়া সুষমা মণিকার মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল,—"কি রাঁধলে আজ?"

"ও মা, তোমার হাতে পদ্য, আর মুখে গদ্য?" কপট-বিস্ময়ে মণিকা চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিল।

"তামাসা রাখো, বল না কি রাঁধলে?"

হাসিমুখে মণিকা উত্তর দিল,—"অনে-ক জিনিস।"

"তাই নাকি? তবে মুখটা অত শুকনো কেন?"

"অনেকক্ষণ আগুনতাতে ছিলাম কি না,—তাই।"

"বর কি খেলে?"

"এত জিনিস রাঁধলাম—তবু তুমি সে কি খেল তাই জানতে চাচ্ছ? কি শুনছ তবে তুমি?"

"যা শুনছি তা ভালই।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সুষমা বলিল, "আচ্ছা ভাই, আমার হাতের কিম্বা বামুন-দির হাতের রান্না তরকারী খেলে তোমার না হয় জাত যাবে, কিন্তু তোমার বরেরও কি তাই?"

"নিশ্চয়ই! যেহেতু সে আমার অর্দ্ধাঙ্গ।"

"এতও তোমার আসে ভাই! হরিমটর করে থেকে আমরা ত অমন হাসতে পারিনে।"

হাসিয়া মণিকা বলিল, "তুমি যে লক্ষ্মীর বাহন, দিনের বেলা কোটরে থাকাই তোমার উচিত।"

ঘরের মেঝের মাদুর পাতিয়া সুষমা বলিল,—"বোসো।"

"বেশীক্ষণ বসব না ভাই, এখুনি আবার ছেলে উঠে পড়বে।"

"ওঠে—ওপরে আসবে, তার জন্যে ভাবনা কি?"

"ভাবনা বিশেষ কিছু নেই, তবে সিঁদুরের কোটোটা ঘরের মেঝেতেই ফেলে এসেছি—"

"মাথা আঁচড়াচ্ছিলে বুঝি? তবুও চুলের এত বাহার? এসো, আমি আঁচড়ে দিই।"

তাকের উপর হইতে চিরুণী আর তেলের বাটি পাড়িয়া লইয়া সুষমা মণিকার মাথা আঁচড়াইতে বসিল। মণিকা তাড়াতাড়ি তেলের বাটিটা সরাইয়া রাখিয়া বলিল,—"এই ভরাদুপুরে মাথায় তেল দিলে উধ্যুক হবে যে!"

সুষমা কণ্ঠস্বর গম্ভীর করিয়া ডাকিল, "মণিকা!"

যোড়হাত করিয়া মণিকা বলিল,—"হুজুর!"

"পরের দান তুমি নিতে চাও না, বেশ—ভাল কথা। কিন্তু জানতে চাই, আমিও কি তোমার পর?"

ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে মণিকা বলিল,—"হলে গেলে ভাল হ'ত"।

"সব তাতেই চালাকি! আচ্ছা ভাই, সামান্য একটু তেল দিলেও কি তোমার দারিদ্র্যকে অপমান করা হবে?"

"কি কথায় কি কথা আনলে? তুমি দেখছি ঝগড়া বাধাতে ভয়ানক মজবুত! এখন এসো, আপোসে মিটমাট করা যাক।"

তেল মাখিতে মাখিতে মণিকা বলিল, "যদি মাথা গরম হ'য়ে মরে যাই, তা হলে কিন্তু দেখে শুনে একটা বিয়ে দিয়ে দিও।"

"নিশ্চয়ই দেব, পাটেল-বিল ত পাশ হ'তে চল্ল, এবারে একটা কায়েতের মেয়ের সঙ্গে মালা বদল করিয়ে দেব।"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "ভদ্রলোকের জাতের ওপরে দেখছি তোমার ভয়ানক রকম আক্রোশ।"

(২)

মণিকা রাঁধিতেছিল। সুষমা আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিল,—"ওগো বামুন-ঠাকরুণ, দরজার কাছে দাঁড়ালেও কি তোমার জাত যাবে?"

ঘরের ভিতর হইতে উত্তর আসিল,—"হ্যাঁ ভাই, দয়া করে সরে দাঁড়াও।"

"দড়িতে ত একখানাও কাপড় নেই, রান্নাটা কাচা কাপড়েই হচ্চে নাকি?"

হাসিতে হাসিতে মণিকা উত্তর দিল, "পরীক্ষা ক'রে দেখচি ভাই, অশুচির আঘাতে জাতটা ভাঙে কি না।"

মিনিট দুই নীরব থাকিয়া সুষমা বলিল, "একবার দয়া ক'রে বেরোও, চাঁদমুখখানি দেখে চলে যাই।"

"শীতের ভোরে চাঁদের দেখা পাবে কোথায়? সে যে কুয়াশায় ঢেকে গেছে!"

"কবিত্ব রেখে বেরোও দেখি একবার!"

হাসিমুখে বাহির হইয়া মণিকা বলিল, "ফরমাইয়ে বিবিজান!"

সুষমা তাহার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "এই পোষ মাসের শীতে ভিজে কাপড় পরে আছ, তবু আমার কাছ থেকে একখানা শুকনো কাপড় নেবে না? কায়েতের পরা কাপড় ব'লে সঙ্কোচ হয় বুঝি?"

মণিকা স্মিতমুখে উত্তর দিল,—"তোমার কথার কায়দাটি ত ভারি চমৎকার! বিদ্যেটা দিনকতকের জন্য হাওলাত দিতে পার?"

"ঠাট্টা রাখো, একখানা কাপড় তোমাকে নিতেই হবে।"

"ও হ'লনা। হাতযোড় কর, গলায় আঁচল দাও, তা নইলে নেব কেন?"

কণ্ঠস্বরে মিনতি ঢালিয়া দিয়া সুষমা বলিল, "হাসি বন্ধ কর ভাই। না ভাই, সত্যিই তোমাকে নিতে হবে, নইলে আমি দুঃখিত হব।"

সুষমার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া মণিকা বলিল, "অন্তরের জিনিস দিয়েছ—সেই ঢের। তার সঙ্গে আবার বাইরের জিনিস জড়াচ্ছ কেন ভাই! আমায় মাপ কর, সত্যিই আমি নিতে পারব না।"

সুষমার চোখ দুটী জলে ভরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ দুজনেই নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ খোকার দিকে দৃষ্টি পড়ায় মণিকা ছুটিয়া আসিয়া ছেলের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, "সুষমা, হতভাগা ছেলের কীর্ত্তিটা দেখে যাও, চেলে ডেলে মিশিয়ে একেবারে এক ক'রে ফেলেছে।"

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে সুষমা বলিল, "বেশ ত, খিচুড়ী রেঁধে ফেল।"

"তোমার আদুরে গোপালকে তুমি নিয়ে যাও, এখানে থাকলে আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করবে।"

নামিয়া আসিয়া শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া সুষমা বলিল, "ছেলের মায়েদের স্বভাবের বিশেষত্বই এই যে, পরের কোলে ছেলে চাপাতে পেলে তারা আর কিছুই চায় না। চল বাবা, আমরা চলে যাই, ঐ মুখপুড়ীর কাছে কিছুতেই থাকা হবে না।"

সুষমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বহু চেষ্টায় শিশু উচ্চারণ করিল, "মুক্-পুরী।"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "ঐগুলো আর ছেলেকে শিখিও না, এর পরে দেখো তোমাকেই ডাকবে মুকপুরী ব'লে।"

ছেলের মুখে চুমা খাইয়া সুষমা বলিল, "কিন্তু ভাই চমৎকার ছেলেটি তোমার।" স্নেহ-সজল-চোখে ছেলের

দিকে তাকাইয়া হাসিয়া মণিকা বলিল, "একলা আমার নয়,—তোমারও বটে।"

মণিকা রান্নাঘরে ঢুকিলে, দরজার কাছে দাঁড়াইয়া সুষমা এক নজরে ভিতরটা দেখিয়া লইয়া খোকার গালে টোকা দিতে দিতে বলিল, "এমন সুন্দর চাঁদের মত ছেলে, কি খেতে দেবে তাকে ? রেঙ্গুনের মোটা চালের ভাত ?"

ফেন গালিয়া ভাতের হাঁড়িটি যথাস্থানে রাখিয়া মণিকা উত্তর দিল,—"ভাত ত ওকে দিই না ভাই, একটু ফেন শুধু দুধের মধ্যে মিশিয়ে খেতে দিই।"

সুষমা বলিল, "স্বীকার করেচ ছেলে আমারও, সুতরাং কাল থেকে আমি ওর খাওয়ার ভার নেব।"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "তুমিও ভাড়াটে, আমিও ভাড়াটে, কে কতক্ষণ আছি তার ঠিকানা নেই। কেন আর ভাল-মন্দ খাইয়ে ছেলেটার মুখ খারাপ ক'রে দেবে ?"

(৩)

ছেলেকে কোলের উপরে শোয়াইয়া দোলা দিতে দিতে মণিকা গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছিল,—"দোলে রে খোকন খায় রে কলা, খোকনের হাতে সোণার বালা।"

শিশু উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কলা দাও।"

"ওমা, জেগে আছে না কি ? আমি বলি ঘুমিয়েছে !"

শিশু কাঁদিবার উদ্যোগ করিয়া বলিল, "কলা—আমা—কলা।"

মণিকা সান্ত্বনার সুরে বলিল, "ঘুম পাড়াতে গেলেই কলা খাও বলতে হয়, তাই ব'লে সত্যিই কি আর কলা খায় ? শোবার সময় কলা খেলে অসুখ করবে যে !"

দরজার কাছ হইতে সুষমা বলিয়া উঠিল, "ও ত সবি বুঝল !"

"বুঝুক আর না বুঝুক, এই সময় থেকে কানের কাছে মন্ত্র দেওয়া ভাল।"

"দাঁড়িয়েই রইলে যে, মাদুরটা টেনে নিয়ে বোসো না !"

মণিকার পাশে বসিয়া পড়িয়া সুষমা বলিল, "অমনিই বেশ বসেচি, তোমার ঘরের মেজেটা ত আয়নার মত ঝকঝকে।"

ছেলেকে জোর করিয়া শোয়াইয়া চাপড়াইতে চাপড়াইতে মণিকা বলিল,—"দশ অবতারের স্তব বলি, শোন,

"প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদং,
বিহিত বহিত্র—"

সুষমা হাসিয়া বলিল, "মন্দ নয়, এবারে আর ছেলে কোনও জিনিস-বিশেষের জন্যে বায়না নিতে পারবে না।"

আমারও বেগারের পুণ্যে গঙ্গাস্নান হয়ে যাবে।"

ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া মণিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। সুষমা বলিল, "হাতে কি খুব বেশী কাজ আছে ?"

"না, বাসন ক'খানা মেজে, কাপড় কেচে এসে গুল দেব।"

"কাপড় কেচে এসে গুল দেবে ?"

হাসিয়া মণিকা বলিল, "হ্যাঁ ভাই, তা হলে ঐ সঙ্গে রোদের তাতে কাপড়খানাও শুকিয়ে যাবে।"

"তা হলে একটু বোসো ভাই, আমি তোমার কাছে একটা জিনিস শিখতে এসেচি।"

মণিকা জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে সুষমার মুখের দিকে চাহিল।

সুষমা বলিল, "সোজাসুজি কাপড় ছিঁড়ে গেলে কেমন ক'রে রিপু করতে হয়—তা আমি জানি, কিন্তু যদি গোলমেলে ছেঁড়া হয়,—তা হলে ?"

"তা হলে সেই গোলমেলে অংশটুকু কেটে বাদ দিতে হবে।"

হাসিয়া সুষমা বলিল, "কাটিবা মাত্র দিব্যি একটা জানলা হ'ল,—তার পর ?"

"তার পর সত্যিকারের জানালায় যেমন রেলিং থাকে, কাপড়খানার লম্বার দিক দিয়ে তেমনি রেলিং মত করবে,—অবশ্য খুব কাছাকাছি সুতোর লাইনগুলো টেনে যাবে, তার পরে বহরের দিক থেকে সেই লাইনগুলোর একটার ওপর দিয়ে অন্যটার তলা দিয়ে সূচ চালিয়ে যাবে। দ্বিতীয় সারিও প্রথম সারির মতই, তবে আগের লাইনে সূচ যেখানে নীচ দিকে—এ লাইনে সূচ তখন ওপর দিকে।"

বিস্মিত হইয়া সুষমা বলিল, "তুমি ত দিব্যি জলের মত বুঝিয়ে গেলে, আমি হ'লে নিশ্চয়ই অমন করে বলতে পারতাম না।"

"কি তুমি পারো? স্বামীকে বামনীর হাতে খাওয়াও —তবু নিজে রাঁধতে পার না! সে যে কি জান্ত তার ঠিক নেই, আর—সে কি যত্ন ক'রে রেঁধে দেয়?"

আরক্তমুখে সুষমা বলিল, "তিনি যে রাঁধতে মানা করেন!"

"তা হ'লে ত তিনি নিজের কর্ত্তব্যই করেন, তুমিও তোমার কর্ত্তব্য কর, অর্থাৎ জোর করে রাঁধ।"

ছেলে পাশ ফিরিয়া শুইল; মণিকা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "গল্পে গল্পে অনেকটা সময় কেটে গেল ভাই; যাই বাসন মাজি গে।"

মণিকা চলিয়া গেলে সুষমাও উপরে উঠিবার জন্য সিঁড়ির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে দরজার কাছে ভিখারীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—"জয় রাধে!"

একমুঠা চা'ল লইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া সুষমা বলিল "মণি, ভিক্ষে ত দিতে যাচ্চি, কিন্তু সীতা-হরণের পালাটা যদি নতুন ক'রে আরম্ভ হয়?"

মণিকা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি আছি, জটায়ু পাখীর মত বুক দিয়ে পড়ব এখন। মাভৈঃ, তুমি নিশ্চিন্তে যেতে পার।"

বাসন মাজিয়া, কাপড় কাচিয়া ঘরের দাওয়ায় উঠিতে উঠিতে মণিকা দেখিল, সুষমা দরজার সামনে দাঁড়াইয়া সেই ভিখারী-দম্পতির জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর খবর লইতেছে। হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া সে বলিল, —

"জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবের ধনের অধিকারী।
এই বনে বহুকাল আমি তপ করি॥
রাবণ আমার নাম জানে মুনিগণে।
বড় প্রীতি পাইলাম তোমা' দরশনে॥"

শেষ লাইনটা বেশ একটু জোর দিয়া বলিয়া মণিকা ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সুষমা ভ্রূ কুঁচাইয়া বলিল, "মরণ আর কি!"

ভিখারিণীর দিকে তাকাইয়া মণিকা বলিল, "বেশ ছেলেটী ত তোমার! ক'দ্দিনের হবে? মাস পাঁচেকের?"

ভিখারিণী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলে সে শিশুটিকে লইবার জন্য হাত পাতিল।

সঙ্কুচিতা হইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া ভিখারিণী বলিল, "মা আমরা জেতে ধোপা।"

"হোক গে"—বলিয়া ছেলেটিকে নাচাইয়া মণিকা তাহাকে তার মার কাছে ফিরাইয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

(৪)

মাসিমার কাছে যাওয়ার জন্য খোকা বায়না ধরিল; অগত্যা তাহাকে কোলে লইয়া মণিকা উপরে উঠিল। সুষমা তখন আলমারীর জিনিসগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া সাজাইয়া রাখিতেছিল। মণিকা টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া সুষমার খাতাখানি টানিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল,

"জীবনের যত সাধ বাসনা আমার,
কিছু তা আমারি নয় সকলি তোমার।"

কথাগুলো ঠিক মনের সঙ্গেই বলছ ত?

"তুমি বুঝি ঝগড়া কত্তে এলে?"

"কাজেই, ছেলে যে ছাড়ে না!" একটা কাঠের ঝুমঝুমি ছেলের হাতে দিয়া তাহাকে কোলে লইয়াই সুষমা চমকিয়া উঠিল; মণিকার দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল,—"খোকার হাতের বালা কোথায়?"

মণিকার প্রফুল্ল মুখখানি মলিন হইয়া গেল। চেষ্টা করিয়া হাসিয়া সে বলিল, "খুলে রেখেছি।"

"খুলে রেখেচ কোথায়? বাড়ীতে? না বাড়ীর বাইরে?"

"যেখানেই হোক আছে।"

মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া সুষমা বলিল, "ছেলের গায়ের গয়না খুললে, তবু আমার কাছ থেকে ধার নিতে পারলে না!"

নতমুখে মণিকা বলিল, "শুধতাম কোথা থেকে?"

"না-ই শুধতে, অমনিই না হয় নিতে।"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "তা হলেও ও বালা ঘরে থাকত না। তুমি ত জান না আমার ঘরের মেজে কি ভয়ানক গরম, মা-লক্ষ্মী তাই দাঁড়াতে না পেরে সরে পড়েন।"

খোকাকে কোলে লইয়া কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি

করিয়া বেড়াইয়া সুষমা মণিকার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। মৃদুস্বরে বলিল, "ব্যাপারটা কি বল ত ?"

"ক' মাসের ভাড়া বাকী পড়েছিল, বাড়ীওয়ালা তাই কাল রাস্তায় জনকতক ভদ্রলোকের সামনে ওঁকে খুব অপমান করেছে—উনি ত বাড়ী এসে ভেবেই অস্থির, বালা খোলার যুক্তিটা শেষকালে আমিই দিলাম।"

সুষমা বলিল, "এখন না হয় তোমার নিজের গায়ে গয়না নেই, কিন্তু কোনোকালেও কি ছিল না ?"

"ছিল বৈ কি ; তবে বেশী নয়, দু'গাছি বালা আর এক গাছি হার।"

"কি হল সেগুলি ?"

"প্রথম যখন উনি চাকরী করতে চান, তখন মোটেই কাজ পান নি, শেষকালে ঐ গয়নাগুলি বাঁধা দিয়ে, সেই টাকায় দুচার জন ভদ্রলোককে ঘুস দিয়ে তবে ঐ পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরীটা পান।"

"শ্বশুরবাড়ীতে কেউ নেই ?"

"না।"

"ভিটেয় বাতি জ্বালছে কে ?"

"ভিটেটা যে কোথায় তাই জানি না, এঁরা তিন পুরুষ থেকে কলকাতার বাসিন্দা।"

সুষমা নীরবে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মণিকা খাতাখানি হাতে লইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া নাড়াচাড়া করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "খোকা তবে এখানে থাক, আমি নীচে যাই, ঢের কাজ পড়ে আছে।"

(৫)

সুষমা বামুন-ঠাকুরাণীর কাছে বসিয়া অখণ্ড-মনোযোগের সহিত তাহার সুদীর্ঘ জীবন-কাহিনী শুনিতেছিল। বিষণ্ণ-মুখে মণিকা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই চমকিয়া উঠিয়া সুষমা বলিল, "একি ? কি হয়েচে ?"

"আমরা যে চলে যাচ্ছি, অন্য বাড়ী ঠিক করা হয়েছে।"

সুষমার মুখটা সাদা হইয়া গেল, মণিকার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া সে বলিল, "কেন যাচ্ছ ?"

"উনি একটী ছেলেকে রোজ সকালবেলা পড়াতেন, কাল সেই ছেলে জবাব দিয়েচে—বলেছে আর পড়বে না। এখন, পঁচিশটী টাকামাত্র সম্বল নিয়ে পাকা বাড়ীতে থাকি কেমন করে ? কাজেই খোলার বাড়ী ভাড়া করতে হল।"

মণিকার হাত ধরিয়া সুষমা নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। কণ্ঠস্বরে অনেকখানি বেদনা ঢালিয়া দিয়া কহিল, "যেও না ভাই, লক্ষীটি ! যে কয়দিন আমি আছি, অন্ততঃ সেই কয়দিনও এখানে থাক।"

"তুমি যাবে না কি কোথাও ?"

"হ্যাঁ, আসচে মাসে বোনের বিয়ে, মাস-খানেক পরে যাব। এই মাসটা তুমিও থাক—লক্ষ্মী বোনটী আমার !"

মণিকা বলিল, "চির-জীবন যদি একত্র থাকবার সুযোগ পাওয়া যেত, তা হলে হয় ত আমি তোমার সাহায্য নিতাম। কিন্তু ভাই ! মাপ কর আমাকে, কিছুতেই আমি আমার স্বামীর আত্ম-সম্মানে আঘাত দিতে পারব না।"

সুষমার চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছিল, তাড়াতাড়ি হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে ধরা-গলায় বলিল, "স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে যদি কোনও জিনিস দিই,—নেবে ?"

"স্মৃতিচিহ্ন বোলোনা ভাই, চিরকাল তুমি আমার মনে থাকবে। তবে ভালবেসে কিছু যদি উপহার দাও কেন নেব না ?"

সের তিনেক তুলা আর একটা চরকা সখীর হাতের কাছে আগাইয়া দিয়া সুষমা বলিল, "আজ কালকার দিনে চরকার চেয়ে আদরের জিনিস আমাদের কাছে আর কিছুই নয়, তাই—"

নীচে স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া মণিকা সুষমাকে চুমা খাইয়া বলিল, "তবে আসি ভাই !"

নত হইয়া মণিকাকে প্রণাম করিয়া সুষমা বলিল, "খোকা কোথায় ?"

"নীচে তার বাঁপের কাছে।"

"চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই, একবারটী তাকে কোলে নেব।"

অবিশ্বাসী।

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।]

১

শয্যা তাহার চোরা বালির তলে
মরুচিকায় তাহার তরী ভাসে,
আলেয়াতে আলোক তাহার জ্বলে,
তরক্ষু তার হাস্য দেখে হাসে।

২

গান গাহে সে ব্যাধের বাঁশীর সাথে,
বড়সী সনে নাচে জলের তালে,
কাক জ্যোছনায় ভ্রমণ করে রাতে,
উৎসব তার ঊর্ণনাভের জালে।

৩

দেয় সে খেয়া মায়া-নদীর মাঝে,
যায় সে হেসে জতুগৃহে লয়ে
ছলতে পারে কণক মৃগের সাজে
দলতে পারে হঠাৎ দানব হয়ে।

মাধবের সে পায় না কৃপা বটে,
পঙ্গু হয়ে লঙ্ঘে তবু গিরি,
মূক সহসা বাচাল হয়ে উঠে,
শৃগাল সে হয়ে ব্যাঘ্রে রাখে ঘিরি।

৫

সত্য সজীব রাজকুমারে ধরি
নিত্য সে হায় মাটীর তলে রাখে,
কিন্তু তারাই গন্ধে ভুবন ভরি
চম্পা যে হয় পারুল দিদির ডাকে

বিন্দুর বিবাহ।

(সত্য ঘটনামূলক গল্প)

[শ্রীসাহাজী]

(১)

"সতু, একি তোর অনাছিষ্টি! তোর জন্য কি শেষে আমাদের জাত যাবে?"—বিরজা যখন ভ্রাতাকে এইরূপ গালি দিতেছিল, ভ্রাতা সতীশচন্দ্র তখন উঠানে নেউল ধরিবার ফাঁদ প্রস্তুত করিতে বসিয়াছিল।

সতীশের বিদ্যার দৌড় ছিল দুর্গাপুর মধ্য ইংরাজি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত। নূতন ইউনিভার্সিটি আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পর যখন বিদ্যালয়ের বেতন বৃদ্ধি পাইল, ফুলস্কাপ পেপারের একসারসাইজ বুক যখন তুলটের কাগজের খাতার স্থান অধিকার করিয়া বসিল, ইংরাজি জি মার্কা নিব যখন বাংলা কলমি কলমের আসন কাড়িয়া লইল, ব্লটিং পেপারের প্লাবনে ভাজা বালি যখন আর হালে পানি পাইল না, খোলা পাতিলের কালি যখন ব্লুব্ল্যাক ইঙ্কের মদনমোহন মূর্ত্তি দেখিয়া লজ্জায় আস্তাকুঁড়ে মাথা লুকাইল, তখন মা-সরস্বতীর সেই রিফর্ম্‌ড্‌ মূর্ত্তি দেখিয়া দরিদ্র সতীশচন্দ্র রণে ভঙ্গ দিয়া চাকুরির চেষ্টায় বাহির হইয়া পড়িল। কলিকাতার মত সহরে নিজের খাইয়া পরের উমেদারি করিয়া অনেক কষ্টে অবশেষে সে মাসিক পনর টাকা বেতনের এক চাকুরি জুটাইয়া লইল এবং প্রতি মাসে দুই টাকা সীট্-রেন্ট্ ও সাড়ে সাত টাকা হোটেল চার্জ দিয়া

টাকা তিনেক মাত্র বাটীর খরচ পাঠাইয়া তিন মাস পরে হঠাৎ একদিন ত্র্যহস্পর্শ প্রভৃতি ত্রিদোষ উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং বেয়ারিং বুকপোষ্টে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। তাহার পর, সে কিছু দিন গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা লইয়া তাহার জন্মস্থ শনির ক্রোধ শান্তির উপায় খুঁজিতে লাগিল। সৌভাগ্যবশতঃ কিছুদিনের মধ্যেই

সাত হাত অন্তর এক হাত বাই,
কলা পুঁত গে চাষা ভাই।
পুঁতে কলা না কেট পাত,
তাতে কাপড় তাতেই ভাত।

এই উপায় মিলিয়া গেল। তখন "ক্ষেতের কোণা বাণিজ্যের সোনা' এ কথাও তাহার মনে জাগিল। সতীশচন্দ্র ক্রমে রীতিমত চাষী হইয়া পড়িল। বাড়ীর পাশে পুরুষানুক্রমে যে পতিত জমি ছিল, তাহাতে সে কাঁচা চাঁপা শবরি মদনা ইত্যাদি নানাজাতীয় কলা এবং তৎসহ পেঁপে গাছেরও আবাদ আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার শাক সবজিও জন্মাইতে লাগিল। সংসারে তাহার বিধবা দিদি বিরজা এবং তাঁহার বিবাহযোগ্যা কন্যা বিন্দু, সর্ব্বশুদ্ধ এই তিনটী প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন। সে কেরানীবাবু হইয়া তাহা জুটাইতে পারে নাই; কিন্তু চাষী হইয়া সহজেই তাহার যোগাড় করিতে পারিয়াছিল।

সম্প্রতি সতীশচন্দ্রের কলাবাগানে কয়েক কাঁদি মর্ত্তমান কলা পাকিয়াছে। পাছে নেউলে খাইয়া ফেলে, এজন্য সে বসিয়া বসিয়া নেউল ধরিবার ফাঁদ প্রস্তুত করিতেছিল, এমন সময়ে বিরজার ঐরূপ গালি খাইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "জাত যদি যায়, তোদের যাবে। আমার জাত অমন ঠুনকো কাচ নয়, একটু ঘায়ে ভেঙে যাবে। ছেলে ছুতোরের ছায়া মাড়ালে তোদের জাত যায়। পান থেকে চুণ খসেছে, আর কি? এই তোদের জাত। অমন জাত থাকার চেয়ে যাওয়াই ভাল।"

বিরজা বিরক্তির স্বরে বলিল, "তুই ভারি পণ্ডিত কি না? করণ-করা মেয়ের বিয়ে হয়, কোন্ শাস্ত্রে শুনেছিস্?"

সতীশ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "শাস্ত্রে নেই, তা জানি। কিন্তু করণ-করা মেয়ে বরণ করার মত বড় হয় কেন? শাস্ত্র তা ঠেকাতে পারে না? বলে, "ভাত দেবার মানুষ নয়, নাক কাটবার গোঁসাই।"—দিদির সম্মুখে এমন বে-তর শ্লোক কাটিতে সতীশচন্দ্রের মুখে বাধিল না। তখন সে ভিতরে ভিতরে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। দিদিকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল, "তোর করণ করার কিছু বলি। এক বছরের মেয়ে। কলাগাছের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে গাছটা কেটে তাকে বিধবা করে দেওয়া। গাছের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে! এরা কি জানোয়ার? এদের আবার শাস্তর? অমন শাস্ত্রের মুখে—" সতীশচন্দ্র বকিয়া বকিয়া শাস্ত্রের চৌদ্দপুরুষ বাপান্ত করিতে লাগিল। বিরজা আরব্ধ-বর্ষণ মেঘের মত দুই চক্ষু লইয়া ঘরে পলাইয়া গেল।

(২)

সে অনেক দিনের কথা। বিরজা তখন পনর পার হইয়া ষোলয় পড়িয়াছে। সতীশচন্দ্র তখন আট বৎসরের বালক মাত্র। তাহারা ছিল নিখুঁত কুলীন। বিরজার বাপ তাই কুলীন জামাতা খুঁজিয়া খুঁজিয়া একেবারে হয়রান হইয়া পড়িয়াছিলেন। বি-এ পাস করা এক ধনীর ছেলে বিরজার রূপ গুণ দেখিয়া যাচিয়া তাহার পানিপ্রার্থী হইয়াছিল। কিন্তু বিরজার বাপ ইচ্ছা সত্ত্বেও সমাজ এবং লোকনিন্দার ভয়ে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তথাপি অন্বেষণের ত্রুটী ছিল না। কিন্তু তাঁহার মত দরিদ্রের পক্ষে ভাল কুলীন জামাতা খুঁজিয়া পাওয়া সহজসাধ্য নহে। যাহা হউক, অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর, পাঁচশত খানি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে উনপঞ্চাশ বৎসরের উনুপাঁজরে এক নিখুঁত কুলীনের সঙ্গে বিরজার বিবাহ হইয়া গেল। স্বর্গে পিতৃপুরুষেরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। সমাজ দুই হাত তুলিয়া "ধন্য ধন্য" করিল। বাপ শ্বশুরের মুখ উজ্জ্বল হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পিতৃকুল শ্বশুরকুল উজ্জ্বল হইলেও মেয়ের নিজের দুই কুল সেই কৌলিন্যের ঝড় তুফানে কোথায় যে তলাইয়া গেল, তাহা কেহই লক্ষ্য করিলেন না।

বিরজার কুলীন বরের পরম উদার চরিত্র। অরক্ষণীয়া কুলীন কন্যার কুল রক্ষা করাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত।

এক একটী কন্যার পিছু পাঁচ পাঁচ শত টাকা দক্ষিণা লইয়া তিনি সে বয়সে পৌনে ছয় গণ্ডা কুলীন কন্যার সদ্গতি করিয়াছেন। এবার বিরজাকে লইয়া পূরাপূরি ছয় গণ্ডা পূরিল। বিবাহের পর, কুলীন জামাতা মাসিক দশ টাকা হিসাবে আক্কেল-সেলামি লইয়া ছয় মাস শ্বশুর-বাড়ীতে ছিলেন। বিরজার মা বাপও মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া প্রতি মাসেই জামাতার কৌলিন্য মর্য্যাদা স্বরূপ অর্থ প্রদান করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। কিন্তু কুলীন বাপাজী যখন আর সুবিধা নাই, বুঝিতে পারিলেন, তখন একদিন নূতন মধু সংগ্রহের আশায় কোথায় উধাও হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বিধির লিখন। তাই, কুলীন বর চলিয়া যাওয়ার দশ মাস পরে, বিরজার একটী কন্যা হইল। তাহাতেও সাক্ষাতে অসাক্ষাতে তাহাকে ভাল মন্দ দুই চারি কথা শুনিতে হইল। কিন্তু মেয়ের চাঁদপানা মুখ দেখিয়া মা নীরবে সকল গঞ্জনা আঁচলে পাতিয়া লইল।

এম্‌নি করিয়া এক বৎসর কাটিয়া গেলে, কন্যার জন্ম-সংবাদ পাইয়া আর একবার কুলীন বাপাজী হ্যালির ধূমকেতুর মত শ্বশুর-বাড়ীর আকাশে হঠাৎ উদিত হইলেন। পড়ি কি মরি, সবুর সহিল না। এক বৎসরের সেই শিশু কন্যাকে লাল চেলী পরাইয়া, এয়ো ডাকিয়া, শাঁখ বাজাইয়া, মন্ত্র আওড়াইয়া কলাগাছের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। বিবাহ শেষে স্বহস্তে হাত-দায়ের এক কোপে কলাগাছটা কাটিয়া ফেলিয়া, সীঁথির সিঁদুর মুছিয়া দিয়া, হাতের নোয়া শাঁখা পরণের চেলী খুলিয়া লইয়া দুগ্ধপোষ্য শিশু-কন্যাকে চির বৈধব্য প্রদান করিয়া আবার কোথায় সরিয়া পড়িলেন। কন্যাদায়গ্রস্তের কুল রক্ষা করাই কুলীনের পরম ধর্ম্ম। পরের কুল রক্ষা করিতে হইলে নিজের কুল বিশুদ্ধ রাখা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বিরজার মা বাপ দরিদ্র। অর্থের অনাটনে, পাছে বিরজার কন্যাকে তাঁহারা কোন ভঙ্গজের ঘরে বিবাহ দিয়া তাঁহার নিকষ কৌলিন্য কলঙ্কিত করিয়া ফেলেন, সেই ভয়ে তিনি পিতা হইয়া এই রূপে শিশু-কন্যার চির বৈধব্যের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। বিরজা চোখের জল মুছিয়া সেই কলা-করা মেয়েকে উচ্ছ্বসিত বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

এ সকল অনেক দিনের কথা। সে দিন চলিয়া গিয়াছে, শুধু স্মৃতি আছে। ঘা শুকাইয়া গিয়াছে, কেবল একটি কাল দাগ রাখিয়া গিয়াছে। স্নেহের সে মা বাপ আজ আর এ জগতে নাই। সে বিধবা হইয়াছে। আজ তাহার বিধবার বেশ, বিধবার ক্লেশ। হিন্দু স্ত্রীরা স্বামিত্বের দাবি করিতে জানে না, পত্নীত্বের দায়িত্ব-বোঝা স্বেচ্ছায় বহন করে। তাহাকে ভালবাসি বলিয়া সে আমার স্বামী, হিন্দু স্ত্রীদের ভালবাসার মূলমন্ত্র এরূপ নহে। তাহাদের প্রেমের মোহন মন্ত্র, সে আমার স্বামী বলিয়াই তাহাকে ভালবাসি। তাই তাহাদের এত বিড়ম্বনা, তাই তাহাদের এত গরিমা।

এম্‌নি করিয়া কত কথা আজ বিরজার মনে পড়িতে লাগিল। চোখের জলে তাহার বুক ভিজিয়া গেল। তাহার নিজের অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা হইয়াছে। কিন্তু ঐ ফুটন্ত কলি! পদ্মফুলের মত ঢল ঢল তাহার মুখখানি! চাঁদ নিঙাড়িয়া এক বিন্দু। সেও কি হায়, চিরজীবন দুঃখে কাটাইবে? কলা-করা মেয়ে—সে যে বিধবার সামিল। বিধবা—সে যে গৃহস্থ-বাড়ীর এঁটেলের ছড়া পাতিল। বিরজা আর ভাবিতে পারিল না। তাহার বুকের পাঁজরে দপ্ দপ্ করিয়া রাবণের চিতা জ্বলিয়া উঠিল। সে অনেক-ক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। শেষে কি ভাবিয়া বাহিরে আসিল, সতীশকে বলিল, "আচ্ছা সতু, এক বছরের মেয়ে—সে ত আর স্বামী চেনে না। সে যদি বিধবা হয়, তবে কি তার বিয়ে হবে না? এক বছরের মেয়ের কলাগাছ সাপ বেঙ যার সঙ্গেই বিয়ে হোক, একি কথা।"—সতীশচন্দ্র দিদির মনের ভাব বুঝিল। সে বলিল, "দিদি, এইবার ঠিক বুঝেছ। এক বছরের মেয়ে—তার গাছের সঙ্গেই বিয়ে দাও, আর যার সঙ্গেই দাও যে স্বামী চেনে না, তার আবার বিয়ে কিসের?" বিরজা আর কোন উত্তর দিল না। সতীশচন্দ্র দিদির এই প্রকার মন্তব্য শুনিয়া আশান্বিত হৃদয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে বিন্দুর বর খুঁজিতে আরম্ভ করিল।

(৬)

সতীশচন্দ্র বিন্দুর বিবাহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল বটে, কিন্তু এ কার্য্য সে যত সহজ বলিয়া মনে করিয়াছিল,

কার্য্যতঃ দেখিল, তত সহজ নহে। দুই এক স্থানে ঘুরিয়াই সে বুঝিল, হিন্দু সমাজের আষ্টে পৃষ্ঠে শাস্ত্রের বাঁধন। সে বাঁধন ছিঁড়িবার শক্তি কাহারও নাই, তাহার ছেলেবেলার "ঘাঘজানি" খেলার কথা মনে পড়িল। 'এতটুক পানি ঘাঘজানি। এদিক দিয়া যাব খোস্তা ফলে মারব, ও দিক দিয়া যাব, সরকি ফেলে মারব।' হিন্দু সমাজেরও সেই দশা। শেষে সে বুদ্ধি করিয়া প্রাচীন পন্থীদের আশা ছাড়িয়া নব্য-তন্ত্রের দলে খোঁজ করিল। কিন্তু দেখিল, সেখানেও বড় সুবিধা নাই। প্রাচীন পন্থীদের দুর্ব্বাসা মুনির মত কাঠখোট্টা শাস্ত্র-দেবতাকে দেখিয়া যেমন সাষ্টাঙ্গে গড় করিতে হয়, নব্যতন্ত্রীদের গালটুকটুকে নধর কান্তি নন্দদুলাল-গোছ "ম্যামন" দেবতাকে দেখিয়াও সেইরূপ সেলাম দিতে হয়। দেখিয়া শুনিয়া সতীশচন্দ্র অনেকটা দমিয়া গেল, কিন্তু একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল না।

এমন সময়ে একদিন বদন চক্রবর্ত্তীর পাইক আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। বদন গ্রামের মহাজন। জনরব, কাঠায় করিয়া টাকা মাপেন এমনি বড় লোক তিনি। দেড় বিঘা মাটী জুড়িয়া তাঁহার গদি-বাড়ী। সুন্দর গদিঘর। সেই গদিঘরের সম্মুখের দেয়ালে

> পিতৃ-বাণী
>
> (১) নিজে প্রতিপালিত হইব এবং অন্য দশজনকে প্রতিপালন করিব।
>
> (২) কাহারও ভিটামাটী উৎসন্ন করিব না।
>
> (৩) সুদের সুদ খাইব না।
>
> মহাজনের ইহাই আদর্শ।

এইরূপ লিখিত ফ্রেমে বাঁধান একখানা বোর্ড ঝুলান। শুনা যায়, বদনের পিতা গগন চক্রবর্ত্তী সৎলোক ছিলেন। একবার কোন ব্রাহ্মণ স্ত্রী-পুত্র লইয়া তাঁহার নিকটে কাঁদিয়া পড়েন, "চক্কোত্তি মশাই, আপনার পাইক পেয়াদা ডিক্রির দায়ে আমার বাড়ীঘর সমস্ত ক্রোক করিয়া লইয়াছে। বাকি এই স্ত্রী-পুত্রগুলি। এগুলি লইয়া আর যাই কোথায়? এগুলিও আপনি লইয়া আমাকে রেহাই দেন।"—ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া গগন চক্রবর্ত্তী অশ্রু-সংবরণ করিতে পারেন নাই। এমন কি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার ক্রোক-করা সমস্ত দ্রব্য খুঁটিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া না হইয়াছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি জলগ্রহণ করেন নাই। শুনা যায়, সেইদিন হইতে সহস্র ক্ষতি হইলেও কাহারও বাস্তুভিটা যেন অপহরণ করা না হয়, সে বিষয়ে সতর্কদৃষ্টি রাখিতে তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দেন। আর একবার জজ আদালতে তাঁহার একটা কর্জ্জা টাকা অনাদায়ের মোকদ্দমা ছিল। আসামীরা এজমালি কারবার করিতেন। হ্যাণ্ডনোটে সকলেই নাম সহি করিয়াছিলেন, কিন্তু টাকা তাঁহাদের একজন আসিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কার্য্যস্থলে এরূপ লেনা-দেনা সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। উকিলবাবু কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে চিনিতেন, তাই তিনি পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে শিখাইয়া রাখিলেন, হাকিম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যেন বলেন, টাকা আদান-প্রদানের সময়ে সকল আসামীই হাজির ছিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় উকিলবাবুর কথা শুনিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। শেষে জবানবন্দি দিতে উঠিয়া কহিলেন, "হুজুর, টাকা দিয়াছিলাম বটে রামুর হাতে, কিন্তু হাতচিটা লিখিয়া দিয়াছিল সকলেই।"—প্রত্যুত্তরে প্রতিবাদীরা কহিলেন, "রামুর নেওয়া টাকার জন্য তাঁহারা দায়িক নহেন। রামু কবে টাকা লইয়াছিল, তাহা তাঁহারা অবগত নহেন।" ফলে, রামুর উপর সমস্ত টাকার ডিক্রি হইয়া গেল। রামুর বাস্তুভিটা ধরিলেও শুধু ডিক্রি জারির খরচই উঠে না। সুতরাং হক টাকা অনাদায় রহিয়া গেল। মামলাবাজ লোকে চক্রবর্ত্তীকে বোকা ঠাওরাইয়া খুব এক চোট হাসিয়া লইল। সংসারের নিয়মই এমনি।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেকালের লোক ছিলেন। তাঁহার কাণ্ড-জ্ঞান-হীন হওয়া তেমন নিন্দার বিষয় নহে।—বলিতে গেলে, এইরূপ অনেক কথাই তাঁহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। ফলতঃ, গগন চক্রবর্ত্তী আজ পর্য্যন্ত এ অঞ্চলের লোকের প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছেন। আজো লোকে বিপদে পড়িলে তাঁহার নামে বিপদ্মুক্ত হইবার চেষ্টা করে। মৃত্যুকালে, চক্রবর্ত্তী-পুত্র বদনকে উক্ত তিনটি

উপদেশ দিয়া যান এবং বলিয়া যান, অন্যায় করিয়া কাহারও এক পয়সা যেন না লওয়া হয়, অন্যায় এক পয়সা কাহাকেও যেন না দেওয়া হয়, তাহা হইলেই সে ধনে বংশে লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়া থাকিবে। তাই, বোর্ডে বাঁধান ঐ উপদেশ্ বাণী তাঁহার গদীঘরে ঝুলিত। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি পিতার আদেশ বাক্য কতদূর পালন করিতেন, তাহা অন্তর্য্যামী অনন্ত চক্ষু ভগবান্ বলিতে পারেন।

বদন সম্প্রতি পঞ্চাশের কোঠায় পা দিয়াছেন। কিন্তু, এ পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তান সন্ততি হয় নাই, এবং ভবিষ্যতে হইবে, এমন আশাও নাই। কিন্তু তিনি নিজে তাহা বিশ্বাস করেন না। তাবিজ, কবচ, মাদুলি, তাগা, ফুঁকা, তুকতাক—আজ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া সকলই করিয়া আসিতেছেন। ডাক্তারী চিকিৎসায় তাঁহার বিশ্বাস নাই। কিন্তু পুত্রেষ্টি যজ্ঞে তাঁহার বিশেষ আস্থা। তবে কলিতে যজ্ঞ দেবতা অন্তর্হিত হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার যত দুঃখ। তবুও চেষ্টার ক্রটী নাই। বংশ লোপ হইবার ভয়ে, পিতৃ পুরুষের জল গণ্ডুষ বজায় রাখিবার জন্য, তিনি পর পর চারিটি বিবাহ করিয়া যদিও বিফলমনোরথ হইয়াছেন, তথাপি হাল ছাড়িয়া দেন নাই। সম্প্রতি আরও দুই একটি বিবাহ করিয়া দেখিবার ইচ্ছা যে তাঁহার একেবারেই নাই, তাহা হলপ করিয়া বলা যায় না।

যাহা হউক, এহেন বদনের পাইক ক্রমান্বয়ে দশ পনর দিন সতীশচন্দ্রের বাড়ীতে যখন তখন যাওয়া আসা করিয়া তাঁহার আঙ্গিনার দুই আঙ্গুল মাটি 'লিন্' করিয়া দিল। গদীঘরের চোর-কোঠায় বদনে আর সতীশে কয়েকদিন ধরিয়া অনেক কথাবার্ত্তা, অনেক বাদানুবাদ চলিল। শেষে একদিন দুইজনে উচ্চবাচ্য হইয়া গেল। বদন সতীশকে রাগিয়া বলিলেন, "তোর ভাগ্নী বিধবার সামিল। আমি নেহাৎ ভাল মানুষ, তাই তাকে নিতে চাইলুম। খাবে, পরবে, রাণীর হালে থাকবে। কারও বাবার সাধ্যি নেই যে কথা বলে। জাত যাবার ভয় নেই, একঘরে হবার ভয় নেই। বদন চক্রবর্ত্তীর জাত তার সিন্ধুকে। আর আমার বয়স এমন বেশীই বা কি? শিব ঠাকুরের সঙ্গেও ত অষ্টম বর্ষীয়া গৌরীর বিয়ে হয়েছিল। তোর ভাগ্নী ত ষোল বছরের ধেড়ে মাগী।"

এত রোষে-ক্ষোভেও সতীশের মুখে হাসি আসিতেছিল। কিন্তু সে কষ্টে তাহা সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আপনি ত শিব ঠাকুরের মত যমের বাড়ী থেকে মোকররি মৌরসি পাট্টা নিয়ে আসেন নি। শিব অজ, নিত্য, শাশ্বত পুরুষ।"

বদন উত্তর করিলেন, "শাস্ত্রে বুড়ার বিবাহের বিধি আছে।" শাস্ত্রের নাম শুনিয়া সতীশের চোখের সম্মুখে জোণাকি জ্বলিয়া উঠিল। সে কোন কথাই বলিল না। বদনের কর্ম্মচারী ঈশান বলিল, "শাস্ত্রে আছে, সন্ন্যাসী ভিন্ন গৃহীর বিপত্নীক থাকতে নেই। "গৃহিণীং গৃহমুচ্যতে।" গীতায় বলে, "বিহায় বস্ত্রানি জীর্ণানি।" শ্লোক মনে নেই, তবে তার অর্থ এই, যেমন পরণের কাপড় ছিঁড়ে গেলে একখানি নূতন পরে, তবে ছেঁড়াখানি ছাড়তে হয়। তাৎপর্য্য ভাল করে বোঝ। একা স্ত্রী মরলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে তবে মৃতা স্ত্রীকে দাহ করতে হয়। শাস্ত্রের এরূপ বিধি। তবে কলির জীবন অন্নগত প্রাণ। বিবাহ করতে হলে সেদিন উপোসী থাকতে হয়। তার ওপর আবার শ্মশানের কষ্ট। তাই আতুরে নিয়ম নাস্তি। কলিতে এক হরিনাম একাগ্র হয়ে করলে জীবের মোক্ষ হয়। আর মৃতা স্ত্রী, বন্ধ্যা স্ত্রী উভয়েই তুল্য।" এই বলিয়া ঈশান সুর করিয়া কহিল,—

"পুত্রহীন যে কামিনী শুন বৎসগণ!
জীবন মরণ তার জীবন মরণ॥

তাহারি পর, "গৌর হে হা নিতাই" বলিয়া হাতে তুড়ি দিতে দিতে হাই তুলিল।

সতীশ বলিল, "আপনার চমৎকার শাস্ত্রজ্ঞান, তবে জানেন কি, সতীশ শর্ম্মার স্পষ্ট কথা, সে বানরের গলায় মুক্তার মালা পরাবে না।"

"কি, এত বড় কথা?" কর্ম্মচারী লাফাইয়া উঠিল। বদন চক্রবর্ত্তী চোখ রাঙাইয়া হাত চাপড়াইয়া বলিলেন, "সতে, আমার পাওনা পঞ্চাশ টাকা এখনি চাই; নইলে তোর ভিটেয় যদি আমি ঘুঘু না চরাই, তবে আমার নাম বদন চক্রোত্তীই নয়।"

সতীশ ঝাঁপাইয়া উঠিল, "পঞ্চাশ টাকা কিসের? পাঁচ

টাকা আপনার পাওনা। এখনি ফেলে দিচ্ছি।" এই বলিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীতে ছুটিয়া গেল। পাঁচটি টাকা আনিয়া ঝনাৎ করিয়া বদনের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। বদন বলিলেন—এখনও পঁয়তাল্লিশ টাকা বাকি রইল।

"আর আমি এক পয়সাও ধারি নে," এই বলিয়া সতীশ হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

বদন তাহাকে শুনাইতে ছাড়িলেন না, সে ধারে কি না, আদালতে তাহা বুঝিয়া লইবেন।

সতীশ অদৃশ্য হইবামাত্র ঈশান টাকা পাঁচটী তুলিয়া লইল। বদনকে কহিল, "আপন মৃত্যুবাণ আপনি দিয়ে গেল। এই পাঁচ টাকায় ডিক্রীজারি পর্য্যন্ত হয়ে যাবে।"

তাহার পর, চোরকোঠায় দরজা বন্ধ করিয়া বদনে আর ঈশানে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ চলিল।

বদনের এই কর্ম্মচারিটি পরম বৈষ্ণব, মাথায় চুটকি, নাকে তিলক, গলায় তুলসীমালা। কিন্তু লোকে বলে, ওটা তুলসীর নয়, বাকসের মালা। তুলসীমালা গলায় দিয়া পাঁচরকম কথা বলতে নাই। আদালতে, যেখানে সত্য লইয়া টানাটানি, সেখানে সত্যের খুব কম আমদানি। কারণ যেখানে যে জিনিষের যত প্রয়োজন, সেখানে তাহার তত অভাব। তাই ঈশানের বাকসের মালাই বোধ হয় পছন্দসই ছিল। যাহা হউক, সে ছিল বদনের হিতৈষীদিগের অগ্রগণ্য। আসামী আসিয়া যখন বদনের নিকটে টাকা কর্জ্জ চাহে, বদন তখন ঈশানকে জিজ্ঞাসা করেন, "কি ঈশান, একে টাকা দেওয়া যায়?" ঈশান অমনি উত্তর করে, "না কর্ত্তা, ওর আছে কি যে টাকা দেবেন?" ঈশান যেন আগন্তুক আসামীর সংসারেরই একজন। সে যেন তাহার সংসারের খুঁটিনাটি সকলই জানে। বদনও ভাবেন, আহা! ঈশানের মত মানুষ নাই। মুনিবের প্রতি তাহার কি টান। মুনিবের যাহাতে এক পয়সা নষ্ট না হয় সেজন্য তাহার কত চেষ্টা। উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলে। ইতিমধ্যে আসামীও ঈশানের চোখে চোখে "ওয়্যারলেস্ টেলিগ্রাফে" "মেসেজ" বিনিময় হইয়া যায়। অমনি "বাবুর কাছে বড় আশায় এনু, তা নছিব মন্দ" এই বলিয়া সেলাম করিয়া আসামী চলিয়া যায়। ঈশানও গাড়ু হাতে বাহির হইয়া যায়। তাহার পর, ঘরের কাছেতে উভয়ের সাক্ষাৎ, খানিকক্ষণ দরদস্তুর। ঈশানের হাতে আসামীর পাঁচ তঙ্কা প্রদান। গাড়ু হাতে ঈশান তখন ঘরে ফিরিয়া আসে, বদনকে বলে, "কর্ত্তা, নইমদ্দিকে শতাবধি টাকা দেওয়া যায়। গেরস্থ মানুষ হাল গরু, দশবিঘে খামার জমি, বাড়ীতে টিনের ঘর। খানেওলা কম, একা স্ত্রী, এক বেটা।"

বদন শুনিয়া বলেন, "আগে বল্লে না। ও যে চলে গেল।"

ঈশান বিজ্ঞের মত হাসিয়া বলে, "কর্ত্তা, সাক্ষাতে কি বলতে আছে? ও বেটাদের নাই দিলে পাতে বসে খায়।"

ঈশানও তখন গাড়ু রাখিয়া বাহিরে আসে এবং "নইমদ্দি, ও নইমদ্দি" করিয়া বিকট চীৎকার জুড়িয়া দেয়।

এহেন ঈশানের যুক্তি বদন চক্রবর্ত্তীর নিকট পরম উপাদেয় বলিয়া বোধ হইত।

(৪)

পরদিন, বদন চক্রবর্ত্তীর খাজনা-কোঠায় গোমস্তা হরিধন মজুমদারের তলব হইল। হরিধন খাতাপত্র লইয়া কর্ত্তার নিকটে হাজির হইল। বদন বলিলেন, "দেখ ত সতীশ বাঁড়ুয্যের বাকি কত?" হরিধন খাতা না দেখিয়াই জবাব দিল, "আজ্ঞে, পাঁচ টাকা।"

বদন মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "খাতা দেখ্‌না কেন?"

হরিধন "শুভ পাইকারি হিসাব বহি" খুলিয়া তাহার কথা যে ঠিক, তাহা প্রমাণ করিল। কিন্তু কর্ত্তা রাগিয়া সতীশের দস্তাবেজখানি তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। হরিধন দেখিল, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে "পঞ্চাশ তঙ্কা মাত্র" লেখা রহিয়াছে। বুদ্ধিজীবী কায়স্থের সন্তান সে, স্কুলে তাহার স্মরণশক্তির প্রশংসা ছিল। আজ দেড় মাসও হয় নাই, সে আপন হাতে, সতীশ বাঁড়ুয্যেকে পাঁচ টাকা দিয়াছে। তাহার সে কথা বেশ মনে আছে। তবে পঞ্চাশ হইল কেমন করিয়া? ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিল, ৫এর পিঠে ০ বসাইয়া "পঞ্চ"র পাশে "াশ" লিখিয়া পঞ্চাশ তঙ্কা করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। বিশেষ, ঈশান যখন বর্ত্তমান, তখন তার অসম্ভব কি?

বদন দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, "দেখছ কি? শুদ্ধ করে থ। টাকা তুমি দিয়েছিলে। তুমিই সাক্ষী আছ।"

হরিধন কিছুক্ষণ শুষ্ক কাষ্ঠের মত আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। শেষে ধীরস্বরে বলিল, "অশুদ্ধ কিছুই নেই। আমি আপন হাতে সতীশ বাঁড়ুয্যেকে পাঁচ টাকা দিয়েছি।"

আহাম্মক!—বদন গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "তুমি আমার কর, তা জান?"

হরিধন রুদ্ধশ্বাসে কহিল, "কর্ত্তা, আমি আপনার কর, আপনি আমার মুনিব, এ কথা সত্য। কিন্তু আমার আপনার চেয়েও বড় আর এক মহাজন আছেন। তিনি আমার এই বুকে বাস করেন। তাঁর কথা ঠেলে আমি আপনার কথা শুনতে পারি নে। আমি কাজে ইস্তফা দলুম। স্ত্রীপুত্র নিয়ে একবেলা খাব, তবু অন্যায় অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিতে পারব না। গগন চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মের ঘরে এমন অধর্ম্ম ভগবান সইবেন না।"—হরিধন কর্ত্তার সম্মুখে একটি প্রণাম রাখিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেল।

* * * * *

এই ঘটনার পর দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। হঠাৎ এক দিন দুপুর বেলায়, যখন বাড়ীর সকলে খাইতে বসিবে, তখন ডিক্রিজারির পরোয়ানা লইয়া আদালতের পিয়ন সতীশচন্দ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সে পরোয়ানায় লেখা ছিল, বাদী বদনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, প্রতিবাদী সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনি কত কি ছাই।

সতীশচন্দ্র কোন কথা না বলিয়া নীরবে ভগিনী ও ভাগিনেয়ীর হাত ধরিয়া পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া গেল। রান্নাঘরে বাড়া ভাত পড়িয়া রহিল। পোষা মেনী বিড়ালটিও সেদিকে ফিরিয়া চাহিল না। বদন চক্রবর্ত্তী তখন হাঁকিয়া বলিলেন, "আমার পিতার আদেশ, আমি কারো ভিটামাটি উচ্ছন্ন করি নে। ঈশানকে আমি এ বাড়ী পূর্ব্বেই দান করেছি।"

সতীশ ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু যাইবে কোথায়? মাথা রাখিবার স্থান কোথায়? খোলা-কাটা বামুনের খোলার ঘর একবার গেলে আর হয় না। এমন সময়ে সে দেখিল, সম্মুখে হরিধন। হরিধন বলিল, "দুঃখ কি ভাই? আমার ঘরে আয়।"

সতীশ কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল, "তোর ঘরে যাব? কেন, ভাই?"

হরিধন কহিল, "তোর ভাগ্নী যদি আমার বৌমা হন।"

সতীশ স্তম্ভিত, অবাক! কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "অসবর্ণ বিবাহ?"

হরিধন বলিল, "দোষ কি ভাই? স্বজাতি তোর বদন চক্রবর্ত্তী, না আমি?"

সতীশ অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল। শেষে অশ্রুতে গলিয়া হরিধনকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "সত্যই ভাই, প্রকৃত স্বজাতি আমার তুই। আপন জনকে ভুলে এতদিন বৃথাই পরের দোরে ঘুরে মরেছি।"

হরিধন হাসিয়া কহিল, "মেঘের আড়ালে রৌদ্রের হাসি ভগবান্ এমনি করেই লুকিয়ে রাখেন, ভাই!"

কবি-স্মৃতি।

[শ্রীকিরণগোপাল সিংহ]

যদিও তাদের খেলা এবে সমাপন—
নাট্যমঞ্চ যবনিকা হয়েছে পতন—
তবু তাহাদের সেই রঙ্গ অভিনয়
জাগায় স্মৃতির কক্ষ করি' মধুময়।
তাহাদের সে সঙ্গীত এখন ধরায়
প্রকৃতি শিশুর সাথে নাচিয়া বেড়ায়—
বাজায়েছে কবে বাঁশী, এখন' সে সুর
রাখিয়াছে ভক্ত-হৃদি করি ভরপুর।
তটিনী গাহিয়া গেছে কল কলি ধীরে
উলটি পালটি পাড় আছাড়িয়া তীরে—
যদিও মিশেছে তারা সাগরের সঙ্গে—
তবু তাহাদের স্মৃতি মানস নয়নে
ধন ধান্যে ষড়ৈশ্বর্য্যে শ্যাম সুষমায়
চিত্র সম স্বপ্ন সম—ছায়া সম ভায়।

হোলী হায়।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত]

(১)

চোখে ঘুমের ঘোর, দেহে যেন পর্ব্বতের ভার, কিন্তু প্রাণের মধ্যে দারুণ নেশা জাহ্নবীর পরপারে সূর্য্যোদয়ের চিত্র দেখিবার। মাত্র সেই দিন কাশীধামে পৌঁছিয়াছি—অলি-গলি ঘুরিয়া, সহস্রাধিক শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া দেহে আনিয়াছিলাম অবসাদ, কিন্তু মনের মধ্যে অন্তঃপ্রকৃতির একটা ঝনঝনে তারে আঘাত লাগিয়াছিল। সে সুর মনকে জাগাইয়া রাখিয়াছিল অথচ দেহের অবসাদ যেন বিশ্বনাথের উদাসীনতাকে বাহ্য-প্রকৃতির উপর লেপিয়া দিয়াছিল। "শঙ্করমৌলিনিবাসিনী" পুণ্যসলিলা আপাততঃ কাশীতলবাহিনী হইয়া আমার বাসাবাটির নিম্নে বহিয়া যাইতেছিল—তাহারই কুলু কুলু ধ্বনি শুনিয়া, তাহার এলোমেলো তাণ্ডব তরঙ্গপ্রবাহের উপর চাহিয়া চাহিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলাম। এখন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম রজনীর শেষভাগে, উজ্জ্বল দীপ্তিতে শুক্রগ্রহ দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে আর তাহার গভীর লম্বা ছায়া ভাগীরথীর লাস্যময় দেহের অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল ত্রিভুবন একই সূত্রে বাঁধিতেছে। বালারুণের চিহ্নের মধ্যে ছিল—ব্যাস-কাশীর আমবাগানের উপর কতকটা সিন্দুররাগ।

বারাণসী সুপ্ত থাকেন মাত্র তিন ঘণ্টা। সেই ঊষার প্রাক্কালের "বম্ বম্" "হর হর শঙ্কর" ধ্বনি ঘুমঘোরের আলস্য জড়তাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি বক্ষে উপাধান দিয়া ঘাটের দিকে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলাম এক রমণী মূর্ত্তি—কি সুন্দর, সুগঠিত দেহ, কি অপরিমেয় কান্তি -অথচ কি বিষাদ-মলিন শান্ত মুখ। আমি সেই নিশাবসানে তারার আলোকে কখনই সেই সদ্যস্নাতা পরস্ত্রীর দিকে চাহিতাম না যদি না সুন্দরীর সেই শান্ত ম্লান মুখচ্ছবি আমার তন্দ্রা-শিথিল চক্ষুকে অভিনিবেশ করিত। শুধু দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াই তো যুবতী ক্ষান্ত হইল না। তাহার আন্তরিকতা আমার শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিল। জনহীন হনুমান ঘাটে চাতালের উপর বালারুণের বিকীর্ণ লাল আভার উদ্দেশে যুবতী অর্ঘ্য দিল। তাহার পর গঙ্গা-মৃত্তিকায় শিবলিঙ্গ গড়িয়া ভক্তিভরে শেফালিকা ও বিল্বপত্রে শঙ্করের আরাধনা করিতে লাগিল। পূজার শেষে যখন গললগ্নীকৃতবাসে যুবতী মহাদেবকে প্রণাম করিল, চক্ষু মুদিয়া জোড়করে তাঁহার নিকট কি জানি কি বর মাগিল, তখন তাহার ম্লান মুখ কি অপরিমেয় শোভা ধারণ করিল তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। কিসের কামনায় সুন্দরী প্রার্থনা করিতেছিল জানি না, আকাঙ্ক্ষিতের আশায় কিন্তু তাহার ম্লান মুখ দিব্য কান্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

আমার একাগ্রতা ভাঙ্গিল স্ত্রীর স্পর্শে। সে মদালসা ভাবে তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে বলিল—উপুড় হ'য়ে কি দেখছ?

আমি তাহার দিকে না চাহিয়া বা তাহার কথার উত্তর না দিয়া ঘাটের দিকে অঙ্গুল নির্দ্দেশ করিলাম। সে মুখ তুলিয়া দেখিয়া বলিল—ওঃ! হৈমবতী। আমাদের পাশের বাড়ীতে সে থাকে। মথুরা বাবুর মেয়ে।

(২)

সেই দিনই দুপুরবেলা আমার পুত্র হেমচন্দ্র বেশ ফুটফুটে একটি ক্ষত্রিয় বালকের সহিত গঙ্গার ধারে বারান্দায় বসিয়া এক ভীষণ হিন্দী ভাষার স্রোত বহাইয়া জাহ্নবী স্রোতের সহিত প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত ছিল। সে বলিল—দেখো ভাই এই বাঁদরগুলো বড় বদমায়েস হায়। এরা বহুৎ জালাতন করেঙ্গা।

ভাষার ব্যাকরণ যাহাই হউক, শিশুর ভাষা শিশুতে বুঝে। ধরমলাল বলিল—ভাই ইয়ে বান্দরকো হরবখত মার্না চাহিয়ে। রা রা রা রা লগ্ লগ্ লগ্ ইয়েঁা পিটনা।

একটা বাঁশের লাঠি লইয়া ধরমলাল একপাল বাঁদরকে

তাড়া করিল। আমার পুত্রও উৎসাহের সহিত সে কার্য্যে যোগদান করিল।

আমি বালকটিকে যত্ন করিয়া নিকটে ডাকিলাম। সলজ্জভাবে সে আমার নিকট আসিল। তাহার নাম ধন্নুলাল মেহেরা। মথুরা বাবু তাহার মাতামহ। তাহার পিতার নাম কাক্কামল।

কাক্কামল কি কাজ করে? বালক জানে না। কাক্কামলের নিবাস কোথা? শুনিলাম লক্ষ্ণৌ। বালকের লক্ষ্ণৌ স্মরণ নাই। বহুদিন সে মাতুলালয়ে বাস করিতেছিল। তাহার নানী তাহাকে অত্যন্ত 'পেয়ার" করে। মাতামহের মেজাজ রুক্ষ। মাঝে মাঝে তাহাকে তিরস্কার করে। তবে আদরই করে অধিক সময়।

আমি বলিলাম, তোমার পিতা মধ্যে মধ্যে বেনারসে আসেন?

সে এক কথায় বলিল—নেহি।

আমি বলিলাম—তুমারা মায়িজী যা'তি হায় লক্ষ্ণৌ?

সে বলিল— নেহি।

সে আমার পুত্রের হাত ধরিয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম—তোমারা বাবা কাঁহা হায়?

সে বলিল—পাত্তা নেহি।

"পাত্তা নেহি?"

বালক একেবারে আমার কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কি সর্ব্বনাশ! তবে কি বালক পিতৃহীন! না। আমি তাহার মাতার শিরে সিন্দুরের রেখা দেখিয়াছি। শিশুকে লইয়া বড় বিব্রত হইলাম। আমার স্ত্রী আসিয়া বলিল—"তুমি যেন কি রকম?"

সে সস্নেহে ধন্নুকে লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

(৩)

পাত্তা নেহি! নিরুদ্দেশ! তাই সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখ বিষাদ ম্লান। তাই তাহার আরাধনায় এত নিষ্ঠা। আর সেই হতভাগ্য কাক্কামল—যেমন অসাধারণ নাম তেমনি কি অসাধারণ ব্যবহার! আমার সহধর্ম্মিণীর সহানুভূতিতে তাহার সহিত হৈমবতীর সখিত্ব ফুটিয়া সরস হইতেছিল। সে কাশীর মেয়ে বাঙ্গালা জানিত, বাঙ্গালা নবেল পড়িত। আমার স্ত্রী আশারাণী তাহার দুঃখের কাহিনীটা জানিয়া লইয়াছিল।

কাক্কামল লক্ষ্ণৌর এক রেশমী ব্যবসায়ীর একমাত্র পুত্র। হৈমবতী ধনী-কন্যা, তাহার পিতা বিবাহের পর জামাতাকে গৃহে পালিতেছিলেন। গৃহ-পালিত জামাতাদিগের সনাতন রীতি অনুসারে কাক্কামল আলস্য ও বিলাসিতার সাধনা করিত—কাশীর রেশমী কাপড়ের দোকানে বসিত না। কিন্তু কেবল যদি কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা করিয়া কাক্কামল দিনাতিপাত করিত তাহা হইলেও হৈমবতীর বা তাহার জনক জননীর ক্ষোভের কারণ থাকিত না। সে দ্যূতাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—দোকানের টাকা কড়ি লইয়া, স্ত্রীর নিকট হইতে অর্থ কাড়িয়া লইয়া সে জুয়ায় নষ্ট করিত। এই দ্যূতক্রীড়াই সুন্দরী হৈমবতীর প্রাণে হলাহল ঢালিয়া দিয়াছিল।

সেদিন দুপুরে আমি ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া ছিলাম। আমার পুত্র ও ধন্নুলাল ছাদের উপর বানরের পালের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিল। বাহিরে বারান্দায় আমার সহিত হৈমবতী গল্প করিতেছিল। আমাকে শুনাইবার জন্যই আশা সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিল।

আশা বলিল—তখন ধন্নু কত বড়?

সে বলিল—চার বৎসরের, এখন ধন্নুর উমর আঠ।

আশা বলিল—কোনও খবর পাও নাই?

সে বলিল—না ভাই কোনও খবর পাই নাই। তিনি কোথা আছেন, কোন্ মুলুকে আছেন, কিছুই জানি না। আর কি ভাই তিনি আসবেন?

আশা আশা দিয়া বলিল—দুঃখ ক'র না ভাই, এ রূপ ছেড়ে তিনি স্বর্গেও থাকতে পারবেন না।

আশা তাহার চিবুক ধরিল। সে একটু ম্লান-হাসি হাসিয়া বলিল—ভাই শেষ দিনের কথা মনে হ'লে আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না। কতবার যে মা গঙ্গার কোলে প্রাণ রাখতে—

আশা বলিল—ছিঃ। ও কি পাগলামী! ধন্নুলাল বড় হ'বে—

সেই আশাতেই তো বেঁচে আছি। আমাকে রাত্রে বললেন—'এখনি তোমার গলার মতির মালাটা দাও।' আমি তখন তাঁর কথা শুনলাম না! সে বলিল—'স্বামীর চেয়ে তোমার মালা বড় হ'ল? আমার ইজ্জৎ যাবে! আমি চললাম। আর তোমার মুখ দেখব না'। কে জানে সত্যি যাবেন, কে জানে কপালে এই যন্ত্রণা আছে। এক একখানা গহনা নিতেন আর বাবা আমাকে যথেষ্ট তিরস্কার করতেন। তাই দিই নাই ভাই।

আমি বলিলাম—তুমি তাঁর ভালোর জন্যই দাওনি। থাকলে তো তাঁরই থাকত।

সে বলিল—কি জানি ভাই। যে মতির মালার জন্যে স্বামীকে হারিয়েছি সে পাপ মালাটা গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছি, কই ভাই তবু তো তিনি এলেন না।

আশা বোধ হয় কাঁদিতেছিল। সে গদ গদ কণ্ঠে বলিল—তোর এতখানি ভালবাসা। বাবা বিশ্বনাথ তোকে—

সে বলিল—ভাই এত কু-চরিত্র হ'য়েছিলেন জুয়া খেলতেন কিন্তু তাঁর প্রাণে বড় গভীর ভালবাসা ছিল। ছেলেবেলায় আমার গলায় একটা তাবিজ ছিল আমার নাম লেখা। তিনি কবচ করে তাকে হাতে পরেছিলেন। লোকে উপহাস করত, কত কথা বলত, তিনি গ্রাহ্য করতেন না। এত ভালবাসতেন বলে অভিমানটা এত বেশী হ'য়েছিল।

আশা বলিল—সেদিন থেকে কোনও খবর নেই?

সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল—কি শুনবে ভাই? কাশীতে জুয়ার টাকা সংগ্রহ করবার জন্যে কার জেব থেকে টাকা তুলে নিয়ে জেলে—

যুবতী আর বলিতে পারিল না। আমি ভাবিলাম—"হাঃ অদৃষ্ট! এই জেলের আসামী চোরের জন্য এমন সোণার কমল শুকিয়ে যাচ্চে। লোকটাকে পেলে বেত্রাঘাত করা উচিত।"

জেল হইতে বাহির হইয়া কাক্কামল কোথা গিয়াছিল তাহার সন্ধান কেহ জানিত না। জুয়ার নেশা ভীষণ নেশা। টাকার টানের জন্য তাহার করপল্লবে আরও অনেক বার লোকের পকেট-গত হইয়াছিল সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। ছিঃ! ছিঃ! এই সোণার কমল আর সেই পকেটমারা! বিধির রসবোধ অদ্ভুত।

(৪)

হোলী হায়! কি বীভৎস ব্যাপার। হৈ হৈ কাণ্ড—পৈশাচিক উৎসব! লোকগুলা ভূত প্রেত দৈত্য দানব সাজিয়া আজ রকমারি বর্ণ বিন্যাস করিয়া কি বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়াছিল! আর ইহাদের বেশভূষা অপেক্ষা বিচিত্র ইহাদের কবিতার ভাষা। ছিঃ ছিঃ পর্ব্বের দিন শুভদিন—কি জঘন্য অশ্লীল ভাষা। প্রত্যেক অশ্লীল ছড়ার শেষে সমস্বরে লোকগুলা বলিতেছিল—"ছ্যা রা রা রা!" গগনভেদী চীৎকার। নেহাত কঠিন পীড়ার চিকিৎসা করিবার জন্য আমি আজ হোলীর দিন বড় বাজারে আসিয়াছিলাম।

আমি রোগী দেখিয়া ফিরিতেছি কতকগুলা পশ্চিমের লোক কালিঝুলি মাখিয়া আবীর ও কুঙ্কুম লইয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিল। আমি বলিলাম—"হাম্ ডাক্তার হায়।" লোকগুলা "হোলি হায়" ও "ছ্যারা রা রা কবির" বলিয়া হুঙ্কার দিয়া একটি লোকের উপর পড়িল। তাহারা বোধ হয় তাহাকে অনুসরণ করিতেছিল। দুই তিন জন তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আবীর মাখাইবার ভান করিতে লাগিল। একটা লোক তাহার পকেটে হাত দিয়া এক তাড়া নোট বাহির করিয়া লইল। ঠিক আমার চক্ষের উপর কলিকাতার সহরের দিনের বেলায় এমন দস্যুতা হইতেছে—ইহা সহ্য করা অনুচিত। আমি নোটের তাড়া সহিতে তস্করটাকে জড়াইয়া ধরিলাম। যাহার চুরি গিয়াছিল সে মারবাড়ীটিও চোর চোর করিয়া চীৎকার করিল। বে-গতিক দেখিয়া অপর দুর্বৃত্তগুলা পলাইয়া গেল। আমি যে চোরটাকে ধরিয়াছিলাম—তাহাকে ছাড়িলাম না। তাহার নিকট হইতে নোটের তাড়াটা কাড়িয়া লইয়া ভদ্রলোককে পুলিস ডাকিতে বলিলাম।

গলির সে অংশটা নির্জ্জন হইল, অপর দিকে লোকে হোলীর আমোদে মত্ত। আমাদের দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না। লোকটা অনুনয় বিনয় করিতেছিল। হাতে

পায়ে ধরিতেছিল, বলিতেছিল—বাবু রক্ষা করুন; ক্ষমা করুন। আমি ভদ্রলোকের ছেলে কু-সংসর্গে পড়ে এ কাজ করেছি। ক্ষমা করুন।

আমি বলিলাম—তুমি তো বাবা পুরান চোর। যে রকম হাত সাফাই। এ কাজ প্রায়ই কর।

সে বলিল—বাবু, হ্যাঁ, অনেকবার মেরেছি,কখনও ধরা পড়িনি। রক্ষা করুন বাবু।

লোকটার মুখ যেন কোথায় দেখিয়াছি; হাত মুখ রক্ত মাখা। তাহার পিরাণের নিচে গৌরবর্ণ দেহ দেখা যাইতেছিল। আমার ভয় হইতেছিল লোকটার কাপড়ের মধ্যে কোথাও কোনও অস্ত্র লুক্কায়িত আছে। তাহার বস্ত্রাদি পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। হাতে একখানা কবচ ছিল। তাহাতে কয়টা অক্ষর লেখা ছিল। পড়িয়াই আমি চমকিয়া উঠিলাম, তাহাকে কোথায় দেখিয়াছি এখন স্মরণ হইল। আমি তাহাকে বলিলাম—তোমার নাম কি?

সে বলিল—গজানন।

আমি বলিলাম—মিথ্যা কথা! তুমি কাক্কামল, মথুরা বাবুর দামাদ।

সে অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমার সন্দেহ রহিল না—সে মুখ ধন্নুর মুখের বৃহৎ সংস্করণ—রাজ সংস্করণ নয়। আমি বলিলাম, কবচে কার নাম?

সে বলিল—হৈমবতীর। আমার স্ত্রীর।

সে বাহুর দ্বারা চক্ষু মুদিয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিল—ডাক্তার বাবু—কি ছোটে হ'য়েছি—

আমি তাহাকে আমার রোগীর বাড়িতে লুকাইয়া রাখিলাম। পুলিস আসিলে—তিন হাজার টাকার নোট তাহাদের হস্তে দিয়া বলিলাম—সে বদমায়েসকে কি এতক্ষণ ধরে রাখিতে পারি? সে পালিয়েছে।

মনে মনে ভাবিলাম—হাঃ বিধি এই অপরূপ পদার্থের জন্য সেই স্বর্ণ-লতিকা শুকাইতেছে! কবচটা নাকি প্রেমের চিহ্ন! হাঃ অদৃষ্ট!

(৫)

আবার কাশী, আবার হনুমান ঘাট, আবার প্রভাত। তবে থালারুণের অর্দ্ধেকটা আমগাছের উপর উঠিয়াছে। নেপালের রাণীর নির্জ্জন মন্দিরের ভিতর হৈমবতী সেই রকম ভক্তি গদ গদ প্রাণে বাবা শৈলেশ্বরের অর্চ্চনা করিতেছিল। ধন্নু বলিল—মা ডাক্তার বাবু আগয়ে।

সুন্দরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে বিস্মিত ভাবে আমার দিকে দেখিতে লাগিল। আমি বলিলাম—ধন্নুর মা! আজ আমাকে লজ্জা করবেন না। আজ মহাদেব আপনার পূজা গ্রহণ করেছেন। বর নিন।

আমি মন্দিরের দ্বারের পাশ হইতে কাক্কামলকে ধরে টানিয়া আনিলাম, সাধ্বী কাঁপিতেছিল। কাক্কামলের আর দস্যু ভাব নাই, তাহার চক্ষে গভীর স্নেহের ভাব। যেন সেই ত্রিদিবচারিণীর সান্নিধ্যে তাহার অন্তঃপ্রকৃতির লুক্কায়িত মধুরতাটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে সহধর্ম্মিণীর দিকে চাহিয়া বলিল—মাফ—

ছিঃ ছিঃ, ক্ষমা প্রার্থনা! হৈমবতী দুই জানু পাতিয়া, শৈলেশ্বরের সম্মুখে জোড় হস্তে বসিল। এক অপূর্ব্ব সুষমা যেন কে তাহার মুখে লেপিয়া দিল। সে কম্পিত-কণ্ঠে বলিল—শঙ্কর! শঙ্কর! মহাদেও! মহাদেও!

তাহার পর—সে আমার দিকে চাহিল। কি গভীর কৃতজ্ঞতার চাহনী!

আমি বলিলাম—কাক্কামল, পুরাণ কথা ভুলিয়া বাবার শিরে হাত দাও, হৈমবতী তুমিও বাবার শিরে হাত দাও। বল যেন জীবনে মরণে তোমাদের আর বিচ্ছেদ না হয়।

তাহারা বাবার মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই সম্মিলিত অশ্রুধারা বিন্দু বিন্দু বাবার মাথায় পড়িতে লাগিল। ছেলেটাও যোগদান করিল। বাবার কি অপূর্ব্ব ত্রি-ধারার জলে প্রাতঃস্নান হইল—গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সম্মিলিত বারিধারা হইতে এ ত্রিধারা কম পবিত্র কাহার সাধ্য সে কথা বলে?

দেশীয় ভৈষজ্য তত্ত্ব।

["বঙ্গরত্ন" সহঃ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত, এচ্, এম্, বি]

"ত্রিফলা"

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

হরীতকী—

আমরা এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন রোগে হরীতকী প্রয়োগের বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

(১) বিষম জ্বরে হরীতকী—হরীতকী মধুর সহিত লেহন করিলে বিষম জ্বর বিনষ্ট হয়।

(২) অতিসারে হরীতকী—অতিসার রোগীর উদরে যন্ত্রণা থাকিলে ও অল্প অল্প বিবদ্ধ মল নির্গত হইলে হরীতকী ও পিঁপুল চূর্ণ বাটিয়া উষ্ণজল সহ পান করাইয়া বিরেচন করাইলে অতিসারে উপকার হয়।

(৩) অর্শে হরীতকী—রক্তার্শ রোগীকে ভোজনের পূর্ব্বে হরীতকী গুড়ের সহিত সেবন করাইবে।

(৪) ঘৃত ভর্জ্জিত হরীতকী—পিঁপুল ও গুড় সহ বা তেউড়ী ওদন্তী মূলের সহিত সেবন করিলে বায়ুর অনুলোম হইয়া অর্শ ভাল হয়।

(৫) গুড়ের সহিত প্রত্যহ হরীতকী সেবন করিলে আমাজীর্ণ অর্শ ও মলবদ্ধতা বিনষ্ট হয়।

(৬) শ্বাস ও হিক্কায় হরীতকী—হরীতকীর সহিত সম পরিমাণ শুঁঠ পেষণ করিয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিলে শ্বাস ও হিক্কায় বিশেষ উপকার হয়।

(৭) স্বরভেদে হরীতকী—হরীতকীর সহিত সম পরিমাণ শুঁঠ অথবা পিঁপুল মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে স্বরভেদ নষ্ট হয়।

(৮) গৃধ্রসী রোগে হরীতকী—হরীতকী চূর্ণ এরণ্ড তৈল সহ সেবন করিলে গৃধ্রসী (Scitica), আমবাত ও বৃদ্ধি রোগ ভাল হয়।

(৯) বৃদ্ধি রোগে হরীতকী—হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ এরণ্ড তৈলে ভর্জ্জিত করিয়া সৈন্ধব লবণ সহ সেবন করিয়া উষ্ণজল পান করিলে—দীর্ঘকালজ বৃদ্ধি রোগ ভাল হয়।

(১০) হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, ঐ ক্বাথের সহিত এরণ্ড তৈল ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কফ বাতজ বৃদ্ধি রোগ ভাল হয়।

(১১) হরীতকী চূর্ণ এরণ্ড তৈলে ভাজিয়া পিঁপুল ও সৈন্ধব লবণ সহ সেবন করিলে বৃদ্ধি রোগ নষ্ট হয়।

(১২) কুষ্ঠে হরীতকী—হরীতকী চূর্ণ সম পরিমাণ নিম্বপত্র চূর্ণ সহ সেবন করিলে ১ বা ১॥ মাসের মধ্যে কুষ্ঠ রোগ ভাল হয়।

(১৩) অম্লপিত্তে হরীতকী—হরীতকী সম পরিমাণ কিস্‌মিসের সহিত পেষণ করিয়া পুরাতন গুড় ও মধু সহ সেবন করিলে অম্লপিত্ত ভাল হয়।

(১৪) নেত্র রোগে হরীতকী—হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া চক্ষুর বহির্ভাগে লেপন করিলে নানা প্রকার নেত্র রোগ ভাল হয়।

—"চক্রদত্ত"।

(১) সন্নিপাত জ্বরে হরীতকী—তিল তৈলে, ঘৃত কিম্বা মধুর সহিত হরীতকী সেবন করিলে কণ্ঠদাহ নামক সন্নিপাত জ্বর নষ্ট হয়।

(২) আমাজীর্ণে হরীতকী—গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিলে আমাজীর্ণ, অর্শ ও কোষ্ঠবদ্ধে উপকার হয়।

(৩) পিত্তশূলে হরীতকী—ঘৃত কিম্বা গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিলে পিত্তশূলে বিশেষ উপকার হয়।

—"ভাবপ্রকাশ"।

(১) অতিসারে হরীতকী—উষ্ণজলের সহিত হরীতকী সেবন করিলে অতিসারের আমদোষ বিনষ্ট হয়।

(২) পাণ্ডুরোগে হরীতকী—হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ

করিয়া গোমূত্র সহ বাটিয়া সেবনে কফজ পাণ্ডু রোগ ভাল হয়।

(৩) রক্তার্শে হরীতকী—রক্তার্শ রোগীকে ভোজনের পূর্ব্বে হরীতকী সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়।

(৪) উদরবোগে হরীতকী—উদর রোগীকে রসায়ন বিধি অনুসারে ক্রমশঃ সহস্র হরীতকী সেবন করাইবে।

(৫) পক্কাতিসারে হরীতকী—উষ্ণ জলের সহিত হরীতকী সেবনে পক্কাতিসারের আমদোষ ভাল হয়।

(৬) সর্দ্দিতে হরীতকী—হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে বমন নিবৃত্তি হয়। —"চরক"।

(১) শূলযুক্ত অতিসারে হরীতকী—মধুর সহিত হরীতকী সেবন করিলে অগ্নি বর্দ্ধিত হয় ও আম পরিপাক হইয়া শূলযুক্ত অতিসারে উপকার হয়।

(২) আঙ্গুলহাড়ায় হরীতকী—লৌহপাত্রে হরিদ্রার রসে হরীতকী ঘর্ষন করিয়া আঙ্গুলহাড়ায় প্রলেপ দিবে। —"বঙ্গসেন"।

(১) বাতরক্তে হরীতকী—সর্ব্ববিধ বাতরক্তে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিবে।

(২) অন্তর্বলি অর্শে হরীতকী—প্রত্যহ প্রাতে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিবে।

(৩) শ্লৈষ্মিক শ্লীপদে হরীতকী—গো বা ছাগী দুগ্ধের বা মূত্রের সহিত হরীতকী চূর্ণ পান করিলে শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ (গোদ) ভাল হয়।

(৪) গুল্মে হরীতকী—গুড়ের সহিত হরীতকী সেবনে গুল্ম ভাল হয়।

(৫) হিক্কায় হরীতকী—উষ্ণ জলের সহিত হরীতকী চূর্ণ পান করিলে হিক্কায় উপকার হয়। —"সুশ্রুত"।

(১) অর্শে হরীতকী—গো মূত্রে হরীতকী ভিজাইয়া পরদিন সেই হরীতকী সেবনে অর্শ নষ্ট হয়।

(২) অশ্মরী রোগে হরীতকী—হরীতকীর আঁটির সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পানে অশ্মরী (পাথুরী) নষ্ট হয়।

(৩) কণ্ঠরোগে হরীতকী—হরীতকীর ক্বাথ মধু সহ সেবন করিলে কণ্ঠরোগ ভাল হয়।

(৪) বলজননার্থ হরীতকী—হরীতকী গব্যঘৃতে ভাজিয়া লইয়া সেই ঘৃত পান করিবে। —"রাগভট্ট"।

(১) বাতরক্তে হরীতকী—বাসক পত্রের রসে হরীতকী চূর্ণ সাত দিন ভাবনা দিয়া পিপুল চূর্ণের সহিত সেব্য।

(২) মদাত্যয়ে হরীতকী—মদাত্যয় রোগী হরীতকী ক্বাথের সহিত মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিবে।—"হারীত"।

(১) ক্ষতরোগে হরীতকী—হরীতকী সিদ্ধ জলদ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে উপকার হয়।

(২) হরীতকী চূর্ণ—গব্য ঘৃত সহ মলমের ন্যায় ক্ষতে প্রয়োগ করিলে ক্ষতে উপকার হয়।

(৩) নেত্র রোগে হরীতকী—হরীতকী সিদ্ধ জল দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে নেত্ররোগ জন্মিতে পারে না, এবং জন্মিয়া থাকিলে ভাল হয়।

(৪) হরীতকী চূর্ণ সমান ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে নেত্ররোগ জন্মিতে পারে না।

(৫) মুখরোগে হরীতকী—হরীতকী চূর্ণে প্রত্যহ দন্ত ধাবন করিলে দন্ত ও দন্তবেষ্ট সুস্থ থাকে।

(৬) দন্ত বেষ্টন স্ফীতিতে স্ফীতস্থলের উপর হরীতকী খণ্ড রাখিয়া দিলে স্ফীতি ও যন্ত্রণা নষ্ট হয়।

(৭) হরীতকী সিদ্ধ জলে পুনঃ পুনঃ কবল করিলে দন্ত ও দন্তবেষ্টন শূল নষ্ট হয়।

(৮) হরীতকী সিদ্ধ জল দ্বারা মুখ ধৌত করিলে ও মধু সহ হরীতকী চূর্ণ প্রয়োগ করিলে মুখ, জিহ্বা ও দন্ত বেষ্টন ক্ষত নষ্ট হয়।

(৯) কোষ্ঠ পরিষ্কারে হরীতকী—রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে কোষ্ঠভেদে আধ তোলা হইতে এক তোলা মাত্রায় হরীতকী বাটিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ ও উষ্ণ জল সহ সেবনে প্রাতে বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

(১০) রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে চারি হইতে অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় হরীতকী চূর্ণ ও সমভাগ চিনি গরম জল সহ সেবনে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে। (প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ)

হরীতকী সম্বন্ধে আমার অধ্যাপক চিকিৎসক শিরোমণি

* উপরি লিখিত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ যে দশটী হরীতকীর ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিলাম তাহা শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রচন্দ্র কবিভূষণ মহাশয়ের ও আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত।—লেখক।

...য়ার আয়ুর্ব্বেদ কবিরাজ ত্রিভঙ্গচরণ গুপ্ত, কাব্যতীর্থ, কবিভূষণ মহাশয় তাঁহার প্রণীত "বনৌষধি দর্পণে" যে সমস্ত প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

দ্রব্যগুণ—হরীতকী—রেচক, কষায় ও রসায়ন। পরিপক্ক হরীতকী প্রায় রেচক এবং অপক্ক হরীতকী কষায় এবং কিঞ্চিৎ রেচক।—আর, এন, কোরি।

এন্সলি বলেন—মুখ ও গলদেশের শ্লেষ্মধরা কলার ক্ষত বিশেষে (Aphthæ) হরীতকী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ডাঃ ওয়ারিং বলেন—ছয়টী পরিপুষ্ট হরীতকী সেবনে পেটকামড়ানি, বিবমিষা, কি অপর কোন উপসর্গ হয় না; অথচ বেশ সহজভাবে ৪।৫ বার প্রচুর পরিমাণে মল নির্গম হইয়াছে—ইহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। টুইনিং "ডিজিজেস্ অভ বেঙ্গল" নামক পুস্তকের—১ম খণ্ডের ... পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—জঙ্গী হরীতকী বল্য, মৃদুরেচক এবং প্লীহা যকৃৎ বিবৃদ্ধিতে বিশেষ হিতকর। আম ও রক্তাতিসার বিশেষে ইনি জঙ্গী হরীতকী ১ Dramch দিনে দুইবার ব্যবহার করাইয়া ফললাভ করিয়াছেন।

সম্প্রতি এম্, পি, এপিরা য়ুরোপীয় চিকিৎসকবর্গের গোচর করিয়াছেন যে, জঙ্গী হরীতকী অতিসার, অতিসার মূলক বিসূচিকা এবং বহুকালের উদরাময়ের পক্ষে মূল্যবান ভেষজ। তিনি বটী করিয়া জঙ্গী হরীতকী সেবন করিতে উপদেশ দেন। বটীর আকার ২৫ সেন্টিগ্রাম। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪—১২ বটী কিম্বা এতদধিক সেবন করাইতে হইবে।—ডিমক্ ২য় খণ্ড, ২ পৃঃ।

(ক্রমশঃ)

সংগ্রহ ও সঙ্কলন

বস্ত্রসমস্যা।

চরকার গুঞ্জনে গন্ধী প্রীতি ধ্বনিত হউক।

রাজ-আজ্ঞায় মহাত্মা গন্ধী আটক হইয়াছেন। এই শান্তির অবতার, অহিংসার একনিষ্ঠ প্রচারক, সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয় দেবতা, যে ঐশী শক্তিতে প্রণোদিত হইয়া তাঁহার কোটী কোটী দেশবাসীকে ঐক্য সূত্রে বাঁধিয়াছেন, সে সূত্র কি চরকার নহে? যুগাবতারগণ ভগবৎপ্রেরণায় ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করিয়া যান। পুরাতন সত্য তাঁহাদের ভিতর দিয়া নূতন করিয়া প্রকাশিত হয়। সেই সত্যের আলোকরশ্মি বহুকালের সঞ্চিত আবর্জ্জনা ভেদ করিয়া লোককে আত্মস্থ করে। মহাত্মা গন্ধী সেই সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন। অহিংস থাক, আত্মস্থ হও, আত্মবশ হও, 'সর্ব্বং পরবশং দুঃখং' এই কথাই তিনি বলিয়া আসিতেছেন। এই রাষ্ট্রের ভারতবর্ষের আত্মা একাগ্রিকবার সত্যপথ অবলম্বন করিয়াছে। ঐ কথার জন্ত আমাদের আত্মা প্রস্তুত বলিয়াই তাঁহার বাণীতে শত শত মতের বিচ্ছেদের ভিতরেও দেশবাসী এক হইয়াছে। পশ্চিমের পথ যে একমাত্র পথ নহে, পশ্চিমের পশ্চাদ্ধাবন ভারতের করিতে হইবে না, এ কথা অনেকে বার বার বলিয়াছেন। কিন্তু এতদিনে মহাত্মার বাক্যে দেশবাসী তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে।

মহাত্মা গন্ধী সকলের হৃদয়-আসন অধিকার করিয়াছেন। তিনি আটক হইবার পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন তাঁহার আটকে দেশবাসী যেন চঞ্চল না হয়। তাঁহার আটকে দেশবাসী অন্তরের অন্তস্তলে গভীর বেদনা অনুভব করিতেছে। প্রচণ্ড আঘাতে লোকে উগ্র হয়, আবার কেহ বা নিশ্চেষ্ট হয়। অহিংসাই যাঁহার ব্রত তাঁহার জন্ত উগ্র হইলে, চঞ্চলতা দেখাইলে তাঁহাকেই পীড়া দেওয়া হইত। তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা সার্থক হইয়াছে। শোকাবেগে দেশবাসী আত্মহারা হয় নাই। এই বেদনা যেন তাঁহার ঈপ্সিত কার্য্যে আমাদিগকে একনিষ্ঠ করে। চরকা কাটা ও তাঁতবোনা দেশের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। ঘরে

ঘরে চরকার গুঞ্জনে গন্ধী-প্রীতি ধ্বনিত হউক। মহাত্মার জন্য হৃদয়ে যদি শ্রদ্ধা থাকে, খাদিবস্ত্র-পরিধানে তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হউক।

দেশের সুসন্তান আজ অনেকেই কারাগারে। বাংলার কর্ম্মিগণ যাঁহাদের ত্যাগের কথা মনে হইলে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয় তাঁহারা স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের ত্যাগ কি ব্যর্থ হইবে? আপনারা কি এখনও সকলে খাদি পরিবেন না? খাদি কোথাও কোথাও প্রচুর প্রস্তুত হইতেছে, ইচ্ছা করিলেই কিনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা কিনিতে পান না তাঁহারা প্রস্তুত করিয়া লউন। গরীব দুঃখী চরকায় সূতা কাটিয়া যে কথঞ্চিৎ দারিদ্র্য মোচন করিতে পারে তাহা আজ তর্কের অতীত। মন হিসাবে চরকার সূতা আজ উৎপন্ন ও ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। আরো হওয়া আবশ্যক। দেশের সকলের খাদি পরা চাই। তাঁতে খাদি বোনা চাই। আপনারা যদি বিদেশী সূতার মিহি কাপড় তাঁতে বুনিয়া দেশী নাম দেন, তবে তাহাতে কেবলমাত্র আত্মপ্রবঞ্চনা করা হয়। দেশের সূতা বা চরকার সূতা না হইলে তাহা দেশী নয়। অন্ততঃ একদিকে চরকার সূতা অর্থাৎ মিশ্রিত খাদি হওয়া চাই-ই।

এখনো দেখি বাঙ্গালী মহিলারা বিলাতী সূতার শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গার কাপড় পরিয়া বেড়াইতেছেন। উহা পরিয়া তাঁহারা যতই আরাম অনুভব করুন, উহার ভিতর হইতে কঙ্কালসার দুর্ভিক্ষ মূর্ত্তি আমার নিকট প্রতিভাত হয়। ঐ বেশই ত দেশে দুর্ভিক্ষ বাঁধিয়া রাখিয়াছে। মা সকল, তোমরা কি সূক্ষ্মবস্ত্রের ক্লেদাক্ত স্পর্শ অনুভব করিতে পার না? খাদি পরিলে তোমাদিগকে অন্নপূর্ণার মত দেখায়। খাদি যে দরিদ্রের অন্ন যোগাইতেছে। দেশবাসীর প্রতি আমার নিবেদন তাঁহারা খাদিই একমাত্র পরিধেয় বলিয়া গ্রহণ করিয়া দেশের প্রতি প্রেম এবং সত্যের অবতার মহাত্মা গন্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করুন।

মহাত্মা গন্ধী আজ কারাগারে। মহাত্মা নিজেই বলিয়াছেন কারাগার পবিত্র স্থান, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কারাগারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মার পক্ষে কারা ক্লেশ ক্লেশই নয়। বিশুদ্ধ মুক্ত আত্মার মত তাঁহার বাক্য ও কর্ম্ম। সে জিনিষকে কোথাও আটক করিয়া রাখা যায় না। "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।" আত্মা নিরবয়ব, অস্ত্রাদির অতীত। ইহা অস্ত্রে কাটে না, আগুনে পোড়ে না, জলে ভিজে না, বাতাসে শুকায় না। মহাত্মা গন্ধীতে এই আত্মার পূর্ণ বিকাশ। কারাগার তাঁহার কি করিবে? যে প্রীতি-বশে তিনি দেশের জন্য আত্মদান করিয়াছেন তাহা আমরা সার্থক করিব।

তিনি দেশবাসীর প্রেমে মণ্ডিত হইয়া কারাগারে বাস করুন। দেশবাসী অন্তরের আসনে তাঁহাকে বসাইয়াছে। রাজ-রোষ সে স্থানে তাঁহাকে আরো দৃঢ় প্রতিষ্ঠ করিবে। দেশের সকলে খাদি পরিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য করুন, কারাগারে তিনি অপরিমেয় সুখ পাইবেন।

—দৈনিক বসুমতী ৩০শে ফাল্গুন, ১৩২৮।

দাসব্যবসায়ের ইতিহাস।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ জাতি প্রথমতঃ দাসত্ব প্রথার প্রচলন করেন। তাহার অল্পদিন পরেই স্পেন-দেশবাসীরাও এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে ব্রিটীশ জাতি এবং তাহার পর ক্রমাগত ওলন্দাজ, ফরাসী, সুইডিস, দিনেমার ও প্রুসিয়ানগণ আসিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই এই প্রথার পূর্ণাঙ্গ প্রচলন করেন।

প্রথমতঃ যখন ইহা প্রচলিত হয় তখন ইহার মধ্যে কোন বিশেষ অসদভিপ্রায় ছিল বলিয়া মনে হয় না। তখন ইউরোপীয়গণের মধ্যে প্রবল ধর্ম্মান্ধতা, দুঃসাহসিকতার প্রতিযোগীতা, বিপদসঙ্কুল কর্ম্মের ভার গ্রহণ এবং তজ্জনিত প্রশংসার নেশা বড়ই প্রবল ছিল। এবং এই সমস্ত ভাবের উত্তেজনার ফলেই দাসত্ব প্রথার প্রথম প্রচলন আরম্ভ হয়। নূতন নূতন ভৌগোলিক আবিষ্কারের ইচ্ছায় উৎসাহিত হইয়া তৃতীয় এডওয়ার্ডের প্রপৌত্র পর্ত্তুগালের নাবিকশ্রেষ্ঠ ও আবিষ্কারক প্রসিদ্ধ হেনরী মানব ইতিহাসের এই ভয়াবহ কু-প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তক। যুবরাজ হেনরীর দুইজন নৌ-সেনানী (ক্যাপ্তেন) ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে দশ বারজন আফ্রিকা-

[illegible] করিয়া লিস্‌বনে লইয়া যান। এই সেনানীদ্বয় আফ্রিকার পশ্চিম-তীরের কোন এক গ্রাম বিনা বাধায় জয় করিবার সময় এই হতভাগ্যেরা ধৃত হইয়াছিল। ইহার পর হইতে এইরূপ ঘটনা ক্রমাগত ঘটিতে লাগিল। পুরাতন পর্ত্তুগীজ ইতিহাসে এ বিষয়ের যে সঙ্কলিত বিবরণ আছে তাহা পাঠ করিলে দেখা যায় যে খৃষ্টানগণ প্যালেষ্টাইনে যে ধর্ম্মযুদ্ধ (Crusade) করিয়াছিলেন, এই সমস্ত ব্যাপার অনেকটা তাহারই অনুরূপ। আফ্রিকাবাসীগণ অসভ্য। সুতরাং তাহারা সভ্য ও শিক্ষিত খৃষ্টানগণের শাণিত অস্ত্র ও কঠিন বর্ম্মাদির সাহায্যে সহজেই পরাভূত হইত। এই বিজেতাগণ বিজিত বন্দীদিগকে বলপূর্ব্বক খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে কেবল যে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার আনন্দই তাঁহারা অনুভব করিতেন তাহা নহে, তাহাদের দ্বারা অন্যান্য অনেক কাজ করিয়া লইবারও সুযোগ পাইতেন। সাধারণতঃ আফ্রিকাবাসীগণ অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু, সুস্থকায় এবং অত্যন্ত শ্রমশীল। অতএব তাহারা পরিশ্রমের কাজকে ডরায় না। যে সমস্ত নূতন নূতন নৌ-সেনাপূর্ণ রণতরী আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিত তাহার সকলগুলিই কৃষ্ণাঙ্গ বন্দীতে পরিপূর্ণ থাকিত। এইরূপে দেখিতে দেখিতে দক্ষিণ-পর্ত্তুগালের লাগেস্ নগর দাস বিক্রয়ের একটি প্রধান বন্দর হইয়া উঠিত। এই ত গেল প্রথম অবস্থা। তাহার পর কলম্বাস্ যখন আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন, এবং স্পেনবাসীগণ যখন হাইতি দ্বীপে স্বর্ণখনির আবিষ্কার করিলেন তখন এই দাস ব্যবসায়ের ভিত্তি আরও ইহাতে দৃঢ় হইল। স্পেনবাসীগণ যখন দেখিলেন যে হাইতিবাসী অসভ্যগণ অতিশয় অলস-প্রকৃতি এবং অকর্ম্মণ্য, তাহাদের দ্বারা কোন কাজই সুবিধামত করান যায় না; তখন তাহারা পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে আফ্রিকার বন্দীদিগকে কিনিয়া লইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ষোড়শ শতাব্দীতে আমরা দেখিতে পাই, আফ্রিকাবাসী অসভ্য "কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমাগণকে" আটলান্টিক্-মহাসাগরের পারে নবাবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশে চালান দেওয়া হইত। সেখানে তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের ফলে, তাহাদের যে শোচনীয় দুরবস্থা হইত (এবং এখনও যাহা মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে) তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণনার বহির্ভূত। প্রথম প্রথম স্পেনবাসীগণ পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে দাস সকল ক্রয় করিতেন। কিন্তু যখন তাঁহারা ওয়েষ্ট ইনডিস্ ও আমেরিকার অনেক দেশ জয় করিলেন তখন তাঁহাদের অনেক শ্রমীর প্রয়োজন হইল। সেই জন্য স্পেন্ দেশাধিপতি অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিদিগকে এইরূপ দাস সরবরাহ করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন এবং এইরূপে যত দাস আমদানি হইত তিনি সে সমস্তই ক্রয় করিতেন। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে জন্ হকিনস্ রাণী এলিজাবেথের সাহায্যে এই দাস সরবরাহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এই সময় হইতেই ইংরাজগণের দাস ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয়।

ইহার একশত বৎসর পরে দেখা যায় যে, স্পেনের আমেরিকার উপর যে একাধিপত্য এবং পর্ত্তুগালের আফ্রিকার উপর একচ্ছত্র অধিকার ছিল তাহা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তখন ফরাসী, ইংরাজ ও ওলন্দাজগণ সকলেই বিপদসঙ্কুল সমুদ্র-পথে যাত্রা করিয়া পশ্চিম-আফ্রিকায় আপনাপন আধিপত্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজগণ 'আফ্রিকান্ কোম্পানী' ও "বারবারী" বণিকদিগের সাহায্যে সমস্ত সংগৃহীত দাস একচেটিয়া ক্রয় করিতে লাগিলেন। প্রুসীয়ান্ ও সুইডেনবাসীগণ দাস-ব্যবসা অধিক দিন করিতে পারেন নাই। এই বীভৎস ব্যবসা যখন আন্তর্জাতিক হইয়া দাঁড়াইল, তখন ইহার বর্ব্বরতা সহস্রগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। আমেরিকার সঙ্কলিত হিসাবে দেখা যায় যে, ইংরাজগণ (১৬৮০-১৭০০) ২০ বৎসরের মধ্যে ৩,০০,০০০ তিন লক্ষ আফ্রিকাবাসীকে দাসরূপে আমেরিকায় চালান দিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ব্যবসা এবং তজ্জনিত অত্যাচার অতি ভীষণ আকার ধারণ করে। এই দাস সরবরাহে এত অধিক অর্থাগম হইতে লাগিল যে, এই সময়ে প্রত্যেক ইংরাজের প্রাণে এই ব্যবসায়ের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল, এবং তাহাদের পরস্পরের প্রতিযোগিতা এত বৃদ্ধি পাইল যে এই ব্যবসাটিকে রাজনীতির অঙ্গীভূত করা হইল। পরে Utrecht এর সন্ধিপত্রে চতুর্দ্দশ লুইএর নিকট হইতে ব্রিটীশ জাতি স্পেনের উপনিবেশ সমূহে এই ব্যবসা এক-

চেটিয়া করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। তখন তাহাদের বাণিজ্য নীতির সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই দাস ব্যবসা। আমেরিকায় ইংরাজ রাজত্ব বিস্তারের সঙ্গে, ইংরাজ রাজের সাহায্যে এই ঘৃণিত ব্যবসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই জঘন্য অর্থাগমের উপায় তখন ইংরাজ-জাতির নৈতিক জীবনকে এত দূর অধঃপাতিত করিয়াছিল যে, লক্ষাধিক নিগ্রো অতি অল্পদিনের মধ্যেই অতি পৈশাচিক ভাবে গোপনে ধৃত ও দাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রাজ-মন্ত্রী চ্যাথাম্ এবং পিট, দুইজনই এই ব্যবসায়ের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তখন লিভারপুল এই ব্যবসায়ের সর্ব্বপ্রধান বন্দর হইয়া উঠিল। শুধু এই বন্দর হইতে ইংলণ্ডের ৳ ভাগ এবং সমস্ত পৃথিবীর ৴ ভাগ দাস সরবরাহ হইত।

এই ব্যবসায় যতই বিস্তৃতি হইতে লাগিল ততই অত্যাচারের মাত্রা বাড়িতে লাগিল। তখন শুধু তীরবর্ত্তী আফ্রিকানদিগকে ধরিয়া চালান দিয়া সংখ্যায় বড়ই কম হইতে লাগিল দেখিয়া ইংরাজ বণিকগণ সেই দেশীয় জাতিদিগকে অর্থের লোভে বশীভূত করিয়া অপরের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া তাঁহাদের অগম্য স্থান সকল হইতেও বহুসংখ্যক দাস সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত দাসের অধিকাংশই গুপ্তভাবে অপহৃত হইত; এবং তাহাদিগের হস্ত গলে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া, অতি অল্প পরিসর স্থানে অনেক লোককে প্রবেশ করাইয়া এমনভাবে চালান দেওয়া হইত যে তাহাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিবার সুযোগও না হওয়ায় অনেকে গন্তব্য-স্থানে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিত। প্রায় শতকরা ত্রিশ জনের এইরূপ অবস্থা ঘটিত। অনেকে যন্ত্রণায় উন্মত্ত হইয়া পরস্পরকে হত্যা করিয়া দম ছাড়িবার সন্ধানের চেষ্টা করিত।

"The slaves could not turn round; were wedged immovably, in fact, and chained to the deck by the neck and legs......not infrequently would go mad before dying of suffocation......in their frenzy some killed others in the hopes of procuring more room to breathe......men strangled those next to them, and women drove nails into each others brains."

ক্রমে আমেরিকায় এত অধিক পরিমাণে দাস প্রেরিত হইতে লাগিল, যে আমেরিকাবাসীগণ ইংরাজদিগের কার্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইংরাজগণ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহারা তাঁহাদের এত লাভের ব্যবসা কিছুতেই খর্ব্ব করিতে রাজি হইলেন না।

শুধু পশ্চিম আফ্রিকা হইতে এই ব্যবসায়ে যত নর-নারী অপহৃত এবং আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের লেখা হইতে সঙ্কলন করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৬৬৬-১৭৬৬—শুধু ইংরাজ বণিকগণ ৩০,০০,০০০ ত্রিশ লক্ষ দাস আমদানী করেন (ইহা ব্যতীত পথে ১০,০০,০০০ দশলক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়)।

১৬৮০-১৭৮৬—ব্রিটীশ-উপনিবেশের জন্য ২১,৩০,০০০ (একুশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) কেবলমাত্র জামাইকা-দ্বীপের জন্য ৬,১০,০০০ (ছয়লক্ষ দশ হাজার)।

১৭০৬-১৭৫৬—মোট ৩৫,০০,০০০ পঁয়ত্রিশ লক্ষ (গড়ে বার্ষিক ৭০,০০০)।

১৭৫২-১৭৬২—শুধু জামাইকা-দ্বীপে ৭১,১১৫।

১৭৫৯-১৭৬২—শুধু গডিলুপে ৪০,০০০।

১৭৭৬-১৮০০—বার্ষিক গড়ে ৭৪,০০০ মোট ১৮,৫০,০০০।

অন্যান্য বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে গড়ে ইংরাজগণ বার্ষিক ৪০,০০০, পর্ত্তুগীজ ১০,০০০, ওলন্দাজগণ ৪,০০০, ফরাসী ২০,০০০ এবং দীনেমারগণ ২,০০০ দাস সরবরাহ করিয়াছিলেন। এখন এই ব্যবসায়ে কি প্রকার অর্থাগম হইত তাহার একটু পরিচয় দেওয়া যাক। ১৭৮৩-১৭৯৩ সালের মধ্যে ১১ বৎসরে লিভারপুলের ৯২১ খানা জাহাজ এই দাস আমদানি কাজে ব্যাপৃত ছিল। ইহাতে সর্ব্বসমেত ৩০৩৭৩৭ জন দাস নীত এবং ১৫,১৮৬,৪৫০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হয়। ইহার মধ্যে শতকরা ১৫ পাউণ্ড বাদে খাঁটী মুনাফা ধরিলে মোট ১২,২৯৪,১১৬ পাউণ্ড অথবা গড়ে বার্ষিক ১,১১৭,৬৪৭ পাউণ্ড লাভ হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে এই

বণিকগণ ২৩,৬১,৪৫৫ পাউণ্ড ৬ শিলিং ১ পেন্স লাভ করেন অর্থাৎ গড়ে বার্ষিক ২,১৪,৬৭৭-১৫-১ খাঁটী লাভ।

এ সমস্ত হতভাগ্য নর নারীগণ সকল জাতির নিকট সমান ব্যবহার পাইতনা। অপরাপর জাতি অপেক্ষা ইংরাজ ও ওলন্দাজগণ অনেক বেশী অত্যাচার করিতেন। ওলন্দাজের গিনি দেশে এবং ব্রিটীশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিসে, এই দাসগণের প্রতি যে লোমহর্ষণ পাশব অত্যাচার হইত তাহা অবর্ণনীয়। পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা নাই, যাহা এই অত্যাচারের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। সয়তান ও নরকের বর্ণনাও ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল বোধ হয়। সামান্য ক্রটী অথবা বিনাদোষেই জ্বলন্ত অনলে নিক্ষিপ্ত করিয়া, কথনও নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া, কখন বা অনাহারে রাখিয়া শত শত হতভাগ্যকে মারিয়া ফেলা হইত।

যথন ইংলণ্ডের রাজা, রাণী, ধনী, দরিদ্র, রাজ-মন্ত্রী, ধর্ম্ম-যাজকগণ পর্য্যন্ত সকলের মনে এই ঘৃণিত ব্যবসা, রাষ্ট্র-নীতি, সমাজ-নীতি, এমন কি ধর্ম্ম-নীতিতেও সর্ব্বপ্রকারে অনুকূল বোধ হইতেছিল ভাবিয়া দেখুন সেই সময়ে ব্রিটীশ-জাতির মানসিক অবস্থা কত দূর ঘৃণ্য এবং অধঃপতিত হইয়াছিল।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই সময়ে ইংরাজ-জাতির মধ্যে সার্প, ক্লার্কসন্, উইলবারফোর্স প্রভৃতি কয়েকজন মহাত্মার আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের নিকট এই ভীষণ ব্যবসা অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হওয়ায় তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করেন; অবশেষে প্রসিদ্ধ বাগ্মী বার্কের প্রভাবে ও চেষ্টায় ঐ কু-প্রথা উৎসাদিত হয়। দাস ব্যবসা উঠিয়া গেল বটে কিন্তু শ্বেতাঙ্গদিগের মনে কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রহ প্রবৃত্তি এখনও দূর হয় নাই।

উপরে যে মহাপুরুষদিগের নাম করিলাম,তাঁহাদের মধ্যে সার্প (গ্রাণভিল সার্প) ছিলেন একজন সামান্য কেরাণী। একদিন তিনি আফিস হইতে প্রত্যাগমন-কালে দেখিতে পাইলেন যে, জোনাথান্ ষ্ট্রং নামক জনৈক দাস মৃতপ্রায় হইয়া তাঁহার বাটীর সম্মুখে পড়িয়া আছে। তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, ঐ ব্যক্তি রোগে অকর্ম্মণ্য হওয়ায় তাহার প্রভু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছে। জোনাথানের অবস্থা দেখিয়া সার্পের মনে করুণার উদ্রেক হওয়ায় তিনি তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিছু দিন পরে জোনাথান্ যথন নীরোগ ও সুস্থ হইয়া বাহিরে আসিল, তখন তাহার পূর্ব্ব প্রভু তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলপূর্ব্বক ধরিয়া পুনরায় নিজ কাজে নিযুক্ত করিল। সার্প যথন এ কথা শুনিলেন, তখন তাঁহার মনে ক্লেশ হইল। বাস্তবিক এই প্রভু উক্ত ভৃত্যকে একবার যথন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তথন আবার তাহার উপর তাঁহার কি রকম স্বত্বের দাবী আসিতে পারে? সার্প নিজ হইতে এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য বিচারালয়ে অভিযোগ করেন। কিন্তু প্রথম প্রথম পরাজিত হন। উকিল, ব্যারিষ্টার, জজ প্রভৃতি তাঁহার কথা গ্রাহ্যও করিলেন না। অনেকে বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু সার্প দমিবার লোক ছিলেন না। যে মহানুভবতা তাঁহার প্রাণে অনুপ্রাণিত ছিল তাহার অনল নির্ব্বাপিত হইবার নহে। যত বাধা ও বিফলতা আসিতে লাগিল, ততই তাঁহার তেজ সহস্রগুণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি চাকরী ছাড়িলেন। আইন-ব্যবসায়ীদিগকে বুঝাইবার জন্য নিজে আইন শিক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রাচীন বাইবেলের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিবার জন্য হিব্রু-ভাষা শিক্ষা করিলেন। এইরূপে প্রায় পঁচিশ বৎসর-কাল দিবারাত্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর তাঁহার জয় হইল। ক্রমে একজন ব্যারিষ্টার ও একজন পার্লামেণ্টের মেম্বর তাঁহার সহায় হইলেন। তাঁহাদের সাহায্যে তিনি ক্রমে ইংরাজ-জাতির মনে বুঝাইতে সক্ষম হইলেন যে, এই নিষ্ঠুর ব্যবসা ধর্ম্ম ও সমাজ-নীতি-বিরুদ্ধ। যদিও উইলবারফোর্স, ক্লার্কসন্ ও পরে বার্কের চেষ্টায় এই অত্যাচার প্রদমিত হয় তাহা হইলেও সকলে এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, এই মহদনুষ্ঠানের মূল প্রবর্ত্তক ছিলেন—মিঃ গ্রানভিল সার্প—একজন কেরাণী।

—কর্ম্মী, ভাদ্র ১৩২৮।

১৯শ ভাগ] বৈশাখ, ১৩২৯ [১ম সংখ্যা

শক্তির দ্বন্দ্ব

[শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ]

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দুই শক্তির অবিরাম লীলা; ও প্রতিনিয়তই দ্বন্দ্ব। এক সৃষ্টি রক্ষার কর্ত্রী, অপর ধ্বংস প্রলয়ের জননী। একটীর নাম অনুকূল, অন্যটির নাম প্রতিকূল। রক্ষাকর্ত্রী শক্তি দেবতা। ধ্বংস শক্তি অসুর। অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতি তেত্রিশটী রক্ষাকর্ত্রী দেবতা বলিয়া বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে উদাহৃত হইয়াছে—

"ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেব দেবাঃ"

সৃষ্টি রক্ষার্থই ইহারা সৃষ্ট ও বর্দ্ধিত। লোকপাল রূপে সকলকার প্রপূজিত। ইহার বিপরীত ধ্বংস শক্তি অসুর। এই ধ্বংস শক্তির নামই প্রতিকূল শক্তি। ইহার অস্তিত্ব যদিও সর্ব্ব সময়ে বিদ্যমান, কিন্তু প্রকৃত প্রবল ভাব কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। বন্যা, ঝটিকা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতিই অসুর। এই অসুরগণের পূর্ণপ্রকাশে প্রলয়। প্রলয়কালে অসুরগণের পূর্ণ প্রতাপ। তখন দেবতারা পর্য্যন্ত অসুরগণের সহিত মিশিয়া গিয়া একরূপতা ধারণ করে। তখন দ্বাদশ সূর্য্য, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু ভীম বিক্রমে সৃষ্টির ধ্বংস করিতে আরম্ভ করে।

জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে এই শক্তিদ্বয়ের দ্বন্দ্ব এক অদ্ভুত ব্যাপার, উভয়ের দ্বন্দ্ব নিয়তই বিদ্যমান। কখনও বা উভয়ের সাময়িক মিলন। আবার সেই মিলনেরই অবশ্যম্ভাবী ফল ঘোরতর দ্বন্দ্ব। ইহা এক বিচিত্র বিরোধও বটে, আবার সেই বিরোধেরই বিচিত্র সামঞ্জস্যও বটে। দেবাসুরের মিলনে অমৃতের উদ্ভব। দ্বন্দ্বে অমৃতের রক্ষা। একের পরাভব সৃষ্টিরক্ষার পক্ষে আবশ্যক। সৃষ্টির প্রথম হইতে এই অবিরাম দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে সৃষ্টির রক্ষা ও ধ্বংস, প্রকৃতির সমতা ও বৈষম্য।

সাধারণতঃই সৃষ্ট ও রক্ষা অনুকূল শক্তির কার্য্য। ধ্বংস বা প্রলয় প্রতিকূল শক্তির কার্য্য। এই উভয় শক্তির দ্বন্দ্বে কখনও একের পরাভব দৃষ্ট হয়, কখনও বা উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়া এক অপূর্ব্ব সমন্বয়ের উদ্ভব হয়। সত্ত্বরজোময়ী ব্রহ্মা বিষ্ণু মূর্ত্তি। আর ধ্বংস প্রলয়ের দেবতা মহাদেব। শান্ত, শিব, আশুতোষ, ভোলানাথ, দিগম্বর শঙ্করই প্রলয়ের দেবতা।

প্রতিকূল শক্তির তখনই প্রাবল্য, যখন অনুকূল শক্তি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় উপনীত হয়। এ নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য বিধান, সৃষ্টির অপরিহার্য্য ফল। অনুকূল শক্তি অবিরাম গতিতে আপনার কার্য্য করিয়া যাইতেছে। অবিশ্রান্ত গতিতে স্রোতের মত হু হু শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। ফলে

যন্ত্রের মত সেই শক্তিকে একদিন বিফলপ্রায় হইতে হইবে; শক্তিরূপ সে যন্ত্রটীর আর সে কার্য্যকারিতা থাকিবে না। অনুকূল শক্তির বল যেমনই ক্ষয় হইয়া আসিবে, প্রতিকূল শক্তি অমনই সগর্ব্বে মাথা খাড়া দিয়া উঠিবে। যে প্রতিকূল শক্তি এতদিন নিজ্জীবপ্রায় ছিল, কি এক ঐন্দ্রজালিক মাহাত্ম্যে সে আজ সজীব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তখন তাহার উদ্দাম নৃত্য দেখে কে? তখন সেই প্রতিকূল শক্তি অনুকূল শক্তিকে সম্পূর্ণ নিজ্জীব ও পরাভূত করিয়া ফেলিবে। তখনই বিশ্বের ধ্বংস অবস্থা। কারণ, প্রতিকূল শক্তির কার্য্য রক্ষা (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে) নহে। জগতের আপাত দৃশ্যমান সৃষ্টি নষ্ট করাই সাধারণতঃ প্রতিকূল শক্তির কার্য্য। তাই উহা দেশের সমক্ষে ধূমকেতুর মত নানা উপদ্রব আনিয়া উপস্থিত করে, পাপের সৃষ্টি করিয়া আপনার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিকাশ করে। এইরূপ ঘোর সঙ্কট মধ্যে মধ্যে আসিয়াই থাকে। সেই ঘোর সঙ্কট হইতে কোনমতে উদ্ধারের উপায় থাকিলে সৃষ্টিকর্ত্তা সে উপায় অবলম্বন করেন। তখন অধর্ম্মের পরাজয় দ্বারা ধর্ম্মের জয় করা, অসুরগণের নাশ দ্বারা দেবতাদের রক্ষা করা আবশ্যক হয়। তখন ভগবান নিজের শক্তি ব্যষ্টি বা সমষ্টির ভিতর দিয়া প্রকাশিত করেন। দুশ্চিকিৎস্য হইলে নিজেই শেষে আবির্ভূত হন। তার পর পরম কারুণিক শ্রীভগবান, আসুরিক শক্তিকে দুর্ব্বল, শেষে বিধ্বস্ত করিয়া দৈবী শক্তিকে প্রবল, পরিশেষে শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলেন। এইরূপে প্রতিকূল শক্তির দৌর্ব্বল্য এবং অনুকূল শক্তির প্রাবল্য সংসারিত হইয়া শেষে সৃষ্টিতেই সমতা রক্ষিত হয়। নিষ্ক্রিয় শক্তির বিনাশ যখন আবশ্যক হইয়া থাকে, তখনই বৈষম্যের উদ্ভব হয়। আবার সেই বৈষম্যের পতন আবশ্যক হইলে আদর্শ সমতার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়ে। এই আদর্শ সমতাই সৃষ্টি রক্ষার হেতু।

সাধারণ দৃষ্টিতে বিচার করিলে মনে হয় বটে, যে এই দ্বন্দ্ব বিশ্বের অহিতকর, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে, পরিণামে ঐ দ্বন্দ্বই সুফলপ্রসূ হইয়া থাকে। ধরিয়া লও, অনুকূল শক্তির পূর্ণ প্রভাব। শত্রু কেহ নাই; সম্মুখে পশ্চাতে কোন বিঘ্ন নাই; কার্য্য নির্বিঘ্নে, সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইতেছে। সূর্য্যদেব যেমন আলোক তাপ বিকীরণ করেন, তাই করিতে থাকিলেন; বায়ু ঠিক মত বহিতে লাগিল, মেঘ যথাযথ জলবর্ষণ করিতে থাকিল। শস্যে পূর্ণ বসুন্ধরা; তরুলতা সচ্ছন্দ মত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল; জল মৎস্য শম্বুকাদিতে, স্থল জীব জন্তুতে পূর্ণ হইয়া গেল। অকালমৃত্যু নাই, প্রকৃতির কোন উপদ্রব নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধ্বংসের পর্য্যন্ত খেলা প্রত্যক্ষে আইসে না। জীব জীবকে ধরিয়া খায় না; বাতাসে ঝটিকাতে তরুলতার একটী পত্রও নষ্ট করে না। কি সুন্দর ধরার অবস্থা!

বাস্তবিকই কি তাই? ইহা আপাততঃ সুখের মনে হইলেও পরিণামে কিন্তু দারুণ দুঃখই আনয়ন করে। ফলের পক্কাবস্থাই তাহার নাশের পূর্ব্বলক্ষণ। তরুলতায় দেশ ছাইয়া গেল, মৎস্যাদি জলজীবে জল পূর্ণ হইয়া গেল। জীবে জীবে বিশ্ব ভরিয়া গেল। তিল অবকাশ (ফাঁক) রহিল না। এই সম্পূর্ণতা, এই পরিণতি শেষে বিষম অসামঞ্জস্য, অনাবশ্যক স্ফীতি আনিয়া দিয়া নাশের পথই দেখাইয়া দিবে। তবেই দেখ, দ্বন্দ্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য — অনুকূল শক্তির সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক সৃষ্টির ভবিষ্যৎ রক্ষা। সৃষ্টির পরিণামে মঙ্গলের জন্য এবং তাহার প্রকৃত রক্ষার জন্যই প্রতিকূল শক্তির প্রাবল্য ও জয়, অনুকূল শক্তির সাময়িক দৌর্ব্বল্য ও পরাভব। এই দ্বন্দ্বে উভয় শক্তির কোনটিই কখনও একেবারে নাশ প্রাপ্ত হয় না; একে অপরের অধীন হইয়া পড়ে মাত্র। কত দিনের জন্য? যতদিন, না এক শক্তি পুনরায় দুর্ব্বল, কার্য্যে অক্ষম হইয়া যায়।

সাধারণ ধ্বংস মাত্রেই ধ্বংস। আর বিশ্বের আত্যন্তিক নাশই প্রলয়। এক্ষণে ধ্বংসের কথা পূর্ব্বে বলিয়া পরে প্রলয়ের কথা বলিব। এই ধ্বংস দুই প্রকার। এক নিত্য, আর নৈমিত্তিক। জন্ম, স্থিতি, রক্ষা, অনুকূল শক্তির ধর্ম্ম। ক্ষয়, বিপরিণাম, নাশ, প্রতিকূল শক্তির ধর্ম্ম। কি জড় কি চেতন, সকল পদার্থেরই যেমন জন্ম, স্থিতি, তেমনই বিপরিণাম ও নাশ আছে। তাবৎ পদার্থেরই প্রতিক্ষণেই ক্ষয় বিপরিণাম বা নাশ দৃষ্ট হয়। এই ক্ষয়,

এই বিপরিণাম, এই নাশই নিত্য ধ্বংসেরই পরিচয় দিতেছে। দেহ, ইন্দ্রিয়, তরু লতা, গিরি নদী—তাবৎ পদার্থই প্রতিনিয়তই যেমন পুষ্ট হইতেছে। এই পুষ্টি ও ক্ষয়েই সকলকার গতি নির্দ্ধারিত হইতেছে। বন্যা, ঝটিকা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ, বিপ্লব সমস্তই সাময়িক বা নৈমিত্তিক ধ্বংসের কার্য্য। এই নিত্য ধ্বংস; নৈমিত্তিক ধ্বংসও আপাততঃ সৃষ্টি নাশের হেতু বলিয়া বিবেচিত হয় বটে, কিন্তু পরিণামে ইহাই সৃষ্টির সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা বিধান করে। নিত্য ধ্বংস রোধ কর; দেখিবে, নৈমিত্তিক ধ্বংস প্রতিনিয়তই ঘটিতে আরম্ভ করিবে। আবার নিত্য ও নৈমিত্তিক ধ্বংস রোধ করিয়া দেখ, প্রলয় কাল অন্ততঃ নিকট হইয়া আসিয়াছে। নিত্য ও নৈমিত্তিক ধ্বংসই আত্যন্তিক নাশ বা প্রলয় হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। প্রলয়কে দূর হইতে দূরবর্ত্তী করিয়া দিয়া আপনাদের সৃষ্টি রক্ষার উপযোগিতা প্রমাণ করিতেছে। সাধারণতঃ এই অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির দ্বন্দ্বে অনুকূল শক্তিরই জয় হইয়া থাকে। এই জয়লাভের ফল আপাততঃ বেশ লাভজনক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহাই ক্রমে সৃষ্টিক্রিয়াকে পঙ্গু ও বিশৃঙ্খল করিয়া তুলে। এই পঙ্গুতা, এই বিশৃঙ্খলতাই, এই অসামঞ্জস্য দূর করিবার জন্যই নিত্য ও নৈমিত্তিক ধ্বংসের আবশ্যকতা। নিত্য নৈমিত্তিক ধ্বংসরূপ প্রতিকূল শক্তির সহিত দ্বন্দ্বে সাধারণতঃ অনুকূল শক্তির জয় ঘটিয়া থাকে। যতদিন সৃষ্টি বিদ্যমান, সৃষ্টির রক্ষাই যখন অভিপ্রেত, তখন মোটের উপর অনুকূল শক্তির একটু একটু করিয়া ঋদ্ধিলাভ হইবেই। বহুকালব্যাপী এই দ্বন্দ্বের ফলে নিত্য নৈমিত্তিক ধ্বংসরূপ প্রতিকূল শক্তি দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া আসিলে পর অনুকূল শক্তি বেশ প্রবল হইয়া উঠে। সেই সময়ে অনুকূল শক্তির সার্ব্বাঙ্গীন ঋদ্ধি দেখা দেয়। পৃথিবীতে তখন সুখ ও শান্তির ভাগই পরিলক্ষিত হয়। সার্ব্বাঙ্গীন ঋদ্ধিপ্রাপ্ত অনুকূল শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিকূল শক্তির বল হ্রাস পাইয়া থাকে। তখন আর তাহার বাধা দিবার শক্তি থাকে না। প্রকৃতি তখন স্থির শান্তভাব ধারণ করে। প্রকৃতি নিরুপদ্রব ও নিস্তব্ধ হইয়া থাকে, প্রকৃতির এই শান্ত স্থিরভাব, পৃথিবীর এই নিস্তব্ধ নিরুপদ্রব অবস্থা তাহাদের আসন্ন নাশেরই পূর্ব্বলক্ষণ। নিভিবার পূর্ব্বে প্রদীপের শেষ শিখা ভালরূপেই জ্বলিয়া উঠে। প্রকৃতির এই শান্ত স্থিরভাব অচিরভাবী ঝটিকারই সূচনা করে। বিশ্বের এই সমতাই বল, সুখ শান্তিই বল, ধূপের মত ক্ষণস্থায়ী আলোক বিতরণ করিয়া নাশ প্রাপ্ত হয়। এই স্থিরভাব, এই নিরুপদ্রব অবস্থা স্ফীত অনুকূল শক্তির প্রচ্ছন্ন বিকারেরই পূর্ব্বলক্ষণ। এ সমতা প্রকৃত সমতা নহে; বিষমতারই পূর্ব্বাবস্থা। সমতার সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতা আসন্ন ধ্বংসেরই পূর্ব্ব সূচনা। আমাদের শাস্ত্রেই আছে, পৃথিবীর সম্পূর্ণ একাকার অবস্থা আসিলে পর প্রলয় দেখা দিবে।

উৎকট সমতাই দারুণ বৈষম্য। সমস্তই একাকার; এক জাতি, এক বর্ণ, এক রীতি, এক ব্যবহার, এক আচার ও এক ধর্ম্ম। সকলেই এক, সকলেই স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল। ব্রাহ্মণ চণ্ডালে ভেদ নাই, দেবতায় মানবে পার্থক্য নাই, ভালমন্দ তারতম্য নাই! রাজা নাই প্রজা নাই, গুরু নাই শিষ্য নাই, প্রভু নাই ভৃত্য নাই, বড় নাই ছোট নাই, ধনী নাই দরিদ্র নাই, জ্ঞানী নাই অজ্ঞানী নাই; সবাই সমান। উপাস্য উপাসকে কোন বিভিন্নতাই নাই! স্ত্রী পুরুষে কোন স্বতন্ত্রতা নাই। আপাততঃ মনে হয় বটে, ধরা যেন স্বর্গধামে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে ইহা মৃত্যুর পূর্ব্বাবস্থা, প্রলয় আবির্ভাবের সূচনা।

প্রলয়ের পূর্ব্বে অনুকূল-শক্তি আপনার স্ফীত অস্বাভাবিক দেহভার লইয়া অক্ষমের মত বসিয়া থাকে। সুখ শান্তির নামে ঔদাসীন্য, আলস্য ও জড়তারই সেবা করে। তখন প্রতিকূল শক্তি নব বলে বলীয়ান্ হইয়া সেই অনুকূল শক্তিকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। জড়বৎ অনুকূল শক্তি প্রতিকূল শক্তির করাল আলিঙ্গনে আপনার অস্তিত্ব মিশাইয়া দেয়। প্রলয়কালে অসুরগণের পূর্ণ প্রতাপ, দেবতারা পরাজিত। দেহাত্মবাদের পাদমূলে আধ্যাত্মিকতা নতশিরে দণ্ডায়মান। বাহ্য ভোগেরই সম্পূর্ণ প্রাবল্য, দেবতাদের মধ্যে কতকগুলি অসুরগণের

আনুগত্য স্বীকার না করিয়া বিজন অরণ্যে লুকাইয়া রহিল। কতকগুলি বা অসুরগণের অনুগত হইয়া তাহাদের নিকট মস্তক বিক্রয় করতঃ ক্রীতদাসের মত সেবা করিতে লাগিল। হৃদয় রাজ্যের অসুর, কাম ক্রোধাদি রিপুগণ হুহুঙ্কারে দিক্‌মণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিল। আধ্যাত্মিক দেবতা দয়া, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, সংযম, ত্যাগ ও বস্তু বিচার প্রভৃতি সঙ্কুচিত হইয়া এক পার্শ্বে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

প্রলয় আসিল। বন্যা, ঝটিকা, ভূমিকম্প, অগ্নিবৃষ্টি, বজ্রপাত, অগ্ন্যুৎপাত হইতে লাগিল। একই আকাশে একই স্থানে দ্বাদশ আদিত্যের অভ্যুত্থান। উনপঞ্চাশৎ বায়ুর একত্র একস্থানে এক সঙ্গে আবির্ভাব। আবর্ত্ত, সংবর্ত্ত প্রভৃতি মেঘদলে অন্তরীক্ষ সমাচ্ছন্ন। চারিদিকে উল্কাপিণ্ড জ্বলিতেছে। গ্রহসমূহ বিপর্য্যস্ত ভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। শত শত ধূমকেতু পুচ্ছ বিস্তার করিয়া আছে। নক্ষত্রপাতে পৃথিবী চূর্ণিত হইতেছে। সমস্ত পৃথিবী রসাতলে নামিবার উপক্রম করিতেছে। দেব প্রকৃতিও তখন দানব-ভাবাপন্ন হইয়াছে।

প্রলয়ের দেবতা মহাদেব তখন ত্রিশূল হস্তে তাণ্ডবনৃত্যে উন্মত্তপ্রায়। রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণু সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম উপাদান স্বরূপ কারণ সলিলে অনন্ত শয্যায় শয়ান্। শ্রীভগবান্ তখন শিশুর মত সেই কারণার্ণবে ভাসমান; এ এক অদ্ভুত কল্পনা!

আমাদের হৃদয়-রাজ্যে ঐ একই দ্বন্দ্ব। হৃদয়ের মধ্যে দুইটী বৃত্তি—এক সুবৃত্তি, এক কুবৃত্তি। সুবৃত্তি অনুকূল শক্তি, কুবৃত্তি প্রতিকূল শক্তি। সুবৃত্তি সৎবৃত্তি—প্রকাশশীল বলিয়া দেবতা (দ্যোতনশীল)। অন্তঃকরণের রক্ষাকর্ত্রী বলিয়া দেবতা। কুবৃত্তি অসৎবৃত্তি—অসুর (অসূন্ প্রাণান্ রাতি ক্লিশ্নাতি ধঃ সঃ অসুরঃ) প্রাণকে ক্লিষ্ট করে বলিয়া, আত্মাকে পর্য্যন্ত পাতিত করে বলিয়া দৈত্য দানব পদবাচ্য। এই উভয়ের দ্বন্দ্ব প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে। কখনও সৎবৃত্তি জয়ী, কখনও বা অসৎবৃত্তি জয়ী হয়। প্রথম পাপ করিবার সময় সুমতি কুমতির দ্বন্দ্ব অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। সৎকার্য্য বা অসৎ কার্য্য করিবার সময় দুইটী মনোবৃত্তির দ্বন্দ্ব বিধাতার বিধানে প্রায়শঃই ঘটিতে দেখা যায়। তুল্যবল স্থলে কোন বৃত্তি জয়ী, কোন বৃত্তি বিজয়ী হয় না। তুল্যবল হইলে ঔদাস্য ও জড়তা আসিয়া এমন ভাবে বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে; তখন যে কেহ যে দিকেই লইয়া যাইতে চাহে, অনায়াসেই তাহাকে সেই দিকেই লইয়া যাইতে পারে। আর কুবৃত্তির পরাজয়ে সুবৃত্তির জয়।—ফলে কর্ত্তা পাপমুখ হইতে প্রত্যাগমন করে। আবার সুবৃত্তির পরাজয়ে কুবৃত্তির জয়,—তখন কর্ত্তা পাপপঙ্কে অধিকতর মজ্জিত হইয়া থাকে। প্রথম পাপ করিবার কালে অনেকে বিবেকের অস্ফুট বাণী (অস্ফুট ভাবেও) শুনিতে পান। কিন্তু তাঁহারা পান না—যাঁহাদের প্রকৃতি পাপময়ী হইয়া গিয়াছে; জন্মান্তরীন সুদৃঢ় সংস্কার ইন্দ্রিয় মনকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সে স্থানে পাপী আপনার কৃত পাপকে পাপ বলিয়া বুঝিতে পারে না। আপনার দারুণ দুর্দ্দশাতেই সন্তুষ্টবৎ থাকে। তাহাদের মনে পাপ কার্য্যের জন্য সেরূপ অনুতাপ জাগে না। তাহাদের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হয় না।

পার্থিব রাজ্যে ঐ একই শক্তির দ্বন্দ্ব। আমাদের ভারতীয় আর্য্যগণ অনুকূল শক্তির ফল ঋদ্ধিবৃদ্ধি লাভ করিয়া পরম ফল শান্তি ও সন্তোষাদির অধিকার পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মানসিক বৃত্তিগুলি অন্তর্মুখীন, হৃদয় ধর্ম্ম ভাবপূর্ণ, বুদ্ধি সম্যক্ বিশুদ্ধ হইয়াছিল। অনুকূল শক্তির শুভফল প্রথম সুখ, সন্তোষ ও সহিষ্ণুতা। পরে বশিত্বাদির ঐশ্বর্য্য অন্তর্মুখিতা ও ধর্ম্মানুরক্তি। কিন্তু অনুকূল শক্তির সম্পূর্ণ সম্প্রসারণে সেই ভারতীয় আর্য্যের বংশধরগণ ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত; সন্তোষে, সুখে, শান্তিতে লালায়িত, পার্থিব ব্যাপারে উদাসীন হইয়া পড়িল। প্রতিকূল শক্তির সংঘর্ষ তখন নাই, ক্রমে তাহারা স্থিতিশীল সম্প্রদায়ে পরিণত হইতে লাগিল। প্রকৃতির বিধানে প্রতিকূল শক্তির দ্বন্দ্বের অভাবে অনুকূল শক্তি ক্রমে অনাবশ্যক স্ফীত, স্থূল হইতে আরম্ভ করিল। স্থিতিশীলতা, ধর্ম্মপ্রাণতা, শান্তি ও সন্তোষই শেষে পার্থিব ব্যাপারে উদাসীনতা আনিয়া দিল। অনুকূল শক্তির পরিণতি অবস্থায়

যাহা ফল, তাহা ফলিল। আর্য্যবংশগণ তখন ধর্ম্মভাবান্বিত, সুখী ও শান্তিপ্রিয় হইয়া শেষে নিষ্ক্রিয় ও অক্ষম হইয়া পড়িল। যেখানে প্রতিকূলতা নাই, বাধ্য নাই, সেখানে বস্তুর স্থায়ীত্ব সম্ভবপর হয় না। বাধা বিঘ্ন, বস্তুর বিনাশকে যেমন প্রতিহত করে, আবার বাধার অভাবও তদ্রূপ বস্তুর স্থায়ীত্বকে নষ্ট করে। বাধার অভাবে কোন বস্তুরই কালের কষ্টি পাথরে বহুদিন ব্যাপী রেখা অঙ্কিত থাকে না। বাধা বিঘ্ন প্রতিকূল শক্তিরই কার্য্য। যদি কোন বাধা, কোন প্রতিযোগিতা না থাকে, তবে কালে তাঁহার পরাভব ও অধঃপতন অনিবার্য্য। যে রাজ্যে সহজেই জীবিকা উপার্জ্জন হয়, সকল দিকেই সুখ শান্তি বিরাজ করে, কোনরূপ অত্যাচার উপদ্রব, যুদ্ধ বিগ্রহ না থাকে, কোন বাধা ও প্রতিযোগিতা না দেখা দেয়; তাহা হইলে সে রাজ্যে স্থিতিশীলতা, ধর্ম্মপ্রাণতা, সুখ-শান্তি, সন্তোষ, সহিষ্ণুতা শেষে আলস্য, ঔদাসীন্য আসিয়া প্রভাব বিস্তার করে। তখন সেই দেশের অধিবাসীরা সত্বরই অলস, বিলাসী, ভীত, যুদ্ধবিগ্রহাদিতে অনিচ্ছুক, শেষে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সেই দেশে আপাততঃ সুখ-শান্তি দেখা দেয় বটে, কিন্তু সেই সুখ-শান্তি আবার নাশের কারণ হইয়া থাকে। নব উদীয়মান্ প্রতিকূল শক্তি আসিয়া যখন উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে আর রোধ করিবার কাহারও শক্তি থাকে না। অনুকূল শক্তি তখন অনাবশ্যক স্ফীত ও বর্দ্ধিত দেহভার লইয়া পঙ্গুর মত বসিয়া থাকে। অধিবাসীরা জড়বৎ অবস্থিতি করে। তখন দেশের আভ্যন্তরীন্ দৃঢ়তা নষ্ট হইয়া যায়; আলস্য, ভীরুতা, জাড্য ও উদাসীনতা আসিয়া উপস্থিত হয়। আমোদে, প্রমোদে, বিলাসে জাতি ডুবিয়া থাকে।

আদর্শ রাজকীয় মহাসভাতেও এই মহাশক্তির দ্বন্দ্ব। সাধারণতঃ রাজ্য শাসন-নীতি পরিচালনা করিয়া থাকে অনুকূল শক্তি। আর প্রতিকূল শক্তি যেমন অনুকূল শক্তির সচ্ছন্দ গতির বাধা উৎপন্ন করে, তদ্রূপ স্বেচ্ছাচারের পথে বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া থাকে। শেষে একটী সুন্দর সামঞ্জস্য ও সমন্বয় আনিয়া দেয়। বিরোধী শক্তি না থাকিলে অনুকূল শক্তির দ্বারা বহুদিন সুফলের আশা করা যায় না।

সৃষ্টি যতদিন বিদ্যমান, বুঝিতে হইবে যে, অনুকূল শক্তি মোটের উপর জয়যুক্ত হইতেছে। অনুকূল শক্তির সম্প্রসারণ কাঙ্ক্ষনীয়। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রতিকূল শক্তির বিলোপ ঘটান উচিত নহে। বিরোধী শক্তির রক্ষা অনুকূল শক্তির স্থায়িত্বের জন্যই আবশ্যক।

পুরাণে এই দেবাসুর যুদ্ধ অনুকূল শক্তি ও প্রতিকূল শক্তির দ্বন্দ্বই সূচিত করে। এই সংঘর্ষে সাধারণতঃ দেবতারা জয়লাভ করেন বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে পরাজিত, স্বর্গচ্যুত ও তেজশূন্য দীনহীনের মত কালযাপন করিতে হইত। দেবগণ যখন অভিমানে আত্মহারা হইয়া, বিলাস মোহে আচ্ছন্ন থাকিয়া, বাহ্য সুখ ভোগে উন্মত্ত হইতেন, তখনই দানবগণের ভীষণ হুংকার শুনা যাইত। তখন দানব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দেবতাদিগের বিলাস মোহ ছুটিয়া যাইত; অভিমান অহঙ্কার দূর হইয়া যাইত। ফলে তখন দেবতাদের দেবত্ব ফিরিয়া আসিত। যে কল্যাণের পথ হইতে দেবতারা ভ্রষ্ট হইতেন, আবার সেই কল্যাণের পথে চলিয়া আপনাদিগকে অমর পদে আরূঢ় থাকিবার যোগ্য করিতেন। এইরূপে দেবত্ব রক্ষা পাইত। বিশ্বদেহের রোগ বিদূরিত হইয়া পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিত। রক্তিম লাবণ্য আবার মুখে চক্ষুতে দেখা দিত। অনুকূল শক্তি প্রকৃতপক্ষে জয়যুক্ত হইত। তখন আবার প্রতিকূল শক্তি কিছুকালের জন্য বলহীন থাকিয়া অনুকূল শক্তির অধীনে আসিয়া সৃষ্টি রক্ষার উপকার করিত। এই অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির রহস্য বস্তুতঃই অবোধগম্য। অনুকূল শক্তির দেবতা বিষ্ণু যেমন আমাদের শ্রীভগবান্, উপাস্য। প্রতিকূল শক্তির দেবতা মহাদেবও তদ্রূপ আমাদের শ্রীভগবান্, উপাস্য। সৃষ্টি যতদিন বিদ্যমান, ততদিন ব্যবহার ভেদেরই আরোপ। প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণু যে, মহাদেবও সে, একই শ্রীভগবান্। অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তি একই মহাশক্তির দুইটী দিক্ মাত্র। যিনি মহামেধা, মহাস্মৃতি, তিনিই আবার মহামোহা মহারাত্রি। যিনি যোগ নিদ্রা তিনিই আবার কালরাত্রি। যিনি সৃষ্টি স্থিতিকারিণী, তিনিই আবার সংহাররূপা। একই মহাশক্তি কোথাও অনুকূল শক্তি রূপে সৃষ্টি স্থিতি বিধায়িনী, কোথাও বা প্রতিকূল শক্তিরূপে সংহারকর্ত্রী। পরমার্থতঃ দুই এক। ব্যবহারে দুই-ই ভিন্ন মাত্র।

পতিতার ছেলে।

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(১)

বেশ তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। নীরবে আকাশ হইতে অন্ধকার ঝরিয়া ধরাবক্ষ প্লাবিত করিয়া দিতেছিল। নদীবক্ষে জেলেদের ডিঙ্গিতে আলো জ্বলিতেছে, ওপারে গাছের ঘন পাতার আড়ালে জোনাকিগুলি ঝিকমিক করিয়া উঠিয়াছে।

বাতাস সোঁ সোঁ করিয়া বহিতেছিল। ফাল্গুনের আকাশ নির্মেঘ। অসংখ্য তারা সেই নীল আকাশে ফুটিয়া ঝিকমিক করিয়া জ্বলিতেছে। ভ্রমণকারীর দল তখন পথ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, পথ এখন শৃগাল কুকুরের অধিকৃত।

একটী রমণী সর্ব্বাঙ্গে অন্ধকার জড়াইয়া গঙ্গার ধারের বাঁধের উপর দাঁড়াইল। পার্শ্ববর্ত্তী বাঁশগাছের শুকন পাতা ঝর ঝর করিয়া তাহার মাথায় ঝরিয়া পড়িল, রমণী একবার মাথা উঁচু করিয়া চাহিল, রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল—"গণশা।"

কোনও উত্তর নাই। রমণী কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া আবার ডাকিল, "গণশা, এখানে আছিস নাকি?"

সেবারেও উত্তর নাই। রমণীর চোখের জল এবারে আর বাধা মানিল না, ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল; সে সেখানেই বসিয়া পড়িল, ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কে সে, সে তো তাহার কেহই নয়। যখন তাহার মা নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া গাছতলায় পড়িয়া মরিতেছিল, বালক গণেশ সেই মরণাহতা মায়ের মাথার কাছে বসিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিতেছিল, তখন গ্রামের সকলেই তো দেখিয়াছিল, সেই পথ দিয়া সকলেই তো যাতায়াত করিয়াছিল, তথাপি কেহই তো সেই মৃত্যুকাতরা জননীকে এইটুকু আশা দেয় নাই—'তোমার ছেলেকে আমি দেখিব।' মৃত্যুশয্যাশায়িনী, সে পথে যে যাতায়াত করিতেছিল, তাহারই পানে চাহিতেছিল। যদিও সংসারে সে অনেক আঘাত সহ্য করিয়াছিল, তথাপি তাহার মনে বুঝি এখনও একটী আশা জাগিতেছিল, এ সময় সংসার তাহাকে অবহেলা করিবে না, এ সময় সকলে তাহার পানে চাহিবে। যে পাপের বোঝা সে মাথায় লইয়াছিল, তাহা সে নামাইতে চলিয়াছে। জগৎ এ সময় তাহার পানে চাহিবেই।

কিন্তু বৃথা আশা! লোকে তাহার পানে একবার চাহিয়াও দেখিল না, অথবা চাহিয়াও চোখ ফিরাইয়া গেল। কলঙ্কিনীর শাস্তি দেখিয়া সকলেই বড় সুখী হইল।

কোন্ সময়ে কি মনের ভুলে সে গৃহত্যাগ করিয়াছিল কে জানে? যাইবার সময় দেড় বৎসরের সন্তান গণেশকে পর্য্যন্তও সে লইয়া গিয়াছিল। তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া একবার সে পিছাইয়াছিল, কিন্তু মাতৃস্নেহ সর্ব্বশেষে জয়লাভ করিয়াছিল। তাহার পরই সে আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া স্বামীর নিকট গেল, কিন্তু স্বামী পদাঘাতে কলঙ্কিনী স্ত্রীকে বিদূরিত করিলেন। সে কাঁদিয়া সকলের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইল, একটু আশ্রয়ের জন্য সে লালায়িত ছিল, কিন্তু কেহ তাহাকে একটু আশ্রয় দিল না। কেহ কেহ সহৃদয় চিত্তে উপদেশ দিলেন 'মিশনারীদের কাছে যাও, তারা যিশুখৃষ্ট ভজাবে, সুখে থাকবে।'

কিন্তু সে গেল না। নিজেকে সে নষ্ট করিয়াছে, প্রাণাধিক পুত্রকে সে নষ্ট করিতে পারিবে না। দিনকতক সে ভিক্ষা করিল, তাহার পর রোগে পড়িল।

হাতে হাতে পাপের সাজা দেখিয়া গ্রামের লোক চমকিত হইয়া উঠিলেন। ধার্ম্মিক সমাজপতির দল ভারি খুসি হইয়া উঠিলেন।

সেই সময় হঠাৎ যোগমায়ার চোখে এই দৃশ্যটা পড়িয়া গেল। ঘাটে যাইতে হঠাৎ তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন। সমাজের কঠোর শাসন ভাবিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় গণেশের কাতরকণ্ঠ তাঁহার কাণে ভাসিয়া আসিল। মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া সে বলিতেছে, "তুই তো চলে যাচ্ছিস, আমায় কার হাতে দিয়ে যাচ্ছিস মা

লুপ্ত মাতৃস্নেহ যোগমায়ার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। মনে পড়িয়া গেল, আজ সাত বৎসর আগে তিনিও ঠিক এমনই ছেলেটীকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। সাত বৎসর শূন্য মাতৃহৃদয় হাহাকার করিয়া ফিরিয়াছে। আজ সেই নিরাশ্রয় বালকের মুখখানা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে সেই ছেলেটীর কথাই জাগিয়া উঠিল, তিনি কোনও মতে নিশ্বাস রোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ের মধ্য হইতে করুণ রোদনের যে সুরটা ভাসিয়া উঠিল, মিলাইয়া দেখিলেন, এ দুই সুরই এক। সেও এমনি মা বলিয়াই তাঁহাকে ডাকিত।

যোগমায়া সমাজের ভ্রুকুটী উপেক্ষা করিয়া এই কলঙ্কিনীর পুত্রকে ধর্ম্ম সাক্ষী রাখিয়া গ্রহণ করিলেন। মৃত্যুশয্যাশায়িনী মায়ের দুই চোখ বহিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বড় শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে সে মৃত্যুকে বরণ করিল।

ব্রাহ্মণ বিধবা যোগমায়া যখন দিব্য অসঙ্কোচে, এই কায়স্থ কলঙ্কিনী পুত্র গণেশকে গ্রহণ করিয়া তাহার মাকে মৃত্যু সময়ে বড় শান্তি দিলেন, তখন দেশ জুড়িয়া একটা বিস্ময়ের প্রলয় ঝড় বহিয়া আসিল।

নিত্য কথা শুনিতে শুনিতে যোগমায়ার কাণ ঝালাপালা হইয়া উঠিতেছিল। তিনি যতই অবহেলার সহিত এ সব কথা উড়াইয়া দিতে চাহিতেন, ততই ইহা আসিয়া তাঁহাকে বিঁধিত। কিন্তু তাহা বিঁধিত মাত্র, ক্ষত করিতে সক্ষম হইত না।

বালক গণেশ অত বুঝিত না। সে ছেলেদের সহিত যখন খেলিতে যাইত, তাহারা ঘৃণার সহিত দূরে সরিয়া যাইত। সে যেন ধূমকেতুর মতই ছিল। যেখানেই যাইত, সেখানেই একটা না একটা অনর্থ বাধাইয়া বসিত। নিজে সে অতি হীন, এ কথাটা সে খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল, তাই সে আর প্রায় তাহাদের নিকটে যাইত না।

আজ যখন যোগমায়ার ননদ তারা—পিত্রালয়ে আসিয়া সব কথা শুনিয়া যোগমায়াকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন হঠাৎ তাহা যোগমায়ার বক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি হঠাৎ উঠিয়া গিয়া পাঠ-নিরত গণেশের পৃষ্ঠে খুব দুমদাম করিয়া কয়েকটা চড় বসাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "জগতে এত লোকের নিত্যি মরণ হচ্ছে, হতভাগা, তুই মরতে পারিস নে? নিজের পেটের ছেলেটাকে যখন চিতায় শুয়াতে পারলুম, তোকে শুইয়ে দিতেও আমার তার চেয়ে বেশী কষ্ট হবে না। যা না হতভাগা, খোলা পথ পড়ে আছে, চলে যা না, আমাকে কেন আর দগ্ধে মারিস?"

গণেশ প্রথমটা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল; ব্যাপারটা বুঝিবার সে চেষ্টা করিতে লাগিল। তারা যখন বলিলেন, "হাঁা, তা আবার যাবে? রাজার হালে রয়েছে, নড়তে চাইবে কেন?"

গণেশ এবার ব্যাপারটা বুঝিল। নিঃশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে বইগুলি তুলিয়া ধীর পদে বাহির হইয়া গেল। অত যে দুর্দ্দান্ত ছেলে, যোগমায়াকে যে সে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনিত না, আজ কি জানি সে কেন বড় শান্ত ভাবে এই কথাটা শুনিল।

সেই সকাল আটটা নটার সময় সে বাহির হইয়াছে, আর এই রাত আটটা বাজে, এখনও সে ফিরিয়া আসে নাই। রাগ করিয়া সমস্ত দিন যোগমায়াও তাহার খোঁজ নেন নাই। সমস্ত দিন তিনিও অনাহারে গৃহ মধ্যে পড়িয়াছিলেন।

অন্ধকার হইয়া আসিল, তথাপি সে ফিরিল না। বিধবা ব্যাকুল নেত্রে বাহির পানে চাহিলেন, ওই যে নিকষ কালো আঁধার রাশি গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া। সন্ধ্যা হইবার আগেই যে সে ফিরিয়া আসে, অন্ধকারকে সে যে বড় ভয় করে। আজ এ গভীর অন্ধকারে, এই ঝড়ের মত বাতাসের মধ্যে সে রহিল কোথায়?

তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

বাঁধের উপর কতক্ষণ তিনি বসিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মনে নাই। তাঁহার বুকের মধ্যে একটা আর্ত্ত কণ্ঠস্বর রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিল, "মা—মাগো।

কোথায় রে কোথায়? বিশ্বজগৎ ব্যাপিয়া ওই যে সেই কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হইতেছে—মা—মাগো। বাতাসও কাঁদিয়া কাণের কাছে ডাকিয়া গেল, মা—মাগো।

কোথায় রে কোথায়? এক্ষি অন্তরেই ধ্বনিত হইতেছে, বাহিরটা স্থিরই আছে? বাছা রে আমার, মাকে

ছেড়ে—মায়ের বুক শূন্য করে শ্মশানে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছিস যে তুই, আজ তোর স্বর কেন ভাসিয়া আসে?

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া যোগমায়া উঠিলেন। এই যে, আবার ডাকিতেছে কে—মা, মাগো। এ যে বড় কাছে, যেন পাশেই সে দাঁড়াইয়া আছে। মায়ের মুখ পানে তাহার অচঞ্চল দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে ডাকিতেছে, মা—মাগো।

হঠাৎ তিনি চমকাইয়া উঠিলেন, এতো অশরীরীর কণ্ঠ নয়, পার্শ্বে কে দাঁড়াইয়া আর্ত্তকণ্ঠে সত্যই কাঁদিয়া ডাকিতেছে, সে তো বাস্তবিকই অশরীরী নয়। এ যে গণেশ, এ যে গণেশের কণ্ঠ।

ব্যগ্র হইয়া তিনি ডাকিলেন, "গণেশ"।

"মা"—গণেশ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সেই অন্ধকারের মধ্যে বড় স্নেহে যোগমায়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। তাহার ললাটে একটা স্নেহচুম্বন দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কোথা গেছলি গণেশ?"

গণেশ চোখ মুছিয়া বলিল "তুমি আমায় তাড়িয়ে দিলে কেন?"

যোগমায়া নীরব হইয়া গেলেন। কেমন করিয়া বুঝাইবেন কাহার উপর রাগ করিয়া তিনি তাহাকে দূর হইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন? কাহাকে জব্দ করিতে গিয়া তিনি নিজেই জব্দ হইয়াছেন?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "আজ খাসনি কিছু?"

রুদ্ধকণ্ঠে গণেশ বলিল, "নিতাইদের বাড়ী হতে কয়েকটা পাকা কলা খেয়েছি, তারা ডটো পয়সা পাবে তার জন্যে—"

যোগমায়া বলিলেন, "তা দেওয়া যাবে কাল। এই কয়েকটা পাকা কলা খেয়ে সারা দিনটা কাটিয়ে দিলি বাবা? আয়, ভাত বেখে দিইছি, খাবি আয়।"

গণেশকে তেমনি করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়াই তিনি বাঁধ হইতে বাগানে নামিলেন।

গণেশ চুপি চুপি বলিল, "পিসীমা আবার বকবে তোমায় না।"

অত্যন্ত স্ক ভাবে যোগমায়া বলিলেন, "না বাবা আয়"

মনে মনে বলিল, তোকে যেদিন কোলে টেনে নিছি গণেশ, সেদিন ভবিষ্যতটাও ভেবেছিলুম। জেনেছিলুম আমায় এখন লোকের নিন্দে—লোকের কটু কথা, সহ্য করবার জন্যে বুক বেঁধে দাঁড়াতে হবে। তোর কিছু ভাবনা নেই, আমার সে সাহস আছে, সে বল আছে যাতে ঠেকে লোকের কথা লোকের নিন্দে ঠিকরে পড়ে যাবে।

(২)

যোগমায়ার স্বামী যখন মারা যান, তখন তিনি স্ত্রীকে পথে বসাইয়া যান নাই। একশ বিঘা জমী, কয়েকটা বাগান, দুইটা পুষ্করিণী, এগুলি সব স্ত্রীর নামে লিখিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, যাহাতে কখনও তাঁহাকে কাহারও কাছে হাত পাতিতে না হয়, সুখে সচ্ছন্দে দিনটা কাটিয়া যায়। এই বাগান পুষ্করিণী ও জমী সবই ভাগে দেওয়া ছিল। একশ বিঘা জমীতে প্রচুর ধান্য জন্মিত, ভাগীদার অর্দ্ধেক গ্রহণ করিত, অপরার্দ্ধ নিজ ব্যয়ে লইয়া আসিয়া তাঁহার গোলাজাত করিয়া দিয়া যাইত। এ গ্রামে তাঁহার তুল্য সচ্ছল অবস্থা একমাত্র কুসুমের ব্যতীত আর কাহারও ছিল না। তিনি গৃহে বসিয়া সকলই পাইতেন। গ্রামের ভদ্র ইতর সকলেই তাঁহার বিশেষ বাধ্য ছিল, কিন্তু যে দিন হইতে গণেশকে তিনি গ্রহণ করিলেন সেই দিন হইতে ভদ্রলোকেরা পিছাইয়া গেলেন, ইতরেরা পিছাইল না।

গ্রামেই তাঁহার দেবর রমণী বাবু বাস করেন, তাঁহার অবস্থাও মন্দ ছিল না। দাদা যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তাঁহার খুবই আশা ছিল দাদা তাঁহারই হস্তে এই নিঃসন্তান বিধবা এবং সম্পত্তি দিয়া যাইবেন। এই আশায় তিনি খুব খাটিয়াছিলেন। কিন্তু দাদা তাঁহাকে বেশ চিনিয়াছিলেন, তাঁহার স্বার্থপরতা দাদার নিকট অছাপা ছিল না। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বেই লেখাপড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং রমণী বাবুর সকল আশাতেই ছাই পড়িয়া গেল।

আর একটা নূতন আশা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি নিজের পুত্রকন্যাগুলিকে বড় বউয়ের কাছে দিনরাতই পাঠাইতেন, বড় বউও সে ছেলে মেয়েগুলিকে খুব ভাল বাসিতেন। শূন্য মাতৃহৃদয় তিনি ইহাদের দ্বারাই পূর্ণ করিয়া তুলিতেন, তাঁহার মাতৃস্নেহ জগতের সব

ছেলেমেয়েগুলির উপরেই ঝরিয়া পড়িত। ছোটলোকের ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট সমান স্নেহ পাইত।

ছোট ছেলে মাণিককে যোগমায়া যেরূপ ভালবাসিতেন, তাহাতে কাহারই সন্দেহ ছিল না যে তিনি ইহাকেই সর্ব্বস্ব দান করিয়া যাইবেন। তিনি নিজেও কত দিন কত লোকের কাছে বলিয়াছেন, আমার সব এরাই পাবে। রমণী বাবু ইহা শুনিয়া আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিতেন, নিজের নামে না পান, তাহারা পাইলেও তো সবই তাঁর। কত আশাই তিনি করিতেন তাহা বর্ণনার অযোগ্য।

ঠিক এমনি সময়ে যখন গণেশ আসিয়া যোগমায়ার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহটা অধিকার করিয়া লইল, আর সকলকে দূরে সরাইয়া দিল, তখন রমণী বাবুর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার হৃদয়ের যত ক্রোধ ছিল সবই পুঞ্জীভূত হইয়া এই ক্ষুদ্র বালকটার উপর পড়িল। তিনি কি করিয়া যে এই ক্ষুদ্র বালকটাকে দূর করিতে পারিবেন তাহার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই পেট মোটা, হাত পা সরু ছেলেটা তাঁহার সব চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া পরম নিশ্চিন্ত ভাবে যোগমায়ার স্নেহরাজ্যে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তাহার স্ফীত উদর ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল, তাহার হাত পা মোটা হইল, বুকের অস্থিগুলি ঢাকা পড়িয়া গেল। এক কথায় সে শীঘ্রই এত নধরত্ব প্রাপ্ত হইল যে লোকে দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

রমণী বাবুর চক্ষু টাটাইতে লাগিল আরও বেশী। তিনি যোগমায়ার কাছে আসিয়া বলিলেন, "তুমি ও করছ কি বউ? কোথাকার এক কায়স্থের ছেলে, যার মা কুলত্যাগ করে বেরিয়ে গেছল, তাকে কেন গ্রহণ করেছ বল দেখি? দাদা যদি বেঁচে থাকতেন কখনো এমন কাজ করতেন না, কারণ ভবিষ্যৎ না ভেবে তিনি চলতেন না। তুমি মেয়ে মানুষ, বুঝতে তো পারছ না, এ ছেলেকে নেওয়াতে কত কাণ্ড হ'তে পারে। ছেলে একটিকে যদি মানুষ করবারই ইচ্ছে হয়, নাও না কেন আমার মাণিককে, আমি একেবারে লেখাপড়া করে দিচ্ছি তোমায়। ওটাকে যে এতদিন মানুষ করেছ এই যথেষ্ট; এখন দাও দূর করে, ভিক্ষে সিক্ষে করে নিজের পেটটা চালাবার যোগ্যতা ওর ঢের হয়েছে। এর পরে ওকে রাখার জন্য তোমার নামে ঢের কথা হবে; লোকে আমায় পর্য্যন্ত জড়াতে কসুর করবে না।"

মুখখানা তুলিয়া শান্তভাবে যোগমায়া বলিলেন, "কেন তোমায় জড়াবে তারা ঠাকুরপো?"

ঠাকুরপো মুখ ভার করিয়া বলিল, "এতটা বয়স তোমার হয়েছে বড় বউ তবু এখনও পাকা বুদ্ধি হল নি। মেয়েমানুষ কি না, বুদ্ধি আর হবে কোথা হ'তে? আমাকে নিয়ে জড়াবে, কেন না, তোমায় তারা সমাজচ্যুত করলেও আমি তো তোমায় ছাড়তে পারব না।"

যোগমায়া বলিলেন, "সমাজচ্যুত করবে—অপরাধ?"

বিরক্ত হইয়া রমণী বাবু বলিলেন, "অপরাধ তো নিজেই জানছ।"

যোগমায়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, এই হতভাগা ছেলেটাকে আশ্রয় আমি দিচ্ছি, এর জন্যে যে সমাজ আমায় ঘৃণা করবে, আমি সে সমাজে বাস করতে চাই নে। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া যদি পাপের কাজ হয় ঠাকুরপো, হোক না সে মহাপাপ, আমি তা সাদরে বরণ করে নেব।"

রমণী বাবু যে কতদূর রাগত হইয়া উঠিয়া গেলেন তাহা যোগমায়া বেশ বুঝিলেন। তিনি বেশ বুঝিলেন, তাঁহার দেবর নিশ্চিন্ত থাকিবার মানুষ নহেন, তিনি যে গণেশকে তাড়াইবার বিধিমত চেষ্টা করিবেন তাহা জানা কথা। তথাপি যোগমায়ার হৃদয় কাঁপিল না, মুমূর্ষার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয় হইতে মুছিয়া গেল না।

রমণী বাবু সেই দিন যে মুখ কালো করিয়া উঠিয়া গেলেন, তাহা অচিরে মহাঝড়ে পরিণত হইল।

এতদিন তারা শ্বশুরালয়ে ছিলেন। যখন সেখানেও এই ঢেউটা গিয়া পৌঁছাইল, যখন তিনি শুনিলেন, বিধবা ভ্রাতৃজায়া কায়স্থ কলঙ্কিনীর পুত্রকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার পিতৃপুরুষ নরকস্থ করিতে চলিয়াছেন, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আসিয়া দেখিলেন কথাটা ঠিকই। গণেশ কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে, তাহাকে তাড়ান এখন প্রায় অসম্ভব। তথাপি তিনি চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না।

রমণী বাবু বিমর্ষ মুখে বলিলেন, "দেখছ দিদি বড় বউয়ের কাণ্ডখানা? এই যে একটা কুলটার ছেলেকে বুকে তুলে নিয়েছেন, এ দেখে স্থির থাকতে পারে এমন সাধ্য কার আছে বল তো? যখন দেখি বড় বউ ওই ছেলেটাকে কোলে বসিয়ে আদর করে তাকে ভাত খাইয়ে দিচ্ছেন, তখন বলব কি, আমার পা হ'তে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে উঠে।"

তারা বলিলেন, "এ তো জ্বলবারই কথা। এমন সব সোণার চাঁদ ছেলে থাকতে ওই ছোঁড়াটাকে না নিলে আর চলত না? দাদার এত বিষয় সম্পত্তি সব খাবে ওই ছোঁড়াটা?"

উদার ভাবে রমণী বাবু বলিলেন, "মরুক গে বিষয় সম্পত্তি। বিষয় সম্পত্তির আমি একটুও প্রত্যাশা রাখিনে দিদি। আমি বরাবরই জানছি ও সব ভূতের শ্রাদ্ধে যাবে। দাদার কি একটু বুদ্ধি ছিল? পৃথকই যেন হলুম, তবু ভাই তো বটে তাঁর, তিনি কোন্ সেই কথাটা মনে করে কাজ করেছেন? মরবার সময় এতটা যে করলুম—থাক। শুধু বলে গেলেন, সব রইল, একটু আধটু পারিস যদি দেখিস। এইটে কি উচিত হয়েছে তাঁর? তবু আমি বলেছিলুম 'দাদা, বড় বউ মেয়েমানুষ, মেয়েদের হাজার জ্ঞান থাকলেও এক কথায় তারা বোকা হয়ে যায়। মনের বল যাদের একটু নেই, সম্পত্তির ভার তারা কি নিতে পারবে মাথায়? আমার হাতে সব দিয়ে যাও, বাড়ীটা আমার নামে দাও, আমি আমার বাড়ী বিক্রি করেই হোক আর ভাড়া দিয়েই হোক, ঐ বাড়ীতে আসি। বেশ হবে, বিষয় সম্পত্তিও দেখা হবে, বড় বউকেও দেখতে শুনতে পাব। আমার ছেলেপুলেগুলোও দিনরাত বড় বউয়ের কাছে থাকবে না।' দাদা কি আমার কথা শুনলে? ভারী বুদ্ধিমতী বড় বউ, আমায় বিশ্বাস হল না। এই তো বুদ্ধি দেখা যাচ্ছে, একটা ব্যভিচারিণীর ছেলে নিয়ে তার মা হয়ে একেবারে গলে আছে। আমার মাণ্কেটাকে আমি তো লেখাপড়া পর্য্যন্ত করে দিতে চাইলুম, কথা মোটে কানে তুললে না। 'মরুক গে, আমার এত মাথাব্যথা কিসের?"

তারা বলিলেন, "তাতো ঠিকই। আচ্ছা, বুড়োমাগীর এটা জ্ঞান হল না, এতে তার স্বামীর চোদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে; ওই ছেলের হাতের জলগণ্ডূষ বোধ হয় দাদাকেও দেবে?"

সজোরে হুঁকায় একটা টান দিয়া—নাসা ও মুখপথে ধূমগুলি ছাড়িয়া দিয়া রমণীবাবু দুঃখে বলিলেন, "না, হিঁদুয়ানী আর থাকে না দিদি। চোদ্দপুরুষ নরকস্থ হ'ল দেখছি। ওই ছেলের হাতে জলগণ্ডূষ? দাদা এবার ভারী জব্দ হবে। একে কায়স্থ, তাতে কার ছেলে ঠিক নেই। নরকে পচে' মরবেন—আর কি? বিধবার হাতে সম্পত্তি পড়লে এই রকমই হয় বটে।"

তারা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সমাজের লোকও তো নেবে না ওকে আর।"

রমণী বাবু জোরের সহিত বলিলেন, "কেমন করে হবে তা? সমাজ অমনি ছেলেখেলার জিনিস আর কি! যা তা করবে, সমাজ তাই সহ্য করে যাবে, এও নাকি হ'তে পারে কখনও?"

তারা বলিলেন, "মাগীর মরণবাড় হয়েছে, নইলে এমন কাজও করতে যায়? কোথায় ও হচ্ছে বামনের ঘরের বিধবা, ওকে থাকতে হবে কেবল আচার-বিচারের মধ্যে, তা না, যত সব খিষ্টেনি মত, মার ঝাঁটা মুখে, অমন মানুষের মরণ হওয়াও ভাল। দাদা নিজে যেমন ছিলেন, একজেদি বউটীকেও তেমনি গড়ে তুলেছেন। আমার তো ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। এ পর্য্যন্ত একটা পূজো আচ্ছা করতে দেখলুম না।"

রমণী বাবু বলিলেন, "আর একবার বুঝিয়ে বলতে পার দিদি? আমার মাণ্কেটাকে নিক না, আমি একেবারে সব সত্ত্ব ছেড়ে দেব, কথাটা একটু বেশ ভাল করে বুঝিয়ে বলো না কেন।"

তারা স্বীকৃত হইলেন।

(৩৬)

গণেশকে সামলাইতে সামলাইতে যোগমায়ার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছিল। এমন দুর্দ্দান্ত ছিল যে, সে কোনও গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিত না। আরও যেটা করিতে নাই, সেইটাই সে জোর করিয়া করিয়া বসিত।

গ্রামের অনেকেই যোগমায়ার সহিত সম্পর্ক রহিত করিয়াছিল। করে নাই কেবল ছোটলোকেরা—যাহারা যোগমায়ার কাছে অনেক সাহায্য পাইত এবং যোগমায়াও যাহাদের কাছে প্রকৃত সাহায্য পাইতেন।

নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায় কার্য্যোপলক্ষে বহুকাল বিদেশে ছিলেন, প্রায় সাত আট বৎসর পরে কন্যার বিবাহ দিতে তিনি দেশে ফিরিলেন।

যোগমায়া রন্ধনে অত্যুৎকৃষ্টা ছিলেন বলিয়া আগে তিনি নিজেই যোগমায়ার কাছে আসিলেন। বরাবর তিনি যোগমায়াকে বউদি বলিয়া ডাকিতেন, এবং যোগমায়াও তাঁহার সহিত কথা কহিতেন। তিনি এখনও যোগমায়ার সমাজচ্যুতির কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই। বৈকালে সমাজপতি হরিহর খুড়া কথাটা বলি বলি করিয়াও বলিতে পারেন নাই। ভাবিয়াছিলেন, যখন তাঁহার সম্মুখে নিমন্ত্রণ লিষ্ট প্রস্তুত হইবে, তখন যোগমায়ার নাম কাটিয়া দিলেই হইবে, এবং সেই সময়ে নীলাম্বরকে সব কথা জানাইলেই হইবে। নীলাম্বর যে গ্রামে পা দিয়াই যোগমায়ার সাহায্যপ্রার্থী হইতে যাইবেন তাহা তিনি জানিতে পারিলে তখনই সব কথা জানাইয়া দিতেন।

তখন রাত হইয়া গিয়াছে, আকাশে তৃতীয়ার সরু চাঁদখানা খানিকদূর উঠিয়া আবার আস্তে আস্তে নামিয়া যাইতেছে। বুড়ু তারাটা জলজল করিয়া জ্বলিতেছে। নিস্তব্ধ পল্লী-পথ অতিবাহিত করিয়া নীলাম্বর যোগমায়ার বাড়ী পৌঁছাইলেন। বাড়ীর সামনেই ছোট একটী ফুলবাগান। তাহাতে সব ফুলের গাছই একটী দুটি ছিল। দুর্দান্ত বালক গণেশ আজ বৈকালে কে জানে কেন, যোগমায়ার উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া ছুরি দিয়া হেনা গাছের অনেক ডাল কাটিয়া পথের উপর ছড়াইয়া ফেলিয়াছে। রান্নাঘরের উপরে যে আমগাছটা ছিল, তাহাতে অনেক মুকুল বাহির হইয়াছে, তাহারি মধ্যে একটা কোকিল বসিয়া ডাকিতেছিল।

নীলাম্বর এই শান্ত ছবিটী একবার চোখ ভরিয়া দেখিয়া লইলেন, তাহার পর খোলা রোয়াকে উঠিয়া দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিলেন—"বউদি।"

ভিতর হইতে যোগমায়ার বিস্মিত কণ্ঠ শুনা গেল—"কে গা?"

নীলাম্বর উত্তর দিলেন—"আমি নীলাম্বর।"

যোগমায়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। তাঁহার হাতে একটা লণ্ঠন ছিল, সেইটা উঁচু করিয়া বলিলেন, "সত্যি তুমি এসেছ ঠাকুরপো?"

নীলাম্বর একটু হাসিয়া বলিলেন, "দেখতেই পাচ্ছ সত্যি এসেছি কি মিথ্যা এসেছি। সত্যি মিথ্যা জিজ্ঞাসা করবার মানেটা যে কি তাতো বুঝতে পারলুম না।"

মলিন হাসিয়া যোগমায়া বলিলেন, "মানে যথেষ্ট আছে ঠাকুরপো। আজ কাল এমনি দিন পড়েছে যে কেউ আসলে আগে তাকে জিজ্ঞাসা করতে হয় সে সত্যি এসেছে না মিথ্যা এসেছে। তুমি কাল রাত্রে এসেছ, আজও কেউ তোমার কানে কোনও কথা তুলে দেয় নি বুঝি? এ সহৃদয়তার মানে তো আমি কিছু বুঝলুম না।"

নীলাম্বর সকৌতুকে বলিলেন, "তোমার কথাগুলো বেশ হেঁয়ালী ভরা। যাই হোক, বসতে জায়গাটুকু দাও তো আগে, তার পর তোমার সব কথা শুনব, আমার সব কথাও শুনাব।"

ব্যস্ত হইয়া যোগমায়া ডাকিলেন, "গণশা, একখানা আসন দিয়ে পড়তে যা তো।"

মুখখানা খুব গম্ভীর করিয়া গণেশ আসিয়া আসনখানা যোগমায়ার কাছে ফেলিয়া দিয়া আগন্তুককে অবহেলার চোখে একবার দেখিয়া লইল, তাহার পর আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

নীলাম্বর বসিতে বসিতে বলিলেন, "এ রত্নটী পেলে কোথায়? রমণী বাবুর বোধ হয়?"

গম্ভীর ভাবে যোগমায়া বলিলেন, "না, পথে কুড়িয়ে পেয়েছি।"

এটী যে যথার্থই সত্য কথা তাহা নীলাম্বর বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তাই তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে। নিজের না হলে পরেরটী হলেই লোকে বলে বটে কুড়িয়ে পাওয়া। যাক, তোমার কথা, পরে শুনছি, এখন আমার কথাটা বলে আগে ভারটা নামিয়ে ফেলা যাক। শুনেছ বোধ হয় আমি কমলার বিয়ে দিতে এসেছি?"

যোগমায়া বলিলেন, "হ্যাঁ, আজ সকালেই তা তোমার মায়ের মুখে শুনলুম।"

নীলাম্বর বলিলেন, "সে আবার কে ?"

যোগমায়া বলিলেন, "তার কথা মনে নেই তোমার ? সেই যে পরমেশ্বর নাপিত ছিল, তারই স্ত্রী, তেনা তার ছেলে। সে এখানেই আছে, তার মা ফিরবার সময় তাকে ডেকে নিয়ে যাবে।"

নীলাম্বর বলিলেন, "থাক গে সে কথা, এখন আমার কথাটা শোন। রাঁধতে বাড়তে তোমার যাওয়া দরকার, আমি জানি রান্না তোমার যেমন ভাল হয়, এমন এ গাঁয়ের কারও হাতে হয় না। এ কয়টা দিনই কিন্তু—"

যোগমায়া বাধা দিয়া বলিলেন, "মাপ কর ভাই, এ আমি পারব না।"

বিস্মিত নীলাম্বর খানিক তাঁহার অন্ধকারপূর্ণ মুখখানার পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পরে সবেগে বলিয়া উঠিলেন "পারবে না কি ? এ কি তোমার পরের কাজ যে পারব না বলেই ছেড়ে দেবে ? দাদা থাকলে আমি না ডাকতেই, তিনি বুক দিয়ে পড়তেন, আর তুমি বলছ কি না বউদি —"আমি পারব না ?"

যোগমায়ার চোখের পাতা চকচকে হইয়া উঠিল, তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "সত্যি ঠাকুরপো, আমি পারব না। মনে ভেব না আমি করব না বলেই বলছি পারব না। তা নয়, এখন তুমি আমায় পাঁচ শ লোকের রান্না রাঁধতে বল না কেন, তাও আমি পারব। আমি রাঁধতে ভয় পাইনে, কিন্তু—"

তিনি থামিয়া গেলেন দেখিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে নীলাম্বর বলিলেন, "তবে ?"

যোগমায়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কেউ আমার হাতে খাবে না।"

"তোমার হাতে খাবে না, কেন, কি করেছ তুমি ?"

যোগমায়া দালানে পাঠনিরত গণেশকে দেখাইয়া বলিলেন, "তার কারণ আমি ওই বালকটীকে আশ্রয় দিয়েছি।"

নীলাম্বর বলিলেন, "সে তো ভাল কথাই। কত লোকে যে কত গরীবদের আশ্রয় দেয়, তাতে কেউ তাকে ছোঁবে না, এ যে আশ্চর্য্য কথা বলছ বউ দি।"

গলা ঝাড়িয়া লইয়া যোগমায়া বলিলেন, "কিছু আশ্চর্য্য নেই ঠাকুরপো। এ ছেলেটীর বাপকেও তুমি চেন, এ অবিনাশ মজুমদারের প্রথম পক্ষের ছেলে।"

নীলাম্বরের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, "সেই যে স্ত্রী বেরিয়ে গেছল, তারই ছেলে ?"

দৃঢ়কণ্ঠে যোগমায়া বলিলেন, "হ্যাঁ, সেই পতিতা মায়েরই ছেলে এ। লোকে বলে, এ ছেলে পতিতার গর্ভজাত, কেন আমি একে গ্রহণ করেছি। জানি নে, তুমিও আমায় কি বলবে ঠাকুরপো, সত্যিই আমি এ ছেলেটীকে দেখে সব ভুলে গেছি। যখন দেখলুম সেই মরণোন্মুখী মা, তার মাথার কাছে বসে এই ছেলেটি, দুই হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে তার কপালের পর নিজের ঠোঁট দুখানা রেখে ডাকছে—মা—মাগো। মরণ তাকে নিতে এগিয়ে এসেছে ; মা—তার যতটা শক্তি আছে সবটা দিয়ে তাকে বাধা দিচ্ছে—এখন নয়, এখন নয়। তার কর্ত্তব্য এখনও যে পড়ে, ছেলেটীকে কারও কাছে গচ্ছিত না রেখে সে যে যেতে পারছে না। পথ দিয়ে সবাই তো চলে গেল, সবাই তো চেয়ে গেল তার পানে, কেউ কি মায়ের এই শাস্তিটা দিয়ে তাকে নিশ্চিন্তভাবে মরণের কোলে আপনাকে সঁপতে সাহায্য করলে ? আমার বুকে যে ঘুমিয়ে ছিল, সে জেগে আমার প্রাণটাকে দুহাতে মুঠো করে ধরে কেঁদে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল—তুলে নে রে, ও আমিই। মনে কর আমি এসেছি ওই দেহটাই ধরে। ঠাকুরপো, আমি আগেই জেনেছিলুম সব সইতে হবে আমায়, তবু আমি পেছুই নি। পতিতা সে ঠাকুরপো ? একবার একটু ভুলে সে যে কাজ করে ফেলেছিল, সারাটী জীবন ধরে যে তার প্রায়শ্চিত্ত করলে তবু সে এত ঘৃণ্য, এত হীন ? ঠাকুরপো, ভুল তো সবাই করে, তার ক্ষমাও তো পায়। সে যে এই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করলে, নিজের জীবনটাই ওই গাছতলায় বিসর্জন দিলে, তবু তোমরা এতটুকু দয়া করবে না তাকে ?"

যোগমায়া অঞ্চলে চোখ মুছিলেন। সঙ্কুচিত কণ্ঠে

নীলাম্বর কি বলিতে যাইতেছিলেন, যোগমায়া বাধা দিয়া দীপ্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "এই আমাদের সমাজ ঠাকুরপো! যার বুকে এতটুকু দয়া নেই মায়া নেই, যে ক্ষমা করতে জানে না, জানে শুধু দগ্ধ করতে, এরই আড়ালে আমরা আপনাকে লুকিয়ে রাখি। আমরা যে সমাজের দোহাই দেই, সে এই সমাজ। এর মধ্যে এত আবর্জ্জনা রয়েছে আমরা তা দেখেও দেখিনে। চাও দেখি ঠাকুরপো, ওই ছেলেটার পানে একবার চেয়ে দেখ দেখি, তার পরে সমাজের পানে চেয়ো। আজ যদি আমি সমাজের ভয়ে একে তাড়িয়ে দেই, এ দাঁড়াবে কোথায়? মা যদি দোষ করে, সে সাজা তোমরা নির্দ্দোষী ছেলেটাকে দিচ্ছ কেন? এ কি জানে ঠাকুরপো?"

নীলাম্বর গম্ভীর মুখে বলিলেন, "একে আশ্রয় দেবার অপরাধে সমাজ তোমায় ত্যাগ করেছে বউ দি? আমি—জানই তো সমাজের লোক নই, কারণ আমায় সমাজের বাইরেই চিরকাল কাটাতে হচ্ছে। তবে দেশে ঘরে যখন আসতে হয় তখন বাধ্য হয়ে সমাজের আশ্রয় নিতেই হয়। আমি বলছি, এতে সমাজ আমায় ত্যাগ করে করবে, তোমাকে আমার বাড়ী রাঁধতেই হবে।"

যোগমায়া বলিলেন, "রাঁধব তো, খাবে কে? আমি যে সমাজচ্যুত, কেউই তো আমার ছোঁয়া খাবে না।"

নীলাম্বর বেগের সহিত বলিলেন, "ছোটলোকদের ডেকে খাওয়াব।"

যোগমায়া তাঁহার পাগলামীর কথা শুনিয়া হাসিলেন; বলিলেন, "ছেলেমানুষির কথা নয় ঠাকুরপো, মেয়ের বিয়ে। আমি তোমার বাড়ী রাঁধতে বসবামাত্র বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। কেন তোমায় বিপদগ্রস্ত করব ঠাকুরপো আমার জন্যে? আরও তো ঢের লোক আছে রাঁধবার মত।"

নীলাম্বর রাগ করিয়া বলিলেন, "তুমি যদি থাকতে বউ দি, তোমার হাতে সব ভার ফেলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতুম। দেশের লোক একটাকে আমার বিশ্বাস হয় না, এরা বেজায় চোর। না হয় নাই রাঁধতে চাও তুমি, আমি কাল সকালেই কলকাতা হতে ঠাকুর আনাব, তারা বেশ রাঁধে। কিন্তু বউ দি, তোমাকে যেতেই হবে, ভাঁড়ার আমি তোমার হাতে ভিন্ন আর কারও হাতে দেব না।"

যোগমায়া বলিলেন, "আমার না যাওয়াই ভাল, ঠাকুরপো, সব দিক বিবেচনা করে দেখ—"

নীলাম্বর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তোমার কোনও ওজর-আপত্তি আমি শুনতে চাই নে বউ দি, যদি যথার্থই আমায় স্নেহ কর, তবে তোমার যাওয়াই চাই। তোমার কোনও কথা আমি শুনব না।"

নিজের হাতেই দরজা খুলিয়া—পাছে যোগমায়া আবার কোনও আপত্তি করিয়া বসেন তাহা শুনিবার ভয়ে—নীলাম্বর তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন। যোগমায়া আর একটা কথাও বলিবার সুযোগ পাইলেন না।

ক্রমশঃ।

প্রিয়ার চিঠি।

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন]

(১)

আমার প্রিয়ার চিঠি!—
তার আঁখরে আঁখরে হেরিবারে পাই প্রেম গদগদ দিঠি!
লিপিখানি তার রসে আছে ভরে',
শবদে শবদে কত সুধা ঝরে,
পড়িতে পড়িতে ভুলি আপনারে
পুলকে শিহরে প্রাণ—
দুকূল প্লাবিয়া হৃদয়-সাগরে
বহায় প্রীতির বান

(২)

আমার প্রিয়ার চিঠি—
মুকুতার মত লেখাগুলি যেন চেয়ে আছে মিটিমিটি!
আসিয়াছে লিপি বহুদিন পরে,
প্রেম-পারাবার উথলিয়া পড়ে
কত কথা আজি জাগে স্মৃতি-পটে—
ছোট বড়—ইটি-সিটি—
দিও লিপি মোরে—দূরে থাকি প্রিয়ে
হেরিব তোমার দিঠি!

ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে ভারতের কথা।

(ড্রাইডেন)

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ]

অলিভার ক্রমওয়েল ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করিলে তাঁহার উদ্দেশে ড্রাইডেন যে স্মৃতি-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে রত্নগর্ভা ভারতের কথা স্থান পাইয়াছে। কবি মৃত ব্যক্তির গুণকীর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন যে, তুলাদণ্ডে ক্রমওয়েলের সৌভাগ্য ওজন করিলে দেখা যায় যে, ভারতের খনি সকলের ভার হইতেও তাহা গুরুতর। "His fortune turned the scale where'er 'twas cast, Though Indian mines were in the other laid" (*Stanzas on Oliver Cromwell*, শ্লোক ২৩)। ড্রাইডেনের সমকালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ প্রাচ্যদেশসমূহে পাশ্চাত্য বাণিজ্যের অধিকার প্রসারিত হওয়াতে ইংলণ্ড ও হলাণ্ডবাসী বণিকদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা শেষে যুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে কবি "আশ্চর্য্য ঘটনাপূর্ণ বর্ষ" নামক যে সুবিখ্যাত কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আরব্য ও সিংহলের সহিত হলাণ্ডের বাণিজ্যের ঘনিষ্টতা দেখিয়া ইংরাজ কবি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, হলাণ্ডের বণিকদের সুবিধার জন্যই যেন উক্ত দুইটি দেশ গন্ধদ্রব্য উৎপন্ন করিয়া থাকে। "For them the Idumæan balm did sweat And in hot Ceylon spicy forests grew." (*Annus Mirabilis*, শ্লোক ৩)। ভারতবর্ষ হইতে হলাণ্ডে রপ্তানি পণ্যদ্রব্যের বহুলতার উল্লেখ করিয়া ড্রাইডেন এই কবিতায় লিখিয়াছেন যে, উদীয়মান সূর্য্যের সমুদায় ধনরত্নে পরিপূর্ণ তাহাদের অর্ণবপোত সকল ভারতবর্ষ হইতে চলিয়াছে। "And now approached their fleet from India, fraught With all the riches of the rising sun." (ঐ, শ্লোক ২৪)। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবাসীর নৌকা নির্ম্মাণ পটুতার অভাব দেখিয়া কবি লিখিয়াছেন যে, তাহার নৌকা অতি প্রাচীন শিল্পের নমুনা মাত্র। নদ নদীতে তাহার সাহায্যে যাতায়াত করা যায় কিন্তু সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে সে নৌকা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। "And untaught Indian on the stream did glide." (ঐ, শ্লোক ১৫৭)। যে জাতির নীতিশাস্ত্র বলেন, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" সে জাতির বাণিজ্যের অবনতির কারণ ইংরাজবণিক এদেশে আসিবার পর স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রাচ্যে বাণিজ্যের অধিকার লইয়া হলাণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের যে যুদ্ধ বাধে তাহাতে ফরাশিরা হলাণ্ডকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ড্রাইডেন যখন উক্ত "আশ্চর্য্য ঘটনাপূর্ণ বর্ষ" শীর্ষক কবিতা রচনা করেন, সে সময়ে ইংলণ্ড উক্ত যুদ্ধে কতকটা জয়ী হওয়াতে কবি লিখিয়াছেন যে, এক্ষণে সম্পূর্ণ জয়লাভের বিলম্ব হইবে না। উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া প্রাচ্যদেশ সমূহে ইংরাজের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য জাহাজ সকল যাইতে পারিবে, ইহা স্মরণ করিয়া বণিকের জাতি ইংরাজের কবি-হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উক্ত কবিতার শেষ শ্লোকে যাহা ব্যক্ত করিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে ইংরাজের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কতকটা সংবাদ পাওয়া যায়।

"Thus to the Eastern wealth through storms we go,
But now, the cape once doubled, fear no more;
A constant trade-wind will securely blow
And gently lay us on the spicy shore."

বণিকজাতির কবি-কল্পনা কাব্য-ক্ষেত্রে ভারতের কথা প্রসঙ্গে বাণিজ্যবিষয়ক যে সকল প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছে, তাহাতে যে স্বার্থ-ভরা মানবহৃদয়ের অনেক

গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ড্রাইডেনের সমসাময়িক পাশ্চাত্য বাণিজ্যের ইতিহাস পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, হলাণ্ডের বণিকগণের অত্যাচার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। "They obstructed us and dictated us. They compelled us to do what we did not wish and prevented us from doing what we did. They committed excesses and we paid the penalty of them in various forfeitures and imprisonments." (*Kaye's Administration of the East India Company*) বাস্তবিক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়, তাহার মূল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইতিহাস। ড্রাইডেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কবি ছিলেন, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডাচদিগকে বিদ্রূপ করিয়া তিনি যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার শেষ চারিটি ছত্রে কবি রোমান বাগ্মী কেটোর উদ্দীপনাপূর্ণ সুবিখ্যাত বাক্য, "কারথেজকে ধ্বংস কর", (Delenda est Carthago) হলাণ্ডের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন।

"As Cats, fruits of Afric did display,
Let us before our eyes their Indies lay ;
All loyal English will like him conclude :
Let Cæsar live, and Carthage be subdued."

(*Satire on the Dutch*)

ইণ্ডিজ আবিষ্কৃত হওয়া সম্বন্ধে ড্রাইডেন কবিত্বপূর্ণ একটি শ্লোকে বলিয়াছেন যে, ইণ্ডিজের মাটি হইতে উত্থিত গন্ধচূর্ণে পরিপূর্ণ সৌরভময় বাষ্প বায়ুদ্বারা চালিত হওয়াতে উক্ত দেশসমূহের অস্তিত্ব পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা অবগত হইয়াছেন।

"The Indies were not found before
Those rich perfumes, which, from the happy shore,
The winds upon their balmy wings conveyed,
Whose guilty sweetness first their world betrayed."

(*Lines to the Chancellor*, ১৩১)

বাস্তবিক, ইণ্ডিজ যে কোথায় ও কতগুলি ইণ্ডিজ আছে তৎসম্বন্ধে য়ুরোপীয়দের ধারণা মার্কোপোলোর সময় পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ তমসাচ্ছন্ন ছিল। যাহা হউক, ভারতবর্ষ যে একটি ইণ্ডিজের সামিল তাহা ইংরাজ কবিরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল হইতেই স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। ড্রাইডেনের সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মোগল সম্রাটদিগের নিকট ফারমান প্রাপ্ত হইয়া সুরাট, মান্দ্রাজ ও বাঙ্গালায় কারখানা স্থাপিত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সংস্পর্শে আসিয়া ইংরাজেরা অনেক পুরাতন ভুল ধারণা সংশোধন করিয়া লইতেছিলেন। নূতন দেশ, নূতন সভ্যতা, নূতন ধর্ম্মের কাহিনী ইংলণ্ডীয় সমাজে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। ড্রাইডেনের সময়ে ইংলণ্ডে ধর্ম্ম সংস্কার লইয়া যে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল কবির অনেকগুলি ব্যঙ্গ-কবিতায় তাহার প্রভাব অনুভব করা যায়, আর সেই সঙ্গে ভারতবাসীর ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কবির সামান্য অভিজ্ঞতারও পরিচয় পাওয়া যায়। "সাধারণ লোকের ধর্ম্ম" শীর্ষক ব্যঙ্গ-কবিতায় ড্রাইডেন খৃষ্টানের ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত ত্রাণকর্ত্তার (Messiah) জন্ম-বৃত্তান্ত জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া বলিয়াছেন যে, নবাবিষ্কৃত ভারতবর্ষের অধিবাসীদের আত্মার কল্যাণ সাধন পক্ষে তাহা কি প্রকারে প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে ?

"'Tis said the sound of a Messiah's birth
Is gone through all the habitable earth ;
But still that test must be confined alone
To what was then inhabited, and known.
And what provision from thence accrue
To Indian souls and worlds discovered new ?"

(*Religio Laici*, ১৭৪)

প্রত্যাদিষ্ট খৃষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে কবির এই যুক্তি সারবান বলিয়া মনে হয়। ইংরাজ বণিক ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া এখানকার নানা তথ্য যে সময়ে আগ্রহের সহিত সংগ্রহ করিতেছিলেন, মুসলমানদিগের ধর্ম্ম তখন মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আশ্রয়ে এদেশে দৃঢ়ভাবে

প্রতিষ্ঠিত। ড্রাইডেন সেই কারণে মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহার কাব্যে তাহার আভাস দিয়াছেন। খৃষ্ট মুশা ও বাইবেলের উল্লেখ করিয়া কবি মরণের পরপারের যে বার্ত্তা মহম্মদ ও কোরাণের অনুমোদিত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও ভারতবাসী মুসলমানের ধর্ম্মমত তিনি ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে লিপিবদ্ধ করিয়া ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে গাঢ়তর ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত সপ্রমাণ করিয়াছেন।

"Though our lean faith these rigid laws has given,
The full-fed Mussulman goes fat to heaven;
For his Arabian Prophet with delights
Of sense allured his Eastern proselytes."

(*Hind and Panther*, প্রথম ভাগ, ৩৭৬)

স্বর্লোকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখভোগের আশায় ভারতবাসীরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিলেন কি না আমরা জানি না, কিন্তু ড্রাইডেন যে ভারতে মোগল সম্রাটগণের শাসন পদ্ধতির ইতিহাস পাঠ করিয়া একখানি নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। সেক্ষপীয়র ও মিল্টনের কাব্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায় তাহা অতি সামান্য। ড্রাইডেনের কল্পনা ভারতের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রভাব উপেক্ষা করিতে পারে নাই। বঙ্গদেশে যখন একখানিও নাটক বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হয় নাই, বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে ঐতিহাসিক নাট্য-কাব্যের অভিনয় যখন কোনও বাঙ্গালী কবি কল্পনা করেন নাই, এমন কি দিল্লী ও আগ্রার মসনদের ইতিহাস পর্য্যন্ত যে সময়ে কোনও বাঙ্গালী লেখক লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই, সে সময়ে ইংরাজি রঙ্গমঞ্চে ভারতের শাসন কর্ত্তাদের কার্য্যাবলী ইংরাজ অভিনেতৃ দ্বারা অভিনীত হইয়াছিল, এ কথা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইংরাজি নাট্য-সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই জানেন যে, সেক্ষপীয়রের নাট্য-প্রতিভা ড্রাইডেনের কবিত্ব শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ড্রাইডেনের "ঔরঙ্গজেব" নামক নাট্য-কাব্য ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের গ্লোব (Globe) রঙ্গালয়ে সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়। বার্ণিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্তে (Bernier's Travels) লিখিত ঘটনাবলী অবলম্বনে এই নাটক রচিত হইয়াছিল। এই পঞ্চাঙ্ক নাটকে কবি মোগল সম্রাট সাজাহানের সমসাময়িক আগ্রার রাজনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি প্রসিদ্ধ ঘটনা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সেই জন্য প্রায় সকলেই পাঠকের পরিচিত। সাজাহান, ঔরঙ্গজেব, মোরাদ, নূরমহাল, আগ্রার শাসনকর্ত্তা অরিমন্ত, দিয়ানাত, সোলেমান, মিরবাবা, আব্বাস, আসফ খাঁ, ফজল খাঁ, মোরাদের স্ত্রী মেলিসেন্দা, নুরমহালের প্রিয় ক্রীতদাসী জায়দা ও ইন্দামোরা প্রভৃতি কুশীলবগণের মধ্যে ঔরঙ্গজেব নাটকের নায়ক ও ইন্দামোরা নায়িকা রূপে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিল। নায়িকার নামটি কবির রচিত। ইন্দামোরা (Ind+amora) কাশ্মীরের বন্দী রাণী। সাজাহান, ঔরঙ্গজেব, মোরাদ ও অরিমন্ত তাঁহাকে মন প্রাণ অর্পণ করিয়াছে। ইন্দামোরা কিন্তু কেবল ঔরঙ্গজেবকে হৃদয়ের দেবতা করিলেন। "ঔরঙ্গজেব" সেইজন্য শোকান্ত নাটক না হইয়া অন্য কোনও শ্রেণীর নাটক হইতে পারে না। ঘটনাবলীর স্থান—আগ্রা, কাল—১৬৬০ খৃষ্টাব্দ।

নাটকের প্রথমাঙ্কে আমরা দেখিতে পাই যে, ইন্দামোরার রূপে মুগ্ধ ঔরঙ্গজেব সম্রাটের আজ্ঞার বিরুদ্ধে বন্দীকে কারামুক্ত করিলে অরিমন্তের সহিত তাহার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। কবি এইখানেই ট্রেজেডির সূত্রপাত করিয়াছিল। ইন্দামোরা যুবরাজ ঔরঙ্গজেব ও অরিমন্তের মাঝে পড়িয়া সে যাত্রা রক্তপাত বন্ধ করিলেন। দ্বিতীয়াঙ্কের সূচনাতে আমরা দেখিতে পাই যে, অরিমন্ত ইন্দামোরাকে হৃদয়ের সুমধুর বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছেন। সম্রাট সাজাহান অন্তরালে অবস্থান করিয়া তাঁহাদের প্রণয় সম্ভাষণ শ্রবণে ক্রোধে, অধীর হইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। ইন্দামোরা সম্রাটকে বলিলেন যে, অরিমন্ত সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁহাকে প্রেমের গাথা শুনাইতেছিলেন। সম্রাট ইহাতে শান্ত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি ইন্দামোরাকে বলিলেন যে, তিনি ঔরঙ্গজেবকে ভালবাসিতে পারিবেন না। এমন সময়ে সম্রাজ্ঞী নুরমহাল সেখানে আসিতেছেন

শুনিয়া ইন্দামোরাকে তাড়াতাড়ি দৃশ্যপটের অন্তরালে সরাইয়া দেওয়া হইল। নুরমহাল সম্রাটকে অনেকগুলি শক্ত কথা শুনাইয়া দিলেন। সাজাহান ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম দিলেন। ঔরঙ্গজেব তৎক্ষণাৎ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন ও মাতার মুক্তির জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করিলেন। নুরমহাল মুক্ত হইলে দ্বিতীয়াঙ্ক শেষ হইল। তৃতীয়াঙ্কে ট্রেজেডি ঘনাইয়া আসিল। মোগল রাজত্বে, বিশেষতঃ সাজাহানের সময়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কথা স্মরণ করিয়া কবি মোরাদ ও ঔরঙ্গজেবের মধ্যে ঈর্ষ্যার যে বিধান সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কবিকল্পিত নহে। উভয়েই ভারতের রাজ-মুকুট পাইবার উচ্চাশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। ইন্দামোরা জানিতেন যে, বৃদ্ধ সাজাহান যদি মোরাদকে সিংহাসনে বসাইয়া দেন তাহা হইলে ঔরঙ্গজেবের সমূহ বিপদ। রাজপ্রাসাদের কক্ষাভ্যন্তরে ইন্দামোরার সহিত মোরাদের স্ত্রী মেলিসেন্দার কথাবার্ত্তা শুনিলে মেঘনাদ বধ কাব্যের সীতা ও সরমার চিত্র মনে পড়ে। ড্রাইডেন ইন্দামোরা ও মেলিসেন্দার মধ্যে সখীত্ব পাতাইয়াছেন। সংবাদ আসিল যে, ঔরঙ্গজেব সম্রাট কর্ত্তৃক অপমানিত ও মোরাদ সিংহাসনের ভাবী অধিকারী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। তৃতীয়াঙ্কে সাজাহান, ঔরঙ্গজেব, মোরাদ ও নুরমহালের কথোপকথন শুনিলে তাঁহাদের চরিত্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। সাজাহানের তখনকার মনের ভাব এই যে, ঔরঙ্গজেবকে রাজ্য হইতে সরাইয়া দিলে ইন্দামোরার হৃদয় তিনি অধিকার করিয়া লইতে পারেন। সম্রাট অনাস্তিকে ঔরঙ্গজেবকে বলিলেন যে, যদি তিনি ইন্দামোরার প্রণয়কে উপেক্ষা করেন তাহা হইলে মোরাদের পরিবর্ত্তে তাঁহাকেই তিনি রাজসিংহাসনে বসাইবেন। ঔরঙ্গজেব সম্রাটের এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ইন্দামোরা ব্যতীত অপর সকলে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে মোরাদ বলিলেন যে, ঔরঙ্গজেবকে হত্যা করিতে-ই হইবে। এই কথা শুনিয়া ইন্দামোরা মোরাদকে ঔরঙ্গজেবের জীবনের জন্য কাতর কণ্ঠে অনেক অনুরোধ করিলেন। শেষে মোরাদের দৃঢ়তা দেখিয়া ঔরঙ্গজেবকে বাঁচাইবার নিমিত্ত ইন্দামোরা মোরাদকে তাঁহার হৃদয়ের গুপ্ত-প্রেমের কথা ইঙ্গিতে জানাইলেন। মোরাদের পাষাণ হৃদয় প্রেমের ফাঁদে পড়িয়া গলিয়া গেল। ঔরঙ্গজেব তখনকার মত রক্ষা পাইলেন। চতুর্থাঙ্কে এই ঐতিহাসিক নাটকের রক্তাক্ত ট্রেজিক ঘটনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ঔরঙ্গজেব সন্দেহ করিয়াছেন, যে, ইন্দামোরা মনে মনে মোরাদকে ভালবাসেন। অরিমন্ত আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, মোরাদ সৈন্যগণ লইয়া রাজধানী বলপূর্ব্বক দখল করিতে আসিতেছেন। সাজাহান ও ঔরঙ্গজেবের মধ্যে এইবার বুঝি প্রীতির আশা হইল। পঞ্চমাঙ্কে আমরা দেখিতে পাই যে, মোরাদ ও ঔরঙ্গজেবের সৈন্যগণের মধ্যে যে যুদ্ধাগ্নি জ্বলিয়াছিল ক্রমে তাহা দুর্গ হইতে রাজপ্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিল। মোরাদ আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, তাঁহার সৈন্যগণ দুর্গ জয় করিয়াছে। প্রাসাদের অভ্যন্তরে যখন সৈন্যগণের কোলাহল পৌছিল ও তৎসঙ্গে নুরমহাল দেখা দিলেন তখন ইন্দামোরা রঙ্গমঞ্চ হইতে প্রস্থান করিলেন। নুরমহাল ঔরঙ্গজেবের শত্রু ও মোরাদের পক্ষপাতী ছিলেন। ঔরঙ্গজেব পলাইয়াছেন শুনিয়া নুরমহাল উদ্বিগ্ন হইলেন। সাজাহান বিদ্রোহী মোরাদের আচরণে ব্যথিত হইয়াছিলেন। সম্রাট সেই কারণে নুরমহালের উপর বিরক্ত হইলেন। নুরমহাল বারংবার বলিতেছেন যে, ঔরঙ্গজেবকে ধৃত করা চাই, নহিলে কখন সে অকস্মাৎ আক্রমণ করিবে। নাটকে বর্ণিত দৃশ্যগুলির দ্রুত পরিবর্ত্তনের সহিত ঘটনাচক্রেরও বুঝি একটা সম্বন্ধ আছে! মোরাদ আহত হইয়া অন্তঃপুরে আনীত হইলে ইন্দামোরা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মুমূর্ষু মোরাদকে কক্ষান্তরে লইয়া যাওয়া হইলে ইন্দামোরা তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন। পরক্ষণেই বিজয়ী ঔরঙ্গজেব অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি ইন্দামোরাকে মোরাদের প্রতি আসক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করাতে ইন্দামোরা মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইতে লাগিলেন। নুরমহাল বোধ হয় বিষপান করিয়াছেন। তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় সেথায় আসিয়া অসংলগ্ন কথা কহিতে লাগিলেন। ইহার পর মোরাদের মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার জন্য লইয়া যাওয়া

হইতেছে। মেলিসেন্দা মৃত পতির অনুগমন করিতেছেন। সাজাহান ঔরঙ্গজেবকে রাজ্যভার ও তৎসঙ্গে ইন্দামোরার পাণি-অর্পণ করিয়া রাজনৈতিক জগত হইতে সরিয়া পড়িলেন। পটক্ষেপণ।

ড্রাইডেন মোরাদের পত্নী মেলিসেন্দাকে হিন্দু স্ত্রীর ন্যায় মৃতপতির সহগমন করিতে দেখিয়াছেন। এই ব্যাপারটি হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ইংরাজ কবি তখনও হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত বিশেষ বিশেষ সামাজিক পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। বার্ণিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে ড্রাইডেন যে নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে চরিত্র-চিত্রণ শিল্প কিন্তু কবির তুলিকার সাহায্যে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই। মেলিসেন্দার চরিত্র সম্বন্ধে ড্রাইডেন নিজে লিখিয়াছেন,—"I have made my Melisenda, in opposition to Nur Mahal, a woman passionately loving of her husband, patient of injuries and contempt and constant in her kindness to the last and in that perhaps, I may have erred, because it is not a virtue much in use. Those Indian wives are loving fools and may do well to keep themselves in their own country, or at least, to keep company with the Arria's and Portia's of old Rome." ইংরাজ কবির মুখে ভারত-ললনার পাতিব্রত্যের সুখ্যাতি শুনিয়া বাঙ্গালী নভেল লেখকদিগের নারীচরিত্র-চিত্রণ শিল্পের উপর ঘৃণা জন্মে। সেক্ষপীয়রের যে সকল নাটকে ভারতবর্ষের উল্লেখ আছে, সেই নাটকগুলি যখন লণ্ডনের গ্লোব রঙ্গালয়ে অভিনীত হইত, "খতিয়ান বহি ও তরবারি" (Ledger and Sword) নামক গ্রন্থের রচয়িতা মিঃ বেকলস উইলসনের (Beckles Wilson) মতে তখন দর্শকদিগের মধ্যে অনেকেই অভিনেতৃদের মুখে ভারতের কথা শুনিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হেতু বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতেন। "ঔরঙ্গজেব" নাটকও যখন উক্ত গ্লোব রঙ্গালয়ে অভিনীত হইত, তখন ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত ইংরাজগণ উক্ত নাটকে বর্ণিত ঘটনাবলীর অভিনয় দেখিয়া যে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। 'ঔরঙ্গজেব" নাটকের শেষ দৃশ্যটির সহিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "নুরজাহান" নাটকের শেষ দৃশ্যের কতকটা মিল আছে বলিয়া মনে হয়।

বসন্তে।

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্]

আজিকার এই দখিন হাওয়া
বাজায় বীণা হিয়ার বনে,
সরস্ সবুজ তরুটি ঐ
কি কথা কয় গুঞ্জরণে।
আজিকার এই কোকিল কুহু
সুর-সুতান মুহু মুহু
কি যে গভীর মদির মোহ্
আনছে মনে সঙ্গোপনে।

আজিকার এই রবির কিরণ
দিকে দিকে গলায় হিরণ
শ্যামল পাতার অমল শোভায়
কি রূপ ধরে তৃণে তৃণে।
আজ বাঁশী বাজে স্থলে জলে
ধূলিকণায় ফুলে ফলে—
আমার গভীর মরমতলে,
এ কি উছাস ক্ষণে ক্ষণে॥

দেশীয় ভৈষজ্য তত্ত্ব।

["বঙ্গরত্ন" সহঃ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত, এচ্, এম্, বি,]

"ত্রিফলা"

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

২। আমলকী।

আমলকী প্রায় সকলের নিকটই সুপরিচিত। যখন আমলকী বৃক্ষ আমাদের নিত্য আহার ও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হওয়ার নিমিত্ত যত্নে ভারতবাসীর উদ্যানে রক্ষিত হইত,—একদিন যে আমলকীর প্রভাবে সমগ্র বিশ্ববাসী চমৎকৃত হইয়াছিল,—যে আমলকীর ব্যবহারে অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিরাও যুবা হইতে সমর্থ হইত, আজ আমি এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যযুগে সেই আমলকীর পরিচয় দিতে বসিয়াছি।

আমলকীর কথা বলিতে গেলে সেই সে কালের কথা মনে পড়ে—মনে পড়ে চ্যবন ঋষির কথা—আর মনে পড়ে 'চ্যবনপ্রাশের' কথা।

সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন শর্য্যাতি নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার এক সুকন্যা নাম্নী সুন্দরী কন্যা ছিল।

একদিন রাজা শর্য্যাতি তাঁহার পরমা সুন্দরী কন্যা সুকন্যাকে লইয়া মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। রাজা যখন মৃগয়ায় ব্যস্ত, সেই সময় তাঁহার কন্যা সুকন্যা বনবিটপির একতম দেশে একটী বল্মীকাচ্ছাদিত স্থানের মধ্যে দুইটী তিমির পটলাবৃত নেত্রতারা শোভা পাইতেছে দেখিতে পাইয়া কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার মস্তকোপরিস্থিত স্বর্ণ কাঁটা হইতে দুইটী কাঁটা বাহির করিয়া ঐ নেত্রতারার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিলেন।

মহামুনি 'চ্যবন' যোগ সমাহিত হইয়া বহুকাল সাধনা করায় এইরূপ মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বল্মীক কর্ত্তৃক তাঁহার সর্ব্বশরীর আচ্ছাদিত হইয়াছিল ও কেবল নেত্রতারা দুইটী প্রকাশমান হইতেছিল। রাজকুমারী সুকন্যা তাঁহার নেত্রতারা দুইটীতে কাঁটা বিদ্ধ করিয়া তাঁহার যোগভঙ্গ করিলে পর চ্যবনমুনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাতে ভস্মীভূত করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় রাজা এই ঘটনা অবগত হইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া মুনিবর চ্যবনের অভিসম্পাত হইতে নিবৃত্তি করিতে না পারিলে পর তাঁহার অনূঢ়া ষোড়শী কন্যাকে চ্যবনের হস্তে দান করিয়া চ্যবনের ক্রোধ প্রশমিত করিলেন।

রাজকন্যা হইয়াও সুকন্যা তাঁহার অতি বৃদ্ধ স্বামী চ্যবনের মনোরঞ্জনের জন্য স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালনের প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চ্যবন ঋষিও তখন গার্হস্থ্য ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এমন সময় স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যার রূপরাশি সন্দর্শনে সুকন্যার সৌন্দর্য্য সুধা পানের নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়া সুকন্যাকে একাকী একাকী অবস্থায় পাইয়া তাঁহাদের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। সুকন্যা অসহায়া অবস্থায় এই কুপ্রস্তাব শ্রবণে শিহরিয়া উঠিয়া পিতৃ সম্বোধনে তাঁহাদের চরণে শরণ গ্রহণপূর্ব্বক অনেক স্তব স্তুতিতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চারে সমর্থা হইলেন।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যার এইরূপ স্বামী ভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধনপূর্ব্বক তাঁহার অভিলষিত 'বর' গ্রহণে আদেশ করিলেন।

সুকন্যা জানিতেন,—

> "পতি-সেবা পরং সত্যাং দানং তীর্থাভিষেচনং
> সর্ব্ব দেবময় স্বামী সর্ব্বস্মাচ্চ পরঃশুচিঃ।
> সর্ব্ব পুণ্যস্বরূপশ্চ পতি-রূপী জনার্দ্দনঃ॥"

সুতরাং তিনি স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে জানাইলেন যে, যদি তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া 'বর' দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার অশীতিবর্ষ বয়স্ক স্বামী ঋষি চ্যবনকে নবযৌবন প্রদানের ব্যবস্থা করুন

অশ্বিনীকুমারদ্বয় 'তাহাই হইবে' বলিয়া 'আমলকী রসায়ন' নামে এক প্রকার রসায়ন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। নিকটস্থ একটী পুষ্করিণীতে স্নাত হইয়া শুদ্ধিভাবে সেই 'আমলকী রসায়ন' সেবন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। সেই ঔষধ সেবন করিয়া অশীতিবর্ষ বয়স্ক চ্যবন নবযৌবনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময় হইতে এই ঔষধের নামকরণ হইল "চ্যবনপ্রাশ।"

শাস্ত্রকার এই ঔষধের ফলশ্রুতি উপলক্ষে ইহাকে 'রসায়ন' আখ্যা দিয়াছেন। 'রসায়ন' ঔষধ সেবনে—

"দীর্ঘমায়ুঃ স্মৃতিং মেধামারোগ্য তরুণং বয়।
দেহেন্দ্রিয় বলং কান্তি নব বিন্দেদ্রসায়নাৎ॥"

অর্থাৎ রসায়ন ঔষধ সেবন করিলে পর দীর্ঘ আয়ু লাভ হইয়া থাকে, স্মৃতি ও মেধাশক্তি বৃদ্ধি হয়, আরোগ্য তাহার নিত্য সহচর হয়—তাহাকে তরুণ বয়স্ক পুরুষ বলিয়া অনুমিত হয় এবং কান্তি যথেষ্টরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

চ্যবনপ্রাশও দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সবল করিতে, নিস্তেজ ইন্দ্রিয় কার্য্যক্ষম করিতে, শরীরের সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নষ্ট করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন মহৌষধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।

সে যাহা হউক, খাদ্যরূপেও আমলকী যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আজকাল অনেকেই আমলকীর মোরব্বা, আমলকীর চাটনী ও আচার প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন।

"ত্রিষামলকমাখ্যাতং ধাত্রী তিষ্যফলামৃতা।
হরীতকী সমন্ধাত্রী ফলং কিন্তু বিশেষতঃ॥
রক্তপিত্ত প্রমেহঘ্নং পরং বৃষ্যং রসায়নম্।"

অর্থাৎ—আমলকী শব্দ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত, ধাত্রী, তিষ্যফলা ও অমৃতা, এই কয়েকটী উহার পর্য্যায়ক শব্দ। আমলকী ও হরীতকী এই উভয়ই তুল্য গুণকারক, বিশেষ এই যে—আমলকী রক্তপিত্ত ও প্রমেহনাশক এবং অতিশয় পুষ্টিকারক ও রসায়ন।

'হন্তিবাতং তদম্লত্বাৎ পিত্তং মাধুর্য্যশৈত্যতঃ।
কফং রূক্ষকষায়ত্বাৎ ফলং ধাত্র্যাস্ত্রিদোষজিৎ॥
যস্য যস্য ফলস্যেহ বীর্য্যং ভবতি যাদৃশং।
তস্য তস্যৈব বীর্য্যেন মজ্জানমপি নির্দ্দিশেৎ॥"

অর্থাৎ আমলকী অম্ল রসদ্বারা বায়ু, মধুর রস ও শীতল রসদ্বারা পিত্ত ও কষায় রসদ্বারা ও রুক্ষ গুণদ্বারা কফ নষ্ট করে। সুতরাং আমলকী ত্রিদোষ নাশক। যে ফলের গুণ যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেই ফলের মজ্জার গুণও তদ্রূপ জানিবে।

ঔষধার্থ ইহার ফল ও বীজ এবং পত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঔষধ প্রয়োগের মাত্রা স্বরস (জল ভিন্ন রস) দুই তোলা, চূর্ণের পরিমাণ পূর্ণবয়স্কের পক্ষে চারি আনা হইতে অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত।

আমরা এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন রোগে আমলকীর ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিতেছি।

(১) বাতিক জ্বরে আমলকী—আমলকী, গুলঞ্চ ও ধনের সহিত সমভাগে সিদ্ধ করিয়া সেবনে বাতিক জ্বর ভাল হয়।

(২) পিপাসা যুক্ত পিত্তজ্বরে উক্ত দ্রব্য তিনটী মিলিত দুই তোলা—অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবনে পিপাসাযুক্ত পিত্ত জ্বরে সত্বর উপকার হয়।

(৩) আমলকী, গুলঞ্চ ও ক্ষেতপাপড়া ইহাদের কাথ সেবনে পিত্তজ্বর দূরীভূত হয়।

(৪) আমলকী, গুলঞ্চ, চিরতা, বালা, বেনার মূল, অগুরু, মুতা, দ্রাক্ষা, বেড়েলা ও ক্ষেতপাপড়া ইহাদের কাথ প্রাতঃকালে মধু সহ পান করিলে উপদ্রবযুক্ত পিত্তজ্বর নিবারিত হয়।

(৫) কফজ্বরে আমলকী—আমলকী, মুতা, বেড়েলা, ইন্দ্রযব, হরীতকী, কটুকী ও ফলসা ইহাদের কাথ পানে কফজ্বর বিনষ্ট হয়।

(৬) বাতপিত্ত জ্বরে আমলকী—আমলকী, চিরতা, শঠী, দ্রাক্ষা, পিপুল, শুঁঠ ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ শীতল করিয়া।০ আনা গুড় সহ পান করিলে বাতপিত্ত জ্বর ভাল হয়।

(৭) পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে আমলকী—আমলকী, হরীতকী,

বহেড়া, পটোলপত্র, নিমছাল, যষ্টিমধু ইহাদের কাথ পিত্ত-শ্লেষ্ম জ্বরনাশক।

(৮) আমলকী, পটোলপত্র, যব, ধান, মুগ ও রক্ত-চন্দন ইহাদের কাথ পানে পিত্তজ্বর, পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর, পিপাসা, দাহ ও বমি দূরীভূত হয়।

(৯) আমলকী, নাগর মুথা, শুঁঠ, গুলঞ্চ, আকনাদি, বেনার মূল ও বালা ইহাদের কাথ পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরনাশক।

(১০) অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরে * আমলকী—আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল, পলতা, দ্রাক্ষা, মুর্তা ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরনাশক।

(১১) চতুর্থক জ্বরে + আমলকী—আমলকী, বাসক ছাল, শালপানি, দেবদারু, হরীতকী ও শুঁঠ ইহাদের কাথে চিনি ও মধু সহ পানে চতুর্থক জ্বর ভাল হয়।

(১২) আমলকী, হরীতকী, শালপাণি, শুঁঠ, দেবদারু ও বাসকছাল ইহাদের কাথে চিনি বা মিছরী চূর্ণ ও মধু সহ পানে চতুর্থকজ্বর ভাল হয়।

(১৩) আমলকী, চিতা, হরীতকী, পিঁপুল ও সৈন্ধব ইহাদের সমভাগ চূর্ণ জ্বরনাশক; ইহা ভেদী, রুচিকর, শ্লেষ্মঘ্ন; অগ্নিকর ও পাচক।

(১৪) কাসে আমলকী—আমলকী চূর্ণ দুগ্ধ সহ পাক করিয়া ঘৃতের সহিত সেবনে কাসে উপকার হয়।

(১৫) দুই তোলা আমলকী চূর্ণ, দেড় পোয়া জল ও অর্দ্ধ পোয়া দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহাতে সম্ভবমত অর্দ্ধ তোলা অথবা সিকি তোলা গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবনে কাসে বিশেষ উপকার হয়।

(১৬) হিক্কায় আমলকী—আমলকী ও কয়েদবেলের রস পিঁপুল চূর্ণ ও মধু সহ সেবনে উপকার দর্শে।

(১৭) শ্বাসে আমলকী—আমলকী, পিঁপুল ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ সমভাগ মধু ও চিনি সহিত বারংবার সেবন করিলে শ্বাস ও হিক্কা নিবৃত্ত হয়।

(১৮) স্বরভেদে আমলকী—আমলকী, যমানী, হরিদ্রা, যবক্ষার ও চিতা ইহাদের চূর্ণ সমভাগে এর উপযুক্ত পরিমাণ মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে স্বরভঙ্গ রোগ বিনষ্ট হয়।

(১৯) ছর্দ্দিতে (বমিতে) আমলকী—আমলকীর রস ১ তোলা ও কয়েদবেলের রস ১ তোলা কিঞ্চিৎ পিঁপুল চূর্ণ, মরিচ চূর্ণ ও মধু সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে প্রবল বমি নিবারিত হয়।

(২০) বাতিক বমনে আমলকী—আমলকীর রসে শ্বেতচন্দন ঘসিয়া গাঢ় হইলে কুল প্রমাণ তাহার বটী প্রস্তুত করিয়া মধুর সহিত সেবনে বাতিক বমি নিবারিত হয়।

(২১) রক্তপিত্তে আমলকী—নাসিকা হইতে রক্ত পতন নিবারণের জন্য শুষ্ক আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিবে।

(২২) পিত্ত শূলে আমলকী—আমলকীর রস চিনির সহিত পানে পিত্তশূল নিবারিত হয়।

(২৩) শ্বেতপ্রদরে আমলকী—আমলকী বীজ উত্তম রূপে পেষণ করিয়া চিনি ও মধুর সহিত সেবনে শ্বেতপ্রদর ভাল হয়।

(২৪) বাতরক্তে আমলকী—আমলকী রসে পুরাতন ঘৃত পাক করিয়া বাতরক্তে পানার্থ ব্যবহার করিলে বাত রক্ত সত্বর ভাল হয়।

(২৫) প্রমেহে আমলকী—প্রস্রাবের যন্ত্রণা অধিক থাকিলে আমলকী অধিক মাত্রায় সেবনে উপকার দর্শে।

(২৬) প্রমেহ রোগী ইক্ষুরসের সহিত আমলকী রস সমভাগে সেবন করিবে।

(২৭) প্রস্রাব অল্প অল্প হইলে বা বন্ধ হইয়া যাইলে তলপেটে আমলকী বাটা প্রলেপ দিলে প্রস্রাব হয়।

(২৮) মধুর সহিত আমলকী রস সেবনে প্রমেহে উপকার হয়।

(২৯) বহুমূত্রে আমলকী—আমলকীর রস ১ তোলা, পক্ক কদলী ফল ১ তোলা, মধু ৪ মাষা, চিনি ৪ মাষা ও দুগ্ধ এক পোয়া, এই সমুদয় একত্র ভক্ষণ করিলে বহুমূত্রের উপশম হয়।

(৩০) আমলকী, বাঁশপাতা, মুতা ও আকনাদি

---

* যে জ্বর দিবা রাত্রের মধ্যে একবার মাত্র হইয়া থাকে—তাহার নাম অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর।

\+ যে জ্বর প্রতি চতুর্থ দিনে অর্থাৎ দুই দিন অন্তর, হইয়া থাকে তাহার নাম চতুর্থজ্বর।—লেখক।

ইঁহাদের কাথে মধু ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া পান করিলে বহুমূত্র নিবারিত হয়।

(৩১) প্রত্যহ মধুর সহিত আমলকী রস পান করিলে বহুমূত্র নিবারিত হয়।

(৩২) শোথে আমলকী—আমলকীর রস তেউড়ী চূর্ণ সহ পান করিলে শোথ ভাল হয়।

(৩৩) বাতরক্তে আমলকী—আমলকীর রসের সহিত পুরাতন ঘৃত পান করিবে।

(৩৪) আমলকী ১ তোলা ও খদির কাষ্ঠ ১ তোলা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবনে বাতরক্ত ভাল হয়।

(৩৫) যোনিদাহে আমলকী—আমলকীর রস চিনিসহ পানে যোনিদাহ ভাল হয়।

(৩৬) শিরঃক্ষতে আমলকী—আমলকী চিনি ও ঘৃতের সহিত পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিবে।

(৩৭) আমলকী, কুঙ্কুম ও নীলোৎপল উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক শিরঃপীড়ায় প্রলেপ দিবে।

(৩৮) চোখউঠায়—সুপক্ক আমলকীর রস বিন্দু বিন্দু চক্ষুতে দিলে যন্ত্রণা ও লৌহিত্য নিবারিত হয়।

(৩৯) চুল উঠায় আমলকী—আমলকীর রসের সহিত তিল তৈল পাক করিয়া শীতল হইলে কেশে মাখিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও কৃষ্ণ হয়।

(৪০) শিশুর চর্ম্মরোগে আমলকী—শিশুর "বিখাজ" "কাউর" প্রভৃতি চর্ম্মরোগে শুষ্ক আমলকীর গুঁড়া ৭ বার গোমূত্রে ভাবনা দিয়া বিচ্ছিযুক্ত স্থানে প্রলেপ দিবে।

কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ও কলেজ হাঁসপাতালের চিকিৎসক কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন মহাশয় বলেন—"দাহযুক্ত প্রবল জ্বরে মস্তকে রক্ত সঞ্চরণ (congestion) হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ ও মস্তকে দাহ উপস্থিত হইলে আজকাল বরফ জল কিম্বা ঠাণ্ডা জলের অবাধ পটী ও 'আইস-ব্যাগই' তাহার একমাত্র শান্তিকারক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু ঐরূপ স্থলে নিউমোনিয়া প্রভৃতি উৎকট শ্লেষ্মজ ব্যাধির কারণ হইয়া থাকে, ঐরূপ ক্ষেত্রে আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঁজি কিম্বা তদভাবে আমলকীর রস দিয়া পেষণ করিয়া তালুতে, রগে ও কপালে প্রলেপ দিয়া বরফের ন্যায় শীত ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে, অথচ অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না।"

এইবার আমি আমলকী সম্বন্ধে "বনৌষধিদর্পণ" হইতে পাশ্চাত্য মত প্রদান করিলাম।

"The fresh fruit is refrigerant, diuretic and laxative and is used in chronic constipation. The dried fruit is cooling stomachic and astingent, a powder of the fruit, Nilotpala, Kesara and rose water is used as a paste to the forehead in cephalagia. It is also applied to the pubes in irritiability of the bladder and in retention of urine. With grapes and honey it is a favourite cooling drink for fever and diarrhœa. An extract, prepared from the wood is astringent like Ka'tho. Its branches put into muddy water render the latter clear. It is one of the ingredients in the preparation known as Triphala." (*Materia Medica of India—R. N. Khory, Part II, P. 550-51*)

অর্থাৎ—নবীন আমলকী, স্নিগ্ধ ও মূত্রকারক এবং মৃদুরেচক হেতু পুরাণ কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক আমলকী শীতল, পাচক ও কষায়। শিরঃপীড়ায়—কুঙ্কুম, নীলোৎপল এবং গোলাপ জলের সহিত আমলকী উত্তমরূপে পেষণপূর্ব্বক কপালে প্রলেপ দিবে। মূত্রকৃচ্ছ্র কিম্বা মূত্ররোধের প্রতীকারার্থ বস্তিদেশে আমলকীর প্রলেপ হিতকর। আঙ্গুর এবং মধুর সহিত আমলকী উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক সরবৎ প্রস্তুত করিবে, এই সরবৎ জ্বরবিশেষে এবং অতিসারে পানীয় রূপে ব্যবহার করা যায়। খদিরসারের এক্সট্রাক্টের মত আমলকী কাষ্ঠের এক্সট্রাক্ট ও স্তম্ভক ও কষায়। আমলকীর শাখা আবিল জলে স্থাপন করিলে আবিল জল নির্ম্মল হয়। আমলকী ত্রিফলার অন্যতম

উপাদান। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, চোরি, ২য় খণ্ড ; ৫৫০—৫১ পৃঃ)

উপরিলিখিত ঔষধগুলির মধ্যে যেগুলির পরিমাণ দেওয়া হয় নাই, তাহাদের প্রস্তুতবিধি—সমুদয় দ্রব্য মিলিত দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের শেষ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছেঁকিয়া সেব্য। *

কালচক্র।

[শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম্‌-এ, বি-এল]

সেদিন বসন্তের হাওয়া হেলিয়া দুলিয়া এ-ঘর সে-ঘর করিয়া প্রীতি সিঞ্চন করিয়া বেড়াইতেছিল। সবুজ স্নিগ্ধ পাতার অন্তরাল হইতে কালোমুখ কোকিল পঞ্চম স্বরে মধু বর্ষণ করিয়া যাইতেছিল। এমন সময় সারদা একখানি চিঠি হাতে করিয়া ইজিচেয়ারটার হাতলে মাথা রাখিয়া ভাবিতেছিল, এই নিরাশ্রয় বন্ধুটীকে লইয়া এখন কি করা যায়?

কেমন একটী অচ্ছেদ্য বন্ধন সকলের অলক্ষ্যে সারদা ও নরেশের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল। নানা রকম অসুবিধায় নরেশচন্দ্র পড়া চালাইতেছিল। সেই কথাটা কানে পৌঁছিতেই সারদা নরেশকে চিঠি লিখিয়া তাহাদের সেই তেমহলা বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছিল। এত বড় বাড়ীটা যদি ঠিক সারদারই হইত, তবে কোনও ঝঞ্ঝাট বাধিয়া উঠিত না। বাড়ীটা ছিল সারদার খুড়ামহাশয়—নিতাইবাবুর। তিনি বিদেশে আসিয়া মুন্সেফী করিতেন, আর সারদা তাহার বাড়ী পাহারা দিত, আর সেখানকার হাঁসপাতালে কম্পাউণ্ডারী করিয়া দিন গুজরাণ করিত। নিতাইবাবু অবশ্য সারদাদের সহিত একান্নভুক্ত ছিলেন না। আর তাহাদের সংস্রব পরিত্যাগ করিবার জন্যই একেবারে কটকে আসিয়া এই তেমহলা বাড়ীটা করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

সারদা ভাবে নাই এত বড় শূন্য বাড়ীটায় তাহার বন্ধুটি আসিয়া থাকিলে নিতাইবাবুর কোনও ক্ষতি বা বাড়ীটার কোনও অপচয় হইবে। তাই সে বন্ধুকে প্রাণ খুলিয়াই আসিতে বলিয়াছিল। নরেশও বন্ধুর কথায় সেখানে আসিয়া কটক কলেজে নাম লিখাইয়া মনের আনন্দে পড়াশুনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। কি মনে করিয়া সারদা নরেশের কথাটা নিতাইবাবুকে লিখিয়াছিল। তাহারই উত্তরে নিতাইবাবু লিখিয়াছিলেন—"আমার বাড়ীতে নরেশের জায়গা হবে না, তাকে পথ দেখতে বলো। আমি ছুটি নিয়ে এক মাস বাড়ী গিয়ে থাকব।"—তাই সারদা ভাবিতেছিল, এই নিরাশ্রয় বন্ধুটীকে লইয়া এখন কি করা যায়।

কলেজ হইতে ফিরিয়া ঘরে ঢুকিয়াই সারদাকে ঐ ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নরেশ কহিল, কি হে, আজও আবার সাহেবটা বকুনী দিয়েছে না কি?

সারদা মাথা উঠাইয়া চাহিতেই তাহার হাতের চিঠিখানি পড়িয়া গেল। মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

নরেশ চিঠিখানি তাড়াতাড়ি উঠাইতেই কেমন এক অস্বাভাবিক আওয়াজ করিয়া সারদা চেঁচাইয়া কহিল, পড়িস্ না বলচি।

বন্ধুর নিষেধ অমান্য করিয়া নরেশ নির্ব্বিকল্পচিত্তে হন্ হন্ করিয়া উপরে চলিয়া গেল। সারদা চেয়ারে বসিয়াই শুনিল, নরেশ সিঁড়ির উপর হইতে বলিতেছে—"আ-হা-হা! বাদশাজাদার চিঠিখানি দেখচি পথেই মারা পড়্‌লো"

কথা শুনিয়া সারদার অন্তরাত্মা যেন শুকাইয়া গেল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে নরেশ আসিয়া দেখিল, সারদা ঠিক পূর্ব্বের মতই বসিয়া আছে। যেন সে কত অপরাধী

---

* এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকাদের কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে "আরোগ্য নিকেতন" ১১।১ নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা, এই ঠিকানায় লেখকের সহিত পত্র ব্যবহার করিবেন।

—'অর্চ্চনা' সম্পাদক

করিয়াছে, যেন সে কত লজ্জিত হইয়াছে। নরেশ কহিল —তা বেশ! বসেই থাক্। আজ ত আর বেতি পরতে হবে না। রাধার মানের দিন যে অনেক কাল চলে গেছে। এখন একবার উঠে চারটি ভাতের বন্দোবস্ত করি চল। তার পর যা' করতে হয় তা ভাববো এখন।

সারদা আর কথা না বলিয়া নরেশের সহিত রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া ভাত চড়াইয়া দিল। ঠাকুর, চাকর তাহাদের একেবারেই ছিল না।

পরের দিন কলেজ হইতে ফিরিবার সময় নরেশ ভাবিল, নিতাইবাবু যদি আজই আসিয়া থাকেন, তবে কেমন হইবে? হাতে ত মাত্র দুইটী টাকা আছে। বাড়ীর কাছে আসিয়া চতুর্দ্দিকে ভাল করিয়া দেখিয়া নরেশ তালা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। পরদিন সকাল সাতটায় নরেশ শুনিল, কে যেন কড়া ঠক্ ঠক্ করিল। নরেশের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাবিল, আর কেউ নয়, নিশ্চয়ই নিতাই বাবু। এইবার বুঝি কুকুর বিড়ালের মত বিতাড়িত হইতে হয়।

নরেশ দরজা খুলিয়া দেখিল, লোকটী তাহার সতীর্থ চণ্ডী। তর্কশাস্ত্রের সমস্যা সমাধান করিতে সে তাহার কাছে আসিয়াছে। নরেশের মন হইতে আতঙ্ক দূর হইল। দুইজনে তখন নিশ্চিন্ত মনে তর্কশাস্ত্রের কেতাব খুলিয়া বোঝাপড়া করিতে লাগিল।

সেদিন কলেজে গিয়া নরেশচন্দ্র কিছুতেই বক্তৃতায় মন দিতে পারিল না। সে কলেজে আসিবার সময় একটী গাড়ীতে দেখিয়াছিল, একটী ভদ্রলোক সপরিবারে তাহাদের বাসার ঐ দিকটা দিয়াই যাইতেছে। তাই নরেশের কেবল মনে হইতেছিল যে, কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখিবে সে বাড়ীটায় তাহার স্থান নাই। কোথায় সে রাত্রি কাটাইবে, কোথায় সে দু'মুটো অন্ন সংগ্রহ করিবে এই চিন্তায় সে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল।

কলেজ ছুটি হইলেই নরেশের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। কেমন একটা লজ্জা, কেমন একটা অবমাননা তাহার শরীর ও মন নিষ্পেষিত করিতে লাগিল। সেদিন পোনর মিনিটের পথ আসিতে তাহার প্রায় এক ঘণ্টা লাগিল। পা আর উঠিতেছিল না। নানা ইতস্ততঃ করিয়া বাড়ীর দরজায় আসিয়া নরেশ দেখিল, তালাটা বন্ধই আছে। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে তালা খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

সারদা আসিলে দুইজনে মিলিয়া আবার রন্ধনকার্য্যে লাগিয়া গেল। নরেশ সেইখানেই ইতিহাসের পাতাটা কোনও মতে উল্টাইয়া যাইত। কিন্তু সেদিন কিছুতেই সে এক লাইনের উপরেও মন বসাইতে পারিল না।

নরেশের চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে দেখিয়া সারদা বলিল, "বা! কাঁদচিস যে! কি হয়েচে?"

নরেশের খেয়ালই ছিল না যে তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইতেছে। তাই সে চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া কহিল —না—কিছু না।

এই কিছু না সত্ত্বেও নরেশের মনের ভাব যে কি তাহা সারদা বুঝিয়া ফেলিল। কিন্তু যে আলোচনা করিয়া প্রতিকারের কোনও উপায় নাই, সে আলোচনা না করাই ভাল। তাই সারদা কোনও কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

খাইয়া আসিয়া নরেশ কহিল আর সহ্য হয় না। যা' হয় একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। নইলে এই অবমাননা আর লজ্জা লইয়া বাঁচিয়া থাকা অসহ্য হয়ে উঠচে। নিতাই বাবুর বাড়ীতে চুরি করে থাকার চেয়ে আমার পক্ষে বিষ খেয়ে মরাও ভাল মনে হচ্ছে। লাঠি কিম্বা বকুনী খেয়ে চলে যাওয়ার চাইতে নিজ থেকেই মানে মানে বিদায় হওয়া ভাল। যেমন তেমন ঘর যদি পাস, টাকা দু'য়ের মধ্যে, তবে তুই আমার জন্য ঠিক করিস্।

সারদা অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল—তা আর তোকে বলতে হবে না। আমি এ কয়দিন ঐ চেষ্টাতেই ঘুরেচি ফিরেচি। একটা প্রায় ঠিকই করেছি। কিন্তু ঢের অসুবিধা আছে।

নরেশ বলিল—তা অসুবিধা হয় হউক। আমরা ত আর রাজপুত্তুর নই যে অসুবিধা দেখে হটে যাব?

সারদা বলিল—রাজপুত্তুরের অসুবিধার কথা আমি বলচি না। আমাদেরও সুবিধা অসুবিধা যে নেহাৎ কম তা মনে করিস না।

নরেশ কহিল—ছেড়ে দে, সুবিধা অসুবিধা। অপমান আর লজ্জার হাত হ'তে ত রক্ষা পাব। শারীরিক কষ্ট নয় খানিকটা ভোগ করা যাবে।

সারদা কহিল—পাইখানা নাই, কুয়ো নাই। সহরের মধ্যে ময়দানও পাওয়ার আশা নাই। সরকারী পায়খানাটাও নেহাৎ কাছে নয়।

নরেশের মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে আর কোনও কথা না বলিয়া ইংরাজী কাব্য লইয়া বসিয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়া নরেশ কহিল—হোক্ গিয়ে অসুবিধে। ঐটেই ঠিক করে ফেল। যেমন করেই হউক, এ বাড়ীটা ছাড়তে হবে।

রবিবার দিন নরেশ তাহার ভাঙ্গা টিনের বাক্সটা মুটের মাথায় চাপাইয়া সেই অসুবিধা পূর্ণ খড়ো ঘরটায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সারদাও সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

খুব উৎসাহের সহিতই নরেশ মাটির উপর কম্বল বিছাইয়া তাহার খাতাপত্র বিছানার দুই পার্শ্বে রাখিয়া দিল। তাহার মাথার উপর হইতে যেন একটা প্রকাণ্ড বোঝা নামিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় সারদা আসিয়া কহিল, সেও ঐখানেই থাকিবে। নরেশ কহিল—এত self sacrifice ভাল নয়। আমি দিব্যি একা থাকতে পারবো। যদি সে বাড়ীটায় এরি মধ্যে চুরি হয়ে যায়, তবে বদনামের ভাগী আমাদেরই দু'জনকে হ'তে হবে।

সারদা আর নরেশ সেদিন রাত্রিতে হোটেলে খাইল। আহারান্তে বিষণ্ণ মুখে সারদা চলিয়া গেল।

তিন দিন কোনও মতে কাটাইয়া নরেশচন্দ্র নিকটবর্ত্তী মেসের অধিবাসীগণের সহিত ভাব করিয়া তাহার অসুবিধা অনেকটা লাঘব করিয়া ফেলিল। কিন্তু এদিকে হাতের পয়সা ফুরাইয়া যাইতেছে দেখিয়া মনে একটা আতঙ্কও উপস্থিত হইল।

নরেশের কাকা জমীদারী সেরেস্তায় কলম পিশিয়া যে ত্রিশটী টাকা উপায় করিতেন তাহা হইতে নরেশকে মাস মাস এগার টাকা করিয়া দিতেন। চার টাকা কলেজের মাহিনা দিয়া অবশিষ্ট টাকায় নরেশ যে কি করিয়া তাহার সকল খরচ কুলাইত তাহা অতি বড় হিসাবীর পক্ষেও বুঝিয়া উঠা মুস্কিলের। সারদার সঙ্গে এক সঙ্গে থাকিয়া নিজ হাতে আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া খাইতে তাহার ভাগে প্রায় ৪৲ পড়িত। কিন্তু বাসা বদলাইয়া হোটেলে খাওয়া সুরু করার জন্য নরেশের স্কন্ধে ছয় টাকা করিয়া মাসিক খরচ চাপিয়া বসিল। অবশিষ্ট একটী মাত্র টাকায় নরেশ যে কি করিয়া খাতা পেন্সিল ধোবা নাপিত কেরাচিন ইত্যাদির খরচ কুলাইবে তাহা সে প্রথমতঃ ভাবিয়াই পাইল না। তাই মনটা তার বিষণ্ণ হইয়া উঠিল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে তাহার প্রিন্সিপালের নিকট দরখাস্ত দিল মাহিনেটা পুরা কিম্বা আংশিক মাপ করিবার জন্য। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। রাত্রিতে খাইতে বসিয়া হোটেলওয়ালাকে বলিয়া রাখিল সামনের মাসের দশ তারিখেই তাহার সমস্ত টাকা সে শোধ করিয়া দিবে। সারদাকে হোটেলওয়ালা চিনিত। তাই সে আর কোনও টাকার জন্য পীড়াপিড়ী করিল না। পয়সা বাঁচাইবার জন্য এদিকে নরেশ একদিন অন্তর একদিন রাত্রে খাওয়া বন্ধ করিয়া দিল। কাকার নিকট চিঠি লিখিয়াও সে কোনও ফল পাইল না। ছয় মাসের বাড়ী ভাড়াটা সারদাই পূর্ব্বে মিটাইয়া দিয়াছিল, নতুবা মুস্কিলেই পড়িতে হইত।

এইরূপে আট মাস কাটিয়া গেল, তবুও নিতাইবাবু আসিলেন না।

টাকার অভাবে নরেশের বই কেনা হইয়া উঠিতেছিল না। সারদা সে খবরটী জানিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া কহিল—এ আমি হাত দেব না। আমার কাছে পোনর টাকা আছে। তোর যা বই লাগে কিনে ফেল। নরেশ কিছুতেই টাকা নিবে না, আর সারদাও না দিয়া ছাড়িবে না। শেষ কালে সারদারই জয় হইল। নরেশের বইএর অভাব এক রকমে দূর হইল।

নরেশের টেষ্ট পরীক্ষার ঠিক পূর্ব্ব সপ্তাহে নিতাইবাবু সস্ত্রীক আসিয়া পড়িলেন। একটু স্থির হইয়াই তিনি সারদাকে কহিলেন—কি খবর বল্ দেখি? তোর বন্ধু কেমন আছে?

সারদা মাথা অবনত করিয়া কহিল, ভালই আছে। নিতাইবাবু একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, এত বড় হয়েচিস্, বুদ্ধিমানের মত চলতে হয়। পরের বাড়ীতে যাকে-তাকে থাকতে দিতে হলে যার বাড়ী তার মতটা একবার জেনে নেওয়া দরকার। সে জ্ঞান তো তোর হয় নাই। যা, এখন একবার বাজার করে নিয়ে আয়।

সারদা কহিল—আমায় যে এক্ষুণি হাঁসপাতালে যেতে হবে! দেরী হলে সাহেব বড় বকে।

নিতাইবাবু কহিলেন, ভারী ত চাকরী, তাতে আবার বকুনী! তা' বকুক গিয়ে। আজ আর সেখানে গিয়ে কাজ নাই।

তারপর নিতাইবাবু সারদাকে বাজারে পাঠাইয়া দিলেন। চাকরীও বজায় রাখিতে হইবে আর এই খুড়ামহাশয়ের কথাটাও শুনিতে হইবে, তাই সারদা তাড়াতাড়ি হাঁস-পাতালে গিয়া একটা ছুটির দরখাস্ত রাখিয়া চুপে চুপে বাজারের দিকে অগ্রসর হইল। বৈকালে সারদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া নরেশ দেখিল দরজার সম্মুখে একটী ফুটফুটে মেয়ে একটী ছেলের সঙ্গে বল খেলিতেছে। এমন সময় কাপড়ে হাত মুছিতে মুছিতে সারদা বাহির হইল।

নরেশকে দেখিয়া সারদা কহিল—কাকা এসেচেন। এমন সময় ছেলে মেয়ে দুটী দৌড়াইয়া আসিয়া কহিল, সারদা দাদা, চল আমাদি'কে বেড়িয়ে নিয়ে আসবে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই নিতাইবাবু বৈঠকখানা হইতে ডাকিলেন—সারদা।

নরেশকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া সারদা নিতাইবাবুর নিকট চলিয়া গেল। পাঁচ মিনিট এদিক-সেদিক পাইচারী করিয়া নরেশ প্রায় বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাই সারদা আসিলেই নরেশ একটু অবজ্ঞা ভরে কহিল—কেন? কিসের জন্য ডেকেছিল?

সারদা একটু হাসিয়াই কহিল—না, তেমন কিছুই নয়। এই তামাকটা সাজিয়ে দিতে।

সারদার সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া নরেশ বাসায় ফিরিবার উপক্রম করিতেছিল। এমন সময় নিতাইবাবু লাঠি হাতে করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বাহির হইয়া আসিলেন। দুই বন্ধুকে পথের ধারে দেখিয়া তিনি সারদাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"এই বুঝি তোর বন্ধু?"

সারদা ছোট্ট একটী "হুঁ" না করিয়া পারিল না। নিতাইবাবু তখন নরেশের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, কি হে ছোকরা! কেমন পড়াশুনা হচ্ছে? কি পড়ছ তুমি?

নরেশ মাথা নীচু করিয়া কহিল—সেকেণ্ড ইয়ার (2nd year)।

"তা বেশ, তা বেশ" বলিয়া নিতাইবাবু চলিয়া গেলেন।

নরেশও আর অপেক্ষা না করিয়া তাহার বাসায় ফিরিল।

টেষ্ট দিয়াই পরীক্ষার ফিসের আর কলেজের মাইনের টাকার জন্য নরেশ তাহার কাকার নিকট লিখিয়া পাঠাইল। কলেজের পরীক্ষা যে সে ভালই পাশ করিবে, তাহা নরেশের জানা ছিল।

নরেশের পিতা কোনও মতে অর্দ্ধেক টাকা পাঠাইয়া দিয়া লিখিলেন—আমি আর পারিলাম না। যেমন করিয়াই হউক অবশিষ্ট টাকা সংগ্রহ করিয়া লইও। তখন ফিস্ দেওয়ার আর বেশী দিন বিলম্ব নাই। সারদা কথাটা জানিতে পারিয়া কহিল—"আমার হাতে যদি থাকৃত, তবে আর ভাবনা ছিল না। মাত্র পঁচিশটা টাকার জন্য পরীক্ষাটা বন্ধ হয়ে যাবে, এ হতেই পারে না। একবার কাকাকে আমি বলে দেখব।"

পরের দিন সকাল বেলা তামাক সাজাইয়া দিয়া সারদা নিতাইবাবুর নিকট কথাটা পাড়িয়া বসিল। নিতাইবাবু মুখ হইতে নটকাটা সরাইয়া কহিলেন—"আমি কি দাতব্য-খানা খুলে বসেছি যে চাইলেই অমনি ভিক্ষে দিয়ে বসব? আমার কাছে ও সব কিছু হবে না।"

সারদা একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল—মাত্র পঁচিশটে টাকা। নইলে ওর পরীক্ষাটাই বন্ধ হয়ে যাবে।

নিতাইবাবু সুরটা একটু চড়াইয়া কহিলেন—তা' হোক গিয়ে।

সারদা মাথাটা নীচু করিয়া কহিল—পরীক্ষার পরে নরেশ টাকাটা শোধ করে দেবে।

নিতাইবাবু কহিলেন—নে, আর বক্ বক্ করতে হবে না। যা তোর কাজে যা। মাছটা ভাল ক'রে দেখে কিনিস্। কাল যা কিনেছিলি তা আর কেউ মুখে দিতে পারে নাই।

সারদা নীরবে বাজারে চলিয়া গেল।

এদিকে নরেশ প্রিন্সিপালকে তাহার কাকার চিঠিখানি দেখাইয়া কহিল, সে বোধ হয় পরীক্ষা দিতে পারিবে না। প্রিন্সিপাল কহিলেন—তা আমি কি করব বল?

নরেশ সজল চক্ষে কহিল—আপনি যদি দয়া করে পাঁচটা মাসের মাইনে রেহাই করেন!

প্রিন্সিপাল মাথা নাড়িয়া কহিলেন—তা হবার যো নাই। তবে আমার নিজের পকেট হ'তে তোমাকে দু' তিন টাকা সাহায্য করতে পারি।

নরেশ আর কোনও কথা না বলিয়া যথারীতি অভিবাদন করিয়া চলিয়া আসিল। তখন তাহার বারম্বার মনে হইতে লাগিল, মাত্র কয়েকটা টাকার জন্য সে চিরজীবনের মত ভিক্ষুকের অপবাদটা মাথায় তুলিয়া নিবে? পরীক্ষা না দিতে হয় তাহাও স্বীকার, তবুও এ কলঙ্ক হইতে সে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবে।

সে রাত্রিতে আহার করিতে নরেশ আর হোটেলে গেল না। শুধু বিছানায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—এখন কি করা যায়?

পরের দিন সারদা আসিয়া দেখিল, নরেশ খাতা পত্র বাক্সে তুলিতেছে। সারদাকে দেখিয়া নরেশ এক অদ্ভুত রকমে হাসিয়া কহিল—এবার আর পরীক্ষা দেব না। ভাল তৈরীও হয় নাই। সামনের বছর দেখা যাবে।

সারদার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। কোনও মতে আপনাকে সংযত করিয়া সে বলিল—এখনও ফিস্ দিবার দুই দিন বাকী আছে। পড়া তুই ছাড়িস্ নে। পঁচিশটে টাকার জন্য দুটো বচ্ছরের পরিশ্রম ব্যর্থ হবে, এ আমার প্রাণে সইবে না।

সারদা আসিয়া তাহার খুড়ীমাকে কহিলেন, যদি পঁচিশটে টাকা দিতেন তবে নরেশ পরীক্ষাটা দিতে পারত।

খুড়ীমা কহিলেন—পঁচিশ—টা—কা! কোথায় পাব যে দেব?

সারদার মনোরথ সিদ্ধ হইল না। সেও নরেশের মত হাল ছাড়িয়া দিল।

ফিস্ দেওয়ার শেষ দিনের সকাল বেলায় চণ্ডী আসিয়া দেখিল নরেশ কাপড় চোপড় বাক্সে গুছাইতেছে। কম্বলের উপর বসিয়াই চণ্ডী কহিল—বা! বাক্স গুছোচ্ছিস্ যে?

নরেশ কহিল—আজ বাড়ী চলে যাব। চণ্ডী অবাক হইয়া কহিল—কেন? পরীক্ষা?

নরেশ কহিল—না, পরীক্ষা আর এবার দেব না।

চণ্ডী কহিল—কেন? কি হয়েছে?

নরেশ একটু হাসিয়া কহিল—ফিস্ না দিলে কি করে দেই?

চণ্ডী কহিল, ফীস এখনও দিস্ নাই?

নরেশ কিছুই গোপন করিতে পারিল না। সবই বলিয়া ফেলিল।

চণ্ডী তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল—তা তুই ভাবিস না। পঁচিশটে টাকা তা আমি মার কাছ থেকে নিশ্চয়ই তোকে এনে দিব। তুই এগারটার সময় কলেজ যাস্। সেখানেই আমি টাকা নিয়ে যাব। ফিরে এসে আজ কিন্তু হিষ্ট্রীর দু'টো চ্যাপ্টার (chapter) পড়তেই হবে।

চণ্ডী আর অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় সারদা আসিয়া দেখিল, নরেশের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। কেমন একটা সঙ্কোচ আর লজ্জা আসিয়া সারদাকে ঘিরিয়া বসিল। সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। মিনিট পাঁচেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া সারদা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল নরেশ পড়িতেছে।

সারদাকে দেখিয়াই নরেশ কহিল—ভগবান একজন নিশ্চয়ই আছেন। আমি ফিস্ দিয়ে ফেলেছি। চণ্ডী টাকাটা দিয়েছে।

চণ্ডীর প্রতি একটা উচ্চ ধারণা লইয়া সারদা বাড়ী ফিরিল। পরের দিন তামাক সাজাইয়া দাঁড়াইতেই নিতাই বাবু কহিলেন—কি রে! নরেশটা ফিস্ দিয়েছে?

সারদা কহিল—হাঁ, দিয়েছে।

নিতাইবাবু কহিলেন, তবে না বড় বলছিলি টাকা নাই। ও আমি বুঝি। ফাঁকি দিয়ে টাকা নেবার মতলব—

আমার চোখ এড়াতে পারে না। এই জন্য দেশের লোককে আমি দুই চক্ষে দেখতে পারি নে।

সারদা মনে মনে হাসিয়া চলিয়া গেল।

নরেশ বেশ ভাল পরীক্ষা দিল। এদিকে নিতাইবাবু আরও তিন মাস ছুটি লইয়া কটকে রহিয়া গেলেন।

সারদাকে ডাকিয়া নিতাইবাবু কহিলেন, নরেশটা খোকাকে পড়াতে পারবে কি না জিজ্ঞেস করিস ত। খেতে দেব আর দশ টাকা মাইনে দেব। সুধাকেও পড়াতে হবে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নরেশ সম্মত হইয়া কার্য্যটী গ্রহণ করিল। আর সেই দিনই বাক্স বিছানা লইয়া সে আবার নিতাই বাবুর তে-মহলা বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পড়ানর সঙ্গে সঙ্গে বাজার করার ভারও নরেশের উপর আসিয়া পড়িল। তাহাতে তাহার মনে আঘাত না লাগিলেও আর একটা জিনিসে সে বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। ঠিক এক সঙ্গে বসিয়াই নরেশ আর সারদা নিতাইবাবুর ছেলে মেয়ের সঙ্গে আহার করিত। কিন্তু তাহাদের দু'জনের পাতে আসিয়া পড়িত জেলখানার কয়েদীরা যে ভাতটা খায় ঠিক সেইরূপ একটা জিনিষ। আর সকলের জন্য ব্যবস্থা ছিল অন্য রকমের। নরেশের কেবলই মনে হইত সে একজন সামান্য মাষ্টার—তার ভাতটা মোটা আর লাল হইলে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু সারদা! সে ত এদের বাড়ীর লোক! তাকেও কেন এরা চাকরদের দলে ফেলে দেয়? আর সারদাটাও কি বিশ্রী!— এতখানি অপমান বুকে লইয়া সে এই বাড়ীটায় থাকতে পারে?

মনের মধ্যে এতখানি বিষ পুষিয়া লইয়াও নরেশ নিতাই বাবুর বাড়ীতে টিকিয়া রহিল।

দুই মাসের মাইনের টাকাটা পাইয়া চণ্ডীকে নরেশ যেদিন টাকাটা দিয়া আসিল তার পর দিনই চণ্ডী আসিয়া নরেশকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। চণ্ডীর মা তাহাদের দুই জনকে এক জায়গায় বসাইয়া মনের আনন্দে আহার করাইলেন। নরেশের মন আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল।

নরেশ যখন বাসায় ফিরিবার উপক্রম করিল তখন চণ্ডী কহিল—একটু বসতে হবে। তারপর বাড়ীর ভিতর হইতে একখানি দেশী কাপড় আর একটা সিল্কের চাদর আনিয়া নরেশের হাতে দিয়া কহিল, মা তোকে দিয়েছেন; তোকে নিতেই হবে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই চণ্ডীর মা আসিয়া দাঁড়াইতেই নরেশের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। কিছুতেই সে জিনিষ দুইটি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না।

ছুটি ফুরাইয়া গেলেই নিতাইবাবু তাঁহার কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন। কিন্তু যাওয়ার সময় সারদাকে নরেশের সম্বন্ধে কিছুই বলিয়া গেলেন না। সুতরাং তাহারা দুই বন্ধুতে আবার সেই পূর্ব্বতন সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গেল।

ঠিক সেই দিনই পরীক্ষার ফল বাহির হইল। নরেশ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছে দেখা গেল। চণ্ডীও ভাল পাশ করিয়া বসিল। সেই দিনই চণ্ডী আসিয়া নরেশকে কহিল—মা ডেকেছেন। চল এক্ষুণ যেতে হবে।

নরেশ আসিয়া দাঁড়াইতেই চণ্ডীর মা বলিলেন, তুমি বাছা আমাদের এখান থেকেই পড়া শুনা করবে। তোমার জন্যই আমার চণ্ডীর উন্নতি। তোমাকে অন্যত্র থাকতে দেব না।

পশ্চাতে দাঁড়াইয়া চণ্ডী হাসিতে লাগিল। নরেশ সম্মতি প্রকাশ করিয়া তবে নিস্তার পাইল।

* * * *

তারপর অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। নরেশ এখন পদে ও গৌরবে একজন ডেপুটী। আর সে নিতাইবাবুর কন্যা সুধাকেই বিবাহ করিয়া বসিয়াছে। একদিন নিতাই বাবু তাহার ওখানে আহার করিতে বসিয়া দেখিলেন নরেশের পাতে সেই মোটা লাল ভাত, আর তাঁহার নিজের পাতে ফুর ফুরে সুগন্ধময় গোবিন্দভোগ। মনে মনে বিষম লজ্জিত হইয়া সেই যে নিতাইবাবু মেয়ের বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন, আর কিছুতেই আসিলেন না। সুধার একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি সে বাড়ীতে যাইতে অস্বীকার করিলেন।

ব্যাপারটা জানিতে পারিয়া সুধা কহিল—এমন করে বাবাকে অপমান করাটা তোমার পক্ষে ভাল হয় নাই। নোয়েল রিডেঞ্জ তুমি দেখ নাই।

নরেশ স্ত্রীর নিকট নিজের দোষ স্বীকার করিয়া শ্বশুরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে চলিয়া গেল।

দেবলীলা।

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

দেবদূত এক আমোদ করিয়া
একদা সাঁঝের বেলা,
কুম্ভ ভরিয়া পীযূষ লইয়া
করিতে আসিল খেলা।
ভাবিল কুম্ভ গোপন করিয়া
রাখিয়া যাইব কোথা,
কোথা দিয়ে যাব স্বরগের শোভা
ধরণীর অমরতা।
প্রথমে গোপনে সম্রাট কাছে
দেখে দেবদূত গিয়া,
গড়িছেন তিনি নূতন সহর
বহু কারিগর নিয়া।
সে নগরী হবে জগতের চেয়ে
সুন্দর সুশোভন,
হার মেনে যাবে ইন্দ্রপ্রস্থ
রোম গ্রীশ ব্যাবিলন।
স্তম্ভ চূড়ায় বিন্ধ্যের মত
সূর্য্য রোধিতে মন,
আকাশ চুম্বী সুদূর বিস্বী
কণকের নিকেতন।
কালের উপর বসাইবে কর
অমরতা লবে কাড়ি,
প্রতিযোগিতার অতীত সে পুরী
যুগ যুগ মনোহারী।
ভাবে দেবদূত পীযূষ কুম্ভ
হেথা রেখে যাব কি না,
ফিরে চেয়ে দেখে কই সে নগরী
পুরু না তাহায় চিনা।
দেখে দেবদূত শুধু অরণ্য
সারি সারি ভাঙা থাম;
আহার খুঁজিছে প্রত্ন তত্ত্ব
এই এর পরিণাম।
সেথা হ'তে ফিরে গেল দেবদূত
প্রমোদ কানন মাঝে,
নিবিড় পুলকে প্রণয় প্রণয়ী
মাধবী দোলায় রাজে।
মরণ দাঁড়ায় বিমোহিত হয়ে
কাল পিছাইয়া যায়,
চুমা দিয়া চাঁদ যেন সে দুটীরে
ছবি করে দিতে চায়।
ভাবে দেবদূত পীযূষ কলসী
দিব উঁহাদের কাছে,
ফিরে দেখে হায় রূপ সম্ভার
কিছু নাকি আর আছে।
নবীনের দল আসিছে যাইছে
এটা বন্দর না কি?
পীযূষ কুম্ভ এত জনতায়
কেমনে যাইবে রাখি!
যান দেবদূত তার পর এক
বিজন ভবন কোণে,
বসে আছে সেথা কবি উন্মনা
যেন কার কথা শোনে।
মনের মাঝারে গড়িয়া তুলিছে
নূতন অলকাখানা,
সুষমা তাহার অতুল অতুল
স্বরগ হইতে আনা।
আপন প্রাণের মাধুরী মিশায়ে
গড়িছে মধুর ছবি,
পুলকে তাহারা জীবিত হতেছে
দেখিয়া মোহিত কবি।

তাহাদের পানে চাহি বলে কবি
স্মরাতে আমারে ভবে,
পুলকের গড়া পলকের ছবি
একটাও কি রে রবে।
পুতুলেরা সব পরী হয়ে বলে,
জানিনে মরণ জরা,
তোমার স্মৃতিকে অমর করিয়া
সাজায়ে রাখিব ধরা।
কবি কেঁদে বলে শুকাইয়া যাবে
জলে এই দাগ কাটা,

তারা বলে মোরা বিজয়পত্র
কালের ললাটে আঁটা।
দেখে দেবদূত কবির সৃষ্টি
হরির দৃষ্টি লভি,
কখন লভেছে অমর জীবন
জানিতে পারে নি কবি।
হেতা রেখে যাই পীযূষ কুম্ভ
ভাল ঠাঁই পেনু খুঁজি,
যুগ যুগ ধরি হবেনাক শেষ
অফুরান এর পুঁজি।

দর্প-চূর্ণ।

[কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ]

(১)

আজ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই পারস্যের রাজধানী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। প্রজাগণ সকলেই বিশেষ হর্ষোৎফুল্ল। কি যেন একটা ব্যস্ততা, কি যেন একটা কৌতূহল সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে। আজ তাহাদের সম্রাট ফারক্-সাহের জন্মদিন উপলক্ষে মহোৎসব। নানারূপ আমোদ প্রমোদ ও পান ভোজন এই দিনটিকে বিশেষভাবে স্মরণীয় ও মোহনীয় করিয়া তোলে। সিংহ প্রভৃতি হিংস্র পশুর অদ্ভুত দ্বন্দ্ব এই উৎসবের একটী প্রধান অঙ্গ।

ফারক্সাহ একজন মহানুভব, উদারচেতা এবং সদয় সম্রাট হইয়াও কি জানি কেন আজিকার দিনে তিনি ঐ জিনিষটীকে অতি আদরের চক্ষে দেখিতেন। আজ প্রজারা ছুটি পাইয়াছে। তাহাদের গৃহচূড়ে, অলিন্দে ও বাতায়নে পুষ্পমাল্যসহ বিচিত্র পতাকা পত পত শব্দে যেন বাদসাহের জয় ঘোষণা করিতেছে। নানাবিধ বাদ্য কোলাহল ও নৃত্যগীতাদি আকাশকে মুখর করিয়া তুলিতেছে। প্রভাত হইতে না হইতে প্রজাগণ বহুমূল্য পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রঙ্গভূমির দিকে ছুটিতেছে। আমীর ওমরাহগণ নানারূপ বেশ বিন্যাস করিয়া নানা কার্য্যে চারিদিকে ধাবিত হইতেছে। রাজপথ লোকে লোকারণ্য।

(২)

পারস্যের উপকূল ভূমি। অপূর্ব্ব কারুকার্য্য মণ্ডিত মণ্ডপ—চারিধারে লৌহ গরাদে পরিবেষ্টিত ক্রমোন্নত আসন-শ্রেণী মণ্ডলাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। বর্ণগন্ধ শোভা-সমৃদ্ধ কুসুমদামে, মণি মুক্তা খচিত ধ্বজসমূহে, বিচিত্র পটবাসে, উজ্জ্বল ঝালরে রঙ্গভূমির অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদন করিতেছে। বংশ ও পদমর্য্যাদা অনুসারে পুরুষ ও স্ত্রীলোক-দিগের জন্য বিভিন্ন আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ মঞ্চে সম্রাট ও তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য মহার্ঘ আসন ক'খানি শোভা পাইতেছে। আজ পূর্ব্বাহ্ণে নবীন আমীর ওমরাহ-গণ স্ব স্ব শক্তি সামর্থ্য ও কৌশলের পরিচয় দিয়া পারস্য-রাজ কর্ত্তৃক অমর জয়-মাল্যে বিভূষিত হইবেন।

(৩)

যথাসময়ে আমীর ওমরাহগণ, পুরুষ ও স্ত্রীগণ ও অন্যান্য দর্শকমণ্ডলী স্ব স্ব আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন। পারস্যরাজও মহিষী, কন্যা ও অপরাপর রাজপরিবার

সমাভিব্যাহারে সর্ব্বোচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিয়া সুখাসীন হইলেন। অবিলম্বে নানাবিধ বাদ্য বাজিয়া উঠিল। স্ত্রীলোকগণের রেশমী পরিচ্ছদের খসখসানি শব্দে ও তাহাদের অলঙ্কারের অপূর্ব্ব শিঞ্জিতে চারিধার সঙ্গীতময় হইয়া উঠিল। আতর গোলাবের খুসবুতে প্রভাতপবন যেন ভরপুর মাতাল হইয়া ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে নকীব কর্ত্তৃক পারস্য সম্রাটের স্তুতিপাঠ আরম্ভ হইল। নিমিষের মধ্যে সেই বিশাল জনসমুদ্র কি যেন যাদুমন্ত্রে অতিশয় শান্তভাব ধারণ করিল। অবিলম্বে চারিটী প্রকাণ্ড সিংহকে রঙ্গভূমির মধ্যস্থলে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তাহারা ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কখন বা ক্রোধোন্মত্ত রক্তবর্ণ চক্ষে মুখব্যাদান পূর্ব্বক জিহ্বা লক লক করিতে করিতে চারিধারে ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। কখন বা মৃত্তিকার উপর পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল এবং উত্থিত ধূলিপটল সমূহ লৌহ গরাদে অতিক্রম করিয়া দর্শকমণ্ডলীর অঙ্গ স্পর্শ করিল। আবার কখন বা উল্লম্ফন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উঠিবার উপক্রম করিল। রঙ্গস্থিত জনসমূহ ভীত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সহসা একটী ওড়না কোথা হইতে আসিয়া সিংহগহ্বরে পতিত হইল। ওড়নাখানি একজন আমীর কন্যার। তাহার নাম ডালিয়া—সুন্দরী, মদগর্ব্বিতা, নির্ম্মম ও যথেচ্ছাচারিণী। ঠিক তাহার বিপরীত আসনে একজন নবীন ওমরাহপুত্র উপবিষ্ট ছিল। যুবকের নাম রোস্তাম—বীর, ধীর, শান্ত ও সুন্দর—ডালিয়ার প্রণয়ী।

রোস্তাম বহুদিন হইতে ডালিয়াকে প্রণয়ের পুষ্পচন্দনে পূজা করিয়া আসিতেছে। ওড়নাখানি পড়িবা মাত্র ডালিয়া একটুকু মৃদু হাসিয়া রোস্তামের দিকে চাহিল এবং কি যেন ইঙ্গিত করিল। রোস্তাম তাহাকে বিলক্ষণ চিনিত, সুতরাং সেই ইঙ্গিতের অর্থ সম্যক বুঝিল। সে একটুকু ভ্রুকুটী করিয়া বিদ্যুৎবেগে একলম্ফে সেই সিংহ-গহ্বরে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তেমনি বিদ্যুৎবেগে ওড়নাখানি তুলিয়া লইয়া নিজের আসনে গিয়া উঠিল, এবং বসিবার পূর্ব্বে তাহা ডালিয়ার মুখের উপর সজোরে এবং ঘৃণাভরে নিক্ষেপ করিল। চক্ষের পলক না পড়িতে পড়িতে এত বড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল। চারিধারে "তোফা তোফা" শব্দ উত্থিত হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ডালিয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তিনী সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ, রোস্তাম আমার জন্য কি না করিতে পারে? জীবন পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিতে পারে।" সম্রাটের চক্ষুদ্বয় বিস্ময় ও প্রশংসার নীরব ইঙ্গিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ কন্যা আয়েষার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার উচ্চ আসন হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া যুবকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং কন্যার হস্ত তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া স্নেহ-নিষিক্ত অথচ জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন—"রোস্তাম, তুমি বীর, এই তোমার বীরত্বের অমর জয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ কর। আমি গুণের পক্ষপাতী—শুধু আভিজাত্যের নহি। তুমিই আমার কন্যার উপযুক্ত পাত্র!"

সমস্ত রঙ্গভূমি নীরব। সহসা সহস্র কণ্ঠে বাদসাহের মহানুভবতার প্রশংসা গীতি ধ্বনিয়া উঠিল। আবার বাদ্য বাজিয়া উঠিল, আবার নকীব স্তুতিপাঠ আরম্ভ করিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিধাতার আশীর্ব্বাদী শুভ শঙ্খধ্বনিবৎ অদূরশ্রুত সাগরের তরঙ্গকল্লোল এবং আনন্দোৎসবের রোশনায়ের মত বালার্কের রক্তিম কিরণ নব দম্পতীর ভবিষ্যৎ ভাগ্যকে জয়যুক্ত করিল।

রোস্তাম ও আয়েষা পরস্পরের মুখপানে ধ্যানমগ্নবৎ নীরবে চাহিয়া রহিল। ডালিয়ার মস্তক আপনা হইতে নত হইয়া পড়িল।

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

শীত আতপ ও জন্মের হার।

ডাঃ ম্যাগেলসেঁ ফরাসী দেশের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ও প্রাণীতত্ত্ববিদ। শীত আতপের জন্য যে জন্ম-মৃত্যুর হারের কম বৃদ্ধি হয় তাহা তিনি আবিষ্কার করিয়া জগৎকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ইয়ুরোপের লোক দুর্নীতিপরায়ণ বা বিলাসী হওয়ার জন্য জন্মের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া পশ্চিম ইয়ুরোপের উত্তাপ কমিয়া যাইতেছে এবং তাহার ফলে জন্মের হার কমিয়া যাওয়ায় নীতিবিদ ও রাষ্ট্রবিদগণ বিচলিত হইয়াছেন।

যদিও বাটি নির্ম্মাণ ও থাকিবার সুবিধা, উত্তম শিশু হাসপাতাল প্রভৃতি করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া যাহাতে বৃহৎ পরিবার হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত তথাপি বিজ্ঞানবিদগণ মানুষের শরীরের উপর জলবায়ুর প্রভাব বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত যাহাতে সামাজিক অবস্থা দেখিয়া কোন্ সময়ে কি করিতে হইবে তাহা ঠিক করিয়া বলা যাইতে পারিবে। উত্তাপের জন্য পরিবর্ত্তনের ফল তৎক্ষণাৎ ঘটিতে পারে; যথা সর্দ্দিগর্ম্মি, সর্দ্দি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি, কিন্তু সাধারণতঃ উত্তাপের ফল আরও গভীরতর যদিও তাহার ফল কিছু কম নয়। মানুষের গ্রন্থি ও কোষাণু সকলে অতি উত্তাপ ও শীতের জন্য যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় তাহা স্থায়ী এবং তাহার ফল পুরুষ পরম্পরা ভোগ করে। এই রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের ফলে জন্ম মৃত্যুর হারের পরিবর্ত্তন হয় এবং ইহারই ফলে অনেকে অপুত্রক হয়। কেবল যে শীত ও উত্তাপের ফলে শরীরের মধ্যে পরিবর্ত্তন হয় তাহা নহে, কিন্তু অতিরিক্ত বারিপাত, অনাবৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা তেমনি পরিবর্ত্তন হয়।

নূতন বৈজ্ঞানিক উপায়ে শরীরের উপর বহুদিন ধরিয়া উত্তাপের প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করা যায়। গত কুড়ি বৎসর ধরিয়া অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে, স্থানীয় সাধারণ উত্তাপ অপেক্ষা কখন উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে জন্মের সংখ্যা বাড়ে এবং শীত বেশী হইলে জন্মের হার কমে। প্যারিস, বার্লিন ও ভিয়েনা সহরে কখন কি উত্তাপ হইয়াছে এবং সেই সময়ে জন্মের হার কি ছিল তাহার বিবরণ আছে। তাহা দ্বারা প্রকাশ পায় যে, গ্রীষ্মকালে বেশী গরম হইলে জন্মের হার বাড়ে। ফ্রান্সে যুদ্ধের জন্য লোকসংখ্যা হ্রাস হওয়ায় এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত বেশী শীত হওয়ায় জন্মের সংখ্যাও হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু আজকাল যে বিবরণ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখা যায় যে গত বৎসর হইতে বেশী উত্তাপ হওয়ায় জন্মের হার বাড়িতেছে।

—০—

উত্তম দন্ত।

উত্তম দন্ত, বিশেষতঃ শিশুদের অনেক পরিমাণে কিরূপ জলপান করা যায় তাহার উপর নির্ভর করে। যে সকল যায়গার জলে অনেক পরিমাণ খনিজদ্রব্য মিশ্রিত আছে অর্থাৎ যে দেশের জলে অধিক পরিমাণ চুণ আছে সে স্থানের লোকের দন্তরোগ অনেক কম। দন্ত তৈয়ারীতে চুণের দরকার হয়। দন্ত খারাপ থাকিলে স্বাস্থ্যহানি হয়, সেইজন্য পাশ্চাত্য দেশের স্কুল সমূহের বালকদিগের দন্তের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। যে সকল শিশুর শরীর ক্ষীণ তাহাদিগের সাধারণতঃ দন্ত খারাপ হয়। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, খারাপ দন্ত থাকার জন্য দৃষ্টির দোষ ঘটিয়াছে।

যে জল পান করা যায় তাহা যেরূপ হয় তাহার উপর দন্ত ভাল বা মন্দ থাকা নির্ভর করে, এই মত পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে দেশের জলে চুণ বেশী তথাকার শিশু বা বালক বালিকাগণের মধ্যে মৃত্যুর হার কম, ইহা কেবলমাত্র ভাল দন্ত থাকার জন্য হইয়াছে; কারণ তাহাতে তাহারা ভাল করিয়া চিবাইতে

পারে। জলে চূণের ও খনিজ দ্রব্যের পরিমাণ যতই বেশী, দন্ত ততই ভাল থাকে এবং স্বাস্থ্যও তৎসঙ্গে ভাল থাকে। যে স্থানের জলে চুণ নাই তথাকার শিশুদিগকে চূণের জল পান করিতে দেওয়া উচিত। শিশুদিগের দুগ্ধের সহিত বাঙ্গলা দেশে সাধারণতঃ চূণের জল মিশান হয় এবং তাহাতে শিশুদিগের খুবই উপকার হয়।

—০—

মিথ্যাবাদী ধরিবার উপায়।

লোকে যখন মিথ্যা কথা বলে তখনকার শ্বাস প্রশ্বাস সত্য কথা বলিবার সময়ের মতন থাকে না। প্রফেসার বেনুসী তাঁহার ছাত্রদিগের উপর পরীক্ষা করিয়া এই বিষয় দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি কয়েকটা কার্ডে অঙ্ক, অক্ষর ও ছবি আঁকিয়া ছাত্রদিগের মধ্যে বিতরণ করেন। তাহাদিগের প্রত্যেককে তাহার নিজের কার্ডের বর্ণনা করিতে বলা হয়, কিন্তু যে সকল কার্ডে লাল দাগ দেওয়া ছিল সেগুলির মিথ্যা বর্ণনা করিতে বলা হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে তাহার সঙ্গীরা সতর্ক হইয়া দেখিতেছিল এবং তাহারা তাহার কার্ডে কি আছে না জানায় তাহার ধরণ ধারণ দেখিয়া ঠিক করিতেছিল সে সত্য কথা বলিতেছে কি না। যাহারা ঠিক পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহারাও আন্দাজ করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না যে তাহার সত্য মিথ্যা ধরিতে পারিতেছে কি না।

প্রত্যেক ছাত্রকে পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের গতি স্থির করা হয় এবং পরীক্ষার অব্যবহিত পরেই পুনরায় দেখা হয়। তাহার ফলে দেখা গেল যে, মিথ্যা কথা বলার সময় শ্বাস লইতে দীর্ঘ সময় লাগিতেছে কিন্তু সত্য কথা বলিতে তত সময় লাগে না। আরও পরীক্ষায় দেখা গেল যে অতি চতুর মিথ্যাবাদীও শ্বাস প্রশ্বাস ইচ্ছা করিয়া নানারূপে পরিবর্ত্তন করিয়া ধরা না পড়িবার চেষ্টা করা সত্বেও ধরা পড়িয়া যায়। মানুষ ইচ্ছা করিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের গতির পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, কারণ যে মিথ্যা কথাটা বলিবে সে সম্বন্ধে ভাব ও শ্বাস প্রশ্বাসের গতি পরিবর্ত্তন করা এই দুই কাজ একই সময়ে করিতে পারে না তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

ডাঃ অগষ্টাস ওয়েলার এক যন্ত্র বাহির করিয়াছেন তাহার সাহায্যেও মিথ্যাবাদী ধরা যায়। যখন দোষী ব্যক্তিকে জেরা করা হয় তখন তাহার স্নায়ুর যে ভাব থাকে তাহার গতি বিদ্যুতের সাহায্যে স্থির করা হয়। ডাঃ ওয়েলার দেখিয়াছেন যে মানুষের মনের অবস্থানুসারে বিদ্যুৎ চর্ম্মের মধ্য দিয়া কম বা বেশী করিয়া প্রবাহিত হয়। এই বিদ্যুৎ প্রবাহের তারতম্যের এমন করিয়া এক তালিকা করিয়াছেন যে বিদ্যুতের গতিও ঐ তালিকা দেখিয়া যাহাকে পরীক্ষা করা হইতেছে তাহার বক্তব্যের সত্য মিথ্যা বেশ ধরা যায়।

যখন কোন দোষী ব্যক্তি বলিবে যে অপরাধের স্থানে সে উপস্থিতই ছিল না, সেই সময়ে তাহার হাতে বৈদ্যুতিক তার লাগাইয়া তাহাকে কয়েকটা চিত্র দেখিতে বলিতে হইবে এবং তাহার মধ্যে যে স্থানে সে অপরাধ করিয়াছে তাহাতে ছবিও দেখাইতে হইবে। অন্যান্য ছবিগুলি দেখার সময় তাহার স্নায়ুতে কোন কার্য্য করিবে না, কিন্তু অপরাধের স্থানের ছবি দেখিলে তাহার স্নায়ু হঠাৎ এমন কার্য্যশীল করিবে যে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা দ্বারা ইহা বন্ধ করিতে পারে।

—সঞ্জীবনী, ২৫ ফাল্গুন, ১৩২৮।

চন্দননগর ইতিহাসের একপৃষ্ঠা।

দাস ব্যবসায়—একখানি দাসখৎ।

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে দাসব্যবসায় প্রচলিত ছিল বলিলে একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কথা; তৎকালের খৃষ্টিয়ান বণিকগণ এদেশে অতি বিস্তৃতরূপে দাসব্যবসায় চালাইতেন বলিলে আরও একটু বিস্মিত হইতে হয়; আমাদের দেশের গরিব হিন্দু পিতামাতা গরুবাছুর বেচার মত শিশু ও কিশোর বয়স্ক পুত্রকন্যা বিক্রয় করিত একথা বলিলে

বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না। কিন্তু কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য, অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। নিম্নে একখানি দাসখতের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল, তাহা পাঠ করিলে সকল সন্দেহ ও অবিশ্বাস তিরোহিত হইবে।

শ্রীআত্মারাম বাগদীকস্য
সাং বর্দ্ধমান

১/৭ শ্রীশ্রীরাম
সন ১৭৩৫

ইয়াদী কির্দ্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীগাছপার কোরর্ণের
ফিরিঙ্গী শুচরিতেষু লিখীতং শ্রীআত্মারাম বাগদীকস্য
ছোকরা বিক্রয় পত্রমিদংকার্য্যঞ্চ্যাণ আগে আমার বেটা
নাম শ্রীস্যামা বাগদী ছোকরা বএশ আট বৎসর বর্ণ কালা
ইহার কিম্মত মান্দরাজী ৭৲ সাততঙ্কা পাইয়া আমি সেৎছা
পূর্ব্বক তোমার স্থানে বিক্রয় করিলাম তুমী ইহারে বাতিজর
ক্রিস্তাও করিয়া খোরাক পোষাক দিয়া আপন খেসমতে
রাখহ এই ছোকরার দানবিক্রের সত্তাধিকার তোমার আমার
সহিত এবং আমার ওয়ারীসের সহিত এই ছোকরার কোন এলাকা
নাই এই করারে ছোকরা বিক্রয় করিলাম ইতি সন ১১৪২ এগারো
সত বাাল্লিষ শাল তারিখ ১৭ সতরঞা জ্যৈষ্ঠ মাহ ২৮ মাই
সন ১৭৩৫ সাল।

আজ হইতে ঠিক ১৮৭ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার এক বাগদীর ছেলে তাহার পিতা কর্ত্তৃক ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিল—এই পুরাতন পত্রখানি তাহারই দাসখৎ। দাসখৎখানি বিবিধ কারণে বিশেষ করিয়া বুঝিয়া দেখিবার জিনিষ। পিতা আত্মারাম বাগদী ৭টী মান্দ্রাজী তঙ্কা লইয়া স্ব-ইচ্ছায় ছেলেটিকে "সকল মঙ্গলালয় শ্রীগাছপার কোরর্ণের" (Gásper Cornet) নামক সাহেবকে নিঃস্বত্ব হইয়া বিক্রয় করিল; এবং দান বিক্রয়ের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রকে "খৃষ্টিয়ান করিবার অধিকার পর্য্যন্ত ক্রেতাকে প্রদান করিল। সেই বৎসর অক্টোবর মাসে শ্যামা প্রভু কর্ত্তৃক ২৫৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া মসিয়ে থেরেসার নামক অন্য একজন ফরাসীর সম্পত্তি হইল। তারপর নভেম্বর মাসের ২৫শে তারিখে শ্যামা আবার হাতবদল হইয়া ৫০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া মসিয়ে থের্মো নামক তৃতীয় প্রভুর অধীন হইল। তারপর শ্যামার কি হইল কাগজপত্রে আর পাওয়া যায় না। হয়ত শ্যামা পরে Samuel নাম প্রাপ্ত হইয়া প্রভুকর্ত্তৃক ভারতবর্ষ হইতে বুরবঁ বা মরিশাস দ্বীপে চালান হইয়া আকের ক্ষেতে মজুরদারী করিতে করিতে ইহলীলা সাঙ্গ করিয়াছে—কে তার খবর রাখে? যাহ হউক, শ্যামা বাগদীর জীবন

চরিত লেখা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, অতএব পরে বেচারীর কি হইল না জানিতে পারিলেও ক্ষতি নাই।

শ্যামা বাগ্দীর প্রথম মনিব "শ্রীগাছপার কোরর্ণের ফিরিঙ্গী"। ফিরিঙ্গী শব্দটা আজকাল ইউরোপীয়গণের প্রতি প্রয়োগ করা শ্লীলতা বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু সেকালে এরূপ ছিল না; দাসখতের মধ্যগত "ফিরিঙ্গী সুচরিতেষু" এই কথাই তাহার প্রমাণ। দাসখৎখানির নাম "ছোকরা বিক্রয় পত্রমিদং"। আজকাল ইংরাজ সাহেবেরা তাঁহাদের চাকরকে "Boy" বলিয়া ডাকেন; ফরাসি সাহেবেরা Garcon বলেন; বালক যুবা বৃদ্ধ নির্বিশেষে চাকর মাত্রেই Boy বা Garcon। এই Boy বা Garcon কথার অর্থ বালক নহে "ছোকরা"; ছোকরা শব্দ বান্দা বা ক্রীতদাসের প্রতিশব্দ মাত্র। অবস্থাগতিকে ছোট বড় হয়, আবার বড় ছোট হইয়া যায়; ভাষার মধ্যগত অনেক শব্দেরও এই অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। "ফিরিঙ্গী" শব্দ সম্মানের আসন হইতে চ্যুত হইয়া এখন প্রায় একটা দুর্ব্বাক্যে পরিণত হইয়াছে বলিলেই হয়; আর যে "ছোকরা" শব্দ দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে ক্রীতদাসের অভিধা ছিল—আজ তাহা বেতনভোগী অপেক্ষাকৃত স্বাধীনবৃত্তি সম্পন্ন ভৃত্য মাত্রের জ্ঞাপক হইয়াছে।

পুত্রের পরিচয় প্রদান কালে আত্মারাম বলিয়াছে "আমার বেটা নাম শ্রীশ্যামা বাগদী বএশ আট বৎসর বর্ণ কালা"। বিশেষ করিয়া ছেলের বর্ণের পরিচয় দিবার কি প্রয়োজন হইয়াছিল? আত্মারাম ত আর ছেলের বিবাহের ঘটকালি করিতেছিল না! ইহার অর্থ—ফরাসি কায়দা অনুসারে শ্যামার জাতিত্বের প্রমাণ দিবার প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ সে যে ভারতবাসী, ফিরিঙ্গী নহে, ইহাই "বর্ণ কালা" শব্দে ব্যক্ত করা হইয়াছে। সেকালে দেশীয় ব্যবসাদারের নাম ছিল—"Black merchant", কলিকাতার বাঙ্গালী পল্লীর নাম ছিল "Black town", এখনও মান্দ্রাজের যে অংশে দেশীয় লোকের বাস তাহার নাম Black town; পণ্ডিচারীতে ও চন্দননগরে Ville Noir বা Black town আছে। দেশীয় লোক বুঝাইতে হইলে Black বা কালা বলিতে হইত। কিন্তু কথা এই, শ্যামা বাগ্দা বলিলে কি ভারতবাসী বুঝাইত না? খুলিয়া না বলিলে ফরাসি কায়দা মতে হয়ত যথেষ্ট হইত না। এখন পর্য্যন্ত ফরাসী দপ্তরে সরকারী বা বে-সরকারী কাগজ পত্রে, শ্রীযুক্ত রামধন চট্টোপাধ্যায়, জাতিতে ব্রাহ্মণ, চাকরী কলম পেশা ও তাহার বণিতা শ্রীমতী রামমণি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কোন কর্ম্ম নাই একথা খুলিয়া না লিখিলে কায়দা খেলাফ হয়।

আত্মারাম যখন নিঃস্বত্ব হইয়া ছেলেকে বিক্রয় করিল—ছেলেকে "খোরাক পোষাক দিয়া" তাহাকে "আপন খেদমতে" রাখিবার কথাটা বিক্রয় পত্রের মধ্যে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে। কিন্তু ছেলেটাকে "ক্রিস্তাঙ" করিবার কথাটা বিক্রয় সর্ত্তের মধ্যে স্থান পাইল কেন? হিন্দুর ছেলে শ্যামা, বাগ্দা হইলেও, যখন "ফিরিঙ্গীর" ঘরে "ছোকরা" রূপে প্রবেশ করিল তখন ত তাহার "ক্রিস্তাঙ" হওয়া ভিন্ন গতি ছিল না। "বাপ্তিজর" (baptise) করিবার ভার ও ব্যয়টা বোধ হয় ক্রেতার উপর অর্পণ করিবার উদ্দেশ্যেই এ কথার বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অথবা ৮ বৎসরের বালককে তাহার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে "ক্রিস্তাঙ" করা বিধিসঙ্গত ছিল না, তাই দাসত্ব গ্রহণ করিলেও পিতার অনুমতিটা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া লওয়া হইয়াছে।

এই দাসখতের তারিখ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১১৪২ সাল বা ২৮এ মে ১৭৩৫ সাল। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ২৮এ মের সহিত কেমন করিয়া মিলন বলা যায় না। ইউরোপীয় পঞ্জিকা সংস্কারের সময় তারিখগুলা একটু সরিয়া গিয়াছে বোধ হয়, সেই জন্য বাংলা মাসের ১লা এখন প্রায় ইংরাজী মাসের মধ্যস্থলে পড়ে। সে যাহা হউক, ১৭৩৫ সালে চন্দননগরে ফরাসী কুলপ্রদীপ ডুপ্লেক্স Director General. চন্দননগরের তখন বড়ই বোলবোলা, তখন স্বনামখ্যাত শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী চন্দননগরে ফরাসী বাণিজ্যের প্রধান সহায়; তিনি ফরাসী কোম্পানির একদিকে বড় বেনিয়ান, অপর দিকে রাজস্বের ইজারাদার। আত্মারাম মান্দ্রাজী ৭ টাকায় তাহার ৮ বৎসরের ছেলেকে বেচিল, দরটা চড়া হইল কি নরম হইল এতদিন পরে বলা কঠিন। মান্দ্রাজী টাকায়

সহিত আজকালকার টাকার সম্বন্ধ কি তাহারও নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে খাহার্য্যের মূল্য বৃদ্ধির হার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় তখনকার ৭ টাকা এখনকার প্রায় ৩০ টাকার সমান হইতে পারে।

১১৪২ সালে লিখিত এই দলিলখানি গদ্য রচনা পদ্ধতির নিদর্শন হিসাবে মূল্যবান। এই দলিলখানি অপেক্ষা প্রাচীনতর আর একখানি মাত্র লিখন আমাদিগের দৃষ্টি-গোচর হইয়াছে। ১৭ই ফাল্গুন ১১২৫ সনের লিখিত বৈষ্ণবদিগের একখানি প্রাচীন দলিলের প্রতিলিপি ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৩০৬ সনের সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। দাসখৎখানির ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ বহুল ও উর্দ্দু ও ফার্সী পারিভাষিক শব্দ সংমিশ্রিত। এই ১১ ছত্র লেখার মধ্যে ইয়াদী, কির্দ্দি, ফিরিঙ্গী, ছোকরা, বেটা, কিম্মত, খোরাক, পোষাক, ওয়ারীশ, এলাকা, করার, খেদমতে, তারিখ, সন এই ১৪টি কথা উর্দ্দু বা ফার্সী আর সকল শব্দই বিশুদ্ধ বাঙ্গলা বা সংস্কৃত। রচনা ভঙ্গী, প্রথম বাক্যটি ছাড়িয়া দিলে (ইয়াদী কির্দ্দি-স্মরণ রাখিও) বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল বাঙ্গলা। একটু বিচিত্রতা এই, আত্মারাম সাহেবের প্রতি তুমি ও তোমার এই কথা ব্যবহার করিয়াছে। উহা লেখকের অনভিজ্ঞতা জনিত বা তাৎকালিক প্রথা অনুযায়ী বলা কঠিন। কতক-গুলি শব্দের বর্ণ যোজনা আধুনিক পদ্ধতি হইতে ভিন্ন; লিখন-পদ্ধতির বৈচিত্র্য এই যে বিরাম-চিহ্নের চিহ্ন মাত্র নাই; বর্ণ রচনা ভঙ্গী অতি পরিপাটী; তবে কয়েকটী অক্ষর অদ্ভুত ধরণে লিখিত। প্রায় দুই শত বৎসর পরে আজ যে ভাষায়, যে ভাবে পাট্টা কবুলিয়ৎ লিখা হয় এ দাসখৎখানি তাহারই অনুবৃত্তি বলিয়া মনে হয়। আত্মারাম নিরক্ষর ছিল একথা নিঃসংকোচে বলা যায়। পত্রখানি কোন মসীজীবীর পাকা হাতে লেখা; লেখক আত্মারামের হইয়া সহি করিয়াছে, আত্মারাম একটী কালির আঁখর মাত্র কাটিয়া সম্মতি জানাইয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই—আত্মারাম তাহার ৮ বছরের ছেলেকে ৭৲টী টাকায় বিক্রয় করিল কেন? কেন, তাঁহার আভাষ দাসখতেই পাওয়া যাইতেছে। খোরাক পোষাক দিয়া রাখিবার অনুরোধের মধ্যে এই পুত্রবিক্রয়ের নিগূঢ় অভি-প্রায় কিয়ৎ পরিমাণে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। জঠরজ্বালায় পীড়িত দরিদ্র আত্মারাম তাহার আত্মজকে "স্বেচ্ছাপূর্ব্বক" ক্রীতদাস করিল; ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া, স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া যদি তাহার পুত্র দুটী খাইতে পায় আত্মারাম তাহারই ব্যবস্থা করিল এবং নিজেরও উদরান্নের কথঞ্চিৎ জোগাড় করিল।

তখন মুসলমান রাজ্যস্থিতি তিল তিল করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় রাহুগ্রস্ত মুসলমান শক্তির জ্যোতি ও তেজ হরণ করিয়া তিল তিল করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছিল। এই নিদারুণ পরিবর্ত্তনের যুগে—মারাঠার লুট ও ক্ষুদ্র জমিদারগণের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে পড়িয়া রাজা প্রজা উভয়েই ক্ষুব্ধ বিপর্য্যস্ত পীড়িত হইয়া দারুণ বেদনা অনুভব করিতেছিল; কিন্তু দুঃখের বোঝা সকল সময়েই দরিদ্রের ক্ষীণ স্কন্ধকে অধিকতর ভারাক্রান্ত করে। নিঃসম্বল নিম্নস্তরের লোকেই দুর্দ্দিনের দারুণ কশাঘাত উপলব্ধি করে। আত্মারাম বাগ্দীর মত শত শত নিরন্ন দুঃখী প্রজা অনন্যোপায় হইয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া সন্তান বিক্রয় করিয়া ও পরিশেষে আপনার শেষ সম্পত্তি আপনার দেহ বিক্রয় করিয়া জঠরা-নলের হবা সংগ্রহ করিতেছিল।

কেহ না মনে করেন যে এক আত্মারাম বাগ্দী ছেলে বেচিয়াছিল বলিয়া এ দেশের এতটা হীন অবস্থা পরিকল্পনা করা অন্যায়। কল্পনা নহে সত্য ঘটনা। শুধু এই একখানি দাসখৎ নহে, বহু বিপর্য্যয় অতিক্রম করিয়া যে কয়খানা পুরাতন কাগজ পত্র এখনও ফরাসীর দপ্তরখানায় বিদ্যমান আছে তাহার মধ্যে এখনও অন্ততঃ ১০০ খানা দাস বিক্রয়, দাস বিনিময় ও দাসত্ব সম্বন্ধে অন্যান্য কাগজ পাওয়া যায়। (১) আর শুধু চন্দননগরে নহে বাংলার সকল জেলায় পুরাতন কাগজপত্রে ও তৎকালের সংবাদপত্র সমূহে দাস-

---

(১) Bengal Past and Present, Vol VI. p. 257—A note on Slaves and Slavery in old Chandernagore.

ব্যবসায়ের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (১) তখনকার জীবনে দাসব্যবসায় দাসদাসী ক্রয় একটা অতি সাধারণ ঘটনা ছিল। প্রত্যেক সমৃদ্ধ মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের সংসারে পাল পাল ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী ছিল। একপাল ক্রীত দাসদাসী রাখা বড়মানুষীর অঙ্গ ছিল। এমন একটা খৃষ্টান পরিবার ছিল না যাহাতে একটীও ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী না থাকিত।

কেন না কোন সময়ে প্রত্যেক জাতির মধ্যে দাসীকরণ প্রথার প্রবর্ত্তন ছিল; প্রাচীন হিন্দু সমাজে ছিল, প্রাচীন গ্রীসে ছিল, রোমে মিশরে ছিল। মনুষ্য সমাজের ক্রমবিকাশের সহিত দাস প্রথার উদ্ভব ও বিলোপ। মনুষ্য সমাজের বিকাশের সঙ্গে যে দাসত্ব প্রথার উদ্ভব ও পরিপুষ্টি, সে দাসত্ব প্রথা বস্তুতঃ কদর্য্য প্রথা নহে; ব্যক্তিবিশেষ তাহার প্রবর্ত্তক নহে, তাহা স্বাভাবিক, আবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী; সে প্রথা যে কারণ পরম্পরা অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হইয়াছিল সে কারণ পরম্পরার বিলোপ হইলে, উহাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল—কোন ব্যক্তিবিশেষের হুকুমে সে প্রথা জন্মায় নাই, কাহারও হুকুমে মরে নাই। কিন্তু আমরা খৃষ্টিয়ান জগতে যে দাসত্ব প্রথার কথা ইতিহাসে পাঠ করিয়া থাকি, তাহা মনুষ্য সমাজের ক্রমবিকাশের সহিত সম্পর্কশূন্য, তাহার জন্য ব্যক্তিবিশেষ দায়ী এবং সে-প্রথা প্রকৃতই অতি নৃশংস ও ক্রূর; রাজার হুকুমে তাহার উদ্ভব ও রাজার হুকুমে তাহার বিলোপ।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে ইক্ষুক্ষেত্রে যে স্থানীয় বর্ব্বর জাতিকে নিয়োগ করা হইত তাহারা অলস ও দুর্ব্বল। আফ্রিকার কাফ্রি আদিম নিবাসীরা বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী। Bishop Las Casas নামক জনৈক পাদ্রীর মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল এই বলিষ্ঠ ও শ্রমশীল নম্রপ্রকৃতি কাফ্রিগণকে ইক্ষুর চাষে লাগাইলে সুবিধা হইতে পারে। পাদ্রীর বুদ্ধিতে পরিচালিত ইউরোপীয় রাজগণ পাদ্রীর সংকল্পের সমর্থন করিয়া হুকুম প্রচার করিলেন। নৃশংসভাবে সহস্র সহস্র কাফ্রি নরনারীকে বলপূর্ব্বক বা প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া দেশচ্যুত করিয়া, বন্য পশুর মত জাহাজ বোঝাই দিয়া আমেরিকায় ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে আকের চাষ করিতে চালান করা হইল—এ দাসব্যবসায় রাজার হুকুমে আরম্ভ হইয়াছিল এবং Wilberforce এবং Father Gregoryর চেষ্টায় খৃষ্টিয়ান জগতের করুণা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ হইলে, রাজার হুকুমে সে ব্যবসায় রহিত হইল। (১)

কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে আফ্রিকা হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় কাফ্রিদাসের পণ্যস্রোত, পূর্ণ মাত্রায় বহিয়া চলিয়াছে। খৃষ্টিয়ান ব্যবসায়ীবর্গ যখন প্রাচ্য দেশে বাণিজ্য করিতে আসিলেন তাঁহারা ভারতবর্ষে দাস প্রথার প্রচলন দেখিলেন। ভারতবর্ষেও তাঁহারা কাফ্রি দাসের আমদানি করিলেন। তখন দেশের রাজা মুসলমান—মুসলমানগণ দাসত্ব প্রথাকে চিরদিন পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং আগন্তুক খৃষ্টিয়ান বণিকসকলকে দাসব্যবসায় চালাইবার জন্য ইতস্তত করিতে হইল না। তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে রাজানুসৃত পথ বহিয়া চলিতে লাগিলেন। কাফ্রি খোজা মুসলমান অন্তঃপুরের পরিরক্ষক ছিল। কাফ্রি দাসদাসী খৃষ্টিয়ান আগন্তুকগণের গৃহে, পাচকের কাজ করিত, নাপিতের কাজ করিত, খানসামার কাজ করিত, মেম সাহেবদের নেপথ্যের সহায়তা করিত, সঙ্গীত আলাপ করিয়া প্রভুর মনোরঞ্জন করিত। আফ্রিকাবাসী দরিদ্র, ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশের লোকও দরিদ্র, সেই দরিদ্র ভারতবাসীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে দাসীকরণপটু অভ্যাগতগণের বিলম্ব হয় নাই। তাঁহারা আফ্রিকার ন্যায় চট্টগ্রাম হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরভূমি হইতে প্রভূত ক্রীতদাস সংগ্রহ করিয়া দেশ দেশান্তরে লইয়া গিয়াছিলেন। আফ্রিকার ন্যায় ভারতবর্ষেও দস্তুর মত দাসব্যবসায় চালাইয়া ছিলেন। তাহার গোটা-কতক নিদর্শন যাহা খুঁজিয়া পাইয়াছি নিম্নে দিলাম।

(১) Toynbee's Administration of the Hooghly District, p. 149. Seton Kerr's Selections from Calcutta Gazette.

(১) La Grande Encyclopedie under "Esclavage"; Encyclopedia Britannica under "Slavery."

মরিশাস্ ও বুরবঁ (১) এই দুইটী দ্বীপ মনুষ্য বাসোপযোগী করিয়া কৃষিকার্য্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ করিবার মানসে ফরাসি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চেষ্টিত হন। অনাদিকাল হইতে বর্দ্ধিত বনানি ধ্বংস করিয়া কৃষিক্ষেত্র বিস্তারের জন্য এবং বন কাটিয়া নগর নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্রথমে ক্রীতদাসের প্রয়োজন হয়; এবং সে ক্রীতদাসের পাল ভারতবর্ষ হইতে সংগ্রহ করিয়া কোম্পানী বাহাদুর উক্ত দ্বীপদ্বয়ে প্রেরণ করেন। (২) প্রথমে চন্দননগরের উপর ক্রীতদাস সংগ্রহের ভার পড়ে; কত যে বাঙ্গালী ও বিহারী দরিদ্র ব্যক্তি জাহাজ বোঝাই হইয়া সমুদ্র পারে বুরবঁর বনে ও মরিশাসের উৎকট উত্তাপে ইহলীলা সাঙ্গ করে তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন।

১৭২৯ সালের মধ্যভাগে পণ্ডিচারী হইতে হুকুম আসে যে চন্দননগর হইতে ক্রীতদাস কিনিয়া আর পাঠাইতে হইবে না, মান্দ্রাজ উপকূলবর্ত্তী প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, সেখানে বাংলা অপেক্ষা সস্তা দরে ক্রীতদাস পাওয়া যাইতেছে। (১) দুই বৎসর পরে সে প্রদেশে সুজন্মা হয় তখন হুকুম আসে সেখানে দর চড়া অতএব আবার চন্দননগর হইতে ক্রীতদাস পাঠান হউক। (২) ১৭৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চন্দননগর হইতে পণ্ডিচারীতে সংবাদ যায় যে পাটনার নবাব (আলিবর্দ্দী খাঁ) কোন এক হিন্দু রাজাকে (সম্ভবতঃ বিহারের কোন জমিদার বা বঞ্জারা নামক দস্যুগণকে) (৩) যুদ্ধে পরাভূত করিয়া ১২ হইতে ১৫ হাজার বন্দীকে ক্রীতদাস করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। চন্দননগর হইতে ডুপ্লেক্স এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে পাটনার ফরাসী কুঠিয়াল Groiselleকে হুকুম দিলেন ৫০০ ক্রীতদাস ক্রয় কর। পণ্ডিচারী হইতে সংবাদ আসিল —"যদিও বুরবঁ দ্বীপে প্রতি বৎসর ২০ জন মাত্র পাঠাইবার হুকুম আছে—মরিশাস দ্বীপে ৩০০ ক্রীতদাস পাঠাইলে কাজে আসিবে, এবং যেহেতু মনে হয় মাল সস্তায় পাওয়া যাইবে, প্রত্যেক জাহাজে কিছু কিছু করিয়া ৩০০ শতই পাঠাইয়া দেওয়া হউক।" (৪)

---

(১) মরিশাসের ফরাসি নাম Isle de France. ফরাসিগণ ১৭১৫ সালে এই দ্বীপ অধিকার করে এবং ১৮১০ সাল পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকারে থাকিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং তদবধি ইংরাজেরই আছে। ১৮১০ সালে লোক গণনায় প্রকাশ হয় যে মরিশাসের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে প্রত্যেক ১০ জনের মধ্যে ১ জন স্বাধীন ও ৯ জন ক্রীতদাস। কতক দাস মোজাম্বিক ও মাদাগাস্কার হইতে আনীত। —বুরবঁ দ্বীপের বর্ত্তমান নাম Isle de Reunion. ১৬৪২ খ্রীঃ ফরাসিগণ এই দ্বীপ অধিকার করে। ১৮১০ সালে ইংরাজের হস্তে ন্যস্ত হয়; কিন্তু ১৮১৬ সালের সন্ধিতে (Treaty of Paris) ফ্রান্সকে প্রত্যর্পণ করা হয়, উহা এখনও ফ্রান্সের সম্পত্তি। ১৭১৭ সালে লোক সংখ্যা ২০০০, তাহার মধ্যে ১১০০ জন ক্রীতদাস; ১৭৬৩ সালে—১৯০০০ এর মধ্যে ১৫০০০ ক্রীতদাস; ১৭৮৯ সালে—৬১২০০ এর মধ্যে ৫০,০০০ ক্রীতদাস; ১৮১০ সালে—৯০,৩৪৬ এর মধ্যে ৭০৩৫০ ক্রীতদাস।—A Gazetteer of the World.

(২) Pour mettre l'Ile de France en valeur elle (la compagnie) y fait passer cette annee des ouvriers de toutes les professions qu'elle a cru utiles ; elle y envoie plusieures familles qui ont demande a s'y etablir, elle y joint douze jeunes filles qu'elle donnera ordre de marier a des soldats et des ouvriers, et pour mettre tous cesgens en etat de travailler, elle donne ordre qu'on leur avance des esclaves, des outils pour la terre, de semences et graines et des vivres pendant un un ou deux, qu'ils s'obligeront de restituer en nature et du cru de leurs terres. ক্রীতদাসের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"Il aurait ete convenable d'y faire passer des esclaves pour defricher quelques terres qui eussent ete en etat de produire une partie des choses necessaires a la subsistence de tant de monde —French East India Company's letter to the Pondichery Council, dated Paris—25th September 1727.

(১) Nous vous prions dene point faire acheter d'esclaves jusqu'a nouveaux orders de notre part, nous sommes d'ailleurs en etat, par la famine dont ce pays continue d'etre afflige, de nous en procurer la quantite dont nous pourrons avoir besoin et a meilleur marche qu'a Bengale. Letter of Pondichery Council to the Council at Chandernagore ; dated, Fort Louis, Pondichery, the 14th June 1729.

(২) "Ils (esclaves) sont encore plus rares a cette coste cette annee que les dernieres par l'abondance qui y regne.—The same, dated 12th March 1731.

(৩) Stewart's History of Bengal (Bangabasi ed.) p. 477-8.

(৪) Vous ajoutez que le Nabab de Pattena a fait la guerre a un Raja et a fait enlever 12 a 15000

La Bourdonnais তখন মরিশাস দ্বীপের শাসনকর্তা তাঁহার উপর কোম্পানির হুকুম ছিল তিনি আবশ্যক মত ভারতবর্ষ হইতে ক্রীতদাস আমদানি করিতে পারিবেন (১)। ১৭৫১ সালে বুরবঁর শাসন সঙ্ঘ হইতে আবেদন আসে ৬০ জন ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী, বয়ঃক্রম ১৫ হইতে ৩০, পাঠান হউক—পণ্ডিচারী হইতে চন্দননগরের উপর সে আবেদন রক্ষা করিবার ভার পড়ে। (২)

দাসীকরণের প্রক্রিয়া পুরাতন কাগজ পত্র হইতে যতদুর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি নিম্নে প্রদান করিলাম।

কোন এক ধনী দাস ব্যবসায় করিবেন তিনি সংগ্রাহক নিযুক্ত করিয়া গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করিলেন। কুলির আড়কাঠির ন্যায় তাঁহারা ছলে বলে কৌশলে অথবা অতি সহজে দীনহীনগণের সন্তান সকল ক্রয় করিয়া দাসদাসীর আড়তে হাজির করিল। ঋণদানে অশক্ত হইলে উত্তমর্ণকে দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়, আদিমকালের ন্যায় এ নিয়ম মুসলমান যুগেও বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং দরিদ্রকে ঋণজালে জড়িত করিয়া পুত্রকন্যা বিক্রয় করিতে বাধ্য করা, দাসীকরণের অতি সহজ উপায় ছিল। আমরা শিশুগণকে যে ছেলেধরার ভয় দেখাই, দাসসংগ্রাহকগণ সেই ছেলেধরা, (৩) ইয়োরোপীয় বণিকগণের প্রত্যেক আড্ডায় চন্দননগরে, হুগলিতে, চুঁচুড়ায়, শ্রীরামপুরে ও কলিকাতায় দাসের আড়ত ছিল, দাসের হাট বসিত। গহনার নৌকায় বোঝাই দিয়া যেমন আজকাল ব্যবসায়ী হাটে বেসাত লইয়া আসে, তৎকালে দাসব্যবসায়ী দাসদাসী বোঝাই দিয়া ভাগীরথী বক্ষ বহিয়া দাসের হাটে জীবন্ত বেসাত লইয়া যাইতেছে, এ দৃশ্য একেবারেই অভিনব ছিল না। মনুষ্যসমাজে প্রথম কৃতদাস রমণী, দাসের হাটে রমণীর আদরই অধিক ছিল। যে সংসারে দশটা গোলাম, তাহার মধ্যে নয়জন স্ত্রী ও একজন পুরুষ। যে কারণ মেষপালক মেষ অপেক্ষা মেষীর অধিক আদর করে দাস অপেক্ষা দাসীর আদর সেই কারণেই অধিক ছিল। মেষী মেষ শাবক প্রসব করিয়া প্রভুর ধনবৃদ্ধি করে, দাসীও দাসশিশু প্রসব করিয়া প্রভুর ধনবৃদ্ধি করিত। অনেকে দাসীর পাল পুষিত, দাসব্যবসায়ের সুবিধার জন্য। Cattle-breedingএর ন্যায় Slave-breeding একটা লাভের ব্যবসায় ছিল। দাসদাসীর মূল্য স্ত্রীপুরুষ অনুসারে, বয়ঃক্রম অনুসারে ও অন্যান্য গুণাগুণ অনুসারে অল্প বা অধিক হইত। সামান্য নামমাত্র মূল্য হইতে তখনকার শত মুদ্রা পর্য্যন্ত মূল্যের পরিচয় পাইয়াছি। ইংরাজ কোম্পানীর হুকুমে ডাকাতি অপরাধে অপরাধী হতভাগ্যের মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীপুত্রকন্যা দাসত্বের শৃঙ্খল পায়ে পরিয়া সরকারী নিলামে বিক্রীত হইত। জেলের খরচ বাঁচাইবার জন্য আবশ্যক হইলে কয়েদীগণকে সুমাত্রাদ্বীপে নির্ব্বাসিত করা হইত অথবা দাসরূপে বাজারে বেচিয়া ফেলা হইত। (১) ফরাসী বা অন্যান্য কোম্পানীর আদেশ যে অন্যবিধ ছিল তাহা মনে হয় না। কারণ রোমান ক্যাথলিক পাদরী এই জঘন্য আধুনিক দাসব্যবসায়ের প্রবর্ত্তক। ফরাসী কোম্পানি রোমান ক্যাথলিক কোম্পানি এবং এদেশে রোমান ক্যাথলিক পরিবার মধ্যেই অধিক সংখ্যক দাসদাসী পোষিত হইত। হিন্দু গৃহস্থের ঘরে ক্রীত দাসদাসীর নিদর্শন কোথাও পাই নাই। কৃষাণ বা মজুর হিসাবে হিন্দুর ঘরেও হয়ত ক্রীতদাস ছিল কিন্তু গৃহসংসারের পরিচারিকা বা পরিচারক হিসাবে থাকা সম্ভব নহে। হিন্দুগণ অর্থের লোভে আগন্তুক খৃষ্টিয়ানগণের ও মুসলমানগণের দাসব্যবসায়ে সহায়তা করিতেন, সন্দেহ নাই; স্বয়ং ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দাসদাসী ক্রয় বিক্রয়ের শুল্ক আদায় করিতেন। কিন্তু তাঁহারা নিজে যে দাসদাসী পুষিতেন তাহার পরিচয় পাই নাই। মুসলমানগণ ক্রীত দাসদাসীর প্রতি অতিশয় সদ্ব্যবহার করিতেন। দাসবংশ রাজ তক্তে বসিয়াছিল,

---

esclaves et que vous avez donne ordre a M. Groiselle d'en acheter 300, au cas qu'ils soient mis en vente. Quoi que la compagnie nous ait precedemment ecrit d'envoyer, annuellement a l'Isle de Bourbon, que vingt esclaves indiens, sur la demande qui nous en serait faite par le Conseil de cette isle, et que le Conseil ne nous en ait point encore demande, ces 300 esclaves conviendront fort pour l'Isle de France ; il y a apparence qu'ils seront a bon marche. Vous le repartirez sur les differents batiments que vous expedierez du Gange, tant pour l'Isle de France que pour Pondichery.—Letter of Pondichery Council to that of Chandernagor, dated Fort Louis, Pondichery, 24th September 1735.

(১) The same 13th March, 1736.

(২) Le Conseil des iles nous demande soixante esclaves indiens des deux sexes, depuis l'age de quinze a vingt cinq ans ou trente au plus, nous vous prions de vouloir bien en acheter cette quantite, et de les faire passer aux Iles sur les differents vaisseaux qui y toucheront.—The same, dated 8th. September, 1751.

(৩) Anandaranga Pillai's Diary (Madras Govt. publication)—Vol. I. p. 227.

(১) Slavery Days in old Calcutta—Bengal Past and Present Vol. II. p. 271.

দাসী পাটরাণী হইয়াছিল, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দাসদাসীগণের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিলে পুণ্য আছে, ইহাই কোরাণের আদেশ। দাসী দাসশিশু প্রসব করিলে প্রভুর মৃত্যুর পর সে স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, ইহাই মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত বিধি। স্বধর্ম্মাবলম্বীকে মুসলমান ক্রীতদাস করিতে পারিতেন না। ক্রীতদাস মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সে সামান্য ভৃত্য মধ্যে পরিগণিত হইত; এইজন্য মুসলমান সমাজে নিগ্রো, খৃষ্টিয়ান বা হিন্দু ভিন্ন দাস থাকিতে পারিত না। দাস দাসীকে স্বাধীনতা দান করা মুসলমানের পক্ষে পুণ্য কর্ম্ম। মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়া অনেক মুসলমান দাসদাসীকে মুক্তি প্রদান করিতেন।

মুসলমানগণের মধ্যে প্রচলিত নীতির প্রভাব খৃষ্টিয়ানগণের উপর কিয়ৎ পরিমাণে পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আমি অনেকগুলি খৃষ্টানের পুরাতন উইল দেখিয়াছি, প্রত্যেকখানিতেই অন্ততঃ একজন দাস বা দাসীকে মুক্তি প্রদানের কথা আছে। দুই এক স্থলে প্রভু আপনার সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া মুক্ত দাসদাসীদিগকে দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মুসলমান যেমন মুসলমানকে ক্রীত দাস করিতে পারিত না, খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্যে সে স্বধর্ম্মানুরাগ ছিল না। তাহারা দাসগণকে খৃষ্টান করিয়া শুদ্ধ করিয়া লইত বটে কিন্তু দাসত্বের কোন ব্যত্যয় হইত না। খৃষ্টিয়ান সংসারে দাসগণ অনেক সময়ে অতি নৃশংস ব্যবহার প্রাপ্ত হইত, অতি সামান্য অপরাধের জন্য বেত্রাঘাত অতি সাধারণ শাস্তি ছিল, মাঘের শীতে উলঙ্গ করিয়া দাস বা দাসীর মস্তকে উপর্য্যুপরি বহু কলসী ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দেওয়া একটা আমোদজনক প্রক্রিয়া মধ্যে পরিগণিত ছিল।

দাস ক্রয় বা বিক্রয় করিতে হইলে সরকারকে একটা মাশুল দিতে হইত। ইংরাজ সরকার দাসপ্রতি ৪।০ চারি টাকা চারি আনা শুল্ক লইতেন। ফরাসী সরকার দাসখৎখানি লিখিবার কাগজের জন্য পাঁচ সিকা লইতেন এবং দাসদাসীর মূল্যের উপর শতকরা পাঁচ টাকা শুল্ক আদায় করিতেন। (১) এই পাকাপাকি রকমের ব্যবস্থা একটা পাকাপাকি রকমের ব্যবসায়ের সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু পাকা ব্যবস্থার মধ্যে একটা কাঁচা ব্যবহার থাকেই থাকে। আইন থাকিলে আইনের চক্ষে ধূলি দিবার উপায়ও উদ্ভূত হয়। আইন বহির্ভূত উপায়ে—তখনকার লোকের চক্ষে গর্হিত উপায়ে অর্থাৎ জোর করিয়া, চুরি করিয়া, সরকারকে বঞ্চিত করিয়া—দাসদাসী সংগ্রহ ও বিক্রয় এত অধিক মাত্রায় চড়িয়া উঠিয়াছিল যে ১৭৮৯ সালে চন্দননগরের তৎকালীন গবর্ণর মঁসিয়ে মন্টিগ্নি নিম্নলিখিত আজ্ঞা প্রচারিত করেন :—

"The Master Attendant of Chandernagore is directed to see that no native be embarked without an order signed by the Governor and all Captains of vessels trading to the port of Chandernagore are stictly prohibited from receiving any natives on board." (Seton Karr —*Selections from the Calcutta Gazette.* 1865.)

কিন্তু আইনসঙ্গত দাসব্যবসায় পূর্ব্ববৎই চলিতে থাকে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের আদেশে উহা সম্পূর্ণভাবে রহিত হয়।

শ্রীচারুচন্দ্র রায়—(প্রবর্ত্তক, ফাল্গুন ১৩২৮)

গ্রন্থ-সমালোচনা।

শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা—প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী ভাগবতাচার্য্য প্রণীত। শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা নামক পবিত্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া, আমরা যারপর নাই পরিতুষ্ট ও মুগ্ধ হইয়াছি। সংস্কৃত শ্লোকগুলির অন্বয় ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ প্রাঞ্জল। অনুবাদে মূল শ্লোকের ভাবার্থ কুত্রাপি পরিত্যক্ত হয় নাই, অধিকন্তু সর্ব্বত্রই তাহার সামঞ্জস্য ও সুসঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে। "তাৎপর্য্য" ভাগটুকু গ্রন্থের বিশেষত্ব।

ভাষা সৌন্দর্য্যে, ভাব গাম্ভীর্য্যে এবং বিচার-চাতুর্য্যে ইহা এক অভিনব জিনিষ হইয়াছে। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত রাসলীলার মূল শ্লোকগুলির তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা ও বিচার দেখিয়া মনে হয়, সাধক গ্রন্থকার, গোস্বামী মহাশয়, শৃঙ্গার রসোল্লসিত রাসলীলার অভ্যন্তরে মহামুনি শুকদেব গোস্বামীর তাত্ত্বিক ভাবটুকু স্বয়ং গ্রহণ করিয়া পাঠককে উহা উপলব্ধি করাইয়াছেন।

বাহ্য শৃঙ্গার রসের আবরণ দেখিয়া যিনি রাসলীলাকে অশ্লীল মনে করেন, এই তাৎপর্য্যভাগ ধীর ভাবে পাঠ করিয়া, তিনি বহুকাল পুষ্ট মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন এবং জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত স্বীয় সাধন পথের সন্ধান পাইয়া নিজেকে সার্থক ও ধন্য মনে করিবেন।

নিঃসন্দেহে বলিতে পারি ইহা পাঠে উন্মার্গগামী হিন্দু নিষ্ঠাবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া উঠিবে। বাঙ্গালীর ঘরে গ্রন্থখানি গৃহ-পঞ্জীর ন্যায় রক্ষিত হউক, ইহা আমাদের আন্তরিক কামনা।

(১) Schedule of taxes for 1732, a manuscript in the French Government archives.

১৯শ ভাগ] } জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ { [৪র্থ সংখ্যা

ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে ভারতের কথা।

(আলেকজাণ্ডার পোপ)

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ, বি-এল]

আলেকজাণ্ডার পোপ ব্যঙ্গ-কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যে সময়ে তিনি কাব্য-জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ে ইংলণ্ডীয় সমাজ বিলাসিতার পঙ্কে নিমজ্জিত। সেক্ষপীয়রের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া শত বর্ষের মধ্যে বাণিজ্যের কৃপায় ইংরাজ জাতি প্রভূত ধনশালী হওয়াতে তাঁহাদের সমাজে যে সকল দুর্নীতি দেখা দিয়াছিল, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কবি পোপ সারা জীবন সংগ্রাম করিয়াছিলেন। ১৭৩২ হইতে ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি নীতিবিষয়ক যে সকল পদ্যময় রচনা (Moral Essays) প্রকাশিত করিয়াছিলেন ও রোমান কবি হোরেসের অনুকরণে যে সকল ব্যঙ্গ-কবিতা (Satires) লিখিয়াছিলেন, সেগুলি মনোহর মিত্রছন্দে পত্রাকারে সমসাময়িক খ্যাতনামা ব্যক্তিগণকে সম্ভাষণ করিয়া রচিত হইয়াছিল। নীতিবিষয়ক উক্ত রচনায় পোপ বলিয়াছেন যে, বৃটিশ শিল্পীর কর্ম্মশালায় তৈয়ারী কাপড়ের প্রকাণ্ড বস্তাসকল দ্বার অবরুদ্ধ করিয়াছে। "Huge bales of British cloth blockade the door."—(Moral Essays, Epistle III)। পরমুখপ্রেক্ষী ভারতবাসী এই চিত্রের মর্ম্ম যেমন সহজে বুঝিতে পারিবে অপরে সেরূপ পারিবে না। কবি ইংলণ্ডের বাণিজ্য বৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া একস্থানে লিখিয়াছেন যে, দারিদ্র্যের হাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত বণিকেরা সুদূর ইণ্ডিজে গমন করিয়া থাকেন।

> "To either India see the merchant fly,
> Scared at the spectre of pale poverty !
> See him, with pains of body, pangs of soul,
> Burn through the Tropic, freeze beneath the pole !"
>
> (*Satires*)

কবি ভারতবর্ষের রৌদ্রে এত কষ্ট সহ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি এইপ্রকার উন্মাদ বাণিজ্যের প্রতিভূগণকে বুদ্ধিহীন ও অর্থদাস বলিয়া ঘৃণা করিয়াছেন।

> "Advance we, then, what earth's low entrails hold,
> Arabian shores, or Indian seas infold ;
> All the mad trade of fools and slaves for gold ?"
>
> (*Satires*)

এই শ্লোক পাঠ করিয়া মনে হয় যে, পোপের সময়ে ইংরাজবণিক ভারত-সমুদ্র ছাঁকিয়া মুক্তা সংগ্রহ করিতে-

ছিলেন। ভারতবর্ষে উৎপন্ন গন্ধদ্রব্যের কথা অন্যান্য ইংরাজ কবির ন্যায় পোপ একাধিকবার বলিয়াছেন।

"Is wealth thy passion? Hence! from pole to pole,
Where winds can carry, where waves can roll,
For Indian spices, for Peruvian gold,
Prevent the greedy, and out-bid the bold:"—(ঐ)

বিলাতি কাপড়ের বিনিময়ে ইংরাজ বণিক ভারতবর্ষ হইতে যে কেবল গন্ধদ্রব্য স্বদেশে লইয়া যাইতেন তাহা নহে। ভারতের মণিমাণিক্য ও হস্তিদন্তে নির্ম্মিত মূল্যবান দ্রব্য সকলও বিলাতে রপ্তানি হইত। ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিয়া জানা যায় যে, ইংরাজেরা রাণী এলিজাবেথের সময়ে বালিশ ও তাকিয়ার ব্যবহার সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ করেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা একখণ্ড স্থূল, গোলাকার কাষ্ঠের উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন। পোপের সময়কার একজন বিলাসিনীর প্রসাধন ক্রিয়া ও দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যাদি দর্শন করিয়া কবি "কেশগুচ্ছের প্রতি বল প্রয়োগ" (Rape of the Lock) নামক সুবিখ্যাত কবিতায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ভারতের শিল্পসম্ভার ও ধনরাশি যে বিদেশে তৎকালে বহুল পরিমাণে রপ্তানি হইতেছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

"This casket India's glowing gems unlocks,
And all Arabia breathes from yonder box;
The Tortoise here and Elephant unite,
Transform'd to combs, the speckled, and the white."
(*Rape of the Lock*, ১ম সর্গ, ১৩৩)

ভারতবর্ষে তৈয়ারী সুন্দর কারুকার্য্যময় কাষ্ঠের দেরাজের উল্লেখ কবি অন্যত্র করিয়াছেন।

"She, while her lover pants upon her breast,
Can mark the figures on an Indian chest;
And when she sees her friend in deep despair,
Observes how much a chintz exceeds Mohair."
(*Moral Essays*)

ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, চিণ্টজ (chintz) অর্থাৎ ছিট কথাটি ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজি ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বঙ্গদেশ হইতে ছিট ও সূতীকাপড় বিলাতে রপ্তানি হইত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পোপের কাব্যে অন্যান্য কথার উল্লেখের পূর্ব্বে সন্দেহ ভারতবাসীর একখানি ক্ষুদ্র চিত্রের প্রতি পাঠক একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবেন কি? "Asleep and naked as an Indian lay" (Moral Essays)। কবি পোপ ইংলণ্ডীয় সমাজ লইয়া এত ব্যস্ত ছিলেন যে, তিনি ভারতবাসীর সম্বন্ধে কোনও সঠিক তথ্য সংগ্রহ করিবার অবসর পান নাই। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে রচিত "যশের মন্দির" (The Temple of Fame) নামক কবিত্বময় রচনায় পোপ ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা যে ভুল সে কথা তাঁহার কাব্যের টীকাকারেরা (এলউইন ও কোর্টহোপ) স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

"The Eastern front was glorious to behold,
With di'mond flaming and barbaric gold.
There Ninus shone, who spread th' Assyrian fame,
* * * *
And Brachmans, deep in desert wood revered.
These stopped the moon, and called th' unbodied shades
To midnight banquets in the glimm'ring glades;
Made visionary fabrics round them rise,
And airy spectres skim before their eyes;
Of talisman and sigils knew the pow'r,
And careful watched the planetary hour."
(*The Temple of Fame*)

"স্বর্ণ ও উজ্জ্বল হীরকে মণ্ডিত যশের মন্দিরের পূর্ব্বাংশ দেখিতে অতি সুন্দর। সেখানে ব্রাহ্মণেরা বিজন কাননাভ্যন্তরে পূজিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা গভীর রাত্রে চন্দ্রের গতিরোধ করেন এবং প্রেতাত্মাগণকে বনভূমির মধ্যে চন্দ্রালোকে আলোকিত উন্মুক্ত স্থানে ভোজের আসরে আমন্ত্রণ করেন। তাঁহারা চারিদিকে স্বপ্নময় অট্টালিকা সৃষ্টি করেন এবং বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট প্রেতগণ তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে উড়িয়া ভাসিয়া যাইতে থাকে। তাঁহাদের রক্ষাকবচ ও ঐন্দ্রজালিক লিখনের প্রভাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে এবং তাঁহারা গ্রহগণের কাল অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেন।" ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে এই বর্ণনা পোপ যে কোথায় পাইয়াছেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন। তবে, তান্ত্রিক ও জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের সম্বন্ধে হয়ত কবি যাহা শুনিয়াছিলেন এই শ্লোকে তাহার আভাষ দিয়াছেন। গঙ্গা নদীর সম্বন্ধেও যে কবির বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। "উইণ্ডসর বন" (Windsor

Forest) নামক কবিতায় পোপ কতকটা অবজ্ঞার সহিত গঙ্গার উল্লেখ করিয়াছেন। এই কবিতা ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

"Let barb'rous Ganges arm a servile train,
Be mine the blessings of a peaceful reign."
(*Windsor Forest*)

এই শ্লোকে পোপ গঙ্গার নিন্দা করিয়াছেন বটে, কিন্তু গঙ্গা বাস্তবিক বর্ব্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ নহে। য়ুরোপে মারলবরোর যুদ্ধের পর শান্তির উদ্দেশে এই কবিতা রচিত হইয়াছিল। তৎকালে ইংরাজেরা বঙ্গদেশে গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থানে নবাবের অত্যাচার হইতে তাঁহাদের সত্ব রক্ষা করিবার জন্য সিপাহী সৈন্য সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই জন্য কবির ভাষায় পোপ শান্তিপ্রিয় টেমসনদীর সুখ্যাতি করিবার পর গঙ্গার নিন্দা করিয়াছেন। কবির স্বদেশ-প্রীতির জন্য তাঁহার দোষ মার্জ্জনীয়। ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের অধিকার যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল তাহার প্রমাণ এই কবিতার আর একস্থানে পাওয়া যায়। কবি ওক্ (oak) বৃক্ষের সহিত ভারতের উদ্ভিজ্জের তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন—

"Let India boast her plants, nor envy we,
The weeping amber, or the balmy tree,
While by our oaks the precious loads are borne,
And realms commanded which those trees adorn."

"ভারত তাহার উদ্ভিজ্জের জন্য গর্ব্বিত হউক, আমরা তাহার সুরভি বৃক্ষনির্য্যাসের জন্য ঈর্ষান্বিত নহি। আমাদের ওক্ কাষ্ঠে নির্ম্মিত জাহাজ ঐ মূল্যবান দ্রব্যের ভার বহন করে এবং যে সকল দেশ উল্লিখিত সৌরভযুক্ত বৃক্ষদ্বারা সুশোভিত সেই সকল দেশ আমাদের ওক্ বৃক্ষ শাসন করে।" আমরা বাণিজ্যের যুগ হইতে এক্ষণে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যের তলে তলে ইংরাজের ও ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের প্রবাহ যে কি ভাবে বহিতেছে তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি।

কবি পোপ গঙ্গা নদীর উল্লেখ আর এক স্থানে করিয়াছেন। "Or drink of Ganges in their eastern grounds." (The First Book of Statius's Thebais)। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে পোপ "থিবস" নামে গ্রীক পৌরাণিক কাব্যের যে পদ্যময় অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহাতে গঙ্গার উল্লেখ থাকিবার কারণ এই যে, মূল গ্রীক কাব্যে গঙ্গার কথা আছে। ষ্টাটিয়াস নামে গ্রীক কবি (৬১-৯৬ খৃষ্টাব্দ) এই কাব্য রচনা করেন। গ্রীক ভাষা হইতে ইংরাজি ভাষায় অনূদিত কাব্য বিশেষের আলোচনায় সময়ে সময়ে গ্রীক সাহিত্যে লিখিত ভারতের নানা কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহাতে মনে হয় যে, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ য়ুরোপের প্রাচীনতম সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। পোপের জীবদ্দশায় যাঁহারা তাঁহার স্তুতিবাদ করিয়া কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ফ্রান্সিস নাপের নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য। এই কবি ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে পোপের উদ্দেশে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতের কথা স্থান পাইয়াছে। কবি নাপ আমেরিকা হইতে যে কবিতা লিখিয়া ইংলণ্ডে পোপকে পাঠাইয়া দেন, তাহা পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, প্রাচ্যের পণ্যদ্রব্য ইংরাজ বণিকের কর্ম্মকুশলতায় সুদূর আমেরিকার বাজারেও বিক্রীত হইত।

"The Eastern pomp had just bespoke our care,
And India poured her gaudy treasures here:
A various spoil adorned our naked land,
The pride of Persia glittered on our strand,
And China's earth was cast on common sand."
(*To Mr. Pope*)

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে ভারতবর্ষ পারস্য ও চীনদেশ হইতে ইংরাজ বণিক উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান দ্রব্য সকল লুণ্ঠন করিয়া ব্যবসার জন্য আমেরিকায় লইয়া যাইতেছিলেন, একথা এই কবি যেরূপ স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে, প্রাচ্যের উক্ত দেশগুলির নাম তৎকালে আমেরিকায় না হউক; কিন্তু ইংলণ্ডের প্রতি গৃহে কোনও না কোনও দ্রব্যের সহিত জড়িত হইয়া সমসাময়িক ইংরাজ-কবির কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছিল। যেকলে তাঁহার সুবিখ্যাত ইংলণ্ডের ইতিহাসে এই সময়কার ইংলণ্ডীয় সমাজের অবস্থা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন—"And

was it not a shame to see a gentleman whose ancestors had worn nothing but stuffs made by English workmen out of English fleeces flaunting in a calico shirt and a pair of silk stockings from Moorshedebad ?"—"যখন আমরা মনে করি যে, একজন ইংরাজ ভদ্রলোক যাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বিলাতি পশুর লোম হইতে ইংরাজ শিল্পী দ্বারা প্রস্তুত কাপড় ব্যতীত অপর কোনও কাপড়ে দেহ ঢাকিয়া রাখিতেন না, তিনি নির্লজ্জভাবে মুরশিদাবাদ হইতে ইংলণ্ডে আমদানী সুতী কাপড়ে প্রস্তুত জামা ও রেশমের মোজা ব্যবহার করিতেছেন, তখন কি আমরা লজ্জিত হই না ?" বাস্তবিক, বৃটিশ শাসন এদেশে আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতের ধনরত্নাদি ও এদেশে প্রস্তুত নানাপ্রকার মূল্যবান দ্রব্য ও নিত্য ব্যবহারোপযোগী জিনিষ যে ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর অধিক পরিমাণে ইংরাজ বণিকেরা লইয়া যাইতেছিলেন, ইংরাজি কাব্য-সাহিত্য তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমরা সেক্সপীয়রের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যের ভিতর দিয়া যতই অগ্রসর হই, বাণিজ্য সূত্রে ইংলণ্ডের সহিত ভারতের আত্মীয়তা ততই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছে দেখিতে পাই। পোপের কাব্যে পাঠক কোথাও ভারতজাত গন্ধদ্রব্যের সৌরভ আঘ্রাণ করেন, কোথাও বা এদেশের মণিরত্নাদির উজ্জ্বল আভায় তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া যায়, আবার কোথাও চারু-শিল্পের নিদর্শন দেখিয়া ভারতের অতীত গৌরবের কথা তাঁহার স্মৃতি-মন্দিরে জাগিয়া উঠে। পোপের সময়ে ভারতবর্ষ ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যের আসরে জাঁকিয়া বসিয়াছিল। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে পোপ পরলোকগমন করেন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে পলাশির যুদ্ধে ইংরাজেরা জয়লাভ করিয়া ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, পোপের পরবর্ত্তী যুগের ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পতিতার ছেলে।

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(৪)

রাগে ফুলিতে ফুলিতে বাড়ী আসিয়া গণেশ ডাকিল —"মা।"

যোগমায়া তখন রন্ধন করিতেছিলেন। তাহার ডাক শুনিতে পাইলেন না, তিনি তরকারী ভাজিতেছিলেন, ছ্যাঁক-ছ্যাঁক শব্দে তাঁহার কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গিয়াছিল।

উঠানে দাঁড়াইয়াই গণেশ চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ও পোড়ারমুখী—হতভাগি, আমার কথা কাণে যাচ্ছে না বুঝি ?"

এবার যোগমায়া শুনিতে পাইলেন। তরকারীটা চড়াইয়া হাত ধুইয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে, অত চেঁচাচ্ছিস কেন ? বাড়ীতে যেমন এসেছে, অমনি যেন ষাঁড় খওয়াচ্ছে।"

মুখ খিঁচাইয়া গণেশ বলিল, "না, চেঁচাব কেন ? আমার বড় টল মার্ব্বলটা তেনাকে দেওয়া হয়েছে কেন ?"

যোগমায়া বলিলেন, "দিয়েছি তাতে হয়েছে কি ?"

"হয়েছে কি ? অশ্রু আসিয়া কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল— আমার জিনিষ কেন তুমি পরকে দেবে—কেন দেবে তুমি ? যত কিছু বলিনে তত আস্পর্দ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। সেদিন অমনি করে আমার ঘুড়িটা দিয়ে দিলে অভয়কে। কেন দিলে তুমি—"

হঠাৎ যোগমায়া দীপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "দিয়েছি বেশ করেছি, করবি কি তুই তা'তে ?"

"করব কি ?" গণেশের দাঁত দাঁতের উপর কিড়মিড় করিয়া উঠিল, সে কি একটা কথা বলিয়া উঠিল বুঝা গেল না। যোগমায়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "কি বলছিস ?"

গণেশ বলিয়া উঠিল, "আমি এই চললুম বাড়ী হ'তে, আর কখনও এ বাড়ীতে আসছি নে।"

যোগমায়া বলিলেন, "যাবি যা না, কে ধরে রাখছে তোকে? আমিও তো তাই চাই। এই তিনটে বছর তোকে রেখে হাড় মাস জলে গেল আমার, দূর হয়ে যা, এক্ষুনি যা। পাড়ার লোকের নিত্যি কথা শুনব, সমাজের লোকের কথা শুনব, আবার উল্টে তুইও কথা বলবি? নেমকহারাম ছেলে কোথাকার, মনে করে দেখছিস নে তোর জন্যে আমি কতটা কথা—কতটা অবহেলা না সহ্যি করছি? যাবি যা, দূর হ, আমার হাড় জুড়ুক।"

যোগমায়ার মুখে এমন কথা গণেশ কখনও শুনে নাই, সে তাই বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল—এবং কে যে এ কথাটা যোগমায়াকে শিখাইয়া দিল তাহাই ভাবিতে লাগিল। তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, কাল রাত্রে যে লোকটা যোগমায়ার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল, সেই এ সব কথা শিখাইয়া দিয়া গেছে। যোগমায়ার বক্ষ সে মাতৃস্নেহ শূন্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। বটে, এতদূর স্পর্দ্ধা তাহার, সে তাহার মাকে কাড়িয়া লইতে চায়? তাহাকে জব্দ করিতেই হইবে, যেমন করিয়াই হউক।

মনের মধ্যে এই সঙ্কল্পটা লইয়া সে ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। যোগমায়া বকিতে বকিতে গিয়া আবার রন্ধনে বসিলেন।

"কি হচ্ছে মা, রান্না এখনও শেষ হয় নি?"

তেনার মা আসিয়া রন্ধনগৃহের দরজার উপরে বসিল। এই স্ত্রীলোকটাই ছিল যোগমায়ার দক্ষিণ হস্ত। বাজার হাট করা, অবসরমত গৃহের দু' চারটী কাজ করা, সেই করিয়া দিত। আজ সে মুসলমান পাড়ায় জামাইতে গিয়াছিল, যোগমায়া আলু কিনিতে দিয়াছিলেন, কামাইয়া সেইখানকার ঘাটেই স্নান করিয়া আলু কিনিয়া আনিয়াছে।

যোগমায়া ব্যাপৃতভাবে তরকারী নাড়িতে নাড়িতে তাহার দিকে না চাহিয়াই বলিলেন, "হচ্ছে আমার মাথা মুণ্ডু। আর ভাল লাগে না বাপু, আর এ দেশে থাকব না। অনেকদিন হতেই গুরুদেব লিখছেন কাশী যেতে, এবার আর বাধা মানব না। সব বেচে কিনে কাশী চলে যাব।"

গণেশের উপর যখনই তাঁহার রাগ হইত, তখনই তিনি কাশী যাইবার কথা বলিতেন। তেনার মা তাহা জানিত বলিয়াই বলিল, "আজ আবার কি হল?"

যোগমায়া বলিলেন, "হবে আমার মাথা। ভাল আপদ হয়েছে আমার, বালাই মরেও যদি সকল আপদ যায়। নিজের পেটের ছেলেটাকে শ্মশানে শোয়াতে পারলুম, এটাকে আর পারব না?"

তেনার মা কি বলিবে প্রথমটা ঠিক করিতে পারিল না, তাহার পর একটু হাসিয়া বলিল, "ছেলেমানুষ মা, কি বলতে কি বলে ফেলে, কিছু কি ঠিক আছে তার? এই আমার তেনা—যা না তাই বলে বসে। রাগ হয় যখন, খুব মারি, শেষে আবার নিজেই কেঁদে মরি। তা মা, ছেলে পুলের কি মাথার ঠিক আছে? তা না হ'লে আর—"

যোগমায়া তরকারী চড়াইয়া দিয়া সরিয়া বসিলেন। রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আর মা, সবাই জ্বালিয়ে মারলে। যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। ওই হতভাগা ছোঁড়ার জন্যেই না সব। তুই সত্যি বল দেখি তেনার মা, আজ যে সমাজে একঘরে হয়ে আছি, সে কার জন্যে? ওই হতভাগা ছোঁড়াটা যে কি কাল হয়ে এসেছে আমার, তা আমি বলতে পারি নে।"

তাঁহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল; তিনি একটু থামিয়া বলিলেন, "কতখানি আঘাত আমি যে ওর জন্যে সহ্যি করছি, তা কি বুঝছে ও? কেন যে মরতে ওকে তুলে নিলুম—"

তেনার মা বলিল, "সে তো ভালই করেছেন মা। ছেলেটা যে না খেয়ে মরে যেতো। গাঁয়ে এত লোক থাকতে—"

বাধা দিয়া যোগমায়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তুই আর কথা বলিস নে বাছা গাঁয়ে লোক তো সবাই ছিল, কেউ তো একবার ফিরেও চাইল না। এই যে ছেলেটা আমার কাছে আছে, একি কারও সহ্যি হচ্ছে? ভগবানের

চোখে কে ছোট বড় বল দেখি? জাত অজাত আবার কি? যতদূর সম্ভব মেনে চললুম, বাস, ফুরিয়ে গেল। প্রতি পদে যেখানে এত ভয়, সেখানে মানুষ বাস করতে পারে কি? হাড়ি নয়, বাগদি নয়, চাঁড়াল কি মুসলমান নয়, কায়েতের ছেলে, তাতে ছোট ছেলে, ওর মধ্যে কি আছে যে যাতে ছোঁব না? আমার মধ্যেও যে আছে, ওর মধ্যেও তো সেই আছে। এ সব কথা বুঝবে কে—জানিবে কে? আমি কি সাধে ওর 'পরে রাগ করি রে? কতখানি ওকে ভালবেসেছি আমি, তা আর তোরা কি জানবি? আমার মনে হয়, সেই আমার ফিরে এসেছে। সে দেহে সে আমায় মা বলে বেশী দিন ডাকতে পার নি, এই দেহে তাই ডাকতে এসেছে। আমি তাকে দূর দূর করি, কথায় কথায় মারি—কেন? সে কি এদের কথার জন্যেই নয়? এরা আমায় দিন রাত পুড়িয়ে মারছে যে।"

তাঁহার চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল। ব্যস্ত হইয়া তেনার মা বলিল, "কাঁদবেন না মা, লোকের কথায় অনর্থক চোখের জল ফেলছেন কেন? যে যা বলছে, বলুক গে যাক না কেন, আপনি নিজের কাজ করে যান, ফুরিয়ে গেল। ঈশ্বর তো সবই দেখছেন—সবই জানছেন।"

যোগমায়া চোখ মুছিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "তা বই আর উপায়ই বা কোথায়? লোকে যে যাই করুক, সব সহ্যি করে যেতেই হবে। বুকে বাঁশ দিয়ে ডললেও যে কথা বলবার যো নেই। সমাজের চোখে বড় কঠিন দোষে দোষিণী যে আমি, আমার অপরাধের শাস্তি নেই। ব্রাহ্মণের ছেলেরা সাহেবের হোটেলে খানা খেয়ে এসে পরম হিন্দু হয়ে সমাজের নেতা হ'তে পারেন, তাঁরাই আবার বিধান করেন। এমন কেউ কি নেই যে হিন্দু সমাজকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারেন, এই কুসংস্কারগুলো দূর করে দিতে পারেন?"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি নীরব হইলেন। তেনার মা আস্তে আস্তে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল, যোগমায়া আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যাচ্ছিল বুঝি—যা। নীলাম্বর ঠাকুরপোর মেয়ের বিয়ে হচ্ছে বুঝি কাল?"

তেনার মা বলিল, "হ্যাঁ—কালই তো। আপনি যাবেন না মা?"

যোগমায়া বলিলেন, "আমার যাবার পথ কই বল দেখি? আমি নিজেই যে আমার পথ বন্ধ করেছি ছেলেটাকে নিয়ে। ঠাকুরপো তবু জোর করে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল, আমি কেমন করে যাই বল দেখি—সেখানে আমি গেলে একটা মহা অনর্থ ঘটে যাবে।"

তেনার মা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা তো ঠিকই মা। যেখানে জাত নিয়ে কথা, সেখানে না যাওয়াই ভাল। সকলকে নিয়ে জড়িয়ে মরার চেয়ে একা মরাই ভাল।"

কিন্তু যোগমায়ার মনে সে কথা প্রবেশলাভ করিল না। কাল বিবাহ, তিনি যেখানে কর্ত্রী হইয়া রন্ধনাদি করিতে পারিতেন, নিজের হাতে দশ জনকে পরিবেশন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন, সেখানে যে যাইতে পারিবেন না, এই ক্ষোভে তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

তেনার মা বলিল, "তরকারী ওদিকে পুড়ে উঠছে মা, নামান, আমি যাই।"

যোগমায়া তরকারী নামাইয়া বলিলেন, "দেখ গে যা তো মা, সে হতভাগা ছোঁড়া রাগ করে কোথা চলে গেল। যদি তাকে পথে দেখতে পাস, পাঠিয়ে দিস। খাবার সময় বয়ে গেল, রাগ করে কোন্ চুলোয় বেরুল ঠিক নেই তার। আমার হাড় মাস কালি হয়ে গেল ওই দুরন্ত ছেলেকে নিয়ে। আর পারিও না বাপু। ভগবান কবে যে আমায় নেবেন, আমার হাড় জুড়োবে, আমি বাঁচব।"

তেনার মা চলিয়া গেল।

(৫)

প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড সামিয়ানা পড়িয়াছে, বাড়ী ঘর জিনিস পত্রে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু গুছাইয়া তুলিয়া রাখিবার লোক কেহই নাই। আজ এক বৎসর মাত্র হইল নীলাম্বরের পতিব্রতা স্ত্রী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সংসারে এই একটী মাত্র কন্যা আর একটী মাত্র ছেলে ব্যতীত তাঁহার আর কেহই ছিল না। ছেলেটী কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি

কলেজে বি-এ পড়িত, ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে দেশে আসিয়াছে।

নীলাম্বরের মনে খুব আশা ছিল যোগমায়ার সাহায্যে তিনি এ দায় হইতে মুক্ত হইয়া যাইবেন। যোগমায়ার হাতে গৃহস্থালী ছাড়িয়া দিয়া তিনি বাহিরের দিক্ দেখিবেন এই তিনি জানিতেন। হঠাৎ সেদিন যখন যোগমায়ার মুখে শুনিলেন, তিনি বিবাহের সংস্রবে থাকিতে পারিবেন না, সেদিন যথার্থই তাঁহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল।

জিনিস পত্র অফুরন্ত, কিন্তু সব অ-গোছালো। কোন্‌টা কোথায় পড়িয়া আছে তাহার ঠিক নাই। দুই একজন বর্ষীয়সি তত্ত্বাবধারণ করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নিজেদের বাড়ীতে জিনিস রওনা করিতেই ব্যস্ত, কারণ এমন ভাবে দু'হাতে লুটিয়া লইবার স্বর্ণ সুযোগ বড় একটা কপালে জুটিয়া উঠে না।

গ্রামের রাম খুড়ো, তারিণী দাদা, কালী মামা, শ্যাম ঠাকুর—প্রভৃতি মাতব্বর সমাজের নেতৃবর্গ বিবাহবাড়ী জমকাইয়া বসিয়াছেন। তাঁহাদের তামাক যোগাইতে যোগাইতে নীলাম্বরের ভৃত্য শঙ্কর পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে।

যুবক সত্যেশ এ সব আদতে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। এই যে লোকগুলি আসিয়া বাড়ী জাঁকাইয়া বসিয়াছে, কেবল তামাকের ধ্বংস করিতেছে, ও কোথায় কাহার ছেলে বিলাত গিয়াছে, কে মুসলমানের হাতের চা খাইয়াছে, কাহার কন্যা কুলত্যাগ করিয়াছে, কাহার পুত্রবধূ ভ্রষ্টা, এই সব সমালোচনা গভীর ভাবে জমাইয়া তুলিতেছে, ইহাদের উপর সে একেবারে চটিয়া উঠিয়াছিল। তবে নাকি তাহারা ধরিতে গেলে এ গ্রামে বিদেশী, এখানকার রীতি নীতি জানে না এবং মাথার উপর বেশী দায় বিবাহ, তাই চুপ চাপ করিয়া রহিয়াছে।

নীলাম্বর শুষ্ক মলিন মুখে কেবল দেখিয়া যাইতেছেন। যেখানে ভিয়ান হইতেছিল, সেখানে অনেকগুলি ছেলে মেয়ে জটলা বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাম খুড়োর দৃষ্টি সে দিকে পড়িতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আরে সর্ব্বনাশ, নীলাম্বর—ও ছোঁড়াটাকে আসতে দেছ কেন? দূর করে দাও—দূর করে দাও। গাঁয়ের কেউ যদি জানতে পারে, একটা মহা হৈ হৈ কাণ্ড বেধে যাবে এখনি।"

নীলাম্বর গণেশের পানে একবার তাকাইয়া বলিলেন, "কেন? ও ছেলেটা থাকলে কি হবে?"

তারিণী মুখোপাধ্যায়—তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুটা বুজাইয়া বলিলেন, "কি হবে? আরে, তুমি তো জানছই সব। ওইটেই যে সেই ছেলেটা—যার মা কুলত্যাগ করে গেছল। মাগী শেষে খেতে না পেয়ে পথের ধারে পড়ে মরে—"

সত্যেশ গণেশের কথা আগাগোড়াই শুনিয়াছিল, একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "কেন—আপনারা এত লোক গ্রামে থাকতে একটা লোক খেতে না পেয়ে মরে গেল—তাকে দুটো খেতে দিলেই তো পারতেন।"

তারিণী মুখুর্য্যে বিকট মুখভঙ্গী করিয়া দক্ষিণ হস্ত আন্দোলন করিয়া ঘৃণার সুরে বলিলেন, "আরে রামঃ; কুলটা—যে কুল ত্যাগ করে গেছে, তাকে খেতে দেওয়া পাপের প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। সে মরেছে—ভালই হয়েছে, পাপের বোঝা পৃথিবীর বুক হ'তে কতকটা সরে গেছে। খেতে দিয়ে বাঁচালে, আরও কত পাপ করত, তা কেউ কি ঠিক করতে পারে?"

নিধু গাঙ্গুলী একটা হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে বলিলেন, "ঠিক কথা বলেছ খুড়ো, মাগী আবার আমার কাছে কাঁদতে গেছল, ছেলেটাকে চারটী খেতে দাও। আমি বললুম—বরং কুকুরকে পেট ভরে খাওয়াব, তবু তোমাদের একটা দানা দেব না, ওতে কেবল পাপের প্রশ্রয় দেওয়া বই তো নয়।"

শ্যাম বসু বলিলেন, "যখন বেরিয়ে গেছল, তখন এটা মনে করে বেরুতে পারেনি যে এমন দিন আসতে পারে? আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে মাগী যেদিন মরে তার আগের দিন বলছিল, ছেলেটার একটা গতি করতে। ওই বেশ্যের ছেলের গতি আমি করব? আমি হচ্ছি সমাজের একটা কর্ত্তা, আমিই যদি এরকম করে পাপের প্রশ্রয় দেই, অন্য লোকে করবে না কেন? আমি সেদিন মনের সাধ মিটিয়ে মাগীটাকে খুব বকেছিলুম। খুব কাঁদতে লাগল—বলে, একবার ভুলে একটা কাজ করেছি আমায়

মাপ করুন। আরে মাগী—একবার ভুলও যা, দশবার ভুলও তাই। এ কি আর যে সে কথা? পুরুষদের পক্ষে খাটে না বটে, কিন্তু, মেয়ে—আরে বাপরে!"

উষ্ণ প্রকৃতি সত্যেশ আর সহিতে পারিতেছিল না, বলিল "কেন মশাই, মেয়ে বলে তার কি জগতে কোন অধিকার থাকতে পারে না? পুরুষেরা অবাধে অত্যাচার করবে, পীড়ন করবে, তারা কি শুধুই নীরবে বুক পেতে নেবে তাই? আমরা শত সহস্র দোষ করি, তাতে ক্ষমা পেয়ে যাব, মেয়েরা কি ক্ষমা পেতে পারে না?"

বিস্ফারিত চোখে তাহার পানে চাহিয়া তারিণী মুখুর্য্যে বলিলেন, "কে হে তুমি? সমাজের আচার বিচার কিছু জান না দেখছি। কলেজের ছেলে তোমরা, রক্তটা গরম, মেয়ে পুরুষ সকলকেই সমান চোখে দেখ। তোমাদের জন্যেই তো আমাদের সোণার সমাজ অধঃপাতে গেল। যত সব বিলিতি দৃষ্টান্ত এনে ফেলছ সমাজের মধ্যে; মেয়ে পুরুষ সব স্বেচ্ছাচারী করে তুলছ। জানি, আমরা মরে গেলে সমাজের চিহ্নমাত্র থাকবে না। তোমাদের হাতে সমাজ পড়লে সমাজের যা হবে তা জানতে পারছি।"

সত্যেশের হাসি আসিতেছিল, সামলাইয়া লইয়া বলিল "তা সত্যি, আমাদের হাতে সমাজ যেদিন পড়বে, আমরা সেদিন এ সমাজকে ভেঙ্গে চুরে আমাদের মনের মতন করে গড়ে তুলব। আপনাদের সমাজ আমরা বজায় রাখব না যে, এ কথা ঠিক। আপনাদের সমাজের মধ্যে যে কুসংস্কার জেগে রয়েছে আমরা তাকে ঘৃণা করি। সেই যে স্ত্রীলোকটি—বাস্তবিক যে একবার ভুলে একটা কাজ করে ফেলে যথার্থ অনুতপ্ত হয়েছিল, তার সেই ভাঙ্গা বুকে আরও আঘাত করাটাকে আপনারা পৌরুষ বলে মনে করেন, এতে আপনাদের সমাজ সজীব থাকবে মনে করেন? আমরা যে সমাজ গড়ে তুলব তাতে ওই সব পতিতা নারীকে তুলে নেব, তাদের ভুল শুধরাব। আপনারা এটা বুঝতে পারেন না, একবার ভুল করে যে আবার ফিরে আসতে চায়, তাকে তাড়িয়ে দূরে দেওয়াটাই পাপের প্রশ্রয় দেওয়া। আপনারা বুঝতে পারেন না সে অনুতপ্ত হয়েই ফিরে এসেছে, তখন গ্রহণ না করে, তাকে যদি কেবল ঘৃণা করা যায়, সেই ঘৃণাটাই তাকে যথার্থ নরকে ফেলে দেয়। এই সমাজের উপর রাগ করেই তারা তফাতে সরে যায়। হিন্দু সমাজের এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা সমাজে থাকলে সমাজের অনেক উন্নতি কত্তে পারতেন কিন্তু আপনারা ঘৃণা করে তাঁদের এত দূরে রেখে চলেছেন যে তাঁরা এ সমাজ হ'তে সরে গিয়ে ব্রাহ্ম কি খৃষ্টান সমাজভুক্ত হয়ে সে সমাজের অশেষ উন্নতি সাধন করছেন। তাঁদের কাছ হ'তে সাহায্য পেলে আমাদের সমাজ কতদূর উন্নতি লাভ করত তা আপনারা দেখছেন কই? আপনাদের গোঁড়ামীতেই সব মাটী করছেন, আপনাদের সমাজকে উঠিয়ে ফেলবার পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। এ কি সেই হিন্দু সমাজ—যা আমাদের বহু পূর্ব্বকালে ছিল? সে সমাজ ভেঙ্গে গেছে, তার ছায়াটাকে ধরে গোটাকত মনগড়া সংস্কার তৈরি করে আপনারা সেই সমাজের দোহাই দিয়ে পড়ে আছেন। পদে পদে অশুচি পাপ কল্পনা করে শিউরে উঠছেন। আমরা আবার সেই হিন্দু জাতি গড়ে তুলব, সেই সমাজ গড়ে তুলব।"

এই উদ্ধত কলেজের ছোকরার জোর কথা শুনিয়া সকলেই রাগিয়া উঠিয়াছিলেন। একটা মহা গোলমাল বাধিয়া উঠিল। তারিণী মুখুর্য্যে চোখ লাল করিয়া বলিলেন, "নীলাম্বর যখনই বলেছে তার ছেলেকে কলেজে পড়াচ্ছে, আমি তখনই বলেছিলুম, হয়েছে—তোমার ছেলে আবার নতুন একটা সমাজ সংস্কারক হয়ে উঠল বলে। আজ কাল কলেজে, স্কুলে যে বাতাস উঠেছে, সে বাতাস গায়ে লাগলে হিঁদুর ছেলে আর হিঁদু থাকে না। তা বেশ বাবু, তোমরা বাপ বেটায় নতুন সমাজ তৈয়ার কর, আমরা উঠলুম। এ সব খিষ্টেনের মতে পড়ে কি পৈত্রিক ধর্ম্মটা বিসর্জ্জন দেব?"

তিনি উঠিতেই সকলেই উঠিয়া পড়িলেন। অবনী বাবু একপাশে বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, হুঁকাটা রাখিয়া তিনি উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "এই ছোঁড়াটার জন্যে বড় বউ পর্য্যন্ত সমাজচ্যুত হয়েছে। যা হোক, মেয়েমানুষ বটে, কিছুতেই যদি ছোঁড়াটাকে ছাড়ে। হাজার বুঝিয়েছি মশাই, কিছুতেই কথা কানে তোলে না। কথায় কথায়

ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা তোলে। আরে মর, কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখা আছে পতিতার ছেলেকে কুড়িয়ে নিতে হবে, পতিতাকে জাতে তুলতে হবে?"

চোখ ঘুরাইয়া নিধু গাঙ্গুলী বলিলেন, "আমার সঙ্গে যদি তর্ক হয় কোনও দিন, স্পষ্ট আমি দেখিয়ে দেব। মেয়েমানুষে শাস্ত্রের দোহাই দিতে আসে, শুনলেও হাসি পায়।"

ধরণী ভট্টাচার্য্য স্তম্ভিত নীলাম্বরের পানে চাহিয়া বলিলেন, "ওহে নীলাম্বর, তা হ'লে চলছি আমরা, তোমার এখন যা' খুসি করতে পার। যদি ইচ্ছে হয়, এখনও ভুল শোধরাতে পারবে।, এই সন্ধ্যে লগ্নে বিয়ে, সব দিক মাটী কোর না, এখনও বুঝে সুঝে দেখ।"

সত্যেশ কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে ধমক দিয়া নীলাম্বর বলিলেন, 'তোকে আর কথা বলতে হবে না, তুই অন্য জায়গায় যা।"

সত্যেশ সরিয়া গেল। অনেক করিয়া হাতে পায় ধরিয়া নীলাম্বর নেতাগণকে বসাইতে সক্ষম হইলেন।

রাগে সত্যেশের গা জ্বলিয়া যাইতেছিল, পিতার বিপন্ন মুখের পানে চাহিয়া সে সরিয়া গেল।

খাবারের ভার ছিল নিতাই মুখুয্যের হাতে। সত্যেশ একবার সে দিকটা দেখিতে চলিল। গৃহের সামনেই নিতাই মুখুয্যে একটা কম্বলের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। গৃহমধ্যে তাঁহার দুইটী নাতি নাতনী কলাপাতে করিয়া কি খাইতেছিল। সত্যেশ একবার অবহেলার ভাবে সে দিকে চাহিয়া বলিল, "কি হচ্ছে মুখুয্যে মশাই?"

শুষ্ক মুখে মুখুয্যে মশাই একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "এই গিয়ে—এই বাবা, নাতি নাতনী দুটী বড় জ্বালাতন করে মারছিল খাবার খাবে বলে, তাই ওদের দুটিকে একটু খেতে দিয়েছি। তা বেশী দেই নি, কত রকমের খাবার হয়েছে, একখানা করে খেয়েই ওদের পেট ভরে উঠেছে, ওরা আর খেতেই চাচ্ছে না আদিতে।"

সত্যেশ একটু হাসিয়া গৃহের মধ্যে মুখ বাড়াইতেই দেখিতে পাইল একখানি গায়ের কাপড়ের উপর রাশীকৃত খাবার ঢালা রহিয়াছে, তাড়াতাড়ি তাহা বাঁধিয়া রওনা করা হইয়া উঠে নাই। তাহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল দেখিয়া মুখুয্যে মশাই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "ওগুলো বাবা আমার আর দুটি নাতি নাতনী আছে, তাদের জন্যে ওরা নিয়ে যাচ্ছে। এরা কি কিছুতে খেতে বসতে চায় সে দুটিকে ছেড়ে? আহা, এমন ভাই বোনে ভালবাসা যদি আর দেখা যায়! একজন একটু কিছু পেলে সব ক'টাকে না দিয়ে খেতে পারে না। একটী এই সবে হাঁটতে পারে, বছর দেড়েক হবে, আর একটী এই তিন চার মাসের হবে। আমার বাবা—এদিগে খাইয়ে যেমন তৃপ্তি—"

সত্যেশ বাধা দিয়া একটু হাসি দেখাইয়া বলিল, "তা বটে, তা বটে।"

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার পথেই গ্রামের দিদিমার সঙ্গে দেখা। তিনি একটা ছোট পিতলের বাটীতে খানিকটা সরিষার তৈল ও বাম হাতে একটা বড় বাটীতে একবাটী ঘি লইয়া এই খিড়কির দুয়ার পথে বাহির হইতেছিলেন। হঠাৎ অতর্কিত ভাবে এই পথে সত্যেশকে দেখিতে পাইয়া তিনি একেবারে থ' হইয়া গেলেন। কোন্‌টা সামলাইবেন, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না।

তাঁহার এ ভাব দেখিয়া সত্যেশেরই বড় লজ্জা বোধ হইতেছিল। এক একজন মানুষ এরূপও থাকে, সামনে কেহ চুরী করিতেছে দেখিয়া নিজেই ভয়ানক লজ্জা বোধ করিয়া সরিয়া যায়। চোর যে, সে পলায়ন করুক বা না করুক, নিজে আগে পলাইতে পারিলে সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া যায়। সত্যেশ ছিল এই প্রকৃতির লোক। সে নিজেই আরক্তিম মুখে কোনমতে পাশ কাটাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

এমনি করিয়া সকলেই যে তাহার পিতার অর্থ শোষণ করিতেছে তাহাতে একটুও সন্দেহ নাই। ইহারাই আহারাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন, জিনিসপত্রের ফর্দ্দ করিয়া দিয়াছেন। যেখানে দুই পয়সা হইলে হয়, সেখানে এক টাকা লাগাইতেছেন, ইহাতে তাঁহাদেরই লাভ।

সত্যেশের মনটা অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—কেমন করিয়া আজকার

দিনটা পার হইয়া যায় ? পিতা কেন যে এখানে আসিলেন কন্যার বিবাহ দিতে, কাহার ভরসায় যে তিনি নামিয়া পড়িলেন, তাহা সে বুঝিয়াই উঠিতে পারিল না।

কি কার্য্যবশতঃ নীলাম্বর এই সময়ে অন্তঃপুরে আসিয়া পুত্রকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "অমন করে দাঁড়িয়ে আছিস যে সত্য?"

সত্যেশ বিমর্ষমুখে বলিল, "এদের সব সাফাই চুরি দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে যাচ্ছি বাবা, আগাগোড়া সবই কি চুরীর উপরেই চলছে ? যেখানে কাজ করছিলে, সেখান হ'তে বিয়ে দিলে কি হ'ত না ? আমার মনে হচ্ছে এখানকার চেয়ে সেখানে কম খরচে হ'ত, বন্ধু বান্ধবও ঢের পেতুম আমরা। যে রকম ভাবে চুরি হচ্ছে, এতে খাওয়ানোর সময় মানরক্ষা হয় তবে বুঝি।"

নীলাম্বর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আজকের দিনটা বাবা চুপ করে যা। আজকে যতই ক্ষতি হোক, যে যাই বলুক, সব আমাদের সহ্য করে যেতেই হবে। যখন জেনেছি বউদিদি আসবেন না, তখনই বুঝেছি এতে এমনই কাণ্ড হবে, এমনই চুরী জোচ্চুরী চলবে। কি আর করব বাবা ? বাড়ীতে একটীও মেয়ে মানুষ না থাকায় এই রকমই হয় বটে। তোকে বারণ করছি সত্য, আজকের দিনটা সব সহ্য করে যা। আজকের খরচ আমার খরচ বলে গায় লাগবে না।"

সত্যেশ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "জেঠিমা যদি আসতেন তা হ'লে এ রকম হ'তে পারত না। তিনি যে রকম আমাদের ভালবাসেন, প্রাণ দিয়েও যাতে আমাদের কাজ সুশৃঙ্খলায় হয় তা করতেন।"

নীলাম্বর মলিন হাসিয়া বলিলেন, "গণেশ এসেই রক্ষা নেই, বউদি আসলে কেউ থাকবে না আমার বাড়ী। তিনি যে আসতে চান নি, আমায় জড়াতে চান নি, ভালই হয়েছে তা।"

সত্যেশ ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ।

ব্রজবাঁশী।

[শ্রীকালিদাস রায়]

বনে বনে বাজে ব্রজবাঁশী
আকুল নিখিল ব্রজবাসী।
অলিকুল গুঞ্জন মাঝে
বিহগের কলস্বরে বাজে
পল্লব মরমরে বাজে
করি মন পরাণ উদাসী॥
দাদুরী ডাহুকী ডাকে বাজে
বল্লীর ফাঁকে ফাঁকে বাজে
ঝিল্লীর ঝাঁকে ঝাঁকে বাজে
মল্লিকা শাখে বার মাস-ই।
গেহকাজে নাহি মন লাগে
দেহ ত্যজি ছুটে বনে বাগে
যেন কার দরশন মাগে
হ'তে চায় তার সেবাদাসী॥

সুখ।

[শ্রীবুদ্ধদেব বসু]

নির্ম্মল যদি কর
কমলের মত,
দূরে ফেলে দিয়ে পাপ
কলুষতা যত।

পঙ্কিলে অঙ্কিত
রেখো তবে ঘোর,
দুঃখ হবে না প্রাণে
একটুকো মোর!

জল মাঝে ফোটে ফুল
কাদা বুক 'পর,
তার লাগি কে তাহারে
করেনি আদর!

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন।

[শ্রীরাখালরাজ রায়, বি-এ]

দ্বাদশ সাহিত্য সম্মিলনে দাগা পাইয়া ভাবিয়াছিলাম, সম্মিলনে যোগদানরূপ ঝকমারি আর করিব না। কিন্তু বাণীবাবু চাপিয়া ধরিলেন, প্রবন্ধ লিখিতে হইবে আর মেদিনীপুর ত্রয়োদশ সম্মিলনে যাইতে হইবে। এবারকার সাহিত্য শাখার সভাপতি মহাশয় ময়মনসিংহের সম্মিলন হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রবন্ধলেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তিনি এবার যখন অভিভাষণই লিখিতে পারিলেন, তবে আমার সম্মিলনে যাইতে দোষ কি? কাজেই লোভ সাম্‌লাইতে পারিলাম না। বৃহস্পতিবার দিন সংক্রান্তি, আবার হরতাল বলিয়া বুধবার রাঁচি এক্সপ্রেসে হাওড়া হইতে রওনা হইলাম। রেলওয়ে একচেটে ব্যবসায়, গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লইয়া কোম্পানি যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। মহাযুদ্ধের শেষাশেষি বি এন্ রেলওয়ে কোম্পানি মেল ও এক্সপ্রেসের ইণ্টার ক্লাসের ভাড়া অসম্ভব রকম বাড়াইয়া লইয়াছে। অজুহাত এই যে, মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেনে যাহারা যায়, তাহারা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের যাত্রী চাইতে অল্প সময়ে পৌছায়, সুতরাং তাহারা বেশী ভাড়া দিবে। বেশ কথা, কিন্তু যখন রাঁচি এক্সপ্রেস হাওড়া হইতে মেদিনীপুর যাইতে ৩॥০ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে ৫॥০ ঘণ্টা লাগাইয়া দিল, তখন বর্দ্ধিত মাশুল আমরা ফিরাইয়া পাইনা কেন? আর যখন আমরা স্থানাভাবে গাদাগাদি করিয়া চড়িয়া রেলকোম্পানির আয় বাড়াইয়া দিতেছি, তখন আমাদের মাশুলের হার কমিবেনা কেন?

লোকে একচেটে ব্যবসাদারের হাতে পড়িলে 'নায়ে কড়ি দিয়ে ডুবে পার হয়', আর আমরা ইণ্টার ক্লাসের টিকিট কিনিয়া পথে বসিয়া আসিলাম। এই পথটি অবশ্য গাড়ীর মধ্যেই, গাড়ীর একপাশে পায়খানা যাইবার পথ। বাসায় ভাবিয়াছিলাম, কলিকাতা হইতে বুধবার দিন বোধ হয় ২।৪জন মেদিনীপুরের যাত্রী হইবেন। কিন্তু ট্রেনে দেখি, বহু যাত্রী আসিয়াছেন। মেদিনীপুরে নামিয়া শুনিলাম অন্ততঃ ৩০ জন রাঁচি এক্সপ্রেসে আসিয়াছেন। দিনের বেলায়ও কেহ কেহ আসিয়াছেন। সুতরাং শুক্রবার দিন বৈকাল ৪টায় সভার অধিবেশন হইবে স্থির হইলেও বৃহস্পতিবার দিন প্রাতঃকালে অন্ততঃ ৪০ জন লোক অভ্যর্থনা সমিতির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি নিরুপায় হইয়া আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমি অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মহাশয়কে লিখিয়াছিলাম যে, আমি বৃহস্পতিবার দিন জনৈক বন্ধুর গৃহে অতিথি হইব। কিন্তু যখন শুনিলাম অন্ততঃ মোট ৪০ জন এদিন অভ্যর্থনা সমিতির আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, তখন আমার সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। যশোহরে খরচ কমাইবার জন্য ২ দিনে সম্মিলনের কাজ শেষ করা হইয়াছিল। মেদিনীপুরবাসী ৩ দিনে অধিবেশন শেষ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগকে ৪ দিন আতিথ্য সৎকার করিতে হইল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্মিলনে যখন ব্যোমকেশ দাদা বাঁচিয়াছিলেন তখন তিনি ও শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত সাধ্যমতে চেষ্টা করিতেন ও অভ্যর্থনা সমিতিকে উপদেশ দিতেন যাহাতে আতিথ্য সৎকারের খরচটা অল্প হয়। কিন্তু এবার কেহ সে উপদেশ দিয়াছিলেন কি না জানি না, তবে কার্য্যতঃ মেদিনীপুরে আতিথ্য সৎকারের ব্যয় সঙ্কোচের কোন লক্ষণই দেখিলাম না। আমরা ৪ দিনে পূরো আট বেলায় দিনে ভোজ, রাত্রে ফলার, দুবেলা জলখাবার ও চা খাইয়াছি, এই পাহাড়ে দেশে তরি-তরকারী দুর্লভ হইলেও ভোজে অর্থাৎ দিনের বেলায় শাক, সুক্তো, মোচা; লাউ, ইঁচোড়ের তরকারী, পটোল ভাজা, মাছের ঝোল, অম্বোল, দই ও মিষ্টি দিয়া ভাত খাইতাম, আর রাত্রিকালে আলু পটোলের দম, কুমড়োর ছঁকা, মাছের কালিয়া, চাটনি,

দই ও মিষ্টি দিয়া লুচি খাইতাম। তাহার উপর সকাল বেলায় মিহিদানা, সন্দেশ ও চা, এবং বৈকালে ফল, মিষ্টি ও চা খাইতাম। এইরূপ গুরুভোজনে অনেকের পেটের পীড়া হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। কেহ কেহ লেবুর রস দিয়া সরবৎ খাইতেন। কেহ বা রাত্রিকালে উপবাস দিতেন, আবার কেহ বা সকালে সোডা খাইতেন এমনও দেখিয়াছি। শেষদিনে রাত্রিকালে আবার পোলাও ও মাংস। পানীয় জলে বরফ ও কেওড়া এবং স্নানের সময় সুগন্ধি তৈল; ইহাই হইল কলেজ হোষ্টেলবাসী শূদ্র শ্রেণীর সাহিত্যিকদের জন্য। যাঁহারা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর সাহিত্যিক, তাঁহাদের মধ্যে জনকয়েক রাজা জগদীশচন্দ্র ধবল দেবের, কয়েকজন অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের, আর কেহ কেহ স্থানীয় বড় বড় উকীল বা তাঁহাদের বন্ধু বান্ধবের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে সেখানেও তদ্বির চলিত যাহাতে সেখানে আতিথ্য সৎকারের কোনরূপ ত্রুটি না হয়। সুতরাং তাঁহাদের যে ব্রাহ্মণোপযোগী আতিথ্য-সৎকার হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিবাহে যেমন ব্রাহ্মণদের জন্য বসিবার পৃথক আসন ও খাইবার পৃথক স্থান করা হয়, আমাদের সাহিত্য সম্মিলনেও ঠিক তেমনই উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যিকদের জন্য পৃথক্ বাসা দেওয়া হয়; সম্মিলন মণ্ডপেও তাঁহাদের জন্য মঞ্চরূপ উচ্চাসন থাকে। বর্দ্ধমানে কেবল সভাপতিদের জন্যই উচ্চাসন রাখা হইয়াছিল—সভাপতিরা বিবাহে বরের তুল্য, কারণ তাঁহারাই বরের মতন সব চাইতে অধিক সম্মান পাইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের গলাতেই মাল্যদান করা হইয়া থাকে। বিবাহে বরযাত্রদের একবেলা সামলাইতে পারিলেই কন্যাকর্ত্তার নিষ্কৃতি, কিন্তু সম্মিলনে অন্ততঃ ছ'বেলা প্রতিনিধিদের তাল সামলাইতে গিয়া অনেক জায়গায় অভ্যর্থনা সমিতিকে বেতালা হইয়া পড়িতে হয়। যাঁহারা অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য হইয়া কাজ করেন নাই, কি অন্ততঃ যাঁহারা কখনও বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি কাজে দশজনের একত্রে আতিথ্য সৎকার করেন নাই, তাঁহারা প্রতিনিধি বা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলে যদি তাঁহাদের পান হইতে একটু চুণ খসে তাহা হইলে আর রক্ষা নাই! তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহারা প্রতিনিধি বা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া কিংবা একটা প্রবন্ধ লিখিয়া অভ্যর্থনা সমিতির মাথা কিনিয়া রাখিয়াছেন। ব্রাহ্মণ সাহিত্যিকদের সহিত শূদ্র সাহিত্যিকদের মিলন মোটেই হয় না, যে মিলন হয় তাহা যেন তেলের জলের মিলন। আবার প্রতিনিধি বা নিমন্ত্রিতদের ব্যবহারে অভ্যর্থনা সমিতির সহিত মিল না হইয়া গরমিল হয়। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

এবার অভ্যর্থনা সমিতি খড়্গপুরে পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইয়া অভ্যর্থনার মুখপাত দেখান। কিন্তু কোন নিমন্ত্রিত সাহিত্যিক শুক্রবার দিন বেলা ১১টার সময় সভা প্রবেশের টিকিট না পাইয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। কোন প্রতিনিধি এই সাহিত্যিকটিকে বলেন যে, আমরা প্রতিনিধি আমরা টাকা দিয়া ব্যাজ লইয়াছি, আপনিও তেমনই নিমন্ত্রণপত্র দেখাইয়া বা নিমন্ত্রণ হইয়াছে বলিয়া বিনামূল্যে টিকিট লইতে পারেন। অভ্যর্থনা সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ কেমন করিয়া জানিবেন যে, আপনি প্রতিনিধি নন আপনি নিমন্ত্রিত। অভ্যর্থনা সমিতির কোন সদস্য বলিলেন যে, যাঁহারা প্রতিনিধি নন সে রকম, যে সকল সাহিত্যিকের আমরা প্রবন্ধ পাইয়াছি আমরা তাঁহাদের টিকিট ডাকে পাঠাইয়া দিয়াছি, আপনি সভাপতি মহাশয়কে প্রবন্ধ দিয়াছেন একথা না জানিলে আমরা কিরূপে জানিব যে, আপনি টিকিট পান নাই বা আপনি প্রতিনিধি নন। ইহার পরে তিনি টিকিট দিতে গেলে সাহিত্যিকবর টিকিট লইলেন না। গেটে সাহিত্য পরিষদের জনৈক সদস্য টিকিট দিলে, তাহা ফেলিয়া দিয়া লাথি মারিলেন। পরে গেটে স্বেচ্ছাসেবকেরা টিকিট চাহিলে একটা হল্লা করিয়া উঠিলেন। তিনি বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, স্বেচ্ছাসেবকেরা আমার চেহারা দেখিলেই আমাকে সাহিত্যিক বলিয়া ঠাওরাইয়া দ্বার ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু তাহা হইল না দেখিয়া তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শেষে কর্ম্মকর্ত্তারা তাঁহাকে বিনা টিকিটেই লইয়া গেলেন। পরদিন তিনি প্রতিনিধি ও নিমন্ত্রিতদের মণ্ডপে বসিবার পৃথক স্থান থাকা সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া বলিলেন, "এই

পার্থক্য না উঠাইয়া দিলে আমি ত যাইবই না, অপরকেও যাইতে দিব না।" অভ্যর্থনা সমিতির এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকিবারই কথা, কাজেই তাঁহারা এই সাহিত্যিক-প্রবরের আবদার রাখিবার জন্য লেবেলগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কলিকাতা, বর্দ্ধমান, যশোহর, বাঁকীপুর, হাওড়া, প্রভৃতি সকল স্থানেই এইরূপ লেবেল সম্মিলন মণ্ডপে আঁটিয়া পৃথক পৃথক স্থান ঠিক করা হইয়াছিল। কেহ কোন দিন আপত্তি করে নাই। আর আপত্তিটা ঠিক যুক্তিসঙ্গত এমনও মনে হয় না। প্রতিনিধিদের ২৲টাকা করিয়া ফি দিতে হয়, আর নিমন্ত্রিতেরা কিছুই দেন না। সে ক্ষেত্রে পৃথক আসন হওয়াই উচিত। কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্সে দর্শকেরা টাকা দিলেও প্রতিনিধিদের দলে বসিতে পান না। এই সাহিত্যিকপ্রবর প্রতিনিধিদের ভোট দিবার অধিকার লইয়াও ত আপত্তি তুলিতে পারিতেন। যাক, এইবার কাজের কথা বলি।

বৃহস্পতিবার দিন আমরা একরকম বসিয়াই কাটাইলাম। শুক্রবার দিন সকালে, রাজা জগদীশচন্দ্র ধবলদেবের বাটীতে যে সকল সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম। সেখানে খানিকক্ষণ থাকিবার পরেই আমাদের দলের রামকমল বাবুর ডাক পড়িল। মনীষি বাবু উকীলের বাড়ীতে সাধারণ সভাপতি আছেন। রামকমল বাবুকে সেইখানে যাইতে হইবে, অভ্যর্থনা সমিতি গাড়ী পাঠাইয়াছেন। এইখানে বলা ভাল যে, অভ্যর্থনা সমিতি দিনরাত্রি ভাড়া দিয়া ৫।৬ খানি গাড়ী ৪ দিন রাখিয়াছিলেন—প্রতিনিধিগণ এই গাড়ী করিয়া যেখানে প্রয়োজন যাইতেন। মনীষিবাবুর বাড়ী গিয়া দেখি, সেখানে সাধারণ সভাপতি মহাশয় দর্শন ও বিজ্ঞান সভার সভাপতিদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন,—শুক্রবার দিন প্রথমে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও পরে সাধারণ সভার সভাপতির অভিভাষণ পাঠ হইবে। শেষে মেদিনীপুর পরিষৎ শাখার কার্য্যবিবরণ পাঠ ও সভাপতির বক্তৃতা হইবে। সন্ধ্যায় একটি ল্যাণ্টার্ণ লেক্‌চার। শনিবার সকালে দুটি শাখা সভাপতির অভিভাষণ ও বৈকালে আর দুটি শাখার অভিভাষণ পাঠ হইবে এবং সন্ধ্যায় দুটি ল্যাণ্টার্ণ লেক্‌চার হইবে। রবিবার দিন সকালে চার জায়গায় একই সময়ে চার শাখার প্রবন্ধ পাঠ ও বৈকালে সাধারণ সভার অধিবেশনে প্রস্তাবাদি গ্রহণ ও বিদায় গ্রহণ, ধন্যবাদ প্রদানাদি হইবে।

কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম—আমরা শুনিলাম মাত্র। যে দিন হইতে সম্মিলন ৪ শাখায় ভাগ হইয়াছে, সেই দিন হইতে শাখা ভাগ হইবার পরে প্রতিশাখায় বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে শাখা সভাপতিগণের অভিভাষণ পাঠ হইয়া আসিতেছিল। তাহাতে প্রবন্ধ পড়িবার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। এবার কিন্তু শাখা সভাপতিগণ তাঁহাদের অভিভাষণের জন্য ৭ ঘণ্টা সময় লইলেন, আর প্রবন্ধের জন্য ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত—৩ ঘণ্টার ব্যবস্থা করিলেন। কার্য্যতঃ কিন্তু প্রবন্ধ-পাঠকেরা পাইলেন ৯।০ টা হইতে ২ ঘণ্টা সময়। কাট-ছাঁট করিয়া প্রবন্ধের নব কলেবর করা হইল। পূর্ব্বে কাট-ছাঁটের দরুণ ভাল প্রবন্ধ লেখকেরা আর কেহ প্রবন্ধ দেন না। এইবার যে অবিচার করা হইল, তাহাতে যে ২।৪ জন ভাল প্রবন্ধ লেখক এখনও প্রবন্ধ দিতেছেন, তাঁহারা ভবিষ্যতে দিবেন কি না সন্দেহ।

রাঁচি এক্সপ্রেসের বিলম্বে আসার মত সম্মিলনের প্রতি অধিবেশনই বিলম্বে হইতে লাগিল। প্রথম অধিবেশন ৪টায় না হইয়া ৪।০ টায় হইল। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন ৭ টার পরিবর্ত্তে ৭৸০ টায়, এবং তৃতীয় দিনের অধিবেশন ৮।০টায় হইয়াছিল। প্রথম অধিবেশনের প্রারম্ভেই বিবাহের প্রীতি উপহারের মত কার্য্যসূচী,—গান, কবিতা ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ বিলি হইতে লাগিল, আর চারিদিক হইতে ভিক্ষুক বিদায় কালীন দেহি দেহি রবের মত শব্দে সুবৃহৎ সভামণ্ডপ মুখরিত হইয়া উঠিল। সে শব্দ বন্ধ হইলে বিজলীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীনলিনীকান্ত সরকার একটী গান গাহিলেন। গান শেষ হইলে গানরচয়িতার নাম না বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইল "এ গানটি ক্ষীরোদ বাবুর পুত্রের রচনা।" গানটা ছাপান হইলে বুঝিতে পারিতাম যে, ইহাতে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের পুত্র নাম রাখিতে পারিয়াছে কি না। কার্য্যসূচী পাঠ করিয়া দেখি তাহা সব উলট-পালট হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক,

ছাপান গান ও কবিতায় ৩ দিনে ৯টি পাইয়াছি তাহার মধ্যে সম্মিলন ও পরিষৎ শাখার প্রাণস্বরূপ অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "স্বাগত" কবিতা ও বিদায়ের দিনের সঙ্গীতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ইঁহার স্বহস্তে চিত্রিত তৈলচিত্রে সভামণ্ডপ সজ্জিত হইয়াছিল, সেগুলিও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক।

বাণীস্তোত্র, বালিকাদের কবিতাপাঠ, গান প্রভৃতির পরে সভাপতি বরণ ও সভার পঞ্চপতির (সাধারণ ও ৪ শাখার) গলে মাল্যদান করা হইলে অভ্যর্থনা সভাপতি শ্রীসূর্য্যকুমার অগস্তি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তাঁহার অভিভাষণ ডিমাই ৮পেজী ২৪পৃষ্ঠা। তিনি হিন্দুর ধর্ম্মকে সমাজগঠনে প্রধান সহায় বলিয়া মনে করেন, সাহিত্যকে সেই পথ দিয়া সমাজগঠন করিতে হইবে। তৎপরে সাধারণ সভাপতি শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ মহাশয় তাঁহার ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী অভিভাষণ পাঠ করিলেন। সময় লাগিল ১ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট। অনন্তর পরিষৎ শাখার বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ ও সভাপতি শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের বক্তৃতা হইল। তৎপরে মূল সভাপতি বলিলেন, আগামী কল্য প্রাতঃকাল ৭টায় বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন হইবে। কিন্তু বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে কে কে থাকিবে তাহা বলা হইল না। সন্ধ্যায় ডাক্তার শ্রীনিশিকান্ত সেন "জগতে ভারতের স্থান" সম্বন্ধে ল্যাণ্টার্ণ লেক্‌চার দিলেন। অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিয়া তিনি দেখাইলেন যে, ভারতের পরিমাণ ও লোকসংখ্যা বেশী হইলেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতিতে আমরা কত পশ্চাৎপদ। যদি জগতে টিকিয়া থাকিতে হয়, তবে আমাদিগকে জাগিয়া কাজ করিতে হইবে।

আমাদের গ্রামে মধ্যাহ্নে জলপান বলিলে যেমন ৩টায় খাওয়া হয়, তেমনই পরদিন প্রাতঃকালে ৭টায় কথা থাকিলেও ৭৸৹টায় সভা আরম্ভ হইল। সাধারণ সভাপতি মহাশয় ভুল করিয়া বলিলেন, বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে, কেবল যাঁহারা ২৲টাকা চাঁদা দিয়াছেন, তাঁহারাই ভোট দিবেন। যখন প্রতিনিধিদের টাকা দিতে হইত না তখন অভ্যর্থনা সমিতির প্রধান প্রধান সদস্য ও হোমরা-চোমরা সাহিত্যিক ও নিমন্ত্রিত লোক লইয়া বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি গঠিত হইত। বর্দ্ধমানে ঠিক হইল যে, প্রতিনিধিগণকে ২৲টাকা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে আর তাঁহারা তজ্জন্য ভোট দিবার অধিকার পাইবেন। বর্দ্ধমানের নিয়ম দেখিলে বেশ প্রতীয়মান হয় যে, নিমন্ত্রিত ও দর্শকের ভোট দিবার অধিকার থাকিবে না। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই। আর তাঁহারা যখন টাকা দিয়া থাকেন, তখন তাঁহাদেরই বা প্রতিনিধিদের মতন ভোট দিবার অধিকার থাকিবে না কেন? যশোহরে প্রথম প্রতিনিধিদের নিকট চাঁদা লওয়া হয়। সেখানে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে সভাপতিগণ, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ ও প্রতিনিধিগণ ছিলেন। কিন্তু এখানে তাহার ব্যতিক্রম হইল।

কেবল একটি প্রস্তাব লইয়া ৩য় দিন প্রাতঃকালে তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হইল। প্রতিনিধিদের দেয় চাঁদা ২৲ টাকা স্থলে ৪৲ হউক—এই হইল প্রস্তাব। সম্মিলন পরিচালন সমিতিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মিলন সাধারণ সমিতির সদস্যদের মধ্যে ১৯ জন অভিমত লিখিয়া পাঠান, তাহার মধ্যে ১৫ জন বৃদ্ধির পক্ষে মত দেন। কিন্তু বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে শুধু প্রতিনিধিগণ থাকায় প্রস্তাবের পক্ষে ২৭ জন এবং বিপক্ষে ৩০ জন মত দেওয়ায় প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়। সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, সাহিত্যিকদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র—যাতায়াত ব্যয়ের উপরে ২৲টাকা দিতেই তাঁহাদের কষ্ট হয়, তাহার উপরে ৪৲ টাকা দিতে বলিলে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আসিতে চাহিবেন না। বৈকালের অধিবেশনের শেষদিকে এই প্রস্তাবের পুনর্ব্বিচার করিবার জন্য অনুরোধ করা হইলে, প্রস্তাবের পক্ষে বলা হইল অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণের মত গ্রহণ করা উচিত,যাঁহারা দুঃস্থ সাহিত্যিক তাঁহারা প্রতিনিধি হন না, তাঁহারা নিমন্ত্রিত হন। নিমন্ত্রিতদের চাঁদা দিতে হয় না। সাহিত্য শাখা সভাপতি বলিলেন, "এ সব আপত্তি প্রাতঃকালে

করা উচিত ছিল। এখন অন্ধকারের হাতগুলিতে গোলমাল হইবে। এ কেবল আমাদের দলকে হারাইবার মতলবে করা হইয়াছে।" ভোটের সংখ্যা গণিবার সময় নাম লিখিলেই গোলমাল হইত না। যাহা হউক, শেষে সাধারণ সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে প্রস্তাবকর্ত্তা ইহা প্রত্যাহার করেন।

দ্বিতীয় দিন বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশনের পরে সাহিত্য শাখার সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ আরম্ভ হইল। সাধারণ সভাপতি মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে পূর্ব্বদিন বলিয়াছিলেন যে, নিম্ন হইতে উচ্চ পর্য্যন্ত এক ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত সমস্ত বিষয় বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা না দিলে আমাদের জাতীয় শিক্ষা হইবে না। সাহিত্য শাখার সভাপতি স্বয়ং অধ্যাপক। তিনিও এই কথাটার উপর খুব জোর দিলেন। উভয়েই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, ডুবাল চরিত পাঠ করিলে আমাদের জাতীয় শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, জাতীয় শিক্ষার অর্থ কি বাঙ্গালীর জাতীয় শিক্ষা না ভারতের জাতীয় শিক্ষা? ডুবাল চরিতের পরিবর্ত্তে বহুদিন হইল প্রাচীন যুধিষ্ঠির চরিত, বুদ্ধ চরিত এবং আধুনিক মহম্মদ মহসীন চরিত স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। বিলাতী পুস্তকবিক্রেতা ম্যাকমিলান কোম্পানীর প্রকাশিত কোন কোন শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তকে দেশীয় উপাখ্যান স্থান পাইতেছে। কিন্তু যদি বাঙ্গলা ভাষাতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভারতের অন্য প্রদেশের ছাত্রের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার চিরতরে অবরুদ্ধ হইবে। ইহা কি প্রার্থনীয়? এখন ইংরাজী ভাষাটা ভারতের সাধারণ ভাষা হইয়াছে। এই ভাষার সাহায্যেই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দেশভাষায় এম্-এ পরীক্ষার প্রচলন সম্ভব হইয়াছে। যদি মধ্য (ইণ্টারমিডিয়েট) শিক্ষা পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় পঠন পাঠন হয়, তাহা হইলে জাতীয় শিক্ষার কোন ব্যাঘাত হইবে বলিয়া আমি মনে করি না।

'জাতীয় শিক্ষা' কথাটা সভাপতিদের অনুকরণে ব্যবহার করিলাম, কিন্তু ইহার অর্থ ঠিক বুঝিলাম না। আর সভাপতিদের অভিভাষণে রাশি রাশি ইংরাজীর বুক্নী দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ তথা বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের একটা নিয়ম আছে যে, এই সভা সমিতির কাজ বাঙ্গলা ভাষাতেই হইবে। কিন্তু সভাপতিরা এ সব কথা কি ভুলিয়া গেলেন? (দর্শনশাখা-সভাপতি ও অভ্যর্থনা-সভাপতি, নিয়মভঙ্গ করেন নাই) সাহিত্য শাখা সভাপতি মহাশয় একটা বেশ কৈফিয়ত দিয়াছেন যে, ইংরাজী ভাবে আমরা যে ভাবি আর কথায় কথায় যে ইংরাজীর বুক্নী দিই, সেটা মনের গোলামী (Slave mentality). কিন্তু সত্যই কি তাই? তিনি যদি একবার ভাবিতেন যে, আমার শ্রোতাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা ইংরাজী মোটেই বুঝেন না, তাহা হইলে তাঁহার মনের গোলামির কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইত না। পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গালি দিবার জন্য বাঙ্গলা দেশের সংবাদপত্রগুলি একটা কথা সৃষ্টি করিয়াছিলেন "গোলামখানা", আর আজকাল একটা ইংরাজী কথা সৃষ্ট হইয়াছে "স্লেভ মেণ্টালিটি" বা মনের গোলামি। ইহারও অর্থ আমরা আজ পর্য্যন্ত বুঝিলাম না।

সাহিত্য শাখার সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে শেষে একটি প্রস্তাব ছিল। তাহাতে তিনি বলেন, ইতিহাসাশ্রিত আখ্যায়িকা বা নাটক লিখিলে দেশাত্মবোধ জাগরিত হয় —বাঙ্গলায় উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। প্রাচীন পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শের নাটক ও উপন্যাসের রচয়িতা দীনবন্ধু, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, শিবনাথ শাস্ত্রী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ইন্দিরা দেবী, ইত্যাদি করিয়া তিনি বহু গ্রন্থকারের নাম করিলেন, আবার বহু গ্রন্থকারের নাম বাদ পড়িয়া গেল। ইহাতে বহু গ্রন্থরচয়িতা শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় নিজে দাঁড়াইয়া এই অবহেলার জন্য প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন। কাজটা নিতান্তই অশোভন হইয়াছিল বলিতে হইবে। তিনি পরে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন।

সাহিত্য শাখার অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে বিজ্ঞান শাখার অভিভাষণ পাঠ আরম্ভ হইল। ইহার পত্র সংখ্যা

৮০। পড়িতে অন্ততঃ ২ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। স্কুল কলেজের ছাত্রগণকে ১ ঘণ্টার অধিককাল বক্তৃতা শুনাইতে গেলে তাহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে একথা সর্ব্বজন বিদিত। সেরূপ স্থলে সভাপতিগণ দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিলে শ্রোতারা অধীর হইয়া সভামণ্ডপ হইতে উঠিয়া বাহিরে গেলে, সভাপতি মহাশয়ের অপমান করা হয়, একথা মনে রাখিয়া সভাপতিগণ সকলেই তাঁহাদের অভিভাষণ সংক্ষিপ্ত করিতে পারিতেন। ইঁহার অভিভাষণে অনেক কাজের কথা ছিল।

অপরাহ্নে ইতিহাস ও দর্শনশাখার অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে সন্ধ্যায় প্রথমে ডাক্তার একেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "রোমী প্রাণী" বিষয়ে ল্যাণ্টার্ণ লেক্‌চার হইল, তৎপরে শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লণ্ঠনে চিত্র দেখাইয়া "বোধিসত্ব মঞ্জুশ্রী" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। রাত্রি ১১টায় মেদিনীপুরের ২।৩ দল মিলিয়া প্রতিনিধিদের মনোরঞ্জনার্থে "প্রফুল্ল" অভিনয় করেন। ইহা পুরাতন নাটক বলিয়া কেহ কেহ নাক সিট্‌কাইয়া ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলিলেন, "নাটক নূতন হউক পুরাতন হউক, অভিনয়ে কেমন নিপুণতা হয় তাহাই দেখিতে হইবে।" অভিনয় দর্শনে ৩ জন কলিকাতাবাসী সন্তুষ্ট হইয়া ৩ জন অভিনেতাকে মেডাল দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

পরদিন সকালে প্রথমে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন, পরে মণ্ডপে বিজ্ঞান শাখার অধিবেশন ও কলেজে অবশিষ্ট ৩টি শাখার অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ হইল। বিজ্ঞান শাখায় লোক অল্প হইবে তথাপি বৃহৎ মণ্ডপে এই শাখার অধিবেশন হইল, তাহার কারণ কলিকাতার শ্রীবিনোদ-বিহারী দাস নামক জনৈক ভদ্রলোক, কেমন করিয়া জলের কলের অনুকরণে অল্পব্যয়ে গ্রামে ফিল্‌টারে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায়, তাহা দেখাইবার জন্য মণ্ডপে একটি ফিল্‌টার রাখিয়াছিলেন, এইটি দেখাইয়া একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করা হইল। যখন শাখা সভাপতিগণের অভিভাষণ সকলের সমক্ষে পাঠ করা হইল, তখন এই কাজের প্রবন্ধটিও সকলকে শুনাইবার পরে শাখা বিভাগ করা উচিত ছিল।

এবার দর্শন ও বিজ্ঞান শাখায় ৩,৪টি করিয়া প্রবন্ধ এবং সাহিত্য ও ইতিহাস শাখায় ৩০টি করিয়া প্রবন্ধ ছিল। সকাল ৭টায় বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশনের কথা ছিল কিন্তু বসিল ৮।০টায়। শাখা সভায় প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ হইল ৯।০টায়। যে সকল প্রবন্ধ পাঠকের ধৈর্য্য ছিল তাঁহারা বেলা ১২টা পর্য্যন্ত থাকিয়া ইতিহাস ও সাহিত্য শাখায় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। বৈকালে সাহিত্য শাখার জের কিছুক্ষণ চলিয়াছিল। তৎপরে প্রস্তাব গ্রহণ ও পরস্পরকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। আমি মেদিনীপুর লইয়া ৮টা সম্মিলনে যোগদান করিলাম। কিন্তু মেদিনীপুরের প্রত্যেক কাজে অভ্যর্থনা সমিতির যেরূপ প্রীতির নিদর্শন পাইয়াছি, সেরূপ আর কোথাও দেখি নাই।

রবিবার দিন সভার অধিবেশন শেষ হইলে ডাক্তার নিশিকান্ত সেনের "ভারতের দারিদ্র্য ও তাহার প্রতীকার" সম্বন্ধে ল্যাণ্টার্ণ লেক্‌চার হইল। যথাসময়ে রাত্রিকালে প্রীতিভোজনে প্রতিনিধি ও অভ্যর্থনা সমিতির কতিপয় সদস্য একত্রিত হইলেন। রাত্রি ১২।০টার ট্রেনে ইতিহাস শাখা সভাপতি অমূল্যবাবু, ক্ষীরোদবাবু, জলধর দাদা, মনোমোহনবাবু, হিরণবাবু, পরিষদের রামকমলবাবু, বিজলীর শ্রীমান্ নলিনী, বাণীবাবু প্রভৃতির সহিত আমি বিষ্ণুপুরের যাত্রী হইলাম। সর্ব্বকার্য্যে ক্ষিতীশ বাবুকে দেখিয়াছি—এ কয় দিনের দিবারাত্রি খাটুনির পরেও তিনি আমাদিগকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন। অবশ্য স্বেচ্ছাসেবকেরা আগাগোড়া আমাদের সেবা করিয়াছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য। তাঁহারা ষ্টেশনে আসিয়া জিনিষপত্র ট্রেনে তুলিয়া দিলেন। ট্রেনে উঠিয়া দেখা গেল ক্ষীরোদ বাবুর হুঁকাটি হারাইয়া গিয়াছে।

যথারীতি আধঘণ্টা বিলম্বে ট্রেন বিষ্ণুপুরে পৌছিল। কলিকাতার সাহিত্যিকের দল বিষ্ণুপুরের মন্দির দর্শনার্থে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মা ষষ্ঠীর কৃপায় দলে পুরু ছিলেন। তাঁহারা মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হাকিমের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাঁহার গৃহে স্থানাভাব বলিয়া সাহিত্যিকের দল ডাকবাঙ্গলায় চলিলেন। আমি যোখানে আমার গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিলাম।

দেশীয় ভৈষজ্যতত্ত্ব।

["বঙ্গরত্ন"-সম্পাদক কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত, এচ্., এম্, বি]

"ত্রিফলা"

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

৩। বহেড়া।

আমলকীর স্থায় বহেড়াও পূর্ব্বে আমাদের দেশে যত্নে ভারতবাসীর উদ্যানে রক্ষিত হইত। সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম বিভীতক। হিঃ—বহেড়া, মঃ—হেবেড়া ঘাটিঙ্গবৃক্ষ, গুঃ—বেডাং, কঃ—তোরে, তৈঃ—বল্লাতাণ্ডে চট্রে, তাঃ—তনি, তাণ্ড, তোঅস্তি, কাঃ—বলেংলে, অঃ—বলেলজ ও সিংহে বুলু বলে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বহেড়া প্রায় ভারতের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

"বিভীতকস্ত্রিলিঙ্গঃ স্থাদক্ষঃ কর্ষফলস্তুষঃ।
কলিদ্রুমো ভূতবাস স্তথা কলিযুগালয়ঃ॥
বিভীতকং স্বাদুপাকং কষায়ং কফপিত্তনুৎ।
উষ্ণবীর্য্যং হিমস্পর্শং ভেদনং কাসনাশনম্॥
রূক্ষং নেত্র হিতং কেশ্যং কৃমি বৈস্বর্য্য নাশনম্।
বিভীতমজ্জা তৃচ্ছর্দ্দিকফবাতহরো লঘু॥"

অর্থাৎ বিভীতক শব্দ তিন লিঙ্গেই সাধ্য। অক্ষ, কর্ষফল, তুষ, কলিদ্রুম, ভূতবাস এবং কলিযুগালয়, এই কয়েকটী বহেড়ার নামান্তর। বহেড়া—মধুর বিপাক, কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, শীতলস্পর্শ, ভেদক, রূক্ষ, চক্ষু ও কেশের হিতকর এবং কফ, পিত্ত, কাস, ক্রিমি ও বিস্বরতা-নাশক। বহেড়ার মজ্জা—লঘু; কষায় রস, মদকারক এবং পিপাসা, বমি, কফ ও বায়ুনাশক।

আমরা এখানে ভিন্ন ভিন্ন রোগে বহেড়ার ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

(১) জ্বররোগীর কাস হইলে—বহেড়া, পিপুল, পিপুলমূল, ক্ষেৎপাপড়া ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত একটু একটু করিয়া প্রতিদিন ৩।৪বার করিয়া লেহন করিলে কাসের শীঘ্র উপশম হয়।

(২) শ্বাসে বহেড়া—বীজরহিত বহেড়া গোমূত্র দ্বারা অবলেহ প্রস্তুত করিয়া তাহা ৵০ আনা মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস ও কাস নষ্ট হয়।

(৩) বহেড়া চূর্ণ ৵০ আনা মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস কষ্ট দূর হয়।

(৪) বহেড়া বীজের শাঁস ৪।৫টা ও মিশ্রি ।০ সিকি জলের সহিত পাতলা করিয়া সেবন করিলে শ্বাস, হিক্কা নাশ হয়।

(৫) বহেড়ায় গব্যঘৃত মাখাইয়া গোবরের চুলির ভিতর রাখিয়া ঘুটের আগুনের উপর স্থাপন করিতে হইবে। কিছু পরে উদ্ধৃত করিয়া উক্ত বহেড়ার ছাল মুখে ধারণ করিলে উৎকাসি নষ্ট হয়।

(৬) শোথে বহেড়া—বহেড়ার শাঁস পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে ত্রিদোষজ শোথের দাহ ও বেদনা প্রশমিত হয়।

(৭) অশ্মরীতে বহেড়া—আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোনপ্রকার মদ্যের সহিত বহেড়ার শাঁস পেষণ করিয়া পান করিলে মূত্র-বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয় ও অশ্মরী প্রশমিত হয়।

(৮) শুক্রনামক অক্ষিরোগে বহেড়া—বহেড়ার শাঁস মধুর সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে শুক্র-নামক অক্ষিরোগ নষ্ট হয়।

(৯) অতিসারে বহেড়া—দগ্ধ বহেড়া সৈন্ধব লবণ যোগে সেবনে প্রবল অতিসার আরোগ্য হয়।

(১০) হৃদয়গত বায়ুরোগে বহেড়া—অশ্বগন্ধাচূর্ণসহ বহেড়াচূর্ণ পুরাতন ইক্ষুগুড় যোগে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিলে অস্বাভাবিক হৃদয়স্পন্দন প্রশমিত হয়।

বহেড়া সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত—

Astringent, tonic and laxative, with a salt and long pepper it is given as an expectorant in the form of electuries in cough, hoarseness of voice, sore-throat and dyspepsia. The dried pulp roasted is kept in the mouth as lozengess in sore-throat. The fruit is given in diarrhœa, dropsy, leprosy, and also in enlargement of the spleen. (Materia Medica of India, R. N. Khory.)

অর্থাৎ, বহেড়া কষায়, বল্য ও রেচক। সৈন্ধব লবণ পিপ্পলী যোগে বহেড়াচূর্ণ লেহন, কফরোগ, স্বরভেদ, গলক্ষত ও গ্রহণীরোগীর পক্ষে প্রশস্ত। গলক্ষত রোগী ঘৃতভর্জ্জিত বহেড়া মুখে রাখিবে। বহেড়া অতিসার, শোথ, অর্শঃ, কুষ্ঠ ও প্লীহাবিবৃদ্ধি রোগে সেব্য। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া—আর, এন, কোরি)।

ত্রিফলা।

"পথ্যাবিভীতধাত্রীনাং ফলৈঃ স্যাৎ ত্রিফলা সমৈঃ।
ফলত্রিকঞ্চ ত্রিফলা সাবরা চ প্রকীর্ত্তিতা।
ত্রিফলা কফপিত্তঘ্নী মেহ কুষ্ঠ হরা সরা।
চক্ষুষ্যাদীপনী রুচ্যা বিষমজ্বর নাশিনী।"

অর্থাৎ, হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী এই তিনটী ফলের সমপরিমাণে সংযোগকে ত্রিফলা বলে—এ কথা প্রবন্ধ আরম্ভেই উল্লেখ করিয়াছি। ফলত্রিক এবং বরা, এই দুইটী উহার নামান্তর। ত্রিফলা চক্ষুর হিতকারক, অগ্নিপ্রদীপক, রুচিকারক, সারক এবং কফ, পিত্ত, মেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বরনাশক।

এইবার আমি ভিন্ন ভিন্ন যোগে ত্রিফলার ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব।

(১) কফজ্বরে ত্রিফলা—ত্রিফলা, পলতা, বাসক, গুলঞ্চ, কটুকী, বচ ইহাদের কাথ মধুর সহিত সেবনে নানাবিধ কফজ্বর নষ্ট হয়।

(২) ত্রিফলা, পলতা, কটুকী, শঠী, বাসক, গুলঞ্চ ইহাদের কাথ কফজ্বরনাশক।

(৩) বাতপৈত্তিক জ্বরে ত্রিফলা—ত্রিফলা, শিমুলমূল, রাস্না, সোন্দালের আঠা, বাসক ছাল ইহাদের কাথ সেবনে অতি শীঘ্র বাত পৈত্তিক জ্বর আরোগ্য হয় ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

(৪) পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে ত্রিফলা—ত্রিফলা, পলতা, যষ্টিমধু, বেড়েলা ইহাদের কাথ পিত্তশ্লেষ্মনাশক।

(৫) ত্রিফলা, বড় এলাইচ, পলতা, যষ্টিমধু, বাসক ছাল ইহাদের কাথ পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর নষ্ট করে।

(৬) অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরে ত্রিফলা—ত্রিফলা, কিস্‌মিস, মুথা, কুটজ ছাল ইহাদের কাথ পান করিলে অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর নষ্ট হয়।

(৭) ত্রিফলা ও সৈন্ধব ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে ৴৹ আনা মাত্রায় সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর আরোগ্য হয়। ইহা কফনাশক, ভেদক, রুচিকারক, অগ্নপ্রদীপক ও পাচক।

(৮) অজীর্ণে ত্রিফলা—ত্রিফলাচূর্ণ সৈন্ধব লবণসহ সেবনে অজীর্ণ উপশম হয়।

(৯) পাণ্ডুরোগে ত্রিফলা—ত্রিফলা, গুলঞ্চ, বাসক ছাল, কটুকী, চিরতা ও নিমছাল ইহাদের কাথ সেবনে অরুচি, পিপাসা, গাত্রদাহ, হস্তপদ শোথ, মৃদু মৃদু জ্বর, চক্ষু ও শরীরের বিবর্ণতা এবং প্রস্রাবের রং পীতবর্ণতা ইত্যাদি উপসর্গ শীঘ্র দূরীভূত হয়।

(১০) বাতরক্তে ত্রিফলা—ত্রিফলা, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, নিমছাল, কটুকী, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা ইহাদের কাথ পানে বাতরক্ত, দুষ্ট চুলকনা ইত্যাদি সত্বর উপশম হয়।

(১১) ত্রিফলা ও গুলঞ্চ সমভাগে গোমূত্র দ্বারা পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে বাতরক্তে চর্ম্ম কর্কশ, ফাটা ফাটা, চুলকান প্রভৃতি ভাল হয়।

(১২) প্রমেহে ত্রিফলা—ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, রাখালশসা ও মুথা ইহাদের কাথ ৴৹ আনা হরিদ্রাচূর্ণ ও ॥৹ তোলা গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ নষ্ট হয়।

(১৩) ত্রিফলা চূর্ণ সমভাগে।৹ সিকি মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে প্রমেহের উপকার হয়।

(১৪) ত্রিফলা ও কিস্‌মিস্ ইহাদের কাথ পানে অসাধ্য মেহ আরোগ্য হয়।

(১৫) ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু ও চিতা ইহাদের কাথ প্রমেহনাশক।

(১৬) শোথে ত্রিফলা—ত্রিফলা, পলতা, নিমছাল ও দারুহরিদ্রার কাথে ৴৹ আনা পরিমাণ গুগ্‌গুল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক শোথ নষ্ট হয়।

(১৭) একমাত্র ত্রিফলার কাথ শোথের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

(১৮) কুষ্ঠে ত্রিফলা—ত্রিফলা, নিমছাল, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, গুলঞ্চ ও দারুহরিদ্রা ইহাদের কাথ পানে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ ভাল হয়।

(১৯) অম্লপিত্তে ত্রিফলা—ত্রিফলা, পলতা, কটুকী ইহাদের কাথে যষ্টিমধু, চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে অম্লপিত্ত, জ্বর ও বমি নষ্ট হয়।

(২০) কেশে ত্রিফলা—ত্রিফলা, নীলপত্র, ভৃঙ্গরাজ ও আয়ুর্ব্বেদোক্ত লৌহচূর্ণ এই সকল সমভাগে মেষমূত্র দ্বারা পেষণ করতঃ লেপন করিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

উপরিলিখিত ঔষধগুলির যেগুলির প্রস্তুত বিধি লিখিত হয় নাই তাহাদের প্রস্তুত বিধি—মিলিত, দ্রব্য দুই তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেব্য। *

(ত্রিফলা সমাপ্ত)।

মতিলালের মুক্তি।

[শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মজুমদার]

(১)

গোপালপুর গাঁয়ের এক টেরে বাস করত এক ঘর ডোম। সেই ডোম পরিবারের কর্ত্তা ছিল শ্রীযুক্ত মতিলাল ডোম। কিন্তু লোকে তা'কে "মতি ডোম" ব'লেই ডাকৃত।

মতি বুড়ো হয়েছে; বয়স যাটের ওপর। মতির পাঁচ বেটা—সবাই জোয়ান হয়ে উঠেছে। তারা, ঝুড়ি চেটা মাদুর বু'নে বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। মতিকে এখন আর খাটুতে দেয় না। মতি দু'টী ছেলের মহাসমারোহে বিয়ে দিয়েছে—জ্যেষ্ঠ ছেলেটীর একটী সন্তানও হয়েছে; পুত্রসন্তান। মতি আদর করে তার নাম রেখেছে ননীগোপাল। ননীগোপাল এখন চার পাঁচ বছরের। মতিকে এখন কোন কাজ করতে হয় না; কিন্তু সে কাজের মানুষ—চুপ করে বসে থাকৃতে পারে না। নাতির সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করেই সে সমস্ত দিন কাটায়। দীঘীর পাড়ে, আম বাগানে, তেঁতুল গাছের তলায় এখন ননীগোপাল আড্ডা দিচ্ছে। মতি তার সঙ্গেই আছে—ননীকে একদণ্ড ছেড়ে থাকৃতে পারে না। ননীর খেলার জিনিষ সে যোগাড় ক'রে দেয়, ননীকে আম পেড়ে দেয়, ননীর ঘোড়া হয়, ননীকে কাঁধে করে পাড়ায় পাড়ায় গল্প ক'রে বেড়ায়।

মতির ঘরে কোন আপদ বালাই নাই। বেশ সুখেই তার দিন কাট্‌ছে।

(২)

কিন্তু মতির এত সুখ বিধাতার সহ্য হ'ল না। পরের বছর কলেরায় মতির দু'টী ছেলেকে তিনি সরিয়ে নিলেন। তার পরের বছর বিসূচিকায় বাকী তিনটী ছেলে মতির ঘর শূন্য করে চলে গেল। বাকী রইল দু'টী বিধবা পুত্রবধূ, ননীগোপাল, আর তার গৃহিণী।

মতি নিজেই রোজগার করতে লাগ্‌ল—ঝুড়ি চেটা

* অর্চ্চনার পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকেই 'দেশীয় ভৈষজ্য-তত্ত্ব' পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছেন বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তাঁহারা ত্রিফলার ন্যায় বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য গাছপালা সম্বন্ধে আরও জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাই শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণবাবু অর্চ্চনায় আগামী মাস হইতে "ত্রিকটু" (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ) ধারাবাহিক ভাবে লিখিবেন। অর্চ্চনার পাঠক পাঠিকাগণ আশা করি এ সংবাদে সুখী হইবেন সন্দেহ নাই।

"ত্রিফলা" সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকাগণের কোন বিষয়ে জিজ্ঞাস্য থাকিলে দয়া করিয়া লেখকের ঠিকানা "আরোগ্য নিকেতন"—১১১ নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

—"অর্চ্চনা"-সম্পাদক।

বুনে। কাজের পর যেটুকু সময় সে পেত তা' ননীগোপালের সঙ্গে হাস্য পরিহাস ক'রে কাটিয়ে দিত।

বিধি এতেও বাধ সাধলেন। দেখ্তে দেখ্তে পুত্র-বধূ দু'টী ও গৃহিণী কালজ্বর ইনফ্লুয়েঞ্জায় ইহলোকের মায়া ছাড়্লেন। ননীগোপালকে নিয়ে মতি তার যত হাসি কান্নার আলাপ কর্তে লাগ্ল।

শেষে নাতি-নাতি—স্বর্গের বাতিটী শুদ্ধও নিভিয়া গেল। মতি একা ভীষণ শ্মশান জাগিয়ে রইল।

(৩)

এত শোকে মানুষ ক্ষেপে যায়। লোকে মনে করল, মতি এবার নিশ্চয়ই পাগল হবে। কিন্তু তার পাগ্লামির কোন লক্ষণ দেখ্তে পাওয়া গেল না। মতি পূর্ব্বের মত ঝুড়ি চেটা বুনে যেতে লাগ্ল। যা রোজগার করে, তাই খায়।

তবে মতির একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সে তার সুখের সময় ঠাকুর দেবতার মন্দির মোটেই মাড়াত না। এখন ঠাকুরবাড়ীতে নিত্য তার যাতায়াত। নিত্য সে গ্রাম্য দেবতা বিশালাক্ষী মায়ের কাছে যেত—ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করত, খানিকক্ষণ এক দৃষ্টিতে যোড়হাতে মায়ের দিকে চেয়ে থাকৃত। সে কি প্রার্থনা করৃত, অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। দোল দুর্গোৎসবের সময় তার রোজগার থেকে যা কিছু সঞ্চয় কর্তে পারৃত সমস্তই ঠাকুরের সেবায় দান করৃত। তারই দানে গোটাকতক কাঙালী ঐ সব পুজোর সময় পাত পাড়্তে পেত। কিন্তু নাম হ'ত ঠাকুরের মালিকের। অপবিত্র ডোমের কে কবে নাম করে?

লোকে জিজ্ঞাসা করত, "মতি, কবে থেকে এমন দেব-ভক্তি শিখ্লে?"

মতি বলৃত, "বাবা, অমন কথা বলো না। আমি দেব-ভক্তির কি জানি? আমি এমনই মহাপাতক যে আমার সুখের সময় কখনও একবার ঠাকুর দেবতার নাম মুখে আনি নি। আমার সংসারের বন্ধন কেটে গেছে—ভালই হয়েছে। মোহ মায়ার বশে এতদিন ঠাকুর দেবতাকে চিনতে পারি নি। আমার পাপের কি শেষ আছে? তবে জানি, ঠাকুর পতিতপাবন—এই অপবিত্র ডোমকে উদ্ধার করা তাঁর দয়া। দয়াল ঠাকুর, আমাকে কি চরণে স্থান দিবেন?" বল্তে বল্তে মতির গাল চোখের জলে ভেসে যেত।

লোকে অবাক হয়ে ভাব্ত, "তাই ত,এ ডোম সন্তানের হল কি?

(৪)

সে দিন শিবরাত্রি। সকলেই নিজ নিজ পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য শিবরাত্রি করেছে। মতির মনে আজ খুব উৎসাহ। মতি আগের দিনে সংযম করেছে, আজ উপবাসে আছে। দই, মধু, ঘি, দুধ, বেলপাতা, ফুল প্রভৃতি পূজার্ঘ্য সংগ্রহ করে রেখেছে, দয়াল ঠাকুর কৈলাসনাথের শ্রীপাদ পদ্মে দেবার জন্য।

মাঝে মাঝে ব'লে উঠ্ছে, "জয় বাবা কৈলাসনাথ, এ অপবিত্রকে চরণে স্থান দিও।" বাবা কৈলাসনাথ বিরাজ করছেন সোনাডাঙ্গায়। সোনাডাঙ্গা চার পাঁচ ক্রোশের রাস্তা। বৈকালে শুদ্ধভাবে "জয় বাবা কৈলাস-নাথ!" বল্তে বল্তে তার সেই সামান্য পূজার্ঘ্য নিয়ে সে বেরিয়ে পড়্ল। রাত্রি দশটায় সেখানে পৌছিবে।

দু'ক্রোশ যেতেই আকাশের কোণে একখণ্ড মেঘ দেখা দিল। সেই মেঘখণ্ড বাড়্তে বাড়তে বিরাটাকার ধারণ করে আকাশ ছেয়ে ফেল্ল। একটু পরেই এল ঝম্ঝমিয়ে বৃষ্টি! তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে—আকাশের মাথায় হিল্ হিল্ করে' সাপের মত কুটিল গতিতে বিদ্যুৎ ছুটে যাচ্ছিল। ক্রমে ঝড় বইল। অন্ধকার ঘুটঘুটে। তেমন দুর্য্যোগময়ী রাত্রিতে বার হয় কার সাধ্যি?

মতির দৃক্‌পাত নাই। মনে করলেই সে রাস্তার পাশে যে গাঁ প'ড়ে রয়েছে তা'তে আশ্রয় পেতে পারৃত। কিন্তু তার ভয়,সারারাত্রি এই রকম ঝড় বৃষ্টি হ'লে সে যদি আশ্রয় পেয়ে বসে থাকে তা'হলে দয়াল ঠাকুরের পূজা করা শিব-রাত্রিতে ঘটবে না। ঝড় বৃষ্টি মাথায় ক'রে সে রাস্তা বে'য়ে চল্তে লাগ্ল।

(৫)

রাত্রি আন্দাজ দশটা। বাবা কৈলাসনাথের মন্দিরে আজ বড় বেশী ভিড় নাই, কারণ অনেকে শিবরাত্রি করা

স্বপ্নেও এই দুর্য্যোগময়ী রাত্রিতে ঘর থেকে বার হন নাই। যাঁরা এসেছেন তাঁরা পূজো সে'রে ফেলেছেন—কেউ কেউ শিবের সামনে বসে জপ কর্‌ছেন—কেউ কেউ মনে কর্‌ছেন, এই ঝড় বৃষ্টি থাম্‌লেই বাড়ী যাব। পূজারী মহাশয় পূজক না পেয়ে চুপটী করে নিজের আসনে ব'সে আছেন।

এমন সময় একটী লোক বেগে এসে বাবা কৈলাসনাথের সামনে হাঁটু গেড়ে বস্‌ল। লোকটার কাপড় কাদায় ভরে গেছে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। তার হাতের পূজোর ঠোঙাটী কৈলাসনাথের পায়ের কাছে সে রাখ্‌লে। সে হাঁপাতে হাঁপাতে পূজারী ঠাকুরকে বল্‌তে লাগ্‌ল, "ঠাকুর, আমার নাম মতি, জাতে ডোম—অনেক দূর থেকে আস্‌ছি, পথে ঝড় বৃষ্টিতে বড়ই কষ্ট পেয়েছি! ঠাকুর, দয়া করে আমার পূজোটি সে'রে দিন!"

বাবা কৈলাসনাথের দিকে তাকিয়ে যোড়হাতে বল্‌লে, "বাবা, এ অধীনের অপরাধ নিও না! আমি বড় অধম—অধমের এই পূজোয় সন্তুষ্ট হও! পতিতপাবন, অধমকে ও চরণে স্থান দিও। অপবিত্রকে উদ্ধার—"

পূজারী মহাশয় দেখ্‌লেন, ডোমটা শিবলিঙ্গ ছোঁবার উদ্যোগ করেছে—তিনি বাধা দিতে যেয়েই দেখ্‌লেন যে তখন ডোমটা শিবলিঙ্গের পাদদেশ স্পর্শ করে সটান লুটিয়ে পড়েছে।

"একি কর্‌লি! একি কর্‌লি! আরে অপবিত্র, শিবলিঙ্গ ছুঁয়ে ফেল্‌লি যে! কি বিভ্রাট!" বলে পূজারী মহাশয় চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন।

ভক্তবৃন্দ যাঁরা পূজো সে'রে বাড়ী ফের্‌বার সুযোগ খুঁজ্‌ছিলেন—সবাই ছুটে এলেন। একজন বল্‌লেন, "ব্যাপার কি? লোকটা ত অনেকক্ষণ লুটিয়ে পড়ে আছে! মর্‌ল নাকি? বুড়ো হয়ে গেছে—উপবাসের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বোধ হয় এই বিভ্রাট ঘটালে। আচ্ছা, দেখি ওর বুক হাত পরীক্ষা করে!"

পূজারী মহাশয় লাফিয়ে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন, "ছোঁবেন না, ছোঁবেন না! বেটা জাতিতে ডোম! বেটা শিবলিঙ্গ ছুঁয়ে অপবিত্র কর্‌লে। কি বিভ্রাট!"

মন্দিরের ভেতর যখন এই সব কোলাহল চল্‌ছিল, বাইরে ঝড় বৃষ্টি দাপাদাপি কর্‌ছিল, তখন সেই অপবিত্র ডোম সন্তানের মনোবাসনা পূর্ণ হ'তে বাকী ছিল না। *

রামায়ণের কথা।

[শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ]

ইতিপূর্ব্বে আমি আপনাদিগকে মহাভারতের কথা বলিয়াছি। আপনারা পুণ্যবান বলিয়াই অমৃতের কথা বিষের ন্যায় হইলেও আপনারা শুনিয়াছেন এবং সেই ভরসায়ই আজ আবার আপনাদিগের সম্মুখে রামায়ণের কথা লইয়া উপনীত হইয়াছি। আমার বলিবার ভঙ্গীর দোষেই যে অমৃতোপম কথা বিষতুল্য হয় তাহা বলাই বাহুল্য। দেখা যাক ভূতের মুখে রামনাম এবার আপনাদের নিকট কেমন বোধ হয়।

গতবারে 'মহাভারতের কথা' বলিবার সময় আমি মহাভারতের রচনাকাল সম্বন্ধে কোন আলোচনা করি নাই। এবারেও আমি রামায়ণের রচনাকাল সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। অর্থনীতির দিক হইতেই আমি ইহারও আলোচনার প্রয়াস পাইব। রামায়ণের লোক-প্রিয়তার সম্বন্ধে কিছুই বলিবার আবশ্যকতা নাই। বাল্মীকি নিজে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর আর কোন কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই।

তবে কথাপ্রসঙ্গে বলিতে পারি যে, আমার মতে মহাভারত রামায়ণ অপেক্ষা আধুনিক। মহাভারত রচনা হইবার পূর্ব্বে যে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, তাহা উভয়ের সভ্যতা পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয়। আচার্য্য ম্যাকডোনেল্ড তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসেও এই

* সত্য ঘটনামূলক।

কথাই বলিয়াছেন। (১)। অবশ্য, মহাভারতে আমরা যেরূপ দেখিতে পাই, এক্ষেত্রেও অর্থ অর্থে কেবল মুদ্রাই বুঝাইত না (২)—অশ্ব, হস্তী, চর্ম্ম প্রভৃতিও (৩) বুঝাইত। মহাভারতে অবশ্য আমরা ইহাই দেখিতে পাই (৪) যে ধান্য, গোধুম, মুক্তা, পশু, অশ্ব, হস্তী, গাভী এবং সুবর্ণও মুদ্রার সহিত অর্থের মধ্যে পরিগণিত হইত। রামায়ণে দেখিতে পাই যে, গাভীই (৫) সাধারণতঃ বিনিময়ার্থ ব্যবহৃত হইত। সুবর্ণ ও রৌপ্য (৬) উল্লিখিত হইলেও, গাভীকেই প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। রাজা দশরথ সুবর্ণ ও রৌপ্য দান করিলেও, সেই সঙ্গে দশ লক্ষ গাভী দান করিয়াছিলেন। রাজা পৃথিবী ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বিনিময়ে সুবর্ণ ও রৌপ্য প্রার্থনা করিলেন না, প্রার্থনা করিলেন গাভী (৭)। সতী সীতা গঙ্গা ও কালিন্দীর সন্তোষার্থ তাঁহাদিগকে সহস্র সহস্র গাভীদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অবশ্য, ইচ্ছা করিলে তিনি যে সুবর্ণ ও রৌপ্যদান না করিতে পারিতেন, তাহা নহে। আমাদের মনে হয় বিনিময়ার্থ গাভীরই প্রচলন ছিল বলিয়াই তিনি সুবর্ণ ও রৌপ্যের পরিবর্ত্তে গাভীর কথাই উল্লেখ করিয়াছিলেন। কথান্তরে আমরা দেখিতে পাই যে, গোমতী তীর গাভীপূর্ণ ছিল (৮)। রাম নিজ অর্থ বিতরণ কালে ত্রিজটা নামক ব্রাহ্মণকে গাভীই প্রদান করিয়াছিলেন (৯)। অবশ্য কিছু কিছু সুবর্ণ মুদ্রাও প্রদান করিয়াছিলেন (১০)। বৈদিক যুগে যে নিষ্কের প্রচলন ছিল রামায়ণী যুগেও নিষ্কের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (১১)। রাজা কেকয় ভরতকে দ্বিসহস্র নিষ্ক প্রদান করিয়াছিলেন। এগুলি যে গহনা নহে, মুদ্রা, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। (১২)।

মহাভারতের ন্যায় রামায়ণেও আমরা ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের উল্লেখ পাই (১৩)। রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ভরত তিনটাই—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সমান ভাবে ভোগ করিতেছিলেন কি না। মহাভারতেও আমরা এইরূপ প্রশ্ন পাই। (১৪) কুম্ভকর্ণও রাবণকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

কৃষি।

রামায়ণে কৃষির উন্নতির প্রয়াসের আমরা যথেষ্ট নিদর্শন পাই। নরপতিকে বেদ, কৃষি এবং বাণিজ্য—তিনটাই শিক্ষা করিতে হইত। কৃষক ও গোপালকগণ যাহাতে সুখী ও সুস্থ থাকে তজ্জন্য রাজার প্রতি শাস্ত্রের আদেশ ছিল। যাহাতে তাহাদের অভাব না থাকে, দুঃখ মোচন হয়, তজ্জন্য নরপতি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। অযোধ্যায় বহুসংখ্যক কৃষক বাস করিত; অযোধ্যা ধান্যে পূর্ণ থাকিত। (১৫) কেবল রাজধানী নহে, কোশলরাজ্যই ধান্যপূর্ণ থাকিত (১৬)। মিথিলারাজ স্বয়ং কৃষকের বৃত্তিতে আনন্দানুভব করিতেন।

তবে সে সময়েও দুর্ভিক্ষ ছিল (১৭)। রাজা দুর্ভিক্ষ নিবারণে তৎপর থাকিতেন। রাজদোষে দুর্ভিক্ষ হইত, তাই রোমপদ রাজার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল।

শিল্প।

রামায়ণী যুগে শিল্পোন্নতির নিদর্শনের অভাব দৃষ্ট হয় না। শিল্পিগণ বিশেষ অধিকার ভোগ করিত। জল সেচন-

(১) "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস", ৩০৬ পৃষ্ঠা।

(২) বালকাণ্ড ৫ এবং অযোধ্যা ১০০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৩) অযোধ্যা ৭০ অধ্যায়।

(৪) সভাপর্ব্ব এবং আদি দ্রষ্টব্য।

(৫) বাল ৫৩।

(৬) বাল ১৪, অযোধ্যা ৭০। ডাক্তার ভাণ্ডারকার অনুমান করেন যে বালকাণ্ডে উল্লিখিত সুবর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা দীনার।

(৭) বাল ১৪ এবং কিষ্কিন্ধ্যা ৫।

(৮) অযোধ্যা ৪৯।

(৯) অযোধ্যা ৩২।

(১০) ঐ

(১১) বালকাণ্ড ৬; অযোধ্যা ৭০।

(১২) Vedic Index ১।৪৫৪ দ্রষ্টব্য।

(১৩) অযোধ্যা ১০০।

(১৪) সভা ৫।৮৫, ৮৬। আদি ২২৪।

(১৫) অযোধ্যা ১৯, ৪২।

(১৬) অযোধ্যা ৭৫।

(১৭) বালকাণ্ড ৯; অযোধ্যা ১৬০।

প্রণালী ও রাজপ্রাসাদাদি নির্ম্মাণে শিল্পিগণেরও বিশেষ অধিকার ছিল। অযোধ্যা এই সকল শিল্পী পরিপূর্ণ ছিল এবং তাহাদিগের মনোনয়নের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। রামায়ণে শিল্পের এক বিস্তৃত তালিকা পাওয়া যায় (১৮); তদ্দৃষ্টে তৎকালীন শিল্পিগণের অবস্থার বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

যুদ্ধসংক্রান্ত অস্ত্রাদি নির্ম্মাণে বিশেষ কৌশল প্রদর্শিত হইত (১৯)। কেবল যে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণেই পারদর্শিতা দৃষ্ট হইত তাহা নহে; গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতেও পারগতা দেখা যাইত। (২০)। রাবণের ঐশ্বর্য্যশালী প্রাসাদ ও তাহার বর্ণনা পাঠকালে, বহুশতাব্দীর পরবর্ত্তী খালিফগণের কর্দ্দোভার প্রাসাদ বর্ণনা হীন হইয়া পড়ে। হনুমান প্রাসাদ দৃষ্টে সত্যই বলিয়াছিলেন যে লঙ্কা বস্তুতঃই স্বর্গ।

বয়নশিল্প।

বয়নশিল্পেও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। রেশম বস্ত্র সদা সর্ব্বদাই উল্লিখিত হইয়াছে। এমন কি দণ্ডক গমনকালেও সীতা রেশমী বস্ত্র পরিহিতা ছিলেন (২১) অশোকবনেও সীতা রেশম বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন (২২)। সীতার বিবাহের সময় জনক তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে রেশমী বস্ত্র উপহার দিয়াছিলেন (২৩)। সীতার অভ্যর্থনাকালে দশরথ-মহিষীরা ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহাদের বধূমাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। বনে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাতাভিলাষী হইয়া ভরত ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন (২৪)। রাবণ সীতার নিকট গমন কালে এইরূপ বস্ত্রই পরিহিত ছিলেন; শয়নকালেও তিনি ইহাই পরিধান করিতেন (২৫)। মৃত্যুর পরেও তাঁহাকে ইহাতেই সুসজ্জিত করিয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল (২৬)। সাধারণ বস্ত্রের উল্লেখও দৃষ্ট হয় (২৭)। এতদ্ব্যতীত সুবর্ণখচিত বস্ত্র, সুবর্ণ তন্তু নির্ম্মিত নীল বস্ত্র এবং মুক্তাখচিত আস্তরণের উল্লেখ আছে। (২৮)

বাণিজ্য।

রামায়ণ কালে নরপতি বৃন্দ বেদ ও কৃষি শিক্ষার সহিত বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রদত্ত হইতেন। নানা দেশ হইতে বণিক্‌গণ অযোধ্যায় সমাগত হইতেন। রামের বনগমন কালে সমৃদ্ধিশালী বণিক্‌গণ তাঁহার সহগামী হইয়াছিলেন। (২৯) বণিকগণ সামুদ্রিক বাণিজ্যে ব্রতী থাকিতেন (৩০) গুহকের যন্ত্রচালিত নৌকা ছিল এবং তিনি পাঁচশত নৌকার অধীশ্বর ছিলেন। সীতান্বেষণে ব্রতী কপিগণকে সুগ্রীব যে আদেশ প্রদান করেন, তাহা হইতে দাক্ষিণাত্যবাসী ব্যক্তিগণের পরিজ্ঞাত স্থানসমূহের তালিকা পাওয়া যায়। (৩১) এমন কি চীনও যে তাহাদের অপরিজ্ঞাত ছিল না তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় (৩২)। যবনদ্বীপ, লোহিত সাগর প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

সামান্য আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। "মহাভারতের কথা"য়ও ইহা উল্লেখ করিয়াছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে প্রাচীন কালে ভারতে রাজন্যবর্গ অত্যন্ত প্রজাপীড়ন করিতেন। আমেরিকার অধ্যাপক হপ্‌কিন্স এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের কয়েকটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের পক্ষে সমীচীন হয় নাই। মহাভারত আলোচনা কালে আমি ইহা বলিয়াছি। রামায়ণেও

(১৮) অযোধ্যা ২।৯০।
(১৯) কিষ্কিন্ধ্যা ৮; আরণ্যক ৩, ২১, ৪০; সুন্দর ৪৭
(২০) আরণ্যক ৫২, ৫৪; অযোধ্যা ৯।
(২১) অযোধ্যা ৬, ২০, ৩২, ৬৫।
(২২) আরণ্যক ৬৬।
(২৩) বাল ৭৪।
(২৪) অযোধ্যা ৮১।
(২৫) সুন্দর ১০।
(২৬) সুন্দর ১১৩।
(২৭) কিষ্কিন্ধ্যা ও অযোধ্যা।
(২৮) সুন্দর। অযোধ্যা ৬৭।
(২৯) অযোধ্যা, ৬৬।
(৩০) অযোধ্যা ৭২।
(৩১) কিষ্কিন্ধ্যা ৪০।
(৩২) কিষ্কিন্ধ্যা ৪০।

দৃষ্টান্তের অভাব হয় না। রামচন্দ্র বলিয়াছেন, যে রাজা প্রজার ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিয়া প্রজাকে পুত্রের ন্যায় পালন না করেন, তিনি মহাপাপী (৩৩)। যে রাজা প্রজাবর্গকে নিয়মিতরূপে পালন করিতেন, তিনি প্রজার পুণ্যের এক-ংশের ভাগী হইতেন। (৩৪) এরূপ দৃষ্টান্তসমূহ বিরল নহে। যে রাজা প্রজার নিকট কর গ্রহণ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন না করিলেন, তিনি নরকগামী হইতেন —প্রজার পাপ তাঁহাতেই স্পর্শিত হইত, একথা প্রাচীন ভারতে বিশেষরূপে মান্য করা হইত।

এ সম্বন্ধে আপনাদিগকে অন্য দিন আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

চোকের দেখা।

[শ্রীসুশীলকুমার রায়]

১

সেই ন'বছরের মেয়েটির সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল দোতালার জান্‌লার ফাঁক থেকে,—শুধু চোকে চোকে।

তখন কলেজে গরমের ছুটি। সহপাঠী যত বন্ধু বান্ধব সবাই যে যার বাড়ীর দিকে রওনা হ'য়ে প'ড়েছে, আর আমিও চ'লে এসেছি এক বন্ধুর বাড়ী বহরমপুরে। ক'লকাতা সহর এখন কিছুদিন বিশ্রাম করুক। বাবা, বিশেষ ক'রে মা আপত্তি তুলেছিলেন কিন্তু আমার চোকের জল, আর রমেশের হাতজোড় ক'রে অনুনয় কিছুই টিঁকতে দেয় নি।

আমোদ আহ্লাদের ভেতর দিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে একমাস কেটে গেল। বন্ধু-প্রীতির জন্যই হ'ক কিম্বা স্থান পরিবর্ত্তনের গুণেই হ'ক, বহরমপুর আমার কাছে বড়ই প্রিয় হ'য়ে উঠেছিল। দুপুর বেলা বই প'ড়তে প'ড়তে ঘুমুনো, আর রাতে ক্যারম্ বোর্ডের ওপর কতকগুলি কাঠের ঘুঁটি নিয়ে কসরত করা যেন নাওয়া খাওয়ার মত একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল।

সেদিন দুপুর বেলা দোতালার ঘরের ভেতর বই হাতে ক'রে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোন্ জান্‌লাটার ধারে ব'সলে পড়াটা ঠিক হবে বুঝে-উঠতে পাচ্ছিলাম না। ঘরের দোর ত' বন্ধ ক'রেই দিয়েছি।.. যদি পালঙ্কের ওপর শুয়ে শুয়ে পড়ি, তাহ'লে রোজ যেমন পড়া হয় তেমনি হবে অর্থাৎ এমনি ঘুমিয়ে প'ড়ব।...আচ্ছা, যদি ঐ জান্‌লাটার ধারে বসি? না, লাল সুরকিঢালা রাস্তা রোদ্দুরে পুড়ে যেন চারিদিকে আগুন ছড়াচ্চে। পশ্চিমের দিকে জান্‌লাটা বন্ধই থাকে। সেই জান্‌লা খুলে আজ পড়া ঠিক ক'রলাম।

জান্‌লাটা খুলে দেখি নীচে একটা পোড়ো বাগান। চারিদিকে ভাঙ্গা বেড়া দিয়ে কোন রকমে ঘেরা। মাঝখানে একটা বুড়ো শিউলি গাছের গোড়ায় মস্তবড় শিঙ বাঁকানো এক গাই গরু বাঁধা। সামনে একটা ভাঙ্গা বাল্‌তীর ভেতর কিছু খোল ও বিচুলি কুচোনো। ওধারে বাগানের পাশে খানিকটা শুক্‌নো জমা, তাতে চাষিরা কত কি শাক্ বুনে দিয়েছে। বাগানে ঢুক্‌তেই পাশে একটি ভাঙ্গা মন্দির। রোয়াকের ফাটল ভ'রে আকন্দ ও ভাঁটফুলের গাছ।

বই হাতে জান্‌লার ধারে ব'সে দু একখানা পাতা কেবল উল্‌টেছি, এমন সময় দেখি মন্দিরের বাঁক থেকে একটি আট ন'বছরের মেয়ে অতিকষ্টে এক বাল্‌তি জল নিয়ে গরুর কাছে নাবিয়ে ঝুলেপড়া আঁচলটা জড়িয়ে গাছ কোমর বাঁধলে। তার পর কচিহাতে ছোট্ট একটি কিল উঁচিয়ে বল্লে, "আজ তোরে মেরেই ফেলবো। রোজ ব'লে যাই ঐ শিউলির ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকবি, শুয়ে শুয়ে জাব খাবি, কিন্তু তোর রোদ্দুর না হ'লে হয় না, না?" অত বড় শিঙ বাঁকানো গরুটা কিছু বুঝতে পারলে কি না জানি না, তবে নিরীহের মত মুখ নীচু ক'রে বাল্‌তি থেকে জল খেতে লাগল।

(৩৩) আরণ্যক ৬।

(৩৪) আরণ্যক ৫৮, উত্তর ৭০।

বালিকার উগ্রমূর্ত্তি শান্ত হ'য়ে গেছে। সে গরুর গলায় ধীরে ধীরে হাতবুলিয়ে দিতে লাগল।

সেদিন আর আমার পড়া হ'ল না। বেলা তখন প'ড়ে এসেছে। বাইরে থেকে দরজার ওপর দুম দাম ক'রে ধাক্কা প'ড়তে লাগল। এই সময়টা রমেশের ছোট বোন চপলা জল খাওয়াবার জন্যে বড় জ্বালাতন করে।

২

এখন থেকে রোজ দুপুর বেলা ঘরে দোর দিয়ে জান্‌লাটি খুলে বই হাতে ক'রে ব'সে থাকি আর মাঝে মাঝে বাগানের দিকে চেয়ে দেখি। ঠিক একই সময়ে সেই মেয়েটি এক বাল্‌তি জল নিয়ে গরুর কাছে আসে আর কিছুক্ষণ বকাবকির পর আবার আপোষে মিটমাট হ'য়ে যায়।

একদিন দেখি মেয়েটি গরুর বাঁকানো শিঙ দুটো ধরে বেশ টান্‌তে টান্‌তে ছাওয়ায় নিয়ে যাচ্চে। তারপর বাল্‌তিটা কাছে নিয়ে গিয়ে মুখটা তার ওপরে গুঁজড়ে ধ'রে বল্লে, "নে, জলটা খেয়ে নে। ঢের ঢের দেখেছি এমন অবাধ্য কখন দেখিনি বাপু।"

আমি তার এই অসাধারণ গিন্নীপনা দেখে যেন অবাক হ'য়ে যাচ্ছিলাম। খালি বালতিটা হাতে ক'রে নিয়ে মুখ ভার ক'রে সে যেমনি উঠে দাঁড়াল, আমি আর থাকতে পারলাম না। বলে ফেল্লাম "ও খুকি!" হাতের বাল্‌তিটা তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়েই দু'হাতে চোক দুটো চেপে ধ'রে খুকি ছুট্টে পালিয়ে গেল। আমিও জান্‌লার কপাট দুখানা জোরে বন্ধ ক'রে দিলাম।

৩

দু' চার বছর কেটে গেছে।

রমেশ এখন কলেজ ছেড়ে ল' কলেজে ঢুকেচে। তার বাপের ইচ্ছে সেও বহরমপুরে প্রাক্‌টিস্ করে। আর আমি কাঁচড়াপাড়া লোকো ওয়ার্ক-সপে ঢুকেছি,—একজন লোহা পেটা পাকা মিস্ত্রী হ'ব ব'লে।

মাঝে মাঝে ক'লকাতায় এসে মার সঙ্গে দেখা ক'রে যাই। রমেশের সঙ্গেও আলাপ ছাড়িনি, একদিন অন্তর তার চিঠি পাই।

বিকেল বেলা হাত পা ধুয়ে কোয়ার্টারের ভেতর নিজের ঘরটিতে চুপ ক'রে ব'সে আছি। সাম্‌নের মাঠ দিয়ে একজন প্রৌঢ়া একটি খাড়া খাড়া শিঙ উঁচু করা গরুর গলার দাঁড় ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে যাচ্চে আর পেছনে দুটি ছোট ছেলে পাঁচুনবাড়ি হাতে কড়া পাহারা দিতে দিতে চ'লেছে।

অনেক দিনকার ভুলে যাওয়া একটা ঘটনা হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল। সেই বহরমপুরের বাড়ী। পাশে পোড়ো বাগান। শিঙ্ বাঁকানো মস্তবড় গরু,—আর সব চেয়ে সেই মন্দিরের বাঁকে এক বাল্‌তি জল হাতে ছোট্ট মেয়েটিকে!

রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে ভাল ঘুম এল না। তার স্নেহ মমতায় ভরা মুখ, বুড়ো শিউলি গাছের ছায়ে বাল্‌তিতে মুখ গুঁজড়ে ধ'রে জল খাওয়ান, সব যেন চোকের সামনে ভেসে উঠল। সেই মেয়েটি হয় ত' এতদিন বেশ বড় হ'য়ে উঠেছে। কোন্ দেশের কোন্ জায়গায় যেন তার শ্বশুরবাড়ী। গরুটিকে আর বোধ হয় সেই জায়গায় টেনে নিয়ে এসে কেউ বাঁধে না। তারপর তার স্বামী হ'য়েছে বোধ হয় বদ্‌রাগি। একটু কথাতেই ধ'রে মারে। না, না, তা কিছুতেই নয়। যে অত ছোট বেলায় মস্ত গরুর শিঙ্ ধ'রে, টেনে, ধম্‌কে, কিল উঁচিয়ে, তারপর গলার ওপর ধীরে ধীরে কচি হাত বুলিয়ে বশ ক'রেছিল, সে কি তার দুর্দান্ত স্বামীকেও বশ ক'রতে পারবে না? যদি অভিমানে কিছু নাই বলে! রাগে লাল টুকটুকে ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে ঘরের কোণ্‌টিতে বসে চোকের ওপর সাড়ীর আঁচলখানি চেপে ধ'রে শুধু যদি কাঁদে! হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার যে বড় লজ্জা। সে কিছুতেই এ সব পারবে না। সে যেন কোন্ অজানা দেশের স্যাঁতানো ঝোপের ভেতর কোন্ নামহীন ফুল। লতা পাতার ভেতর গোপনে ফুটে আশে পাশে যত প্রতিবেশী গাছপালা, ফল ফুল, সবাইকে নিজের স্বভাবের কোমলতায় মিষ্ট গন্ধে মাতিয়ে রাখে, কিন্তু সূর্য্যের এতটুকু কড়াতেজ, মানুষের হাতের একটু স্পর্শ তার সয় না। অমনি কুঁকড়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ে যায়।

সমস্ত রাত্রি এই রকম কত কি আবোল-তাবোল ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন ঘুমিয়ে প'ড়েছি জানি না। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন বেশ সকাল হ'য়ে গেছে। তাড়াতাড়ি দোরটা খুলে দিয়ে আবার শুয়ে প'ড়লাম। রবিবার ব'লে আজ তেমন সকাল সকাল ওঠবার তাড়া ছিল না। আমাদের ছোকরা চাকরটা এসে একখানা খাম টেবিলের ওপর রেখে গেল। কোন রকমে হাত বাড়িয়ে খামখানা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেখি, বড় বড় অক্ষরে শুভ বিবাহ। রমেশের তাড়াতাড়ি হাতের জড়ানো লেখা "চপলার পনেরই বিয়ে। আর সময় নেই। যত শীগ্‌গির পারো এস। সাক্ষাতে সমস্ত ব'লব। কোন ওজর আপত্তি শুনবো না। আসা চাই—চাই-ই—

তোমার রমেশ।"

এরপর আর কুড়েমি ক'রে শুয়ে থাকা যায় না। তখনই তাড়াতাড়ি মুখে চোকে জল দিয়ে সিনিয়রদের সঙ্গে ছুটি নেবার একটা ব্যবস্থা ক'রে ষ্টেসনের দিকে চাকরটাকে পাঠিয়ে দিলাম সুবিধামত গাড়ী ও ভাড়াটা জেনে আসতে।

৪

বিয়ের দু' দিন হৈ হৈ ক'রে কেটে গেল। রমেশেতে আমাতে দু'জনে চন্দন ঘষে চপলাকে সাজিয়ে দিয়েছিলাম। সকাল বেলা বর ক'নে বিদায় দেবার সময় আমিও চোকের জল রাখতে পারি নি।

বিকেল বেলা দুই বন্ধুতে বেড়াতে বেড়াতে বাড়ীর পশ্চিমধারে সেই পোড়ো বাগানটার ভেতর এসে দাঁড়ালাম। চারিদিকের বেড়া আরো ভেঙ্গে গেছে। শিউলি গাছের অনেক পাতা পেকে ঝ'রে প'ড়েছে। জাব খাবার মরচে পড়া ভাঙ্গা বালতিটা উপুড় করা।

রমেশকে সব কথা খুলে বল্লাম। সে বল্লে, "ওঃ সেই চটপটে মেয়েটা—ক্ষেমী। ঐ যে মন্দিরের পাশে গোল-পাতার ছাওয়া ঘর, ঐখানে তার বাড়ী। চল, তার বুড়ি দিদিমার কাছে খবর নিয়ে আসি। আমিও অনেকদিন তাকে আর দেখি নি।"

দু'জনে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সেই গাই গরুটা চালার একপাশে শুয়ে জাবর কাটছে। বড্ড রোগা। পেটের সরু সরু হাড় এক একটি কোরে গোনা যায়। রমেশ এদিক ওদিক একটু ঘুরে ডাক্‌লে—"ক্ষেমী ও ক্ষেমী।" দোর খুলে একজন বৃদ্ধা বেরিয়ে এল। "কে বাবা তোরা, আমার ক্ষেমী কি আবার ফিরে এসেছে?" বৃদ্ধার দুই চোক দিয়ে টপ্‌ টপ্‌ ক'রে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

দাওয়ার ওপর তালপাতার বোনা একখানা ছেঁড়া চেটাই পড়েছিল। আমরা দু'জনে অন্যমনস্ক ভাবে তার ওপর বসে পড়লাম। আমার মুখ থেকে আর কোন কথাই বেরুল না। রমেশ বল্লে, "হ্যাঁগা, কি হয়েছিল?"

বুড়ি একবার সাদা ফ্যাকাশে চোক দুটো চারিদিকে বুলিয়ে নিয়ে বল্লে, "একখানা চিটি কাকে দিয়ে লিখিয়েছিল—'ওগো আমায় নিয়ে যাও, বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।' জামাই নাকি মাতাল ছিল। বাছাকে ধরে ধরে মারত।" বুড়ি এবার চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। আমার বুকের ওপর ধড়াস করে কে যেন ঘুঁষি বসিয়ে দিলে। আমি আর থাকতে পারলাম না। বলে ফেল্লাম, "সে কিছু ব'লতে পারত না?" বুড়ি আঁচল দিয়ে চোকদুটো মুছে নিয়ে বল্লে, "কিছু ব'লত না গো, কিছু না। মুখটি বুঁজে মা আমার সব সহ্য ক'রত।" আমার চোকের সামনে যেন ক্ষেমীর শুকনো মুখখানা দেখ্‌তে পেলাম। দাওয়া থেকে নেমে পড়ে বল্লাম, "কিসে গেল?" বুড়ি ধনুকের মত বাঁকানো পিটটা একটু সোজা ক'রে বল্লে, "এই বুকের মাঝখানে লাথি মেরেছিল। বাছা আমার এক ঘণ্টা উঠতে পারে নি। সেই যে বিছানা নিলে আর ওঠে নি গো, ওঠে নি।" আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পারলাম না। রমেশের হাত ধরে টেনে বেরিয়ে পড়লাম।

পড়ন্ত সূর্য্যের শেষ ছটা ভাঙ্গা মন্দিরের চুড়ার ওপর পড়ে চিক্‌ চিক্‌ করছিল। ভাঁট ও আকন্দ ফুলের গাছ-গুলো ফুলে ভরা। মন্দিরের ভেতর কতকালের প্রতিষ্ঠিত পুরানো শিবলিঙ্গ। রমেশ মাথা নুইয়ে প্রণাম করলে, কিন্তু আমি পারলাম না। মনে হ'ল ক্ষেমীর মত বুকফাটা যাতনার চাপা নিশ্বাস তার আশে পাশে ভিড় ক'রে আছে, আর চোকের জল মাথার ওপর আবার খড় বেয়ে একফোঁটা একফোঁটা ক'রে ঝরে পড়চে।

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

ইউরোপীয় সাহিত্যে বিচারের মাপকাঠি।

আর্ট বা শিল্পকলা অর্থে সাধারণতঃ স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রাঙ্কণ, সঙ্গীত ও সাহিত্যকে বুঝায়। নাট্য কলা, বাগ্মিতা ও নৃত্যনৈপুণ্যকে আর্ট হিসাবে ধরা যায়। কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁতী, স্যাকরা ও জহুরীদের কাজে যথেষ্ট আর্ট আছে। আমরা ইহার আদর করি, কারণ এগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাযে লাগে। Hegel বলেন, সাহিত্যের আসন সবের উপরে। ইহার কারণ কি? স্থাপত্যাদি শিল্প আমাদের চক্ষু কর্ণের আনন্দ দিয়া মনকে দোলা দেয় মাত্র, কিন্তু সাহিত্য আমাদের মানস রাজ্যে এমন একটি আনন্দ-লোকের সৃষ্টি করে যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মনে হয় এই জন্যই মনীষী Hegel সাহিত্যের আসন অন্যান্য আর্টের উপরে স্থির কোরেছেন।

গ্রীক পণ্ডিত Simonides বলেন, "Painting is silent poetry and poetry is painting that speaks"—চিত্র নীরব কাব্য, এবং কাব্য এমন চিত্র যাহা নিজেকে ভাষায় প্রকাশ করে। স্থাপত্যে Parthenon, St. Peters বা তাজমহল, ভাস্কর্য্যে Athene Parthenon, Venus of Milo, Laocoon বা ধ্যানী বুদ্ধ, চিত্রে Raphaelএর Madonna বা অজন্তা চিত্র, সঙ্গীতে Beethhoven বা তানসেনে যে আনন্দলোকের সৃষ্টি হয় নি, এ কথা বলিলে সত্যের অবমাননা করা হয়। অনন্ত সৌন্দর্য্য এই শিল্পকলায় বিকশিত হ'য়ে উঠেছে, এবং চিরদিনই ওগুলি আমাদের মনে আনন্দ দেবে। কিন্তু এ কথা কি সত্য নয় যে, এই সব আর্টের উপাদান ধরণীর ধূলিকণা মাত্র! এই হিসাবে সাহিত্য মানসী সৃষ্টি। সঙ্গীত কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া আত্মার আনন্দ দেয় সত্য, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া তাহাকে পৌঁছিতে হয়। কিন্তু সাহিত্যের রস একেবারে মনকে ডুবিয়ে দেয়। এইখানেই সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব আর সব রূপের রাজ্য, কিন্তু সাহিত্য আমাদের অরূপ লোকের সহিত পরিচয় করাইয়া দেয়। আর সবে পাই সীমার আনন্দ, সাহিত্য দেয় অসীমের আনন্দ।

কবি কালের গণ্ডী মানেন না, দেশের সীমায় ধরা দেন না। তাঁর মোহন তুলিকায় বুদ্ধ, প্লেটো, Montaique সজীব হইয়া উঠেন, Babylon, Athens, Alexandria, উজ্জয়িনী আমাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। বিশ্বমানবের যুগসঞ্চিত চিন্তা ধারাতেই যে সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি।

Goethe বোলেছেন "a traveller does not take anything out of Rome which he has not brought with him" যিনি রোমে যাবেন তাঁকে সেই বস্তুই ফিরে নিয়ে যেতে হবে যা তিনি সঙ্গে এনেছিলেন ঠিকই ত, আমরা যা ভেবে যাই, তাই ত পাই! মনে পড়ে, পুরীতে একবার স্নানযাত্রার সময় শুনতে পেলুম আমার পাশের দুটি যুবক বলাবলি কোচ্ছে, "পাণ্ডার ঠাকুর ক'টাকে যদি দেয় ত দুটো পাখোয়াজ ও একটা তবলা তৈরী করি। খাসা জিনিষ হবে।" আবার তাদের চারি পাশে নরনারীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি সেই রূপহীন নিমকাঠের ঠাকুর দেখিয়াই তাহাদের নয়নে জলধারা। আমার সামনের ঠাকুরটি ত মাটীর ঢেলা, আসল ঠাকুরটির আসন যে আমার মনে।

কাব্যের রস অনুভব করা যায়, কিন্তু সবটা বিশ্লেষণ কোরে দেখান যায় না। ভাবকে রূপ দেওয়া ত সহজ নয়। কাব্যের সৌন্দর্য্য মনকে অভিভূত ক'রে; এমন একটি রসের সৃষ্টি করে যাহাতে আর কোন উপাদানের প্রয়োজন হয় না। এই রসানুভূতিই পরম আনন্দ।

এখন দেখা যাউক, সাহিত্য বিচারের রীতি কি Plato বলেন, সাহিত্যের সঙ্গে সুরুচি ও সুনীতির যোগ

থাকা চাই। সাহিত্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে কি ভাবে পুষ্ট করে ও সত্যকে কিরূপে প্রকাশ করে—ইহার দ্বারাই দোষ গুণের বিচার করিতে হয়। তিনি গ্রীক সাহিত্যকে আদর করিতে পারেন নাই, কারণ Attic নাট্যকারেরা অদৃষ্টের জয় ঘোষণা কোরেছিলেন, ধর্ম্মের জয় নয়। মনে হয়, Plato একটু ভুল কোরেছেন। প্রথমতঃ জগতে সর্ব্বত্র ধর্ম্মের জয় হয় না। আমাদের Intuitional জগতেই ধর্ম্ম জয়ী হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইন্দ্রিয় (Senses) দিয়া সত্য অবধারণ এক বস্তু এবং চিন্তার (Idea) দ্বারা সত্য প্রকাশ আর এক বস্তু। অর্থাৎ Logic ও আর্টের মধ্যে যে প্রভেদ, তিনি তাহা দেখেন নাই।

তাঁর মত, সাহিত্য আমাদের ভাবুকতাকে পুষ্ট করে সেই সঙ্গে Intellect বা বুদ্ধিবৃত্তিকে দুর্ব্বল করে। এক কথায়, সত্যকে প্রকাশ করাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য এবং এই মাপকাঠি দিয়াই সাহিত্যের দোষ গুণ বিচার করা উচিত।

Aristotle এর Poetics বইখানা সংস্কৃত সাহিত্যে "কাব্য প্রকাশের" মত—সাহিত্য সমালোচনার মূল সূত্র-গুলি ইহাতে পাওয়া যায়। তাঁর মতে সাহিত্য অনুকরণ বা পুনরাবৃত্তি মাত্র। ইহাতে বস্তু (Plot), চরিত্র (Character), ভাষা (Diction) এবং ভাব (Sentiment) থাকে এবং নাটক হইলে সঙ্গীত ও নাট্যকলারও বিচার কোত্তে হয়। তিনি বলেন, আর্টের উদ্দেশ্য আনন্দ দান। বিজ্ঞজনের চুলচেরা সত্যে ও আর্টের সত্যে অনেক প্রভেদ। আর্টে ঘটনা অপেক্ষা ঘটনার যোজনা ও সমাবেশের প্রয়োজন বেশী। এইখানেই ইতিহাস ও কাব্যের পার্থক্য ধরা পড়ে। ঐতিহাসিক বলেন 'কি ঘটেছে', কবি বলেন 'কি ঘটতে পারে।' ঐতিহাসিক সত্য, ব্যক্তিগত ও দেশগত (Particular), কাব্যের সত্য বিশ্বজনীন (Universal)। তিনি Tragedy বা বিয়োগান্ত নাটক সম্বন্ধে বলেন যে, কোন Tragedyর অভিনয় দেখিলে আমাদের মন ভাবুকতার প্রাচুর্য্য (Excess of emotion) হইতে রক্ষা পায়। যখন ভাবি, "আমার দুঃখ ত এত তীব্র নয়" এই চিন্তাই আমাদের প্রাণে সান্ত্বনা দেয় এবং দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি দেয়।

রোমেও এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছিল। Cecero, Quintilion, Horace ও Longniusএর 'On Sublime'এ ইহার পরিচয় পাই। কিন্তু Aristotleএর উপর কোন কথা বলিবার সাহস তখন ছিল না। ইউরোপেরই মধ্যযুগে Aristotle ছিলেন আপ্তবাক্য। Renaissence বা নবজাগরণের দিন—তাঁর বেদীতে বসেছিলেন Plato.

আধুনিক যুগে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে Addison Miltonএর Paradise Lost বিচার করিবার কালে একটা নূতন কথা বলেন যে, আর্টের প্রধান ক্ষমতা আমাদের কল্পনা শক্তিকে জাগ্রত করা। এই কল্পনার বলেই মানুষ কারাগারের মধ্যেও এমন ছবি আঁকতে পারে যাহা বিশ্বে দুর্লভ।

তিনি ইচ্ছা কোল্লে যে কোন সাজে প্রকৃতিকে সাজাতে পারেন, কারণ সে ক্ষমতা তাঁর নিজের হাতে। কেবল একটি কথা মনে রাখা চাই যে, খুব বাড়াবাড়ি কোল্লে হাস্যাস্পদ হ'তে হয়। "মুখখানা কাঁচা ফোড়ার মত লাল হ'য়ে উঠ্‌লো"—বা "পায়ের চাপে মুরগীর ছানাটা ডবল পয়সার মত চ্যাপটা হ'য়ে গেল" ইত্যাদি উপমা original সন্দেহ নাই, কিন্তু কালিদাসের সঙ্গে মোটেই মেলে না। কল্পনাকে জাগ্রত কর্ব্বার শক্তিই কাব্যের প্রাণ এবং এইখানেই সাহিত্যে মনস্তত্ত্ববিদের প্রয়োজন হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৬৬) একজন জার্ম্মাণ পণ্ডিত Lessing (যাঁর Nathan the Wiseএর সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে) Laocoon নাম দিয়া সাহিত্য-বিচারের পদ্ধতি স্থির করেন। এরূপ গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকের সংখ্যা খুব কম। Laocoon নামে প্রসিদ্ধ ভাস্কর্য্যের উপলক্ষ কোরে বিচার কোরেছেন। Virgil এর Æneidএর দ্বিতীয় সর্গে Laocoonএর চিত্র দেখান হ'য়েছে, যেখানে দেখি হতভাগ্য Laocoon অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পীড়নে হাহাকার কোচ্ছেন। ভাস্কর এই রূপটী আমাদের চোখের সামনে ধোরেছেন। কিন্তু মূর্ত্তিতে

চীৎকার দেখান যায় না। কাজেই ভাস্কর Laocoonএর মুখে তীব্র বেদনা ও নিরাশার মাঝেও একটা স্থৈর্য্য প্রকাশ পাচ্ছে। Laocoonএর সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, চোখের সামনে সর্পাঘাতে দুই পুত্র মরণের কোলে ঢ'লে পড়েছে। সর্প Laocoonএর সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া তাহাকে পিষিয়া মারিতে যাইতেছে, কিন্তু Laocoon হার মান্‌লে না, শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত নিষ্ঠুর অদৃষ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। 'মনসার ভাসানে' চাঁদসদাগরকে মনে পড়ে। Lessing বলেন, ভাস্কর Virgil হইতে ঘটনাটুকু নিয়েছেন, কিন্তু আর্টিষ্ট তা'কে নূতন রূপ দিয়েছেন। শুনতে পাই Shakespeare তাঁর আখ্যানবস্তু নিয়েছিলেন Holinshed's Chronicles O Plutarchএর জীবনী সংগ্রহ হ'তে। রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ', 'অভিসার' প্রভৃতি উপনিষৎ বা অবদান কল্পলতা হ'তে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা অতীতের কাহিনীকে এমন রূপ দিয়াছেন—এই কাহিনীর মধ্যে আর্ট এমন ফুটে উঠেছে—যা মূলে নাই। Quarry (পাথরের খনি) ও finished statue বা মূর্ত্তিতে তফাৎ যেমন—এও তেমনি। আর্ট বস্তুটি কি এইখানেই ধরা যায়।

Lessingএর সঙ্গে তুলনা হয় Aristotleএর, যেমন Platoর সঙ্গে মেলে Victor Cousin. ভিক্টর কুসে ১৮১৮ সালে Du Vrai, du Bean, et du bien (সত্যং সুন্দরং শিবম্) নাম দিয়া কয়েকটি বক্তৃতা দেন, ১৮৫৩ সালে ইহা পুস্তকাকারে বাহির হয়। তিনি বলেন আর্টিষ্ট বা শিল্পীর ধর্ম্ম বাস্তবের (Reality) মধ্যে যে ভাব বা Idea আছে তাহাকে প্রকাশ করা। অনেক Ideaর অনেক বাছিয়া তবে এই ভাবটীকে প্রকাশ কোত্তে হয়। কারণ এই ছাঁটা ও বাছার (Omission ও Selection) শক্তির নামই আর্ট। আর্টের উদ্দেশ্য ভৌতিক সৌন্দর্য্যের সাহায্যে নৈতিক সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া তোলা। এক হিসাবে আর্টের শক্তি প্রকৃতির চেয়েও বেশী, কেন না আর্ট Pathos বা করুণাকে বিচিত্ররূপে ফুটাইয়া তুলে। এবং এই Pathosএর দিক দিয়াই বিচার ক'ত্তে হয় শ্রেষ্ঠ আর্টের রূপ কি—এবার এই কষ্টিপাথরেই সৌন্দর্য্য বিচার কোত্তে হয়।

Wordsworth বলেন, জগতের বড় কবি বা সাহিত্যিককে একটা অসুবিধা ভোগ কোত্তে হয়—সেটা হো'চ্ছে বোঝান। বাঁধা গণ্ডীর মাঝে যে মন ঘোরে তাহা নূতনকে নিতে চায় না। সেইজন্য প্রথমে একদল পাঠক তৈরী কোত্তে হয়, লোকের মনে রস (taste) জাগাতে হয়, তবে তিনি আদর পান্ এবং পাঠক আনন্দ পান্। শুধু সূক্ষ্ম সমালোচকের কল্পনাকে জাগিয়ে তুল্‌লেই হবে না সাধারণ পাঠক সমাজের মনে আনন্দ দিতে হবে।

Mathew Arnoldএর মতে কবির সহিত সেই যুগের সম্বন্ধটা স্থির কো'ত্তে হয়, অর্থাৎ কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সুবন্ধ নির্ণয় করা চাই। উদাহরণ স্বরূপ তিনি Grayর কথা উল্লেখ কোরেছেন—Grayর সহিত সে যুগের কোন সম্বন্ধ ছিল না, কাজেই তাঁকে একলাটি কাটাতে হ'য়েছিল, এবং তাঁর কবিত্বের বিকাশ হ'তে পারে নাই। তিনি আর এক বোঝান বলেন—Poetry is the criticism of life ইত্যবসরীর মানব জীবনের সমালোচনা মাত্র। কবির ধর্ম্ম আমাদের Benn- সুখ দুঃখের জীবনটাকে বুঝিয়ে দেওয়া এবং যিনি যে পরিমাণে এই কথাগুলো বুঝিয়ে দেন তাঁকে সেই ভাবেই আমরা বিচার করি ও তাঁর কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাই। Wordsworth যা'কে বল্‌তে চান্ "The breath and finer spirit of all Knowledge."

Ruskin ও William Morrisএর মধ্যে দেখি Platoর আদর্শ। নীতিবর্জ্জিত আর্ট মিথ্যা—এই কথাটা Ruskin বার বার বোলেছেন। তাঁর মতে আর্টের জন্ম মানুষের প্রবৃত্তি (Passion) ও আশার মধ্যে। সেই আর্টই সব চেয়ে বড় যাহাতে বেশী ভাব আছে (which contains the greatest number of greatest ideas.)।

আমরা আর একটা কথা প্রায়ই শুন্‌তে পাই, Art for Art's sake. বোধহয় Theophile Gantier এই তত্ত্বের জন্মদাতা এবং Swinburne ইহার প্রচারক। Swinburne বলেন, 'কোন একটা কবিতা বুঝ্‌তে হো'লে ইহার উদ্দেশ্য বা নৈতিক অর্থ দেখিবার প্রয়োজন নাই।

সব বড় কবির ভিতরে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য (Harmony) ও আধ্যাত্মিক জীবনের আভাষ আছে;—তাহার মাধুর্য্যকে ক্ষীণ বলা চলে না এবং এমনই তাহার শক্তি যাহাকে তীব্র বা উগ্র বলিলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়। যেহেতু কোন কবির মতের সঙ্গে কোন সমালোচকের মত মেলে না বা জনসাধারণের মতের সহিত বিরোধ হয় বলিয়াই যদি কোন কবিতা বা অন্য কোন সাহিত্য-সৃষ্টিকে গালাগালি দিই তাহাতে সমালোচকবর্গের মূঢ়তাই প্রকাশ পায়। 'স্ত্রীর পত্র', 'চিত্রাঙ্গদা', 'ঘরে বাইরে' এমন কি 'শিক্ষার মিলন'কে বুঝতে না পেরে আমাদের সাহিত্যে কত আবর্জ্জনা জমেছে! আমার 'ভাল লাগে না' অতএব 'সকলের ভাল লাগা উচিত নয়'—এটা বোধ হয় Neo ন্যায়। এই কারণে Christ[illegible]lul, সেই সঙ্গে[illegible] immortality বা 'সোনার তরী'কে অস্পষ্ট কথায়, [illegible] এবং আমরা দেখতে যদি ভুল করি, দোষ এবং এই [illegible]বিদের। এই জন্য Shelley তাঁর কবিতার করা উক্তি Glossary of words তৈরী কোত্তে বলেন। ভয় হয়, একদিন রবীন্দ্রনাথকেও হয়ত পাদটীকা দিতে হবে। এককালে Southey, Wordsworth ও Kingsley সমালোচক সম্প্রদায়ের ভয়ের কারণ হ'য়ে উঠেছিলেন।

Mrs. Browning তাঁর Aurora Leighএর এক স্থানে বলেছেন, "The poets are the only truth teller left to God"—অর্থাৎ ভগবানের রাজ্যে কবিই সত্যদ্রষ্টা সেইজন্য সত্যকে প্রকাশ কর্‌বার ভার তাঁর উপর। আমাদের ঋষিদের অন্য নাম কবি—তাঁরা ছিলেন সত্যদ্রষ্টা, মন্ত্রের মধ্যে সত্যের স্বরূপটি প্রকাশ কোরেছেন।

Meredithএর Diana of the Crosswaysএর কয়েকটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, সাহিত্য সেইখানেই সার্থক যখন তাহা আমাদের ভিতরের মানুষটিকে জাগিয়ে দিতে পারে। রং তুলি দিয়ে খুব কষ্ট কল্পনা কো'রে কোন ছবি আঁকলেই হয় না কারণ চোখের তৃপ্তিতে ত মানুষের অন্তরের ক্ষুধা মেটে না। কোন সুদীর্ঘ বর্ণনা পড়িতে আমাদের সাদা চঞ্চল মন যেন হাঁপিয়ে উঠে। সেইজন্য যিনি প্রকৃত কবি যেমন Shakespeare, Dante বা রবীন্দ্রনাথ একটি কি দুটি লাইনে চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলেন।

এই প্রসঙ্গে Schlegel, Sainte Beauve, Dowden, Raleigh ও Bradleyর উল্লেখ প্রয়োজনীয়। কিন্তু বাহুল্যভয়ে চাপা দিলাম। তবে আমাদের মনে হয় সকলের মত একত্র করিলে এই সত্যটিকে সার্ব্বজনীন মনে করা যেতে পারে—The supreme test of merit is agreement with the general sense of mankind, অর্থাৎ যখন কোন সাহিত্য বিশ্বমানবের চিরন্তন সত্যটির সঙ্গে মেলে তখনই বুঝিব সেই সাহিত্যই সত্য—কারণ তাহা বহুলোকের আনন্দের উপাদান।

বর্ত্তমান সাহিত্যের দিকে তাকাইলে আমরা দেখি যে ইহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সহিত কিরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখন দেখা যাউক মোটামুটি হিসাবে কোন্ কষ্টিপাথরে মাজিয়া সাহিত্যের দোষ গুণ বিচার কোত্তে হয়।

প্রথমতঃ, দেখিতে হয় সাহিত্যের নূতন সৃষ্টিটি বিশ্বমানবের আদরের সামগ্রী কি না এবং ইহা আমাদের যুগসঞ্চিত মনীষার ভাণ্ডারে স্থায়ী দান কি না। যে সাহিত্যে আমাদের বাস্তবজীবনের সহিত কোন সম্পর্ক নাই এবং যাহা সার্ব্বজনীন ও স্বাভাবিক কোন মতকে পদদলিত করে তাহাতে যতই আর্ট থাকুক না কেন তাহা ত্যাজ্য—কতকটা বারনারীর মত। এই হিসাবে 'পঙ্কতিলক' ও 'গৃহদাহ' বর্জ্জনীয়।

দ্বিতীয়তঃ, আর্টের সত্য মিথ্যা ভাব (idea) পরীক্ষা কোত্তে হয়। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সহিত তাঁহার সমাজ ও জাতির সঙ্গে একটি অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে কি না দেখতে হয়। এক কথায় ব্যক্তিগত (particular) অভিজ্ঞতার সহিত বিশ্বজনীন (Universal) অভিজ্ঞতার যোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। রমেশচন্দ্রের "সমাজে" বা প্রভাত বাবুর "সিন্দুর কৌটায়" তাহা নাই।

তৃতীয়তঃ, ধর্ম্মজ্ঞান বা সুনীতি সমাজের যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফল। সেইজন্য সাহিত্যিকের হাতে যদি

ধার্ম্মিকের লাঞ্ছনা দেখি ও পাপীর জয় দেখি, প্রাণে বড় আঘাত লাগে এবং এ চিত্র সমাজের মঙ্গলকর নয়, সেই জন্য তাহা হেয়। সুনীতি, সুরুচি ও সাহিত্যের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন প্রীতির বন্ধন বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করি।

চতুর্থতঃ, সাহিত্যের কাটামো বা Symmetry বিচার কোত্তে হয়, কথায় বলে, মণি কাঞ্চনের যোগ, noble words set to perfect music. শুধু ছবিখানা ভাল হ'লেই চল্‌বে না, তার Frame খানাকেও ভাল কোত্তে হবে, তবেই ছবির সৌন্দর্য্য খুল্‌বে। সাজাবার সৌন্দর্য্যে এক একটি সত্য হীরার ন্যায় জল্‌তে থাকে—কখন রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা', রজনী সেনের 'অমৃত' যেখানে দেখি কাঠামোর গুণে মামুলী উপদেশগুলি কেমন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। সেইখানেই শিল্পীর বাহাদুরী যখন তিনি কোন কথা না ব'লে কেবল ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দেন। এই 'না বলা'র (Suggested বা Implied) সৌন্দর্য্য যে আমাদের কাছে সব চেয়ে বড়।

ভাষা ভাল হওয়া চাই। ভাষার দোষে Robert Browning—বিশেষতঃ তাঁর Sordello—অনেক সময় অবোধ্য। ভাষার গুণে Tennyson কত মনোরম, যদিও আমরা স্বীকার করি চিন্তাশীলতায় Browningএর স্থান অনেক উঁচু।

পঞ্চমতঃ, সাহিত্যে আদর্শ ও ভাব (Idealisation) বিশেষ কো'রে বিচার করা দরকার। সাহিত্যের কাজ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা (objective), কিন্তু তার চেয়েও বড় কাজ আমাদের আনন্দ দেওয়া (subjective). Bacon বলেন, কাব্য নৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করে এবং মনকে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী হ'তে মুক্তি দেয়।

এখন মোটের উপর দেখা গেল যে, সাহিত্যে যখন সত্য উপলব্ধি করি তখন বুঝি তাহার বস্তুভাগ (matter) সুন্দর, কাঠামো বা ভাষার বাঁধুনি যখন ভাল লাগে তখন বুঝিতে হইবে রূপটি (manner) বেশ মনোরম হয়েছে এবং যখন সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই তখন বুঝি সাহিত্যিকের মনে তাদের রূপটি (Idealisation) কেমন সহজে ধরা দিয়েছে। ছন্দ (Rhyme) ও রচনার রীতি (Style) সম্বন্ধে দুটো কথা ব'লে এ প্রবন্ধ শেষ কোত্তে চাই।

ছন্দ আমাদের জীবনে সর্ব্বদা দোলা দিচ্ছে। ঘুম-পাড়ানির গান শুনে শিশু মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, বাজনার তালে তালে পা ফেলে, সৈনিক মরণের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাদের নাড়ীতে, আমাদের বক্ষস্পন্দনে সেই ছন্দের দোল। প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে সেই অনন্ত ছন্দের লীলা আবহমান কাল চলে আস্‌ছে। কবি তার ছন্দ দিয়ে আমাদের অন্তরের বীণায় ঝঙ্কার তোলেন বলিয়াই তিনি আমাদের এত প্রিয়?

উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধের মধ্যেও একটা গতি আছে—যাহার বেগ আমাদের মনকে দুলিয়ে দিয়ে যায়। এই যে গতি বেগ মনে হয় ইহার নামই Style. কিন্তু এই Style জিনিষটা কি অনুভব করা যায়, বোঝান যায় না। Raleighএর ন্যায় প্রসিদ্ধ সাহিত্যরথীর Style বইখানা এমন অপূর্ব্ব হয়েছে যে Arnold Bennett মুগ্ধ হয়ে বলেছেন যে, বইখানা ছাপাতে না দিয়ে যদি আগুনে দিতেন ত জগতের একটা উপকার হো'ত এবং তাঁর সুনামও অক্ষুণ্ণ থাক্‌তো। এই Style জিনিসটা পরিষ্কার কো'রে বুঝান বড় কঠিন। যেমন সঙ্গ দেখে কোন লোক্‌কে চিন্‌তে পারি, কোন জাতির শিল্প বা স্থাপত্য দেখে সেই জাতির Cultureএর পরিচয় পাই, সেইরূপ The style is the man. অর্থাৎ যে বেশে লেখক পাঠকের কাছে ধরা দেন সেইটিই তাঁর Style.

[দ্রষ্টব্য—Temple Classicsএর একখানা খুব ছোট কিন্তু বেশ ভাল বই—Worsfold's judgment in Literature এই প্রবন্ধের মূল উপাদান]

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ

—অলকা, বৈশাখ ১৩২৯

নারী।

প্রাচীন কালের গ্রন্থ ইত্যাদি থেকে আমরা জান্‌তে পারি যে, বহু পুরাতন কালে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যদের মধ্যে নানা প্রকারের বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। এখনও

হিন্দু সতী নারীদের যে পঞ্চ কন্যার নাম প্রত্যহ প্রাতে স্মরণ করতে হয়, তাঁরা হচ্ছেন অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী। এই পঞ্চকন্যাই একাধিক পুরুষে উপগতা হয়েছিল। সে কালে সমাজে বা ধর্ম্মে ইহা দূষণীয় ছিল না। হিন্দু শাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহের বর্ণনা আছে। সকলের বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, তবে উপরোক্ত তালিকা থেকে দেখা যায় যে, নারীকে বলপূর্ব্বক করায়ত্ত করাও এক প্রকার বিবাহ ছিল। এই সকল বিবাহ প্রথার মধ্যে নারীর করণীয় অংশ কিছু ছিল কি না আমরা বিশেষ অবগত নই। অবশ্য স্বয়ম্বর প্রথায় নারী আপন স্বাধীন নির্ব্বাচন-শক্তির ব্যবহার করতে পারত, কিন্তু রাজকন্যা ব্যতীত অন্য কেহ স্বয়ম্বরা হ'তে পারত কিনা তা কোন গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে বলে আমরা জানি না। তবে আধুনিক বাঙ্গালীদের মধ্যে যে বিবাহ-প্রথার প্রচলন আছে, তাহাতে নারীর করণীয় কিছুই নাই—এ বিবাহে বরকেই সমস্ত করতে হয়। কন্যা শুধু একটা জড় পদার্থের মত হয়ে থাকে।

হিন্দুরা যতজন ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু হিন্দুনারী এখন একাধিক পতি গ্রহণ করতে পারেনা। পুরাকালে বৌদ্ধদের মধ্যে কিরূপ বিবাহ প্রথা ছিল জানিনা। আধুনিক বৌদ্ধদের মধ্যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি আছে। আজকাল ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্ব সাধারণের ধর্ম্ম। [চীন ও জাপানের বৌদ্ধধর্ম্ম তদ্দেশীয় পুরাতন ধর্ম্মের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বিকৃত হয়ে গিয়েছে]

ব্রহ্মদেশবাসীদের বিবাহ প্রথা অতি সরল এবং সংক্ষেপ। একজন ব্রহ্মদেশীয় বণিকের নিকট সে দেশের বিবাহের নিম্নলিখিত বর্ণনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পাত্র পক্ষ হইতে কেহ প্রথমে প্রস্তাব নিয়ে পাত্রীর বাড়ীতে যায়। দুই পক্ষের লোকেরা পাত্রীর বাড়ীতে বসে বিয়ের কথাবার্ত্তা ঠিক করে। নির্দ্দিষ্ট দিনে পাত্র লোকজন নিয়ে পাত্রীর বাড়ীতে যায়। সেইখানে বিয়ের মজলিস হয়। পাত্র-পাত্রীকে আলাদা একটা জায়গায় নিয়ে রাখা হয়। উভয় পক্ষের অভিভাবকের সম্মতি নিয়ে পুরোহিত ঠাকুর মন্ত্র পড়েন, আর আশীর্ব্বাদ করেন।

তারপর পাত্র-পাত্রীর হাত একত্র ক'রে মন্ত্র পড়ে বলেন, "আজ থেকে তোমাদের বিবাহ বন্ধনে বেঁধে দিলাম।" পাত্র বা পাত্রীর কোন মতামত জিজ্ঞেস করা হয় না। বিয়ের পর পাত্র পাত্রীর বাড়ীতে তিন, পাঁচ কি সাত দিন পর্য্যন্ত থাকে। তারপর পাত্রীকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যায়।

বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। পুরুষ স্ত্রীর সম্মতি হলেই চলো। কোন প্রকার আচার অনুষ্ঠানের সাহায্য নিতে হয় না।

চীন দেশের বিবাহপ্রথা শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক তাঁর চীন ভ্রমণে বিবৃত করেছেন। পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য সেই বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

"পাত্র-পাত্রীতে পূর্ব্বে দেখা হইবার নিয়ম নাই, গণকের পরামর্শ অনুসারে শুভদিনে, শুভক্ষণে বিবাহের দিন ঠিক হয়। পরস্পরের কোষ্ঠী মিলাইবার পর তবে বিবাহ ঠিক হয়। পাত্রীকে বরের বাড়ীতে আনা হয়। বরের পিতামাতারই কথামত বিবাহ হইয়া থাকে। শ্বশুর-গৃহে প্রবেশ করিবার সময় ক'নে দরজার নিকট রক্ষিত কতকগুলি জ্বলন্ত অঙ্গার ডিঙ্গাইয়া গৃহে প্রবেশ করেন। তারপর সেই বাড়ীর সধবা স্ত্রীলোকেরা আসিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া গৃহে লইয়া যায়। অনন্তর পাত্রের সঙ্গে কনের শুভদৃষ্টি হয়। পরে পাত্রী বরের চারিধারে তিন বার প্রদক্ষিণ করে, অতঃপর উভয়ে এক আসনে বসে এবং বসিবার সময় পরস্পর পরস্পরের কাপড়ের উপর বসিবার চেষ্টা করে। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, যে যাহার কাপড়ের উপর বসিতে পারিবে, সেই গার্হস্থ্য জীবনে প্রবল হইবে।"

বহুবিবাহ চীন দেশে নিষিদ্ধ। একজন লোক এক সময়ে একটি মাত্র বিবাহ করতে পারে। কিন্তু যত ইচ্ছা উপপত্নী রাখতে পারে।

একজন চীনব্যবসায়ী সে দেশের বিবাহের এই রকম বর্ণনা দিয়েছে।

বিয়ের প্রস্তাব ঠিক হলে, নির্দ্দিষ্ট দিনে পাত্র পাত্রীর বাড়ীতে যায়। বর কনে আলাদা কামরায় থাকে। উভয় পক্ষের অভিভাবকেরা মিলে দলিল লেখে। তা'তে পাত্র পাত্রী দু'জনাতেই দস্তখৎ করে। অভিভাবকেরা সাক্ষী হয়। তারপর পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে এবং বর কনে দুজনকেই পাঠ করায়। কখন কখন পাত্রীকে পাত্রের বাড়ীতে এনেও বিয়ে হয়। বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র পাত্রী দেখা কর্‌তে পারে, কিন্তু কথা বল্‌তে পারে না—বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে।

শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিকের বর্ণনার সঙ্গে চীনব্যবসায়ী-প্রদত্ত বর্ণনার অনেক অনৈক্য দেখা যাচ্ছে। কোন্ বর্ণনা যে ঠিক—অথবা চীনের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকমের বিবাহ প্রথার প্রচলন আছে কি না, ঠিক করে বলা যায় না।

জাপানে বিবাহ হয় এই প্রকারে—"বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যায় দেখা সাক্ষাৎ হয় না। বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হয়ে গেলে কন্যা তাঁর ভাবী স্বামীকে একছত্র পরিচ্ছদ পাঠিয়ে দেন এবং বর তাঁর ভাবী স্ত্রীকে একটি ওবি (ঝোলা) উপহার দেন, তার সঙ্গে মৎস্য মদ্য প্রভৃতি নানাবিধ আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্যাদিও প্রেরিত হয়। কন্যা বরের বাটীতে যান। বিবাহের দিন প্রাতে বড় বড় কাঠের সিন্দুকে তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ ও গৃহস্থের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও কিছু টাকা বরের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। যে ঘরে বিবাহ হয় সেটী বংশ, দেবদারুর ডাল এবং কুলের ফুলে সজ্জিত হয়। এই তিনটী বস্তু দাম্পত্য সুখের মাঙ্গলিক চিহ্ন। ঘরে প্রবেশ করিবার কালে কন্যা তাঁর মুখ পাৎলা কাপড়ে আচ্ছাদিত করেন, সে ঘরে বড় জোর বার জন প্রবেশ করিবার বিধি। বর ও তাঁর পিতামাতা, কন্যা ও তাঁর পিতামাতা, দুই ঘটক, তাদের স্ত্রী ও পত্রবাহক দুটি ছোট ছোট ছেলে। বর ও কন্যা মুখোমুখি করে বসেন, তাঁদের মাঝখানে একটা ছোট খেত রঙের কাঠের টেবিল, উচ্চে আঠার ইঞ্চি ও উপরিভাগে সমচতুষ্কোণ। প্রত্যেক ধারে এক ফুট। টেবিলের উপর লাল ল্যাকারের (গালার) "সাকের" (মদের) পেয়ালা। বিবাহের সময় কোন কথা নেই। মন্ত্র উচ্চারিত হয় না। প্রতিজ্ঞা নেই, উপাসনাও নেই। বর এবং কন্যা এই তিনটী পেয়ালাতে তিন তিনবার সাকে পান করে। বিবাহ হয়ে গেল। তার পর নব দম্পতী তাদের পিতা মাতাকে সাকে প্রদান করেন।"

মুসলমানদের বিবাহ বর ও কনের সম্মতির উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ যদি তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়। যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তাহ'লে তাদের অভিভাবকেরা তাদের হয়ে সম্মতি দেয়। ক্ষেত্র বিশেষে বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে বর বা কনে এই সম্মতি প্রত্যাহার কর্‌তে পারে। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে বর কনের দেখা সাক্ষাৎ হয় না। যদিও মুসলমান শাস্ত্রে এর বিরুদ্ধে কোন অনুজ্ঞা আছে বলে আমরা জ্ঞাত নই। সাধারণতঃ বিবাহের দিন বর কনের বাড়ীতে যায়,—বর ও বরযাত্রীরা বাইরের ঘরে বসে,—কনে বাড়ীর ভেতর থাকে, কনে একজনকে তার "উকিল" অর্থাৎ Proxy নিযুক্ত করে। সেই উকিল-নিয়োগের সময় দু'জন সাক্ষী থাকা আবশ্যক। উকিল কনের সম্মতি নিয়ে বাইরে বর ও বরযাত্রীদের মজলিসে গিয়ে সেই সম্মতি জানায় এবং বর সম্মত আছে কি না জিজ্ঞাসা করে। বরকে স্বীকার কর্‌তে হয় যে বিবাহ ভেঙ্গে গেলে কনেকে সে এত টাকা দেবে। এই টাকাকে 'মোহর' বলে। যদি বর সম্মত হয়, তাহলেই বিয়ে হয়ে গেল। তার পর কোন কলমা (মন্ত্র) পড়া বা আর কিছু করা সামাজিক প্রথা মাত্র। শাস্ত্রের আদেশ নয়। মুসলমান ধর্ম্মানুসারে চারিজন নারীকে এককালে স্ত্রীত্বে গ্রহণ করা যেতে পারে, এর অধিক নিষিদ্ধ। এককালে একাধিক পতি নিষিদ্ধ।

খৃষ্টানদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বিবাহ সম্বন্ধে কোন রকম অনুজ্ঞা নেই। প্রথম প্রথম বিয়ের সঙ্গে গির্জ্জা বা পুরোহিতের কোন সম্পর্ক ছিল না। পরে গির্জ্জার দরজায় গিয়ে বিবাহ করার প্রথার সৃষ্টি হয়। তার পর গির্জ্জার ভেতরে পুরোহিতের সাহায্যে। এখন সাধারণতঃ একজন পুরোহিত নইলে বিয়ে হয় না। তখন উভয় পক্ষ, গির্জ্জায় যায় এবং পুরোহিতের জিজ্ঞাসা মত উভয় পক্ষ আপন আপন সম্মতি জ্ঞাপন করে। এখন আর এক প্রকার

বিবাহের প্রচলন হচ্ছে। তা'কে বলে সিভিল ম্যারেজ। এই বিবাহে পুরোহিতের আবশুক হয় না। সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট গিয়ে আপন আপন সম্মতি জ্ঞাপন করলেই বিবাহ হয়ে যায়। খৃষ্টানেরা এককালে একাধিক পত্নী গ্রহণ করতে পারে না। একাধিক পতিও নিষিদ্ধ। উত্তর আমেরিকায় কিছুদিন একদল লোক হয়েছিল তারা নিজেদের মর্ম্মন ধর্ম্মাবলম্বী বলে পরিচয় দিত। তাদের মধ্যে একাধিক পত্নী গ্রহণ শাস্ত্র-সঙ্গত ছিল। কিন্তু এই ধর্ম্ম অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কারণ যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট এই প্রথার বিরুদ্ধে আইন পাশ করে কয়েকজন মর্ম্মন পুরুষকে জেলে পাঠিয়ে ছিল। এই ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা প্রধানতঃ উটা প্রদেশে বাস করতো। যুক্তরাজ্যের মধ্যে উটা প্রদেশেই প্রথমে নারী ভোটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে।

ইহুদিদের বিবাহ প্রথা অনেকটা খৃষ্টানদের মত অর্থাৎ পুরোহিত না হলে তাদেরও বিবাহ হয় না। ইহুদিরাও তাদের ধর্ম্মানুযায়ী এককালে চারিজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, একাধিক স্বামী নিষিদ্ধ। এই হলো বিভিন্ন ধর্ম্মের বিবাহ প্রথার বর্ণনা। এখন আমরা বিভিন্ন দেশের বিবাহ-প্রথার বর্ণনা করবো। মিসর দেশে পুরাকালে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর পর যে সমস্ত নারী গৃহীত হতো, তারা প্রথমার দাসী বলে গণ্য হতো। মিসরবাসীদের মধ্যে ভ্রাতা ভগ্নী এবং কখন কখন মাতা পুত্রে বিবাহ হতো। এখন সে দেশ মুসলমান-প্রধান।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বর কনেকে তাড়া করে নিয়ে বেড়ায়। কনে দেখায় যেন ধরা দিতে অনিচ্ছুক, অবশেষে ধরা দেয়। এই রকম দু' তিন বার হয়। তারপর একজন বুড়ো এসে দুজনকে টেনে একটা বাঁশের মইয়ের উপর নিয়ে যায়। একজন বুড়ী কনের হাত ধরে থাকে। তারপর বরের বাপ কনের গায়ের উপর নারিকেলের খোলে-ভরা এক খোলা জল ঢেলে দেয়, তারপর সবাই নেমে আসে। বর কনে হাঁটু গেড়ে বসে—বরের পিতা তাদের দু'জনার মাথা একখানে করে দেয়—এই হয়ে গেল তাদের বিয়ে।

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্তবয়স্ক হ'লে উভয় পক্ষ জেলার রেজিষ্ট্রারের নিকট লিখিত সম্মতি জ্ঞাপন করলেই বিয়ে হয়ে গেল।

কালমুখ তাতারের বর কনের ঘোড় দৌড় হয়। কনেকে আগে রওনা হ'তে দেওয়া হয়। বর তার পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে তা'কে ধরে—কনেরা প্রায়ই ভাল ঘোড়ায় সওয়ার হয়। কাজেই তাদের ইচ্ছা থাকলে বরেরা ধরতে পারে না।

পারস্য দেশে দু'রকম বিবাহ প্রচলিত আছে। এক রকম হচ্ছে যাবজ্জীবনের জন্য আর এক রকম হচ্ছে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য। পারস্যদেশবাসীরা চিরকালই একটু বেশী বিলাসপরায়ণ এবং কামুক। তাদের রাজা জেরেক্সিস আপন স্ত্রী বেছে নেওয়ার জন্য রাজ্যের সমস্ত অনূঢ়া কন্যাদিগকে আনিয়ে নিজের সামনে মিছিল করে দাঁড় করিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে থেকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরীকে বেছে নেওয়ার জন্য।

এখনও পারস্য দেশের রাজা প্রত্যেক বৎসর তাঁর রাজত্বের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী বালিকাগণকে একবার করে তাঁর সামনে আনান। তিনি তাদের ভেতর থেকে পঁচিশ জনকে বেছে নেন। প্রত্যেক বৎসর ২৫শে ডিসেম্বর সুন্দরী কন্যাদের পিতাগণকে নোটিশ দেওয়া হয়। এক মাস পরে বাছনি হয়।

ফরমোজা দ্বীপে স্বামী স্ত্রীর পরিবারভুক্ত হয়।

পেগু দ্বীপে পিতামাতা অল্প বা অধিক কালের জন্য কন্যা বিক্রী করে।

সিংহল দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের ভেদা [illegible]লে। তারা এক পত্নীক। সাধারণতঃ তারা আপন ভগ্নীকে বিয়ে করে।

—সহচর, মাঘ ১৩২৮

কবিতা-কুঞ্জ।

তুমি-আমি।

[শ্রীঅবনীকুমার দে]

প্রফুল্ল করেছে মোরে বিরহ তোমার
সুখ পাই কেঁদে অবিরত
পরিপূর্ণ আজি তুমি বিশ্বের মাঝার
কিছু নহে রোদনের মত।

আঁখি খোঁজে মধুকান্তি প্রতি পলে পলে
আত্মা সদা ধ্যানে তব রত
বাসনার লক্ষশিখা নিশিদিন জ্বলে
কিছু নহে বিরহের মত।

শ্বাসে শ্বাসে খুঁজি তব গন্ধ মনোহর
দেহ মাগে প্রফুল্ল পরশ
"প্রতি অঙ্গ তরে কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর"
দেহ মন অবশ-বিবশ।

না পেয়ে পেয়েছি তোমা' মনোমত করি
হ'য়ে গেছি তোমাতে বিভোর
কত জন্ম গোঙাইব—কোটি বিভাবরি
কত কল্প আরো মনচোর।

মোর তরে বসে আছো নিঃসঙ্গ-সঙ্গিনী
বিরহিনী শবরীর মত
অনন্ত যৌবনা তুমি—মানস-রঙ্গিনী
সুর তব চির অনাহত।

অমর করেছ মোরে ওগো প্রিয়তম
তুমি-আমি অনাদি অতীত
সৃষ্টির প্রথম আঁখি—যুগ্ম পদ্মসম
তুমি-আমি চির পরিচিত।

শোভা।

[শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী]

খণ্ড মেঘে চাঁদের শোভা
অস্তসূর্য্যে মাঠের আভা
প্রভাত বেলার সোণার কিরণটুক,
নরের কিগো ভরায় নাকো বুক?
জ্যোৎস্নাটি নদীর জলে
ছায়া শীতল বৃক্ষতলে
সান্ধ্য ধূসর শান্তি-ভরা রূপ
দেখায় নাকি তাঁহার প্রতিরূপ?
মায়ের কোলে শিশুর হাসি
ধরার বুকে ফুলের রাশি
নারীর প্রথম মা হওয়াটির সুখ,
হরে নাকি ধরার সকল দুখ?
পূর্ণিমার এই আলোর রাশি
সদ্য ফোটা ফুলের হাসি
নব বধূর কিশোর হাসি মুখ,
ভুলিয়ে কিগো দেয় না সকল দুখ?

নারী।

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন]

(১)

সংসার-মরু-মাঝারে তোমার পুণ্য প্রেমের পরশে
অলকাপুরীর অমিয় নির্ঝর কি যে সুধা সদা বরষে
শান্তি তোমার অঞ্চলতলে
যুগ যুগ ধরি থাকে দুলে দুলে—
মানব তোমারে লভিয়া ভূতলে
শোক-তাপ ভোলে হয়

(২)

তোমারি মুখের মধুময় বাণী শুনিতে মানব পিয়াসী,
তোমারে হেরিতে বিশ্ব-মানব কোন দিন নহে উদাসী!
স্নেহ-করুণায় বিগলিত প্রাণ,
ভালবাসা তব স্বরগ-সমান,
বিশ্বের স্রোত রাখ বহমান
প্রেয়সীর রূপে প্রকাশি'!

(৩)

প্রণত সকলে চরণের তলে—তুমি নিখিলের রাণী গো!
ঝঙ্কারে তব হৃদয়-বীণায় সকল যুগের বাণী গো!
তুমি যে নরের মানস-প্রতিমা,
অন্তর-ভরা তোমার গরিমা—
আমি দীন কবি—তোমার মহিমা
গাহিয়া ধন্য মানি গো!

গান।

[শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা]

হে মোর দেবতা অন্তরবাসী!
যতটুকু তোমা' পাই কাছাকাছি
ছাড়াছাড়ি তার অনেক বেশী!
আদর সোহাগ কর তুমি যত
বিরহ বেদনা দাও তার শত—
কত দীর্ঘ দিবস রাখ উপবাসী!
কত নিশি যায় পথ চাহি চাহি
নিদ্ নাই চোখে তব নাম গাহি'—
তুমি সব জান, ওগো সব জান
জেনেও থাক উদাসী—
হে মোর দেবতা অন্তরবাসী!

নববর্ষে।

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ]

ওরে ভাগ্যহীন বুঝি, ওরে ভাগ্যহীন,
সবার জীবনে আজ আসিল নবীন—
তোর পুরাতন যাহা, তাও রহিল না,
অথচ নূতন আসি' কই গাহিল না
জীবন গগনে তোর—নবারুণ কর
পশিল না সেথা—তবে চল ফিরে ঘর—
আর থাকিস্ না হেথা—থাকিবি কি নিয়া?
জীবনের স্বর্ণকাটি লয়ে তোর প্রিয়া
চলে গেছে পরপারে—সব শান্তি সুখ
নিয়ে গেছে, রেখে গেছে জীর্ণ মৌন মূক
একটী কঙ্কাল শুধু—প্রাণের স্পন্দন
আছে যাহা অবশিষ্ট—সেটুকু ক্রন্দন।

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দনা।

[শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত]

(১)

ভৈরবী—মধ্যমান।

কে ডাকে রে ঐ, সুরধুনী-তীরে,
পাষাণ গলায়ে মা মা ব'লে।
পতিতপাবনী, জাহ্নবী-জননী,
ছুটে আসে স্নেহে, করিতে কোলে॥
'কালী কথা কয়', কভু মিথ্যা নয়,
কে আছ পিপাসী, কর রে প্রত্যয়,
ঘুচিবে সংশয়, যাবে মোহ-ভয়,
সত্য হও যদি, মায়ের ছেলে॥
বল হরিবোল, তোল' উচ্চ রোল,
কাঁদ রে কাঙ্গাল, ভোল' গণ্ডগোল,
জীবনের তাপ, বিধাতার শাপ,
যাবে ধুয়ে মুছে, চোখের জলে॥

(২)

ললিত—আড়াঠেকা।

এস হে জীবন-ধন, হৃদি-কুঞ্জ আলো করি।
সচেতন কর নাথ, অচেতনে হাতে ধরি॥
সুপ্রভাতে, সুবাতাসে, ল'য়ে চল নিজ সাথে,
স্বজনের ঘোর মাঝে, এখনো র'য়েছে ঘিরি।
সচল দেবতা তুমি, কহ কথা শুনি আমি,
পরশি' তোমারে স্বামি, পদ-রজ শিরে ধরি।
পায়ে ধরি প্রাণ-সখা, আর হে হয়োনা বাঁকা,
জীবন ক'রনা ফাঁকা, তার চেয়ে যেন মরি।

১৯শ ভাগ] } আষাঢ়, ১৩২৯ । { ৫ম সংখ্যা

ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে ভারতের কথা।

(৪)

[গোল্ডস্মিথ—কুপার]

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ, বি-এল]

ওলিভার গোল্ডস্মিথ যদিও পোপের পরবর্ত্তী কবি ও ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন, তাঁহার কাব্যে কিন্তু আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যৎসামান্য উল্লেখ দেখিতে পাই। তাঁহার সুবিখ্যাত "পর্য্যটক" (The Traveller) নামে কবিতায় পঞ্জাবের বিতস্তা নদের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু ভারত বা ভারতবাসীর কোনও কথা এই সুদীর্ঘ রচনায় স্থান পায় নাই। "And brighter streams than famed Hydaspes glide" (৩২০ ছত্র)। গোল্ডস্মিথ একটি মাত্র খণ্ড কবিতায় ভারতবর্ষের নামোল্লেখ করিয়াছেন। "জোবেদা" নামক শোকান্ত নাটকের পূর্ব্বাভাসে (Prologue) কবি লিখিয়াছেন—

"In these bold times, when learning's sons explore
The distant climates, and the savage shore;
When wise *astronomers* to India steer,
And quit for Venus many brighter here;
While *botanists*, all cold to smiles and dimpling,
Forsake the fair, and patiently—so simpling,
Our bard with the general spirits enters,
And fits his little frigate for adventures."

(*Prologue to the Tragedy of Zobeida*)

এই শ্লোক হইতে বেশ বুঝা যায় যে, গোল্ডস্মিথের সময়ে ইংরাজ বিশেষজ্ঞেরা নানাবিষয়িনী জ্ঞানলাভের জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক, পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরাজেরা এদেশে কেবল বাণিজ্য বিস্তারের জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরাজের অভিজ্ঞতা এই সময় হইতে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে ভারতের সামাজিক অবস্থার চিত্র একাধিক ইংরাজ কবি প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গোল্ডস্মিথের সমসাময়িক কবি উইলিয়ম কুপার (William Cowper) তাঁহার কাব্যে ভারতের পরিবর্ত্তিত অবস্থা সম্বন্ধে যত কথা লিখিয়াছেন, বোধ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের অপর কোনও ইংরাজ-কবি তাহার অর্দ্ধেকও লেখেন নাই। কেবল তাহাই নহে, কবি কুপার স্বাধীনতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সেই সকল কবিতার স্থানে স্থানে উৎপীড়িত ভারতবাসীর দুঃখে তাঁহার কবি-হৃদয়ের সমবেদনা সহস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িয়াছে। কুপার "নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম" (The

Task) নামক সুবৃহৎ কাব্যের "শোফা" শীর্ষক কবিতায় লর্ড ক্লাইবের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে স্বার্থপর পাশ্চাত্য বাণিজ্যের পদানুসরণ করিয়া ইংরাজি কাব্য-সাহিত্য যে সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

"That thieves at home must hang ; but he, that puts
Into his overgorged and bloated purse
The wealth of Indian provinces, escapes."
(*The Sofa*, ৭৩৬)

"স্বদেশে অর্থাৎ ইংলণ্ডে চৌর্য্যাপরাধীরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়; কিন্তু যে তাহার অতিস্ফীত থলী ভারতবর্ষের প্রদেশ সমূহের ধনরাশিতে আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করে, সে কোনওরূপ শাস্তিভোগ না করিয়া অব্যাহতি পায়।" ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে "নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম" প্রকাশিত হইয়াছিল। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস সেই বৎসর জুন মাসে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার পর ভারতবন্ধু এডমণ্ড বার্ক তাঁহার বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে অভিযোগের নোটিশ দিয়াছিলেন। কুপার এই ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উদ্ধৃত শ্লোক রচনা করিয়াছেন কি না বলা সুকঠিন। তিনি ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ক্লাইবের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে অভিযোগের বিষয় স্মরণ করিয়া যে এই শ্লোক লিখিয়াছিলেন তাহা সুনিশ্চিত। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে যে মকদ্দমা বার্ক আনয়ন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কবি ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে আসামীকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন—

"Hastings ! I knew thee young, and of a mind,
While young, humane, conversable and kind ;
Nor can I well believe thee, gentle then,
Now grown a villain, and the worst of men ;
But rather some suspect who have oppressed
And worried thee, as not themselves the best."
(*To Mr. Warren Hastings, Esq.*)

"হেষ্টিংস! আমি তোমার যৌবনাবস্থায় তোমাকে জানিতাম, তখন তোমার মন সরল ও দয়ার্দ্র ছিল, আর তখন তুমি মিষ্টভাষী ছিলে। আমি এক্ষণে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি না যে, যে তুমি এত বিনয়ী ছিলে, সেই তুমি এখন পাপাশয় ও মানব নামের কলঙ্ক হইয়াছ। যাহা হউক, আমার মনে হয় না যে, যাহারা তোমাকে পীড়ন ও উত্যক্ত করিয়াছে, তাহারা নিজে খুব ভাল।" ইহার পূর্ব্বে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কবি ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের উকিল হেনরি কুপারকে সম্বোধন করিয়া একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। লর্ড সভায় উক্ত উকিল প্রতিবাদীর পক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া কুপার এই কবিতা লেখেন। এই কবিতায় বার্কের বাগ্মিতার উদ্দেশে শ্লেষোক্তি আছে। (Sonnet Addressed to Henry Cowper, Esq. On the Emphatical and Interesting Delivery of the Defence of Warren Hastings, Esq. in the House of Lords) ক্লাইব ও ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে উক্ত দুইটি মকদ্দমার ফলে ইংরাজি ভাষায় যে সকল কবিতা রচিত হইয়াছিল, সেগুলি একত্র করিয়া মুদ্রিত করিলে একখানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পরে এদেশে ইংরাজের অধিকার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে শাসনের ভারপ্রাপ্ত হইয়া যাঁহারা ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিতেন, তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে "ইণ্ডিয়ান নবাব" নামে অভিহিত হইতেন এবং ইংরাজ জনসাধারণ তাঁহাদিগকে অবৈধ উপায়ে প্রভূত ধনের অধিকারী মনে করিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, আর সেই কারণে ক্লাইব ও হেষ্টিংসের নামে পার্লামেণ্টে অভিযোগ হইলে সেই সময়ে ইংরাজি ভাষার ছোট বড় যত কবি ছিলেন তাঁহারা প্রতিবাদীকে কষাঘাত করিবার বেশ সুবিধা পাইয়াছিলেন। এমন কি, ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের পত্নীও ব্যঙ্গ-কবিতার বিদ্রূপ হইতে রক্ষা পান নাই। ক্লাইব ও হেষ্টিংস ভারতবর্ষ হইতে যে সকল বহুমূল্য রত্নাদি ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের জ্যোতিঃ সমসাময়িক বিস্তর ইংরাজ কবির কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়াছিল। ক্লাইব ও হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডীয় সমাজে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় শান্ত-প্রকৃতি কবি কুপারও তাহার প্রভাব উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। কুপার তাঁহার কাব্যে ইণ্ডিয়ান নবাব নামধেয় এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদিগের বিরুদ্ধে একাধিকবার তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি দাসপ্রথা, অত্যাচার ও উৎপীড়নের চিরশত্রু ছিলেন। "নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম" নামক কাব্যের চতুর্থ সর্গে কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"Is India free ? and does she wear her plumed
And jewelled turban with a smile of peace,
Or do we grind her still ?"

(*The Task, Book IV, The Winter Evening*, ২৮)

"ভারতবর্ষ কি স্বাধীন হইয়াছে ? সে কি এক্ষণে শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে, হাসিমাখা মুখে, মণিময় উষ্ণীষ মস্তকে ধারণ করিতেছে,—না এখনও আমরা তাহাকে পেষণ করিতেছি ?" ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রচিত "তুষার দ্বীপ" নামক কবিতায় কুপার লিখিয়াছেন—

"What view we now ? More wondrous still ! Behold !
Like burnished brass they shine, or beaten gold ;
And all around the pearl's pure splendour show,
And all around the ruby's fiery glow.
Come they from India, where the burning earth,
All bounteous, gives her richest treasures birth ;
And where the costly gems that beam around
The brows of mightiest potentates are found ?
No. Never such a countless dazzling *store*
Had left, unseen, the Ganges' peopled shore ;
Rapacious hands, and ever-watchful eyes,
Should sooner far have marked and seized the prize."

(*On the Ice Islands*)

"এ আমরা আবার কি দেখি ? অত্যন্ত বিস্ময়কর ! দেখ, দেখ ! দ্বীপগুলি পরিমার্জ্জিত পিত্তল কিম্বা স্বর্ণপত্রের ন্যায় উজ্জ্বল ; এবং তাহাদের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া মুক্তার অমল সৌন্দর্য্য, চুণীর গলিত আভা প্রতিভাত হইতেছে। এই দ্বীপগুলি কি ভারতবর্ষ হইতে আসিল ? সেখানে প্রজ্বলিত ধরিত্রী অবাধে অমূল্য ধনরত্ন প্রসব করে, আর সেখানে বহুমূল্য মণিরত্নাদির জ্যোতিঃ প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিদের ভ্রূর চারিধারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। না, না। গঙ্গার জনসঙ্কুল তীরদেশ ত্যাগ করিয়া অলক্ষিতভাবে এই অগণিত অত্যুজ্জ্বল রত্নভাণ্ডার আসে নাই ; তাহা হইলে নিশ্চয়ই সদা-জাগ্রত পরস্বাপহারীরা দেখিতে পাইত এবং ইতিপূর্ব্বেই তাহারা হস্তগত করিত।" কুপার ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে "অনুযোগ" (Expostulation) নামে যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ইংলণ্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"Hast thou, though suckled at fair Freedom's breast,
Exported slavery to the conquered East ?
Pulled down the tyrants India, served with dread,
And raised thyself, a greater, in their stead ?
Gone thither armed and hungry, returned full,
Fed from the richest veins of the mogul,
A despot big with power obtained by wealth
And that obtained by rapine and by stealth ?
With Asiatic vices stored thy mind,
But left their virtues and thine own behind ;
And, leaving trucked thy soul, brought home the fee
To tempt the poor to sell himself to thee ?"

(*Expostulation*, ৩৬৪)

"তুমি স্বাধীনতার স্তন্যপান করিলেও দাসপ্রথাকে কি বিজিত প্রাচ্যে লইয়া যাও নাই ? ভারত যাহাকে ভয়ে ভয়ে সেবা করিত, সেই উৎপীড়নকারীকে বিদূরিত করিয়া তাহার আসনে নিজেকে কি তুমি অধিকতর ক্ষমতাশালী অত্যাচারীরূপে প্রতিষ্ঠিত কর নাই ? সেখানে তুমি জঠর জ্বালায় অস্থির হইয়া অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলে আর এক্ষণে মোগলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধমনী হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া উদর পূর্ণ করিবার পর গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছ। তুমি যে ধনের কৃপায় শক্তিশালী হইয়া যথেচ্ছাচারী হইয়াছ, তাহা কি তুমি লুণ্ঠন ও চৌর্য্যদ্বারা অর্জ্জন কর নাই ? আসিয়ার অধিবাসীদের সংসর্গে তোমার মন কলুষিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের ও তোমার নিজের গুণরাশি কি সেই দেশে পরিহার কর নাই ? এইরূপে পুণ্যবিবর্জ্জিত হইয়া তোমার আত্মাকে কি সামান্য পণ্যদ্রব্যের ন্যায় বিক্রয় কর নাই ? এবং যে অর্থ ঘরে লইয়া আসিয়াছ, তদ্দ্বারা প্রলোভিত হইয়া দরিদ্র তাহার স্বাধীনতাকে তোমার সুখের জন্য বিক্রয় করিবে ত ?" ভারতের ধনরত্নের বিষয় কুপার অন্যান্য ইংরাজ কবির ন্যায় বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। "The looms of Ormus and the mines of Ind." (The Task, Book IV, The Winter Evening, ২৮)। এ ছত্রটি মিল্টনের প্রতিধ্বনি মাত্র। "The gems of India, Nature's rarest Birth." (Charity, ১৩৪)

"The heart that beats beneath that breast
Is William's well I know,

"A nobler prize and richer far
Than India could bestow."
(*To A Lady*)

"সেই বক্ষের অন্তস্তলে যে হৃদয়ের সাড়া পাওয়া যায়, তাহা যে উইলিয়মের ইহা আমি বেশ জানি। সেই হৃদয়খানি ভারতবর্ষের দান হইতেও মূল্যবান।" কুপারের কাব্যে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে আমদানি কতকগুলি নূতন পণ্যদ্রব্যের নাম পাওয়া যায়। ইংরাজ ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় বেতসখণ্ডে নির্ম্মিত আসন বা চেয়ার সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

"Then came from India, smooth and bright
With Nature's varnish, severed into stripes
That interlaced each other, these supplied
Of texture firm a lattice-work, that braced
The new machine, and it became a Chair."
(*The Task, Book I, The Sofa*, ৩৯)

"তৎপরে ভারতবর্ষ হইতে মসৃণ ও প্রকৃতির বার্ণিশ সংযোগে উজ্জ্বল বেতসের ফালি আসিল ও তদ্দ্বারা নৈপুণ্য সহকারে বুননকার্য্যের ফল স্বরূপ যে যন্ত্র প্রস্তুত হইল, তাহারই নাম চেয়ার।" ইংলণ্ডের বাগানে পশ্চিম ভারতের লেবুবৃক্ষে ফলের শোভা দেখিয়া কবি লিখিয়াছেন—

"The golden boasts
Of Portugal and western India there,
The ruddier orange and the paler lime,
Peep through their polished foliage at the storm,
And seem to smile at what they need not fear."
(*The Task, Book III, The Garden*, ৫১১)

গোল্ড্স্মিথ যে সকল উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্ ইংরাজকে জাহাজে রওনা হইতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা বোধ হয় ভারতবর্ষ হইতে লেবুর বীজ দেশে লইয়া গিয়াছিলেন। কুপার বলিতেছেন যে, লেবুগুলি পত্রগুচ্ছের ফাঁক হইতে ঝড়ের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে, আর যেন বৃক্ষচ্যুত হইয়া পড়িয়া যাইবার ভয় নাই, ইহা ভাবিয়া মৃদুহাস্য করিতেছে। ইংরাজেরা কুপারের সময়ে কেবল যে নিজেদের দেশে ভারতজাত বৃক্ষাদি উৎপন্ন করিতেছিলেন তাহা নহে। বাগানের সৌন্দর্য্য-শ্রী বৃদ্ধির জন্য তাঁহারা শিল্পের আশ্রয় লইয়া ভারতের বাহ্য প্রকৃতির অনুকরণে নানা ব্যাপার সম্পাদন করিতেছিলেন।

"Ambrosial gardens, in which Art supplies
The fervour and the force of Indian skies."
(*Expostulation*, ১১)

কুপারের উক্ত "নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম" নামক কাব্যে (খৃঃ অঃ ১৭৮৫) আমরা ইংলণ্ড হইতে ভারতে আমদানি বিলাতী আতপত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই।

"We bear our shades about us; self-deprived
Of other screen, the thin umbrella spread,
And range an Indian waste without a tree."
(*The Task, Book I, The Sofa*, ২২৯)

"আমাদের আচ্ছাদনী আমরা নিজেই বহন করি। অন্য সকল প্রকার পর্দ্দা ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়া আমরা সূক্ষ্ম ছাতার সাহায্যে ভারতের বৃক্ষশূন্য মরুভূমিতে বিচরণ করি।" কুপারের পশু-প্রীতির কথা ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। প্রাচ্য হইতে ইংলণ্ডে আমদানি একটি শুক পক্ষী সম্বন্ধে ভিনসেণ্ট বোর্ণ (Vincent Bourne) লাটিন ভাষায় যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কুপার তাহা ভাষান্তরিত করিয়াছেন।

"In painted plumes superbly drest,
A native of the gorgeous East,
By many a billow tost;
Poll gains at length the British shore,
Part of the captain's precious store,
A present to his Toast."
(*The Parrot, Translated from Vincent Bourne*)

"পূর্ব্ব দেশের পাখীটি রঙিন পালকে সাজিয়া, সাগর তরঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া শেষে বিলাতে আসিয়া পৌছিল। এই শুক পাখীটি কাপ্তেনের ভাণ্ডারের মূল্যবান সামগ্রী, কারণ তিনি তাঁহার প্রণয়িনীকে উহা উপহার দিবেন।" একটি বিড়াল দেরাজের প্রকোষ্ঠে আশ্রয় লইয়াছে দেখিয়া কবি লিখিয়াছেন—

"A drawer it chanced, at bottom lined
With linen of the softest kind,
With such as merchants introduce
From India, for the ladies' use—
A drawer impending o'er the rest,
Half open in the topmost chest,
Of depth enough, and none to spare,
Invited her to slumber there."
(*The Retired Cat*)

"ভদ্রমহিলার ব্যবহারের জন্য যে শুভ্র কোমল লিনেন কাপড় বণিকেরা ভারতবর্ষ হইতে লইয়া যাইতেন, তাহা দেরাজের প্রকোষ্ঠে তলায় বিছান ছিল এবং এই সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠটি অর্দ্ধোন্মুক্ত অবস্থায় থাকাতে বিড়ালটি তাহাতে সুখে নিদ্রা যাইবার সুবিধা পাইয়াছিল।" কুপারের সময়ে ভারতবর্ষ হইতে বণিকগণ ইংরাজ মহিলার জন্য লিনেন প্রভৃতি নানাপ্রকার বস্ত্র ইংলণ্ডে লইয়া যাইতেন, একথা শুনিয়া মনে হয় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষেও এদেশের বস্ত্রবয়ন-শিল্প হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। বাস্তবিক, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত বাষ্পীয় কল ও যন্ত্র-শিল্পের প্রাধান্য যতদিন না দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ততদিন ভারতের শিল্পজাত বহুল পরিমাণে এদেশ হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানি হইত। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল কাঁচা মাল তখন বিলাতে আমদানি হইত, তাহাদের নামোল্লেখ কুপারের কাব্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে, বিলাসপ্রিয় ইংলণ্ডীয় সমাজে সে সময়ে ভারতবর্ষ হইতে আমদানি একটি নূতন জিনিষের আদর দেখা যায়।

> "The birds put off their every hue,
> To dress a room for Montagu :
> The peacock sends his heavenly dyes,
> His rainbows and his starry eyes ;
> The pheasant plumes, which round infold
> His mantling neck with downy gold ;
> The cock his arched tails' azure show ;
> And river-blanched, the swan his snow ;
> All tribes beside of Indian name,
> That glossy shine, or vivid flame,
> Where rises and where sets the day,
> Whate'er they boast of rich and gay,
> Contribute to the gorgeous plan,
> Proud to advance it all they can."
>
> (*On Mrs. Montagu's Feather-Hangings*)

মিসেস মণ্টেগু পালকের ঝালরে ঘর সাজাইয়াছিলেন। কবি বলিতেছেন যে, "পক্ষীকুল মেম সাহেবের ঘর সাজাইবার জন্য বাহার যত প্রকার বর্ণের পক্ষ ছিল, সেগুলি বর্জ্জন করিয়াছে। ময়ূর তারাখচিত অসংখ্য নেত্রবিশিষ্ট ও রামধনু আঁকা পুচ্ছের স্বর্গীয় রঙ পাঠাইয়াছে। দীর্ঘ গ্রীবাযুক্ত নানাজাতীয় পাখীরা সুকোমল ও স্বর্ণাভ পালকের আবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠাইয়াছে। মোরগ তাহার বক্র পুচ্ছের নীল শোভা, মরাল তাহার নদীস্নাত তুষারশুভ্র পালক সকল পাঠাইয়া দিয়াছে। ফল কথা, ভারতের নানা জাতীয় পক্ষীগণ মিসেস মণ্টেগুর জাঁকাল সজ্জা-কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিবার জন্য তাহাদের গৌরব করিবার যাহা কিছু মসৃণ, উজ্জ্বল, সুন্দর ও মূল্যবান সামগ্রী ছিল, তৎসমুদয় প্রেরণ করিয়াছে।" ভারতের বিহঙ্গমগণ যেভাবে ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যের কলেবর পরিপুষ্ট ও অলঙ্কৃত করিয়াছে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। কুপার পুণ্যার্থে কৃচ্ছ্রসাধ্য কর্ম্ম সম্বন্ধে "সত্য" (Truth) নামক কবিতায় লিখিয়াছেন যে, "খৃষ্টান সন্ন্যাসীরা স্বর্গ-লাভের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ দৈহিক শাস্তি ভোগ করেন, তাহার তুলনায় যোগমার্গাবলম্বী ব্রাহ্মণেরা অধিক-তর কষ্ট সহ্য করিয়া থাকেন, এবং ইহাই যদি স্বর্গে যাইবার প্রকৃষ্ট পন্থা হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্রাহ্মণগণেরই স্বর্গা-রোহণের অধিকার আছে।"

> "The Bramin kindles on his own bare head
> The sacred fire, self-torturing his trade ;
> His voluntary pains severe and long,
> Would give a barbarous air to British song ;
> No grand inquisitor could worse invent
> Than he contrives to suffer well content.
> Which is the saintlier worthy of the two ?
> "Post all dispute, you anchorite," say, you,
> Your sentence and mine differ. What's a name ?
> I say the Bramin has the fairer claim."
>
> (*Truth*, ৯৯)

উইলিয়ম কুপার যখন কাব্য-জগতে আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন, ইংলণ্ডের রাজনৈতিক গগনে তখন ভারতের ইংরাজ শাসনকর্ত্তারা উচ্চ স্থান অধিকার করিতেছেন। সমগ্র ইংরাজ জাতির দৃষ্টি সে সময়ে ক্লাইব ও হেষ্টিংসের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই দুইজন গবর্ণর জেনারেলের শাসনকালে যে সকল ভারতবাসী উৎপীড়িত হইয়াছিল, তাহাদেরও নাম ইংরাজ কবি ও সাহিত্যিক, পার্লামেণ্টের বক্তা ও সদস্য, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন সমিতি ও অংশীদারগণ ইংলণ্ডের জন-সাধারণের নিকট ঢক্কা-নিনাদে প্রচারিত করিয়াছিলেন।

ইংরাজ ঐতিহাসিক, বাগ্মী, গদ্য ও পদ্যরচয়িতা, বৈজ্ঞানিক, সমাজসংস্কারক ও ধর্ম্মপ্রচারক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অন্তরে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর কাহিনী এক নূতনতর ভাব-তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইংরাজের জাতীয়-হৃদয়ের উদারতা, স্বার্থপর বাণিজ্যের ধনলিপ্সা ও অসদুপায়ে সাম্রাজ্য লাভের বলবতী ইচ্ছাকে দমন করিবার জন্য এই সময়ে মুক্তকণ্ঠে ও নির্ভীক ভাবে যেরূপ প্রতিবাদ করিয়াছিল, দরিদ্র উৎপীড়িত ভারতবাসী তজ্জন্য এডমণ্ড বার্কপ্রমুখ সমসাময়িক বৃটিশ রাজনীতিকদের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজি গদ্য ও পদ্য সাহিত্য ভারতের কথা প্রসঙ্গে মানব-চরিত্রের এমন উচ্চ আদর্শ বর্ণন করিয়াছে, রাজনীতি ও সমাজনীতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এদেশের শাসনকর্ত্তাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও সততা সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য তত্ত্বাদি এমন সঙ্গত ও সুন্দরভাবে বিচার করিয়াছে যে, আমাদের মনে হয়, ভারতের কথাগুলি এই সময়কার ইংরাজি সাহিত্য হইতে বাদ দিলে ইংরাজি ভাষা দরিদ্রা ও শ্রীহীনা হইয়া পড়িবে। কুপারের সমকালে ভারত সাম্রাজ্য লাভ করিয়া ইংলণ্ড যেমন ধনী হইয়াছিল, ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার চর্চ্চা করিয়া ইংরাজি সাহিত্যও তেমনি বিষয়-বৈভবে গরীয়সী হইয়াছিল। কুপার ১৮০০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে যে উদারনীতি (Liberalism) কোলরিজ (Coleridge) ও ওয়ার্ডসোয়ার্থ (Wordsworth) পরিস্ফুট করিয়াছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কুপারের কাব্যে আমরা তাহার রশ্মিরেখা দেখিতে পাই। ফরাশি বিপ্লবের ফলস্বরূপ সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের নবভাব য়ুরোপে জন্মলাভ করিলে যেমন উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ কবিগণের কল্পনা চিন্তারাজ্যের নূতন ও পরিসর ক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চয় করিবার সুবিধা পাইয়াছিল, পলাশীর যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে ইংরাজের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কুপার প্রমুখ ইংরাজ কবিগণও সেইরূপ কাব্য-জগতে মানব-চরিত্রের নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর নিকট ইংরাজি কাব্য-সাহিত্য যে কতটা ঋণী, তাহা অনেকেই ভাবিয়া দেখেন নাই। ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস যাঁহারা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বলিতেই হইবে যে, প্রাচ্যের সংশ্রবে আসিয়া ইংরাজ কবির কল্পনা প্রকৃতির নবাবিষ্কৃত রাজ্যে বর্ণ-সৌন্দর্য্য ও আলো-আঁধারের বৈচিত্র্যময় বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিয়া, অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে মুসলমান রাজত্বের সমকালে রাজপুতের বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া, ইংরাজ কবি যে কত শত পদ্যময় রচনায় ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সহজ নহে। আমরা ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে যুগ-প্রবর্ত্তক কবিবিশেষের রচনা হইতে যতটা প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উক্ত সাহিত্যের উপর ভারতের প্রভাব নেহাৎ কম ও উপেক্ষনীয় নহে।

পতিতার ছেলে।

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(৬)

বৈকাল বেলায় সন্তোশ ষ্টেশনে বর আনিতে গিয়াছিল। গ্রামের ছোট-বড় সকলেই আসিয়া বিবাহ বাড়ী জাঁকাইয়া বসিয়াছে; অন্তঃপুরেও মেয়েদের হাট বসিয়া গিয়াছে। ইহারই মধ্যে কেহ কেহ মেয়ে সাজাইতে বসিয়া গিয়াছে, কারণ সন্ধ্যা-লগ্নেই বিবাহ।

ক্যাবলার ঠাকুরমা বারাণ্ডায় বসিয়া হুকুম চালাইতেছিলেন, দাসীরা খাটিতেছিল। উঠান বারাণ্ডা—তরকারীর খোসা, বাসনপত্রে একাকার হইয়া রহিয়াছে। নীলাম্বর একবার বাড়ীর মধ্যে আসিয়া বলিলেন, "খুড়িমা, এগুলো ঝিদের দিয়ে উঠিয়ে ফেল, এখানে ঘিরে হবে। আলপনা যে দিতে পারে তাকে—"

মাথা দিয়া খুড়িমা বলিয়া উঠিলেন, "সে আর তোমায় বলতে হবে না বাছা, আমি সব একুনি ঠিক করিয়ে দিচ্ছি। কাজের বাড়ী, কারও কি একরত্তি ছুটি আছে। আমি সেই তিনটের সময় বাড়ী গিয়ে চারটী খেয়ে এসে এখনও একটু জিরুতে পাই নি। তা বাবা—এ রকম আর হবে না। কাজের বাড়ী—বিশেষ, তুমিই যখন একাজ আমাদের হাতে সঁপে দেছ, আমাদের কি এখন জিরুতে গেলে চলে? ওরে—ও ঝি মাগীরা, নে নে, শীগ্‌গির বাসন-কোসনগুলো ঘরে তোল, উঠোনটা প'স্কার করে দে বাছা। এখন কখনই বা আলপনা দেওয়া হবে, কখনই বা কি হবে?"

তাঁহার ব্যস্ততা দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নীলাম্বর বাহিরে চলিয়া গেলেন। মুখের ব্যস্ততা মুখেই থাকিয়া গেল, কার্য্যে কিছুই হইল না।

বাসন তুলিতে তুলিতে খাগড়াই একখানা ছোট রেকাব দেখিতে পাইয়া কুসুম বলিল, "খাসা রেকাবখানি। আমার ইচ্ছে করে, এমনি একখানা রেকাব কিনি; তা পোড়া কপাল আমার, পয়সাই জুটে ওঠে না।"

খুড়িমা মহা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "রাখ বাপু ওখানা। আমি নীলুর কাছ হতে ওই রেকাবখানা আর দুটো গেলাস চেয়ে নেব ভেবেছি। তা দেখছি তোরা আর নিতে দিবি নে। কণক, এদিকে আয় তো দিদি। এই রেকাব আর গেলাস দুটো এক দৌড়ে আমাদের ঘরে রেখে আয়, তারপরে অবসর বুঝে আমি নিলুকে বলব'খন।"

ঠাকুরমার আদেশে কণক গেলাস ও রেকাবি লইয়া সবে মাত্র পা বাড়াইয়াছিল, সেই সময় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল—"থাম্ বলছি—নিয়ে যাস নে।"

অকস্মাৎ যোগমায়াকে সেখানে দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেল। কাহারও মুখ দিয়া আর একটী কথা বাহির হইল না। একটু পরে খুড়িমা বলিলেন, "হ্যাঁ গা, তুমি যে আবার এখানে এলে?"

"কেন—আসতে কি নেই?" বলিয়া যোগমায়া কণকের হাত হইতে গেলাস ও রেকাব লইয়া গৃহে তুলিলেন। দাসীদের পানে চাহিয়া বলিলেন, "তাড়াতাড়ি করে উঠান সাফ করে দে, দেরী করিস নে।"

খুড়িমা তাজ্জব মানিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, "এ আবার কি কথা গো বাছা? তুমি কি এ বিয়ে পণ্ড করতে এলে নাকি? জেনে শুনেও—"

ক্ষিপ্র হস্তে বারাণ্ডার কাপড়-চোপড়, বাসন প্রভৃতি গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে যোগমায়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ—জেনে শুনেই এসেছি। তোমাদের বেধড়ক চুরিগুলো আর দেখতে পারলুম না বলেই আসতে হল। তোমরা যদি ধর্ম্মভেবে কাজ করতে, আমাকে তা হলে মাথা ঘামাতে হ'ত না, আসতেও হ'ত না। তোমরাই তো আমায় নিয়ে আসলে।"

যে চোর, তাহাকে চোর বলিলে সে খুব রাগিয়া উঠে। খুড়িমাও জ্বলিয়া উঠিলেন; তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "চুরি করছি? কি চুরি করেছি দেখিয়ে দাও তো বাছা? তোমার মতন এমন নিছক মিথ্যেবাদী তো আর কোথাও দেখি নি। আমি আগেই এই সব ভেবেচিন্তেই আসতে চাই নি। নীলু পায়ে ধরে কেঁদে কেটে তবে নিয়ে এল আমায়, আমি কি যে-সে লোক গা? আমার শ্বশুর অমুক চূড়ামণি, আমার স্বামী অমুক তর্কালঙ্কার, আমার ছেলে ভবতারণ ন্যায়রত্ন, এঁদের না চেনে কে? তাদের ঘরের গিন্নি আমি, আমায় বলে কি না চোর? মাগীর যে বড় লম্বা চওড়া কথা হয়েছে দেখতে পাই। আছেন সমাজচ্যুত হয়ে, তবু কথা যায় নি?"

যোগমায়া তাঁহার কথায় কান দিলেন না। তাড়াতাড়ি উঠান পরিষ্কার করিয়া একটী মেয়েকে আলপনা দিতে বসাইয়া দিলেন। ঘরের জিনিষ সব ঘরে উঠিল, যোগমায়া গৃহে চাবী বন্ধ করিয়া চাবী সত্যেশের কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

প্রাচীনাগণ মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অন্তঃপুরে রীতিমত একটা হাট বসিয়া গেল। বাহিরে নীলাম্বরের কানে গোলমাল পৌঁছাইবামাত্র তিনি ব্যস্তভাবে বাড়ীর মধ্যে আসিয়াই সম্মুখে যোগমায়াকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন—"এ কি; বউদি যে?"

যোগমায়া একটু হাসিয়াই বড় গম্ভীর হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "তুমি আমায় বারবার করে আসতে বলেছিলে

ঠাকুরপো; তবুও আসতুম না আমি—যদি না এই চুরিগুলো না দেখতে পেতুম। যখন নিজের চোখে দেখতে পেলুম সব, তখন থাকতে পারলুম না—চলে এলুম।"

নীলাম্বরের চোখে জল আসিয়া পড়িল, গাঢ়স্বরে তিনি বলিলেন, "বেশ করেছ বউ দি। তোমার হাত পড়েছে বলেই বাড়ীখানার শ্রী এত শিগ্‌গীর ফিরে গেছে। আর একটু বাদেই জামাই আসবে, অথচ কোথায় কি যে তার ঠিক নেই।"

যোগমায়া বলিলেন, "আমি সব ঠিক করে রেখেছি। ঘরে চাবী দিয়ে চাবী গজেশের কাছে দিয়েছি। বাইরে সব পড়ে থাকায় লোকের নেবার আরও সুবিধা হয়েছিল।"

এই সময়ে বাহিরে খবর দেওয়ায় মাতব্বর লোকেরা ক্রোধ কম্পিত কলেবরে অন্তঃপুরে আসিয়া পড়িলেন। যোগমায়া কখনও ইঁহাদের সম্মুখে বাহির পর্য্যন্ত হন নাই, তাই তিনি অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া থামের পাশে সরিয়া গেলেন।

তারিণী মুখুয্যে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "বলি নীলাম্বর, তাই যদি তোমার মনে ছিল, আমাদের সাহায্য নেবার কি মানেটা ছিল তোমার? যখন ওঁর সাহায্য পেলেই তোমার হয়, তখন আমাদের দরকারটা কি? এই কথাটা স্পষ্ট করে আগে বললেই তো ভাল ছিল, আমরা নিজেদের কাজ ক্ষতি করে বসে থাকতুম না।"

খুড়িমা সানুনাসিক সুরে বলিলেন, "আবার বলে কি না আমরা সব চোর, দু হাতে চুরি করছি।"

"চোর!" বৃদ্ধ তারিণীচরণ যুবকের মতই সদর্পে লাফাইয়া উঠিল। রাম খুড়ো নস্যি লইতে গিয়েছিলেন, হাত কাঁপিয়া সমস্ত নস্যটা মাটিতে পড়িয়া গেল। শ্যাম ঠাকুর আচমকা কথাটা শুনিবামাত্র পড়িয়া গেলেন। নিধু গাঙ্গুলী ভগ্নকণ্ঠে ধীরে ধীরে ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "হায় ভগবান্, আমরা চোরই বটে। যাক, বেশী কথা বলবার দরকার দেখছি নে কিছু। নীলু যখন ওঁকেই বিশেষ সাহায্যকারিণী ভেবেছে, তখন আমাদের ছুটি। সত্যি আমরা কিছু নেমন্তন্ন খাবার প্রত্যাশা করি নে। এমনতর নেমতন্ন গাঁয়ে ঢের মেলে।"

তারিণীচরণ রুক্ষ কণ্ঠে বলিলেন, "এর চেয়ে ভাল বল। আমার মেয়ের বিয়ে হল যে সেবার অঘ্রাণ মাসে, কি লোকটাই খেলে বল তো তোমরা?"

রাম খুড়ো তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "আর আমার নাতনীর বিয়েতে—"

বাধা দিয়া শ্যাম ঠাকুর বলিলেন, "আমার ভাইয়ের মেয়ের বিয়েতে কি লোকটাই—"

তাঁহাকে একটা ধাক্কা দিয়া নিধু গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিলেন, "রাখ তোমার ভাইঝির বিয়ে। আমার ভাগনির বিয়েতে গাঁয়ের একটা লোক বাকি গিছল? লোকের বাড়ী বাড়ী একথালা সন্দেশ, একখানা করে কাপড়—"

অকস্মাৎ কাশি আসিয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিল—কাশিতে কাশিতে তিনি বলিলেন—'আর পাঁচ পোয়া করে' —খক খক খক—'সে খাঁটি সরষের তেল—' খক খক খক—কাশী চলিতেই লাগিল। অবশেষে চোখ মুখ রক্তবর্ণ করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিলেন, "চল হে চল, যাদের জাত বিচার নেই, তারা সব করতে পারে। এ বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিতে আসাই আমার মত কুলীনের অন্যায় হয়েছে।"

যথার্থই তাঁহারা চলিয়া যান দেখিয়া নীলাম্বরের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "যাবেন না, কথাটা শুনে যান।"

শ্রীদাম গুহ গর্জ্জিয়া বলিলেন, "আবার তোমার কথা শোনা? তুমি আমাদের চোর বলবে, ডাকাত বলবে—আমরা তোমার কথা শুনব?"

খুড়িমা একটু সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলেন, "না না, নীলু কিছু বলে নি, বলেছেন অবনীর ভাজ।"

তারিণীচরণ ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি ওঁকে ডেকেছ তোমার বাড়ী?"

নীলাম্বর একটু নীরব রহিলেন, তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় যোগমায়া অন্তরাল হইতে সরিয়া আসিলেন। অবগুণ্ঠন একটু কম হইয়া শক্ত ভাবে উত্তর করিলেন, "না, আমায় কেউ ডাকে নি, আমি অমনিই এসেছি।"

তাঁহাকে সহসা প্রকাশ হইতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া গেলেন। তারিণীচরণ থতমত খাইয়া অ্যাঁ উ করিয়া বলিলেন, "আপনি জানেন তো যে আপনি সমাজচ্যুত, তবে জেনে শুনে সমাজের কোনও ব্যাপারে হাত দিতে এসেছেন কেন?"

যোগমায়া সেইরূপ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "আমি তা জানি নে।"

বিস্মিত তারিণীচরণ বলিলেন, "জানেন না? গ্রামের ছোট বড় সবাই এ কথা জানে, আপনি জানেন না? আপনাকে নিয়েই গ্রামে এতবড় কাণ্ড হচ্ছে—"

স্পষ্টভাবে যোগমায়া বলিলেন, "কি করে জানব তাই আগে আমায় বলুন। আপনারা কেউ দয়া করে আমায় সে কথা কখনও জানিয়েছেন কি? পরোক্ষ ভাবে শুনলেও আমি তা বিশ্বাস করতে পারি নি।"

তারিণীচরণ বলিলেন, "এখন বিশ্বাস করছেন?"

যোগমায়া উত্তর করিলেন, "বিশ্বাস করার আগে আমি জানতে চাই কিসের জন্যে আমি সমাজচ্যুত হচ্ছি?"

তারিণীচরণ রাগ চাপিয়া বলিলেন, "আপনি সব জেনে শুনেও আবার জিজ্ঞাসা করছেন? আপনি যে পতিতার ছেলেটিকে গ্রহণ করেছেন, তার জন্যেই আপনি সমাজচ্যুত হচ্ছেন। তাকে ত্যাগ করুন, প্রায়শ্চিত্ত করুন, আমরা আপনাকে আদর করে ডেকে নেব; আপনি যেমন ছিলেন তেমনি থাকবেন।"

গর্ব্বপূর্ণ কণ্ঠে যোগমায়া বলিলেন, "আর যদি ত্যাগ না করি?"

তারিণীচরণ বলিলেন, "চিরদিন আপনাকে সমাজের বাইরে থাকতে হবে।"

তেমনি গর্ব্বপূর্ণ কণ্ঠে যোগমায়া বলিলেন, "তবে তাই হোক, আমি চিরদিন তাকে নিয়ে সমাজের বাইরেই থাকব। যে সমাজ এমন কঠোর আমি সে সমাজে বাস করে নিজেকে উঁচু বলে ধারণা করতে পারিনে। যতদিন সে বেঁচে থাকবে, ততদিন আমি কিছুতেই দূর করতে পারব না। যদি ঈশ্বর এর মধ্যে তাকে গ্রহণ করেন, তাহলে বাধ্য হয়ে হয় ত আবার আপনাদের শরণাপন্না হতে হবে। পতিতার ছেলে সে—এই তার অপরাধ? আপনাদের কয়টা ঘর অকলঙ্কিত আছে খোঁজ করে বলবেন। মায়ের জন্যে ছেলের উপর নির্য্যাতন, এ করতে পারে হৃদয়হীন মানুষে; যাদের হৃদয় আছে তারা পারে না। ধার্ম্মিক বলে গর্ব্ব করেন আপনারা। কিসের ধর্ম্ম আপনাদের? কোন্ শাস্ত্রে আছে অনাহারে ক্লিষ্টা একটী নারীকে আর একটী শিশুকে সামনে রেখে নিজেরা খেলে পুণ্য হয়? কোন্ শাস্ত্রে আছে পতিতার মুখে জল দেওয়াও পাপ, এতে পাপের অংশ বহন করা হয়? এই আপনাদের ধর্ম্ম—এই আপনাদের সমাজ? আমি আপনাদের এমন সমাজের মুখে সহস্রবার—লক্ষবার পদাঘাত করি।"

যোগমায়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। তাঁহার দর্পপূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমটা কথা কহিলেন বিশ্বেশ্বর গুহ। তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "না, সমাজ আর থাকে না, ধর্ম্মও আর থাকে না। কালে কালে এ সব হল কি? মেয়ে মানুষ—যারা চিরদিন দাসীবৃত্তিই করে আসছে, হাজার লাথী মারলে যাদের মুখে একটী না শব্দ উচ্চারণ হ'ত না, যাদের মুখ চন্দ্র সূর্য্য দেখতে পেত না, তারাই কি না সকলের সামনে বেরিয়ে এমনি করে লম্বা চওড়া কথা বলে যায়?"

এতক্ষণে তারিণীচরণ কথা কহিতে পারিলেন। মাথার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "নিশ্চয়ই সমাজ থাকবে না। উঃ, একটা মেয়ে মানুষের এত তেজ, এত দর্প! কিছুতেই দমল না, উল্টে আমাদেরই এত কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল?"

নিধু গাঙ্গুলী বলিলেন, "আর দেখছেন কি খুড়ো, এ কলিযুগের শেষ হয়েছে যে। ওই যে কি একখানা থিয়েটারের বই আছে না, মেয়েরা হবে পুরুষ, পুরুষ হবে মেয়ে, এ হয়েছে ঠিক তাই। চলুন, আমরা এখন ঘোমটা দিয়ে ঘরের মধ্যে বসিগে যাই, সমাজ চালাবে ওরা।"

শ্যাম ঠাকুর ক্ষোভের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "না, হিঁদুয়ানি আর থাকে না। এ সব খিষ্টেনী মত হে—আর কিছু নয়।"

অবনী বাবু বলিলেন, "বড় বউয়ের তেজের কথা আমি যে আগে বলেছিলুম, দেখলেন তো এখন।"

তারিণীচরণ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বিশেষ করে দেখলুম হে। বলি তোমার বাবা কি আর মেয়ে খুঁজে পান নি ছেলের বিয়ে দেবার, তাই ওর সঙ্গে বিয়ে দিলেন?"

চোরের মত নীলাম্বর এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। অন্তর সম্পূর্ণ যোগমায়ার কার্য্যের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে চাহিতেছিল, মুখ নীরব। আজ তাঁহার একটা কথা বলিবার অধিকার নাই।

রাম খুড়ো বলিলেন, "নীলুর যখন কোনও দোষ নেই, তখন এ বাড়ী ছেড়ে যাওয়া অনর্থক। বিয়েটা পণ্ড করে কোন লাভ নেই। এ সব ব্যাপারের মধ্যে নীলুর কোন সংস্রব আছে আর আমরা এতে থাকব না শুনলে বরকর্ত্তা পিছিয়ে যাবেন। চল, বলা যাক।"

ধরণী ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। চল হে নীলাম্বর, আমরা যা বলেছি রাগের মাথায়, সে সব কথা আর মনে কোরো না। রাগের মাথায় অমন কথা ঢের বেরিয়ে যায়। তখন কে বলছিলে খুব ভাল অম্বিকে তামাক আনিয়েছ, দু চার ছিলিম খাওয়াবে চল।"

উচ্চ হাসিয়া নীলাম্বর ভৃত্যকে তামাক আনিতে আদেশ করিয়া সকলের সহিত বাহিরে গেলেন।

(৭)

বাড়ী আসিয়া যোগমায়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। কাজকর্ম্ম সব পড়িয়া রহিল।

বৈকাল বেলায় একবার গণেশ আসিয়া বলিল, "মা, খাবার দাও, খিদে পেয়েছে।"

সেই সকালে সে খাইয়া স্কুলে গিয়াছিল। অন্য দিন তাহার ফিরিবার অনেক আগেই যোগমায়া মুড়ি, দুধ, গুড় সব ঠিক করিয়া রাখিয়া দিতেন। সে আসিয়া নিয়মিত স্থানে বই রাখিয়াই খাবার লইয়া বসিত। আজ তাহারও ফিরিতে দেরী হইয়াছিল। স্কুল হইতে আসিবার পথে নীলাম্বরের বাড়ীর জাঁকজমক দেখিয়া সে যোগমায়ার নিষেধ না শুনিয়াই তাহার মধ্যে গিয়াছিল। যখন দেখিল তাহার জন্ত সেখানে ঝগড়া বাধিয়া গেল, তখন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল। পথে আসিয়া ভাবিতেও তাহার এক ঘণ্টা লাগিয়াছে, কেন তাহার জন্ত এ ঝগড়া বাধিল? অন্য সব ছেলে যেখানে যাইতে পারে, সে সেখানে যাইতে পারে না কেন?

বাড়ী আসিয়া বই রাখিয়া সে খাবার রাখিবার স্থানে গিয়া দেখিল সেখানে কিছুই নাই। ক্ষুধায় তাহার পেট জলিতেছিল, তথাপি আজ সে রাগ করিবার সময় পাইয়া উঠে নাই।

যোগমায়া তাহার দিকে চাহিলেন না, বিপরীত দিকে ফিরিয়া শুইলেন। গণেশ ঠিক করিয়া লইল বোধ হয় জ্বর হইয়াছে। সে তাই যোগমায়ার পৃষ্ঠে হাত দিয়া দেখিল, কই জ্বর তো হয় নাই; তবে নিশ্চয়ই মাথা ধরিয়াছে। আর একদিনও এমনি মাথা ধরিয়াছিল, যোগমায়া সেদিন এমনি করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন।

গণেশ যোগমায়ার মাথায় হাত দিয়া উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "সে দিনকার মতন বড্ড মাথা ধরেছে কি মা? টিপে দেব?"

"দূর হ—দূর হ আপদ, একটু শান্তিতে থাকতে এলুম, এখানেও আবার জ্বালাতে এলি?"

যোগমায়া গণেশের হাতখানা দূরে সরাইয়া ফেলিলেন।

গণেশ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। চুপ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। যোগমায়া কেন যে বার বার তাহার সহিত এরূপ কঠোর ব্যবহার করিতেছেন, কেন যে এরূপ কঠোর কথায় তাহার হৃদয়খানা ক্ষত বিক্ষত করিয়া তুলিতেছেন, বালক কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে বিহ্বল ভাবে যোগমায়ার পানে চাহিয়া রহিল।

যোগমায়া ফিরিয়া কঠোর দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "তোর কি মরণও নেই ডেকরা? এই যে জগতে লক্ষ লক্ষ লোক মরছে, তুইও মর না কেন? তোর জন্তে আমি যে কিছুতেই মুক্তি পেতে পারছি নে, আমার গায়ে যে শিকল পরিয়ে রেখেছিস তুই। তুই মর—একেবারে মর, আমার শেকল বিপদ ঘুচে যাক, আমি সকলের সঙ্গে আবার মিশতে পারি। কেবল ওরা

করছিস তুই, তোর জালায় আমি মরলুম যে। কাউকে মুখ দেখাতে পারিনে, কারও সঙ্গে একটা কথা বলতে পারিস নে। আমি বলছি তোকে, তুই মর। নিজেও নিস্কৃতি পা, আমাকেও দে।"

অভিমানে গণেশের চোখ জলে ভরিয়া আসিল, হঠাৎ চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া কয়েকটা বিন্দু গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িয়া গেল। কি একটা যেন তাহার কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া উঠিতেছিল। নীরবে সে বাহির হইয়া গেল।

যোগমায়া ডাকিলেন, "গণেশ।"

কোনও উত্তর নাই।

যোগমায়া শয্যাত্যাগ করিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া দেখিলেন সে এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তখন সন্ধ্যার তরল অন্ধকার পৃথিবীর বুকে ভাসিয়া আসিয়াছে, তাহার মুখখানা তাই তেমন স্পষ্ট দেখা গেল না। সে যে কাঁদিতেছে, তাহাতে যোগমায়ার কোনও সন্দেহ ছিল না। তিনি তাহার কাছে আসিয়া কোমল কণ্ঠে ডাকিলেন, "গণেশ।"

গণেশ উত্তর করিল না।

তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া, তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে স্নিগ্ধ কণ্ঠে যোগমায়া বলিলেন, "বড্ড ব্যথা পেয়েছিস বাবা? কাঁদছিস্ নাকি?"

এবার বালক আর নীরব থাকিতে পারিল না, যোগমায়ার কোলের উপর মুখখানি লুকাইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল।

যোগমায়ার চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া কয়েকটা বড় বড় জলের ফোঁটা গণেশের পিঠের উপর পড়িল। মাতৃহৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে চাহিতেছিল, গোপন ব্যথা মূর্ত্তিমান হইয়া ফুটিয়া পড়িল। এখন তিনি সে দৃঢ়চেতা—জ্ঞানময়ী নারী নহেন, এখন তিনি বড় হালকা, এখন তিনি জ্ঞানহীনা, এখন তিনি মা। তিনি আজ জগতের পরিত্যক্তা, আজ আছে কেবল এই ছেলেটাই তাঁহার, আর কেহই নাই। সব বিসর্জ্জন দিয়া তিনি এই ছেলেটীকে বক্ষে লইয়া নিজের অন্ধকার গৃহে ফিরিয়াছেন।

তখনই তিনি শক্ত হইয়া গেলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, "কাঁদিস নে, চুপ কর। ঘরে চল, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে। আগে আর খাবার খেয়ে নিবি।"

গণেশ রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমার আর খিদে নেই।"

যোগমায়া বলিলেন, "তখন এসে বললি খিদে পেয়েছে, এখন বলছিস খিদে নেই। আর কথা বাড়াস নে, চল খাবি।"

গণেশ আর কথা কহিল না। যোগমায়া তাহার হাত ধরিয়া গৃহের মধ্যে লইয়া গেলেন; সন্ধ্যা প্রদীপ জালাইয়া দিয়া তাহাকে দুধ, মুড়ি, গুড় আনিয়া দিলেন। গৃহে কয়েকটা পাকা মর্ত্তমান কলা ছিল, তাহাও আনিয়া তাঁহার কাছে রাখিয়া বলিলেন, "খেয়ে নে বাবা, মুখখানা শুকিয়ে গেছে। অনর্থক আর দেরী করিস নে।"

গণেশ তথাপিও কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল, হাত তুলিল না। যোগমায়া নিজেই দুধ, মুড়ি মাখিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন।

খাওয়াইয়া বলিলেন, "একটা কথা শুনবি?"

গণেশ বলিল, "কি?"

যোগমায়া বলিলেন, "আমি তোকে আমার কাছে আর রাখতে পারছি নে, তাই তোকে তোর বাপের কাছে দিয়ে আসতে চাই। দেখ্ ভেবে—যাবি তো?"

গণেশ না ভাবিয়াই উত্তর দিল, "যাব।"

যোগমায়া শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। এই সুদীর্ঘ তিন বৎসর তাহাকে নিজের কাছে রাখিয়াছেন, সঞ্চিত যত স্নেহ ছিল সব তাহার উপর ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহার জন্য কত কথা না শুনিতে হইয়াছে, সে কি না বিনা প্রতিবাদেই বলিল যাব। তিনি এই কথাটা শুইয়া পড়িয়া ভাবিতেছিলেন, তথাপি ইহাও ভাবিতেছিলেন, গণেশ নিশ্চয়ই ঘোর আপত্তি তুলিবে, নিশ্চয়ই বলিবে 'যাইতে পারিব না।' এখন তাহার মুখের কথা শুনিয়া হঠাৎ তাঁহার বুকে কিসের একটা আঘাত আসিয়া লাগিল, তিনি মুহূর্ত্তে পাষাণ হইয়া গেলেন। মনের মধ্যে এই অনিত্ত সত্যটা জাগিয়া উঠিল। হাজার হোক—পরের ছেলে তো। হাজার খাওয়াও দাওয়াও, যত্ন কর, ভালবাস, তথাপি সে পরের ছেলে। ইহারা লইতে জানে, দিতে জানে না।

ঘরের ডাক পড়িলেই সে চলিয়া যাইবে—তখন আর ফিরিয়াও চাহিবে না। যতদিন না ঘরের ডাক আসে, ততদিন সে আপন হইয়া থাকে।

কিন্তু গণেশের মর্ম্মব্যথা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সে যে কত বড় অভিমানে যাইতে চাহিতেছে, তাহা সেই জানে। দশ বৎসরের বালক মাত্র সে, তথাপিও সে বুঝিয়াছে যোগমায়া তাহাকে লইয়া কতদূর ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আগে সে বুঝিতে পারে নাই, কতদূর নীচ সে, তাই যথেচ্ছাচার করিয়া গিয়াছে। আজ তাহার মনে হইতেছে, সে যে মায়ের গর্ভে জন্ম লইয়াছিল—যে ওইখানে ওই গাছের তলায় পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সেই মা পতিতা হইলেও তাহার হৃদয় কি উপাদানে নির্ম্মিত ছিল। সেই মাকে সে তো বড় কম জ্বালাতন করে নাই, তথাপিও তো মা একদিনও একটী কথা বলেন নাই। কেবল ক্ষমা—না চাহিতেই ক্ষমা সে পাইয়াছে। সেই মা আর এই মা? সে নির্ম্মল স্নেহের আধার সে হারাইয়াছে—আর সে বক্ষে তাহার স্থান হইবে না।

তাহার বক্ষে বড় আঘাত লাগিয়াছিল। যোগমায়ার উপর অভিমানে তাহার সমস্ত হৃদয়টা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার জন্যই যোগমায়ার এত লাঞ্ছনা; যদিও সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে নাই, তথাপি সে যোগমায়াকে মুক্তি দিবার জন্য ভাবিয়াছিল। নিজেকে এমনই সে একটা বিরাট বোঝা স্বরূপ ভাবিতে শিখিয়াছিল।

যোগমায়া অনেকক্ষণ নীরবে বাহিরের ঘনীভূত নিকষ কালো অন্ধকারের পানে চাহিয়া রহিলেন। কালোর মাঝে সাদা বিন্দু ও সব কি ভাসিতেছে? চোখ চাহিলেও অন্ধকারে এই সাদা বিন্দু, চোখ মুদিলেও অন্ধকারের মধ্যে সেই সাদা বিন্দু।

অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া যখন চোখ জ্বালা করিতে লাগিল, তখন যোগমায়া চোখ ফিরাইলেন। গণেশের পানে চাহিয়া দেখিলেন সে তেমনই শক্ত কাঠের মত বসিয়া আছে। এ আর সে গণেশ নয়, সে দুর্দান্ত গণেশের অবসান হইয়াছে, বুঝি চিরকালের মতই তাহার শেষ হইয়া গেছে।

যোগমায়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "বেশ ভাল করে ভেবে বলছিস তো? দেখ, এখনও—"

গণেশ মাথা কাত করিয়া জানাইল, "সে ভাল করিয়া ভাবিয়াই বলিতেছে, সে সেখানে নিশ্চয়ই যাইবে।"

যোগমায়া বলিলেন, "থাকতে পারবি তো?"

গণেশ বলিল, "পারব। এই তো ও পাড়ায় থাকব, যখন ইচ্ছে হবে, তোমায় এসে দেখে যাব।"

যোগমায়া হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "না—তা হবে না। আর কক্ষনো আমার কাছে আসতে পারবি নে তুই। তুই কে যে আসবি আমার কাছে? আমায় বুঝি আবার ডুবাবি? আমি তোকে তোর বাপের কাছে ফেলে দিয়ে এসে প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে উঠব, তোর জন্যে আবার আমি জাত খোয়াতে যাব? কক্ষনো হবে না তা, কক্ষনো না। যদি মার খেয়ে মরিস সেখানে, তবু আমার কাছে আসতে পাবি নে। যদি না খেতে পাস—ব্যারামে ভুগে মরিস—তবুও না।"

গণেশ সজল চোখ তুলিয়া বলিল, "তবুও না?"

দৃঢ় কণ্ঠে যোগমায়া বলিলেন, "না—তবুও না।"

গণেশ নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার চোখের কোণ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া গেল। একটু থামিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে মা, আমি আর কক্ষনো আসব না।"

ক্রমশঃ।

অভাব।

[অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

অভাবের কথা শুনিলে সকলেরই একটা মহান্ আতঙ্ক উপস্থিত হয়। জগতের প্রায় সকলেই একটা না একটা অভাবের তাড়নায় উৎপীড়িত। এই অভাব পদার্থটা কি, আজ তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

"অভাব" বলিয়া যে একটী পদার্থ আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রামের টাকা নাই, শ্যামের পুত্র নাই, ইত্যাদি সর্ব্বজনীন প্রতীতির বলেই অভাব নামক পদার্থ সিদ্ধ হয়। ষড় দর্শন-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন,—"সর্ব্বজনীনাভাবপ্রত্যয় ব্যবহারৌ ন কাল্পনিকৌ ভবিতুমর্হতঃ।"—(তাৎপর্য্যটীকা ৩০৬ পৃষ্ঠা)

ন্যায়মঞ্জরী-প্রণেতা জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন,—

সুখদুঃখসমুৎপত্তিরভাবে শত্রুমিত্রয়োঃ।
কণ্টকাভাবমালক্ষ্য পদং পথি নিধীয়তে॥
প্রাগুৎপত্তের্ঘটাভাবং বুদ্ধা তৎকারণাদরঃ।
ব্যাধ্যভাবপরিচ্ছেদাৎ ভৈষজ্যবিনিবর্ত্তনম্॥
ইহাভাবপ্রতিষ্ঠানব্যবহারপরম্পরাম্।
পশ্যন্নভাবং কো নাম নিহ্নুবীত সচেতনঃ॥

(ন্যায়মঞ্জরী ৯ পৃষ্ঠা)

শত্রুর অভাবে সুখ এবং মিত্রের অভাবে দুঃখ উপস্থিত হয়, যে পথে কণ্টক নাই সেই পথেই লোকে পদক্ষেপ করে, উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটের অভাব অনুভব করিয়া কুম্ভকার তাহার কারণ সম্বলনে প্রবৃত্ত হয়, আবার রোগের অভাব হইয়াছে বুঝিয়া মানুষ আর ঔষধ খায় না—এইরূপ অভাব সম্ভাবের ব্যবহার-পরম্পরা দেখিয়া কোন সচেতন ব্যক্তি অভাব পদার্থের অপলাপ করিতে পারে।

প্রভাকর প্রভৃতি দার্শনিকেরা বলেন যে, অভাব বলিয়া কোন অতিরিক্ত পদার্থ নাই, উহা অধিকরণের স্বরূপ। এখন আপত্তি হইতে পারে, অভাব কীদৃশ অধিকরণের স্বরূপ? অভাব যদি যে কোন অধিকরণের স্বরূপ হয় তাহা হইলে যে অধিকরণে ঘট আছে সেখানেও ঘটাভাবের ব্যবহার হউক, আর যদি বল ঘটাভাববিশিষ্ট যে অধিকরণ ঘটাভাব তাদৃশ অধিকরণের স্বরূপ, তাহা হইলে ত অতিরিক্ত অভাব পদার্থেরই স্বীকার করিতে হয়। ইহার সমাধান প্রসঙ্গে প্রভাকরেরা বলিয়াছেন যে, তোমরা যেরূপ অধিকরণে ঘটাভাবের সত্তা স্বীকার কর, আমরা সেই ঘটাভাবকে সেই অধিকরণেরই স্বরূপ বলিব। অভাব অধিকরণের স্বরূপ হইলে ভূতলে ঘটাভাব আছে এইরূপ আধারাধেয়ভাবের উপপত্তি হইতে পারে না—এ কথা বলা শোভা পায় না, কারণ, ঘটশূন্য অন্যান্য স্থানের ন্যায় ঘটাভাবের উপরেও ঘটাভাব আছে, অভিন্ন হইলেও 'ঘটাভাবে ঘটোনাস্তি' এইরূপ প্রতীতি তোমরাও স্বীকার করিয়া থাক।

প্রভাকরদিগের এই সিদ্ধান্তের উপরে নৈয়ায়িকেরা বলিয়াছেন, জলে যে গন্ধাভাব আছে তাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; এখন তোমার মতে এই গন্ধাভাব তাহার অধিকরণ জলের স্বরূপ, সুতরাং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ত তাহার প্রত্যক্ষ অসম্ভব, কেন না জল কখনও ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। এই ভাবে অন্যান্য গুণের অভাব প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও ঈদৃশ অনুপপত্তি হয়। অভাবকে অধিকরণের স্বরূপ স্বীকার করিলে আরও এক দোষ হয়—আত্যন্তিক দুঃখধ্বংসের নাম মুক্তি, এই মুক্তির প্রতি তত্ত্বজ্ঞান কারণ। এখন অভাব যদি অধিকরণের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে দুঃখধ্বংসরূপ মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্য হইতে পারে না, কেন না, দুঃখধ্বংস অভাব পদার্থ, সে যদি তাহার অধিকরণ আত্মার স্বরূপ হয় তবে মুক্তি ত নিত্য পদার্থে পরিণত হইল, তাহার আর কোনও কারণ থাকিতে পারে না। আত্মা নিত্য বলিয়া তাহার যেমন কোনও কারণ নাই, তেমনই মুক্তিও যদি আত্মার স্বরূপ হয় তবে তত্ত্বজ্ঞান তাহার প্রতি কারণ হইবে

কিরূপে? তাই "তত্ত্বচিন্তামণি"কার লিখিয়াছেন,—"দুঃখধ্বংসস্য মুক্তিত্বে চাত্মনো দুঃখাভাবত্বে মোক্ষাস্যাপুরুষার্থত্বপ্রসঙ্গঃ আত্মনোঽসাধ্যত্বাৎ।"—(প্রত্যক্ষখণ্ড, অভাববাদ, ৭১২ পৃষ্ঠা।) কাজে কাজেই অভাবকে অধিকরণের স্বরূপ মানিলে দুঃখধ্বংসরূপ মুক্তি অসাধ্য হইয়া পড়ে, সুতরাং লোকে আর তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য নানাবিধ কঠোর আয়াস স্বীকার করিবে কেন?

এখন আর একটা কথা হইতে পারে এই যে, পূর্ব্বোক্ত বিবিধ দোষের আপত্তির ভয়ে অভাবকে অধিকরণের স্বরূপ বলিতে না পারিলেও যে সময়বিশেষে যে ভূতলে নৈয়ায়িকেরা অভাব স্বীকার করেন সেই সময়বিশেষের সম্বন্ধকেই ঘটাভাব বলিব, অতিরিক্ত অভাব পদার্থ মানিব কেন? ইহা বলিলে 'ভূতলে ঘট নাই' এইরূপ আধারাধেয়ভাবেরও আর অনুপপত্তি হয় না—কারণ, ভূতলেই তাদৃশ সময়বিশেষ-সম্বন্ধের অধিকরণ। সময়বিশেষ-সম্বন্ধকে অভাব বলিয়া স্বীকার করিলে অননুগম দোষ হয়, এ কথা বলিতে পার না; কেন না, অতিরিক্ত অভাব পক্ষেও এ দোষ তুল্য রূপে বিদ্যমান, যেহেতু, অভাবত্ব জাতিও নহে, উপাধিও নহে। যদি বল অভাব প্রতীতির অনুগমের জন্য অভাব পদার্থের উপর একটা ধর্ম্মান্তর স্বীকার করিব, তাহা হইলে সেই ধর্ম্ম লাঘবতঃ তাদৃশ সময় বিশেষেই বিদ্যমান হউক। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 'ইদানীং ভূতলে ঘট নাই' এইরূপ প্রতীতি অনুসারে ভূতলের ন্যায় সময়বিশেষও অভাবের অধিকরণ রূপে অনুভূত হয়, কিন্তু তৎসময়বিশেষে, তৎসময়বিশেষের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, কাজেই আধারাধেয়ভাবের অনুপপত্তি হয়। তার পর আর এক কথা, যদি তত্তৎসময় বিশেষের সম্বন্ধ নিবন্ধন ভূতলে ঘটাভাবের ব্যবহার হয়, তাহা হইলে যে কপালে ঘট থাকে তত্তৎসময়বিশেষের সম্বন্ধ হেতু সেই কপালই ঘট ব্যবহারের জনক হউক, স্বতন্ত্র ঘট স্বীকারের আর আবশ্যকতা কি? সময়বিশেষের সম্বন্ধকে অভাব বলিলে আর এক প্রধান দোষের আপত্তি এই হয় যে, কোন অভাবেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না—কারণ, সময়বিশেষসম্বন্ধ অতীন্দ্রিয়।

মহর্ষি কণাদ "দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্," (১।১।৪।) —এই সূত্রে কেবল ভাব পদার্থের বর্ণনাভিপ্রায়েই অভাবের উল্লেখ করেন নাই। নতুবা অভাবও যে পদার্থান্তর, ইহা মহর্ষির অভিপ্রেত, কারণ, তিনি পশ্চাল্লিখিত সূত্রগুলিতে প্রাগভাব, ধ্বংস, অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাব—এই চতুর্ব্বিধ অভাবের নিরূপণ করিয়াছেন।

"ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ।"—৯।১।১

[ঘটাদি বস্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে থাকে না। কেন না তখন তাহাতে ক্রিয়া বা গুণের ব্যপদেশ অর্থাৎ 'ঘট নড়িতেছে', বা 'ঘট লাল' ইত্যাদি ব্যবহার হয় না। ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটের যে অভাব থাকে তাহার নাম ঘটের প্রাগভাব।]

"সদসৎ।"—৯।১।২ [যে ঘট এখন বর্ত্তমান আছে মুদ্গরের আঘাত করিলে সেই ঘট 'অসৎ' অর্থাৎ অবর্ত্তমান হয়। ঘটের এতাদৃশ অভাবের নাম ধ্বংস।]

"সচ্চাসৎ"—৯।১।৩ [ভূতলে ঘট থাকিলেও ভূতলে ঘটের যে অভাবের অনুভব হয়, অর্থাৎ 'ভূতল ঘট নহে' বা ভূতলে ঘটের ভেদ আছে এই ব্যবহার যে অভাবের সাহায্যে উপপন্ন হয়, তাহার নাম ঘটের অন্যোন্যাভাব বা ভেদ।]

"যচ্চান্যদসদতস্তদসৎ।"—৯।১।৫ [পূর্ব্বোক্ত এই তিন প্রকার অভাব ভিন্ন যে অভাব, তাহার নাম অত্যন্তাভাব, গৃহাভ্যন্তরে ঘট থাকিলেও প্রাঙ্গণে সেই ঘটের যে অভাব অনুভূত হয় তাহাই অত্যন্তাভাব।]

উদ্ধৃত সূত্রগুলির পরবর্ত্তী সূত্র সমূহে এই চতুর্ব্বিধ অভাবের প্রত্যক্ষের প্রণালীও অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং মহর্ষি কণাদ যে দ্রব্যগুণাদির ন্যায় অভাবকেও পদার্থান্তর বলিয়া স্বীকার করিতেন ইহা আর অপ্রতিপন্ন হয় না, এই জন্যই কণাদ সূত্রের ভাষ্যের ব্যাখ্যা গ্রন্থ শ্রীধরাচার্য্য-কৃত "ন্যায়কন্দলী"তে ও উদয়নাচার্য্য-কৃত "দ্রব্যকিরণাবলী"তে অভাব যে পদার্থান্তর ইহা উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে (১)। বৈশেষিকশাস্ত্রানুমোদিত 'সপ্তপদার্থী' নামক প্রাচীন

(১) 'অভাবস্য পৃথগনুপদেশো ভাবপারতন্ত্র্যাৎ, ন ত্বভাবাৎ'। —ন্যায়কন্দলী, (৭ পৃষ্ঠা)

সংগ্রহ গ্রন্থে শিবাদিত্য স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—'প্রমিতি-বিষয়াঃ পদার্থাঃ। তে চ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্য বিশেষসম-বায়াভাবাখ্যাঃ সপ্তৈব'। ৯-১০ পৃঃ।

বরদরাজও স্বকৃত "তার্কিকরক্ষা"য় বলিয়াছেন,—

"এবং লক্ষিতা ষট্‌পদার্থী, এতস্যামেব ভাবাত্মকং বিশ্বমন্তর্ভবতি। ভাবব্যতিরিক্তোঽভাব ইতি তেন সহ সপ্তৈব পদার্থা ইতি নিয়মঃ।"—(১৮৩ পৃষ্ঠা)

কণাদের ন্যায় মহর্ষি গৌতমও অভাবের পদার্থান্তরতা স্বীকার করিতেন। গৌতম, 'প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজন' —(১।১।১) ইত্যাদি প্রথম সূত্রে অভাবের উল্লেখ না করিলেও তিনি যে অভাব পদার্থ মানিতেন ইহা ভাষ্য, বার্ত্তিক, তাৎপর্য্য দেখিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন,—'তদেবং সতঃ প্রকাশকং প্রমাণম-সদপি প্রকাশয়তীতি,'—যে সকল প্রমাণ ভাবপদার্থের সাধক, অভাব পদার্থও সেই সকল প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয়, ভাবপদার্থের ন্যায় অভাব পদার্থ যদি প্রমাণসিদ্ধ, তাহা হইলে সূত্রকার গৌতম অভাব পদার্থের নিরূপণ করেন নাই কেন?—এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে। তাই বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্য টীকায় লিখিয়াছেন,—'নহু যদি সদসতী প্রমাণ বিষয়ৌ কস্মাৎ সদ্ভেদা ইব অসদ্ভেদা অপি সূত্রকৃতা-নোচ্যন্তে।' (২৪ পৃষ্ঠা) ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—'তত্র স্বাত-ন্ত্র্যেণাসদ্ভেদা ন প্রকাশন্ত ইতি নোচ্যন্তে'।—(১০ পৃষ্ঠা) ভাবাভাবের মধ্যে অভাব পদার্থ স্বতন্ত্র অনুভূত হয় না, এই জন্যই অভাব পদার্থ উদ্দিষ্ট হয় নাই। অর্থাৎ প্রতি-যোগী (যাহার অভাব তাহাকে প্রতিযোগী বলে, যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট) ও অনুযোগীর (অভাবের অধিকরণকে অনুযোগী বলে, যেমন 'ভূতলে ঘটাভাব' এখানে ভূতল অনুযোগী) নিরূপণ না হইলে অভাবের নিরূপণ হইতে পারে না, কাজেই অভাবনিরূপণ ভাব নিরূপণের অধীন, সুতরাং ভাবনিরূপণের দ্বারাই এক প্রকার অভাবের নিরূপণও হইয়া গিয়াছে, তাই পৃথক ভাবে অভাব উদ্দিষ্ট হয় নাই।

গৌতম, প্রথম সূত্রে অভাবের উল্লেখ করেন নাই কেন, এ সম্বন্ধে উদ্দ্যোতকর আর একটা কারণও দেখাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"চতুর্বর্গানন্তর্ভাবাদ্বা, ভাবপ্রপঞ্চব-দভাবপ্রপঞ্চোঽপ্যুদ্দিষ্টো বেদিতব্য ইতি।"—(ন্যায়বার্ত্তিক ১০ পৃষ্ঠা) বাচস্পতি মিশ্র এই অংশের টীকায় লিখিয়াছেন "অথবা কথিতা এব যেষাং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সোপ-যোগি যে তু ন তথা ন তেষাং প্রপঞ্চঃ অনুপযুক্তভাব প্রপঞ্চইব বক্তব্য।"—(তাৎপর্য্যটীকা ২৪ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান নিঃশ্রেয়সের উপযোগী, তাহাই কথিত হইয়াছে, যাহার তত্ত্বজ্ঞান নিঃশ্রেয়সের উপযোগী নহে, তাহা গৌতম বলেন নাই। যে যে ভাব পদার্থের তত্ত্ব জ্ঞান নিঃশ্রেয়সের অনুপযোগী তাহা যেমন কথিত হয় নাই, সেইরূপ অভাব পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান নিঃশ্রেয়সের অনুপযোগী বলিয়া গৌতম প্রথম সূত্রে অভাবের কীর্ত্তন করেন নাই 'প্রমাণপ্রমেয়সংশয়'—ইত্যাদি সূত্রে কণাদোক্ত দ্রব্যগুণাদি পদার্থের উল্লেখ না থাকিলেও গৌতম যে সেই সমস্ত পদার্থ স্বীকার করিতেন তাহা আমরা 'আন্বীক্ষিকী' প্রবন্ধে (ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩২৩) দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

মহর্ষি গৌতম "নাভাবপ্রামাণ্যং প্রমেয়াসিদ্ধেঃ"—(২।২।৭) অভাবখণ্ডনপর এই শঙ্কা সূত্রের অবতারণা করিয়া পরবর্ত্তী সূত্রে অত্যন্তাভাব সিদ্ধির কথা বলিয়াছেন—

"লক্ষিতেষ্বলক্ষণলক্ষিতত্বাদলক্ষিতানাং তৎপ্রমেয়াসিদ্ধিঃ"। —(২।২।৮)

প্রাগভাবও যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলেই সিদ্ধ হয়, মহর্ষি গৌতম তাহাও লিখিয়াছেন,—

"প্রাগুৎপত্তেরভাবোপপত্তেশ্চ"—২।২।১২

এই সূত্রের শেষে যে 'চ'কার প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারা 'ঘট নষ্ট হইল' ও 'ঘট পট নহে' ইত্যাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে ধ্বংস ও অন্যোন্যাভাব সিদ্ধিরও যে সমুচ্চয় হইবে, ইহা

এতেন পদার্থা এব প্রাধান্যেনোদ্দিষ্টা বেদিতব্যাঃ অভাবস্তু স্বরূপ বানপি পৃথক্‌নোদ্দিষ্টঃ প্রতিযোগিনিরূপণাধীননিরূপণত্বাৎ নতু তুচ্ছ-ত্বাৎ। উৎপত্তিবিনাশচিন্তায়াং প্রাগভাবপ্রধ্বংসাভাবৌ বৈধর্ম্ম্যে চেতরে-তরাত্যন্তাভাবয়োরত্র তত্র ব্যুৎপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ।

—কিরণাবলী, ৭ পৃষ্ঠা।

গৌতম সূত্রের বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এবং বিবরণকার গোস্বামী ভট্টাচার্য্য স্পষ্টই লিখিয়াছেন (২)।

মীমাংসক প্রভাকর, অতিরিক্ত অভাব না মানিলেও মীমাংসকচূড়ামণি কুমারিল ভট্ট অতিরিক্ত অভাব পদার্থ স্বীকার করিতেন। তাঁহার মতেও অভাব চতুর্বিধ,—

"ক্ষীরে দধ্যাদি যন্নাস্তি প্রাগভাবঃ স উচ্যতে।
নাস্তিতা পয়সো দধ্নি প্রধ্বংসাভাব ইষ্যতে॥
গবি যোঽশ্বাদ্যভাবস্তু সোঽন্যোন্যাভাব উচ্যতে।
শিরসোঽবয়বা নিম্না বৃদ্ধিকাঠিন্যবর্জ্জিতাঃ।
শশশৃঙ্গাদিরূপেণ সোঽত্যন্তাভাব উচ্যতে॥"

— শ্লোকবার্ত্তিক, অভাব-পরিচ্ছেদ।

জরন্নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট, স্বকৃত "ন্যায়মঞ্জরী"তে অভাব পদার্থের সাম্প্রদায়িক প্রকারভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার নিজের মতে অভাব দ্বিবিধ,—প্রাগভাব ও ধ্বংস। তারপর, মতান্তর প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন, কাহারও মতে অভাব চতুর্বিধ,—প্রাগভাব, ধ্বংস, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব। আবার অন্যমতে এই চারিটী ভিন্ন অপেক্ষাভাব ও সামর্থ্যাভাব নামক দুইটী অতিরিক্ত অভাব স্বীকার করা হয় (৩)। এই সমস্ত অভাবের পরিচয় দিবার উদ্দেশে জয়ন্তভট্ট লিখিয়াছেন,—

প্রাগাত্মলাভান্নাস্তিত্বং প্রাগভাবোঽভিধীয়তে।
উৎপন্নস্যাত্মহানং তু প্রধ্বংস ইতি কথ্যতে॥
ন প্রাগভাবাদন্যে তু ভিদ্যন্তে পরমার্থতঃ।
স হি বস্ত্বন্তরোপাধিরন্যোন্যাভাব উচ্যতে॥
স এবাবধিশূন্যত্বাদত্যন্তাভাবতাং গতঃ।
অপেক্ষাভাবতা তস্য দেশোপাধিনিবন্ধনা॥
সামর্থ্যং পূর্ব্বসিদ্ধং চেৎ প্রধ্বংসে তদভাবধীঃ।
নো চেৎ তর্হি বিশেষোঽস্য স্বরূপঃ প্রাগভাবতঃ॥
উৎপন্নস্য বিনাশো বা তদনুৎপাদ এব বা।
অভাবস্তত্ত্বতোঽন্যে তু ভেদাস্ত্বৌপাধিকা মতাঃ॥

—ন্যায়মঞ্জরী, ৬৩ পৃষ্ঠা।

অপেক্ষাভাব ও সামর্থ্যাভাবের উল্লেখ, ন্যায়-বৈশেষিকের অন্য কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাই নাই। ভোজদেবকৃত "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" নামক অলঙ্কার গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে—

"অভাবঃ প্রাগভাবাদিভেদেনেহ চতুর্বিধঃ।
ঘটাভাবাদিভেদাত্তু তস্য সংখ্যা ন বিদ্যতে॥"

ইত্যাদি গ্রন্থে অভাব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে। মহারাজ ভোজদেব, তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষভাগে—যেখানে

"অসত্তা যা পদার্থানামভাবঃ সোঽভিধীয়তে।"

বলিয়া অভাবের লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেখানে অভাব যে ষড়্বিধ, তাহাই কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"প্রাগভাবাদিভেদেন স ষড়্বিধ ইহেষ্যতে॥"

পূর্ব্ব প্রদর্শিত প্রাগভাব, ধ্বংস, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব এবং মতান্তরসিদ্ধ বিজাতীয় অত্যন্তাভাব ও সামর্থ্যাভাব—এই ছয় প্রকার অভাবই এখানে গ্রন্থকারের বক্তব্য।

"অন্যে পুনরন্যথা অত্যন্তাভাব মাচক্ষতে" বলিয়া ভোজরাজ ইহার উদাহরণ দেখাইয়াছেন,—

"প্রসীদ সদ্যো মুঞ্চেমং চণ্ডি মানং মনোগতম্।
দৃষ্টমাত্রেঽপি তে তত্র রোষঃ খকুসুমায়তে॥"

এই অংশের টীকায় রত্নেশ্বর লিখিয়াছেন,—"স্থানান্তরে প্রমিতস্য স্থানান্তরে ত্রৈকালিকোঽভাববিশেষোঽত্যন্তাভাব ইতি দর্শনমাশ্রিত্য চতুষ্টয়মধ্যপাতী তাবদত্যন্তাভাব উদাহৃতঃ। ইদানীং পঞ্চমাভাবোচিতবিশেষমত্যন্তাভাবং দর্শয়তি। অন্যে পুনরিতি। সৌগতাদয়ঃ। অত্যন্তাসৎপ্রতিযোগিকোঽভাবোঽত্যন্তাভাবঃ। যথা খপুষ্পাভাব ইত্যুদাহরণং স্ফুটম্।"

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, "অন্যে পুনঃ"—বলিয়া ভোজরাজ যে বিশিষ্ট অত্যন্তাভাব দেখাইয়াছেন, তাহা

---

(২) "চকারেণ ধ্বংসাদেরপি প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বং সমুচ্চীয়তে।"

—ন্যায়সূত্রবৃত্তি, ৮৭ পৃঃ।

"চকারেণ নষ্টো ধ্বস্তো ঘটো ইত্যাদিপ্রত্যয়েন ধ্বংস-ভেদাবপি সিদ্ধাবিতি সমুচ্চীয়তে।"—ন্যায়সূত্রবিবরণ, ৬৩৬ পৃঃ।

(৩) তস্মান্নাস্তীতিপ্রত্যয়গম্যো হ্যভাব ইতি সিদ্ধম্। স চ দ্বিবিধঃ প্রাগভাবঃ প্রধ্বংসাভাবশ্চেতি। চতুর্বিধ ইত্যন্যে। ইতরেতরাভাবঃ অত্যন্তাভাবশ্চ তৌ চ দ্বাবিতি। ষট্প্রকার ইত্যন্যে। অপেক্ষাভাবঃ সামর্থ্যাভাবস্তে চ চত্বার ইতি।

—ন্যায়মঞ্জরী, ৬৩ পৃঃ।

অলীকপ্রতিযোগিক অভাব—টীকাকার রত্নেশ্বর ইহাকে বৌদ্ধমত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সামর্থ্যাভাবের উদাহরণরূপে ভোজরাজ "অভিজ্ঞান শকুন্তলে"র নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

'মানুষীষু কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ।
ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলে॥"

টীকাকার রত্নেশ্বর লিখিয়াছেন,—"সামর্থ্যাভাবো যোগ্যতাভাবঃ।" মানুষীতে এমন রূপের যোগ্যতা নাই' ইহাই সামর্থ্যাভাব। অপেক্ষাভাবের উল্লেখ, আর কোনও গ্রন্থে নাই। "ন্যায়মঞ্জরী"কার লিখিয়াছেন,—"অপেক্ষাভাবস্তু তস্য দেশোপাধিনিবন্ধনা।" 'কলিকাতা অপেক্ষা কাশীতে জনতার অভাব' ইহাই বোধ হয় অপেক্ষাভাব।

অভাব সম্বন্ধে আরও অনেক বক্তব্য আছে। প্রবন্ধের দীর্ঘতার ভয়ে আজ এই খানেই সমাপ্ত করিলাম।

হেবার মা।

[অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত, এম-এ, বি-এল]

বিনা সুপারিশে বি-এ পাশ করিতে গিয়া তিনবার অকৃতকার্য্য হইলাম। ইংরাজী আর সংস্কৃত এই দুইটিই ছিল আমার পথের কাঁটা। কিন্তু চতুর্থবার সুপারিশের গুণে আমার সকল কাঁটাই গোলাপ হইয়া ফুটিয়া উঠিল। আমি বি-এ পাশ করিয়া বসিলাম। তারপর বাবার খোসামুদীর জন্য পেড়ু প্রভৃতি গোরাচাঁদের মুরুব্বিয়ানায় ডেপুটিগিরীও মিলিয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক আমাকে সৎপাত্র জ্ঞান করিয়া তাঁহার ফুটফুটে কন্যারত্নটিকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া ফেলিলেন। দুই বৎসর শিক্ষানবিশী করার পর আমি কুড়িগ্রাম বদলী হইলাম। আর আমার মত নির্ভরশীল ব্যক্তির উপরেও সরকার হইতে দুই বৎসর অবধি জেল দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

সেই কুড়িগ্রামের কথাই বলিতেছি। সেদিন রবিবার। সকালে চা খাইতে খাইতে গিন্নিকে কহিলাম—দেখ, এই যায়গাটায় ছোট বেলায় যে ছিলাম তা বোধ হয় তুমি জান না। এখানে বাবা একটা বাড়ীও করিয়াছিলেন। আমাদের এক মাষ্টার একবার বন্ধের পরে হাতের লেখা না আনার জন্য প্রায় পোনর দিনের জন্য ক্লাসশুদ্ধ ছাত্রকে বেঞ্চের উপর নীল-ডাউন করাইয়াছিলেন। আমিও বাদ যাই নাই। আমি যদি হেড্ মাষ্টার হইতাম, তবে বোধ হয় ঐ মাষ্টারকেই ছাত্রদের পরিবর্ত্তে নীল-ডাউন করাইয়া দিতাম।

কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী দেখতে ইচ্ছা হয় আমাদের হেবার মা আর তার হেবাকে। হেবার মা আমাদের বাড়ী চাল যোগাইত আর হেবা তাহার সঙ্গে আসিত। কয়েক মিনিট করিয়া এই হেবার সঙ্গে যে আমি খেলিতাম তাহাও আমার মনে আছে। তাহাকে যে আমি মধ্যে মধ্যে সাধ্যমত ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিতাম, তাহাও আমার মনে আছে। হেবা কিন্তু পড়িয়া গিয়াও কাঁদিত না, বরং খুসীই হইত। সেজন্য মা তাহাকে আমার দুই একটা জামাও বক্‌সিস্ দিতেন। হেবার মাও আমাকে খুসী করিবার জন্য মাঝে মাঝে কলা ও পেয়ারা লইয়া আসিত। মা কিন্তু রাগ করিতেন, কোন কোন দিন ঐ সকল উপাদেয় বস্তু সম্বন্ধে ভয়ানক আপত্তি করিতেন। খেতে কিন্তু আমার ভালই লাগিত। পেটে কেন ঐ সকল উপাদেয় বস্তু সহিবে না তাহা একেবারেই বুঝিতে পারিতাম না।

নবীন ঘাসের উপর নিদাঘের প্রচণ্ড বায়ু তাড়িত পথের রুক্ষ ধূলি পড়িলে সেই ঘাসের বর্ণ যেমন ফুটিয়া উঠে, হেবার মায়ের গায়ের বর্ণও অনেকটা সেই আকার ধারণ করিয়াছিল। আমরা যখন তাহাকে দেখিয়াছিলাম তখন সে বয়সে যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়ত্বে পড়িবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু দেখিয়া তাহাকে অনেক বেশী বুড়ী বলিয়াই মনে হইত। চোখের পাতা ঐ বয়সেই লোল হইয়া পড়িয়াছিল। গায়ের চামড়াও

স্থানে স্থানে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। মস্তকের নাতিদীর্ঘ দ্বিবর্ণের কেশগুচ্ছ মস্তকের প্রায় মধ্য খানেই শেষ হইয়া গিয়াছিল; তবুও অনেক চেষ্টা চরিত্র করিয়া সে ঐ কেশ কয় গাছকে টানিয়া ঘাড়ের উপরেই কোন মতে একটা অতি ছোট গাঁইট বাঁধিয়া রাখিত।

আমি সেদিন উঠানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আম খাইতেছিলাম। এমন সময় হেবার মা মাথা হইতে চালের ধামাটা নামাইল। সেদিন হেবা না আসায় আমার শৈশব খেলার ব্যাঘাত জন্মিল। যেখানে চাল মাপা হইতেছিল আমি সেইখানে গিয়া কহিলাম—হেবা?

মা আমার কথার অর্থ বুঝিয়া কহিলেন—তাই ত! তোমার হেবাকে নিয়ে এসনি?

হেবার মা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—না, তার জ্বর হয়েছে।

মা কহিলেন—বা, এরি মধ্যে জ্বর হলো! কালই ত হেবাকে নিয়ে দুধ দিয়ে গেলে।

হেবার মা অনেকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল—সে দুঃখের কথা বলে আর কি হবে মা?

তথাপি ঐ দুঃখের কথা শুনিবার আগ্রহ যে মার কম হইল তাহা নয়। তাই হেবার মাকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁটিয়া সকলই বলিতে হইল।

সেদিন মামাত ভাইএর সহিত হেবার একটি খণ্ড-যুদ্ধ হইয়া গেল। জয় পরাজয় তখনও অনিশ্চিত। এমন সময় কোথা হইতে উল্কার মত ছুটিয়া আসিয়া সুন্দরী তাহার ছেলেকে যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লইল, এবং যাইতে যাইতে তাহাকে এমন ভাবে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল যে হেবার আর বিন্দুমাত্রও আপশোষ রহিল না। হেবার মাও নিকটে বসিয়া সব দেখিতেছিল। তাহার হাতের ঝাঁটারূপী মহা অস্ত্র সে তাহার একমাত্র সন্তানের উপর নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু ভিতর হইতে কিসের একটা টানের জন্ত তাহার হাতের অস্ত্র হাতেই রহিয়া গেল।

পীড়ন যজ্ঞ সমাধা করিয়া সুন্দরী আর সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিল—গোগ্রাসে চার বেলা করে যত পারে দিয়ে ছেলেটাকে দস্যি করে তুলেছে, আর পরের উপর লেলিয়ে দিয়ে মজা দেখা হচ্ছে।

এমন সময় সুন্দরীর স্বামী আসিয়া কর্কশ স্বরে কহিল—কি হয়েছে যে এত চেঁচাচ্ছ?

ততোধিক কর্কশ স্বরে সুন্দরী কহিল—রাজ্যশুদ্ধ লোককে বাড়ীতে এনে জায়গা দেবে আর তারাই কি না বুকের উপর চেপে বসে লাথি মারবে, আর চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করবে। আমি যদি একটু হুঁ করি তখনি তুমি তাম্বি করা সুরু করবে।

এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া সুন্দরী গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে সুরু করিল। রাজচন্দ্রের মন সেদিন ভাল ছিল না। পাটনী তাহাকে পারের পয়সার জন্ত সকলের সম্মুখে এমন তাগাদা দিয়াছিল যে তাহার আর সহ্য হইতেছিল না। কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে পাটনীকে কিছুই বলিতে পারে নাই। তিন মাসের জমার টাকা সে তখন পর্য্যন্তও বাকী রাখিয়াছিল। তাই পাটনীর উপরকার ক্রোধটুকু জমা করিয়াই সে বাড়ী ফিরিয়াছিল। বাড়ীতে আসিয়া সুন্দরীর কাহিনী শুনিয়া সে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। তারপর ক্ষিপ্রহস্তে হেবাকে ধরিয়া তাহার মাথায় পিঠে এমন ভাবে কীল চড় বর্ষণ করিতে লাগিল যে অল্পক্ষণেই হেবা ধরাশায়ী হইল।

এই নির্ম্মম পীড়ন হেবার মা বসিয়া বসিয়া দেখিয়াছে, একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। অপমানে ও ক্রোধে তাহার সমস্ত ভিতরটা আহতা ফণীনির ন্যায় জ্বলিতেছিল।

রাজচন্দ্র চলিয়া গেলে হেবার মা একটা ঝাঁকি দিয়া উঠিয়া পড়িল এবং এক দৌড়ে এক ঘটি জল আনিয়া হেবার মাথার উপর ঢালিতে লাগিল। মহা আতঙ্কে ছেলেটি ঐ সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেও কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে হেবার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডাকিয়া জ্বর আনিল। সেই জ্বরেই হেবা পড়িয়াছিল, তাই সে আসিতে পারে নাই।

হেবার মার কথা শুনিয়া মা চোখের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। আমার মনও দুঃখে ভরিয়া উঠিল।

এই ঘটনার পাঁচ দিনের পরের কথা বলিতেছি। আমি সেদিন রান্নাঘরের সম্মুখে লাট্টু ঘুরাইতেছিলাম, আর একটা বিচ্ছু মার্কা লাট্টু আমার পকেটে পকেটে ঘুরিতেছিল। অভিপ্রায় ছিল হেবা আসিলেই তাহাকে ঐ মূল্যবান জিনিষটী প্রদান করা হইবে।

একাগ্রচিত্তে লাট্টু ঘুরাইতে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আমি শুনিলাম হেবার মা কহিতেছে—আমি আর বরদাস্ত করিতে পারি না। মনে হয় একটা দা নিয়ে সাঁ করে বুকের মধ্যে এক কোপ বসিয়ে দেই। দিন রাত তারা ছ'জনে যে আমার এক রত্তি ছেলেটার আদিখ্যাতি করবে, এ আর সহ্য হয় না। শুধু ত ঐ ঘরটায় থাকি, ওদের এক পয়সাও ত খাই না। মা ঠাকরুণ, বলুন দেখি তবুও আমাকে এত খোঁটা সহ্য করতে কেন হয়?

মা তাহাকে অদৃষ্টের দোষ বলিয়া নিরস্ত করিলেন। হেবার মা চলিয়া গেল।

তার পরের রবিবারে হেবার মা আসিয়া কহিল—কি বলব মা ঠাকরুণ! আজ রান্নাঘরে হেবার জন্য দুটি আলু সেদ্ধ ভাত তৈরী করতে গিয়েছিলুম। কিন্তু সুন্দরী বললেন কি না আমি না কি তাদের চাল ডাল নুন তেল গোপনে গোপনে চুরি করি। এত লোকসান সহ্য করলে তাকে দুদিনেই না খেয়ে মরতে হবে। তাই রাজচন্দ্র ফিরে এলে সে আমাকে ঐ রান্নাঘরে আর ঢুকতে দেবে না। আমিও তাকে কম শুনিয়ে দেই নি মা ঠাকরুণ। সে যে বাপের বাড়ী থেকে ঐ রান্নাঘরটা নিয়ে আসেনি, রাজচন্দ্রও যে ওটা তোলে নি, তা আমি সুন্দরীকে খুব ভাল করেই বলেছি। আর কে যে কার জিনিষ চুরি করে তাহাও আমি গোপন রাখি নাই। কি বোলব মা ঠাকরুণ, ঐ ছোটলোকের মেয়েটাই ত রাতদিন ঘরে বসে সমস্ত জিনিষপত্র ওলট-পালট করে দেখে, আর আমি যখন বেচা কেনা করতে বাহির হয়ে আসি তখন সে যে দুই একটা মাঝে মাঝে সরিয়ে রাখে তার খবর আমি পেয়েছি।

সেইদিন ঐ পর্য্যন্তই হেবার মার নিকট শুনিলাম। তার দুই দিন পরে হেবার মা দেখিলাম মার নিকট বসিয়া কাঁদিতেছে। কিন্তু সেদিন আমি কিছুই শুনিতে পারিলাম না। তারপর চালের আগাদায় হেবার মার বাড়ী গিয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার চক্ষুস্থির হইল। হেবা আমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। এই ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে রসিক মণ্ডলের নিকট খোঁজ লইয়া অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। সেই সব কথাই এখন তোমাকে বলিব।

হেবার মা যেদিন মার নিকট বসিয়া কাঁদিতেছিল, সে দিন রাজচন্দ্র আসিয়া তাহাকে রান্নাঘর হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল।

সুন্দরীর সহিত জোর দেখাইতে গিয়া সুন্দরীকে হেবার মা বলিয়াছিল—আমি যাব না এই রান্নাঘর ছেড়ে। আমি একবার দেখে নেব তোর কোন্ বাপের ক্ষমতা আছে আমাকে এখান হ'তে তাড়ায়।

হেবাও তাহার কাছে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সুন্দরী সাঁ করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে কহিল—ও মুখ যদি না খেঁৎলে দেই, তবে আমার নাম সুন্দরী নয়। তখন যেন সুন্দরীর চোখ হইতে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছিল।

মিনিট পাঁচেক পরেই রাজচন্দ্র সেই রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া বজ্রমুষ্টিতে হেবার হাতটা ধরিয়া একটানে তাহাকে সে রান্নাঘরের দাওয়ার নীচে ফেলিয়া দিল। তারপর এক পদাঘাতে হেবার মায়ের উনানটা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সোলা, গোঠা কাঠ পাতা পরিপূর্ণ ডালিটা উঠাইয়া লইয়া উঠানে আনিয়া ভীষণ বেগে ফেলিয়া দিল। আর একটু হইলে চাল ডাল ইত্যাদির ব্যবস্থা রাজচন্দ্র ঠিক ঐরূপ করিত। কিন্তু হেবার মা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া এক ঝটকায় উঠিয়া একটা কাটারী দিয়া সুন্দরীর দুইটি উনানই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। জলের মেটে কলসীটার উপরেও দুইটা আঘাত করিল, ফলে ঘরময় জল ছড়াইয়া পড়িল।

রাজচন্দ্র লক্ষ্য করে নাই যে ঘরের মধ্যে এতখান কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। অসতর্ক ভাবে ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া রাজচন্দ্র পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল। সেই অবসরে হেবার মা বাহিরে আসিয়া হেবাকে উঠান হইতে কোলে

তুলিয়া লইয়া বসিল। সুন্দরী বড়ঘরটার দাওয়ায় বসিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছিল। হেবার মা তাহাকে দেখিতে পাইয়া কাটারীখানা উছাইয়া কহিল—ফের হাসবি যদি দাঁত গুঁড়ো করে দেব।

কাটারী দেখিয়া সুন্দরীর প্রাণ উড়িয়া গেল। এমন সময় কর্দ্দমাক্ত চেহারা লইয়া রাজচন্দ্র ঘরের বাহির হইতেই সুন্দরীর চক্ষুস্থির হইল। রাজচন্দ্র কি মনে করিয়া হেবার মার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সুন্দরী বুঝিতে পারিয়া ছুটিয়া আসিয়া রাজচন্দ্রকে জাপটাইয়া ধরিয়া কহিল—আমার মাথা খাও, ওদিকে যেও না। দেখচ না, ওর মাথায় খুন চেপেছে। চোখ দুটো বাঘের মত জ্বলচে। তুমি ঘরে এস শীগগীর। দেরী করো না।

রাজচন্দ্রকে কোনও মতে ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিয়া সুন্দরী দরজা বন্ধ করিয়া দিল। হেবার মা আধ ঘণ্টা ধরিয়া বাহিরে বসিয়া থাকিয়া হাতের কাটারীটা রান্নাঘরের উপর দিয়া ছুড়িয়া ফেলিল। তারপর হেবাকে লইয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইল। একটানা চলিয়া আসিয়া গ্রামের রসিক মাম্বরের বাড়ী আসিয়া সে নালিশ করিল—রাজচন্দ্র আর সুন্দরী তাহাকে তাহার বাপের ভিটা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। তাহার খড় কুটা ফেলিয়া দিয়াছে, চুলা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

রসিক মাম্বর গ্রামের পাঁচজনকে সঙ্গে করিয়া রাজচন্দ্রের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। হেবার মাও ছেলের হাত ধরিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল।

মাম্বরের কথা শুনিয়া রাজচন্দ্র কহিল—আপনারা যাই বলুন না কেন, ঐ খুনে বোনের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকতে আমরা পারব না। বাপরে কি দস্যি! আর একটু হলেই আমার বুকে এক কোপ কাটারী বসিয়ে দিত!

অনেক যুক্তি তর্কের পর সাব্যস্ত হইল মধু কৈবর্ত্তের বাড়ীখানি রাজচন্দ্র মনিবের কাছ থেকে বন্দোবস্ত লইবে, আর সেই বাড়ীতেই সে হেবার মার থাকিবার মত একটা টীনের ছাপ্পড় উঠাইয়া দিবে।" যাহাতে মনিবের মজুরটা যেহাই হয় তাহা রসিক মাম্বর করিবে। আর ছাপ্পড় উঠাইতে যে দু'চার দিন দেরী হইবে সে কয় দিনের খোরপোস রাজচন্দ্রকে দিতে হইবে।

রাজচন্দ্র প্রথমতঃ আপত্তি করিল। কিন্তু সমাজে বন্ধ দিবার ভয় দেখাইয়া রসিক মাম্বর রাজচন্দ্রকে সম্মত করাইল। তারপর হেবার মা রাজচন্দ্রের নিকট হইতে খোরাকী বাদে তিন টাকা আদায় করিয়া লইয়া তাহাদের পাশের বাড়ীতে হরিকালীর নিকট আশ্রয় লইল।

বৈকালে সুন্দরীর সহিত কুয়ার পারে দেখা হইলে হেবার মা একটু হাসিল আর হরিকালীকে বেশ একটু জোরেই কহিল—কলিকাল! যুগ উল্টাইবার আর দেরী নাই। এই দেখ না যাদু করে ভাইটাকে ভেড়া বানিয়েছে। উঠতে বল্‌লে উঠছে, বসতে বল্‌লে বসছে। থাকতো যদি মা, তবে ঝেঁটিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দিত।

সুন্দরী মনের রাগটুকু অতি কষ্টে দমন করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া স্বামীকে কহিল—আমি আর সইতে পারি না। যাতে এ পাড়া হ'তে ও পাপ দূর হয়ে যায় তাই কর দেখি। ছাপ্পড়টা কালই তুলে দাও। বাপরে! কি দজ্জাল! গায়ে পড়ে যেখানে-সেখানে লড়াই বাধাবে।

রাজচন্দ্র আলস্য পরিত্যাগ করিয়া দুই দিনের মধ্যেই হেবার মার ছাপ্পড় উঠাইয়া দিল: সে নির্ব্বিবাদে হরিকালীর বাড়ী হইতে এই নূতন বাড়ীতে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিল। একমাস সেখানে কাটাইয়া দেওয়ার পর একদিন হেবার মা আসিয়া রসিক মাম্বরকে কহিল—ও পাড়ায় সে আর থাকিতে পারিবে না। অত বড় শূন্য বাড়ীতে একা থাকার মত সাহস তাহার নাই।

কথাটা যে প্রকৃত তাহা রসিক মাম্বর বুঝিতে পারিল। তাই হেবার মা যখন হরিকালীর বাড়ীতে ছাপ্পড়টা আনিয়া তুলিবার প্রস্তাব করিল তখন রসিক মাম্বর আর আপত্তি করিল না। সুন্দরী যখন পরের দিন দেখিল হেবার মা ছাপ্পড় আনিয়া হরিকালীর বাড়ীতে উঠাইতেছে, তখন সে রাজচন্দ্রকে দিয়া রসিক মাম্বরের নিকট নালিশ করিল। হেবার মার আবার ডাক পড়িল। সে বিনা আপত্তিতে উপস্থিত হইয়া খুব শান্তভাবে কহিল—আপনারা পাঁচজন আছেন। আপনারাই বিচার করিয়া দেখুন ঐ হুজুরের

মধ্যে আমি একা থাকতে পারি কি না। আর একটা কথা বলতে ভুল করেছিলাম। জানেন ত আপনারা, আমি ধান ভেনে খাই। ও বাড়ীটায় ঢেঁকি নাই। তাই রাত দুপুরে আমার দুধের ছেলেকে ঐ জঙ্গলে ফেলে আস্‌তে হয় হরিকালীর বাড়ীতে। বাছার জন্য আমার বুক কাঁপতে থাকে। একমাস আমি ঐ রাত্রে ছেলেটার ঘুম ভাঙ্গিয়ে কোনও মতে সঙ্গে নিয়ে এসে কাজ চালিয়েছি। আর পারি না বলেই হরিকালীর বাড়ী ফিরে গিয়েছি।

সুতরাং রাজচন্দ্রের নালীশ টিকিল না। ফলে সুন্দরীও হেবার মাকে বরদাস্ত করা শিখাইল। এবং দুই দিনের মধ্যে সেও একটা দল গড়িয়া হেবার মার সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে লাগিয়া গেল।

এইরূপে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু একদিন সব উলট-পালট হইয়া গেল। সেদিন রাত্রে খুব শীত পড়িয়াছিল। তবুও রাত্রি তিনটার সময় উঠিয়া ঢেঁকি যন্ত্রের সাহায্যে হেবার মা ধান ভানিতেছিল। যখন তাহার কাজ শেষ হইল, তখন তাহার সমস্ত শরীর ঘামিয়া উঠিয়াছিল। খানিকক্ষণ ঢেঁকির উপর বিশ্রাম করিয়া হেবার মা চাল লইয়া নিজের ছাপ্পড়ের মধ্যে গিয়া দেখিল হেবা তখনও ঘুমাইতেছে। এমন সময় বাহিরে কি যেন পড়িয়া যাওয়ার শব্দ হইল। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হেবার মা দেখিল, সুন্দরী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছে। এত বড় শত্রুতা থাকা সত্বেও হেবার মাঁ ঘর হইতে জল আনিয়া সুন্দরীর চোখে মুখে ছিটে দিতে লাগিল, আর হরিকালিকে পাখাটা লইয়া আসিবার জন্য চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। সুন্দরীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে সে চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল—দিদি, আমার সব গেছে। ভাল মানুষ রাত্রে শুয়ে ছিল। ওমা! সকাল বেলায় উঠিয়া তামাকে একটা মাত্র টান দিয়াছে আর অমনি হু হু করে গলা দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগ্‌ল, আর দেখতে দেখতে অসাড় হয়ে পড়ে গেল। দিদি, চোখে দেখা যায় না। আমার খোকা খুকীকে নিয়ে কার কাছে দাঁড়াব দিদি! কেমন করে তা'দিগকে খাইয়ে মানুষ করব, দিদি? আমার যে আর দাঁড়াবার স্থান নাই!

সুন্দরীকে সান্ত্বনা দিয়া তাহারা রাজচন্দ্রের নিকট ফিরিয়া গেল। ঘরে তখন রক্তের ঢেউ খেলিতেছিল। রাজচন্দ্রের মাথায় বুকে পিঠে হাত দিয়া হেবার মা দেখিল, সে আর বাঁচিয়া নাই। সেই মুহূর্ত্তেই ভ্রাতৃশোক তাহার মনে উথলিয়া উঠিল। পাড়ার লোক চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল রাজচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে। তারপর রসিক মাধব আসিয়া রাজচন্দ্রের দেহটাকে শ্মশানে লইয়া গেল।

বৈকালে সুন্দরী গলায় কাপড় লইয়া হেবার মার পায়ে পড়িতে যাইতেছিল। হেবার মা তাহাকে ঘাট্ ঘাট্ করিয়া তুলিয়া ধরিল। সুন্দরী কহিল—দিদি! আমি কি করে আমার খোকা খুকীকে বাঁচিয়ে রাখব, আমার যে কিছুই নাই! আমিও তোমার মত ধান ভানব দিদি। তুমি এস, আমার দক্ষিণ হাত হয়ে আমার শিশু সন্তান দু'টিকে রক্ষা কর দিদি।

হেবার মার দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। অনেক দিনের ঝগড়া ও শত্রুতার পরিসমাপ্তি করিয়া হেবার মা পুত্রের সহিত সুন্দরীর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং মাতা পুত্রে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া সুন্দরী ও তাহার সন্তান দুইটীকে খাওয়াইতে পরাইতে লাগিল।

হেবার মা'র কাহিনী শুনিয়া গিন্নি কহিলেন—বাস্তবিক মানুষের মন বুঝিয়া উঠা বড়ই মুস্কিল। পানের চূণ একটু কম হইলে এই মন শক্ত কাঠ হইয়া রুখিয়া দাঁড়ায়, আবার একটুতেই পাষাণ সম মনও স্নেহের বন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এ জিনিসটার রূপকাঠি ঠিক করা বড়ই কঠিন।

এমন সময় চাপরাসী ডাক লইয়া আসিয়া কহিল—দারোগা বাবু এসেছেন। একটা আসামী confession করবে। আমি চা-টা তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া বাহিরের ঘরে confession লিখতে চলিলাম।

দেশীয় ভৈষজ্য তত্ত্ব।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত, এচ্, এম্, বি]

"ত্রিকটু"

শুঁঠ।

'বিশ্বোপকুল্যা মরিচং ত্রয়ং ত্রিকটু কথ্যতে।'

শুঁঠী, পিপ্পলী ও মরিচ, এই তিনটী ভেষজের সংযোগকে ত্রিকটু বলিয়া থাকে।

'কটু ত্রিকন্তু ত্রিকটুং ত্র্যুষং ব্যোষ উচ্যতে।'

কটুত্রিক, ত্রিকটু, ত্র্যুষণ এবং ব্যোষ, এই কয়টী ইহার নামান্তর। 'ত্রিফলা'র ন্যায় এই তিনটী ভেষজের পৃথক পৃথক গুণ ও পরিচয়, এবং এই তিনটী দ্রব্যের মিলিত গুণ পরিচয় নিম্নে প্রদান করিলাম।

আদা গাছ প্রায় সকল ব্যক্তির নিকটই সুপরিচিত। বঙ্গদেশে আদার আবাদ হইয়া থাকে। য়ুরোপে প্রচুর পরিমাণে আদা রপ্তানি হইয়া থাকে। পুষ্ট পুষ্ট আদার কন্দ উত্তম রূপে ধৌত করিয়া উহার খোসা ভাল করিয়া ছাড়াইয়া ক্রমশঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই শুঁঠ প্রস্তুত হয়। ইহা দেখিতে শুভ্রবর্ণ হয়, এবং বহুদিন অবিকৃত থাকে।

এক্ষণে আমি আদার বিষয় কিছু লিখিয়া পরে শুঁঠ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

আদ্রক।

"আর্দ্রকং শৃঙ্গবেরং স্যাৎ কটুভদ্রং তথার্দ্রিকা।
আর্দ্রিকা ভেদিনী গুর্ব্বী তীক্ষ্ণোষ্ণা দীপনী মতা॥
কটুকা মধুরা পাকে রুক্ষা বাত কফা পহা।
যে গুণাঃ কথিতাঃ শুণ্ঠ্যাস্তেঽপি সন্ত্যার্দ্রকেঽখিলাঃ॥
ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং লবণার্দ্রক ভক্ষণম্।
অগ্নিসন্দীপনং রুচ্যং জিহ্বা কণ্ঠ বিশোধনম্॥"

আদ্রক, শৃঙ্গবের, কটুভদ্র ও আর্দ্রিকা এই কয়টী আদার সংস্কৃত নাম। আদা—ভেদক, গুরু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, কটুরস, মধুর বিপাক, রুক্ষ এবং বায়ু কফনাশক। পরন্তু শুঁঠীর যে সকল গুণ শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন, আদ্রকেও সেই সকল গুণ অবস্থিত করে। প্রত্যহ ভোজনের পূর্ব্বে সৈন্ধব সহযোগে আদা ভক্ষণ করিলে গুণকারক হয়, এমন কি তদ্দ্বারা অগ্নিদীপ্তি, আহারে রুচি এবং জিহ্বা ও কণ্ঠ শোধিত হয়।

আদার হিন্দিনাম—আদ্রক। মঃ—আলং। গুঃ—আদু। কঃ—অল্ল। তৈঃ—অল্লশং। ডাক্তারীতে Gingiber Officinala. ইংরাজীতে Ginger বলিয়া থাকে।

চৈত্র ও বৈশাখ মাসে কৃষকেরা জমী উত্তমরূপে খুঁড়িয়া দেড় হাত দুই হাত অন্তর শ্রেণী কাটিয়া এবং প্রতি শ্রেণীতে অর্দ্ধ হাত অন্তর আদা পুতিয়া দিয়া থাকে। ভালরূপ একবার বৃষ্টি হইলে পর সাধারণতঃ কৃষকেরা আদা বসাইয়া থাকে। আদাগাছের গোড়াতে যাহাতে বৃষ্টির জল না দাঁড়াইতে পায়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কারণ জল দাঁড়াইলে গাছ পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। আদা গাছে সার দিবার জন্য খোল ও ছাই ব্যবহার হইয়া থাকে। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে আদার গোড়া হইতে কতক আদা ভাঙ্গিয়া লওয়া হইয়া থাকে। পরে ভাল করিয়া মাটী চাপা দিলে গাছের কোন প্রকার অনিষ্ট হয় না। মাঘ মাসে আদা গাছের পাতা শুষ্ক হইয়া যায়। তখন সমস্ত আদা মাটী হইতে উঠাইয়া লইতে হয়।

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ কবিভূষণ মহাশয় ১৩২৫ সনের "ঢাকা প্রকাশ" পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, "এই বৎসর (১৩২৫ সন) কলিকাতা ও অন্যান্য সহরে, এমন কি গ্রামে ঘরেও এক প্রকার বহু ব্যাপক নাশক সংক্রামক সর্দ্দিজ্বর দেখা যায়। সাধারণতঃ এই জ্বর "সমর জ্বর" বলিয়া কথিত। ভারতবর্ষের প্রথমতঃ বম্বে প্রদেশেই এই রোগ দেখা যায়। রোগের প্রথম অবস্থায় প্রবল সর্দ্দিজ্বরের

মস্ত নাক ও গলা শ্লেষ্মা পূর্ণ হয়, অত্যন্ত মাথা ধরে, ক্ষুধা মাত্রও থাকে না, শরীর ম্যাজমেজে ও দুর্ব্বল বোধ হয়। রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় জ্বর দেখা দেয়, মূত্র রক্ত বর্ণ হয়, শেষে বুকে সর্দ্দি বসিয়া স্থল বিশেষে ঘোরতর সান্নিপাতিক জ্বরের ন্যায় বিবিধ উপসর্গ উপস্থিত করে। এই রোগ কলিকাতায় সংক্রামক রূপে দেখা দিলে তথায় আমরা যে বাটীতে ছিলাম, ঐ বাটীর সকলেই এই রোগে আক্রান্ত হন এবং ৩।৪ দিন ভুগিয়া সকলে আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু কলিকাতার অন্যান্য স্থলে এই ব্যাধি এত সহজে আরোগ্য হয় নাই।

এই রোগের গৌণ কারণ যাহা হউক, মুখ্যতঃ কোন আগন্তুক বিষ গলা ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং পাকস্থলী আক্রমণ করিয়া বায়ু, পিত্ত ও কফকে দূষিত করে। কফের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। এই আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই যদি আকণ্ঠ আদার রসের কুলি দিবসে ৩।৪ বার এবং আদার রস ও মধু দিবসে ৩ বার এবং তুলসী পাতার রস, মধু সন্ধ্যার পর ১ বার সেবন করা যায়, তাহা হইলে ব্যাধি নিশ্চয়ই প্রবল হইতে পারে না, এবং ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইয়া যায়। জিঞ্জারেড ব্যবহার করাও মন্দ নহে। ইহাতে আদা আছে। গুরুতর আক্রমণেও এইরূপ চলিতে হইবে। আমি এ পর্য্যন্ত ১৭ জন রোগীকে এই ব্যাধি হইতে আরোগ্য করিয়াছি। ইহাতে কাহার কোন দুষ্ট উপসর্গ দেখা দেয় নাই।"

আজকাল "সমর জ্বর" বলিতে আর বড় একটা কাহাকে দেখা যায় না। তবে তখন 'সমর জ্বর' যাহাকে বলা হইত এখন সেই ধরণের জ্বর, যদিও তখনকার মত অত বেশী পরিমাণে না হইয়া থাকে, কিন্তু যাহা হইয়া থাকে তাহাও কম নহে। আমার বিশ্বাস 'সর্দ্দিজ্বরে' উপরোক্ত প্রণালীতে আদা ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যাইবে। কারণ আদার রসের কুলি লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গলা, বুক ও নাক হইতে সর্দ্দি কাটিতে থাকে, বেদনাও হ্রাস হয় ও সর্দ্দি জ্বরের যাতনা অনেকটা হ্রাস পায়। এইরূপ জ্বরে আদা ও সৈন্ধব লবণ বড় উপকারী।

এইবার আমি ভিন্ন ভিন্ন রোগে আদার ব্যবহারের উল্লেখ করিব।

(১) সন্নিপাত জ্বরে আদা—আদার রসে সৈন্ধব লবণ ও ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ) চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ মুখে ধারণ করিয়া কিছুক্ষণ পরে ফেলিয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলিবে। ইহাতে বুকের গলার ও কণ্ঠের কফ বাহির হইয়া যাইবে ও সন্নিপাত জ্বরে বিশেষ উপকার পাওয়া যাইবে।

(২) অতিসারে আদা—উত্তানভাবেস্থিত রোগীর নাভীর চতুর্দ্দিকে পিষ্ট আমলকীর আলবাল প্রস্তুত করিয়া মধ্যস্থল আদার রসে পূর্ণ করিবে। ইহা অতিসারের পক্ষে হিতকর।

(৩) ক্ষুধাবৃদ্ধির জন্য আদা—মধ্যাহ্নের আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে সৈন্ধব লবণ সহ ৫।৬ টুকরা আদা চিবাইয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে বেশ অগ্নি বৃদ্ধি করে।

(৪) গুল্মে আদা—সর্জ্জিকাক্ষার ও আদা সমভাগে গুল্ম রোগে সেব্য।

(৫) শীতপিত্তে আদা—শীতপিত্ত রোগে পুরাতন গুড়ের সহিত আদার রস সেবনীয়।

(৬) উদর রোগে আদা—আদার রস ও দুগ্ধ সমভাগে উদর রোগে ব্যবস্থেয়।

কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মূত্রকৃচ্ছ, রক্তপিত্ত, ব্রণজ্বর ও দাহ এই সকল রোগে এবং গ্রীষ্ম ও শরৎকালে আদা হিতকারী নহে।

শুঁঠ।

"শুণ্ঠী বিশ্বা চ বিশ্বঞ্চ নাগরং বিশ্বভেষজম্।
উষণং কটুভদ্রঞ্চ শৃঙ্গবেরং মহৌষধম্॥
শুণ্ঠী রুচ্যামবাতঘ্নী পাচনী কটুকা লঘুঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণা মধুরা পাকে কফবাত বিবন্ধনুৎ॥
বৃষ্যা স্বর্য্যা বমিশ্বাস শূলকাসহৃদাময়ান্।
হন্তি শ্লীপদশোথার্শ আনাহোদর মারুতাম্॥"

শুণ্ঠী, বিশ্ব, নাগর, বিশ্বভেষজ, উষণ, কটুভদ্র, শৃঙ্গবের, মহৌষধ, এই কয়েকটী এক পর্য্যায়ক শব্দ। শুণ্ঠী—রুচিকারক, পাচক, কটুরস, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, মধুর বিপাক, পুষ্টিকারক, স্বরবর্দ্ধক, এবং আমবাত, কফ, বায়ু, বিবন্ধ

বমি, শ্বাস, শূল, কাস, হৃদ্রোগ, শ্লীপদ অর্থাৎ গোদ, শোথ, অর্শঃ, আনাহ, উদর ও বাত জন্ম রোগনাশক।

শুঁঠের ভাষানাম—বাঃ—শুঁঠ, হিঃ—সোঁঠ, মঃ—সুঠ, গুঃ—শুন্ঠ্য, কঃ—শুণ্ঠী, তৈঃ—শোঠী। সম্পূর্ণ ত্বক বিবর্জ্জিত শুঁঠকে হিন্দীতে "ভুগুরী শুঁঠ" বলিয়া থাকে। মাত্রা স্বরস (আদা) ১—২ তোলা, চূর্ণ (শুঁঠ) ১—৪ আনা।

এইবার আমি ভিন্ন ভিন্ন রোগে শুঁঠের ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করিব।

(১) অর্শে শুঁঠ—অর্শরোগী চিতামূল ও শুঁঠ চূর্ণ সমভাগে সীধু নামক মদ্যের সহিত সেবন করিবে।

(২) অতিসারে শুঁঠ—বালা ও শুঁঠ সমভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া সেব্য। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও অতিসার-নাশক।

(৩) ক্ষতক্ষীণে শুঁঠ—ক্ষতক্ষীণ রোগী শুঁঠের চূর্ণ প্রত্যহ সেবন করিবে। রোগী ঔষধ সেবন কালে অন্ন ত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধ পান করিবে।

(৪) আম পরিপাচনার্থ শুঁঠ—গরম জলের সহিত শুঁঠ চূর্ণ পান করিলে আম পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

(৫) কামলায় শুঁঠ—পুরাতন গুড় ও শুঁঠ চূর্ণ সেবনে কামলা ভাল হয়।

(৬) গুল্মে শুঁঠ—গুল্ম রোগীর বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক গোমূত্রের সহিত ত্রিবৃৎ ও শুণ্ঠীচূর্ণ সেবন করাইলে গুল্মে উপকার দর্শে।

(৭) গ্রহণীতে শুঁঠ—শুণ্ঠী কল্কের সহিত গব্যঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেব্য।

(৮) উরুস্তম্ভে শুঁঠ—উরুস্তম্ভ রোগীকে গোমূত্রের সহিত শুঁঠচূর্ণ পান করাইলে বিশেষ উপকার হয়।

(৯) আমবাতে শুঁঠ—কাঁজির সহিত শুণ্ঠীচূর্ণ সেবনে আমবাত ভাল হয়।

(১০) হৃদ্রোগে শুঁঠ—শুঁঠের কাথ গরম করিয়া পান করিলে হৃদ্রোগ ভাল হয়।

(১১) শিরোরোগে শুঁঠ—শুণ্ঠীচূর্ণ গব্য দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত পূর্ব্বক নস্ত করিলে তীব্র শিরোবেদনা প্রশমিত হয়।

(১২) আমাতিসারের পেটের ব্যথায় শুঁঠ—শুঁঠ-চূর্ণে কিঞ্চিৎ গব্যঘৃত মাখাইয়া এরণ্ড পত্র বেষ্টন পূর্ব্বক মাটীর প্রলেপ দিয়া মৃদু অগ্নিতে পুটপাক করিবে। এই চূর্ণ প্রাতঃকালে চিনির সহিত সেব্য। ইহাতে আমবাতের বেদনা নিবৃত্তি পায়।

(১৩) আমবাতে শুণ্ঠী পুটপাক—শুণ্ঠীচূর্ণ এরণ্ড মূলের রসে সিক্ত করতঃ পিণ্ডাকার করিবে। এই পিণ্ড এরণ্ড পত্রদ্বারা আবৃত করিয়া পুটপাক করিবে। ইহার রস মধুর সহিত পান করিলে প্রবল আমবাত ভাল হয়।

(১৪) বিষমজ্বরে শুঁঠ—শুঁঠ ও পীতপুষ্প, বেড়েলার মূলের ছাল সমভাগে লইয়া কাথ করিবে। এই কাথ দুই তিন দিন পান করিলে শীতকম্প দাহ সমন্বিত বিষমজ্বর ভাল হয়।

(১৫) বমন ও বিসূচিকায় শুঁঠ—বেলশুঁঠ ও শুণ্ঠীর কাথ পান করিলে বমন ও বিসূচিকা প্রশমিত হয়।

(১৬) খেজুর ও পানিফল ভক্ষণজ অজীর্ণে শুঁঠ—খেজুর ও পানিফলের অতি-ভোজন-জনিত অজীর্ণে শুঁঠ সেবন করিতে দিলে উপকার হয়।

(১৭) হিক্কায় শুঁঠ—ছাগী দুগ্ধে শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবনে হিক্কায় উপকার হয়।

শুঁঠ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত :—

Actions and uses—Dried ginger is aromatic, stimulant and carminative, produces a sensation of warmth at the epigastrium and expels flatus; as a carminative it is given in colic; as a masticatory in relaxed throat and to increase the saliva. Locally it is rubefacient, anodyne and sialogogue. When chewed fresh ginger is stomachic and digestive. The dry rhizome powdered and made into a paste with warm water is used as cataplasm or fomentation to the forehead in headaches. Neuralgia, colic and toothache; also given in atonic Dyspepsia loss of appetite, to nauseous medicines and to check griping of purgatives. It is also used

as flavouring adjuvant to bitters. The juice is given as an adjuvant to laxatives, as castor oil; with garlic and honey it is used for cough and Asthma. (*Materia Medica of India—R. N. Khory, Part II, P. 601*)

অর্থাৎ, শুঁঠ, সুগন্ধি, উষ্ণ ও বায়ুনাশক। ইহা সেবন করিলে পেট গরম ও পেট জ্বালা করে এইরূপ অনুভব হয়। ইহা উদরের সঞ্চিত বায়ু নিঃসারিত করিয়া উদরাধ্মান প্রশমিত করে। বায়ুনাশক বলিয়া শুঁঠ শূলরোগে ব্যবহৃত হয়। গলরোগ বিশেষে (Relaxed throat) এবং লালাস্রাব বৰ্দ্ধিত করাইবার জন্য শুঁঠ চর্ব্বণ করিতে দিবে। প্রলেপাদি বাহ্য প্রয়োগে শুণ্ঠী ত্বকের লোহিত্যোৎপাদক বেদনাহর এবং লালাস্রাবকারী। আদ্রক চর্ব্বণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে পাচক। শুঁঠচূর্ণ গরম জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শিরঃপীড়িত রোগীর ললাটে প্রলেপ দিবে, অথবা তদ্দ্বারা পিণ্ডস্বেদ দিবে। শুঁঠ নার্ভের শূল, শূলরোগ, দন্তশূল, গ্রহণী বিশেষে (Atomic Dyspepsia) অগ্নিমান্দ্য, উদরাধ্মান, প্রবাহিকা, কাস, বুক ধড়ফড় করা, শোথ, বিসূচিকা ও উদরাধ্মান রোগে ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু ইহা বিবমিষোৎপাদক কিম্বা বিরেচক ঔষধের সহিত ব্যবহার করিলে বিবমিষা ও বিরেচন জন্য পরিকৰ্ত্তিকা জন্মিতে পারে না। তিক্ত ভেষজ দ্রব্যকে সুগন্ধি করিবার জন্যও শুঁঠের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

এরণ্ড তৈল প্রভৃতি বিরেচক ভেষজের সহিত আদার রস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রসোন ও মধুর সহিত শুণ্ঠী কাসশ্বাসে প্রয়োগ করা যায়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, খোরি, ২য় খণ্ড, ৬০১ পৃঃ)।

উপরিলিখিত ঔষধগুলির মধ্যে যেগুলির প্রস্তুত বিধি লিখিত হয় নাই, তাহাদের প্রস্তুত বিধি—মিলিত দ্রব্য দুই তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অৰ্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেব্য।

(ক্রমশঃ)

মিলন।

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু]

পুরীতে আসিয়া জগন্নাথের পবিত্র শ্রীমূর্ত্তি ও তাঁহার শ্রীপাদ প্রক্ষালনে উন্মত্ত সমুদ্রের আন্তরিকতা নয়ন ভরিয়া দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্ত হইয়াছে। একজন ভাল সঙ্গীও পাইয়াছিলাম। তাহার নাম শ্রীরাম, জাতিতে উড়ে। অকপট হৃদয় ও প্রেমভরা প্রাণ তাহার জীবনের সম্বল ছিল। প্রতিদিন স্নানের সময় সে আমার হাত ধরিয়া সমুদ্রের মাঝে অনেক দূর লইয়া যাইত; বৈকালে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্র-তীরে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেড়াইতাম। সন্ধ্যার পরে আমার আহারাদির পর সে আমার সব কাজ শেষ করিয়া কোথায় চলিয়া যাইত। কোথায় যাইত সম্বাদ রাখিতাম না। সুতরাং রাত্রে তাহাকে ডাকিয়া পাইতাম না, কিন্তু ভোরের পাখীর মত আসিয়া সে আমার ঘুম ভাঙ্গাইত। নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহার মুখ দেখিয়া আমি বিস্মিত হইতাম। দেখিতাম, তাহার চক্ষুদুটী রক্তবর্ণ, মুখ বিশুষ্ক, চক্ষের কোণে অশ্রুর দাগ।

একদিন খেয়ালের বসে হঠাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শ্রীরাম, রাত্রে তুমি যাও কোথায়, ডেকে সাড়া পাই না কেন?"

সে অশ্রু সজল নেত্রে শুধু নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার নিরুত্তরে আমিও আর কিছু বলিলাম না। একদিন রাত্রে বড় গরম বোধ হইতে লাগিল, শয্যা হইতে উঠিয়া বাসার তালাবদ্ধ করিয়া সমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু অনন্ত লবণাম্বুরাশির উদ্বেলিত তরঙ্গগর্জ্জন সমুদ্র-তট প্রকম্পিত করিয়া তুলিতে-

ছিল। তখন চাঁদ উঠিয়াছে, জ্যোৎস্নার আলো সমুদ্র বক্ষে পড়িয়াছে। বেড়াইতে বেড়াইতে কিয়দ্দূর আসিয়া দেখিলাম, কে একজন সমুদ্র তীরে সেই সীমাশূন্য নীল জলরাশির প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাতে আসিয়া জ্যোৎস্নার আলোকে তাহার মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। এ যে শ্রীরাম! তাহার চক্ষু দিয়া অবিরত স্রোত গড়াইতেছে। ডাকিলাম—'শ্রীরাম'!

স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া সে ফিরিল। রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, বাবু—

আমি তাহার মাথায় হাত রাখিয়া কহিলাম—"তুমি এই গভীর রাত্রে এখানে একা বসে কেন শ্রীরাম?"

আমার কথা শুনিয়া বালকের ন্যায় সে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেক সান্ত্বনা দিয়া তাহাকে শান্ত করিলাম। সে একটু প্রকৃতিস্থ হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি একলা এই সমুদ্রের ধারে বসে কাঁদ্‌ছ কেন শ্রীরাম? কি তোমার দুঃখ?"

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "বাবু বাসায় চলুন, রাত অনেক হয়েছে।"

আমি কহিলাম, "তোমার সমস্ত কথা না শুন্‌লে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব না।"

শ্রীরাম বলিল, "বাসায় চলুন বাবু, আপনাকে বল্‌ব।"

বাসায় ফিরিলাম। রাত্রি বারটা। ছাদের উপর উপবেশন করিলে শ্রীরাম একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে চাহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, "বাবু, সে আজ এক বৎসরের কথা। আমার বাপ মা কলেরা হয়ে মারা যায়। আমার বাড়ীর পার্শ্বে নীলমণির বাড়ীতে. তার মেয়ে হারানীর সঙ্গে ছেলেবেলা হ'তে আমার ভালবাসা ছিল। আমি না হ'লে হারানীর একদণ্ড চল্‌ত না, আর তাকে ছেড়ে আমিও এক মুহূর্ত্ত থাকতে পারতাম না। ওই সমুদ্রের জলের উপর হারানীকে বুকে নিয়ে কতদিন সাঁতার খেলেছি, তাহাকে বুকে ধরে কতদূর ভেসে গিয়েছি, আবার ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তীরে এসেছি। আমার বুকের উপর থেকে ওই বড় বড় ঢেউ দেখে হারানী কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্য ভয় পেত না, সে নির্ভয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বলত' তুমি যদি আর না পার শ্রীরাম দা; হাত পা যদি তোমার অবশ হয়ে যায়! তবে আমি এই সমুদ্রে ডুবে মরব—আমি উত্তর দিতাম "পাষাণী, ডুব্‌বি কি! কে তোকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিতে পারে? আর যদি ডুবিস তবে এই বুকে এমনি ভাবে দু'জনে এই সমুদ্রের অতল জলে ডুবে থাকব।"

সে কথা শুনে তার মুখে একটা স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ত বাবু। হারানীর সঙ্গে আমার মা বাপ্ আমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে। যে মাসে আমাদের বিয়ে হবে তার ঠিক একমাস পূর্ব্বে মা বাপ আমার মারা গেল। বিবাহে বাধা পড়ল। দুই মাস পরে একদিন হঠাৎ শুন্‌লাম, নীলমণি অপর কোন লোকের সঙ্গে হারানীর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক কর্‌ছে। শুধু হারানী আর তার মা সম্মত নয়। কিন্তু নীলমণির তাহাতে কিছু যায় আসে না। সে দশ টাকা পণ নিয়ে সেই ছেলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিবার সঙ্কল্প ক'রে দিন স্থির করে। এই সব কথা যখন আমি শুন্‌তে পেলাম বাবু, আমার মাথার মধ্যে যেন রক্ত টগ্‌বগ্ করে ফুটে উঠ্‌লো, উন্মাদের মত ছুটে নীলমণির বাড়ী এসেই উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "কার সঙ্গে হারানীর বিয়ে হচ্ছে?"

নীলমণি উত্তর করিল, "সুদামের ছেলে বাঞ্ছার সঙ্গে।"

"কেন, আমার সঙ্গে হল কি?"

"তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে আর হ'তে পারে না, তোমার বাপ্ মা নেই।"

উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম, "বিয়েটাত আমার সঙ্গে হবে তুমি না কথা দিয়েছিলে?"

"সে সব উল্টে গেছে। এখন তোমার সঙ্গে হারানীর বিয়ে আমি দেব না।"

উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া বলিলাম, "আল্‌বৎ দেবে, হারানী আমার, তার সঙ্গে আর কারও বিয়ে হ'তে পারে না।"

নীলমণি হাসিয়া বলিল, "হারানীকে বিয়ে কর্‌তে হ'লে দুশো টাকা দিতে হবে, পারবে?"

দৃঢ় কণ্ঠে কহিলাম, "নিশ্চয়, দুশো টাকা কি, আমার জীবন আমি হারানীর জন্য দিতে পারি।"

নীলমণি কহিল, "তবে এক সপ্তাহের মধ্যে দুশো টাকা দিয়ে হারানীকে বিবাহ কর। নহিলে অন্য লোকের সঙ্গে তার বিয়ে হবে।"

নীলমণির বাড়ী হইতে পাগলের মত ছুটে বেরুলুম্, পথে এসে দেখ্‌লুম্ হারানী স্নান করে বাড়ী ফিরছে। দ্রুতপদে ছুটে গিয়ে দৃঢ় মুষ্টিতে তার হাত ধরে বল্‌লাম, —"হারানী, তোকে বিয়ে করতে হ'লে তোর বাপ্‌কে দুশো টাকা দিতে হবে—" আর কিছু আমার বলা হ'ল না, পিছন হ'তে নীলমণি ক্রোধ কর্কশ স্বরে ব'লে উঠ্‌ল, "শ্রীরাম! বিয়ের আগে আমার কন্যার হাত ধর্‌বার কোন অধিকার নেই তোমার। আমি তোমায় সাবধান ক'রে দিচ্ছি।"

আকাশ ভেঙ্গে যেন মাথায় পড়ল। সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন একটা দারুণ জ্বালার স্রোত ছুটোছুটী করতে লাগ্‌ল। হারানীকে ছেড়ে দিয়ে ছুটতে ছুটতে সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়ালেম। টাকা—কোথায় টাকা? একটা পয়সা যার সংস্থান নেই, সে কেমন ক'রে দুশো টাকা দেবে বাবু! স্থির কর্‌লাম বাড়ী বিক্রয় করব। কিন্তু একশত টাকার উপর কেউ দর দিলে না। ক্রমে ছয় দিন কেটে গেল। আর এক দিন মাত্র সময়। একশত টাকাতেই বাড়ী বিক্রয় ক'রে ফেল্‌লাম, কিন্তু আরও একশ চাই। কোথায় পাব! সে টাকা কে দেবে? সেই দিন সেই একশত টাকা কাপড়ে বেঁধে জগন্নাথের মন্দিরে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লাম, "ঠাকুর, প্রভু! আমার হারানীকে আমার বুক থেকে উপ্‌ড়ে নিও না। সে আমার সর্ব্বস্ব, দরিদ্রের মাথার মণি, তাকে পর করে দিও না দয়াময়!"

সন্ধ্যার সময় একশত টাকা নিয়ে নীলমণির বাড়ী এসে শুনলাম পরদিন হারানীর বিয়ে। আমার সকল উদ্দেশ্য পণ্ড, সব আশা শেষ। আমার অনুরোধ, অশ্রু জলে কিছুতেই নীলমণি ভিজিল না। আমি ছুটে আবার জগন্নাথের মন্দিরে গেলাম। কত কাঁদ্‌লাম, চক্ষের জলে মন্দিরের চাতাল ভিজে গেল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় হারানীর বিয়ে দেখ্‌তে কম্পিত বুকে তাদের বাড়ীর দরজার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম। বর এসেছে বিয়ে হবে, কিন্তু হারানী হারিয়েছে। তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চিন্তা পরিক্লান্ত অন্তরে সমুদ্র তীরে এসে দাঁড়ালাম। যে জায়গাটায় আপনি আমায় দেখ্‌তে পেয়েছিলেন বাবু, ঠিক সেইখানে। এসে কাতর ভাবে বসে পড়ে জগন্নাথকে ডেকে বল্‌লাম, "প্রভু, দয়াময়, হারানীকে ফিরিয়ে দাও, তার ভাল কর। সে আমার সর্ব্বস্ব! হোক তার বিবাহ, সুখী হ'ক্ সে।"

ঠিক এমন সময় সমুদ্রের মধ্য হইতে কে ডেকে উঠ্‌লো —'শ্রীরাম দা'!

চমকে উঠে দেখি একগলা জলে দাঁড়িয়ে হারানী ডাক্‌ছে, "শ্রীরাম দা! এস—যাই। আজ যে আমাদের বিয়ে।"

বিশেষ উন্মত্ত হয়ে চীৎকার ক'রে ডাকলাম, "হারানী, হারানী, ফিরে আয়, আর যাস্‌নে।"

হারানী হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর করলে, "তবে আজ বুঝি যাবেনা তুমি? তবে আমি একাই যাই, কিন্তু আর একদিন আস্‌ব, সেইদিন তোমায় নিয়ে যাব, তুমি তৈরী হ'য়ে থেক, আমি ডাকলেই এস।"

এই ব'লে সে অগ্রসর হ'ল। আমি আবার চীৎকার করে উঠ্‌লাম—"ফিরে আয়, ফিরে আয় হারানী।"

ঠিক সেই সময় পর্ব্বতের মত জলের ঢেউয়ের মধ্যে সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লাম, কিন্তু কোথায় তাকে পাব বাবু!

হারানী ওই সমুদ্র বুক হ'তে আমায় আহ্বান করবে। আমি যে ব্যাকুল আগ্রহে তারই অপেক্ষা করছি। প্রতি-দিন রাত্রে সেই স্থানে গিয়ে বসে থাকি যদি সে ডাকে। কিন্তু এত দিনের মধ্যে কই সে ত' এল না। কবে আস্‌বে; কবে আস্‌বে বাবু!

বালকের মত শ্রীরাম্ কাঁদিতে লাগিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত তার কাহিনী শুনিতে ছিলাম। আমার চক্ষু তখন অশ্রু ভরে টলমল করিতেছিল। শ্রীরামকে সান্ত্বনা দিবার জন্য যখন মুখ তুলিয়া চাহিলাম, দেখিলাম সে নাই। ঠিক সেই

সহসা নিচে হইতে শ্রীরাম বলিয়া উঠিল, "চল্‌লাম বাবু, আমার ডাক এসেছে, হারানী আমায় ডাকছে, আজ আমি চল্‌লাম বাবু।"

তাহার পর আর কিছু শুনিতে পাইলাম না। তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া আসিয়া দেখিলাম, উন্মাদের ন্যায় শ্রীরাম সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। আমিও তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া চলিলাম। কিন্তু সমুদ্রতীরে যখন পৌঁছিলাম সে তখন এক গলা জলে ক্রমশঃ অতলের দিকে অগ্রসর হইতেছে। চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, "শ্রীরাম, শ্রীরাম।"

উন্মত্ত সমুদ্র গর্জ্জনে আর প্রবল বায়ুবেগে আমার কণ্ঠস্বর কোথায় ভাসিয়া গেল। কিন্তু শুধু কানে আসিয়া পৌঁছিল—"পেয়েছি।" শান্তি ও তৃপ্তির সুর তাহাতে ছিল!

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

সর্পদংশন-চিকিৎসা।

পল্লীগ্রামে সর্প-ভয়ের সময় আসিতেছে। সর্পদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য কয়েকটি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ এবং কোন্ ঔষধ কোন্ জাতীয় সর্পের বিষে উপকারী, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

সর্প সাধারণতঃ তিন প্রকার :—দর্ব্বীকর, মণ্ডলী ও রাজীমান্।

দর্ব্বীকর সর্প।

যে সকল সর্পের গাত্রে চক্র, লাঙ্গল, ছত্র, স্বস্তিক (তণ্ডুলচূর্ণাদিকৃত—ত্রিকোণাকার বিশিষ্ট অধিবাসদ্রব্য) ও অঙ্কুশ এইরূপ আকৃতি (চিহ্ন) আছে এবং যাহাদের ফণা আছে ও যাহারা শীঘ্র গমন করে, তাহাদিগকে দর্ব্বীকর বলিয়া জানিবে। দর্ব্বীকর সর্প প্রায় দিবাভাগে বিচরণ করিয়া থাকে। ইহার বিষ কটু রুক্ষ বলিয়া বায়ুর প্রকোপ জন্মাইয়া থাকে। দর্ব্বীকর সর্প তরুণ বয়সে (বিষোল্বণ) সাংঘাতিক হয়। এইরূপ বর্ষা, শীত ও উষ্ণ ঋতুতেও যথাক্রমে বিষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

সকল সর্পেরই বিষের সাতটি বেগ আছে। তন্মধ্যে দর্ব্বীকর সর্পের বিষের প্রথম বেগে রক্ত দূষিত হইয়া শ্যামবর্ণ হয়। তাহাতে দষ্ট ব্যক্তির মুখ ও নয়নাদি শ্যামবর্ণ হয় এবং শরীরে পিপীলিকাদি কীট সঞ্চালনবৎ প্রতীতি হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বেগে গ্রন্থি সমূহের উৎপত্তি; তৃতীয় বেগে মস্তকের গুরুত্ব, গাত্রে দুর্গন্ধ এবং দষ্ট স্থানে ক্লেদ; চতুর্থ বেগে প্রসেক, বমি, সন্ধি সমূহের বিশ্লেষ ও তন্দ্রা; পঞ্চম বেগে পর্ব্বভেদ, দাহ ও হিক্কা; ষষ্ঠ বেগে হৃৎপীড়া, গাত্রের গুরুতা, মূর্চ্ছা, অবিপাক ও অতিসার হয়। সপ্তম বেগে বিষ শুক্রগত হইয়া স্কন্ধ, পৃষ্ঠ ও কটীদেশে ভঙ্গবৎ পীড়া জন্মায় এবং সর্ব্বপ্রকার শারীর ও মানস ক্রিয়া নাশ করে।

১। বাবলা গাছের ফল বাঁটিয়া দংশিত স্থানে প্রলেপ দিলে ও মুখে চর্ব্বণ করিলে বিষ নষ্ট হয়।

২। হাতিশুঁড়া গাছের মূল ও আড়াইটী গোলমরীচ জল দিয়া বাঁটিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে খাওয়াইলে রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।

৩। জনৈক সন্ন্যাসী বলিয়াছেন, সর্পদংশনমাত্র ঐ স্থানে প্রস্রাব লাগাইলে বিষ নাশ হয়।

৪। বনসরিষা গাছের মূল বাঁটিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে খাওয়াইলে সর্পবিষ নাশ হয়।

৫। কেঁচোর গাত্রের লালা সর্পদষ্ট ব্যক্তির দংশিত স্থানে লাগাইলে বিষ নষ্ট হয়।

মণ্ডলী সর্প।

যে সকল সর্প অল্প ফণাধারী, বিবিধ মণ্ডল চিহ্নে ব্যাপ্ত, দীর্ঘাকৃতি ও মন্দগামী তাহাদিগকে মণ্ডলী বলিয়া জানিবে।

মণ্ডলী সর্প সন্ধ্যার পর হইতে তিন প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া থাকে। মণ্ডলী সর্পের বিষ অম্ল ও উষ্ণবীর্য্য বলিয়া পিত্তের প্রকোপ জন্মাইয়া থাকে।

মণ্ডলী সর্পের মধ্য বয়সে বিষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মণ্ডলী সর্পের বিষের প্রথম বেগে রক্ত দূষিত হইয়া পীতবর্ণ হয়। তদ্দ্বারা দষ্ট ব্যক্তির গাত্র পীতবর্ণ ও দাহযুক্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বেগে শোথোৎপত্তি; তৃতীয় বেগে দংশ-বিক্লেদ, স্বেদ ও তৃষ্ণা; চতুর্থ বেগে জ্বর ও দাহ; পঞ্চম বেগে সর্ব্ব শরীরে দাহ, এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগে মূর্চ্ছা, প্রসেক ও শরীরে স্পর্শশক্তিহীনতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

১। আপাংয়ের শিকড় চাল ধোয়া জলের সহিত বাঁটিয়া খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হয়।

২। লজ্জাবতী লতা সমূলে উৎপাটিত করিয়া তাহা মর্দ্দন পূর্ব্বক দষ্ট স্থানে লাগাইলে বিষ নষ্ট হয়।

৩। কৃষ্ণবর্ণ উইমাটি জলে গুলিয়া খাওয়াইলে উপকার হয়।

৪। শ্বেত করবীর ও অপরাজিতার মূলের ছাল বাঁটিয়া খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হয়।

৫। পুষ্যা নক্ষত্রে শ্বেতপুনর্নবা মূল চেলুনি জলের সহিত বাঁটিয়া খাওয়াইলে এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত সর্পের উপদ্রব থাকে না।

৬। গাম্ভারীছাল, বটের শুঙ্গা, জীরক, ঋষভক, চিনি, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া পান করিলে বিষ নষ্ট হয়।

রাজীমান্ সর্প।

যে সকল সর্প চিক্কণ এবং ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক বিবিধ বর্ণের রেখা সমূহ দ্বারা রঞ্জিত, তাহাদিগকে রাজীমান্ বলিয়া জানিবে।

রাজীমান্ সর্প রাত্রির শেষ প্রহরে বিচরণ করিয়া থাকে। রাজীমানের বিষ মধুর ও শীতল বলিয়া কফের প্রকোপ জন্মাইয়া থাকে।

রাজীমান্ সর্পের বৃদ্ধাবস্থায় বিষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। রাজীমান্ সর্পের দংশনে বিষের প্রথম বেগে রক্ত দূষিত হইয়া পাণ্ডুবর্ণ হয়, সেই জন্য রোগীর গাত্র পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে; দ্বিতীয় বেগে গাত্রের গুরুতা; তৃতীয় বেগে দংশ-বিক্লেদ, নাসাস্রাব, অক্ষিস্রাব ও মুখস্রাব; চতুর্থ বেগে মস্তকের গুরুত্ব ও মন্যাস্তম্ভ; পঞ্চম বেগে গাত্রভঙ্গ ও শীতজ্বর হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগে পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ দর্ব্বীকর সর্প দষ্ট ব্যক্তির ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগে যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই তিন প্রকার দষ্ট ব্যক্তির প্রথম হইতে পঞ্চম বেগ পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিবে। তাহার পর অসাধ্য।

১। গোয়ালে লতার রস সর্পদষ্ট ব্যক্তির দষ্ট স্থানে লাগাইবে, যে পর্য্যন্ত আরাম না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রলেপ দিবে।

২। আমরুল পাতার রস দষ্ট স্থানে লাগাইবে, তাহা হইলে বিষ নির্গত হইবে, তাহার পর কিঞ্চিৎ লবণ দিবে। যদি বিষ সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হয়, রোগীকে উহার রস এক ছটাক ও কলমী শাকের ডাঁটার রস এক ছটাক পৃথক পৃথক করিয়া খাওয়াইবে। পরে সমুদয় বিষ পড়িয়া গেলে পুনরায় দষ্ট স্থানে উহার রস ও লবণ দিবে।

৩। দশবাইচণ্ডী ফুলের মূল বাঁটিয়া রোগীর শরীরের যে কোন স্থান চিরিয়া রক্তের সহিত সংযোগ করিয়া দিবে।

৪। শ্বেত পদ্মের মৃণাল কিম্বা কেশর জলে বাঁটিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির অজ্ঞান অবস্থা হইলে মাথা চিরিয়া দিয়া তথায় ঘষিবে। চক্ষে জলের ঝাপটা দিবে। জ্ঞান হইলে মৃণাল বা কেশর ২।৩ বার চাটিয়া খাওয়াইবে, জীবন সংশয় হইলে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিস করিবে, কিন্তু রোগীকে ঘুমাইতে দিবে না।

৫। কাঁটানটিয়া মূল সাতটী গোল মরিচের সহিত বাঁটিয়া সরবৎ করিয়া রোগীকে উদর পূর্ণ করিয়া সেবন করাইবে।

৬। কালিয়া কড়ার মূলের ছাল অর্দ্ধ তোলা ২৫টা গোলমরিচ সহ বাঁটিয়া দষ্ট ব্যক্তির ব্রহ্মতালুতে (মাথার চুল কামাইয়া) প্রলেপ দিবে, এবং নস্য লওয়াইলে অজ্ঞানাবস্থা হইলেও আরোগ্য লাভ করিবে।

৭। শ্বেত আকন্দের মূল বাঁটিয়া সেবন ও ঘা-মুখে প্রলেপ দিবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

য়ুরোপের রণকুবের।

প্রাচীন ও বর্ত্তমান যুদ্ধের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যুদ্ধের সময় নূতন নূতন বীরের আবির্ভাব হয়। প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রেই কোনও না কোনও নূতন মহারথের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহে বিশেষতঃ বিগত য়ুরোপ-যুদ্ধে রণবীর ভিন্ন অপর এক জাতীয় বীরের আবির্ভাব লক্ষিত হয়, এবং রণবীর অপেক্ষা এই সকল ধনবীরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধব্যাপার তলাইয়া দেখিলে ইহার কারণ কতকটা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান যুদ্ধবিগ্রহের পিছনে বিরাট শিল্পবাণিজ্য-ব্যবসায়ের আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্প-ব্যবসায়ের ভর না পাইলে বিগত য়ুরোপীয় যুদ্ধ একদিনের অধিক চলিত কি না সন্দেহ। গত য়ুরোপের যুদ্ধ জাতীয় লোকবলের অপেক্ষা জাতীয় শ্রমশিল্প-ব্যবসায়ের শক্তির পরিচায়ক। কামান বন্দুকের লড়াইয়ের আড়ালে আসল সংগ্রাম যে শ্রমশিল্পের, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। জার্ম্মানী যে এই সংগ্রাম চারি বৎসর চালাইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, তাহার শিল্পকলার শক্তি অত্যন্ত অধিক ও বিস্তৃত ছিল।

আবার দেখিতে পাওয়া যায় শ্রমশিল্প-ক্ষেত্রে ধনাঢ্য ধুরন্ধরই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। বর্ত্তমান সময়ে শ্রমজীবীদের অধিকার সম্বন্ধে নানা কথা চলিতেছে, কিন্তু তাহাদের আধিপত্য স্থাপন যে সুদূরপরাহত, রুশিয়ার বল্শেভিক্ নীতির হৃদয়বিদারক পরিণাম তাহার সাক্ষ্য দিবে। শ্রমশিল্পের অধিনায়ক ধনী মহাজন বিগত যুদ্ধের ফলে সমাজে বিষম প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছেন। পৃথিবীর সব দেশেই বিশেষতঃ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন তাঁহাদের সংখ্যা সহস্র সহস্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার মধ্যে কেহ কেহ কোটিপতি হইতে বহু-কোটীপতি হইয়াছেন, আবার কেহ কেহ নিঃস্ব অবস্থা হইতে বিরাট ধনৈশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন।

মধ্য য়ুরোপের শিল্প-ব্যবসায় ক্ষেত্রে এইরূপ কয়েকজন রণকুবের ধুরন্ধরের অসাধারণ ব্যবসায় কৌশল, আয়োজন এবং অভূতপূর্ব্ব অর্থোপার্জ্জনের কথা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। জার্ম্মানীর হিউগো ষ্টাইনেস্ এবং অষ্ট্রিয়ার ক্যাষ্টিলিয়ন্ ব্যবসায়-বুদ্ধিতে এবং আর্থিক শক্তিতে এত পরাক্রমশালী হইয়াছেন যে, সমাজের আশা ভরসা এবং ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অবনতি তাঁহাদের কার্য্যকলাপের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। আমরা এইরূপ একজন মহাধনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নিয়ে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

হিউগো ষ্টাইনেস্।

হিউগো ষ্টাইনেস্ বর্ত্তমান সময়ে মধ্য য়ুরোপের শিল্প-ব্যবসায় ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী ব্যক্তি। অসাধারণ ব্যবসায় বুদ্ধিকৌশলে তিনি সমগ্র য়ুরোপের শিল্পব্যবসায় করায়ত্ত করিবার বিপুল উদ্যম করিতেছেন। বিগত য়ুরোপীয় যুদ্ধের পর তিনি জার্ম্মানীর বিবিধ শিল্পব্যবসায়ের মূল উপাদানগুলি সম্পূর্ণ একচেটিয়া করিয়াছেন। জার্ম্মান শিল্পের মূল উপাদান খনিজ কয়লা এবং লৌহ (Iron ore)। আরও তিনি রাষ্ট্রীয় সমাজে প্রভাব বিস্তারের জন্য বহু সংবাদপত্র ব্যবসায় হস্তগত করিয়াছেন। সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া নিজ মত ও ব্যবসায়ের পোষকতা ও প্রচারের তিনি বিস্তৃত আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহাকে কয়লা এবং সংবাদপত্র ব্যবসায়ের 'নেপোলিয়ন্' আখ্যা দেওয়া হয়। বস্তুতঃ এক সময়ে নেপোলিয়ন্ যে প্রকার য়ুরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে দুর্দ্দমনীয় প্রতাপান্বিত বীর হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই প্রকার বর্ত্তমান য়ুরোপীয় শিল্প সমাজে হিউগো ষ্টাইনেস্ প্রবল আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ প্রতাপশালী ধুরন্ধর হইয়াছেন। তাঁহাকে বর্ত্তমান জার্ম্মানীর শিল্পসম্রাট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

হিউগো ষ্টাইনেস্ প্রুসিয়াবাসী একজন কয়লা-ব্যবসায়ী বণিকরাজের পুত্র (The son and heir of Germany's coal king)। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মুলহাইম্ নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মুলহাইম্ জার্ম্মান শ্রমশিল্প-কেন্দ্রের সন্নিকটস্থ একটি নগর। তাঁহার পিতার কয়লার খনি ও বিস্তৃত ব্যবসায় ছিল। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি উক্ত ব্যবসায়ের অধিকারী হন। তখন তাঁহার বয়স উনিশ বৎসর। তাঁহার পিতা তাঁহাকে আদৌ ব্যবসায় শিক্ষা

দিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। ষোল বৎসর বয়সে স্কুল ছাড়িয়া তিনি তাঁহার পিতার কয়লার খনিতে কাজে নিযুক্ত হন। কয়লার কাজে তিনি এমনই একাগ্রতার সহিত লাগিয়াছিলেন যে, কয়লা তাঁহার জাগ্রতের চিন্তা ও নিদ্রার স্বপ্ন ছিল বলিলেও বলা যায়। ছোক্‌রা মজুর (pit-boy) হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাকে কয়লার খনির ছোট বড় সমস্ত কাজ হাতে কলমে শিক্ষা করিতে হয়। কয়লা-শিল্পের নানা বিভাগের কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার পিতার জাহাজে শিক্ষানবীশ হইয়া প্রবেশ করেন। এখানেও সেই কঠোর পরিশ্রম। এখানেও পর্য্যায়ক্রমে তিনি নানা বিভাগের কাজ আয়ত্ত করেন। ইঞ্জিনে কয়লা দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া জাহাজের প্রধান অধ্যক্ষের কাজ পর্য্যন্ত কিছুই তাঁহার করিতে বাকি ছিল না।

এই প্রকার সুব্যবস্থিত ভাবে প্রণালীবদ্ধ কঠোর শিক্ষা ও পরিশ্রমের ফলে তিনি একজন বিচক্ষণ ব্যবসায়ী হইলেন। কয়লা ও লোহার শিল্পের যা কিছু কায়দা কৌশল অল্প বয়সে সমস্তই তাঁহার আয়ত্ত হইল, এবং কার্য্যকলাপে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ হইলেন।

ষ্টাইনেস্ যখন পৈতৃক ব্যবসায় কর্ম্মের অধিকারী হইলেন, তখন ঐ সমস্ত সম্পত্তির মূল্য সাত মিলিয়ন্ পাউণ্ড, অর্থাৎ সাড়ে দশ কোটি টাকা; এবং বিস্তৃত ভূসম্পত্তি, কয়লার খনি, লোহার কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ইত্যাদি নানাবিধ কারখানা তাঁহার পিতার ব্যবসায় কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিগত য়ুরোপীয় যুদ্ধে ষ্টাইনেস্ তাঁহার কারবার বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং পৈতৃক সম্পত্তি বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। এখন ষ্টাইনেসের সম্পত্তির মূল্য এক হাজার মিলিয়ন মার্ক।* এই সমস্ত অর্থ বহু ব্যবসায়ে খাটিতেছে। তিনি এখন জার্ম্মানীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ক্রুপ্ (krupp) এবং থাইসেন্ (thyssen) জার্ম্মান্ শিল্প-ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রধান ধুরন্ধর ছিলেন। জার্ম্মানীর ইসেন্ নগরে ক্রুপের লোহা-ইস্পাত ও কামান-বন্দুকের কারখানা জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু জার্ম্মানীর যুদ্ধ পরাজয়ে ভার্সাই-সন্ধি-সর্ত্ত অনুসারে ইসেন্ ক্রুপ্ ফ্যাক্টরীতে কামান-বন্দুক প্রস্তুত বন্ধ হইল, এবং ইহার সহিত ক্রুপের ব্যবসায় মাটি হইল। থাইসেন্ বিস্তৃত ভূসম্পত্তির মালিক। এই ভূসম্পত্তির অধিকাংশ আল্‌সেস দেশের (Alsace-Lorraine) অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁহার ভূসম্পত্তির মধ্যে অনেক কয়লা এবং লোহার খনি নিহিত। আরও তিনি জার্ম্মানীর যুদ্ধ জয়ের আশায় অ্যাল্‌সেস্ লোরেন্ দেশের সংলগ্ন বিস্তর আকরপূর্ণ ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। জার্ম্মানীর পরাজয়ে এই সমস্ত সম্পত্তি ফরাসীরাজের এলাকায় আসিয়া পড়িল, এবং থাইসেন্ বহু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ষ্টাইনেস্ জার্ম্মানীর পরাজয় ভাবিয়া লইয়াছিলেন এবং জার্ম্মান পরাজয়ের সহিত ভবিষ্যৎ লাভ-ক্ষতির হিসাব করিয়া সেই ভাবে কারবার ফাঁদিয়াছিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার মতলবই ফলবান হইল, এবং ষ্টাইনেস্ এই সুযোগে নিজের স্বার্থসিদ্ধ করিলেন।

পৈতৃক ব্যবসায়-সম্পত্তি হাতে পাইয়া ষ্টাইনেস্ উহা বহুমুখে বিস্তার করিতে লাগিলেন, এবং ব্যবসায় বৃদ্ধির সহিত তাঁহার আয়ও বহুগুণ বাড়িয়া গেল। কয়লার খনিসমূহ তিনি প্রায় একচেটিয়া করিয়া বসিলেন। এখন তিনি ষাটটি কয়লার খনির মালিক; এবং উত্তর সাইলিসিয়ার কয়লার খনির আশায় উহাকে জার্ম্মান রাজ্যভুক্ত করিবার তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কয়লার আকরের জন্যই উত্তর সাইলিসিয়া প্রদেশ কোন্ রাজ্যভুক্ত হয় ইহা য়ুরোপের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় সমস্যার একটি জটিল বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কয়লা ব্যতীত ষ্টাইনেস্ আরও নানা বিষয়ে লিপ্ত আছেন। পরীক্ষাচ্ছলে জাহাজ ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেন এবং এখন তিনি জার্ম্মান জাহাজ-ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অন্যতম ধুরন্ধর। তাঁহার মহৎ কীর্ত্তি একটি বিরাট শ্রম শিল্পের সমবায়। এই সমবায়ে অনেকগুলি ব্যবসায় একত্র সম্মিলিত করিয়া তিনি ইহাতে নিজের অধিকার স্থাপন করিয়াছেন।

বিগত যুদ্ধের সময় তিনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঠিকাদারী

* ১ মার্ক=১১৸ পেনি। এক হাজার মিলিয়ন্ মার্ক=৪৯ মিলিয়ন্ পাউণ্ড=৭৩॥০ কোটী টাকা।

কাজ হাতে লইয়াছিলেন এবং নিজ ব্যবসায় ও শ্রমশিল্পের দ্বারা জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টকে তিনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। যুদ্ধের পর কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি নানাবিধ ব্যবসার মিলিত করিয়া বড় বড় সমবায় (Trust) গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অনেকে ভাবিতেছেন তিনি সমগ্র শিল্প-ব্যবসায় আত্মসাৎ করিয়া ফেলিবেন এবং ইহারই উদ্দেশ্যে তাঁহার নানাদিকে এই বিপুল উদ্যম। কিন্তু তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা এই অভিযোগের প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, ষ্টাইনেসের উদ্দেশ্য জার্ম্মান শিল্পের উন্নতি ও উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করা; কারণ তিনি জানেন যে, শিল্পজাত দ্রব্যাদির রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে না পারিলে জার্ম্মানীর ভবিষ্যতে বাঁচিবার আশা নাই।

ষ্টাইনেস্ একজন পাকা ব্যবসায়ী, তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য কারবার-বিস্তার ও লাভ। শ্রমিকদিগের কঠোর জীবন ও তাহাদের দারিদ্র্য ষ্টাইনেসের হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র আঘাত করে না। মহাত্মা কার্ণেগীর কারবারে লক্ষ লক্ষ লোকজন খাটিত; তাহাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য তিনি নানাবিধ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ষ্টাইনেস্ হৃদয়হীন কঠোর মনিব। তাঁহার অমানুষিক ব্যবহারে প্রুসিয়ার শ্রমজীবীরা উত্যক্ত হইয়া যখন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল, তিনি পোল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ ইতালি হইতে মজুর আমদানি করিয়া তাঁহার কয়লার খনিতে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারই প্ররোচনায় বিগত যুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ বন্দী বেল্‌জিয়াম হইতে জার্ম্মানীতে নির্ব্বাসিত হয়, এবং বন্দী বেল্‌জিয়ানদিগকে তিনি কয়লার খনিতে এবং লোহার কারখানায় ক্রীতদাসের ন্যায় খাটাইয়াছিলেন।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাঁহার কৌশলজাল কোথায় কি ভাবে তিনি বিস্তার করিতেছেন, তাহা দুরধিগম্য। জার্ম্মান-শিল্পের মূল উপাদান একচেটিয়া করিবার মতলবে তিনি যে চাল চালিয়াছিলেন তাহা অতি ভয়ঙ্কর। ফ্রান্স এবং বেল্‌জিয়মের যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরগুলির পুনর্গঠনের কথা যখন উঠিল, ষ্টাইনেস্ ইহার ভিতর স্বার্থের পথ দেখিতে পাইলেন। তিনি ইহা হইতে বিস্তর কাজ পাইবেন এবং বিস্তর অর্থাগম হইবে ভাবিয়া লইলেন। নগরগুলির পুনর্গঠন কার্য্যে বিস্তর লোহালক্কড় দরকার, এই ভাবিয়া তিনি জার্ম্মানীর কয়লা ব্যবসায় হাত করিলেন; কিন্তু জার্ম্মানীর লোহার অনাটন; জার্ম্মান লোহা অ্যাল্‌সেস্ দেশ হইতে প্রাপ্ত। অ্যাল্‌সেস্ উৎকৃষ্ট লোহার জন্য বিখ্যাত। অ্যাল্‌সেস্ লোরেন্ প্রদেশ জার্ম্মানীর যুদ্ধ পরাজয়ে ফরাসী-রাজ্যভুক্ত হওয়াতে উহার লোহা জার্ম্মানীতে আমদানী বন্ধ হইয়াছিল। তখনও ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান সন্ধি পাকা হয় নাই; তখনও ভার্সাই সন্ধির অন্যান্য সর্ত্ত লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। ষ্টাইনেস্ এবং তাঁহার বন্ধু একজন ফরাসী ব্যবসায়ী উভয়ে মিলিয়া অ্যাল্‌সেস্ দেশীয় লোহা হস্তগত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র পাকাইলেন। ষ্টাইনেসের বন্ধু এই ফরাসী বণিকটি এবং ফরাসী-রাজ্যের তদানীন্তন পররাষ্ট্রসচিব হরিহর আত্মা ছিলেন; ইহাদের সাহায্যে ষ্টাইনেস্ ফরাসী গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অ্যাল্‌সেস্‌জাত সমস্ত লোহা ক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। জার্ম্মানীর কয়লা, অ্যাল্‌সেসের লোহা এবং জার্ম্মানীর সস্তার মজুর লাগাইয়া ষ্টাইনেস্ এবং তাঁহার ফরাসী বন্ধু উত্তর ফ্রান্সের ধ্বংসপ্রাপ্ত সহরগুলি পুনর্নির্ম্মাণ করিবেন—এই উদ্দেশ্য। এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাওয়াতে গভর্ণমেণ্ট পররাষ্ট্রসচিবকে সরাইয়া দেন। ষ্টাইনেসের মতলব ভাঙ্গিয়া গেল। ষ্টাইনেস্ কিন্তু দমিলেন না। তখন তিনি স্বদেশপ্রেমের ভাণ দেখাইয়া নিজের পরাভব চাপা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি হঠাৎ স্বদেশপ্রেমিক হইয়া বিগ্রহসন্ধির কড়া সর্ত্তের প্রতিবাদ করিয়া তুমুল বিবাদের সূত্রপাত করিয়াছিলেন।

ফরাসী দেশের লোহা না পাইয়া তিনি বল্‌শেভিক রাষ্ট্রনায়ক লেনিনের (Lenin) নিকটে রুসিয়ার খনিজ লোহা এবং অন্যান্য ধাতু বিক্রয়ের প্রস্তাব করিলেন। রুসিয়ায় প্রচুর খনিজ ধাতু পাওয়া যায় এবং ইহার লোভে তিনি রুসিয়ার শিল্প-ব্যবসায় পুনঃস্থাপনের জন্য তৎপর হইয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টায় রুস-জার্ম্মান ব্যবসায় সমবায় (Russo-German Trading Corporation) গঠিত হইয়াছে; তিনিই ইহার কর্ত্তা। একদিকে তিনি রুসিয়ার

বলশেভিক্ গভর্ণমেণ্টকে শিল্প সাহায্য দিয়া আশ্বাসিত করিতেছেন, আবার অপর দিকে তাঁহার সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া বল্‌শেভিক্ তন্ত্রের ভীষণ প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন।

ষ্টাইনেস্ তাঁহার চেষ্টা রুসিয়ায় নিবদ্ধ না রাখিয়া অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গারী রাজ্যের কয়লার খনি ও কল কারখানার বন্দোবস্ত লইয়া তথাকার ভগ্নশিল্পের পুনঃস্থাপনে ব্যাপৃত হইয়াছেন। অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গারী রাজ্যের শিল্প কারখানা এক্সচেঞ্জ পড়িয়া যাওয়ার দরুণ (fall of exchange) তিনি অতি অল্পমূল্যে কিনিবার সুবিধা পাইয়াছেন। তিনি কোথায় এবং কখন কি কাজে হাত দেন, তাহা কেহই সহজে বুঝিতে পারেন না। কখন তিনি কোন্ দেশের রাজ্য শিল্পব্যবসায় অলক্ষ্যে মুষ্টিগত করিয়া ফেলিবেন, কখন তিনি তাঁহার সূক্ষ্ম ব্যবসায়-নীতি কৌশলে কোন্ জাতির সম্পদ শোষণ করিয়া ফেলিবেন, এই ভয় অনেকের মনে জাগরূক আছে। তাঁহার শয়তানী ব্যবসায়বুদ্ধি য়ুরোপের জাতিবর্গের একটা আতঙ্কের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মানীর বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা ফিরাইবার যে একমাত্র উপায় শিল্প-ব্যবসায়ের পুনরুদ্ধার—এটা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছেন, এবং বোধ হয় সেই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি জার্ম্মান শিল্প-ব্যবসায়ের পুনর্গঠনের নিমিত্ত এই নির্ম্মম ব্যবসায়-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

সম্প্রতি ষ্টাইনেস্ একটি বিশাল ব্যবসায় কল্পনা জার্ম্মানীর সমক্ষে ধরিয়াছেন, এবং কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টাও করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সেদিন জার্ম্মানীর নৌ-ব্যবসায়ীদিগকে একটি সভায় আহ্বান করিয়া ব্যাপারটা আলোচনা করিয়াছিলেন। ব্যাপারটি এই—মধ্য য়ুরোপের নদীগুলি সুদীর্ঘ খালের দ্বারা সংযোগ করিয়া উত্তর জার্ম্মানীর বন্দরগুলির সহিত যোগ করিয়া দেওয়া। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে মধ্য য়ুরোপের আভ্যন্তরিক বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা হইবে।

ষ্টাইনেসের কার্য্যকলাপ শুধু শিল্পব্যবসায়ক্ষেত্রে সংবদ্ধ নহে। তিনি চতুর রাজনীতিবিৎ, বর্ত্তমান গণতন্ত্রদলের নেতা না হইলেও তিনি ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী। ইংলণ্ডের লর্ড নর্থক্লিফের মত সংবাদপত্রের সাহায্যে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রভাব বৃদ্ধি করিতেছেন। জার্ম্মানীর সংবাদপত্র ব্যবসায় তাঁহার প্রায় করায়ত্ত হইয়াছে। জার্ম্মানী ব্যতীত তিনি অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গারী দেশের সংবাদপত্র ক্রয় করিতেছেন। এখন তিনি শতাধিক সংবাদপত্রের মালিক। আজকালকার প্রজাতন্ত্রের যুগে সংবাদপত্র সমাজে বিষম শক্তিশালী হইয়াছে, এবং এই শক্তি তিনি নিজ ব্যবসায় বৃদ্ধির সাহায্যে প্রয়োগ করিবেন—এই উদ্দেশ্য।

শ্রমশিল্পক্ষেত্রে ষ্টাইনেসের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও প্রবল আকাঙ্খার পরিচয় পাওয়া যায়। দুরতিক্রম্য বাধাবিঘ্ন তাঁহার চেষ্টার নিকটে তুচ্ছ হইয়া যায়। এই কঠিন লোকটি আবার গার্হস্থ্য জীবনে অত্যন্ত সরলচিত্ত, কৌতুকপ্রিয় এবং সদাপ্রফুল্ল। আলাপ পরিচয়ে তাঁহার আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পারিবারিক জীবনে তিনি আদৌ উদাসীন নহেন। তাঁহার স্ত্রী কোন বিশিষ্ট ধনী জার্ম্মান ব্যবসায়ীর কন্যা, অসাধারণ রূপগুণসম্পন্না এবং কর্ম্মকুশলা। তাঁহাদের দুই কন্যা এবং চারি পুত্র।

শ্রীনিমাইচাঁদ শীল, এম-এ

সুবর্ণবণিক্ সমাচার, চৈত্র, ১৩২৮।

ভাঙ্গা গড়া।

[শ্রীজগদীশচন্দ্র দাস]

(১)

ওরে, গড়ছিস্ যত ভাঙ্ছিস্ তোরা
অনেক বেশী তার,
তবে, কেমন ক'রে হবে গড়া
পূজার গৃহ মার ?
তোদের—দীর্ঘ কালের ঘুম ভেঙ্গেছে
বাণ ডেকেছে প্রাণে,
দেশ মাতা'লি দীপক রাগের
ঘুম-ভাঙ্গানো গানে।
মাল মসলার নাইকো জোগাড়
শিল্পী তেমন নাই,
শুধু, সারা দেশের মানুষ ডেকে
করলি রে এক ঠাঁই।
তাদের একটা কিছু করতে হবেই—
গড়া হবে পাছে,
তাই, ভেঙ্গে তারা করলো রে চুর
যেখানে যা আছে।
গড়ার চেয়ে ভাঙ্গা বেশী
কেমন কাজের ঢং ?
বুঝে সুঝে মায়ের কাজে
লাগ্ দেখি হরদম।

(২)

ওরে, দেশের মাঝে অনেক আছে
শিল্পী কারিগর,
তারা, শিব্ না গ'ড়ে বানর গড়ায়
র'য়েছে তৎপর।
ঘৃণা ক'রে দূরে তাদের
কেন রাখিস্ ফেলে ?
হাতটী ধ'রে ভুলটী ভেঙ্গে
নে' আয় কর্ম্মস্থলে।
ওরে, ছোট, বড়, বিজ্ঞ, মূর্খ
ঘৃণ্য ত কেউ নয়,
সবাই মিলে লাগলে কাজে
কাজ কি বাকী রয় ?
অনেক আছে তোদের চেয়েও
অধিক শক্তিশালী,
মত্ মেলেনা ব'লে কেন
করিস্ গালাগালি ?
এখন, গালাগালি দলাদলীর
সময় কি আর আছে ?
গ'লে মিশে এক হ'য়ে যা
মায়ের পূজার কাজে।

(৩)

তোরা জগৎ জুড়ে ঐক্যতানে
বাঁধবি বীণার সুর,
তবে, আপন জনে শত্রু ভেবে
কেন রাখিস দূর ?
লক্ষ প্রাণে এক হ'য়ে যা
এক লক্ষ্য চাওয়া—
সাগর জুড়ে ঢেউ উঠেছে
পালে লাগে হাওয়া।
ঢেউ দেখে ভাই ভয় কি তোদের
অমর তোরা যে,
শাঁক বেজেছে ডাক প'ড়েছে
পারে যাবি কে ?
জগত খুঁজে মসলা এনে
গড় মন্দির মার,
উচ্চ চূড়ায় কণক-কলস
উজল চমৎকার।
জীর্ণ গাঁথন্ আপনি তখন
পড়বে লুটে ধুলি,
শঙ্খ ঘণ্টা উঠবে বেজে
"জয় মা আমার" বুলি।

আলোচনা।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত]

এবার ভারতেশ্বরের জন্মদিনে বর্ষিত উপাধি-তালিকার বাঙ্গালীর সাহিত্য-সেবী তিন জনের নাম আছে। "ভারতবর্ষে"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় "রায় বাহাদুর" হইয়াছেন কেবল সাহিত্য-সেবার জন্য। সেন মহাশয়ের এক সাহিত্য-সেবা ব্যতীত দ্বিতীয় পেশা নাই। আজীবন ইনি বাণী-মন্দিরে অর্ঘ্য দান করিয়া আসিতেছেন। মিষ্ট-ভাষী, সদানন্দ, সুরসিক জলধর দাদাকে উপাধিদানে সম্মানিত করিয়া কর্তৃপক্ষ সাহিত্য-সেবক-সমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। জগদীশ্বর নবীন উপাধিমণ্ডিত প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়কে দীর্ঘজীবী করুন।

* * *

অশেষ-গুণের আধার রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু, আই, এস্‌ও মহাশয় সি, আই, ই হইয়াছেন। বাণী-মন্দিরের এ পূজারী উপাধি পাইয়াছেন কলিকাতার সেরিফের কার্য্য করিয়া। বসু মহাশয় মহাপ্রাণ, দশের কর্ম্ম পাইলে নিজের কথা ভুলিয়া যান। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করিতে ইনি আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন, অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, ছায়াচিত্র দেখাইয়া বক্তৃতা দিয়াছেন। অনাথ আশ্রমের ইনিই কর্ণধার। আমরা আশা করিয়াছিলাম, এই জ্ঞানবীর ও কর্ম্মবীর সাহিত্য-সেবী স্যার হইবেন। কিন্তু ইনি নিঃশব্দে কার্য্য করিতে ভালবাসেন—এই ইঁহার প্রধান অপরাধ। নিজের ঢাক নিজে না বাজাইয়া উপাধি-মঞ্চের এতটা উচ্চে ইনি উঠিয়াছেন। ভগবানের কৃপায় ইনি দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের ও দশের সেবা করুন। ইহা বাঙ্গালী মাত্রেরই প্রার্থনা।

তৃতীয় সাহিত্য-সেবী উপাধি-ব্যাধি পীড়িত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। ইনি টাইটেল লাভ করিয়াছেন অবৈতনিক হাকিমি করিয়া। যতদিন পুলিস কোর্টে বসিয়া ঘোষ মহাশয় নিরপেক্ষ ভাবে অর্থী-প্রত্যর্থীর মামলা নিষ্পত্তি করিতেন, ততদিন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সম্মানিত করেন নাই। ইহা গবর্ণমেণ্টের তীব্র রস-বোধ পরিচায়ক। এখন তিনি তাঁহার পরলোকগত শিশুকে প্রভুর পদে অর্পণ করিয়া নিজে যীশুর ক্রশ স্কন্ধে লইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন—এখন আর তাঁহার স্কন্ধে উপাধি কেন? ঘোষ মহাশয় তুচ্ছ শত সহস্র টাকা দান করেন না। ইনি দান করিয়াছেন মাত্র বিশ লক্ষ টাকা, আর তাহার সহিত "ফাউ" নিজের জীবনটা। ইঁহার সংস্কৃত ও ইংরাজী পাণ্ডিত্যের ফলে হিন্দুধর্ম্মের ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের নীতির সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে। ইঁহার "তৃণপুঞ্জ", "বীণা ও বাঁশরী" প্রভৃতি কবিতার পুস্তক বাঙ্গালী সমাজে যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে। ঘোষ মহাশয় "সম্মিলনী" পত্রিকার প্রাণ স্বরূপ ছিলেন। এখন তিনি পরোপকার ব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য কুবেরের সম্পদ দান করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন। সদা বিনয়-নম্র, মিষ্টভাষী ঘোষ মহাশয় উপাধি প্রত্যর্পণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু তিনি এ ব্যাধি লইয়া বিষম বিব্রত হইবেন। সরকার যে তাঁহার মহানুভবতা পুরস্কৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—ইহা অতীব সুখের কথা। জগদীশ্বর ঘোষ মহাশয়কে দীর্ঘজীবন দান করুন, সমাজের কার্য্যে উদার নীতির প্রসার করিবার সামর্থ্য আরও বহুকাল তাঁহাকে অর্পণ করুন।

বাহিরের গণ্ডগোল স্তব্ধ করিয়া দমন-নীতি বুঝিতেছে যে, স্বরাজ্য-সিদ্ধির সঙ্কল্পটা ভারতবাসীর প্রাণ হইতে উপিয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস কিন্তু অন্য রকম। সমাজ সংস্কারের ধারাটা দুই প্রকার—প্রথম ধারা বহির্মুখী; দ্বিতীয় ধারা ফল্গু নদীর মত অন্তঃপ্রবাহিনী। প্রথম ধারার বিকাশ স্কুলের ছেলের সমবেত চেষ্টা-ফলের সাফল্যের মত—করতালি, চীৎকার, উড্ডীন পতাকায় ইহার

বিকাশ। সে সাফল্য চায় আপনাকে প্রকাশ করিতে, প্রচার করিতে; জগতে জানাইতে চায় যে, সে সাফল্য সে বিজয়। এ বিজয় কিন্তু গভীর হয় না, এ বিজয় পুলকিত করে তাহাদের, যাহাদের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি স্বল্পশক্তি মূলক। প্রকৃত কর্ম্মবীর কিন্তু এ সাফল্যে তুষ্ট হয় না। সে চায় সমাজের স্থায়ী হিতের সাধনা। চীৎকার-বীর গলাবাজী করিয়া দেশের হিতসাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়, শেষে বিপক্ষ পক্ষ উপাধি দানে বা চাকুরী দানে তাহাকে নিজস্ব করিয়া লয়। স্বার্থত্যাগ না করিয়া এ শ্রেণীর দেশহিতৈষী (?) স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লয়। এমন কি ইংলণ্ডের মত উন্নত দেশেও এ শ্রেণীর গণ্ডগোল ও আন্দোলন রাজনীতিক্ষেত্রে বিরল নয়। কিন্তু আয়ারল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রদেশে ইহাদের অস্তিত্ব বিশেষ ভাবে অনুভূত।

* * *

স্বদেশ-হিতৈষণার দ্বিতীয় ধারা কর্ম্মে। এই কর্ম্ম-কর্ত্তাদের আবার দুইটি বিভাগ আছে। একদল ভাঙ্গিতে চায়, অপর দল গড়িতে চায়। এই ভাঙ্গার দলের দ্বারা দেশের প্রভূত অনিষ্ট হয়, শাসনযন্ত্রের ক্ষতি হয়। দমন-নীতি বাহিরের গণ্ডগোল থামাইয়া দিলে এই ভাঙ্গার দল অন্তঃসলিলা নদীর মত কার্য্য করে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যাহারা গুপ্তহত্যা প্রভৃতি মহাপাপে মাতৃসেবার অনুষ্ঠান করে তাহারা বুঝে না যে, তাহাদের দেশসেবা কত হানিকর। পাপে কোনও জাতি বড় হয় নাই—পাপ করিয়া কোন জাতির শৃঙ্খল টুটে নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। বঙ্গভঙ্গের পর বাহিরের আন্দোলন বন্ধ হইলে যাহারা গুপ্ত-সমিতি গড়িয়া নরহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছিল, স্বদেশবাসীর অর্থ লুণ্ঠন করিয়াছিল, কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজকর্ম্মচারীর প্রাণবধে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের দ্বারা কোনও ইষ্ট সাধিত হয় নাই। এরূপ হিংসার কার্য্যে দেশের হিত বা জগতের হিত কোনও দিন হইতে পারে না। এ বিষয়ে ইতিহাসের নবীন দৃষ্টান্ত জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য। বল-গর্ব্বে দৃপ্ত করিয়া জার্ম্মাণী শোণিত স্রোতের উপর দিয়া বিশ্বস্বামীত্বের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু সে গর্ব্ব ভগবান সম্যকরূপে খর্ব্ব করিয়াছেন। যে বলের উপর ভর করিয়া স্বাধীন জাতি প্রায় নিজেদের স্বাধীনতা হারাইয়াছিল, সেই হিংসামার্গে পরাধীন জাতি কোনও দিন স্বরাজ্য সিদ্ধি করিতে পারে না।

* * *

নীরব কর্ম্মের অপর ধারা গঠন। না ভাঙ্গিলে গড়া যায় না। কিন্তু ভাঙ্গিতে হইবে—দুর্নীতি, স্বার্থপরতার প্রাচীর, জড়তার নির্জ্জীবতা। তাহার উপর গড়িয়া তুলিতে হইবে সংস্কৃত সমাজ, নির্ম্মল নীতিজ্ঞান, শ্রম-শিল্প, কৃষি বাণিজ্যে শ্রমশীলতার উপর শ্রদ্ধা। অহিংসায় আমাদের স্বরাজ লাভ হইবে, আত্মশুদ্ধির দ্বারা আমরা আবার মানুষের মত হইব। বিলাতী বর্জ্জন করিতে হইবে, বিলাতীর উপর হিংসা করিয়া নয়—নিজেদের শ্রমজীবীদের উপর প্রেম ও প্রীতিতে। চরকার গুঞ্জনে প্রাণের মধ্যে স্বদেশ-প্রেমের সঙ্গীত আপনি বাজিয়া উঠিবে। খদ্দরের স্পর্শে দেহ পুষ্ট হইবে, লজ্জা পাইয়া বিলাসিতা দূরে পলাইবে, তাহার সহিত অনেক মন্দ, অনেক অলস স্বভাব দূরীভূত হইবে। তাই বলিতেছিলাম, স্বদেশ-সেবা স্বরাজ্য লাভ নীরব সাধনা, কঠোর কর্ম্ম সাপেক্ষ। রাত্রে বিশ্রাম-লাভের পূর্ব্বে যদি আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ চিত্তকে প্রশ্ন করি, স্বরাজ-লাভের জন্য আজ কতটুকু স্বার্থত্যাগ করিয়াছি, স্বদেশবাসীর জন্য কতটুকু প্রাণ কাঁদিয়াছে, দেশের কল্যাণের জন্য আমাদের অজ্ঞ "অস্পৃশ্য" ভ্রাতাদের উন্নতির কি ব্যবস্থা করিয়াছি, মন হইতে প্রবলের প্রতি দাস্য-ভাব কতটুকু বর্জ্জন করিয়াছি, তবেই আমরা স্বরাজ-লাভের অধিকারী হইব। বাহু-বলে স্বরাজ আসিবে না।

১৯শ ভাগ] } শ্রাবণ, ১৩২৯। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে ভারতের কথা।

(৫)

(কোলরিজ—ওয়ার্ডসোয়ার্থ—সাদে)

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

ইংরাজি কাব্য সাহিত্যে রোমান্টিসিজমের (Romanticism) জন্ম এক অভাবনীয় ব্যাপার। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে য়ুরোপীয়েরা জগতকে নূতন জ্ঞানের আলোকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। গ্রীক ও রোমান কবিদের প্রাচীন আদর্শকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কালে য়ুরোপীয় সাহিত্য যখন মানবতার সিংহাসনে উদারনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিল, কাব্যের কলেবর ভাষা তখন অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রচলিত বিধিকে উপেক্ষা করিয়া সহজবোধ্য কথায়, নূতন ছন্দে পাঠকের হৃদয়ে প্রকৃতি দেবীর সৌন্দর্য্য রাশি ও প্রেমের বৈচিত্র্য অঙ্কিত করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে রাজনীতি ও সমাজনীতির উচ্চতর আদর্শ রাজা ও রাজমহিষীদের ইতিহাসে বর্ণিত কার্য্যকলাপকে কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের তালিকা হইতে বাদ দিয়া বৃহত্তম মানবসমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ সাধারণ লোকেদের আড়ম্বরশূন্য জীবনেতিহাসের অধ্যায়গুলি একে একে কবির লেখনী মুখে প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিল। ইহার ফলে কাব্য জগতে যে বিপ্লব উপস্থিত হইল তাহার মূলে স্বাধীন মতবাদ যে বর্ত্তমান ছিল, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। চিন্তারাজ্যের সর্ব্বত্র এই মতবাদ কিরূপে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে তদ্বিষয়ে ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মানব-সমাজে যেখানে যত প্রকার নূতন আদর্শ এই সময় হইতে কবিরা দেখিতে পাইয়াছেন সেগুলি যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া কাব্য-সাহিত্যের কলেবর পরিপুষ্ট করিয়াছেন। কবিরা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া প্রাচীন আদর্শের নূতনতর ব্যাখ্যা করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহারা নূতন আদর্শের বার্ত্তা কাব্যের ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিয়া বাহিরের ও অন্তর্জ্জগতের পাতাল প্রদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া তুলিলেন। ইংরাজি ভাষার কাব্যক্ষেত্রে রূপার প্রমুখ কবিরা রোমান্টিসিজমের যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, কোলরিজ তাহাকে জলসেচন দ্বারা অঙ্কুরিত করেন, কিন্তু ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিত্ব-প্রতিভা সেই অঙ্কুরকে প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত করিয়া মানুষের অন্তর্দৃষ্টির নূতন শক্তিকে চিরকালের তরে গৌরব-মণ্ডিত

করিয়াছে। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, কোলরিজের কাব্যে আমরা ভারত ও ভারতবাসীর কোনও উল্লেখ দেখিতে পাই না। ফ্রান্সের রাজনৈতিক আকাশে বিদ্রোহের যে ধূমকেতু উল্কাবর্ষণ করিতেছিল, কোলরিজের কল্পনা তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের য়ুরোপীয় আদর্শ সৃষ্টি করিতে ব্যস্ত ছিল। কোলরিজ বুঝি অপরিণত বয়সে একবার ভারতের হীরক-প্রসবিনী গোলকণ্ডার কথা তাঁহার একটি খণ্ড কবিতায় বলিয়াছিলেন।

'Fond man ! should all Peru thy empire own,
For thee tho' all Golconda's jewels shone,
What greater bliss could all this wealth supply ?
What but to eat and drink and sleep and die ?'

প্রাচ্যে য়ুরোপীয় বাণিজ্যের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবিদের মত কতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে! "মূর্খ মানব! তুমি যদি সমগ্র পেরু রাজ্য লাভ কর আর গোলকণ্ডার রত্নরাজি যদি তোমারই চক্ষে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা হইলে এই ধনরাশি তোমাকে কি এমন বেশী সুখ দিতে পারে? তুমি না হয় চর্ব্ব-চোষ্য লেহ্য-পেয় আস্বাদন করিবে আর নিদ্রা যাইবে আর তার পরে মরিবে ত?" কোলরিজের ন্যায় ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবি-জীবনের প্রায় সমস্তটা ফরাশি বিপ্লবের ঘোরতর নেশায় কাটিয়া গিয়াছিল। ওয়ার্ডসোয়ার্থ ফরাশি বিপ্লবের ইংরাজ কবি ছিলেন, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি উক্ত বিপ্লব সংক্রান্ত ঘটনাবলীর যে পদ্যময় বিবরণ ও স্বাধীনতার অনুকূলে যে সকল কাব্য লিখিয়াছেন সেগুলি একত্র করিয়া মুদ্রিত করিলে একাধিক বৃহদায়তন গ্রন্থ হইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে, প্রকৃতির খাস কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থের কল্পনার আবাস-ভূমি 'সরোবর প্রদেশের' গ্রাসমীয়র (Grassmere) প্রভৃতি স্থানের প্রত্যেক উপলখণ্ড কবির গীতি-কবিতার গানে মুখর হইয়াছিল। প্রকৃতির বিশ্ব-বীণায় ওয়ার্ডসোয়ার্থ যে ঝঙ্কার শুনাইয়াছেন তাহাতে কখন কখন ভারতের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে।

'Lyre ! though such power do in thy magic live
As might from India's farthest plain
Recall the not unwilling maid,
Assist me to detain
The lively Fugitive." (১৮৪২ খ্রীঃ অঃ)

"বীণা! তোমার ঐন্দ্রজালিক শক্তি ভারতের দূরতম স্থান হইতে স্বেচ্ছাধীন কুমারীকে ফিরাইয়া আনিতে পারে আর সেই জন্যই তোমাকে অনুরোধ করিতেছি যে, চঞ্চল-চিত্ত পলায়নপরাকে ধরিয়া রাখিতে আমাকে সাহায্য কর।" ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্ব হইতে ইংরাজ মহিলারা যে ভারতে আগমন করিতেছিলেন তাহা এই শ্লোক পাঠ করিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়। উক্ত বৎসরে ওয়ার্ডসোয়ার্থের রচিত আর একটি শ্লোকে ভারতের কথা স্থান পাইয়াছে।

"Whom Sylphs, if e'er for casual pastime they
Through India's spicy regions wing their way,
Might bow as to their lord.'

কবি স্বর্গের পাখীর (Bird of Paradise) একখানি ছবি দেখিয়া বলিতেছেন যে, "পরীজাতীয় পাখা বিশিষ্ট শিলফগণ যদি ক্রীড়াসক্ত হইয়া কোনও সময়ে ভারতের সুগন্ধযুক্ত প্রদেশে গমন করে তাহা হইলে তাহারা নত হইয়া উক্ত পক্ষীকে তাহাদের রাজার ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিবে।" এই পক্ষীর জন্মস্থান কি ভারতবর্ষে? যাহা হউক, ওয়ার্ডসোয়ার্থের কল্পনা যে ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া কবির চিত্রাঙ্কণ শিল্পের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছে তাহার প্রমাণ তাঁহার কাব্যের আরও কয়েক স্থানে পাওয়া যায়। কবি ১৮০২ খৃষ্টাব্দে একদিন ইয়র্কসায়রের অন্তর্গত হামিল্টন পাহাড় উত্তীর্ণ হইয়া তৎপ্রদেশের কিম্বদন্তী অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন। এই কবিতায় উক্ত স্থানের বনভূমির মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের দুর্গবিশেষের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন। "There stood Indian citadel." ওয়ার্ডসোয়ার্থের সময়ে ইংরাজের উদ্যমশীলতা তাহাকে কোথায় না লইয়া গিয়াছিল? কবি "উদ্যমশীলতা" নামে যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে ভারতের রত্নরাশির কথা লিখিত আছে।

"Thee winged Fancy took, and nursed
On broad Euphrates' palmy shore,

And where the mightier Waters burst
From caves of Indian mountains hoar !"

"উত্তমশীলতা! তোমাকে কল্পনারূপ পক্ষী তালবনাকীর্ণ ইউফ্রেটিসের তীরে, আর যেখানে ভারতের তুষারাবৃত পর্ব্বতের গহ্বর হইতে অধিকতর শক্তিশালী নদী সকল বাহির হইয়াছে সেখানে লইয়া গিয়া লালন পালন করিয়াছে।" ওয়ার্ডসোয়ার্থ অধিকাংশ স্থলে অলঙ্কারের খাতিরে তাঁহার কাব্যে ভারতের খণ্ড-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কবির অন্তরে তাঁহার দেশের একটি অজ্ঞাতনামা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী যে স্মৃতি জাগাইয়া দেয় গঙ্গা কিম্বা নীল নদ তাহা পারে না।

"There is a little unpretending rill
Of limpid water, humble far than aught
That ever among men or Naiads sought
Notice or name ! It quivers down the hill,
Furrowing its shallow way with dubious will ;
Yet to my mind this scanty stream is brought
Oftener than Ganges or the Nile ; a thought
Of private recollection sweet and still !"
(*Stanza*, ১৮০১ খ্রীঃ অঃ)

ওয়ার্ডসোয়ার্থের এই রচনা পাঠ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্তের ফ্রান্সে অবস্থিতি কালে রচিত একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতার কথা মনে পড়ে। এই কবিতায় মধুসূদন-কপোতাক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে।
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।
বহু দেশ দেখিয়াছি বহু নদ দলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?"

গঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে ওয়ার্ডসোয়ার্থ যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা হইতে তিনি "পরিভ্রমণ" (The Excursion) নামে তাঁহার সুবৃহৎ কাব্যে মানব-জীবনের গতি নিরূপণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "হিন্দুরা যেমন আকাশে প্রতিষ্ঠিত উৎস হইতে তাঁহাদের পবিত্র গঙ্গার উৎপত্তি স্থির করেন, সেইরূপ মানব-জীবন রূপ নদীও দৈবশক্তির বেদী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে জানিও; আর মনে রাখিও যে, গঙ্গার মত মন্থর গতিতে আমাদের জীবন এই পৃথিবীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিলেও ইহা বিশ্বের মহা-প্রাণ রূপ সমুদ্রেরই অঙ্গবিশেষ এবং তাহাতেই মিশাইতে চাহে।"

—"As the Hindoos draw
The holy Ganges from a skiey fount,
Even so deduce the stream of human life
From seats of power divine ; and hope, or trust,
That our existence winds her stately course
Beneath the sun, like Ganges, to make part
Of a living ocean."
(*The Excursion, Despondency*, ২৪৪)

ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবি-জীবনে প্রকৃতি পূজা ও য়ুরোপীয় সমাজে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এই দুইটি প্রধান কার্য্য ছাড়া আরও একটি কার্য্যের অনুষ্ঠান আমরা দেখিতে পাই। ওয়ার্ডসোয়ার্থ তাঁহার কাব্যের অসংখ্য স্থানে ইংলণ্ডকে স্বাধীনতার পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কথা কবি একেবারে ভুলিয়া যান নাই। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতায় তিনি ইংলণ্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"England ! the time is come when thou should'st wean
The heart from this emasculating food ;
The truth should now be better understood ;
Old things have been unsettled ; we have seen
Fair seed-time, better harvest might have been
But for thy trespasses, and, at this day,
If for Greece, Egypt, India, Africa,
Aught good were destined, thou would'st step between."

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে ইংলণ্ড ভারতবর্ষে বিদেশীয় শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ওয়ার্ডসোয়ার্থ উপরোক্ত শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই যে, এক্ষণে পৃথিবীতে রাজা ও সমাজ-শাসনের পুরাতন নিয়ম যদ্দ্বারা উৎপীড়ন প্রশ্রয় পাইত তাহা বদলাইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড নিজের স্কন্ধে যে দায়িত্ব স্থাপন করিয়াছে তাহাতে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তাহাকে গ্রীস, ঈজিপ্ট, ভারতবর্ষ ও আফ্রিকায়

স্বাধীনতার ধ্বজা তুলিয়া মানব-সমাজে তাহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে হইবে। ওয়ার্ডসোয়ার্থ এই কবিতা রচনা করিবার পর ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে "পূর্ব্বাভাস" (The Prelude) নামে একখানি সুবৃহৎ কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই কাব্য যদিও তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও উক্ত কাব্য রচনাকালে কবি সমসাময়িক ফ্রান্সের কথা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে নৃশংসতার কাহিনী শুনিয়া লিখিয়াছিলেন—

"They—who had come elate as eastern hunters
Banded beneath the Great Mogul, when he
Erewhile went forth from Agra or Lahore,
Rajas and Omras in his train, intent
To drive their prey enclosed within a ring
Wide as a province, but, the signal given,
Before the point of the life-threatening spear
Narrowing itself by moments—they, rash men,
Had seen the anticipated quarry turned
Into avengers, from whose wrath they fled
In terror."

(*The Prelude, Residence in France, Bk. X,* ১৭)

মোগল সম্রাটের মৃগয়া বর্ণন করিয়া কবি বলিতেছেন যে, যখন সম্রাট রাজা ও ওমরাগণের সহিত আগ্রা কিম্বা লাহোর হইতে মৃগয়ায় বহির্গত হন তিনি একটি সমগ্র প্রদেশকে ঘিরিয়া ফেলেন এবং সঙ্কেত প্রাপ্ত হইবা মাত্র বর্ষাধারীরা অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতর বৃত্তের মধ্যে শিকারকে আক্রমণ করে, কিন্তু কখন এমন হয় যে হিংস্র জন্তুরা শিকারীগণকে আক্রমণ করে ও তাহারা ভয়ে পলায়ন করে। ওয়ার্ডসোয়ার্থের বন্ধু ও প্রতিবাসী কবি সাদের (Southey) রচনায় উপরোক্ত মৃগয়া বর্ণনার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। "জোন্ অব্ আর্ক" নামক মহাকাব্যের অষ্টম সর্গে সাদে লিখিয়াছেন—

"When the monarch of the East goes forth
From Gemna's banks and the proud palaces
Of Delhi, the wild monsters of the wood
Die in the blameless warfare : closed within
The still-contracting circle, their brute force
Wasting in mutual rage, they perish there,
Or by each other's fury lacerate,
The archer's barbed arrow, or the lance
Of some bold youth of his first exploits vain,
Rajah or Omrah, in the war of beasts
Venturous, and learning thus the love of blood."

ইংরাজ কবির চিত্রাধারে যে ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত এইরূপ কত ঐতিহাসিক চিত্র স্থান পাইয়াছে তাহা গণিয়া ঠিক করা যায় না। কবি সাদে "নস্য" (Snuff) নামক যে কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহাতে গোলকণ্ডার উল্লেখ করিয়াছেন।

"What are Peru and those Golcondan mines
To the Virginian? miserable realms,
The produce of human toil, they sen
Gold for the greedy, jewels for the vain."

সাদে মান্দ্রাজ প্রদেশের মালাবার বিভাগের অধিবাসী মালাবারীগণকে মালাবার (Malabar) নামে তাঁহার কাব্যে একাধিক স্থানে অভিহিত করিয়াছেন। স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ডের মধ্যে একতা স্থাপিত হইলে কবি ঈজিপ্ট ও ভারতবর্ষকে একটি কবিতায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, এই আত্মীয়তার ফলে মানব-সমাজ কি সুখ ও শান্তিরূপ আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে না? "নারীর জয়" নামক কবিতায় সাদে ভারতের নামোল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"India sends her sons, submissive slaves." কোলরিজ, ওয়ার্ডসোয়ার্থ ও সাদের পদ্যময় রচনায় ভারতের সহিত ইংলণ্ডের ব্যবসা বাণিজ্যের কোনও কথা নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার অগ্রণী খৃষ্টান ধর্ম্ম ভারতে পদার্পণ করিয়া ভারতবাসীর চিন্তারাজ্যে এক নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছিল। খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকগণ এই সময় হইতে এদেশে আগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। খ্যাতনামা পাদরী হিবারের (Heber) একখানি আলেখ্য দেখিয়া সাদে লিখিয়াছেন—

"Where'er the Christian Patriarch went,
Honour and reverence *heralded* his way,
And blessings followed him,
The Malabar, the Moor, the Cyngalese,
Tho' unillumed by faith,
Yet not the less admired
The virtue that they saw.

The European soldier, there so long
Of needful and consolatory rites
Injuriously deprived,
Felt, at his presence, the neglected seed
Of early piety
Refresh'd as with a quickening dew from heaven,
Native believers wept for thankfulness,
When on their heads he laid his hallowing hands;
And, if the Saints in bliss
Be cognizant of aught that passeth here,
It was a joy for Schwartz
To look from paradise that hour
Upon his earthly flock.
* *
Ram boweth down,
Creeshna and Sheeva stoop;
The Arabian moon must wave to wax no more."

"যেখানেই খৃষ্টান ধর্ম্মাচার্য্য (হিবার) গমন করিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার অগ্রগামী হইয়া সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখা দিয়াছে আর আশীর্ব্বাদ তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছে। মালাবারী, মুর ও সিংহলবাসী যদিও খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, কিন্তু তাঁহার সদ্‌গুণের জন্য তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে ভুলিয়া যায় নাই। য়ুরোপীয় সৈনিক ঐ সকল স্থানে বহু দিন ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলভোগে বঞ্চিত হইয়া ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার আগমনে অযত্নে রক্ষিত ধর্ম্মের বীজটি তাহার হৃদয়রূপ ক্ষেত্রে যেন স্বর্গ হইতে শিশির বর্ষণে সত্বর সঞ্জীবিত হইয়াছিল। ধর্ম্মে আস্থাবান স্থানীয় লোকেরা তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আনন্দাশ্রু মোচন করিয়াছে। রাম কৃষ্ণ শিব প্রভৃতি দেবতারাও এই সকল ব্যাপার দর্শনে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবেন, কারণ স্বর্গবাসী পুণ্যাত্মারা যদি মর্ত্ত্যের কোনও সংবাদ রাখেন তাহা হইলে তাঁহারা এরূপ অবস্থায় সুখী হইয়া থাকেন।" সাদের রচিত "কবির তীর্থ ভ্রমণ" (The Poets' Pilgrimage.) নামক কবিতা পাঠে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কবির সমকালে য়ুরোপীয় পরিব্রাজকেরা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিলেন। এই কবিতার ৩৬ ও ৩৭ শ্লোকে কবি বলিতেছেন যে, এই সকল পরিব্রাজকের মধ্যে "একজন মালাবারী ও মুরদিগের সহিত বসবাস করিয়াছিলেন। উর্ব্বর পৃথিবী ও সুন্দর আকাশ ভারতের সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান সমূহে অকাতরে প্রকৃতির দান বিতরণ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের সুখকর যাহা কিছু হইতে পারে তাহা এই স্থানে আছে। উপত্যকা সকল বৎসরের সকল সময়ে বিবিধ সুস্বাদু ফলে সমৃদ্ধ, পর্ব্বত সকল অম্লান ও সতেজ পত্র-পরিচ্ছদে আবৃত। আর একজন পরিব্রাজক ঐশ্বর্য্যের ছবি প্রাসাদ সকল দেখিয়াছেন। এই সকল প্রাসাদ প্রাচ্যের প্রাচীন নরপতিগণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি পর্ব্বত গুহাস্থিত মন্দিরের মধ্যে গিয়াছেন এবং তথায় ভীতিজনক কক্ষ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন। যে নিপুণ শিল্পী মানুষের চক্ষে এই সকল আশ্চর্য্য দৃশ্য অনায়াসে ব্যক্ত করিতে পারেন, তিনি দৈব-শক্তি-সম্পন্ন।"

"And one had dwelt with Malabars and Moors,
Where fertile earth and genial heaven dispense
Profuse their bounty upon Indian shores;
Whate'er delights the eye, or charms the sense,
The vallies with perpetual fruitage blest,
The mountains with unfading foliage drest.
* * *
He those barbaric palaces had seen,
The work of Eastern potentates of old;
And in the Temples of the Rock had been
Awe-struck their dread recesses to behold;
A gifted hand was his, which by its skill
Could to the eye pourtray such wondrous scenes at will."

রোমাণ্টিসিজমের কবিদিগের রচনায় পৃথিবীর দূরতম স্থানের অধিবাসীদের সামাজিক অবস্থার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমেরিকার কৃষ্ণবর্ণ আদিম জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া তুরস্ক, মধ্য আসিয়া, আরব দেশ ও আফ্রিকার অন্তর্গত নানা স্থানের নানা জাতির আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বিবিধ উপাদেয় তথ্য তাঁহারা মহাকাব্য, নাট্যকাব্য, গীতি-কবিতা ও বিবিধ শ্রেণীর পদ্যময় রচনায় নিপুণতার সহিত বুনিয়া দিয়াছেন। মানব-সমাজের যেখানেই এই কবিরা অত্যাচার ও উৎ-পীড়নের সংবাদ পাইয়াছেন, সেইখানেই তাঁহাদের কল্পনা

ছুটিয়া গিয়া নৃশংসতা ও হৃদয়হীনতার ফটো তুলিয়া আনিয়াছে। রোমাণ্টিসিজমের কবিদিগের হৃদয় যে কিরূপ সহানুভূতি ও সমবেদনায় পরিপূর্ণ ছিল, তাহা তাঁহাদের রচিত কাব্য-গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়। কোলরিজ ও ওয়ার্ডসোয়ার্থের কাব্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার অভাব রবার্ট সাদে অনেকটা পূরণ করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরাজ কবিরা মোগল ও ইংরাজের অধীনে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। বিদেশী বণিক তখন রাজনীতিকের বেশে এদেশে জাঁকিয়া বসিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে ইংরাজগণ এদেশে নিজেদের ধর্ম্ম ও সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ করিলে প্রবাসী ইংরাজ রাজনীতির সহিত সমাজনীতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বিদেশী বণিক যখন এদেশে সর্ব্বপ্রথম আগমন করেন, তখন তিনি জাঁকজমকময় মুসলমান সভ্যতার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বিজীত হিন্দুদিগের প্রাচীনতম সভ্যতা তখন তাঁহার দৃষ্টিতে পড়ে নাই। সংস্কৃত সাহিত্য বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে, তৎসম্বন্ধে বিদেশীরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। কবি সাদের কাব্য হইতে উদ্ধৃত শ্লোক পাঠে জানা যায় যে, ইংরাজ পাদরী হিবার ও প্রসিয়ান ধর্ম্মপ্রচারক সোয়ার্টজ্ (Schwartz) এদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। সাদে প্রবাসী ইংরাজ সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। সাদের সমসাময়িক কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা বিচারপতি ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত স্যার উইলিয়ম জোন্স (Sir William Jones) সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম সংক্রান্ত বহু তথ্য ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত করিয়া হিন্দুদিগের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে ইংরাজ কবির অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করিয়াছিলেন। রোমাণ্টিসিজমের কবি সাদে সেইজন্য হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিলেন। সাদে ইংরাজি ভাষায় সর্ব্বপ্রথম হিন্দুধর্ম্মমূলক মহাকাব্য রচনা করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। রাজকবি সাদে "কেহামার অভিশাপ" (The curse of Kehama) নামক চতুর্বিংশ সর্গে সমাপ্ত মহাকাব্যের মুখবন্ধে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি স্যার উইলিয়ম জোন্সের নিকট হিন্দু পুরাবৃত্তে লিখিত পৌরাণিক আখ্যানের জন্য অশেষভাবে ঋণী। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজ কবির রচিত এই মহাকাব্য বুঝিতে হইলে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার কি অভিমত তাহা জানা আবশ্যক।

'পৃথিবীতে যতগুলি মিথ্যা ধর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম সংক্রান্ত কথাগুলি অত্যন্ত বীভৎস ও হিন্দুরা তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাতে কার্য্যের ফল তাহাদের পক্ষে মারাত্মক হইয়া পড়ে। তবে, দেখা যায় যে, ইহার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। হিন্দুর চক্ষে পূজা, উপবাস ও দৈহিক ক্লেশ এবং পশুবলির মূল্য আছে, যদিও এই সকল কার্য্য যে উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়, তাহার মূলে সদিচ্ছার অভাব থাকিতে পারে। এই সকল কার্য্য করিলে দেবতারা মানুষকে বর না দিয়া থাকিতে পারেন না। দুষ্ট ব্যক্তি দুরভিসন্ধিতে এই সকল কার্য্য করিয়া এমন পরাক্রান্ত হয় যে, দেবতারা পর্য্যন্ত তাহার দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া পড়েন এবং শেষে বিষ্ণুকে বাধ্য হইয়া নরদেহ ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে হয়। হিন্দুদিগের এই প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া "কেহামার অভিশাপ" কাব্য রচিত। ইহা একটি মৌলিক আখ্যান এবং হিন্দু পুরাবৃত্তে লিখিত অন্যান্য পৌরাণিক কথার সহিত তুলনা করিলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুর নিকট ইহা সত্য বলিয়া মনে হইবে। পুরাণে বর্ণিত ব্রাহ্মণগণের অবয়ব অপেক্ষা অধিকতর কুৎসিত ও কাব্য-শিল্পের সৌন্দর্য্যের হানিকর কোনও কিছু কল্পনা করা যায় না। এই অসুন্দর দেহ কিন্তু হিন্দুর চক্ষের অন্তরালে পড়িয়া থাকে। তাহার কারণ, শতহস্তযুক্ত দেহ শক্তির স্থূল আকার মাত্র এবং দেবতার একাধিক মস্তক ভগবদ্গীতার মতে দৈবীশক্তির মূর্ত্তিমাত্র যাহা দৃশ্যমান জগতের সকল দিকেই প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে।' ইংরাজ পাঠকের বোধগম্যের নিমিত্ত কাব্যের মুখবন্ধে সাদে হিন্দু দেবতার একটি তালিকা দিয়াছেন। 'সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা; পালনকর্ত্তা বিষ্ণু ও সংহার-

কর্ত্তা শিব। ব্রাহ্মণগণের ইহারাই ত্রিমূর্ত্তি (Trimourtee or Trinity)। এই ত্রিমূর্ত্তির ব্যাখ্যার জন্য রূপকের সৃষ্টি, রূপকের খাতিরে ত্রিমূর্ত্তিকে কল্পনা করা হয় নাই। ব্যক্তিত্ব হিসাবে এই তিনটি দেবতা বিভিন্ন প্রকৃতির, এই ধারণা হিন্দুদিগের মধ্যে প্রবল। শেষোক্ত দুইটি দেবতার পরস্পর-বিরোধী উপাসক সম্প্রদায় আছে। শিবোপাসকের দলই প্রবল আর এই কাব্যে শিবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এই দেবতার নাম ইংরাজগণ Seeb, Sieven, Siva, ফরাশিরা Chiven ও পর্ত্তুগীজেরা Xiven এইরূপ বানান করিয়া থাকেন, এবং য়ুরোপীয় লেখকেরা কখন কখন তাঁহাকে Eswara, Iswaren, Mohadeo, Mohadeva ও Rutren নামে অভিহিত করেন। তাঁহার ১০৮ নামের মধ্যে লেখকবিশেষের নিকট তিনি ভারতের যে প্রদেশে যে নামে পরিচিত সেই নামে তিনি অভিহিত হইয়াছেন।” সাদে কাব্যের অন্যান্য পাত্র পাত্রীদের নামের পরিবর্ত্তে আরও কতকগুলি দেবতার ও উপদেবতার নামোল্লেখ করিয়াছেন, যথা—স্বর্গের রাজা ইন্দ্র, নরকের রাজা ও মৃতের বিচারকর্ত্তা যম, পর্য্যটকদিগের রক্ষাকারী গণেশ, অমরগণের পিতা কশ্যপ, অসুরগণ ও গন্ধর্ব্বগণ। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের উপাস্যা দেবী মরিয়াতলী (Marriataly)। এই মরিয়াতলী ত্রেতায় পরশুরামের মাতা ছিলেন। পুত্র কর্ত্তৃক নিহতা হইবার পর তিনি উপদেবতাদিগের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। সাদে বলেন যে, মরিয়াতলী সম্বন্ধে এই জনশ্রুতি ভারতের কোনও কোনও স্থানে হিন্দুরা বিশ্বাস করে। ইংরাজ কবি সাদে “কেহামার অভিশাপ” কাব্য রচনা করিবার জন্য যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে এই প্রকার জনশ্রুতি ব্যতীত, বার্ণিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিত পশ্চিম ভারতের হিন্দু সমাজে স্ত্রীগণের সহমরণ প্রথা, কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে বর্ণিত কশ্যপ মুনির আশ্রমের দৃশ্য, হিন্দুদিগের স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা, তপস্যার ফলে দৈত্যগণের বর লাভ ও পরে দেবতাদিগের সহিত তাহাদের যুদ্ধ ও হিন্দু পুরাতত্ত্বমূলক নানা ঘটনার তিনি সমাবেশ করিয়াছিলেন। ইংরাজ কবির কল্পনা হিন্দুদিগের স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালের খবর লইয়া যে মহাকাব্য রচনা করিয়াছে তাহার তুলনা ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যে বিরল। সর্ব্বোপরি হিন্দু সমাজ ও ভারতের বাহ্য-প্রকৃতির চিত্রাবলী বিদেশী কবি যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই মহাকাব্যে শুধু দেবতাদিগের কার্য্যাবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। ইহাতে যাহারা নরলীলার অভিনয় করিয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিগণের এস্থলে পরিচয় না দিলে পাঠক কাব্যের বস্তুসংক্ষেপ বুঝিতে পারিবেন না। সুবর্ণপুরের (City of Golden Palaces) রাজা কেহামা এই মহাকাব্যের নায়ক। তাঁহার পুত্র অর্ব্বালনের প্রেতাত্মা, অর্ব্বালনের পত্নীদ্বয় অজলা ও নলিনী, অর্ব্বালনের হত্যাকারী লড়ুর্লদ, তাহার অবিবাহিতা কন্যা কইলিয়া, এই কয়জন পাত্র পাত্রী ব্যতীত ব্রাহ্মণগণ, সৈনিকগণ, নাগরিকগণ ও অন্যান্য বহু অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি আছেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এই মহাকাব্য রচিত হয়। লড়ুর্লদ কেহামার পুত্র অর্ব্বালনকে হত্যা করিলে কেহামার অভিশাপে হত্যাকারীকে অরুন্তুদ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ইহাই এই মহাকাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। অধ্যাপক হারফোর্ডের (C. H. Herford) মতে উক্ত কাব্যের এই কয়টি মাত্র সূত্রের উপর কবির দীর্ঘকালব্যাপী প্রাচ্য-সাহিত্য অধ্যয়নের ফল ন্যস্ত হইয়াছে।

পতিতার ছেলে।

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(৮)

প্রভাতে তখনও গণেশের ঘুম ভাঙ্গে নাই। সবেমাত্র পূর্ব্ব গগন আরক্তিম করিয়া সূর্য্য উঠিতেছেন, তখনই যোগমায়ার সকল কাজ শেষ হইয়া গিয়াছিল। কাপড় কাচিয়া আসিয়া দেখিলেন, গণেশ তখনও ঘুমাইতেছে। তীব্র কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন, "গণেশ।"

ধড়ফড় করিয়া গণেশ উঠিয়া বসিল। দুই হাত চোখের উপর রাখিয়া সে একটু হাসিয়া বলিল, "এমন সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিলুম মা—"

যোগমায়া তেমনি তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা—আচ্ছা, রাখ এখন তোর স্বপ্ন। উঠে চল—এখনই তোর বাপের কাছে যেতে হবে তোকে।"

সে কথা গণেশ একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিল। হঠাৎ মনে পড়িতেই সে বিস্ফারিত চোখে যোগমায়ার পানে চাহিল।

যোগমায়া বলিলেন, "তাকিয়ে রইলি যে—চল বলছি, ওঠ শিগগীর।"

গণেশ আর দ্বিরুক্তি করিল না, উঠিয়া পড়িল। দেখিল যোগমায়া একটা বোঁচকার মধ্যে তাহার কাপড়, জামা, বই, ভাঙ্গা শ্লেট সব গুছাইয়া লইয়াছেন।

গণেশের চোখে জল আসিতে লাগিল, তথাপিও সে বলিতে পারিল না, সে যাইবে না। শুধু রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ও সব দিচ্ছ কেন, আমি কিছু নেব না।"

যোগমায়া বলিলেন, "কেন নিবি নে? তোর জিনিস রাখবার ভারী দায় পড়েছে আমার।"

গণেশ সহসা উদ্ধত ভাবে বলিয়া উঠিল, "আমার জিনিস কিসে, ও সব তো তোমারই। আমি কখনো নেব না কিছু।"

খানিকক্ষণ দীপ্ত চোখে তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া যোগমায়া বলিলেন, "না নিবি বেশ, আমার নেবার লোক আছে। মানকেকে দিলে সে বর্ত্তে যাবে'খন। যেমন কপাল তোর, চল ওই ঠেঁটি কাপড়খানা পরে।"

বোঁচকাটা সশব্দে তিনি গৃহের এক কোণে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। শ্লেটখানা যে সে আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল, সে দিকে তাঁহার খেয়াল রহিল না। গণেশের হাত ধরিয়া এক রকম প্রায় জোর করিয়া বাহিরে আনিয়া তিনি দ্বারে তালা লাগাইতেছেন, সেই সময় নিতাইয়ের মা একটা ডালায় করিয়া কতকগুলি তরকারী লইয়া উপস্থিত হইল। নিতাইয়ের মা জাতিতে চাঁই, তরকারী বেচিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কয়েকখানা টুকরা টুকরা জমি আছে, পুত্র নিতাই তাহা আবাদ করিয়া তরকারী পাতি লাগাইয়া থাকে। আর কয়েকটী গাই আছে, তাহার দুধ বিক্রয় করিয়াও ইহাদের দিন বেশ কাটিয়া যায়। ছোটলোক হইলেও ইহারা সাধারণ গৃহস্থের অপেক্ষা অনেক উন্নত। আমাদের মত অবস্থাপন্ন গৃহে অভিভাবকের মৃত্যু হইলে আমরা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়ি, কি করিয়া দিন চলিবে তাহা ভাবিয়া পাই না, কিন্তু ইহারা সেরূপ নহে। ইহাদের মধ্যে স্বাবলম্বন আছে, আমাদের মত ইহারা কি হইল ভাবিয়া মাথায় হাত দিয়া বসে না। আমাদের উদরে ক্ষুধা—পরণে বস্ত্র থাকে না, আমরা তবু নিজেরা নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারি না, পুরুষের উপর নির্ভর না করিলে আমাদের চলে না। ইহার প্রধান কারণ আমাদের শিক্ষা। আমাদের শিক্ষাই আমাদের অবনতির কারণ। আমরা অনাহারে মরিব—আত্মহত্যা করিব, তথাপি আমাদের শিক্ষাগত দোষ কাটিবে না। আমাদের সমাজ আমাদের যে ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে, যে ভাবে রাখিয়াছে, আমরা সেই ভাবে থাকিয়াই জীবন কাটাইয়া যাই। এ কথাগুলি ভাবিলে যথার্থই মনে হয় বটে, ছোটলোকের গৃহে জন্মানই উচিত ছিল, কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না, সমাজও এমন করিয়া

সামান্য সামান্য ত্রুটি ধরিয়া চোখ মুখ রাঙাইতে পারিত না।

যোগমায়া তাহার পানে চাহিতেই সে হাসিয়া বলিল, "এই যে মা—সেদিন খোকাবাবু, কাঁকরোল খেতে চেয়েছিলেন, আজ তাই নিয়ে আসছুম। আর এই শাক—"

বাধা দিয়া যোগমায়া বলিলেন, "ও সব নিয়ে যা নিতাইয়ের মা—আজ আর কিছু লাগবে না।"

গণেশের পানে চাহিয়া ধমক দিয়া বলিলেন, "হাঁ করে দেখছিস কি—আয় না।"

নিতাইয়ের মা বলিল, "কোথায় যাচ্ছেন এত সকালে মা?"

যোগমায়া বলিলেন, "একে এর বাপের কাছে দিতে যাচ্ছি।"

আশ্চর্য্য হইয়া নিতাইয়ের মা বলিল, "মজুমদার মশাই তো? তিনি কি এ ছেলেকে নেবেন?"

ঝাঁঝের সঙ্গে যোগমায়া বলিলেন, "তা আমি কি জানি? আমারই বা এত দায় কিসের যে এই ছেলেকে রাখব? আমি দিয়ে আসি গে যাই, ইচ্ছে হয় রাখুক, না ইচ্ছে হয় দূর করে তাড়িয়ে দিক—বয়েই গেল তাতে আমার। আমি তো সকল দায় হ'তে এড়ান পাব?"

নিতাইয়ের মা বলিল, "তা বটে মা, আপনাকে কি কম যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে একে নিয়ে। কিন্তু যদি তাড়িয়ে দেয়, তা হ'লে তো আবার আপনারই কাছে আসবে।"

গণেশের পানে সরোষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া যোগমায়া বলিলেন, "তা বই কি—আবার আমার কাছে আসবে? পথ হ'তেই দূর করে দেব। আবার হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কি—আয় বলছি।"

নিতাইয়ের মা বালকের শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "কিছু খেতে দেন নি মা?"

তাহার হৃদয়টাও বিগলিত হইয়া উঠিয়াছিল। যোগমায়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কি খেতে দেব আবার? অমনিই চলুক—আর খায় না। বাপের কাছে, সৎমায়ের কাছে থাক গে যাক।"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নিতাইয়ের মা ঝাঁকা মাথায় লইয়া চলিয়া গেল।

যোগমায়া বিহ্বল গণেশের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে অনেক লোকের সহিতই দেখা হইল, কাহারও পানে তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না। বর্ষীয়সী মতির মা কালকের কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই, তাই নিজেই অন্য দিনের মত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিগো গণেশের মা—কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

অনেকে যদিও তাঁহাকে গণেশের মা বলিয়াই ডাকিয়া থাকে, তথাপি আজিকার সম্বোধনটা যোগমায়াকে যেন চাবুকাঘাত করিল। তাঁহার মনে হইল, তিনি যে আজ গণেশকে জন্মের মতই ত্যাগ করিতে যাইতেছেন, তাহা ইহারই মধ্যে সমস্ত গ্রামখানায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং সকলেই তাঁহাকে আজ গণেশের মা নামে ডাকিবার তীব্র আনন্দটা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র। হটাৎ শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "গণেশের মা আবার কে? গণেশ কি আমার দুলাল নাকি? মর পোড়ারমুখো ছেলে—হতভাগা কোথাকার—"

নির্দ্দোষী গণেশের পৃষ্ঠে অকস্মাৎ গোটাকত কীল চড় কসাইয়া তিনি তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। গণেশ একটা নিশ্বাস ফেলিল মাত্র, চোখের জল তাহার শুখাইয়া গিয়াছিল, মুখের কথাও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

অবিনাশ মজুমদার তখন দ্বিতীয় পক্ষের একটী ছেলেকে কোলে ও অপরটীর হাত ধরিয়া সবেমাত্র বাটীর বাহির হইতেছিলেন। একটা দমকা বাতাসের মতই যোগমায়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া পড়িলেন—"এই নাও গো তোমার ছেলে, আমাকে সকল যন্ত্রণার হাত হ'তে রেহাই দাও।"

যোগমায়ার পিত্রালয় অবিনাশ মজুমদারের বাটীর পাশেই ছিল। অবিনাশ যোগমায়াকে দিদি বলিয়া ডাকিতেন। গণেশকে যোগমায়া গ্রহণ করা অবধি অবিনাশ আর সেদিকে যাইতেন না, নচেৎ প্রায়ই যোগমায়াকে দেখিতে যাইতেন।

হটাৎ যোগমায়া যখন গণেশকে তাঁহার দিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন, তখন অবিনাশ একেবারে চমকাইয়া তিন হাত পিছনে সরিয়া গেলেন—"দিদি—"

তীব্র কণ্ঠে যোগমায়া বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ আমিই বটে, তোমার ছেলেকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিতে এসেছি।"

"আমার ছেলে?" অবিনাশের দুই চোখ দীপ্ত হইয়া উঠিল।

দৃঢ় কণ্ঠে যোগমায়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমারই ছেলে। তোমারই ঔরসজাত ছেলে। পতিতার গর্ভে জন্ম নেয়নি, তোমার স্ত্রীর গর্ভেই জন্ম নিছিল। তোমাকে বাপ বলে ডাকবার এর সম্পূর্ণ দাবী আছে। সমাজের দিকে চেয়ে নয়—তোমার এ পুত্র কন্যা বা স্ত্রীর পানে চেয়ে নয়,—আকাশের পানে চেয়ে বল, এ যথার্থ তোমার ছেলে কি না? তুমি একে গ্রহণ করতে বাধ্য কি না?"

অবিনাশ একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আমি তো একে গ্রহণ করতে পারব না দিদি। জানোই তো ধর্ম্মের চেয়ে সমাজ বড়?"

"সমাজ বড় ধর্ম্মের চেয়ে?" যোগমায়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"তাই তুমি স্বীকার করছ? এই লক্ষ লক্ষ কুসংস্কার নিয়ে যে সমাজ সৃজিত হয়েছে, সেই সমাজ ধর্ম্মের চেয়েও বড়? সমাজ ধর্ম্মের জন্য—না ধর্ম্ম সমাজের জন্য সৃজিত হয়েছে? তোমরা সমাজের বুকে যা ইচ্ছে তাই অত্যাচার করবে, নতুন নতুন সংস্কার এনে সমাজকে গেঁথে তুলবে, আর বলবে, সমাজ ধর্ম্মের চেয়েও বড়? এমন সমাজ রসাতলে যাক—এ সমাজের নেতারা জন্ম জন্ম এর শাস্তি ভোগ করুক।"

অবিনাশ থতমত খাইয়া বলিলেন, "না, তা আমি বলছিনে। তবে আজকাল হচ্ছেও তো তাই দিদি। লোকে লুকিয়ে যা না তাই করছে, ধর্ম্মকে ভয় করছে কে? সমাজ যাতে না জানতে পারে তারই চেষ্টা। মানে হচ্ছে কি—সমাজটা আমাদের মাথার—"

বাধা দিয়া যোগমায়া বলিলেন, "যথেষ্ট হয়েছে। সমাজটা তোমাদের ছাতা স্বরূপ রয়েছে তাই বলতে চাচ্ছ তো? এযে ভাঙ্গা ছাতা—এর মধ্যে এ রকম করে সকলে মিলে জড়াজড়ি করে রোদে পোড়া—বৃষ্টিতে ভেজার চেয়ে বেরিয়ে পড়ে নতুন ছাতার চেষ্টা করা ভাল। আমাদের সমাজ বিদেশবাসীর কাছে ঘৃণিত কেন—সত্য বলে' আজ কাল যাঁরা পরিচিত আছেন, তাঁদের কাছেই বা ঘৃণিত কেন? তোমরা মুখে আস্ফালন করতে চাও অথচ ভাঙ্গা ছাতার বার হ'তে যে তোমাদের ঘরের সব খবর বেরিয়ে পড়ছে। তোমাদের সমাজ হয়েছে আজকাল একটা খেলার জিনিস। তোমাদের যার যা মনে হচ্ছে—তাই দিয়ে তোমরা একে আরও এমন বিচিত্র ভাবে সাজাচ্ছ যা ভাবতে গেলে হাসি সামলান দায় হয়ে ওঠে। নতুন ভাবে এ সমাজ গড়ে তোলবার চেষ্টা করা দূরে থাক, তোমরা একে আরও রং মাখাচ্ছ। সেদিন যে রায় মশাইকে সমাজচ্যুত করা হ'ল—তার মানেটা কি?"

কুণ্ঠিত ভাবে অবিনাশ বলিলেন, "তার মানে ঢের আছে।"

যোগমায়া দীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, "ঢের যা আছে, তা আমিও জানি। তাদের বাড়ীর মেয়েরা তোমাদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারে না, তারা একটু লেখা পড়া জানে, দেশ বিদেশের খবর রাখে, তোমাদের মেয়েদের মত অনাবশ্যক কারও চরিত্রের দোষ খুঁজে বেড়ায় না—এই তো?"

উত্তেজিত ভাবে অবিনাশ বলিলেন, "শুধু তাই নাকি? সে বাড়ীর মেয়েদের লজ্জা নাই; মেয়েদের মুখে যে ঘোমটা দেওয়া প্রথা, তারা তা মানতে চায় না। আবার হার্ম্মোনিয়ম বাজিয়ে গান করা; বলতে পারো—কোন্ ভদ্রলোকের মেয়েরা এ রকম করে থাকে?"

যোগমায়া বলিলেন, "এটা তা হ'লে বড়ই দোষের কথা—না? তাঁদের বাড়ীর মেয়েরা যদি যথার্থই এ রকম শিক্ষিতা হ'তে পেরে থাকেন—আমি সত্যিই তাতে বড় খুসি হব। ঘোমটা না খুলতে পারলে—জেনো, তোমাদের সমাজ উঁচু হ'তে পারবে না। সমাজকে গড়ে তুলতে যেমন পুরুষেরও দরকার, তেমনি মেয়েদেরও দরকার। শুধু এক হাতে যদি কাজ হতো, তা হ'লে তো বাঁ হাতটাকে নামাবার কোন দরকারই ছিল না। কাজ করতে গেলে ডান হাতটাকে যেমন মুক্ত করে রাখতে হবে, বাঁ হাত খানাকেও তেমনি মুক্ত করা চাই। এতখানি ঘোমটা

টেনে বেরিয়ে লোকের মনে কৌতূহল জাগিয়ে তোলার চেয়ে ঘোমটা খুলে ফেলাই ভাল। আর গানের কথা বলছ? সেটাও তো শিক্ষা বটে। শ্রেষ্ঠ শিক্ষা সেই। কেন গান করবে না? তোমাদের সব অধিকার থাকতে পারে, তাদের মধ্যে সেটা থাকতে পারবে না? তারা কি এমনি করেই বিধিবদ্ধ হয়ে এসেছে?"

অবিনাশ একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তোমার মতের সঙ্গে মিলতে পারে দিদি, আমাদের মেলে না। তাই তো—"

যোগমায়া বলিলেন, "তাই স্ত্রীকে লাথী মেরে তাড়িয়ে দিয়েছ। তুমিই তো তাকে অধঃপাতে দেবার কারণ। দিনরাত যদি মানুষকে ত্যক্ত বিরক্ত করা যায়, কত সে সহ্য করতে পারে? তোমার লাথী খেয়েই সে বেরিয়ে পড়ল, গায়ে মুখে নিজের হাতে পাপের কালি মাখলে। তার পরে যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলে, তখন তোমার কাছে সে কেঁদে এসেছিল—স্ত্রী বলে নয়, দাসী বলে; একটু জায়গা দাও, তোমার ছেলে তুমি ফিরিয়ে নাও। এই সমাজের পানে তাকিয়ে তুমি আবার তাকে লাথি মারলে, আবার সে পথে ভাসতে লাগল। তোমরা চাও নিজের সুখ—তাই মেয়েদের একেবারে আড়াল করে রাখতে চাও। তোমাদের ভয় হয় পাছে তারা তোমাদের পাশে কোনও দিন এসে দাঁড়ায়, তারও যে অধিকার আছে সংসারে—সেটা পাছে তারা জেনে ফেলে, তা হ'লে তোমাদের অত্যাচারগুলো সইবে কে?"

অবিনাশ মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যোগমায়া বলিলেন, "থাক্, আর আমি কিছু বলতে চাইনে, তোমার ছেলেকে তুমি নাও, আমায় রেহাই দাও।"

অবিনাশ বলিলেন, "তোমার কাছেই তো বেশ ছিল দিদি—আবার—"

যোগমায়া বাধা দিয়া বলিলেন, "আমার এমন কিছু কথা নেই যে তোমার ছেলেকে আজীবন আমায় পুষতে হবে। নেহাৎ ছেলেমানুষ ছিল, মানুষ করে দিয়েছি। চাকরের মত রেখে দাও, মাইনে বেঁচে যাবে। যদি বেশী সমাজের ভয় কর, না হয় ঘরে দোরে উঠতে দিয়ো না।"

অবিনাশ অনিচ্ছার সঙ্গে বলিলেন, "থাক তবে।"

যোগমায়া ফিরিতেছিলেন, গণেশ একবারমাত্র রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "মা।"

যোগমায়া চাহিয়া দেখিলেন, তাহার চোখ দিয়া অশ্রু-বান ছুটিয়াছে। যোগমায়া আর চাহিলেন না—দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

(৯)

অবনী বাবু যখন জানিতে পারিলেন যোগমায়া গণেশকে জন্মের মত তাহার পিতার নিকট দিয়া আসিয়াছেন, তখন আনন্দে তাঁহার বুকটা ভরিয়া উঠিল। স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো, শুনছো, আমাদের মাণ্কার কপাল বুঝি ফিরল এবার।"

স্ত্রী তাড়াতাড়ি রন্ধনগৃহ হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "কি হয়েছে, ছোঁড়াটা মরেছে নাকি?"

অবনী বাবু বলিলেন, "সে একরকম মরারই মতন। বড় বউ তাকে তার বাপের কাছে জন্মের মত রেখে এসেছে। আমি এই বেলা মাণকাকে নিয়ে যাই। ছেলেটা গেল কোথায়? তাকে জামাটা পরিয়ে দাও, আর বেশ করে শিখিয়ে পড়িয়ে দাও, যেন কেঁদে কেঁদে বেশ করে কথা বলে।"

সপ্তম বর্ষীয় বালক মাণিক তখন বাগানে বসিয়া মায়ের সদ্যপ্রস্তুত কুলের আচার ধ্বংস করিতেছিল। ছেলেটা কাপড় পরিতে তত ভাল বাসিত না, উলঙ্গ অবস্থাটাই বেশী পছন্দ করিত। ইহাতে অবনী বাবুরও অনেকটা খরচ বাঁচিয়া যাইত। আজকাল যে কাপড়ের দাম—বাপরে, গোষ্ঠীশুদ্ধ সকলের কাপড় কিনিতে গেলে তিনি যে একটী দিনেই দেউলিয়া হইয়া পড়িবেন।

স্ত্রী খুঁজিয়া খুঁজিয়া মাণিককে গিয়া ধরিলেন। মাকে দেখিয়াই ছেলের চক্ষু কপালে উঠিল, এবং প্রহার হইতে পিঠ বাঁচাইবার মতলবে আগেই কাঁদিতে আরম্ভ করিল—"আমি নেই নি, খুকি দিয়েছে।"

অনর্থক এখনই চোখের জলগুলা ব্যয় করা দেখিয়া মা ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তা খেয়েছিস বেশ করেছিস। এখন শিগ্গির করে আয় দিকি নি, একটা জায়গায় যেতে হবে।"

মাণিক তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বলিল, "কোথায় যাব মা?"

"তোর জেঠিমার কাছে"—বলিয়া মা তাহার হাত ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া তাড়াতাড়ি গা মুছাইয়া দিয়া বাছিয়া বাছিয়া ছেঁড়া জামা একটা ও তেমনি শতছিন্ন একখানি কাপড় পরাইয়া দিলেন। ছেলেটী খুব আশা করিয়াছিল, যখন এত গা মুছানর ধুম, তখন নিশ্চয়ই পূজার এবারকার পাওয়া ভাল কাপড়খানা ও জামাটা পরিতে পাইবে। যখন দেখিল ছিন্ন জামা ও কাপড়ে তাহাকে সাজাইয়া দেওয়া হইল—তখন সে ঠোঁট ফুলাইয়া রহিল—একটাও কথা কহিল না।

মা তাহাকে—জেঠিমার গলা এমনি করিয়া ধরিয়া কাঁদ কাঁদ সুরে কথা বলিবার কথাগুলি এত শিখাইতে লাগিলেন যে, সে কিছুতেই কথা বলে না।

পিতা বলিলেন, "বল বাবা আমার। এই সব কথা বললে পরে জেঠিমার কাছে কত জিনিষ পাবে, কত ভাল ভাল কাপড় জামা জুতো দেবে জেঠিমা, ভাব্ না কি? বল বাবা—মাণিক আমার—"

মাণিক হর্ষোৎফুল্ল মুখে বলিল, "সত্যি দেবে?"

পিতা বলিলেন, "দেবে বই কি।"

মায়ের পানে চাহিয়া মাণিক বলিল, "বল তবে কি বলতে হবে। বেশী কথা বলো না কিন্তু—দুটো চারটে।"

মাতা কাঁদ কাঁদ সুরে আবার কথা বলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মাণিকও বলিল—কিন্তু সে রকম সুরেরই বড় অভাব। পিতা মাতা একঘণ্টা ধরিয়া তাহাকে কাঁদ কাঁদ সুর-শিক্ষা দিলেন, কিছুতেই সে সুর তাহার আসিল না, মুখস্থ করা কথা কয়টাই মাত্র সে গড়-গড় করিয়া বলিয়া গেল।

অত্যন্ত রাগত হইয়া মা বলিলেন, "মার ঝেঁটা মুখে ছেলের। একটা চড় মারলে এখনি কান্নার চোটে বাড়ী অস্থির হয়ে উঠবে, চোখের জলে বুক ভেসে যাবে, এমনি একটা তুচ্ছ কথা, তাই বলতে মরছেন। এর চেয়ে খুকিটা বেশ বলতে পারে। লোকের কাছে কাতরে যা চায়, লোকে আর না বলতে পারে না। আর এ হাতীকে যদি শিখাব—হাতী গিয়ে বলবেন ওই—তোর ও জিনিষটে আমায় দে দিকিনি। লোকে অমনি দূর দূর করে তাড়ায়। কি কথারই ছিরি ছেলের, না আছে মিষ্টি—না আছে কিছু।"

সুপুত্র পাছে আবার বিগড়াইয়া যায়, সেই ভয়ে পিতা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "থাক থাক, ওতেই 'হবে'খন। চল বাবা আমার—মাণিক আমার।"

পিতার হাত ধরিয়া পুত্র বাহির হইল।

যোগমায়ার এ কয়টা দিন যে কি ভাবে কাটিয়াছে তা বলিবার উপায় নাই। দিনগুলা এত দীর্ঘ হইয়া আসে যে মোটে তাহা কাটানো যায় না। তিন বৎসরের অভ্যাসগুলি তাঁহাকে একেবারে জড়াইয়া ফেলিয়াছিল। প্রতিদিন ঘুম ভাঙ্গিয়াই তিনি পাশের দিকে চান। শূন্য শয্যা যে—তাহার অধিকারী কই। গৃহতলে, প্রাঙ্গণে, বাগানে, সব স্থানেই তাহার হাতের চিহ্ন। চারিদিক হইতে অবিরত একটা হাহাকার উঠিয়া যোগমায়াকে ক্রমশঃই তাহার মধ্যে ডুবাইয়া ফেলিতেছে। বাহিরে যতদূর শূন্যতা—মনে তাহার চেয়েও বেশী। যোগমায়ার মধ্যে যে ছিল—সে আর্ত্তকণ্ঠে এমন করিয়া কাঁদিতেছে যে, যোগমায়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন, কিছুতেই তাহাকে থামাইতে পারিতেছেন না।

আজ যোগমায়া সবে মাত্র আহারে বসিয়াছিলেন, সেই সময় তেনার মা আসিয়া বলিল, "আহা মা—ছেলেটাকে কেন দিলেন তার বাপের কাছে? আপনি যদি বলতেন, আমিই যে তাকে নিতুম। আপনি সমাজ না নিয়েও তো বেশ কাটাচ্ছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত যে করবেন, তাতে লাভটা কি হবে আপনার বলুন তো? এমন সমাজে উঠেই বা কি ফল? আহা! ছেলেটা বড় ভাল গো—বড় ভাল।"

বিবর্ণ মুখে যোগমায়া বলিলেন, "কেন—কি হয়েছে তার?"

তেনার মা বলিল, "আহা, মজুমদার মশাই এমন করে মারে তাকে যে কি বলব! আজ বুঝি ছোট খোকা তার কোল হ'তে পড়ে গেছল, তাইতে মজুমদার মশাই তাকে

যা মারটা মারলে! আমি ঠিক জানছি, এমনি করে মার খেতে খেতেই কোন্ দিন প্রাণটা তার বেরিয়ে যাবে। আজকের মারে ওর জ্বর যদি না আসে তো কি বলেছি আমি। আহা—ওই পথটায় পড়ে পড়ে কাঁদছে, ভয়ে এদিকে আসতেও পাচ্ছে না। কাল রাতে খেতে পায় নি, আজ এতখানি বেলা হয়েছে তবুও খেতে পায় নি।"

যোগমায়ার মুখটা সাদা হইয়া গেল। একগ্রাস ভাত সবেমাত্র মুখে উঠাইতেছিলেন, তাহা নামাইয়া রাখিলেন। ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "তাকে ডেকে নিয়ে আয় তেনার মা—ডেকে নিয়ে আয়। আমি তো মরিনি এখনও, আমি তো বেঁচে আছি।"

তাঁহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তেনার মা গণেশকে ডাকিতে ছুটিল, যোগমায়া পাতের কাছে তেমনিই আড়ষ্ট ভাবে বসিয়া রহিলেন।

খানিক পরে তেনার মা শুষ্কমুখে একা ফিরিয়া আসিল। উদ্বেগ পূর্ণ কণ্ঠে যোগমায়া বলিলেন, "সে কই?"

তেনার মা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তার বাপ এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। আপনি ডাকছেন শুনেই সে লাফিয়ে উঠে আসছিল; অত যে গায়ের ব্যথা, সব যেন তার দূর হয়ে গেল। ওই বাঁকটার মুখেই মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে দেখা। তিনি ঠাস ঠাস করে তার গালে দুটো চড় মেরে তাকে কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেলেন; আমি হাঁ করে তাকিয়েই রইলুম।"

যোগমায়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অমনিই উঠিয়া পড়িলেন। তেনার মা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "উঠছেন যে মা?"

"খাওয়া হয়ে গেছে" বলিয়া যোগমায়া আঁচাইয়া শয়ন গৃহে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন।

এত কষ্ট সহ্য করিতেছে সে! আহা—সেই নির্দ্দয় প্রহারে বুঝি সুকোমল দেহখানি ফাটিয়া কত রক্ত বাহির হইয়াছে! তবু সে তাঁহার কাছে আসে নাই, তাঁহার আদেশ সে প্রাণপণে পালন করিয়া চলিতেছে। তাহাকে কেন তিনি দিয়া আসিলেন? যে সমাজকে তিনি ঘৃণা করেন, সেই সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া তাঁহার কি লাভ হইবে? সে যে তাঁহাকেই মুক্তি দিবার জন্য নিজের মায়ের কৃত পাপের ফল নিজে ভোগ করিতেছে। কতদূর কষ্ট সে ভোগ করিতেছে, কি নিদারুণ অভিমানে তাহার কচি বুকটা ফাটিয়া যাইতেছে!

ও কি—ও কে কাঁদিয়া বলিতেছে, "তাড়াইয়া দিলি? ওরে রমণী, তুই না মা, তুই না তোর ওই বুকে তোর সন্তানকে চাপিয়া ধরিয়াছিস? আমি যে তোর মাতৃত্বের 'পরে বিশ্বাস করিয়া আমার ছেলেকে তোর হাতে দিয়া আসিয়াছি। ওরে মা—ওরে জগতের 'পরে স্নেহপ্রদায়িনী মা, তোর অপরিমেয় স্নেহও কি সীমাবদ্ধ? সে স্নেহও কি সমাজের পায়ে বলিদান দিলি তুই?"

কে রে—কে তুই অদৃশ্যা জননী, কোন্‌খান হইতে কথা বলিতেছিস? ওরে না না, যোগমায়া তাহাকে আনিবে, নিজের বুকের মধ্যে আবার তাহাকে রাখিবে, সে এ দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে চলিয়া যাইবে, সেখানে কেহ জানিতে পারিবে না সে পতিতার ছেলে। যোগমায়া মা, তাহার স্নেহ ফুরায় নাই।

যোগমায়া চোখ মুদিয়া পড়িয়া রহিলেন।

বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছিল। গঙ্গার ওপারে সূর্য্য হেলিয়া পড়িয়াছিল, তখনও যোগমায়া শয্যাত্যাগ করিলেন না।

"বড় বউ, ঘরে আছ?"

যোগমায়া বুঝিলেন দেবর আসিয়াছেন। কি অভিপ্রায়ে যে তিনি আসিয়াছেন তাহাও বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না। কাল প্রায়শ্চিত্তের দিন, যদি সেই সময়টাতে একেবারে নিজের ছেলেটীকে গছাইয়া দিতে পারেন—এই তাঁহার উদ্দেশ্য। যোগমায়ার হৃদয়খানা মুহূর্ত্তে তিক্ত হইয়া উঠিল, তথাপি মনের সকল বিরক্তির ভাব চাপিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "আছি ঠাকুরপো।"

হাসিমুখে ছেলের হাত ধরিয়া অবনী বাবু গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। যোগমায়া তাড়াতাড়ি একখানা আসন দিতে গেলেন, অবনী বাবু বলিলেন, "থাক আর আসন দিতে হবে না বড় বউ। ছেলেটা কেঁদে কেঁদে মরছিল, খাওয়া

নেই দাওয়া নেই, কেবল বলে জেঠিমার কাছে যাব। সকাল হ'তে বলছি যা, তা যদি কিছুতেই আসে। আমার সঙ্গে না আসলে ওর হবেই না।"

যোগমায়ার মুখে যে কথা শুনিবার তিনি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, সেরূপ একটা কথাও বাহির হইল না। যোগমায়ার মুখ যেন আরও অন্ধকার হইয়া উঠিল, যোগমায়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

অবনী বাবু পুত্রকে একটা টিপুনি দিয়া জনান্তিকে বলিলেন, 'বল'—পুত্র নীরব হইয়াই রহিল।

রুদ্ধ রোষে মনে মনে গর্জ্জিয়া—মুখে হাসি দেখাইয়া তিনি বলিলেন, "আজ কতকাল তোমার কাছছাড়া কি না, তাই সামনে দেখে লজ্জা হয়েছে, বুঝেছ কি না বড় বউ? আড়ালে গেলেই ওর মাকে, আমাকে একেবারে অস্থির করে তোলে, জেঠিমার কোলে যাব, জেঠিমার হাতের খাবার খাব। এইতো এসেছিস মাণকে, খাবার খেতে চাচ্ছিলি, খা এবার চেয়ে।"

খাবারের নামে ছেলেটার মুখ দিয়া জল পড়িত। সে জেঠিমার কাছে সরিয়া গিয়া আদরের সুরে বলিল, "খাবার দাও জেঠিমা, খিদে পেয়েছে।"

জেঠিমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। নিজের দেবরের কিছু আদায়ের জন্য নীচ বৃত্তি অবলম্বন করা দেখিয়া তিনি নিজেকেই বড় অপমানিত জ্ঞান করিয়া লজ্জা পাইলেন। বিষণ্ণ মুখে বলিলেন, "খাবার নেই। আর তো কোনও খাবার তৈরি করিনে। নিজে একবেলা ভাত খাই তাতেই কেটে যায়, জলখাবারের দায় হ'তে এড়িয়েছি।"

অবনী বাবু কুণ্ঠিত হইয়া নীরব রহিলেন। দেখিলেন, ভ্রাতৃবধূর সে হৃদয় আর নাই। মাণিককেও সে অনায়াসে ঠেকাইয়া দিল। একটু নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "শুনলুম কাল নাকি প্রায়শ্চিত্ত করবে তুমি? তা বেশ করছ এটা। ছেলেটাকে যে আপনিই দূর করে দেছ এটা বড় ভাল কথা। আচ্ছা, সত্যি কথা বল বড় বউ, আমি কি অনেক দিন হতেই এ কথাটা বলছিলুম না? যত গণ্ডগোল সব ঐ ছেলেটাকে নিয়ে। এই যে সেদিন নীলাম্বরের বাড়ীতে অতটা অপমান সহ্য করতে হ'ল, সবই তো সেই ছেলেটার জন্যে। বামনের ঘরের বিধবা তুমি, সমাজ আছে, ধর্ম্ম আছে, ও সব নিয়ে জড়িয়ে থাকা কি তোমার চলে? তা বেশ হলো, কাল প্রায়শ্চিত্তটা করে ফেল, পতিতার ছেলেকে ছোঁবার যে পাপটা সেটা কেটে যাক। আমি আমার ছেলে মেয়েগুলোকে তোমার হাতে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই। শুনলুম, গাঁয়ের সব লোকজনকে খাওয়াবে, দান ধ্যানও করবে—"

বাধা দিয়া শান্ত কণ্ঠে যোগমায়া বলিলেন, "আমি প্রায়শ্চিত্ত করবার কোনও দরকার দেখছিনে। আমি যে পাপ করেছি তা আমার মনে নিচ্ছে না। আমি ও বেলা তারিণী মুখুর্য্যের কাছে খবর পাঠিয়েছি প্রায়শ্চিত্ত করব না।"

অবনী বাবু যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেলেন, তাঁহার মনের গড়া আশা সব ভূমিসাৎ হইয়া গেল। মানুষ জলে পড়িয়া গেলে সাঁতার না জানিলে যেমন করিয়া চোখ কপালে তুলিয়া হাঁফাইয়া উঠে, তিনিও তেমনি করিয়া হাঁফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত করবে না?"

যোগমায়া তখনি শান্ত ভাবে বলিলেন, "না।"

কঠিন ভাবে অবনী বাবু বলিলেন, "তা হ'লে স্পষ্ট বলে ফেল যে সেই জারজ ছেলেটাকে তুমি ছাড়তে পারবে না। তুমি তাকে আবার তোমার কাছে আনবে তো? যদি তাই করতে ইচ্ছে তোমার, তবে এতটা কাণ্ড না করলেই পারতে। তাকে তার বাপের কাছে দেওয়া, প্রায়শ্চিত্ত করবে বলে সকলের পায়ে পড়া—"

দীপ্ত হইয়া যোগমায়া বলিলেন, "আমি মেয়ে বটে ঠাকুরপো, তবু দুর্ব্বলা নই। বোধ হয়—বোধ হয় কি নিশ্চয়ই—তোমাদের চেয়ে বেশী সাহস আছে আমার। সমাজকে আমি অনায়াসে ঠেকিয়ে রাখতে পারি। সমাজের পায়ে আমি কখনও আমাকে লুটিয়ে ফেলব না, এই আমার প্রতিজ্ঞা। আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইনি ঠাকুরপো, তোমাদের সমাজই আমার খোসামোদ করছে। জানিনে তখন আমার মনটা কি রকম অবস্থায় ছিল, তাই আমিও রাজি হয়েছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি সমাজে

আমার না যাওয়াই উচিত। আমি কি পাপ করেছি যার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে? আমি যদি বুঝতুম পাপ করেছি, নিজেই প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্যস্ত হতুম। কিন্তু না, আমি যখন পাপ করিনি তখন কিছুতেই আমি প্রায়শ্চিত্ত করব না—কিছুতেই না।"

অবনী বাবু রুদ্ধ রোষে বলিলেন, "এখনও তোমার রক্তের তেজ আছে বড় বউ, কিন্তু যখন রক্তের তেজ কমবে—যখন মরণ কাছে এগিয়ে আসবে, তখন কি করবে?"

যোগমায়া একটু হাসিয়া তখনি গম্ভীর হইলেন—"সে ভয় আমি করি নে ঠাকুরপো। আমি বেঁচে থাকতে তোমরা আমার কতদূর কষ্টের অবসান করবে তা আমি অনেক দিন আগেই বুঝতে পেরেছি। তোমাদের এই দায়টা হ'তে মুক্তি দিতে চাই আমি—যেন আমার সেবা তোমাদের না করতে হয়। মরলে পরে আমার দেহ পচুক, শিয়াল কুকুরে খাক, তাতে আমার কিছু এসে যাবে না। যদি রোগশয্যায় পড়ে একাকীত্বের কষ্ট অনুভব করি, মনকে এই বলে প্রবোধ দেব, আমি একটী অনাথা দুখিনীর অনাথ শিশুকে গ্রহণ করেছিলুম, তারই ফল এটা। তবু আমি নুইব না ঠাকুরপো, নিজের দৃঢ়তার মধ্যে অটুট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব।"

অবনী বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন—"আয় মাণকে—বাড়ী চল।" যোগমায়ার পানে ফিরিয়া বলিলেন, "কাজটা কিন্তু ভাল করলে না বউ; সমাজ এখনও তোমায় নিতে চাচ্ছিল, এর পরে তুমি কেঁদে তার দুয়ারে সাত দিন ধন্না দিলেও সে তোমার পানে চাইবে না।"

গর্ব্বিতা যোগমায়া বলিলেন, "সে ভয় নেই ঠাকুরপো। এ সমাজকে সে জয়ের দিনের সুযোগ আমি কখনই দেব না, এ আমার প্রতিজ্ঞা। মৃত্যু পর্য্যন্ত আমি লড়ব—হটব না। যদি এর মধ্যে নতুন কোনও সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব হয়—কিন্তু না, হিন্দু সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিন আজও আসেনি। আমার মত অনেককেই সমাজের এই ছোট বড় সংস্কারগুলোর সঙ্গে লড়তে হবে। আমি শুধু এই ভেবে গর্ব্ব অনুভব করছি, ভগবান আমায় মেয়ে করে গড়েছেন, কিন্তু আমায় দুর্ব্বলা করে গড়েন নি। আমায় শক্তি দেছেন—মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস দিয়েছেন, তোমাদের মত নির্জীব করে সমাজের পায়ে ফেলে রাখেন নি।"

অবনী বাবু আর একটাও কথা কহিলেন না। মাণিকের হাত ধরিয়া গজ গজ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন।

ক্রমশঃ।

অনুরোধ।

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ]

আছে যত ধরণীর শোভা গন্ধ গান,
আছে যত ধরণীর প্রেম পূজা প্রাণ,
আছে যত ধরণীর পূর্ণিমার আলো—
সব আজ নিয়ে এসে প্রাণে মোর ঢালো।
হে মোর মানসী বধূ—কবিতা-সুন্দরী,
আমার জীবন উৎস দাও ভরি' ভরি'।
যৌবন-তটিনী যবে হবে ক্ষীণকায়া,
তোমার সৌন্দর্য্য দিয়া, দিয়া তব মায়া
রাখিও সতত তারে উদ্দাম উচ্ছল—
সে শুধু বহিয়া যাবে করি টল টল।
তুমিই ত একদিন প্রণয়িনী সম
সহসা উদয় হ'য়ে এ জীবনে মম
এনে দিয়েছিলে নানা দুর্ভাগ্য প্রমাদ—
যৌবনে আনিয়া দিলে জরার আস্বাদ।
আজ দাঁড়ায়েছি শেষ যৌবনের তীরে—
নেছ যাহা দয়া করে' দাও সব ফিরে।

বিভীতক।

[শ্রীগুরুদাস সরকার]

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'অর্চ্চনা'য় শ্রদ্ধাস্পদ কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন মহাশয় 'ত্রিফলা' বিষয়ক প্রবন্ধে বিভীতক বা বহেড়া সম্বন্ধে যে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতে ইহার অক্ষ, কলিদ্রুম, কলিযুগালয় প্রভৃতি বিভিন্ন নামের পরিচয় পাওয়া যায়। ভৈষজ্য গুণ হিসাবে যে এরূপ আখ্যা প্রদত্ত হয় নাই তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না, সুতরাং এই কয়টি নামের উদ্ভব যে কি প্রকারে ঘটিয়াছিল তাহা জানিবার জন্য স্বভাবতঃই কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়। মহাভারতের বনপর্ব্বে নলোপাখ্যান প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, কলি নিষধরাজ নলের দেহ পরিত্যাগ করিয়া একটি বিভীতক বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং কলির দুষ্ট প্রভাবে বৃক্ষটি শুকাইয়া যায়। নল অত্যন্ত অক্ষক্রীড়াসক্ত ছিলেন বলিয়া রাজ্য সম্পদ হারাইয়াছিলেন। তাঁহার দেহে কলি আশ্রয় লওয়ায় তাঁহাকে নানা দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল। কলি বলিতে আমরা এই পাপময় কলিযুগের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকেই বুঝিয়া থাকি, কিন্তু আশ্রয় লইবার এত স্থান থাকিতে তিনি বিভীতক বৃক্ষে লুকাইত হইলেন কেন? আচার্য্য সিলভাঁ লেভী তৎপ্রচিত নল দময়ন্তী গ্রন্থের পূর্ব্ব কথায় যে প্রকারে এই রহস্যের উদ্ভেদ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অপূর্ব্ব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় (La legende de Nala et Damayanti tradinte par Sylvain Levi, Editions Bossard, 1920, P. 12)। অক্ষক্রীড়ার উল্লেখ করিলেই, আমাদিগের হস্তী দন্ত নির্ম্মিত পাশকের কথা মনে পড়ে, কিন্তু অতি প্রাচীন কালে সকলেই কি এইরূপ ব্যয়সাধ্য পাশক ব্যবহার করিতে পারিত? শিল্পাদির বিশেষ উন্নতি হইবার পূর্ব্বে দ্যূত ক্রীড়াদি বহেড়ার ন্যায় কোনও কঠিন ফল লইয়া সংঘটিত হওয়াই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। এখনও দেখিতে পাই ইতর শ্রেণীর বালকেরা এই প্রকার হার জিতের খেলায় কলিকা ফুলের বীজ ('কাণ্ডেল') ব্যবহার করিয়া থাকে। আচার্য্য লেভী বলিয়াছেন, অতি প্রাচীন কালে বহেড়ার ফল লইয়া অক্ষ ক্রীড়া করা হইত। সে খেলার চারিটি দান ছিল—কলি, দ্বাপর, ত্রেতা ও কৃত। ইহার মধ্যে কলি সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট দান বলিয়া মানব কল্পিত চারিটি যুগের মধ্যে অপকৃষ্টতম যুগ 'কলি' নামে অভিহিত হইয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যের ভাবপ্রবণতা ফলে রূপকাদি বিষয়েও ক্রমে ক্রমে মানবধর্ম্ম আরোপিত হইয়া থাকে। কলিও এই প্রকারে রূপান্তরিত হইয়া, অক্ষক্রীড়ার 'দান' হইতে ইহ জগতের অপকৃষ্টতম যুগে পাপকলুষাদির মূর্ত্তিমন্ত বিকাশ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। আমাদের 'চৌপাড়' পাশকগুলি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট এবং বিলাতের জুয়া খেলার পাশটি ষট্ কোণ, কিন্তু তাই বলিয়া গোলাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি গাছের ফল লইয়া যে হার জিতের কোনও খেলা খেলা যাইতে পারে না এ কথা মোটেই স্বীকার্য্য নহে। ডাঃ সিলভাঁ লেভীর মতে স্তূপীকৃত বহেড়ার ফল হইতে একমুঠা তুলিয়া লইয়া 'দান' ফেলিলে ফলের সংখ্যা অনুসারে—অর্থাৎ সেগুলি ৪, ৩, ২, ১ এই সংখ্যা কয়টির দ্বারা বিভাজ্য কি না তাহা স্থির করিয়া দানের তারতম্য সহজেই নির্ণীত হইতে পারে।' এই প্রকার ক্রীড়ায় উত্তম, মধ্যম, মধ্যমেতর ও অপকৃষ্ট এই চারি শ্রেণীর 'দান' পূর্ব্বোক্ত সংখ্যা চতুষ্টয়ের সহিত বিশেষরূপ সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ যে পরিমাণ ফল হাতে উঠে, তাহা যদি চারিটি চারিটি করিয়া ভাগ করা যায়, তাহা হইলে 'দান' প্রথম শ্রেণীর, তিন তিনটি করিয়া ভাগ হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর, দুই দুইটি করিয়া ভাগ করা গেলে তৃতীয় শ্রেণীর, আর যদি এক একটি বই ভাগ না করা যায়, তাহা হইলে উহা চতুর্থ বা অপকৃষ্টতম শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। সাতটি বা এগারটি ফল উঠিলে উহা এক একটি করিয়া ভাগ করিতে হয়, সুতরাং সাত ও এগার শেষোক্ত দানের মধ্যে পড়ে। ফলগুলি গ্রহণকালে যে যত

তাড়াতাড়ি সংখ্যা নির্ণয় করিয়া লইতে পারে তাহারই জিতের তত অধিক সম্ভাবনা। ঋতুপর্ণ রাজা সহজাত সংস্কার বশেই হউক বা অভ্যাস ফলেই হউক, এক দৃষ্টিতে বৃক্ষের ফল ও পত্রাদির সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কবি-সুলভ অত্যুক্তি বাদ দিলেও ঋতুপর্ণ যে তৎকালে গণনায় অনন্যসাধারণ ক্ষিপ্রতা লাভ করিয়াছিলেন, এই আসল কথাটুকু অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখিনা। ঋতুপর্ণের নিকট তাঁহার গণনা প্রণালী শিক্ষা লাভের সুবিধা ঘটায় নলরাজাও যে এ বিষয়ে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। শিক্ষাগুণে এক লহমায় ফলগুলি গণিয়া লইয়া মুঠি মুঠি উঠাইয়া ফেলিতে পারিতেন বলিয়াই শেষে তিনি অক্ষক্রীড়ায় এরূপ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজ্যধন সমস্তই পুষ্করের কবল হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই প্রকার কোনও খেলা দেশমধ্যে সুপরিচিত হইয়া গেলে তাহার উত্তম 'দান' বাচক শব্দ নিচয় চলিত কথায়, এমন কি সময় সময় সাহিত্যেও স্থান লাভ করিয়া থাকে। পাশা খেলায় ব্যবহৃত 'পোয়াবারো' 'দান'টি ইহার একটি প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। কাহারও সময় ভাল হইলে আমরা বলিয়া থাকি, উহার এখন 'পোয়াবারো'। সুতরাং মানব যখন কল্পনাবশে তাহার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য, পুণ্য ও ইষ্টের আদর্শগুলি সুদূর অতীতে ঠেলিয়া দিয়া, কালের গতির সহিত পাপ ও দুঃখ বৃদ্ধি পাইয়াছে এইরূপ ধারণা করিয়া, চারিটি যুগ সৃষ্টি করিতে বসিয়া গেল, তখন যে সেই যুগগুলির নামকরণের জন্য অক্ষক্রীড়ার দানের নাম কয়টিই ব্যবহার করিয়াছিল, ডাঃ লেভীর এ অনুমান অজ্ঞাতপূর্ব্ব হইলেও নিতান্ত মনগড়া বলিয়া বোধ হয় না। অক্ষক্রীড়ার সহিত সম্পর্কশূন্য হইলে বিভীতক বৃক্ষের নামই বা অক্ষ হইবে কেন এবং বিভীতক বৃক্ষ যে কলির আশ্রয় সেই কলির প্রভাব বশে নলরাজাই বা এরূপ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিবেন কেন? আবার অক্ষের দানের সহিত যুগ চতুষ্টয়ের নামেরই বা এইরূপ আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য ঘটিবার কারণ কি? প্রতিপক্ষ অবশ্য শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পারেন যে, যুগ কয়টির নাম পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল এবং তাহাদের নামানুসারেই অক্ষক্রীড়ার দানগুলির নামকরণ হইয়া থাকিবে। এই সমস্যার বিচার ভার সুধী পাঠকবৃন্দের উপর অর্পণ করিয়া আমরা অদ্যকার মত বিদায় গ্রহণ করিলাম।

বেদনার সম্বল।

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন]

(১)

দীন-দরিদ্র, দুঃখ-দৈন্যে—কাটিছে শুধুই কাল,
নিঃস্ব আমি যে, বিরাট বিশ্বে চৌদিকে বাঁধা-জাল।
পেট-পূরে আমি খেতে নাহি পাই, ক্ষুধায় পীড়নে মরি!
তবুও যে আমি কষ্টে-সৃষ্টে—কিছু কিছু জমা করি।
জানি না আমার মনের বাসনা মনেই কেবল রবে,
এ মোর নীরব হিয়ার কামনা পূর্ণ কি কভু হ'বে?
তবুও আমি যে আশার পিছনে ছুটেছি বাঁধিয়া বুক,
—সে শুধু চাহিয়া ও যাদুমণির সুধা-চাঁদপানা মুখ।

(২)

সকল হৃদয় রঙীন্ করিয়া জাগিছে কত না আশা,
পরাণে পরাণে করি অনুভব, মুখে নাহি ফোটে ভাষা।
ভাবিতেছি আমি, যাদুমণি মোর মানুষ যখন হ'বে,—
দুঃখ-দৈন্য ঘুচে যাবে মোর—বুক-ভরা সুখ রবে।
জ্ঞান-সাগরের অতুল রতন লভিবে সে নিতি নিতি,
দশজন-মুখে শুনি' সুখ্যাতি—পাইব পরম প্রীতি!
মরু-মাঝে পাবো কল্প-তরু যে,—আশায় বেঁধেছি বুক,
—সে শুধু চাহিয়া ও যাদুমণির সুধা-চাঁদ-পানা মুখ।

বস্তীর বনে।

[শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল, বি-এল]

(ক)

রাজার মেয়ে সে; বিশ্বের সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারের সবটুকু সুষমা নিংড়ে যেন সেই মেয়েটীকে গড়ে বিধাতা জালন্ধর রাজের গৃহ উজ্জ্বল করতে পাঠিয়েছিলেন। বৃদ্ধ বয়সের পিতামাতার একমাত্র কন্যা ভ্রাতাদের স্নেহের সামগ্রী। বড়ই আদরে রাজ-অন্তঃপুর আলো ক'রে মূর্ত্তিমতী কমলার মত এই প্রেমপ্রতিমাখানি বেড়ে উঠেছিল। তার উজ্জ্বল হাসির ছটায় অন্তঃপুর মুখরিত হ'য়ে উঠত।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার সেই ভুবনভোলান রূপরাশির সৌরভ রাজ্যের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছিল। জালন্ধর রাজকন্যার রূপরাশি, সে কালের রাজবংশীয় যুবকদের মধ্যে যেন একটা যুগান্তর এনে দিয়েছিল, তার রূপরাশির খ্যাতি যেন তাদের একটা দৈনন্দিন চর্চ্চার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। 'কে জানে কোন্ রাজ্যের কোন্ রাজকুমার সৌভাগ্যের পশরা নিয়ে সেই দেবতার নির্ম্মাল্যটীকে বরণ করে মাথায় তুলে নেবে।'

পূর্ব্ব হ'তেই রাজকুমারী মেহেরার পাণিপ্রার্থী বহু উচ্চ রাজবংশীয় যুবকের দরখাস্ত জালন্ধর রাজদরবারে পেশ্ হ'তে সুরু হয়েছিল। কিন্তু বুঝি তাদের সমস্ত আশার প্রাসাদকে ধূলিগুঁড়ি করে দিয়ে রাজকুমারীর চোখের সামনে ভেসে উঠল—তাদের মৃত দেওয়ান-পুত্র অনঙ্গর সম্মোহন রূপরাশি। শৈশবে মেহেরা তাদের দেওয়ানের জীবিতাবস্থায় বহুবারই অনঙ্গকে দেখেছিল, কিন্তু সে যখন অধ্যয়ন শেষ ক'রে বহুদিন পরে তার অনুপম দেহকান্তির উপর যৌবনের সাঁজোয়া এঁটে তার সামনে এসে দাঁড়াল, ঠিক মূর্ত্তিমান অনঙ্গেরই মত,—রাজকুমারী মেহেরার চোখের পল্লব পড়ল না; তার ইন্দিবর-তুল্য নয়ন দুটী পল্লবগুণ্ঠনের মধ্য হ'তে সেই প্রতিভা উজ্জ্বল, স্বর্ণকান্তি মুখের উপর নিবাত, নিষ্কম্প শিখাটীর মত অচঞ্চল, স্থির হ'য়ে রইল। তার নারী জীবনের সঞ্চিত স্নেহ অনুরাগ সমস্ত যেন লুটিয়ে পড়তে লাগল, তার সেই দেবতার চরণতলে,—একটা রাগিণীর মূর্চ্ছনার মত। এম্‌নি কখন, কি ভাবে, কোন্ স্বপ্নময় তুলির মাঝখান দিয়ে যে এই দুটী তরুণ হৃদয় পরস্পরের কাছাকাছি হ'য়ে একটা অচ্ছেদ্য রঙিন ডোরে বাঁধা পড়েছিল, তা তারা নিজেরাই বুঝে উঠত না।

প্রভাতে যখন রাজকুমারী মেহেরা গগনস্পর্শী প্রাসাদের উন্মুক্ত ছাদের প্রান্তভাগে ব'সে তার সেতারটীতে ঝঙ্কার তুলে দিত, অদূরে নিচে একখানি ছোট্ট বাড়ীর একটী ঘরে ব'সে সেই ঝঙ্কারের মধ্যে অনঙ্গকুমার তার হাল্কা নবীন জীবনখানিকে ডুবিয়ে দিয়ে সেই উচ্চ প্রাসাদের পানে অনুরাগদীপ্ত চোখে চেয়ে থাকত, তার হাতের উপর উন্মুক্ত বইখানি হতাদরে পড়ে থাকত। রাজকুমারীর সেতার মুখর হ'য়ে ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে আকাশ ছেয়ে ফেলত, তার রেশটুকু প্রভাত বায়ুহিল্লোলে কাঁপতে কাঁপতে মুগ্ধ দেওয়ান পুত্রের মর্ম্মের মাঝে কেঁদে আছড়ে পড়ত। মধ্যাহ্নে অনঙ্গ যখন রাজকার্য্যে বহির্গত হ'য়ে প্রাসাদের পাশের রাস্তাটার উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যেত, সেই চারখানি ক্ষুরের শব্দ ব্যাপৃত মেহেরার কার্য্যের ধারাটীকে ওলোট-পালোট করে দিয়ে তাকে উন্মুক্ত বাতায়নপথে টেনে নিয়ে যেত। সেই বাদামী রঙ্গের উষ্ণীষের নিচে সেই দেবোপম মুখখানির দর্শন আশায় তার পিপাসু চোখ দুটী ব্যাকুল হ'য়ে উঠত। অনঙ্গ দেখত মুক্ত বাতায়ন পথে এক জোড়া দুর্লভ কালো চোখ দেবতার আশীর্ব্বাদী ফুলের মত কেমন করে তার দৈনন্দিন কার্য্যের প্রারম্ভটীকে মঙ্গলময় করে তোলে। সেই মিলিত মুগ্ধদৃষ্টির মধ্য দিয়ে পরস্পরের প্রাণ পান করে তারা যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে উড়ে যেত। সন্ধ্যায় আবার তেম্‌নি সেই বাতায়নতল দিয়ে রাজকুমারীর শুভেচ্ছার ভার বহন করে অনঙ্গ ঘরে ফিরত। অনঙ্গকে

বহন করে নিয়ে যখন তার ঘোড়াটা দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেত, রাজকুমারী অশ্রুসজল চোখে আকাশের সেই ম্লান রক্তচ্ছটার পানে চেয়ে ব'সে থাকত।

* * *

অনঙ্গকুমার পীড়িত; নিতান্ত নিরালা সে তার নির্জ্জন কক্ষে শয্যার উপর শুয়েছিল। কক্ষের বদ্ধবায়ুতে তার প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল। দীর্ঘ তিনটী দিন সে সেই ঈপ্সিত বাতায়নতল দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যায়নি, তিনটী দিন যেন তার প্রাণের মাঝে দীর্ঘ তিনটী যুগের ব্যর্থতা জড় করে দিয়েছিল! সে তার চোখ দুটী মুদিত করে তন্দ্রার ঘোরে ধ্যান করছিল, দুটী ইন্দিবরতুল্য নয়নের জ্যোতি—দুখানি রাজীব রক্তচরণের নূপুরনিক্কণ! সহসা বড় মধুর, বড় কোমল কণ্ঠে কে ডাকিল—"দেওয়ান পুত্র!"

স্বর বড় করুণ, বড় স্নেহার্দ্র! যেন দূরাগত একটা করুণ রাগিণীর মূর্চ্ছনা!

আজ তার সমস্ত সাধনা সফল করে দিতে কোন্ স্বপ্নরাজ্য হ'তে নেমে এল এই বিশ্ববিজয়িনী নারীপ্রতিমা! তার দেহ ঘিরে একটা রূপের হিল্লোল ঠিক্‌রে পড়ে সেই দীন দেওয়ান পুত্রের কক্ষখানি যেন আলোকিত করে দিলে। অসুস্থ অনঙ্গ ধ্যানস্তিমিতনেত্র দুটী উন্মীলিত করে অভিভূতের মত সেই অপূর্ব্ব রাজেশ্বরী মূর্ত্তির পানে চেয়ে রইল।

"কেমন আছ তুমি?"—বলতে বলতে রাজকুমারী স্নেহের বালিকা-সুলভ চপলতায় অনঙ্গর শয্যাপ্রান্তে ব'সে পড়ল।

অনঙ্গ সঙ্কুচিত হ'য়ে ত্রাস্তে শয্যার উপর উঠে বসল।

"রাজকুমারী?"—অনঙ্গর শুষ্ককণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এল। তার হৃদয়-দোলায় কে সঘনে দোল দিয়ে গেল,—দেহের সমস্ত রক্ত উত্তপ্ত হয়ে মাথার পানে ঠেলে উঠল,—দেহ মনে একটা প্রলয়ের ঝড় ব'য়ে গেল। অনঙ্গ ভাবছিল, "সফল তার সাধনা, তার বাঞ্ছিতের রাতুল চরণরেণুতে আজ তার দীন কুটীর পবিত্র,—সে ধন্য!" এমনি বলবার তার অনেক ছিল,—তার চিরবাঞ্ছিত রাণীকে অভ্যর্থনা করবার মত উচ্ছ্বাসও তার হৃদয়ে যথেষ্ট ছিল। ছিল না শুধু কণ্ঠে ভাষা! উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ অন্তস্তল উত্থিত দীর্ঘশ্বাসে পর্য্যবসিত হ'য়ে গেল।

"কেমন আছ তুমি?"—সহসা রাজকুমারী অনঙ্গর উত্তপ্ত ললাটে শীতল স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে "কেমন আছ তুমি?"

সেই একটী স্নেহস্পর্শে যেন অনঙ্গর জন্মজন্মান্তরের সমস্ত ব্যথাই মুছে দিলে,—সেই একটী স্নেহপ্রশ্নে তার মর্ম্মের গোপনতম প্রদেশটী সাড়া দিয়ে উঠল। পুঞ্জীকৃত প্রেমাশ্রু তার নয়ন কোণে উথলে উঠল। সে সজোরে দুহাতে বুকখানা চেপে ধরে শয্যার উপর লুটিয়ে পড়ল।

(খ)

নক্ষত্ররাজ্যের বুক হ'তে যখন ঈষদ্‌ম্লান পাঁশুটে রঙের যবনিকাখানি ধীরে ধীরে গুটিয়ে যেত, রাজকুমারী 'রঙ্গমঞ্জীলে'র হ্রদতীরে মর্ম্মরবেদীর উপর প্রতীক্ষায় ব'সে থাকত। মৌন সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকার উদ্ভাসিত করে তার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে একটা সৌন্দর্য্যহিল্লোল ছড়িয়ে পড়ত। অম্লান শতদলের মত রাজকুমারীর সুন্দর মুখখানির প্রতিচ্ছবি বুকে ধ'রে হ্রদবক্ষোত্থিত টুক্‌রো তরঙ্গগুলো যেন হাস্‌তে হাস্‌তে লুটিয়ে আছড়ে পড়ত। রাজকুমারী বিভোর হ'য়ে সেই নক্ষত্র খচিত হ্রদের বুকে সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রজাল রচনা দেখত। আশার সম্মোহন ছবি আঁকতে আঁকতে সৌন্দর্য্যের রাজ্যে ব'সে সৌন্দর্য্যের রাণী বাহ্য জ্ঞানলুপ্ত হয়ে পড়ত। সহসা কার পুষ্পময় আলিঙ্গনে নিষ্পেষিত হ'য়ে সচেতন হ'য়ে উঠত। রাজকুমারীর ফুলের মত দেহলতাখানি সেই উন্নত বক্ষের মাঝে অবশ হ'য়ে লুটিয়ে পড়ত—তার চোখ দুটী দুখানি সুকোমল কর-পল্লবের নিচে আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকত, তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে মোহময় তড়িৎপ্রবাহ ঠিকরে পড়ত। রাজকুমারী আলিঙ্গনের নিচে হ'তে সলজ্জ-কৌতুকে ডাকত—'বেলা!'

বেতসকুঞ্জের অন্তরাল হ'তে অনঙ্গের ঘোড়াটা হ্রেষারবে দিগন্ত কাঁপিয়ে তুলত। অনঙ্গ হাস্‌তে হাস্‌তে তার বাহু-পাশ মুক্ত করে দিত।

এমনি প্রতি সন্ধ্যায় এই তরুণ তরুণী দুটী রঙ্গমঞ্জীলের

মর্ম্মরবেদীর উপর পরস্পরের প্রাণ পান করতে করতে সান্ধ্য বায়ুহিল্লোলে গা ভাসিয়ে দিয়ে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করত। বায়ুহিল্লোলে হ্রদের বুকটা ফুলে উঠে তাদের পায়ের নিচে, মর্ম্মরবেদীর গায়ে লুটিয়ে পড়ে এক অজানা রাগিণী সৃষ্টি করত,—আর সেই মর্ম্মরবেদীর উপর তারা পরস্পরকে সাম্‌নে রেখে শুধু পরস্পরের পানে বিভোর হয়ে চেয়ে থাকত—চোখে পলক নেই, যেন প্রাণহীন পাষাণ-মূর্ত্তি!—সুনিপুণ ভাস্কর-খোদিত প্রস্তরময় প্রণয়ী-যুগল! 'রত্নমঞ্জীলে'র হ্রদসোপানে জালন্ধরের সযত্ন-প্রতিষ্ঠিত পাষাণ-নির্ম্মিত গ্রীসের প্রণয় দেবতা "ভিনাস্—কিউপিড্"।

• • • •

স্বর্ণমণ্ডিত পর্য্যাঙ্ক-শয্যায় চিন্তাকুল রাজা গোবিন্দ-সিংহ অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় রাজভ্রাতা ও সেনাপতি অজয়সিংহের মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি রেখে জিজ্ঞাসা করলেন,—"এখন উপায় কি অজয়? যাই-যার মুখে যা শুনছি তাতে তো আমার মাটীর মধ্যে মিশে যেতে ইচ্ছা করছে।"

অজয়সিংহ তার আয়ত চক্ষু দুটো বিস্ফারিত ক'রে উত্তর দিল,—"দাদা! ভাববার সময় নেই, শীঘ্রই এর একটা মীমাংসা—একটা নিষ্পত্তি করতেই হবে। এ জালন্ধরের সৌভাগ্য, জালন্ধর রাজের সৌভাগ্য, ভগ্নী মেহেরার সৌভাগ্য যে ভারতের শত শত নৃপতি তার অনুকম্পাভিখারী হ'য়ে তার মুখের একটী উত্তরের আশায় অপেক্ষায় চেয়ে আছে। কিন্তু আর কতদিন? কতদিন তাদের আর এমনি মিথ্যা প্রবোধ দিয়ে রাখবেন? ওর উপর সামান্য একটা হাওয়ার ভরে যদি কোন দিন মিথ্যার খোলস খসে পড়ে, আর ভিতরকার সত্যটা তাদের সাম্‌নে প্রকাশ হ'য়ে যায়, তখন—ভেবে দেখেছেন কি? তখন এ প্রকাণ্ড বিশ্বে মহামান্য জালন্ধর রাজের যে লজ্জাটুকু ঢেকে মাথা রাখবার এতটুকু স্থান থাক্‌বে না।"

ঐশ্বর্য্য-মদ-দৃপ্ত রাজা গোবিন্দসিংহের মুখখানা সহসা নীল হ'য়ে উঠে ধীরে ধীরে মাথাটা ঝুইয়ে পড়ল—তার প্রধূপিত বুকখানা দুহাতে চেপে ধরে অবরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল,—"সত্য কথা অজয়! এ কলঙ্ক প্রকাশ হ'বার পূর্ব্বে যেন আমার মৃত্যু হয়!—জালন্ধরের রত্নসিংহাসন অতলে ডুবে যায়।"

অজয়সিংহ অনুশোচনায় তীব্রকণ্ঠে বলতে লাগল—"ছিঃ! ছিঃ! লজ্জা! ঘৃণা! একটা ভৃত্য—একটা দীন-হীন নিঃস্ব যুবক জালন্ধরের রাজকুমারী অসামান্য সুন্দরী মেহেরার মনোনীত স্বামী! যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে ভারতের শত শত নৃপতি আজ লালায়িত—সেই মেহেরার প্রণয়ী কি না পথের কুকুর দেওয়ান-পুত্র অনঙ্গ! ধন্য আশা! মহারাজ! কঠোর হোন্—যেমন করে হোক এ আবর্জ্জনাকে মেহেরার পথ হ'তে সরাতেই হবে।"

অজয়সিংহের প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে তার হৃদয়ের জিঘাংসা প্রবৃত্তি দৃঢ়ভাবে ফুটে উঠল। রাজা তার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অন্তরে কেঁপে উঠল, কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে গাঢ়স্বরে বলতে লাগল,—"কঠোর হ'তে হবে? কঠোর হয়েছি অজয় সেই দিন, যেদিন রাজদণ্ড হাতে নিয়ে এই ন্যায়ের সিংহাসনে বসেছি; কিন্তু অজয়! সত্যের অপলাপ কর্ব্ব না,—শৈশবে পিতৃমাতৃহারা ছোট বোনটীকে নিজের কন্যার অধিক স্নেহে পালন করেছি—তাই বোধ হয় যখনি কঠোর হ'য়ে তার বিরুদ্ধাচরণ কর্ত্তে যাই, তখনি তার ব্যথিত ছলছল চোখ দুটী মনের মাঝে ভেসে উঠে আমায় পাথর করে দিয়ে যায়।"—তার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এল—আয়ত চোখ দুটী ধীরে ধীরে নিমীলিত হ'য়ে গেল, অবসন্নের মত নিম্নস্বরে বলতে লাগল—"কিন্তু কঠোর হ'তে হবে, উপায় নেই।"

অজয়সিংহ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলো,—"নিশ্চয়! কঠোর হয়ে দুহাতে তার পথ হ'তে অমঙ্গল সরিয়ে দিতে হবে। মেহেরা বালিকা। বালিকা-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হ'য়ে সে যদি নিজের মুখে বিষ তুলে দেয়, আমাদের কর্ত্তব্য দুহাত প্রসারিত করে তাকে রক্ষা করা। সত্য বটে অনঙ্গর রূপ আছে, কিন্তু রূপের দোহাই দিয়ে দুনিয়া চলে না, তার মূল্য শুধু কবির চোখে! এ একটা ক্ষণিক মোহ! চোখের আড় হয়ে গেলেই স্বপ্নের নেশা ছুটে যাবে।"

গোবিন্দসিংহের উন্নত ললাটদেশ বিস্ফারিত হয়ে

উঠ্‌লো—চোখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটে উঠ্‌লো। নিতান্ত অন্যমনে বল্‌তে লাগল,—"সত্য কথা! সত্য কথা!"

(গ)

সবেমাত্র যখন উষার স্নিগ্ধ আলোটুকু শান্ত বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই সময় সজ্জিত দেওয়ান-পুত্র অনঙ্গ অতি সন্তর্পণে রাজপ্রাসাদের মর্ম্মর-সোপান বেয়ে উপরে উঠ্‌ছিল। ধীরে, ধীরে, মৃদুচরণক্ষেপে এক একটা সোপানে উঠছিল, সহসা স্তব্ধ হ'য়ে সলজ্জদৃষ্টিতে অন্তঃপুরের পানে তাকাচ্ছিল, আবার উঠ্‌ছিল। এমনি করে যখন অনঙ্গ অন্তঃপুরের দোরে এসে পৌঁছল, সেই সময় বৃদ্ধা ধাত্রী তার সামনে এসে দাঁড়াল। অনঙ্গর মুখখানা রাঙ্গা হয়ে উঠল, সে কম্পিত প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করলে, "ধাইমা! রাজকুমারী?" বৃদ্ধা ধাত্রী সস্নেহ অভ্যর্থনা জানিয়ে উত্তর দিলে, "রাজকুমারী পরিচ্ছদাগারে"। রাজকুমারী মেহেরা অনঙ্গর কণ্ঠস্বর শুনে ত্রাস্তে বাহিরে এসে তার সামনে দাঁড়াল, প্রভাতের শিশিরে ধোয়া তাজা ফুলটীর মত। অনঙ্গ সস্নেহে ডাকলে,—"রাজকুমারি!"

মেহেরা অনুযোগের স্বরে বলে উঠ্‌লো,—"মেহেরা বল।"

"ক্ষমা কর মেহেরা!" অনঙ্গ তার হাতখানা ধরে তার মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মেহেরার হাসিতে ছোপান অম্লান মুখখানি প্রফুল্ল হয়ে উঠল। সে সকৌতুক প্রশ্ন করলে—"এত প্রত্যুষে! আজ আমার সুপ্রভাত!"

"মেহেরা! আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।"

"বিদায়! কেন?" মেহেরার মুখের স্বাভাবিক হাসিটুকু সহসা নিভে গিয়ে একটা ম্লানিমা ফুটে উঠল। অনঙ্গ মোহাচ্ছন্ন কণ্ঠে বলে উঠলো, "শুধু এই আজকের দিনটী মেহেরা, আমায় রাজার সঙ্গে মৃগয়ায় যেতে হবে।' যদি সন্ধ্যার ফিরি 'রত্নমঞ্জীলে' দেখা হবে।"

মেহেরার মুখে স্বচ্ছ হাসিটুকু আবার ফুটে উঠল, যেন শরতের আকাশে মেঘের ও রৌদ্রের চকিত ক্রীড়া! মেহেরা একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে বল্লে, "তাই ভালো"—পরে নিতান্ত বালিকার মত মিহিসুরে প্রশ্ন করলে—"তুমি মৃগয়ায় যাবে? কই সাঁজোয়া পরনি; অস্ত্র নাওনি?"

অনঙ্গ অপ্রতিভ হয়ে উঠল। সংযত হয়ে শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলে, "প্রয়োজন নেই। জিঘাংসা প্রবৃত্তিটা আমার মধ্যে বড় কম মেহেরা, যদিও ক্ষত্রিয় রক্তেই আমার জন্ম। কিন্তু কি কর্ব্ব! রাজার ভৃত্য, রাজার আমন্ত্রণ ত অগ্রাহ্য কর্ত্তে পারি না।"

• • •

তিনজনে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছিল। প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চ চূড়ার উপর দাঁড়িয়ে রাজকুমারী নিষ্পলকনেত্রে তাদের পানে চেয়েছিল। প্রথমে তার ভ্রাতা রাজা গোবিন্দসিংহ, মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেনাপতি অজয়সিংহ,—পশ্চাতে তার উপাস্য দেবতা অনঙ্গ। হাতে বর্শা, মাথায় বাদামী রঙের উষ্ণীষ। প্রতিভা-মণ্ডিত সুগৌর মুখখানি প্রেমোজ্জ্বল—চোখে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ! দূরে, বহুদূরে, ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষান্তরালের মধ্য দিয়ে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছিল,—গাছের মাথায় মাথায় প্রভাতের সোণালী রোদটুকু ঝরে ঝরে পড়ছিল। রাজকুমারী অনিমিষে চেয়েছিল,—সেই পিছনের বাদামী উষ্ণীষটীর পানে। দূরে, আরও দূরে,—ঐ তারা বৃক্ষান্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল! সহসা যেন রাজকুমারীর চোখের সামনে দিনের আলো নিভে গেল, তার প্রাণটা আর্ত্তনাদে ভরে' উঠল। সে মুখখানা দু'হাতে চেপে সেইখানে বসে পড়ল।

(ঘ)

রাজধানী হ'তে বহুদূরে, রাজ্যের সীমাপ্রান্তে "রক্তীর বন"। সাঁঝের আঁধার বনভূমির বুকে জমাট হ'য়ে নেমে আস্‌ছিল। মৌন বনভূমি স্তব্ধ হ'য়ে চেয়েছিল। কালো পাহাড়ের পা ধুইয়ে দিয়ে একটা শীর্ণ নদী উচ্ছল হয়ে ছুটেছিল,—একটা পৈশাচিক আতঙ্কে থেকে থেকে তার বুকটা যেন সঘনে কেঁপে উঠ্‌ছিল।

রাজা গোবিন্দসিংহ ও সেনাপতি অজয়সিংহ অনঙ্গর শোণিত-রঞ্জিত শুভ্রবারি দু'খানা নদীজলে ডুবিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। গোবিন্দসিংহের চোখের সামনে

অনঙ্গর শেষ রক্তটুকু ধুয়ে নিয়ে নদীর জলটা রাঙ্গা হ'য়ে উঠল। সেই ঝাপ্‌সা সাঁঝের আলোয় রাজার মুখখানা কালো হ'য়ে উঠল।

"কি করলুম অজয়?" কম্পিত প্রশ্নে রাজা অজয়ের মুখের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে। অজয়ের মুখে হিংস্র সর্প শিশুর অস্বাভাবিক কুটীল দীপ্তি,—চোখ দুটোতে লোলুপ চাহনি। বেশ সহজ স্বরেই সে উত্তর দিলে, "কিছু না দাদা, জালন্ধরের পবিত্র রাজবংশে কালী পড়তে বসেছিল, প্রারম্ভের মুখেই সে কালী মুছে ফেললুম।"

"হুঁ! কিন্তু এ হত্যা! তার অপরাধ কোথায় অজয়?"

অজয় উত্তেজিত হ'য়ে বলে উঠ্‌লো, "অপরাধ? তার অপরাধ সে ভালবেসেছিল,—জালন্ধরের রাজকুমারীকে ভালবেসেছিল।"

পায়ের নিচে তার স্বরের প্রতিধ্বনি করে নদীজল পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ল।

অজয় গোবিন্দর হাত ধরে বল্‌লে, "চল দাদা, রাজধানীতে ফিরি।"

গোবিন্দর চোখের সাম্‌নে তার স্নেহময়ী ভগিনীটির শুভ্র সদ্যবৈধব্য মূর্ত্তিখানি ভেসে উঠল। ফেরবার পথে কেবলই তার মনে হ'তে লাগল—"এ হত্যা! হত্যা!"

পাহাড়ের পথে ঘোড়া ছুটেছিল, তাদের পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি স্তব্ধ বনভূমিকে প্রকম্পিত করে আর্ত্তনাদ করছিল,—"হত্যা! এ হত্যা!"

বনভূমি যেন সহসা মুখর হয়ে কেঁদে উঠল—হত্যা! হত্যা!

(৪)

আশায় বুক বেঁধে মেহেরা অনঙ্গর অপেক্ষা করত। সে জানত প্রয়োজনীয় রাজকার্য্যে অনঙ্গ সহসা প্রবাসে গেছে—জানত না যে তার ভাগ্যাকাশ হ'তে, সুখের তারাটী চিরদিনের মত নিভে গেছে। অবোধ বালিকা তার বিরহকাতর বুকখানাকে সেই শুভদিনটীর অপেক্ষায় বেঁধে রাখত। তার জীবনের সে এক শুভলগ্ন! বড় পুণ্যমুহূর্ত্ত! প্রতিদিন, প্রভাত হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রত্যেক মুহূর্ত্তে অনঙ্গর প্রত্যাগমন আশা করত। সন্ধ্যায় তেমনি রত্নমঞ্জীলের হ্রদতীরে, মর্ম্মরবেদীর উপর তার প্রতীক্ষায় বসে থাকত। প্রত্যেক শব্দটীতে তার মনে হ'ত 'ঐ বুঝি সে আসছে'। যখন সে তার ভুল বুঝত, একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে মর্ম্মরবেদীর উপর লুটিয়ে পড়ত—যেন তার বুকে হঠাৎ একখানা কে ছুরী বসিয়ে দিলে। তার পায়ের নিচে হ্রদের জল উছলে উঠে একটা বিলাপের রাগিণী সৃজন করত,—একটা অমঙ্গল হাহাকারে তার প্রাণটা ভারি হ'য়ে উঠত।

অনঙ্গ ফিরল না,—উদ্বেগ, আশঙ্কায় রাজকুমারী অস্থির হ'য়ে উঠল। আতপদগ্ধ লতাটীর মত মেহেরা দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগল। দেহের সোনার বর্ণ মলিন হ'য়ে গেল,—গণ্ডের প্রস্ফুটিত গোলাপ শুকিয়ে ঝরে পড়ল। "কেন তুমি এখনও ফিরলে না? আজও কি তোমার কাজ শেষ হয়নি? রাজাধিরাজ! মেহেরার জীবন সর্ব্বস্ব! আর কতদিন অপেক্ষায় ব'সে থাকব—এ নৈবেদ্যর ডালা নিয়ে আর কতদিন মন্দির দোরে ব'সে থাকব? দেবতা আমার! বাঞ্ছিত আমার! ওগো আমার চির উপাস্য! আমি কি অপরাধ করেছি যে তুমিও আজ দুর্লভ হ'য়ে পড়লে!" এম্‌নি একটা ব্যাকুলতা তার হৃদয়ের মাঝে সদাই গুমরে ফুঁপিয়ে উঠত। একটা অরুন্তুদ যাতনায় তার প্রাণটা হাহাকার ক'রে উঠত। ফুটফুটে চাঁদিনীর মত তার মুখের শুভ্র নিষ্কলঙ্ক হাসিটুকু যেন মেঘে ঢেকে ফেলেছিল;—তার মৌন, শান্তোজ্জ্বল চোখ দুটীতে অবসাদের কালী ছড়িয়ে দিয়েছিল। সে আহার নিদ্রা ভুলে নিজের চিন্তার সুরটীতেই মগ্ন হ'য়ে দিনরাত শূন্য প্রেক্ষণে চেয়ে থাকত,—যেন বর্ষার ভরা নদী অকালে শুকিয়ে পড়ে আছে,—যেন একখানা মালঞ্চ পুড়ে জ্ব'লে গিয়েছে,—একটা বিরাট উৎসব-মণ্ডপ ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

গভীর রাত্রে নক্ষত্রগুলো যখন জ্ব'লে জ্ব'লে একটার পর একটা নিবে আসত, তখনও রাজকুমারী খোলা জানালার ধারে উৎকর্ণ হ'য়ে ব'সে থাকত,—একটী পরিচিত অশ্বের পদশব্দের আশায়! উদ্বেগ, অবসাদ, অনিদ্রায় রাত্রিশেষে যখন তার অবসন্ন দেহখানা তন্দ্রায় ঢুলে পড়ত

—একটা মর্ম্মন্তুদ যাতনায় প্রাণটা যেন তার বুক ফেটে বের হ'তে চাইত;—সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে মেঝের বিস্তৃত মখমলের উপর লুটিয়ে পড়ত। তন্দ্রার ঘোরেও মাঝে মাঝে সে আর্ত্তনাদ করে উঠত,—"কোথায়? কোথায়? ওগো কোথায় তুমি?"

সে একটা স্বপ্ন। যেন কোন্ অজানা বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ দিয়ে রাজকুমারী নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলেছিল। সেখানে কেবল আঁধার,—আঁধারের বিরাট রাজ্য। আশে পাশে কালো পাহাড়; পাহাড়ের বুকে জমাট আঁধার মেহেরার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। মেহেরা স্তব্ধ হ'য়ে স্থির দৃষ্টিতে সেই আঁধারের পানে চেয়েছিল। আতঙ্কে সমস্ত শরীরখানা তার শিউরে উঠল, তার ভারি কান্না এল। অকস্মাৎ যেন যাদুস্পর্শে একটা পর্ব্বতরন্ধ্র হ'তে একটা ক্ষীণ আলোকরশ্মি বেরুতে লাগল। মেহেরা বিস্মিত-আতঙ্কে সেই আলোকরশ্মির পানে চেয়ে রইল। আলোকরশ্মি উজ্জ্বল হ'য়ে শূন্যে উঠে ছড়িয়ে পড়ল,—বনভূমি প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল। মেহেরা সহ্য করতে পারলে না, তার চোখ ঝলসে গেল। সে দুহাতে চোখ দুখানা ঢেকে থর্ থর করে কাঁপতে লাগল। মুহূর্ত্ত পরে আবার চোখদুটী উন্মীলিত করে দেখলে চতুষ্পার্শে কালো আঁধার, মধ্যে উজ্জ্বল আলোকদীপ্ত পর্ব্বতসানুদেশে অপূর্ব্ব বনস্থলী! অদূরে ছোট একটা নদী, নদীতীরে পুষ্পিত বনলতা। আশে পাশে ছোট বড় নানা রকমের গাছ। নদীর জল, গাছের পাতা মৃদু বায়ুহিল্লোলে কাঁপছে। একটা বড় কদমগাছের নিচে একখানা শিলাখণ্ডের উপর ঈষৎ অস্পষ্ট মনুষ্য মূর্ত্তি উপবিষ্ট। বুকের উপর মাথাটী ঝুলে পড়েছে, মুখখানা ভাল দেখা যায় না। মেহেরা মন্ত্রাচ্ছন্নের মত সেই মনুষ্য মূর্ত্তির পানে চেয়ে রইল। তার মনে হ'ল লোকটা বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। ধীরে ধীরে মনুষ্যমূর্ত্তি মুখখানি তুলে মেহেরার মুখের পানে চেয়ে রইল। তুষার শুভ্র দেহ, চোখে স্থির নিষ্প্রভ দৃষ্টি, গণ্ডে অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতা। সহসা তার চোখদুটী ঝকমক করে জলে উঠলো, প্রভাতের রৌদ্রদীপ্ত শিশির বিন্দুর মত। মেহেরার বিবর্ণ মুখে রক্ত ফিরে এল, সে উৎফুল্ল হ'য়ে একেবারে তার কাছে গিয়ে ব'লে উঠলো—"তুমি? রাজাধিরাজ আমার! এতদিন পরে?"

আলিঙ্গনোদ্যত মেহেরাকে ইঙ্গিতে থামতে বলে, অনঙ্গ মনুষ্যকণ্ঠে বল্‌তে লাগল—"মেহেরা! এ আমার ছায়ামূর্ত্তি! এখন আমি তোমার আলিঙ্গনের, তোমার স্পর্শের অতীত।"—তার অধরে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। রাজকুমারীর ক্ষুধিত, ব্যথিত হৃদয়খানা সেই স্বরের ঝঙ্কারে ডুবে গেল। ছায়ামূর্ত্তি বল্‌তে লাগল, "এসেছ তুমি রাণী আমার! এস, মাঝে মাঝে এম্নি দেখা দিয়ে, তোমার অনাবিল অশ্রুজলে এই শিলাখণ্ড সিক্ত করে দিও—আমার অতৃপ্ত বাসনার বোঝা ধুয়ে দিও। তোমার অমৃতময় স্পর্শে দীনের এই শেষ শয্যাটীকেও পবিত্র, মঙ্গলময় করে তুলো,—যেমন সেই প্রথম দিনটীতে তোমার রাতুল চরণরেণুতে আমার সেই দীন কুটীরখানিকে পবিত্র করে দিয়েছিলে। তোমার ফুলের মত রূপের আলোয়—কিন্তু মেহেরা! আলো ম্লান হয়ে এসেছে, তোমার গণ্ডের বিকসিত ফুল ঝরে গিয়েছে! কি আনন্দ! তুমিও আসচ? এস—আর অপেক্ষা করতে পারি না, কি যন্ত্রণা! একা এই লোকালয়ে, ওঃ! কতদিন—আর কত দিন!" অনঙ্গের ছায়ামূর্ত্তি দুহাতে তার বুকখানা চেপে ধরলে, মাথাটি তার ধীরে ধীরে বুকের উপর নুয়ে পড়ল। মেহেরা আর্ত্তনাদ করে উঠল—"ওগো কোথায়? কোথায় গেলে তোমার দেখা পাব?"

"বন্দীর বনে।"

"কেন? তুমি ওখানে কেন? তোমার ছায়ামূর্ত্তি কেন?" ছায়ামূর্ত্তি ধীরে ধীরে তার শুভ্রবস্ত্রাচ্ছাদিত দেহখানি উন্মুক্ত করলে—সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাত!—তুষারমণ্ডিত দেহে রক্তবন্যা! মেহেরা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

* * * *

—"ধাইমা! স্বপ্ন কি সত্য হয়?—প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করেই রাজকুমারী ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে। ধাত্রী রাজকুমারীর অসংযত চুলের রাশ নাড়তে নাড়তে সান্ত্বনার স্বরে বল্লে, "হয় বই কি মা, সময়ে সময়ে হয় বৈ কি!"—

"তবে,—তবে এ স্বপ্ন নয়? সত্য!" রাজকুমারী লুটিয়ে পড়ল।

(৮)

ভোরের আলো তখন ভাল ফুটে নাই—মাথার উপর তখন একটা নক্ষত্র দপ দপ করে জ্বলছিল। রাজকুমারী অশ্বপৃষ্ঠে বনভূমি অতিক্রম করে চলেছিল। মুখে তার উদ্বেগ আশঙ্কা, অনিদ্রাজনিত শ্রান্তি, ললাটে মুক্তার মত ছোট ছোট স্বেদবিন্দু। পার্ব্বত্য বনস্থলীর বুক কাঁপিয়ে তীরবেগে ঘোড়া ছুটেছিল,—দূরে, এক কোন্ অজানা দেশে। সহসা একটা উঁচু শিলাখণ্ডের উপর উঠে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে চকিত দৃষ্টিতে কি দেখ্‌তে লাগল। রাজকুমারী বিস্মিত-আতঙ্কে চারিদিক নিরীক্ষণ করে অশ্বকে জোরে কশাঘাত করলে। ঘোড়াটা নড়ল না, শুধু চীৎকার করে উঠ্‌লো—সঙ্গে সঙ্গে অদূরে যেন আর একটা ঘোড়া তার চীৎকারের প্রতিধ্বনি করে উঠ্‌লো। স্বর যেন পরিচিত! রাজকুমারী উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল। আবার! আবার! রাজকুমারী সহসা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে উঠ্‌লো—'বেলা! বেলা!'—

একটা ঘন লতামণ্ডপ ভেদ করে উন্মত্ত বেগে 'বেলা' তার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। রাজকুমারী মন্ত্রাচ্ছন্নের মত তার পানে চেয়ে রইল,—কথা সরল না, কণ্ঠ শুকিয়ে এল। বেলা রাজকুমারীর মুখের 'পরে তীব্র দৃষ্টি রেখে ঘন ঘন হ্রেষারবে বনভূমি কাঁপিয়ে তুল্‌লে। সহসা রাজকুমারী বেলার কণ্ঠ আলিঙ্গনে বদ্ধ করে আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌লো —"বেলা! কই?—কই?"

বেলা পার্শ্বের বনভূমির পানে গ্রীবা হেলিয়ে চীৎকার করতে সুরু করলে। রাজকুমারী তিল বিলম্ব না করে বেলার পৃষ্ঠে আরোহণ করলে। বেলা তীরবেগে ছুটলো। রাজকুমারী উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারিদিক দেখতে লাগল।

সহসা বেলার গতি মন্দীভূত হ'য়ে এল, একটা উঁচু শিলাখণ্ডের পাশে, তার পায়ের নিচে ছোট নদীর বুকে প্রভাতের সোণালি রোদটুকু ঝিক্‌মিকিয়ে উঠ্‌ছিল। অদূরে একটা কদমগাছের নুয়েপড়া ডালগুলো হাওয়ায় দুলছিল।

রাজকুমারীর মুখখানা সহসা সাদা হ'য়ে গেল, যেন কে সজোরে তার পিঠে চাবুক মেরে গেল। সে বজ্রাহতের মতই সেই বনস্থলীর পানে চেয়ে রইল। এবে তার সেই স্বপ্নে-গড়া বনভূমি—সেই "বক্তীর-বন"। কি আশ্চর্য্য! তার মনে হল যেন একটা ঘূর্ণীঝড়ের প্রবল টানে তাকে রাজপ্রাসাদ হ'তে এই বনভূমিতে টেনে এনে ফেলেছে! সে বেলার পিঠের উপর পাথর হয়ে গেল।

তার চেতনা ফিরে এল বেলার আর্ত্তনাদে। বুকের সে কি বুকফাটা আর্ত্তনাদ! রাজকুমারীর বুকখানা সবলে দুলে উঠ্‌লো—তার সমস্ত দেহখানা থর্ থর্ করে কেঁপে উঠ্‌লো—একটা বুকফাটা হাহাকার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলে উঠল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য! বড় ক্ষণিকের সে ব্যাকুলতা!

বেলা কদমগাছের নিচে সেই উঁচু ঢিবিটার কাছে ব্যাকুলভাবে যেন কি খুঁজ্‌তে লাগল। তার চোখ দুটো যেন মেহেরাকে বল্‌তে চাচ্ছিল—"ওগো! এইখানে—এইখানে।"

রাজকুমারীর চোখে পলক ছিল না, সে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিল সেই শিলাখণ্ডের পাশে, উঁচু ঢিবিটার পানে। কদমের শুক্‌নো ঝরা ফুলে তার বুকটী ভরে গিয়েছিল! মেহেরা তার বক্ষাবরণের নিচে হ'তে একখানা তীক্ষ্ণধার দীর্ঘ ছুরিকা বের করে, লুব্ধনেত্রে চারিদিক নিরীক্ষণ করে সেই ঢিবিটা খুঁড়তে লাগল, অতি সন্তর্পণে; যেমন করে কৃপণ তার প্রোথিত ধনরত্ন দেখ্‌বার আশায় নিরালায় নির্দ্দিষ্ট স্থানটী খনন করে!

* * *

রাজকুমারী নিরুদ্দেশ! প্রভাত হ'তেই প্রাসাদে একটা সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। একটা অজানা আতঙ্কে রাজা গোবিন্দসিংহের বুকখানা থেকে থেকে কেঁপে উঠ্‌ছিল। বৃদ্ধা ধাত্রীর আর্ত্তনাদে প্রাসাদ ভরে গিয়েছিল। তার মুখে মেহেরা বর্ণিত পূর্ব্ব রাত্রের অপূর্ব্ব স্বপ্নের কথা শুনে রাজার মুখখানা পাংশু হ'য়ে গেল, তার চোখের সাম্‌নে বিশ্বের নিখিল সৌন্দর্য্য কালো হ'য়ে গেল।

চারিদিকে লোক ছুটেছিল, রাজকুমারীর অনুসন্ধানে। গোপনে রাজা গোবিন্দসিংহ ও ভ্রাতা অজয়সিংহও অনুসন্ধানে বের হয়েছিল, এক প্রবল আকর্ষণ তাদের টেনে নিয়ে চলেছিল—তাদেরই কন্যার লীলাভূমি বক্তীর দিকে!

ম্লান গোধূলির রক্তাম্বরের নিচে হত্যাকারী প্রাণহরের রাজপুত্রদ্বয় মন্ত্রাচ্ছন্নের মত নিষ্পলকনেত্রে দাঁড়িয়েছিল, আর সেইখানে,—সেই বন্দীর বনে, তাদের পায়ের নিচে একটা অর্দ্ধপ্রোথিত নরকঙ্কালকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করে, একরাশ ঝরা ফুলের মত লুটিয়ে পড়েছিল তাদের ভগ্নীর প্রাণহীন দেহখানা। সেই রাজার মেয়ে।

স্মৃতির ফর্দ্দ।

[শ্রীমতী প্রতিভাবালা বিশ্বাস]

এইটে আমার ছেলেবেলায়
ছোট হাতের লেখা,
এইটে হচ্ছে ধরে' ধরে'
ভূত পেত্নি আঁকা।
দেয়াল গায়ে আঁচর কাটা
এও ত আমার কাজ,
(দেখি) বিস্কুটাকে ঝুলিয়েছিলাম
সকল ঘরের মাঝ।
জন্মদিনে পেয়েছিলাম
এত পুতুল ভাই,
(আজ) খড়ে তাদের কোন মুণ্ডুর
চিহ্ন মাত্র নাই।
ভেঙ্গেছিনু ঘড়ি একটী
আছে বাক্স-বন্দি,
(বোধ হয়) নূতন কিছু আবিষ্কারের
এঁটেছিলাম ফন্দি।
আর একটা কি অপকর্ম্ম
করেছিলাম ভাই,
(তার) চপেটাঘাত ছাড়া আমার
মনে কিছুই নাই।

নবীন লেখকের পৃষ্ঠা।

মাসীমা।

[শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়]

(১)

'হ্যাঁ রে হতভাগা ছোঁড়া, এতক্ষণ কোথা ছিলি? পোড়ারমুখোর কপালও যেমন স্বভাবও তেমন। তোকে না আমি পই পই বলে দিয়েছি যে, টুনিকে নিয়ে বেশীক্ষণ রাস্তায় থাকবি না'— এই বলিতে বলিতে মোক্ষদাসুন্দরী প্রতুলের পৃষ্ঠে হস্তস্থিত চেলা কাঠের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

বাপ-মা-মরা ছেলে প্রতুলকে পেটের দায়ে কাকার অন্নদাস হইতে হইয়াছিল। কর্ত্তব্যজ্ঞান বা চক্ষুলজ্জায় নহে, শুধু সাংসারিক কাজকর্ম্মের সুবিধার জন্য মোক্ষদা-সুন্দরী প্রতুলকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। প্রতুলের শুভাগমনের অব্যবহিত পরেই মোক্ষদাসুন্দরী তাঁহার ভৃত্যটীকে তাড়াইয়া দিলেন। ভৃত্যটীর কঠিন কাজগুলির গুরুভার পড়িল প্রতুলের কোমল স্কন্ধে। গো-সেবা হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড় কাচা প্রভৃতি সবই তাহার উপর, তাহাকে কাকীমার চার বছরের ছেলে টুনিকে লইয়া বেড়াইতে হইত। মোক্ষদা-সুন্দরী প্রতুলকে প্রকারান্তরে ভৃত্যপদে বসাইলেও তাহার কাকা কিন্তু প্রতুলকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তবে

মোক্ষদাসুন্দরীর ভয়ে তিনি তাঁহাকে কোনও কথা বলিতে পারিতেন না। সেদিন প্রতুল টুনিকে লইয়া ঘোষেদের বাড়ীতে খেলা দেখিতে গিয়াছিল; ফিরিতে একটু বেলা হইয়াছিল বলিয়া মোক্ষদাসুন্দরীর এত রাগ।

বলা বাহুল্য, সেদিন তাহার ভাত বন্ধ হইল। প্রতুল ধীরে ধীরে বাটীর বাহির হইয়া গিয়া ঘাটের ধারে একটী বটগাছের স্নিগ্ধ ছাওয়ায় বসিয়া পড়িল। শ্রান্ত মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্র পাতার মধ্য দিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল। নিস্তব্ধতা যখন নিবিড় হইয়া আসিল, তখন তাহার স্মৃতি একটী সীমাহীন অন্তহীন শূন্যতার মধ্য দিয়া গিয়া তাহার হারান মায়ের নিকট পৌছিল। পবিত্র মাতৃস্নেহের স্মৃতির সহিত মোক্ষদাসুন্দরীর নির্ম্মম ব্যবহারের সংঘর্ষণে নেত্রদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হইল।

'প্রতুল'—পিছন হইতে কে ডাকিল 'প্রতুল'।

স্নেহস্বরে অনভ্যস্থ প্রতুল ফিরিয়া দেখিল, তার মাসীমা।

বরদামণি প্রতুলদের বাড়ীর পার্শ্বেই থাকিতেন। তিনি প্রতুলকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। দুখের ছেলে প্রতুলের কষ্ট দেখে তাঁর চোখ ফেটে জল আস্‌ত। কিন্তু তিনি মোক্ষদাসুন্দরীকে এঁটে উঠ্‌তে পারতেন না। প্রতুলের স্বপক্ষে কোনও কথা বলিলে, অমনি মোক্ষদাসুন্দরী ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেন। প্রতুল বরদামণিকে মাসীমা বলিয়া ডাকিত। সে তাঁহাকে মার মত ভালবাসিত। বরদামণি প্রতুলের মাথার উপর হাত দিয়া বলিলেন, 'প্রতুল! কাঁদছিস্ কেন রে?'

প্রতুল উত্তর করিতে পারিল না, কেবল ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বরদামণি বলিলেন, 'আয়, ওখানে বসে কাঁদ্‌তে হবে না; কি হয়েছে আমার বল্।'

প্রতুল উঠিয়া মাসিমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'কাকীমা আমায় মেরেচে।'

বরদামণি বলিলেন, 'কেন, মেরেচে কেন? কি করেছিলি তুই? তোর খাওয়া হয়েছে?'

প্রতুল নিরুত্তরে নতমুখে চাহিয়া রহিল। তাহার অশ্রু ফোঁটা ফোঁটা মাটিতে পড়িতেছিল।

বরদামণি বলিলেন, 'বাছা আমার; এতখানি বেলা হলো, এখনও খাওয়া হয়নি? আয়, আমার সঙ্গে আয়।'

সে স্নেহসম্ভাষণে প্রতুলের সজল চক্ষু দুইটা অশ্রুভারে ঝুঁকিয়া পড়িল, কয়েক ফোঁটা অশ্রু গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করিল। প্রতুলের ক্রন্দনে তাঁহার চোখ দুইটাও জলে ভরিয়া আসিল।

ঘরে গিয়া প্রতুলকে খাইতে দিয়া বরদামণি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাঁ রে প্রতুল, তোকে মারলে কেন রে?'

প্রতুল বলিল, 'টুনিকে নিয়ে আমি ঘোষেদের বাড়ীতে খেলা দেখছিলুম, ফিরে এলে কাকীমা বল্‌লে 'এত দেরী হল কেন', বলেই—আর বলিতে পারিল না।

বরদামণি বেদনা-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'কোথা মারলে? খুব লেগেছে?'

প্রতুল এক গ্রাস ভাত মুখে তুলিতে যাইতেছিল, মাসিমার স্নেহসম্ভাষণে তাহার চক্ষুর্দ্বয় আবার অশ্রু ভরিয়া উঠিল। হাতের ভাত হাতেই রহিয়া গেল, সে কোনও উত্তর করিতে পারিল না।

বরদামণি বলিলেন, 'দেখ্ প্রতুল, আমি তোর মাসীমা হই। তোর মায়ের মতনই। আমার কাছে কিছু লজ্জা কর্‌তে নেই। যখন যা তোর দরকার হবে, আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবি; বুঝলি?'

প্রতুল কোনও উত্তর করিল না।

বরদামণি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'কি রে, কথা কইলি না যে? আসবি তো?'

প্রতুল লজ্জাজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'আসব।'

বরদামণি বলিলেন, 'নে, খেয়ে নে।'

(২)

প্রতুল মাসীমার বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া গৃহে পদার্পণ করিবামাত্রই, মোক্ষদাসুন্দরী ভৎর্সনাসূচক স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'কি গো প্রতুল, এতক্ষণ ছিলে কোথা?'

প্রতুলের মুখখানা শুকাইয়া গেল। সে ভীতিচমকিত চিত্তে শুষ্ক মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তার এই ভীতিভাব লক্ষ্য করিয়া মোক্ষদাসুন্দরী রুক্ষ স্বরে বলিলেন, 'বলি এত তেজ ক'দিন থাকবে? অহঙ্কারে ফেটে মরছেন। দেখব,

তোর মাসীমা তোকে ক'দিন ভাত দেয়?' এই বলিয়া মোক্ষদাসুন্দরী রাগে গর গর করিতে করিতে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

এদিকে দাওয়ার উপর, টুনি গগনভেদী চীৎকার করিতেছিল। প্রতুল তাড়াতাড়ি গিয়া টুনিকে কোলে লইয়া একটী চুমু খাইল।

'থাক্, থাক্, অত আর মায়া দেখিয়ে কাজ নেই। খুব হয়েছে!' মোক্ষদাসুন্দরী ঝঙ্কার দিয়া চিলের মত ছুটিয়া আসিয়া প্রতুলের কোল হইতে টুনিকে ছিনাইয়া লইলেন। টুনি প্রতুলের কোলে আসিয়া কান্না থামাইয়াছিল, মায়ের কোলে গিয়া কান্না একেবারে সপ্তমে চড়াইয়া দিল।

রাত্রে প্রতুল ও প্রতুলের কাকা খাইতে বসিয়াছিল; টুনি ঘরে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল ও মাঝে মাঝে প্রতুলের ঘাড়ের উপর আসিয়া উঠিতেছিল। এমন সময় মোক্ষদাসুন্দরী মুখখানি হাঁড়ীর মত ভারী করিয়া, ধপাস্ করিয়া মেঝেতে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন।

'আর ত পারা যায় না। যা হয় একটা বিহিত কর। দুধ কলা দিয়ে তো আর ঘরে সাপ পোষা যায় না!'

'কেন, হয়েছে কি?'

'কেন? তোমার এই দুলাল ভাইপোকে নিয়ে। বেলা দুপুরের সময় টুনিকে নিয়ে রোদে কোথায় খেলা দেখ্‌ছিল, তাই একটু বকা হয়েছিল। তার পরেই একেবারে গর্ গর্ কর্‌তে কর্‌তে পাশের বরদাদের বাড়ীতে গিয়া হাজির। সেখানে গিয়ে কত কথা লাগিয়েছে। সে আমায় কিছু না হক্ কত কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল,—'এই তোমরা ছেলেকে খেতে দাও না, মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দাও'—আরও কত কথা।' মোক্ষদাসুন্দরী এক নিশ্বাসে সব কথাগুলি বলিয়া গেলেন।

প্রতুলের কাকা মোক্ষদাসুন্দরীকে বেশ ভাল রকমই জানিতেন। তিনি কোনও উত্তর না দিয়া নীরবে আহার সমাপন করিতে লাগিলেন। ওদিকে প্রতুল ভয়ে, লজ্জায় মাটী হইতে মাথাটী পর্য্যন্ত তুলিতে পারিতেছিল না। প্রতুলের পাত শূন্য দেখিয়া তার কাকা মোক্ষদাসুন্দরীকে বলিলেন, 'ওগো, প্রতুলকে আর চারটী ভাত দাও তো।'

মোক্ষদাসুন্দরী রাগে ফুলিতে ফুলিতে বলিলেন, 'বলি, এ হাতীর খোরাক আর ক'দিন যোগাবে? আমাদের খাবেন পরবেন, আর ওঁর মাসীমার সেবা করবেন!'

মোক্ষদাসুন্দরী তৎক্ষণাৎ গৃহের বাহির হইয়া গিয়া এক থালা ভাত লইয়া আসিলেন।

প্রতুল ভয়ে ও লজ্জায় কথা কহিতে পারিতেছিল না; অতি কষ্টে চাপা সুরে বলিল, 'আর চাই না।'

মোক্ষদাসুন্দরী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আমি কি তোর বাঁধা মাইনের চাকরাণী? এ কথাটা আগে বল্‌লে কি হতো?'

প্রতুলের কাকা বিরক্তিসূচক স্বরে বলিলেন, 'তোমার ঝগড়া থামাবে কি? দিনরাত বাড়ীতে ঝগড়া লেগেই আছে।'

মোক্ষদাসুন্দরী অভিমানে দুম্ দুম্ শব্দ করিতে করিতে গৃহের বাহির হইয়া গেলেন।

(৩)

'মাসীমা!'

'কে রে?'

'আমি প্রতুল।'

'ঘরের ভেতর আয় না। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?' বরদামণি লেপের ভিতর হইতেই প্রতুলকে ডাকিলেন। প্রতুল গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, বরদামণি বলিলেন, 'এখনো মাসীমার কাছে লজ্জা! ঘরের ভেতর আস্‌তে কি হয়েছিল?'

প্রতুল কোন উত্তর করিল না।

তিনি আবার বলিলেন, 'হাঁরে, হঠাৎ আজ এত সকালে কেন? তোর হাতে ওটা কি?'

প্রতুল প্রথমে কি বলিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না, তারপর আস্তে আস্তে বলিল, 'দুধ আন্‌তে আন্‌তে হাত থেকে ঘটীটা পড়ে গিয়ে সব দুধ পড়ে গেছে। মাসীমা, চার আনা পয়সা দেবে? আবার দুধ কিনে আন্‌ব?'

বরদামণি বলিলেন, 'হাঁরে, এই সকালে তুই শীতে হি হি কর্‌তে কর্‌তে দুধ আন্‌তে গেছ্‌লি? তোর কাকীর

প্রাণে কি একটুও মায়া দয়া নেই? এত সকালে দুধ কি হয়?'

প্রতুল বলিল, টুনি ঘুম থেকে উঠেই দুধ খায়।

বরদামণি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রতুলের হাতে একটী সিকি দিলেন। প্রতুল প্রফুল্লচিত্তে যথাসম্ভব সত্বর গয়লা বাড়ীর দিকে ছুটিল। গৃহে ফিরিয়া প্রতুল দেখিল, তাহার কাকীমা বেশ মুড়িশুড়ি দিয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বাহিরে আসিতেছেন। প্রতুলকে দেখিবামাত্রই তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'কিরে, তুই কি এখন দুধ নিয়ে এলি? এতক্ষণ কি কর্‌ছিলি? বাড়ী যেন ভ্যান্ ভ্যান্ কর্‌ছে!'

বিনা বাক্যব্যয়ে একরাশ কাপড় লইয়া প্রতুল কাঁপিতে কাঁপিতে কূয়ায় কাপড় কাচিতে চলিয়া গেল।

মোক্ষদাসুন্দরী একবার বিরক্তিপূর্ণ চোখে প্রতুলের দিকে চাহিয়াই গৃহের মধ্যে ঢুকিয়া গেলেন। স্নান সমাপনে তিনি আহ্নিকে বসিলেন। সবেমাত্র আচমন্ করিয়া মন্ত্র জপিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বরদামণির গলার আওয়াজে তিনি চমকিয়া উঠিলেন।

সকালে বরদামণি ঠাকুরের জন্য ফুল তুলিতে গিয়া কূয়ার ধারে অস্ফুট কান্নার শব্দ শুনিতে পান। ভীতচিত্তে সেখানে গিয়া দেখেন যে প্রতুল পড়িয়া আছে ও তাহার মাথা হইতে ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়িতেছে। তিনি তাড়াতাড়ি আঁচলের খানিকটা ছিঁড়িয়া প্রতুলের মাথা বাঁধিয়া দিলেন। কিন্তু রক্ত বন্ধ হইল না। সাদা নেকড়াটী লাল রঙে রঞ্জিত হইয়া গেল। দুঃখে, ক্ষোভে বরদামণির চোখে জল আসিল। তিনি প্রতুলের হাত ধরিয়া মোক্ষদাসুন্দরীর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহ প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিয়াই বরদামণি তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'বলি, মোক্ষদা,—ও মোক্ষদা!' মোক্ষদাসুন্দরী আহ্নিক করিতে করিতে একবার ঘাড় তুলিয়া দেখিলেন যে বরদামণি ডাকিতেছেন। কোনও উত্তর না দিয়া তিনি জপ করিতে লাগিলেন। বরদামণি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'হ্যাঁ গা কানের মাথা কি একেবারে খেয়েছ? কোন্ চুলোয় আছ যে শুনতে পাচ্ছ না?'

কলহপ্রিয় মোক্ষদাসুন্দরী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন্ না। তৎক্ষণাৎ কোষাকুষি ফেলিয়া বাহিরে আসিলেন।

'কেন গা, কি হয়েছে কি? কিসের জন্য এত গালিগালাজ? আমি না হয় কানের মাথা খেয়ে বসে আছি, তোমার কি আর কোন চুলোয় ঠাঁই হলো না?'

বরদামণি বলিলেন, 'হ্যাঁ লা, তোর প্রাণে একটুও মায়া দয়া নেই? দেখ্ তো ছেলেটার কি হলো! বাবা! যেন জলজ্যান্ত তাড়কা!'

মোক্ষদাসুন্দরী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, 'কি! যত বড় মুখ নয় তার তত বড় কথা! বেরো বল্‌ছি আমার বাড়ী থেকে! তুই আমার বাড়ীতে ঢোকবার কে?'

বরদামণিও ছাড়িবার পাত্রী নহেন। তিনিও চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কি! তোর বাড়ী? এখুনি ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোবো জানিস্!'

এই সব চীৎকারে প্রতুলের কাকার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি কাপড় পরিতে পরিতে বাহিরে আসিলেন। টুনিও সেইখানে ছিল; মায়ের রুদ্রমূর্ত্তিতে ভীত হইয়া সে ছুটিয়া আসিয়া পিতার কোঁচা ধরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র মোক্ষদাসুন্দরী তৎক্ষণাৎ এক হাত ঘোমটা টানিয়া দিলেন। বরদামণিও মাথার কাপড় একটু অগ্রভাগে টানিয়া দিয়া, সরিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতুলের কাকা মোক্ষদাসুন্দরীর দিকে ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, 'কি হলো কি? বাড়ীতে যেন হুলুস্থুল পড়ে গেছে!' পরে বরদামণিকে বলিলেন, 'আর বরদাপিশি তোমাকেও বলি— আমরা কি ওকে খেতে পর্‌তে দিই না? আমাদের কি ওর উপর কোনও স্নেহমমতা নেই?'

বরদামণি বলিলেন, 'কেন, আমি কি তা' বলছি; এই দেখ না—'

বাধা দিয়া প্রতুলের কাকা বলিয়া উঠিলেন, 'না পিশি, আমি কি ওকে কোনও অযত্নে রেখেছি যে তুমি গায়ে পড়ে বল্‌তে এসেছ? বারবার এই রকম কোরে বল্‌লে পাড়ার লোকেরাই বা কি মনে কর্‌বে?'

কথার ধরণ দেখিয়া বরদামণির গা জ্বালা করিয়া

উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'বেশ্ ত, আমি আর গায়ে পড়ে বল্‌তে আসব না। তবে বাপ-মা-মরা ছেলে বলেই যা' বলা!' এই বলিয়া বরদামণি প্রতুলকে সরাইয়া দিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(৪)

দিন পাঁচ ছয় হইল টুনি জ্বরের তাড়নায় বেঘোরে পড়িয়া আছে। ডাক্তারও আসিতেছেন, কিন্তু রোগের কিছুমাত্র উপশম হইতেছে না। সমস্ত দিনই প্রতুল টুনির শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতেছিল ও মোক্ষদাসুন্দরী পার্শ্বে বসিয়া মাঝে মাঝে ভগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "টুনি—বাবা আমার, কেমন আছ?'

বৈকালে রোগীর অবস্থা কিছু ভাল বলিয়া বোধ হইল। রাত্রে প্রতুলের কাকা রোগীর কাছে আসিলেন ও প্রতুলকে শুইতে যাইতে বলিলেন। প্রায় মধ্য রাত্রে প্রতুলের কাকা প্রতুলের ঘরের ভিতর গিয়া ডাকিলেন, 'প্রতুল—প্রতুল! শীগ্‌গীর করে একবার আয় বাবা!'

প্রতুল তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল। সভয়ে টুনির ঘরে গিয়া দেখিল, তাহার মুখ পাংশু বর্ণ হইয়া গিয়াছে—ওষ্ঠদ্বয়ে রক্তের লেশমাত্র নাই।

প্রতুলের কাকা বলিলেন, 'প্রতুল! একবার ডাক্তারকে ডেকে আন্‌তে পার্‌বি, বাবা?'

প্রতুল দ্বিরুক্তি না করিয়া র‍্যাপারটী গায়ে জড়াইয়া ডাক্তার বাবুর বাড়ীর দিকে ছুটিল। ডাক্তার আসিলেন। তিনি বলিলেন, চিন্তার কোনও কারণ নাই। দুর্ব্বলতার জন্যই অবস্থা এরূপ হয়েছে।

পরদিন প্রাতঃকালে টুনি চক্ষু মেলিল। ক্ষীণ ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত করিয়া ডাকিল, 'দাদু—দাদু!'

প্রতুল জানালার ধারে দাঁড়াইয়াছিল। মোক্ষদাসুন্দরী তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'হতভাগা, এদিকে আয় না। ওর জন্যে টুনি কেঁদে মরে, ও তবু একবারও কাছে আস্‌তে পারে না!'

প্রতুল তাড়াতাড়ি টুনির কাছে আসিয়া ডাকিল, 'টুনি!' ইতিমধ্যে টুনি চক্ষু বুজিয়াছিল। দাদুর স্নেহ-লহরবে আবার চাহিয়া তাহার ছোট কচি কচি হাত দুটী দিয়া প্রতুলের গালের উপর থাবড়াইয়া আদর করিতে লাগিল।

প্রতুল বলিল, 'টুনি কেমন আছ? কি কষ্ট হচ্ছে?'

টুনি কোনও কথা বলিল না। দুই হাতে প্রতুলের কণ্ঠবেষ্টন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে টুনি বলিয়া উঠিল, 'দাদু! তোমাকে মা অত মারে কেন?'

টুনিও যে তাহার মার নির্ম্মম ব্যবহার জানিতে পারিয়াছে ভাবিয়া প্রতুলের নেত্রদ্বয় অশ্রুভরে টল্‌টল্ করিতে লাগিল। প্রতুল উচ্ছ্বসিত অশ্রু সম্বরণ করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'কই! কখন মারে?'

টুনি বলিল, 'এইতো মা তোমায় বক্‌লে। এবার যদি মা তোমাকে মারে তা'হলে আমি মাকে মার্‌বো!' এই বলিয়া টুনি কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রতুল কোনও কথা কহিল না; ধীরে ধীরে টুনিকে চুম্বন করিল।

টুনির এই ব্যবহারে মোক্ষদাসুন্দরীর চোখ হইতে কে যেন হিংসার পর্দ্দা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। মাতৃস্নেহের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া, চির-দুঃখী মা-হারা ছেলে প্রতুলের উপর স্নেহের-ধারা উথলিয়া পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতুলকে কোলে লইয়া একটা চুমু খাইয়া বলিলেন, 'না টুনি, আর তোমার দাদুকে মার্‌বো না। তুমি ভাল হয়ে ওঠ।'

ইতিমধ্যে প্রতুলের কাকা গৃহে প্রবেশ করিয়া সমস্তই দেখিতেছিলেন। টুনির নিকটে আসিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'টুনি, আজ থেকে এ প্রতুলের মা, তোমার মা নয়!'

টুনি নাসিকার অগ্রভাগ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'ইস্! তা বই কি!'

(৫)

'প্রতুল!'

'মাসীমা!'

'হাঁরে, আমি যদি মরে যাই, আমার জন্যে তোর মন কেমন কর্‌বে?'

প্রতুল কোনও উত্তর করিতে পারিল না, মাসীমার জ্বরতপ্ত কপালের উপর হাত বুলাইতে লাগিল।

বরদামণি বলিলেন, 'আয়, আমার সাম্নে এসে বোস্।'

প্রতুল চক্ষু মুছিতে মুছিতে মাসীমার আজ্ঞা পালন করিল।

বরদামণি বলিলেন, 'হ্যাঁরে প্রতুল, তুই কেঁদে ফেল্‌লি ?'

প্রতুল তথনও নিরুত্তর। তাহার একান্ত ব্যথিত ব্যগ্র চোখ দুটী দিয়া অবিশ্রান্ত ভাবে অশ্রু নির্গত হইতেছিল। বরদামণি ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সেই নিমীলিত অশ্রু উৎস নিজের শুষ্ক ওষ্ঠাধরের উপর টানিয়া লইলেন। প্রতুলের দুই চক্ষুর অশ্রু প্রবাহে তাঁহার মুখ, গলা, বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রতুল মাসীমার স্নেহপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বলিল, 'মাসীমা, তুমি মরে যাবে কেন ?'

ম্লান হাসি হাসিয়া বরদামণি বলিলেন, 'কেউ কি চিরদিনের জন্য থাকে রে ? আমার যে অসুখ হয়েছে বোধ হয় আর বেশীদিন বাঁচব না।'

প্রতুল দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, 'না মাসীমা, নিশ্চয় তুমি বাঁচবে।'

বরদামণির বুকভরা বেদনারাশির মধ্য হইতে একটী দীর্ঘশ্বাস শূন্যে মিলাইয়া গেল।

প্রতুল বলিল, 'মাসীমা, তুমি অমন কচ্ছ কেন ?'

বরদামণি বলিয়া উঠিলেন, 'না বাবা, আমার কিছু হয় নি ; তুই বাড়ী যা, অনেক দেরী হয়ে গেছে।'

প্রতুল চোখ মুছিতে মুছিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

* * * * *

দিন সাতেক হইল রোজই ডাক্তার আসিতেছেন। কিন্তু বরদামণির অবস্থা ক্রমশঃই সঙ্গীন হইয়া আসিতেছিল। এই কয় দিবস মোক্ষদাসুন্দরী রোজই বরদামণিকে দেখিতে আসিতেছিলেন। সেদিন তিনি বরদামণির অবস্থা দেখিয়া করুণস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

বরদামণি মোক্ষদাসুন্দরীকে কাছে দেখিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন, 'মোক্ষদা, আবার তোকে বল্‌ছি ভাই, সব কথা ভুলে গিয়ে প্রতুলকে নিজের ছেলের মত দেখিস্। ও যে বড় দীন, ওর এ সংসারে যে তুই ছাড়া আর কেউ নেই ভাই।'

বরদামণির কোঠরাগত চক্ষুদ্বয় হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মোক্ষদাসুন্দরী অশ্রুগাঢ় কণ্ঠে বলিলেন, 'বরদাপিশি! প্রতুল যে টুনির দাদা। তুমি ভাল হয়ে ওঠ তা'হলে ওর সব দুঃখ ঘুচে যাবে।'

বরদামণি ক্ষীণ ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত করিয়া বলিলেন, 'আমি আর বেশীক্ষণ নেই।'

মোক্ষদাসুন্দরী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, 'ছিঃ, অমন কথা কি বল্‌তে আছে ?'

চকিতে একটী ম্লান হাসি বরদামণির মুখটাকে আরও বিবর্ণ করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চক্ষু মুদিত হইয়া আসিল। সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল, নীচে হইতে ডাক্তারবাবু, প্রতুলের কাকা প্রভৃতি ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন, কিন্তু বরদামণি আর চোখ চাহিলেন না, আর কথা কহিলেন না। ইতিমধ্যে প্রতুল এক মাটির ভাঁড় হস্তে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘরে প্রবেশ করিল। সকলের কান্নাতে সেও কাঁদিয়া ফেলিল। পর মুহূর্ত্তে দুই হাত দিয়া মাসীমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিয়া উঠিল—'মাসীমা—মাসীমা গো!'

পরিচয়।

[শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী]

চাঁদের পরশ পাই সন্তানের মুখে।
জ্যোছনা সোহাগ রাশি প্রণয়ীর বুকে॥
সন্ধ্যার স্নিগ্ধতাটুকু মায়ের নয়ানে।
প্রভাত অরুণ হাসি পিতার বয়ানে॥
বন্ধুর সে স্নিগ্ধ ছবি উষার আলোক।
কন্যারূপে নিশীথিনী জাগায় পুলক॥
দোর্দ্দণ্ড মার্ত্তণ্ড আসে শাসকের রূপে।
ভগ্নিরূপে অপরাহ্ন আসে চুপে চুপে॥
ভ্রাতার প্রীতির ধারা মলয় বরষে।
তোমার পরশ জাগে ফুলের পরশে॥

দেশীয় ভৈষজ্যতত্ত্ব।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত]

"ত্রিকটু"

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

পিপ্পলী।

পিপ্পলীকে বাঙ্গালায় পিপুল বলে। মঃ—পিম্পঠ্ঠী, গুঃ—লণ্ডীপীপল, কঃ—পিপ্পলী, তৈঃ—পিপ্পল, তাঃ—পিম্পলী, বঃ—বঙ্গালি পিম্পয়িং, ফাঃ—পিল্‌পিল্‌দরাজ, অঃ—ভারফিল, কোচবঃ—পিপ্‌লী বলিয়া থাকে।

"পিপ্পলী মগধী কৃষ্ণা বৈদেহী চপলা কণা।
উপকুল্যোষণা শৌণ্ডীকোলা স্যাৎ তীক্ষ্ণতণ্ডুলা॥"

অর্থাৎ পিপ্পলী, মাগধী, কৃষ্ণা, বৈদেহী, চপলা, কণা, উপকুল্যা, উষণা, শৌণ্ডী, কোলা ও তীক্ষ্ণতণ্ডুলা এই কয়টী পিপ্পলীর একপর্য্যায়ক শব্দ।

"পিপ্পলী দীপনী বৃষ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী।
অনুষ্ণা কটুকা স্নিগ্ধা বাতশ্লেষ্মহরালঘুঃ॥
পিপ্পলী রেচনী হন্তি শ্বাসকাসোদরজ্বরাণ।
কুষ্ঠ প্রমেহ গুল্মার্শঃ প্লীহশূলাম মারুতান্॥"

পিপ্পলী—অগ্নিদীপ্তিকারক, পুষ্টিজনক, মধুর বিপাক, রসায়ন, শীতল, কটুরস, স্নিগ্ধ, লঘু, রেচক এবং বায়ু, কফ, শ্বাস, কাস, উদর জ্বর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, শূল ও আমবাতনাশক।

"আর্দ্রা কফপ্রদা স্নিগ্ধা শীতলা মধুরা গুরুঃ।
পিত্তপ্রশমনী সা তু শুষ্কা পিত্তপ্রকোপিনী॥"

কাঁচাপিপ্পলী কফকারক, স্নিগ্ধ, শীতল, মধুর রস, গুরু ও পিত্তনাশক, কিন্তু শুষ্ক হইলে পিত্ত প্রকুপিত করে।

"পিপ্পলী মধুসংযুক্তা মেদঃ কফবিনাশিনী।
শ্বাসকাস জ্বরহরাঃ বৃষ্যা মেধাগ্নি বর্দ্ধিনী॥"

মধু সহযোগে পিপ্পলী সেবন করিলে মেদঃ, কফ, শ্বাস, কাস ও জ্বর নষ্ট হয় ও শরীরের পুষ্টি, মেধাবৃদ্ধি ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

"জীর্ণজ্বরেঽগ্নিমান্দ্যে চ শস্যতে গুড়পিপ্পলী।
কাসাজীর্ণারুচিশ্বাসহৃৎপাণ্ডু ক্রিমিরোগনুৎ॥
দ্বিগুণাঃ পিপ্পলীচূর্ণাদ্ গুড়োঽত্র ভিষজাং মতঃ।"

গুড়ের সহিত পিপ্পলী সেবন করিলে জীর্ণজ্বর ও অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয় এবং কাস, অজীর্ণ, অরুচি, শ্বাস,

হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ ও ক্রিমি নষ্ট হয়। এস্থলে গুড়ের পরিমাণ পিপ্পলী অপেক্ষা দ্বিগুণ করা বৈদ্য সম্প্রদায়ের অভিমত।

এইবার আমি ভিন্ন ভিন্ন রোগে পিপ্পলীর ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করিব।

(১) বাতশ্লেষ্ম জ্বরে—পিপ্পলীর কাথ কফনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং বাতশ্লেষ্ম জ্বর ও প্লীহজ্বরনাশক।

(২) জ্বরে—পিপুল, আমলকী, চিতা, হরীতকী ও সৈন্ধব সমভাগ চূর্ণ জ্বরনাশক। ইহা ভেদী, রুচিকর, শ্লেষ্মঘ্ন, অগ্নিকর ও পাচক।

(৩) শ্লেষ্মাজ্বরে—মধুর সহিত পিপুল চূর্ণ সেবন করিলে শ্লেষ্মাজ্বর ভাল হয়।

(৪) কাসে—পিষ্ট পিপ্পলী ঘৃতে ভাজিয়া সৈন্ধব লবণ সহ সেবন করিলে কাস ভাল হয়।

(৫) কফজ কাসে—পিপুলের কল্ক তিলতৈলে ভাজিয়া মিছরির সহিত, কুলথ কলায়ের কাথে আপ্লুত করিয়া পান করিলে কফজ কাসে বিশেষ উপকার হয়।

(৬) বাতরক্তে—দুগ্ধ ও অন্ন ভোজন করিয়া পিপ্পলীর কাথ পান করিলে বাতরক্ত ভাল হয়।

(৭) ক্রিমিরোগে—পিপ্পলী মূল ছাগীমূত্রে পেষণ করিয়া পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

(৮) প্রবাহিকায়—পিপ্পলীর সূক্ষ্ম চূর্ণ সেবন করিলে প্রবাহিকা নষ্ট হয়।

(৯) রক্তপিত্তে—বাসকপত্র স্বরসে পিপ্পলী চূর্ণ ৭ বার ভাবনা দিয়া মধু সহ সেবনে রক্তপিত্ত নষ্ট হয়।

(১০) শোথে—শোথরোগী দুগ্ধের সহিত পিপ্পলী চূর্ণ সেবন করিবে।

(১১) অম্লপিত্তে—মধুর সহিত পিপ্পলী সেবন করিলে অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়।

(১২) প্রসূতির স্তন্য বর্দ্ধনার্থে—পিপ্পলী মূল ও মরিচ চূর্ণ দুগ্ধ সহ সেবন করিলে স্তন্য বর্দ্ধিত হয়।

(১৩) অর্শে—পিপ্পলী বা পিপ্পলীর মূল পেষণ পূর্ব্বক একটী মৃৎকলসীর অভ্যন্তর লিপ্ত করিয়া ঐ কলসীতে দুগ্ধ স্থাপন পূর্ব্বক দধি প্রস্তুত করিবে। অর্শরোগী সেই দধির তক্র পথ্যের সহিত সেবন করিবে। অথবা অন্নাহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক মাস কেবল ঐ তক্র পান করিবে।

(১৪) প্লীহায়—দুগ্ধের সহিত পিপুল চূর্ণ পান করিলে প্লীহায় বিশেষ উপকার হয়।

(১৫) গৃধ্রসী রোগে—গোমূত্র ও এরণ্ডতৈল যোগে পিপ্পলী পান করিলে বহু কালের গৃধ্রসী নামক কফ-বাতজ বাতব্যাধি ভাল হয়।

(১৬) নিদ্রানাশে—গুড়ের সহিত পিপ্পলী মূল চূর্ণ সেবন করিলে যাহাদের নিদ্রা হয় না তাহাদের নিদ্রা হয়।

(১৭) পরিণামশূলে—পিপুলের কাথ ও কল্ক সহ যথা-বিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পাকান্তে দুগ্ধ পান করিতে হইবে। ইহা পরিণামশূলের একটী অমোঘ ঔষধ।

পাশ্চাত্য মত—

Actions and Uses—Stimulant, carminative, laxative and alterative; given in chest affections, dispepsia, chronic cough, enlargement of the spleen and other abdominal viscera, gout, lumbago etc, as a resolvent. They are useful in relieving the symptoms due to obstructions of the liver and spleen with pakhanbheda a paste of them is applied to the breasts as a lactagogue.—*Materia Medica of Indica—R. N. Khory—II. P. 519*

অর্থাৎ পিপ্পলী উষ্ণ বায়ুনাশক, মৃদুরেচক ও রসায়ন। ইহা কাস, গ্রহণী, পুরাতন কফ রোগ, প্লীহা যকৃৎ বৃদ্ধি, আমবাত, কটীবাত প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। পাষাণ ভেদ সহ স্তনে ইহার প্রলেপ দিলে স্তনে অধিক পরিমাণে স্তন্য সঞ্চিত হয়। (আর, এন্, খোরি)

উপরি লিখিত ঔষধগুলির মধ্যে যেগুলির প্রস্তুত বিধি প্রদত্ত হয় নাই তাহাদের প্রস্তুতপ্রণালী—সমুদয় দ্রব্য দুই তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছেঁকিয়া সেব্য।

সত্যেন্দ্রনাথ।

[শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল]

বাঙালীর কবি সত্যেন্দ্রনাথ আর ইহলোকে নেই! কাব্যগগনের পূর্ণচন্দ্র অকালে জ্যোৎস্না-মাধুরীসমেত মৃত্যু-মেঘের অন্তরালে চিরকালের জন্ম অন্তর্হিত হয়েছেন। বাঙলার সাহিত্য-জগতে ভাবের দিক থেকে যেন ইন্দ্রপাত হয়ে গেছে।

বাঙ্‌লা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টিকর্ত্তা ৺অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ। ১২৮৮ সালের মকর-সংক্রান্তির দিন সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয়, বেলঘরিয়ার নিকটে নিমৃতা গ্রামে, তাঁর মাতুলালয়ে। সত্যেন্দ্র ছেলেবেলায় অত্যন্ত রুগ্ন ছিলেন, বয়স হলেও এ রুগ্ন শরীর কোন দিনই স্বচ্ছন্দ হতে পারেনি।

শৈশব থেকেই তিনি সাহিত্যিক আবেষ্টনের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। পিতামহের লাইব্রেরী, পিতা ৺রজনী নাথ দত্তের সাহিত্য-সেবা, মাতুল শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্রের ছোট গল্প লেখা—এরই মধ্যে তিনি বড় হয়েছিলেন। সাহিত্যের আবহাওয়ায় তাঁর শিশুচিত্ত মুঞ্জরিত হয়।

সত্যেন্দ্র বি, এ পর্য্যন্ত পড়ে' কলেজের পড়া সাঙ্গ করেন—তা হলেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। নানা দেশের ইতিহাস, দর্শন, কাব্য আর সাহিত্য তিনি নৈষ্ঠিক ছাত্রের মতই বিশেষ অভিনিবেশ-সহকারেই পড়েছিলেন। তাঁর লাইব্রেরী বাঙলা দেশেই একটী দেখবার সামগ্রী। অগাধ টাকার মালিক সত্যেন্দ্রনাথকে উদরান্নের জন্ম ব্যবসায় বা চাকুরির পিছনে কোন দিনই ছুটতে হয়নি। তাঁর অবসর ছিল প্রচুর; আর এই অবসর পড়া-শোনায় আর বাণীর সেবাতেই তিনি যাপন করে গেছেন। তাঁর চালচলন ছিল খুব সাদাসিধা,—কোন রকম বিলাসের ধারও তিনি ধারতেন না। বিলাসিতাকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখতেন।

সত্যেন্দ্রনাথ খুব বড় কবি ছিলেন। কবি-প্রতিভার হিসাবে তাঁর আসন ছিল ঠিক রবীন্দ্রনাথের পাশেই—একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের পাশে আসন পাবার যোগ্য কবি আজও বাঙলা দেশে দেখা দেন্ নি। সত্যেন্দ্রনাথ ১০।১২ বৎসর বয়স থেকে কবিতা লিখতে সুরু করেন। তাঁর গুরু ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর ভক্তির আর সীমা ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ চির দিনই বলতেন, রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙলার নয়, বিশ্বের মধ্যে এখন শ্রেষ্ঠ কবি।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "বেণু ও বীণা" যখন প্রকাশিত হলো, তখন কবিতার পাঠক এ দেশে খুব অল্পই ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ মাসিকপত্রের ঢেউয়ের মাথায় কোনদিন ফেনার মত ভেসে বেড়ান নি,—কিন্তু তাঁর 'বেণু ও বীণা' পড়ে পাঠকসমাজ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। সকলেই বুঝলে,—রবীন্দ্রনাথের পর একজন কবির উদয় হলো আবার। তারপর সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভা নিত্য নব ছন্দে নূতন মালা গেঁথে ভারতীর চরণ শোভায় ভরিয়ে তুলতে লাগলেন। তাঁর হোমশিখা, অভ্র-আবীর, কুহু ও কেকা, ফুলের ফসল, তুলির লিখন একে একে আত্মপ্রকাশ করে বৈচিত্র্যে, সৌন্দর্য্যে, দীপ্তিতে, অভিনবত্বে বাংলার কাব্যকুঞ্জ আলোয় ভরে' দিলে। সুরে যেমন বৈচিত্র্য, ছন্দে তেমনি লীলা—এ যেন একেবারে আনন্দের ঝরণা বয়ে এল!

তাঁর তীর্থসলিল, তীর্থরেণু, মণিমঞ্জুষা—জগতের শ্রেষ্ঠ ভাবসমূহের নিপুণ-ললিত ছন্দানুবাদ। শুধু নিপুণ বললে এগুলির সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না—এগুলি মূল কবিতার মতই তাজা, প্রাণবন্ত—'একই কালে অনুবাদ ও নূতন কাব্য।'

সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দের রাজা ছিলেন। ছন্দের খেলায় এমন ওস্তাদী হাত আর কেউ কোন দিন দেখাতে পারেন

নি। রবীন্দ্রনাথ নিজের মুখে বলেছেন, ছন্দের উপর এ অধিকার, এমন দখল তাঁরও বুঝি নেই! নানা বিদেশী ছন্দের সুর আর ভঙ্গী, সংস্কৃত ছন্দের সুর আর ভঙ্গী—তা কি হালকা আর কি গম্ভীর জটিল—এ সমস্তই এমন অনায়াসে সত্যেন্দ্র বাংলা কাব্যে আমদানি করেছেন যে, তা দেখে বিস্ময়ে চমৎকৃত হতে হয়! তাছাড়া চরকার সুর, ঝরণার সুর, গ্রীষ্মের গুমট সুর, বর্ষার বিদ্যুৎ-নাচানো সুর, পাল্কী বেহারার পাল্কী বহার সুর, পিয়ানোর সুর—সত্যেন্দ্রনাথ ঐন্দ্রজালিকের মত বাঙলা ভাষায় ছন্দে ধরে বেঁধে দিয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার একটি আরো বিশেষত্ব ছিল এই,—তাঁর প্রতিভা কোনদিন মর্ত্ত্যের ধূলি ছেড়ে আকাশের ধোঁয়ায় বিলীন হয়ে যায়নি। এই মর্ত্ত্যের মাটীকে আঁকড়ে ঘিরে তাঁর স্নেহ, অনুরাগ, মমতা, শ্রদ্ধা সমস্তই তিনি ছন্দে-সুরে জাগিয়ে তুলেছেন। মর্ত্ত্যের মাটী তাঁর কাছে ছিল মাণিকের মুঠি, প্রাণে ভরা! মর্ত্ত্যের মানুষ ছিল তাঁর মরমের বন্ধু। মানুষ কেউই ঘৃণ্য নয়—অশুচি নয়, হেয় নয়। মানুষ হৃদয়ের বন্ধু, মানুষ দরদের পাত্র, মানুষ দেবতা। নারীর মন আর যৌবন নিয়ে চটুল খেলা তিনি খেলেন নি কোন দিন। নারী তাঁর চোখে পুরুষের ভোগের সামগ্রী নয়—নারী মহিমাময়ী দেবী, মায়ের জাতি। ফলে-ফুলে ভরা এই শ্যামাপ্রকৃতি, ঝর-ঝর-ঝরা ঝর্ণা, কলনাদিনী নদী—এ সমস্তই প্রাণবান্, জীবন্ত! দেশ তাঁর কাছে মাটীর জড় স্তূপ নয়—সে 'মূর্ত্তিমন্ত মায়ের স্নেহ!'

সত্যেন্দ্র সুন্দরের কবি, আনন্দের কবি, আশার কবি। তিনি শক্তির পূজারী, মনুষ্যত্বের সাধক, মহত্বের কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। তিনি ছিলেন ধরণীর মরমী বন্ধু। তাঁর দরদ আর সহানুভূতির ব্যাপকতা ছিল অসীম। জাতি-বিজাতির ভেদ ছিল না তাঁর কাছে। মানুষের মাঝে অথর্ব্ব পাঁচিল তুলে চিরদিন সমাজে-সমাজে যে ব্যবধান গড়ে মানুষকে মানুষের কাছ থেকে দূর করে দেবার চেষ্টা করেছে, সে পাঁচিল ভাঙতে সত্যেন্দ্র একেবারে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁর রচনায় আগাগোড়া সাম্য সামের রাগিণী উঠেছে। যত কিছু কুৎসিত হীন আচার আর নিগড়ের বিরুদ্ধে কখনো তাঁর বেদনার সুর উঠেছে, কখনো বা তীব্র ভাষায় আগুনের ছন্দে তিনি তার উচ্ছেদে বাণ হেনেছেন সবলে। মানুষ হিসাবেও সত্যেন্দ্র একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন, ভারী খাঁটী নিখুঁত। তিনি ছিলেন সত্যের উপাসক। যা-কিছু মিথ্যা বা পাপ বা কুৎসিত, তিনি ছিলেন সে-সবের শত্রু! তার বিরুদ্ধে তিনি নির্ম্মম কঠোর ভাবে চিরদিন লেখনী চালনা করেছেন। এ-সবের সঙ্গে রফা করবার পাত্র তিনি মোটেই ছিলেন না। তাঁর মাতৃভক্তি ছিল অপরিসীম—মার সঙ্গে তিনিও একাদশী করতেন। মা ছিলেন তাঁর দেবতা। তিনি বলতেন, মাতৃহীন কাকেও দেখলে আমি শিউরে উঠি, কি দুর্ভাগা!

তাঁর বন্ধুপ্রীতিও তেমনি ছিল। তাঁর বন্ধুর সংখ্যা ছিল অল্প, তিনি খুব অল্প লোকের সঙ্গেই মিশতেন—তাঁর প্রকৃতি ছিল খুব shy ধরণের, কিন্তু এই অল্পসংখ্যক বন্ধুরা ছিল তাঁর প্রাণের অধিক। তাঁদের সুখে-দুঃখে সত্যেন্দ্র সুখী হতেন, দুঃখ পেতেন।

দেশে যখনই দুর্দ্দিন এসেছে, সত্যেন্দ্র তখনই বেদনার গানে সহানুভূতি জাগিয়েছেন। সে দুর্য্যোগে আলোর রশ্মি পথে ছড়িয়েছেন। দেশের নব-জাগরণে সত্যেন্দ্র যে সুর তুলে সুপ্ত জাতির চেতনা সঞ্চারে প্রয়াস পেয়েছেন, সে সব গান, সে সব সুর মন্ত্রের কাজ করবে। সে সব ছন্দ মাণিকের মত এই জাতীয় উদ্বোধনের ইতিহাসের পাতায় পাতায় জ্বল্ জ্বল্ করবে।

সত্যেন্দ্র শক্তির সাধক ছিলেন। দুর্ব্বল দেশে চিরদিনই শক্তির গান গেয়েছেন তিনি। দেশকে নিখুঁত করে জানতেন,—দেশের গৌরব গানে গেয়ে দেশের কত হারানো ভোলা কীর্ত্তির পরিচয় দিয়ে তিনি দেশের সৌন্দর্য্য ছন্দের ছবিতে ফুটিয়ে গিয়েছেন! যাক, আজ তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেবার সময় নয়।

এ দুর্দ্দিনে আজ তাঁকে হারিয়ে ভবিষ্যৎ যেন অন্ধকার দেখছি! কিন্তু না, তা দেখলে হবে না—সত্যেন্দ্রনাথ সুরের আলোয় যে রশ্মি ছড়িয়ে গিয়েছেন, সেই আলোই আমাদের গাইড হোক্। সত্যেন্দ্রর শক্তি, সত্যেন্দ্রর সাধনা

আমাদের হৃদয় আশায় উদ্বুদ্ধ রাখুক। সত্যেন্দ্রকে মনে প্রাণে অনুভব করে আমরা জীবনের পথে চলব, তাতে সত্যেন্দ্রকে কোন দিনই হারাব না—তাতে সত্যেন্দ্রর প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতা প্রদর্শিত হবে। জাতীয়তার কবির আত্মা জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখে তা হলে তৃপ্ত হবেন।

সার্থক যৌবন।

[শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়, বি-এ]

১

আজি লাল-ফুল-দোল আজি মোর রাস,
প্রেমের যমুনা জলে সলীল-বিলাস।
তরুণ অরুণ সম নব অনুরাগ,
ছিটান বাসনা—কম-কমল-পরাগ।

২

প্রেম আজি ভাবাময় বিপিন-বাঁশরী,
প্রাণ আজি আশাময় দিবা বিভাবরী।
রূপে-রূপে দুটী চোখ ভরা নিশিদিন,
আঁধার আলোকময় বাধা বিঘ্নহীন।

৩

দেখে আজ হাসি পায় জড়তার ভাব,
ক্ষতি আজ ক্ষতি নয় ষোল আনা লাভ।
মধুমাস প্রকটিত সদা ফুলে ফলে,
বিকশিত প্রেম-পদ্ম প্রণয়-মৃণালে।

৪

কামনা মাধবীলতা ভুবন-ভবনে,
চঞ্চল হিয়ার গতি বাঁধা বল্গাসনে।
কল্পলতা দেয় দেব পূজা উপহার,
উদ্দাম-সংযত মম হৃদয় বিকার।

৫

আজি প্রেম-বৃন্দাবনে একাকী আসিয়া,
বসে আছি পাছে যায় আসিয়া ফিরিয়া।
মিলন-কদম্বমূলে সব লয়ে একা,
প্রতীক্ষায় আছি বসে হবে ব'লে দেখা।

৬

চপল পুলক রাজি ধরণীর শোভা,
যৌবন-গৌরব মোর প্রেম মনোলোভা
সফল হইবে আজ মিলনের ক্ষণে,
দেখা যদি হয় সেই প্রিয়জন সনে।

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

বিবাহ, বংশবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য।

বিবাহ, বংশবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য, এই তিনের মধ্যে সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ভারতবাসী অন্যান্য জাতির তুলনায় দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবী। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, স্ফূর্ত্তির অভাবে ও দুশ্চিন্তায় এ জাতির জীবনীশক্তি দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। কিসে দারিদ্র্য দূরীভূত হইবে এ বিষয়ে বর্ত্তমানে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার সাধন ও বিদেশে খাদ্য-সামগ্রীর অবাধ রপ্তানি বন্ধ দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে জাতীয় দারিদ্র্যের অনেক পরিমাণে প্রতিকার হইতে পারে সত্য, কিন্তু ইহার ফল স্থায়ী হইবে না, যদি নিঃসম্বল বিবাহ ও

অকাল-মাতৃত্ব চলিতে থাকে। এ বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যের ফলে আমাদের পারিবারিক অশান্তি, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা ও অকালমৃত্যু দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক স্থলেই দেখা যায়, বর ও কন্যা উভয় পক্ষই কেবলমাত্র পদ-মর্য্যাদা ও ধনের মোহে আকৃষ্ট হইয়া বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন, এবং সে অবিবেচনার ফলও তাঁহারা অচিরেই হাতে হাতে পাইয়া থাকেন। শিক্ষার সার্থকতা কি, যদি তাহা মানুষকে সুবিবেচক ও চরিত্রবান করিয়া না তোলে? ক্রোধের বশীভূত হইয়া অপরের সামান্য অশান্তির কারণ ঘটাইলে, সমাজে আইনানুযায়ী দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কেহ যদি রিপুর উত্তেজনায় সন্তান-উৎপাদনের নামে স্ত্রী বা সন্তানের প্রাণনাশের কারণ হয়, বা ভবিষ্যৎ বংশকে ক্ষীণজীবী, বংশগত-রোগাক্রান্ত, দুর্ব্বল ও দরিদ্র করে, তবে সমাজ কি সে পাপে উদাসীন থাকিবে? একটা সামান্য চাকরীর জন্য কত না যোগ্যতার নিদর্শন উপস্থিত করিতে হয়! কিন্তু পিতৃত্বে ও মাতৃত্বে কি কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নাই? কোন দায়িত্ব নাই? স্বার্থপরতা ও দায়িত্ববোধ-হীনতা দাম্পত্যজীবনের পরমশত্রু। প্রাচীনকালে, এক সময়ে হয়ত জন-সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন "জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি" দরিদ্রদেশে এই দায়িত্বহীন, ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা সমাজে কত না অনিষ্ট সাধন করিতেছি! পণ্ডিতপ্রবর John Stuart Mill বলিতেছেন—"Little improvement can be expected in morality until the producing of large families is regarded with the same feeling as drunkenness or any other physical excess."

স্ত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আর্থিক অবস্থানুযায়ী বংশবৃদ্ধি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা বাঞ্ছনীয়। পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষিত সমাজে এ বিষয়ে নির্দ্দোষ বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারা প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতেছে। কেহ কেহ মনে করেন, জন-সংখ্যার দ্বারাই জাতি জনবলে শক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠিবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, অনাহারক্লিষ্ট, রুগ্ন, দুর্ব্বল ও হীনচরিত্র জনসমষ্টি দ্বারা কোন জাতিই কখনো শ্রীমান্ বা শক্তিমান্ হইয়া উঠিতে পারে না, বরং তাহার বিপরীত ফলই অবশ্যম্ভাবী।

মহাত্মা গান্ধি, Tolstoy, Plato, Malthus, Darwin, Aristotle, Mill, Huxley, Annie Besant ও Herbert Spencer প্রভৃতি মনীষিগণ সমাজের কল্যাণের জন্য অবাধ বংশবৃদ্ধির ও অযোগ্যের বিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবকে লজ্জা করিলে ঠকিতে হয়। বীরবল বলিয়াছেন, "আমার মতে যা সত্য তা গোপন করা সুনীতি নয় এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয়"।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—ভারতী, আষাঢ় ১৩২৯।

প্রাপ্তি স্বীকার।

স্বদেশজাত দ্রব্যাদির ব্যবহারে স্বদেশী যুগে কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী মেসার্স পি, এম, বাগচী এণ্ড কোম্পানী নীরব কর্ম্মী। স্বদেশী যুগের বহু পূর্ব্ব হইতে ইঁহাদের লিখিবার কালী ভারতে অদ্বিতীয় হইয়া রহিয়াছে, এবং বিলাতীর সহিত সমান ভাবে প্রতিযোগীতা করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি এই কোম্পানীর শ্রীযুক্ত পি, বাগচী "নিমা" নামক জুতার কালী বাহির করিয়াছেন। আমরা উহা ব্যবহার করিয়া আশাতীত আনন্দলাভ করিয়াছি। ইহা শুধু মাখাইলেই বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, 'ব্রুশ' করিতে হয় না। এই স্বদেশী যুগে "Nima—Waterproof Blacking" দেশের একটা প্রকৃত অভাব দূর করিল। শিশি, প্যাকিং, কর্ক, স্পঞ্জ সমস্তই বিলাতীর অনুরূপ। সাহস করিয়া বলিতেছি, ইহা ব্যবহারে সন্তোষ লাভ করিতেই হইবে।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১৯শ ভাগ] } ভাদ্র, ১৩২৯। { [৭ম সংখ্যা

কেহামার অভিশাপ।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ, বি-এল]

প্রথম সর্গের নাম "অন্ত্যেষ্টি"। সাদের রচনা-ভঙ্গীর একটু নমুনা পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এস্থলে প্রদত্ত হইল। "নিশীথ সময়। সেই রাজধানীতে কিন্তু কেহ নিদ্রা যায় নাই! উজ্জ্বল আলোকে রাস্তাগুলি যেন ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিয়া রক্তবর্ণ আকাশে অগ্নি সংযোগ করিয়াছে। অসংখ্য নর নারী জনাকীর্ণ বর্ত্মে ক্রমশঃই জনতা বৃদ্ধি করিতেছে। প্রভু ও ক্রীতদাস, বৃদ্ধ ও শিশু, সকলেই ভাল করিয়া দেখিবার জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছে। বাটীর ছাদ ও বারাণ্ডায় স্ত্রীগণ সমবেত হইয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়াছে। তাহাদের অতৃপ্ত নয়ন মহাযাত্রার জাঁকজমক ভাল করিয়া দেখিতে চাহে। এই শোকাবহ দৃশ্য তাহাদের চক্ষে কেবল যেন আনন্দের দৃশ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। নক্ষত্রগণ! তোমাদের ঝিকি-মিকি কিরণ বৃথা বর্ষণ করিতেছ। ঐ অস্বাভাবিক আলোকে দিনের নেত্রও ভয়ে মুদিয়া যায়। চন্দ্রমা! স্বর্গপথের দ্বারে অবস্থান করিয়া কেন বৃথা রশ্মি ঢালিতেছ? দশ সহস্র মশাল গভীর রাত্রে বায়ুর বক্ষে প্রজ্বলিত হইয়া যে এক বিরাট শিখার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার তীব্র আলোক স্বর্গের দীপাবলীকে মুছিয়া ফেলিতেছে! দেখ, সুগন্ধ ধূম স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধগামী হইয়া অগ্নিময় আকাশে ভাসিতেছে, আর যেন কৃষ্ণবর্ণ চঞ্চল চন্দ্রাতপের ন্যায় অতি উচ্চে অবলম্বনশূন্য অবস্থায় রহিয়াছে। অই শুন, মহাপ্রয়াণের ভেরী নিনাদ! এ যে মৃত্যুর সঙ্গীত! দশ সহস্র ঢাক যুগপৎ বাজিয়া উঠিয়া যেন একটিমাত্র সুদীর্ঘ বজ্র-নির্ঘোষে কর্ণকে পীড়া দিতেছে। দশ সহস্র কণ্ঠস্বর সেই শব্দের সহিত মিশিয়া যেন একটি মাত্র অস্পষ্ট তীব্র শব্দে তাহাদের হৃদয়-বিদারক কর্কশতা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিতেছে! কর্ণ-বধিরকর শব্দে প্রশংসার গীতি ডুবিয়া গেল। তুমি এখন আর ভেরীর স্বর বা বিলাপকারীদের হাহাকার শুনিতে পাইতেছ না, যদিও ভেরীর শব্দ ও মৃত্যুর সঙ্গীত মিলিত হইয়া মহাযাত্রার চীৎকারকে তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে। তাহা হইলেও সর্ব্বোপরি দিগন্তব্যাপী জয়ধ্বনি সেই নামটির প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে আর তাহা ঘুরিয়া ফিরিয়া শুনা যাইতেছে।—সেই অগণিত জনসঙ্ঘ হইতে দশ সহস্র কণ্ঠ সমস্বরে দশ বার করিয়া অর্ব্বালনের নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। অর্ব্বালন! অর্ব্বালন!! অর্ব্বালন!!! সেই অত্যুচ্চ কণ্ঠ-

স্বর গৃহ হইতে গৃহান্তরে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইয়া যেন চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, দুর্গ হইতে দুর্গান্তরে গড়াইয়া যাইতেছে। মৃত্যুর শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। যাত্রীদের কেশহীন মস্তক মশালের আলোয় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা অগ্রগামী হইয়া সময়োপযোগী মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে চলিয়াছে। এইবার তাহারা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—অর্ব্বালন! অর্ব্বালন!! সেই শব্দ যেন হঠাৎ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া লাফাইয়া উঠিল। সকলেই সমস্বরে উত্তর দিল—অর্ব্বালন! অর্ব্বালন!! তোমরা বৃথা তাহার কর্ণে ঐ নাম শুনাইতেছ! তোমরা কি মৃতকে চিরনিদ্রা হইতে জাগাইতে পার? ঐ যে ঐ শিবিকাতে অর্ব্বালনকে সরলভাবে বসাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। তাহাকে সকলেই দেখিতে পাইতেছে। তাহার মুখমণ্ডলে কেমন এক জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনে হয় যেন জীবন্ত ব্যক্তির রক্তাভ মূর্ত্তি। তা নয়, রক্তবর্ণ চন্দ্রাতপ তাহার গণ্ডদেশে লাল আভা ফেলিয়াছে। ঐ যে সে নড়িতেছে না! মস্তক নত করিয়া অভিবাদন করিতেছে? না না, মৃতদেহ উচ্চে রক্ষিত হওয়াতে বাহকদিগের প্রতি পদক্ষেপে তাহা নড়িতেছে আর আপনার ভারে আপনি দুলিতেছে। কেহামা মৃত পুত্রকে অনুসরণ করিতেছিলেন। শোকসঙ্গীতে তিনি যোগ-দান করেন নাই বা সেই প্রিয় নাম ধরিয়া তিনি ডাকেন নাই। অবনত মস্তকে, শোকের পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া, বক্ষোপরি হস্তদ্বয় ন্যস্ত করিয়া, চিন্তায় মগ্ন হইয়া নিঃশব্দে তিনি চলিয়াছেন। পৃথিবীর রাজাকে তাঁহার ক্রীতদাসেরা এক্ষণে ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিতেছে না। দুরবস্থাপন্ন প্রভুকে তাহারা দেখিতেছে। প্রবল পরাক্রান্ত রাজার দুঃখ দেখিয়া তাহারা আনন্দিত হইয়াছে। স্বয়ং প্রকৃতি যেন রাজার দর্পাতিশয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আঘাত করিয়াছেন আর- মানব জাতির প্রভুস্থানীয়কে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, তিনি মানুষ ছাড়া আর কিছুই নহেন, অদৃষ্টের হাত হইতে তাঁহার অব্যাহতি নাই।"

অর্ব্বালনের যুবতী ভার্য্যাদ্বয় অজলা ও নলিনী আসিতেছেন। হায়, হায়! আজ কি তাঁহাদের বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইবে তাই তাঁহারা অমন করিয়া হীরক খচিত স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া শিবিকারোহণে চলিয়াছেন? আর তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন নৃত্য গীত সহকারে তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া চলিতেছে?

ইহার পর একটি লোক তাহার কুমারী কন্যার সহিত আসিল। এই অসম-সাহসী ব্যক্তিই কি অর্ব্বালনকে হত্যা করিয়াছে? কে বলিতে পারে যে ইহার প্রতি অর্ব্বালন দুর্ব্ব্যবহার করে নাই? আর তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সে তাহাকে হত্যা করে নাই?

শোভাযাত্রার এই সকল দৃশ্য হইতে বহু দূরে চন্দন কাষ্ঠে সজ্জিত চিতা রহিয়াছে। অজলা নিরুদ্বিগ্নচিত্তে চিতারোহণ করিয়া মৃত স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে রক্ষা করিলেন। নলিনীর অঙ্গ হইতে অলঙ্কার সকল খুলিয়া লওয়া হইল। তাহারা কেবল বিবাহের গাঁট-ছড়াটি তাহার কণ্ঠদেশ হইতে অপসৃত করিল না। নলিনীর ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশ তাহারা পুষ্পবিন্যাসে সজ্জিত করিল। সেই লোক-সমুদ্রের দিকে নলিনী কাতর দৃষ্টিতে জীবন-ভিক্ষা চাহিতে-ছিলেন। বল প্রয়োগে তাঁহাকে সেই চিতার নিকট লইয়া যাওয়া হইল। নিষ্ঠুর লোকেরা তাঁহাকে মৃতদেহের সহিত বাঁধিয়া ফেলিল।

ব্রাহ্মণগণ প্রত্যেকে প্রজ্বলিত মশাল লইয়া চিতাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। অর্ব্বালনের পিতা কেহামা চিতায় অগ্নিসংযোগ করিলেন। চিতাকে বেষ্টন করিয়া তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইল। বাদ্যভাণ্ডের কি উৎসাহ! চীৎকারের কি উল্লাস! যেন সকলেই মদ্যপানে উন্মত্ত। তারপর সব থামিয়া গেল, কেবল চিতা হইতে উত্থিত অগ্নি-শিখার মল্লযুদ্ধের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় সর্গের নাম "অভিশাপ"। যখন অর্ব্বালনের প্রেতাত্মাকে অন্ন ও মধু প্রদত্ত হইল তখন একমাত্র কেহামা তাহাকে দেখিতে পাইলেন। মৃত পুত্র পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। অর্ব্বালন বলিল, "যমরাজা যতদিন পর্য্যন্ত না আমার বিচার করিবেন ততদিন পর্য্যন্ত কি আপনি আমাকে এই ভাবে

দারুণ শীতে কষ্টভোগ করাইবেন? "আমাকে পুনর্জীবিত করুন, নহিলে আপনাকে লোকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিবে কেন?" কেহামা মন্ত্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি তোমার বুদ্ধিহীনতার ফল ভোগ করিতেছ।" "আপনি ত সর্ব্বশক্তিমান, বাহ্য প্রকৃতি ত আপনার আজ্ঞা পালন করিবে?" কেহামা বলিলেন, "ভাল, অতীতের উপর আমার হাত নাই, কিন্তু অদৃষ্ট ভবিষ্যতে আমার আজ্ঞা শুনিতে বাধ্য হইবে। তোমাকে যমের ইচ্ছায় শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। আর ইতিমধ্যে তুমি যাহাতে তোমার কষ্ট লাঘব করিতে পার তজ্জন্য তোমাকে আমি উপযোগী ক্ষমতা অর্পণ করিলাম।" অর্ব্বালন বলিল, "প্রতিহিংসার ফলে যাহা ঘটিবে কেবল সেইটি যেন আমি দেখিতে পাই। নিমেষের শাস্তি নয়, একটিমাত্র আঘাতেই প্রতিহিংসার শেষ হইবে না। আমার হত্যাকারীকে দীর্ঘকালব্যাপী মর্ম্মভেদী যাতনা ভোগ করা চাই।" কেহামা বলিলেন, "ইহাই যদি তোমাকে সুখী করে তাহা হইলে—তথাস্তু।" কেহামার আজ্ঞায় হত্যাকারী আনীত হইল। লহুর্লদ যখন রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তাহার কন্যা কইলিয়া প্রাণভয়ে দেবী মরিয়াতলীর প্রতিমাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। রাজার লোকেরা তাহাকে বল প্রয়োগে সেই প্রতিমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল। ক্রোধে দেবীমূর্ত্তি কাঁপিতে লাগিল, লোকেরা মনে করিল যে, বুঝি কইলিয়ার হস্তদ্বয় শিথিল হইয়াছে। তাহারা আরও জোরে তাহাকে টানিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল। তাহার পর অকস্মাৎ নদীর তীরদেশে ভাঙ্গন পড়িল আর তাহারা সকলেই নদীগর্ভে তলাইয়া গেল। কেহামা বলিলেন, "লহুর্লদ! তোর কন্যা সরিয়া পড়িল, কিন্তু তুই ত এখানে আছিস?" লহুর্লদ বলিল, "আমাকে কৃপা করিয়া ক্ষমা করুন। আমার কন্যার ধর্ম্ম রক্ষার্থে আমি অকস্মাৎ ক্রোধের বশীভূত হইয়া যুবরাজকে হত্যা করিয়াছি।" কেহামা তাহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন যে, সে কোনও ব্যাধি বা বাহ্য প্রকৃতির উৎপাত ভোগ করিবে না, জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি দৈবশক্তি তাহাকে কোনও রূপে কষ্ট দিতে পারিবে না, কিন্তু কোনও প্রকার ফল বা খাদ্য দ্রব্য, জল বা শিশির তাহার স্পর্শাতীত হইবে, নিদ্রা তাহাকে ভুলিয়া যাইবে।" অভিশপ্ত লহুর্লদ প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় নির্ব্বাক হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

তৃতীয় সর্গের নাম "পুনর্মিলন"। রাজা কেহামা চিতার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চিতার অগ্নি তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। এদিকে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যখন শেষ হইতেছিল, লহুর্লদ সেই নদী তীরে একাকী দাঁড়াইয়া অভিশাপের নিষ্ঠুরতার বিষয় চিন্তা করিতেছিল। কোথায় যে সে যাইবে, কি করিবে, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিলে লহুর্লদ উষার আলোকে নদীবক্ষে কি যেন একটা কিছু ভাসিতেছে দেখিতে পাইল। একটি বালিকার মৃতদেহ না! লহুর্লদ সেই দিকে ছুটিয়া চলিল। নদীর জল তাহাকে দেখিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। লহুর্লদ ছুটিয়া গিয়া মরিয়াতলীর মূর্ত্তিটিকে ধরিল। কইলিয়া তখনও অজ্ঞানাবস্থায় সেই মূর্ত্তিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। লহুর্লদ তাহাকে লইয়া নদীর পরপারে পৌঁছিল। কইলিয়া প্রকৃতিস্থ হইলে পিতার অভিশাপের কথা শুনিল। তাই ত! নদীর ভিতর দিয়া গমন করিবার পরেও ত লহুর্লদের বস্ত্র আর্দ্র হয় নাই!

চতুর্থ সর্গের নাম "প্রস্থান"। একটি বৃক্ষের পাদদেশে লহুর্লদ যেন অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া আছে, আর বলিতেছে যে, এই অভিশাপ হইতে মুক্তিদান করা বিষ্ণু ও শিবের অসাধ্য। তাহার কন্যা বলিল, "দেবতার প্রতি বিশ্বাসহীন হইবেন না। দরিদ্রের রক্ষাকর্ত্রী দেবী মরিয়াতলীর কৃপায় আপনি আমাকে ফিরিয়া পাইয়াছেন। আসুন, এইখানে তাঁহার মূর্ত্তি স্থাপনা করি।" লহুর্লদ ও কইলিয়া শেষে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, তাহাদের ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করাই যুক্তিযুক্ত। নদীর অপর পারে সুবর্ণপুর, রাজা কেহামার নির্য্যাতন হইতে রক্ষা পাইতে হইলে রাজধানীর এত নিকটে থাকা উচিত নহে। লহুর্লদ ও কইলিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

পঞ্চম সর্গের নাম "বিচ্ছেদ"। জনশূন্য ক্ষেত্রের মধ্যে

পিতা ও কন্যা ভ্রমণ করে, আর সেইখানেই তাহারা শয়ন করে। কইলিয়া অভিশপ্ত পিতার কষ্টে অত্যন্ত কাতর হইয়াছে। লদুর্লঁদ কন্যার হৃদয়ের অশান্তির কারণ বুঝিতে পারিয়াছিল। সে একদিন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শান্ত ভাবে শয়ন করিয়া রহিল। কইলিয়া মনে করিল যে তাহার পিতা নিদ্রা যাইতেছে। লদুর্লঁদ নিদ্রার ভাণ করিয়াছে। নিদ্রাভাবে তাহার মস্তিষ্ক যন্ত্রণায় ফাটিয়া যাইতেছে। লদুর্লঁদ শুনিতে লাগিল তাহার কন্যা বলিতেছে যে, দেবী মরিয়াতলী সুপ্রসন্ন হইয়া অনিদ্রার অভিশাপ হইতে তাহার পিতাকে মুক্তিদান করিয়াছেন। কইলিয়া এইরূপ বলিতে বলিতে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। এইবার লদুর্লঁদ কইলিয়াকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার সুবিধা পাইল। লদুর্লঁদ মনে করিয়াছিল যে, সে পলায়ন না করিলে তাহার কন্যার কিছুতেই শান্তিলাভ হইবে না। লদুর্লঁদ দ্রুতপদে প্রস্থান করিবার পরক্ষণেই কইলিয়ার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে উচ্চৈঃস্বরে তাহার পিতাকে ডাকিতে লাগিল। লদুর্লঁদ অন্ধকার বনের মধ্যে ছুটিয়া প্রবেশ করিল। পরিত্যক্তা কইলিয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে একাকী ভয়ে মৃতপ্রায় হইল। সুযোগ পাইয়া অর্ব্বালনের প্রেতমূর্ত্তি অকস্মাৎ তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই মূর্ত্তি কইলিয়াকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইলে সে প্রাণভয়ে দৌড়াইয়া নিকটস্থ গণেশের মন্দিরে আশ্রয় লইল। অর্ব্বালনের প্রেতমূর্ত্তি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কইলিয়াকে ধরিল। গণেশ ক্রুদ্ধ হইয়া অর্ব্বালনকে বহু দূরে সবেগে নিক্ষেপ করিলেন। কইলিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। কিছুদূর ছুটিয়া গিয়া সে একটি বৃক্ষের সংঘর্ষে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল।

ষষ্ঠ সর্গের নাম "কশ্যপ"। ইস্রিণীর নামে এক গন্ধর্ব্ব সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি কইলিয়াকে উঠাইয়া লইলেন এবং হিমকুটের শিখরদেশে দেবগণের পিতা কশ্যপের আশ্রমে তাহাকে লইয়া গেলেন। মুনিবর গন্ধর্ব্বকে বলিলেন, "বৎস। তুমি ইহাকে যেখান হইতে লইয়া আসিয়াছ সেইখানে ফিরাইয়া লইয়া যাও, নহিলে তপোবলে শক্তিসম্পন্ন রাজা কেহামার কোপে পড়িলে ইন্দ্রাদি দেবগণও ইহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। রাজা কেহামা ও তাঁহার বরপ্রাপ্ত মৃত পুত্র অর্ব্বালন যদি এই আশ্রমে আসেন, তাহা হইলে আমাদের সমূহ বিপদ জানিবে।" গন্ধর্ব্ব বলিলেন যে, তবে ইহাকে ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত, কারণ ইন্দ্র কেহামার শত্রু আর কেহামা স্বর্গে প্রবেশ লাভ করিতে অসমর্থ, করিলেও দেবতারা ইহাকে রক্ষা করিবেন। কশ্যপ গন্ধর্ব্বের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

সপ্তম সর্গের নাম "স্বর্গ।" কইলিয়ার মূর্চ্ছা অপনোদন হইতেছে। তাহার মনে হইল যেন এক দেবদূত তাহাকে স্বর্গে লইয়া যাইতেছেন। গন্ধর্ব্ব তাহাকে স্বর্গরাজ্যে নিজের কুঞ্জভবনে লইয়া গেলেন। তিনি কইলিয়াকে বলিলেন, "আমি তোমাকে এই স্থানে রক্ষা করিব আর ইন্দ্রও তোমার রক্ষাকার্য্যে আমাকে সাহায্য করিবেন।" তৎপরে গন্ধর্ব্ব তাহাকে পুষ্পক রথে বসাইয়া ইন্দ্র-সমীপে লইয়া গেলেন। ইন্দ্রের সভায় অপ্সরাগণের সমক্ষে গন্ধর্ব্ব কইলিয়ার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিলেন। গন্ধর্ব্ব আরও বলিলেন যে, কইলিয়া প্রার্থনা করিতেছে যে, তাহাকে ও তাহার পিতাকে যেন দেবগণ রক্ষা করেন। ইন্দ্র বলিলেন যে, তিনি কেহামাকে ভয় করেন। ইহা শুনিয়া কইলিয়া বলিল, "তবে আমাকে মর্ত্ত্যে লইয়া চলুন। স্বর্গের দেবতারা শক্তিহীন। এখানে কোনও সুখ নাই। আমি আমার পিতার নিকট থাকিব।" কইলিয়ার পিতৃভক্তিতে ইন্দ্র তাহার উপর প্রসন্ন হইয়া গন্ধর্ব্বকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ইহাকে মধ্যগঙ্গার তীরে লইয়া যাও, সেখানে পিতার সহিত এই কন্যা শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত নির্ভয়ে বাস করিতে পারিবে।"

অষ্টম সর্গের নাম "যজ্ঞ"। কেহামার শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হইবার আর বিলম্ব নাই। আর একটি মাত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ করিলেই তিনি ঈপ্সিত লাভ করেন। ইন্দ্র! তুমি কি নিদ্রা যাইতেছ? শততম যজ্ঞ সাঙ্গ হইলেই যে কেহামা তোমার স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইবেন। শেষ যজ্ঞের অর্দ্ধ সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছে। কেহামা শততম

অশ্ব বলি দিবার জন্য কুঠার গ্রহণ করিলেন। এ কি! কোথা হইতে একটি লোক সেই লোকারণ্যের ভিতর হইতে নির্গত হইয়া অশ্বের সটা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিল। ধানুকীরা তাহার উপর অসংখ্য শরবর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু সে অক্ষতদেহে সেই অশ্বের পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিয়া তাহাকে পরিচালিত করিতে থাকিল। সে উচ্চৈঃস্বরে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আপনি কি আমার প্রাণবধ করিবেন?" রাজা লদুর্লদকে চিনিতে পারিয়া রোষে ও ক্ষোভে আপনার ললাটে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার অভিসম্পাত উহাকে রক্ষা করিয়াছে। উহাকে ধৃত করিও না, উহাকে অভিশাপের ফলভোগ করিতে দাও।" রাজা কেহামা কিন্তু যে দশ সহস্র ধনুর্ধারী অশ্বের রক্ষার্থে নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগকে হত্যা করিতে আদেশ দিলেন। এই ভীষণ হত্যাকার্য্য শেষ হইতে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইয়াছিল।

নবম সর্গের নাম "গৃহের চিত্র"। অভিশপ্ত লদুর্লদ সেখান হইতে তাহার গৃহের দিকে গমন করিল। শূন্য গৃহের অবস্থা দেখিয়া তাহার মনে পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। ঐ ওখানে মরিয়াতলীর দেবীমূর্ত্তি রহিয়াছে, ঐ সেখানে বৃক্ষশ্রেণী দেখা যাইতেছে, সন্ধ্যাকালে পূজারতির শব্দ প্রতিবাসীদের গৃহে শুনা যাইতেছে। লদুর্লদ প্রাণীশূন্য ভগ্ন গৃহের অবস্থার সহিত পারিপার্শ্বিক সজীবতার তুলনা করিতে করিতে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ইন্দ্র! আজ আমারই সাহায্যে তুমি স্বর্গচ্যুত হইলে না। এই উপকারের কথা স্মরণ করিয়া তুমি আমাকে বধ কর। আমি আর শাপগ্রস্ত জীবনের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারিতেছি না।" এমন সময়ে অর্ব্বালনের প্রেতাত্মা সেখানে দেখা দিল আর বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া লদুর্লদকে আঘাত করিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু গন্ধর্ব্ব ইরিণীর অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া লদুর্লদকে রক্ষা করিলেন।

দশম সর্গের নাম "মেরু পর্ব্বত"। লদুর্লদ, তাহার কন্যা কইলিয়া ও গন্ধর্ব্ব ইরিণীর এক্ষণে মেরু পর্ব্বতে বাস করিতেছে। এই শান্তির আলয়ে একদিন কইলিয়ার মৃত মাতা যেজিলিয়ন দেখা দিলেন। কিছুদিন গত হইলে কামদেব সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে গন্ধর্ব্ব ও কইলিয়া বেশ সুখে ও শান্তিতে কালযাপন করিতেছে। গন্ধর্ব্বের হৃদয়ে কইলিয়ার প্রতি প্রণয়ের ভাব আনয়ন করিবার জন্য কামদেব শরবর্ষণ করিলেন। শরসন্ধান ব্যর্থ হইল দেখিয়া কইলিয়ার উপর তিনি শরবর্ষণ করিলেন। কামদেব এখানেও ব্যর্থ মনোরথ হইলেন।

একাদশ সর্গের নাম "যাদুকরী"। অর্ব্বালন গন্ধর্ব কর্তৃক আহত হইয়া লদুর্লদের অজ্ঞাত বাসস্থানের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সে মন্ত্রসিদ্ধ যাদুকরীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে অনেক অনুনয় করিলে যাদুকরী লদুর্লদ ও কইলিয়ার বাসস্থানের চিত্র তাহাকে দেখাইল। যাদুকরী অর্ব্বালনকে দুইজন দৈত্য, ঐন্দ্রজালিক বর্ম্ম ও রথ দিল। অর্ব্বালন দৈত্য-চালিত সেই রথে আরোহণ করিয়া মেরু পর্ব্বতের দিকে চলিল কিন্তু দৈবশক্তির প্রভাবে সেখানে পৌঁছিতে পারিল না। কেবল তাহাই নহে, অর্ব্বালন তুষারাবৃত প্রদেশে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া সেখানে বর্ণনাতীত কষ্ট ভোগ করিতে লাগিল।

দ্বাদশ সর্গের নাম "যজ্ঞ সমাপ্তি"। কশ্যপ গন্ধর্ব্বকে বলিলেন যে, কেহামা অবিলম্বে শততম অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিবেন। ইন্দ্র ভীত হইয়া স্বর্গ ত্যাগ করিতেছে। লদুর্লদ ও কইলিয়াকে পুষ্পক রথে বসাইয়া পৃথিবীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল। যজ্ঞ শেষ হইলে কেহামা স্বর্গ জয় করিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গের নাম "নিভৃত কুঞ্জ"। লদুর্লদ ও কইলিয়া পৃথিবীতে আসিবার পর নিভৃত স্থানে একটি কুঞ্জভবন নির্ম্মাণ করিল। সেখানে তাহারা মরিয়াতলীর সেবায় দিন যাপন করিতে লাগিল। তাহাদের সেই বাসস্থানটি যেন সুখের আলয় হইল। হিংস্র জন্তু ও পক্ষীগণ সেখানে ভয় ও হিংসাদি পশু-প্রকৃতি ভুলিয়া গিয়া নির্ব্বিবাদে ও শান্তিতে বাস করিত। এমন সময়ে একদিন সন্ন্যাসীর দল আসিয়া জগন্নাথদেবের সহিত বিবাহ দিবার জন্য কইলিয়াকে ধরিয়া লইয়া গেল। তাহারা উক্ত দেবতার জন্য উপযুক্ত পাত্রীর অনুসন্ধান করিতেছিল।

চতুর্দ্দশ সর্গের নাম "জগন্নাথ"। এই জগন্নাথ সাতটী

মস্তকবিশিষ্ট বিগ্রহ। তাঁহাকে মন্দির হইতে বাহিরে আনিয়া রথের উপর স্থাপন করা হইল। কইলিয়াকে বধূরূপে তাহারা তাঁহার পার্শ্বে বসাইয়া দিল। সেই রথকে যখন রাস্তা দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে তখন লোকেরা রথচক্রের নিম্নে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। কইলিয়া ব্যথিত হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার পর রথ যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিল নর্ত্তকী ও গায়িকারা কইলিয়াকে ঘিরিয়া উৎসবে মত্ত হইল। ইহার পর তাহারা নব বধূকে বাসর-শয্যায় শয়ন করিবার জন্য লইয়া গেল। কইলিয়া এই ভীষণ অবস্থা হইতে উদ্ধারলাভের জন্য গন্ধর্ব্ব ইরিণীয়কে কাতরকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল। মন্দিরের পূজারী যখন করতলগত কুমারীকে উপভোগ করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিল, সে অকস্মাৎ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রাণবায়ু ত্যাগ করিল। পরক্ষণেই অর্ব্বালনের প্রেতাত্মা কইলিয়ার নয়নগোচর হইল। সে পুনর্ব্বার গন্ধর্ব্বকে কাতর কণ্ঠে ডাকিল। গন্ধর্ব্ব সেখানে উপস্থিত হইয়া অর্ব্বালনের সহিত যুদ্ধ করিলেন বটে কিন্তু যাদুকরীর অসংখ্য দৈত্য-সেনা অর্ব্বালনকে এই যুদ্ধে সাহায্য করাতে গন্ধর্ব্ব পরাস্ত হইলেন। অর্ব্বালন এইবার কইলিয়াকে উপভোগ করিবে। কইলিয়া একটি মশাল লইয়া বাসর-শয্যায় অগ্নি-প্রয়োগ করিল। অর্ব্বালন স্থূল দেহ ধারণ করিয়াছিল, আর সেই কারণে অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইবার ভয়ে পলায়ন করিল। কইলিয়া প্রজ্বলিত অনলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিতে যখন উদ্যত হইয়াছে তাহার পিতা সেই মুহূর্ত্তে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে রক্ষা করিল। কেহামার অভিশাপে লড়ুর্ল'দ অগ্নিতে পুড়িয়া মরিল না।

পঞ্চদশ সর্গের নাম, "বলিরাজার পুরী"। অর্ব্বালন গন্ধর্ব্বকে লইয়া পাতালে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া এক দৈত্যকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিল। লড়ুর্ল'দ ও কইলিয়া এক্ষণে গন্ধর্ব্বকে উদ্ধার করিবার জন্য সচেষ্ট হইল। লড়ুর্ল'দ সমুদ্রে প্রবেশ করিলে জলরাশি সরিয়া যাইতে লাগিল। লড়ুর্ল'দ সমুদ্রের তলদেশে পাতালে প্রবেশ করিল। কইলিয়া পিতার অপেক্ষায় সমুদ্রতীরে সাত দিন কাটাইয়া দিল।

ষোড়শ সর্গের নাম, "প্রাচীন সমাধি স্তম্ভ"। লড়ুর্ল'দ পাতালে দৈত্যের সহিত সাত দিন যুদ্ধ করিয়া গন্ধর্ব্বকে মুক্ত করিল। সপ্তদশ সর্গের নাম "বলিরাজ্য"। লড়ুর্ল'দ পাতালের কারাগার হইতে গন্ধর্ব্বকে উদ্ধার করিয়া মর্ত্ত্যে লইয়া আসিল। গন্ধর্ব্ব, লড়ুর্ল'দ ও কইলিয়া মিলিত হইলে অর্ব্বালন পুনরায় দৈত্যগণের সাহায্যে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিল। বলিরাজা নির্য্যাতিত পিতা, কন্যা ও গন্ধর্ব্বকে রক্ষা করিলেন এবং অর্ব্বালনকে যমপুরীতে লইয়া গেলেন।

অষ্টাদশ সর্গের নাম "কেহামার মর্ত্ত্যে আগমন"। কেহামা পাতালে গমন করিয়া অর্ব্বালনকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে অবতরণ করিলেন, কিন্তু তিনি পাতালে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কইলিয়াকে কেহামা দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইলেন। কেহামা কইলিয়াকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন এবং লড়ুর্ল'দকে অভিশাপ হইতে অব্যাহতি দিলেন। কইলিয়া ও লড়ুর্লদ কেহামার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলে রাজা পুনর্ব্বার লড়ুর্লদকে আর সেই সঙ্গে কইলিয়াকেও অভিশাপ দিলেন। ইহার পর কেহামা স্বর্গে চলিয়া গেলেন। ঊনবিংশ সর্গে জরাগ্রস্ত কইলিয়ার চিত্র আছে। ইরিণীয় শিবের সমীপে গমন করিয়া কেহামার উৎপাতের কথা বলিলেন। শিব তাঁহাকে পাতালে রক্ষিত অমৃতের অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। বিংশ সর্গে গন্ধর্ব্ব কইলিয়াকে যমের সমীপে লইয়া গেলেন। একবিংশতিতম সর্গ হইতে চতুর্বিংশতিতম সর্গে যমপুরীর বর্ণনা ও কেহামা কর্ত্তৃক বলিরাজার রাজত্ব জয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শেষ সর্গে কেহামা কইলিয়াকে সেখানে দেখিয়া বলিলেন যে, এইবার তিনি অমৃত পান করিয়া যমরাজের সিংহাসনে উপবেশন করিবেন ও কইলিয়াকে তাঁহার পার্শ্বে বসাইবেন। কেহামা অমৃত পান করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতেই তাঁহার জীবন শেষ হইল। কইলিয়া অমৃত পান করিয়া জরা হইতে মুক্ত হইলেন। কন্যার পুণ্যে লড়ুর্লদ অভিশাপের দারুণ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইল। কবি বলেন যে, অমৃত পান করিলে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিই সুখী হয়, পাপিষ্ঠ কোনও কালে হয় না।

"কেহামার অভিশাপ" কাব্যের নাটকীয় ঘটনাবলীর বিবরণ অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। এই সুবৃহৎ মহাকাব্যে রাজকবি সাদে হিন্দু ভারতের যে অসংখ্য মনোহর চিত্র সাজাইয়া রাখিয়াছেন, এস্থলে তাহার সামান্য মাত্র পরিচয় দেওয়াও অসম্ভব। ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক অধ্যাপক হারফোর্ড বলেন,—"In the woof of the tale of Kehama's wrath are interwoven Sutee and Juggernaut, Siva and Yamen, the ship of heaven in which the heroine is wafted aloft, and the oriental Inferno, Padalon, into which she is plunged down. In all this there is much rich and beautiful description. The fluent verse bears us easily along, like a great eastern river, by torrid desert and perfumed garden, magical mountains, subterranean chasms. Scott thought he had read nothing more impressive than the description of the approach to Padalon in Kehama." কইলিয়ার চরিত্র সম্বন্ধে লর্ড মেকলে বলিয়াছেন,—"The fortitude, the modesty, the filial tenderness of Kailyah, are virtues of all ages and nations." অধ্যাপক ডাউডেন বলেন,—"In Kehama, a work of Southey's mature years, the chivalric ardour of his earlier heroes is transformed into the sterner virtues of fortitude and an almost despairing constancy. The power of evil, as conceived by the poet, has grown more despotic; little can be achieved by the light-winged Glendoveer (গন্ধর্ব)—a more radiant Thalaba—against the Rajah; only the lidless eye of Seeva can destroy that tyranny of lust and pride." ড্রাইডেনের "ঔরঙ্গজেবের" ন্যায় "কেহামার অভিশাপ" একখানি সুসম্পূর্ণ কাব্য। ড্রাইডেনের ন্যায় সাদে ভারত-ললনার চরিত্রের উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষ যে আদর্শ নারীর জন্মস্থান, তাহা ইংরাজ কবিরা বারংবার স্বীকার করিয়াছেন। সাদের বিরাট কল্পনা যে ভাবে হিন্দুর পুরাণাদি গ্রন্থ সকল মন্থন করিয়া "কেহামার অভিশাপ" কাব্য রচনা করিয়াছে, তাহার তুলনা ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে বিরল। রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যানবিশেষ লইয়া বঙ্গভাষায় যে সকল উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত তুলনা করিলে সাদের রচিত এই মহাকাব্য কোনও অংশে হীন বলিয়া মনে হইবে না।

পতিতার ছেলে।

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(১০)

সেদিনকার সেই প্রহারেই গণেশের খুব জ্বর আসিয়াছিল। সেই জ্বর গায়েই সে একবার যোগমায়ার কাছে চলিয়াছিল। তখন তাহার মন হইতে যোগমায়ার তীব্র কথা মুছিয়া গিয়াছিল, তাহার মনে ভাসিতেছিল কেবল তাঁহার স্নেহ।

পথের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িয়া সে থামিয়া গেল। মনে পড়িল সেই যোগমায়ার পায়ের শিকল, তাই যোগমায়া নিজে তাহাকে তাহার পিতার কাছে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাহার সহিত তাঁহার যে সম্পর্ক ছিল তাহা তিনি জোর করিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছেন; তাহাকে বারবার সতর্ক করিয়া দিয়াছেন সে যেন কখনও তাঁহার কাছে না যায়।

অভিমানে দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল—বেশ তাই হোক। সে জীবন্তে তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিবে না।

চোখ মুছিতে মুছিতে সে ফিরিয়া গেল। তাহাকে গোয়ালঘরের পাশের ঘরটা থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। পতিতার ছেলে সে, একটা হাড়ী কি বাগ্‌দি জাতীয় ছেলে

যে সম্মান লাভ করে তাহার অদৃষ্টে তাহাও জুটে নাই। গণেশ দুর্ব্বার চেয়েও হীন, সে সেইরূপ ভাবেই থাকিত।

নিজের গৃহে সে শুইয়া পড়িয়া রহিল। অবিনাশের স্ত্রী আহারের জন্য তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন, সে তখন মূর্চ্ছিতের ন্যায় পড়িয়া ছিল। তিনি দরজার কাছাকাছি আসিয়া দু' চার বার ডাকিয়া অত্যন্ত রাগ করিয়া ফিরিয়া গেলেন। অবিনাশ শুনিয়া রাগিয়া বলিলেন, "থাক্ বেটা পাজি, আদর করে আবার ভাত খাওয়াবার জন্যে ডাকতে গেছেন উনি। নেহাৎ কেবল কাজের জন্যেই রেখেছি, নইলে ওই বেশ্যার ছেলেকে রাখে কে?"

সমস্ত দিন চলিয়া গেল—গণেশ উঠিল না, জ্বরও কমিল না। সন্ধ্যার সময় দয়া করিয়া অবিনাশের স্ত্রী একটু সাগু করিয়া আনিয়া দিলেন।

এই দয়াটুকু অযাচিত ভাবে পাইয়া গণেশের দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। জ্বরের যন্ত্রণা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় সে একেবারে নেতাইয়া পড়িয়াছিল তাই সাগুটুকু পাইবা মাত্র এক চুমুকে সব খাইয়া ফেলিল।

দিনের পরে দিন যাইতে লাগিল, গণেশের জ্বর ছাড়িল না, সে উঠিতেও পারিল না। স্ত্রী বলিলেন, "কাউকে ডেকে দেখাও না একবার, অনবরত ঘং ঘং করে কাসছে। এর পরে যদি কিছু হয় দোষ হবে তোমারি। লোকে বলবে একবার ছোঁড়াটাকে দেখালে না।"

অবিনাশ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এই যে—ডাক্তার ডাকতে যাই। মরে তো আপদ যায় আমার, সমাজেরও একটা আপদ যায়। কার ছেলে ঠিক নেই, এসে পড়ল আমার ঘাড়ে। লোকের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা করে আমার। নেহাৎ তাড়াতে পারি নি; আপনা আপনি মরে তো আমি বেঁচে যাই।"

হতভাগ্য বালকের রোগশয্যা কণ্টকময়। সেখানে কাহারও স্নেহের বাণী ঝরিয়া পড়ে না, কাহারও দুটি স্নেহপূর্ণ আঁখি তাহার মুখের উপর স্থাপিত থাকে না। একা সে ছটফট করিতেছে, যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। বুকের ব্যথায় পাশ ফিরিতে পারিতেছে না।

মা গো—মা—বড় যন্ত্রণায় সে কাঁদিতে লাগিল। কত দিন সে এ নাম মুখে আনে নাই। বড় অভিমানেই সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল আর মা নাম মুখে আনিবে না। কিন্তু আজ আর থাকিতে পারিল না, আজ সে মায়ের নাম মুখে আনিল, মাকে ডাকিয়া সে আজ বুকের ব্যথা লাঘব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

মাকে ডাকিতে এক মূর্ত্তি হৃদয়ে ভাসে, এ সেই মূর্ত্তি—যে তাহাকে নির্দ্দয়া রাক্ষসীর মত এই রাক্ষসের আশ্রয়ে ফেলিয়া রাখিয়া গেছে। নিজের গর্ভধারিণীর ছবিখানা সে হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে যায়, কিন্তু সে যে বড় মলিন হইয়া গেছে।

মনে পড়িতে লাগিল যোগমায়া তাহাকে কত ভাল-বাসিতেন। তাহার সামান্য অসুখ হইলে তাঁহার আহার নিদ্রা থাকিত না। কতদিন রাত্রে সে জাগিয়া দেখিয়াছে যোগমায়া বিনিদ্র নয়নে তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছেন। তাহার এ অসুখের খবর কি কেহ তাঁহাকে দেয় নাই? তিনি কি তাহার অসুখের কথা শুনিতে পান নাই—অথবা শুনিয়াও কঠিন হইয়া আছেন?

না—না, তাহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না—তিনি যে গণেশের মা। তিনি বড় আঘাত পাইয়াছেন বলিয়াই তাহাকে জোর করিয়া এখানে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি হয়তো তাহার ব্যারামের খবর কিছুই পান নাই। কে তাঁহাকে সে খবর দিবে? ইহারা যে দিবে না তাহা নিশ্চয়। জগতে সে যে সকলেরই ঘৃণিত, কেহই যে তাহার পানে চাহে না, বহু দূরে তাহাকে রাখিয়া সকলে চলিয়াছে। জগতের মধ্যে সে দুইটি রমণীর কাছে বুক-ভরা স্নেহ পাইয়াছিল। একটী তাহার গর্ভধারিণী মা, যে তাহার ললাটের উপর ছাপ মারিয়া গিয়াছে সে পতিতার পুত্র। তাহাকে শমনে কাড়িয়া লইয়াছে। আর একটী যোগমায়া। তাঁহাকে সমাজে কাড়িয়া লইয়াছে।

গণেশ প্রাণপণে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, সে যোগমায়ার কাছে যাইবে—নিশ্চয়ই যাইবে। কোনও বাধা বিঘ্ন সে আজ মানিবে না, কারণ কে যেন তাহার অন্তরে ডাকিয়া বলিতেছে এসময় যোগমায়াকে না দেখিতে পাইলে সে আর দেখিতে পাইবে না।

অনেক কষ্টে উঠিয়া বসিয়া সে আবার পড়িয়া গেল। বুকে বড় ব্যথা লাগিল, একটা অস্ফুট কাতরোক্তি করিয়া সে চোখ মুদিল।

সেই কি জন্মের মত চক্ষু মুদা? পতিতার ছেলের নাম কি জগৎ হইতে চিরতরে মুছিয়া গেল?

না—সে জন্মের মত ঘুমাইল না, সে বাঁচিয়া আছে। ওই যে তাহার বক্ষের স্পন্দন অনুভব হইতেছে। এখনই কি তাহার মুক্তি আসিবে? বোধ হয় না, কারণ এখন মরিলেই যে সব ফুরায়; তাহার মায়ের পাপের ফল তাহা হইলে তাহাকে ভোগ করা হয় কই? পাপ যেই করুক —তাহার সংশ্রবে যাহারা আছে তাহাদের সকলকেই সে ফল ভোগ করিতেই হইবে। ধর্ম্মের জয়, সমাজের জয় অব্যাহত—সে পরিত্রাণ পাইবে কি করিয়া?

যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল—সে পাশ ফিরিতে গেল। উঃ, বুকে যে বড় ব্যথা! আর্ত্তকণ্ঠে সে ডাকিল "মা।"

"বাবা আমার—এই যে আমি।"

আসন্ন-মৃত্যু-কাতর মলিন মুখখানা মুহূর্ত্তের তরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চোখ দুটি চির জন্মের মতই মুদিয়া আসিতেছিল। মৃত্যু অজ্ঞানতাকে দূর করিয়া মুহূর্ত্তের জ্ঞান দিয়া তাহাকে আপনার শান্ত শীতল ক্রোড়ে টানিয়া লইবার জন্য বড় স্নেহে হাত দুখানা বাড়াইয়াছিলেন। গণেশ জড়তাকে প্রাণপণে বিদূরিত করিয়া চোখ দুইটা যথাসাধ্য বিস্তৃত করিয়া জড়িত কণ্ঠে ডাকিল, "এসেছ মা?"

যোগমায়ার চোখে জলধারা গড়াইয়া পড়িল—"এসেছি বাবা।"

গণেশ হাতখানা প্রসারিত করিয়া বলিল, "কই মা—কোথায় তুমি? বড্ড অন্ধকার যে—আমি যে তোমায় দেখতে পাচ্ছি নে। খুব কাছে এসো মা, তোমায় একবার দেখি।"

যোগমায়া তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "এই যে বাবা—তোর মাথা কোলে করে নিয়ে বসে আছি। তুই কোথায় চলেছিস গণেশ?—আমার 'পরে রাগ করে চলে যাচ্ছিস বাবা?"

গণেশ চক্ষু মুদিয়া বলিল, "না মা, আমি আমার মার কাছে যাচ্ছি। মা আমার নিতে এসেছে, ওই দেখ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলছে—'আয়, আমার কাছে আয়, আমি তোকে নতুন এক দেশে নিয়ে যেতে এসেছি। আমি যাই মা, আর থাকতে পারছি নে এখানে।"

যোগমায়া নীরবে প্রস্থানোদ্যত শিশুর মুখখানার পানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন—ধীরে ধীরে তাহার মুখে ভাবের রূপান্তর ঘটিল; তাহার শুষ্ক অধরে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল,—সে একবার কোন দিকে চাহিল। একবার তাহার মুখ হইতে বাহির হইল—"মা"।

তাহার পর সব নীরব। জগৎ জননীর কোলে সন্তান বিশ্রাম লাভের জন্য চলিয়া গেল। সংসারে আসিয়া অবধি কেবল সে লাভ করিয়াছে ঘৃণা, কাহারও মুখের একটী ভাল কথা সে একদিনও পায় নাই। তাহার অন্তর বড় ব্যথিত হইয়াছিল, সেই ব্যথা মূর্ত্তিমান হইয়া তাহার বুকে পিঠে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সব ফুরাইল!

সবই ফুরাইল? হাঁ—সবই ফুরাইল! সে যতদিন বাঁচিয়াছিল, মায়ের কলঙ্ক তাহাকে ঘেরিয়াছিল। সে তাহার মায়ের ছবি গ্রামে জাগাইয়া রাখিয়াছিল, আজ সে সব মুছিয়া গেল। তাহার ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস এই গ্রামের বুকেই সমাপ্ত হইয়া গেল।

যোগমায়ার চোখ দিয়া নীরবে টপ টপ করিয়া বড় বড় জলের ফোঁটা মৃত বালকের শান্ত মুখখানার উপর পড়িয়া মুক্তার মত জ্বলিতে লাগিল।

"আহা—বড় ব্যথা পেয়েছিস বাবা—তাই জুড়াতে গেছিস?"

যোগমায়া মুখ নত করিলেন—তাহার ললাটে একবার গভীর স্নেহে ওষ্ঠ রাখিলেন।

"কি দিদি—কি রকম দেখছ?"

অবিনাশ বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

চকিতে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া দৃঢ় কণ্ঠে যোগমায়া বলিলেন, "হয়ে গেছে!"

চমকাইয়া অবিনাশ বলিলেন, "হয়ে গেছে?"

যোগমায়া উত্তর করিলেন, "হাঁ—এখন গঙ্গায় দেবার

যোগাড় দেখ। তোমার সকল জ্বালা মিটে গেল ভাই, সকল আপদের শান্তি হল। এখন দেহটার যা হয় একটা ব্যবস্থা করে ফেল—সব মিটে যাক।"

অবিনাশ একটু থামিয়া বলিলেন, "সেই তো বড় মুস্কিলের কথা।"

যোগমায়া বলিলেন, "কি?"

অবিনাশ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "ও মড়া যে কেউ ছোঁবে—তা তো বোধ হয় না! জীবন্ত যখন ছিল, তখনই কেউ ছোঁয় নি, এখন তো মড়া।"

যোগমায়ার চোখ জ্বলিয়া উঠিল; বলিলেন, "আমি বামুনের ঘরের বিধবা হয়ে এ মড়া বুকে নিয়ে বসে আছি কেন অবিনাশ?"

অবিনাশ কুণ্ঠিত হইয়া থামিয়া থামিয়া বলিলেন, "সে তুমি পার, তা বলে কি আর কেউ করতে আসবে? সমাজ নিয়ে বাস করছে তো সকলেই; তোমার মত কেউ—"

অধীর হইয়া যোগমায়া বলিলেন, "থাম, যথেষ্ট হয়েছে। আমার বোধ হয় এতটুকু একটা ছেলের মড়া তুমি নিজেই নিয়ে যেতে পারবে। গঙ্গাও কাছে, বেশী দূরে নয়। লোকের সাহায্য নেবার কোনও দরকার দেখছি নে।"

অবিনাশ যেন চমকাইয়া দুই পা পিছনে হটিয়া গেলেন, বিস্মিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আমি?"

দৃঢ় কণ্ঠে যোগমায়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তুমি। তুমি এই ছেলের বাপ—তা মনে আছে?"

কর্কশ হাসিয়া অবিনাশ বলিলেন, "আর মিথ্যে কথা বলো না দিদি। মাস দেড়েক আগে যখন এই ছেলেটাকে নিয়ে এসেছিলে তখনও এই কথাই বলেছিলে। আমি যে এই ছেলের বাপ, তার কোনও ঠিক নেই। চাকরের মত রেখেছি এতদিন, ছেলে বলে রাখি নে। জারজকে ছুঁয়ে আমি সমাজে হীন হতে পারব না। এই শোন স্পষ্ট কথা আমার। তোমার যা খুসি তুমি তাই কর গে। পার —লোক ডাকিয়ে মড়াটাকে নিয়ে যাও। আজ শনিবার দিন মরল—বাড়ীর অমঙ্গল, তাই ভেবেই আমি ভয় পাচ্ছি। যাই দেখি ভট্চায্যি মশাইকে জিজ্ঞাসা করি, যদি কোনও উপায় থাকে দোষ কাটাবার, করে দিন তিনি।"

অবিনাশ চলিয়া গেলেন।

স্থাণুর ন্যায় যোগমায়া মৃত বালক বক্ষে বসিয়া রহিলেন। এই জগৎ—এই সংসার—এই সমাজ? ভগবান, তুমি কি নিদ্রাগত?

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি মৃত বালককে বক্ষে লইয়া উঠিলেন। তিনিই আজ নিজের হাতে তাহাকে বিসর্জ্জন দিবেন।

মনে পড়িল কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা। তাঁহার একমাত্র পুত্রকে সেদিন তিনি এমনি সময়ে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। সেদিন তিনি একটা দায় হইতে বাঁচিয়াছিলেন, তাহাকে নিজের হাতে ভাসাইয়া দিতে হয় নাই। আজ এ দেহ তাঁহাকে নিজের হাতে গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিতে হইবে।

বড় কঠিন কর্ত্তব্য তাঁহার সম্মুখে, তথাপি ইহা তাঁহাকে শেষ করিতেই হইবে। হৃদয় ফাটিয়া যাক্, তবু এ সময় চোখের জল রোধ করিতেই হইবে। তাঁহাকে দুর্ব্বলতা ঢাকিতেই হইবে। কেহ যেন তাঁহার দুর্ব্বলতা না দেখিতে পায়।

মৃত বালককে বক্ষে লইয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

পথ নিস্তব্ধ—কাহারও সাড়া শব্দ নাই। আর একটু পরে এই পথ জনতাপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

স্থির অকম্পিত পদে তিনি গঙ্গার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। শান্ত সুনীলা পুণ্যসলিলা ভাগীরথী তর তর করিয়া বহিয়া যাইতেছে। প্রখর সূর্য্যকিরণে চারি দিক ভরিয়া গিয়াছে। বাবলা গাছের উপর বসিয়া কতকগুলা কাক বিকট কর্কশ রবে চীৎকার করিতেছে।

যোগমায়া দাঁড়াইয়া একবার গঙ্গার পানে চাহিলেন; একবার মৃত বালকের মুখখানার পানে চাহিলেন। দর দর ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

"তবে যা বাবা—যা। তুই তোর স্থানে ফিরে যা। স্বর্গের ফুল যে তুই, মর্ত্ত্যে তোর উপযুক্ত স্থান কোথায়? তোর যোগ্য স্থান যখন ধরায় গঠিত হবে—তখন তুই আসিস। এখন নয় বাবা—এখন নয়। বড় ব্যথা পেয়েছিস, যা তোর মায়ের কাছে জুড়াগে যা।"

যোগমায়া মৃত বালকের দেহ প্রাণপণে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। সে দেহ জলে পড়িয়া একবার ভাসিল মাত্র, তাহার পর ডুবিয়া গেল। কাল তরঙ্গের উপর কাল তরঙ্গ আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র দেহের উপর দিয়া চলিয়া গেল। অসীম শীতল জলরাশির নিম্নে সে কোথায় বিশ্রাম লাভ করিতে চলিয়া গেল কে জানে।

যোগমায়া অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রটীকেও প্রতিবেশীরা আনিয়া ওইখানে বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছিল। ওইখানে অমনি করিয়া তাহার সুকুমার দেহখানি ভাসিয়াছিল—তাহার পর কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছিল!

সে আবার আসিয়াছিল। মা বলিয়া ডাকিয়া যোগমায়ার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতে সে আবার আসিয়াছিল। সংসারের নিষ্পেষণে দলিত পেষিত হইয়া সে ফুলটী কুঁড়িতেই ঝরিয়া পড়িয়া গেল!

(১১)

তারিণী মুখুয্যে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এ কি শুনতে পাই?"

যোগমায়া অদ্ধাবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে উত্তর দিলেন, "কি?"

তারিণীচরণ বলিলেন, "তুমি নাকি আবার পিছিয়ে যাচ্ছ? তুমি নাকি আবার বলেছ সমাজ চাও না, সুতরাং প্রায়শ্চিত্তও করবে না?"

যোগমায়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "বলেছি।"

ক্রুদ্ধ ভাবটা চাপিয়া রাখিয়া তারিণীচরণ বলিলেন, "বলেছ তুমি? তোমার মাথার ঠিক নেই মা, নইলে—"

যোগমায়া বলিলেন, "আমার মাথা ঠিক আছে। আপনারা বলছেন সমাজে উঠতে হ'লে প্রায়শ্চিত্ত করা চাই। কিন্তু কি করেছি আমি যার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে যাব?"

তারিণীচরণ বলিলেন, "ওই যে পতিতার ছেলেটাকে নিয়ে তিন বছর রেখেছিলে তারই জন্যে এটা করার দরকার। সেটা পাপ বই কি মা। তুমি হচ্ছ বামুনের ঘরের বিধবা, কতদূর নিষ্ঠার মধ্যে থাকা তোমার দরকার সেটা তো জান? তুমি সব বিসর্জ্জন দিয়ে সেই ছেলেটাকে—"

যোগমায়া বাধা দিয়া বলিলেন, "এতে আমি কিছুমাত্র পাপ বলে মনে করছি নে। আপনারা যাকে পাপ বলেন আমি তাকেই পুণ্য বলছি, আপনারা যাকে পুণ্য বলেন আমি তাকেই পাপ বলছি। আমায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে সমাজে তুলে কোনও লাভ নেই, কারণ ওই রকম আতুর নিরাশ্রয় ছেলেদের মানুষ করবার জন্যেই ভগবান আমায় জগতে পাঠিয়েছেন। আপনাদের মতের সঙ্গে কিছুতেই আমার মতের মিল যখন হতে পারবে না, তখন অনর্থক এ বাইরের একটা মিথ্যে অনুষ্ঠান করে কতকগুলো টাকা নষ্ট করবার মানে কিছু দেখছি নে। গণেশ তবু জাতিতে কায়স্থ ছিল। যদি আজ একজন নিরাশ্রয় মুসলমানের ছেলে পাই—আমায় তাকেও গ্রহণ করতে হবে, আমার দেবতা আমায় এই আদেশ দিয়েছেন।"

বিস্ময়ে এতখানি হাঁ করিয়া তারিণীচরণ বলিলেন, "অ্যাঁ, মুসলমানের ছেলে নেবে তুমি?"

যোগমায়া বলিলেন, "আমায় মাপ করবেন, আপনাদের মিথ্যা জাতের অহঙ্কার আমি জাগিয়ে রাখতে চাইনে। আমি জাতি বিচার, দেহ ভেদ কিছু বিচার করি নে, আমি দেখি আত্মাকে। যার কোনও ভেদাভেদ নেই, যার জাতি বিজাতি ঠিক নেই তাকে। মরলে সব যে একই জায়গায়, তখন কোথায় থাকবে হিন্দু মুসলমান ভেদজ্ঞান? এই সংসারটুকুর মধ্যে আপনারা সমাজ গড়ে অটুট হয়ে বসে আছেন, এর মধ্যে কারও আসবার যো নেই, এর ভেতর হ'তে কারও একটু বাইরে যাবার যো নেই। মৃত্যুর পরে কি এ সমাজের কোনও বাঁধন অনুভব করতে পারবেন? তখন কে আপনার মনে ভেদজ্ঞান জাগিয়ে রাখবে বলুন।"

তারিণীচরণ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বুঝেছি বুঝেছি। তুমি বড় বেদজ্ঞ হয়েছ কি না—তাই ভেদজ্ঞানটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চাও। যথেষ্ট হয়েছে। যখন তুমি নিজের মুখে স্বীকার করছ মুসলমানের ছেলে এবার নেবে—তখনই জেনেছি। তা দেখ, তোমায় বলে দিচ্ছি, গ্রামের মধ্যে থেকে এ সব ভ্রষ্টাচারী তুমি করতে পারবে না। তুমি অন্যত্র যাও।"

যোগমায়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "আমার স্বামীর বাড়ী ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।"

"তাই ভাল—কিন্তু আমাদের সঙ্গে তোমার আর কোনও সংস্রব রইল না।"

বলিয়া তারিণীচরণ সবেগে প্রস্থান করিলেন। গ্রামের মধ্যে অচিরে রাষ্ট্র হইয়া গেল যোগমায়া খৃষ্টান অথবা মুসলমান এই দুইটার একটা কিছু হইতে যাইতেছেন। তিনি এবার প্রকাশ্যে পীরবক্সের পেটরোগা ছেলে ইব্রাহিমকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন।

অবনী বাবু শুনিয়া প্রকাশ্য ভাবে খুব লাফালাফি করিতে লাগিলেন। যোগমায়াকে জোর করিয়া বাড়ী হইতে উঠাইয়া দিবার কল্পনাও কেহ কেহ করিলেন। যোগমায়া সব শুনিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি নির্ব্বিকার, অটল। কিছুতেই তিনি এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবেন না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তাঁহার বাড়ীতে সকলের আসা বন্ধ করা হইল। বাধ্য হইয়া ছোটলোক, যাহারা যোগমায়ার সময় অসময়ে বন্ধু ছিল, তাহারাও আসিতে পারিল না। যোগমায়া উপেক্ষার সহিত সকল অত্যাচার নীরবে সহিতে লাগিলেন, তথাপি তিনি সমাজের পদে আপনাকে নত করিলেন না।

একটা সামান্য স্ত্রীলোকের এত দর্প, তেজ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া গেল। তাঁহাকে বিশেষরূপে জব্দ করিবার জন্য সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

যেদিন যোগমায়াকে বিশেষরূপে জব্দ করিবার জন্য তারিণী মুখুয্যের বাড়ী সকলে সমবেত হইয়াছিলেন, এবং অবনী বাবুই বিশেষ লাফালাফি করিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময় নিধু গাঙ্গুলী আসিয়া সংবাদ দিলেন, "যোগমায়ার মৃত্যু হইয়াছে।

যোগমায়ার মৃত্যু হইয়াছে কথাটা শুনিবামাত্র সকলের মুখের কথা বন্ধ হইয়া গেল। অবনী বাবু বলিয়া উঠিলেন, "মরে গেছে, সে কি কথা? কাল সন্ধ্যাবেলা যে আমি তাকে গঙ্গা হ'তে জল তুলতে দেখেছি। গুরুঠাকুর এসেছে দেখলুম।"

নিধু গাঙ্গুলী বলিলেন, "বাস্তবিকই মারা গেছে। এখন দেখলুম অনেক লোকে তাকে গঙ্গাতীরে দাহ করতে নিয়ে যাচ্ছে।"

দমিয়া গিয়া তারিণীচরণ বলিলেন, "অনেক লোক পেলে কোথায়?"

নিধুগাঙ্গুলী মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "ওই নীলাম্বরের ছেলে হে; কলকাতা হ'তে দশ বারটা কলেজের ছেলে এসেছে তার সঙ্গে—তারা সকলে মিলে তাকে নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে গুরুঠাকুর চলেছেন, মুখ-অগ্নি করবেন। শুনলুম, কাল সব সম্পত্তি লেখাপড়া হয়ে গেছে। অনাথ ছেলে মেয়েদের সেবার জন্যে সে সব সম্পত্তি দান করে গেছে। নীলাম্বরের ছেলে আর তার বন্ধুরা এ ভার নিয়েছে।"

অবনী বাবু ধীরে ধীরে একপার্শ্বে বসিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "শক্রতাটা দেখলেন? যাবার সময়ও যদি একটু ভাল ব্যবহার করে যায়!"

তারিণীচরণ বলিলেন, "যাই হোক, তেজ দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি। মেয়েমানুষ, যে পায়ের তলায় থাকবে, যাকে হাজার লাথী মারলেও একটা কথা বলতে পারবে না, তার এত অহঙ্কার কেন? যাদের যা মানায় তাই ভাল। মেয়েদের মুখের ঘোমটা খোলাই অন্যায়। সেকালে আমাদের ঠাকুরমায়েরা পর্য্যন্ত মুখের ঘোমটা ফেলতেন না, আর আজকাল কি না বউগুলো মুখের ঘোমটা তোলে। এ সব আবার কি? সমাজ নিয়ে মাথা ঘামাব আমরা, ওদের এতে মাথা দেবার কি দরকার? যাই হোক—মরেছে আপদ গেছে। দেশের বউ-ঝিগুলো কুদৃষ্টান্ত পেয়ে খারাপ হ'তে পারবে না।

অবনী বাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন।

সমাপ্ত।

প্রণাম করি।

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

করেছিলাম যেথায় খেলা,
যে কুঞ্জে মোর কাটলো বেলা,
যেই নিঝরের পীযূষ ধারা,
করলে শীতল তৃষ্ণা হরি',
আজ সবারে প্রণাম করি।

নিবিড় যাঁদের স্নেহের ছায়ে,
ঝঞ্ঝা ঝাপ্টা পাইনি গায়ে,
বৃষ্টি রোদে রাখলে যারা
যতন ক'রে বক্ষে ধরি'
আজ তাদেরে প্রণাম করি।

যে সুর আবার পশলো কানে,
সুগন্ধ যা পেলাম ঘ্রাণে,
পথের যে সব কুসুম তুলে
বুকের সাজি নিলাম ভরি'
আজকে তাদের প্রণাম করি।

যে সব কাঁটা ফুটলো পায়ে,
যে সব আঁচড় লাগলো গায়ে,
নয়ন দিয়ে যে সব শোণিত
দুখের পায়ে পড়লো ঝরি'
আজকে তাদের প্রণাম করি।

যে সব তরু গেলাম রোপি'
জীবন দিয়ে জীবন সঁপি,
বালুর বাঁধে দেবের দেউল
যত্নে যে সব গেলাম গড়ি'
আজকে তাদের প্রণাম করি।

ভরুক তরু পুষ্পে ফলে,
রহুক এ বাঁধ সাগর জলে,
খেলার এ শিব প্রেমের বলে
হয় যেন হয় রামেশ্বর-ই,
আজকে সবায় প্রণাম করি।

ভক্তি হউক সর্ব্বজয়া,
মাগছি ক্ষমা, মাগছি দয়া,
কৃতজ্ঞতায় অশ্রু ছাপায়
আস্‌লে ঘাটে পারের তরী,
আজকে সবায় প্রণাম করি।

ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে ভারতের কথা।

(৬)

[লর্ড বায়রণ]

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

লর্ড বায়রণ য়ুরোপের নানা স্থানে অত্যাচারের বিরুদ্ধে এত বেশী লেখনী চালনা করিয়াছিলেন যে, আমাদের মনে হয় তিনি ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। তুরস্ক ও য়ুরোপের দক্ষিণ ভাগে মুসলমান সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিয়া বায়রণ তাঁহার অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বায়রণের রচিত Don Juan, Giaour, Bride of Abydos, The Corsair, The Siege

of Corinth প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিলে মুসলমান জগতের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। মহম্মদ, জুলেয়িকা, সাদি প্রভৃতির নাম বায়রণ একাধিকবার তাঁহার কাব্যে গ্রহণ করিয়াছেন। মুসলমানেরা বায়রণের চক্ষুশূল ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহা না হইলে তিনি কবি হাফিজ সম্বন্ধে লিখিতেন না,—"From silly Hafiz up to simple Bowles"—(English Bards and Scotch Reviewers). বায়রণের ইংরাজ সমালোচকও এই শ্লোকের উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তবে, আজানের উল্লেখ করিয়া বায়রণ কয়েকবার ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। "At solemn sound of "Alla Hu !" (Giaour). "The Muezzin's call doth shake the minaret, There is no God but God !—to prayer—lo ! God is great !" (Childe Harold II). লর্ড বায়রণের সমকালে তুরস্কের সহিত গ্রীসের যে যুদ্ধ বাধিয়াছিল, সেই যুদ্ধে গ্রীসের পক্ষে কবি স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করিয়া রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই প্রতিভাশালী ইংরাজ কবি ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড পোর্টল্যাণ্ড তাঁহার সম্বন্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট সুপারিশ করিতে অসম্মত হওয়ায় বায়রণের ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। কবি বোধ হয় সেই জন্য পোর্টল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে লিখিয়াছিলেন,—"Old dame Portland fills the place of Pitt"—(English Bards &c). বায়রণ ভারতবর্ষে না আসিলেও ভারতবাসীর সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা যে একেবারে ছিল না, এমন কথা বলিবার কোনও কারণ নাই। কবির সমসাময়িক ভারতবর্ষের নানা কথা তাঁহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের ভেলোর প্রদেশে যে শিপাহী বিদ্রোহ হয় ও যাহার ফলে বহুসংখ্যক য়ুরোপীয় সেনানী নিহত হইয়াছিল, লর্ড বায়রণ সম্ভবতঃ তদ্বিষয় স্মরণ করিয়া "মিনার্ভার অভিশাপ" (The Curse of Minerva) নামক কবিতায় লিখিয়াছিলেন,—

"Look to the East, where Ganges' Swarthy race
Shall shake your tyrant empire to its base ;
Lo ! there Rebellion rears her ghastly head,
And glares the Nemisis of Native dead ;
Till Indus rolls a deep purpureal flood,
And claims his long arrear of Northern blood."

"প্রাচ্যের দিকে দৃষ্টিপাত কর, যেখানে গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থানের কৃষ্ণকায় জাতি উৎপীড়নের উপর সংস্থাপিত তোমার সাম্রাজ্যের ভিত্তি পর্য্যন্ত টলাইয়া দিবে। ওই দেখ! বিদ্রোহ সেখানে তাহার বিকট মস্তক উত্তোলন করিতেছে এবং তদ্দেশবাসী মৃতের প্রতিহিংসা-দেবী রোষকষায়িত নয়ন বিস্ফারিত করিয়াছে। যতদিন না সিন্ধু নদে, রক্তের স্রোত বহিবে, আর পৃথিবীর উত্তর প্রদেশবাসিদের নিকট বহুদিনের প্রাপ্য রক্তের ঋণ আদায় করিয়া লইবে, ততদিন সে ক্ষান্ত হইবে না।" "পিতলের যুগ" (The Age of Bronze) নামক কবিতাতেও সিন্ধুনদের উল্লেখ আছে। ইংলণ্ড য়িহুদীদের প্রভাব সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন,—"All stocks, all things, all sovereigns they control, And waft a loan from Indus to the Pole." বায়রণ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কাব্য "চাইল্ড হেরল্ডে" বিভীষিকাময় দিল্লীর উল্লেখ করিয়াছেন,—"The Delhi with his cap of terror on." (২য় সর্গ, ৫৮ শ্লোক)। কাশ্মিরী শালের উল্লেখ করিয়া কবি "ডন জুয়ান" নামক কাব্যের পঞ্চম সর্গে লিখিয়াছেন,—"A shawl whose folds in Cashmire had been nursed." উক্ত কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে ভারতবাসীর কৃষ্ণবর্ণ দেহ ও ভারতবর্ষের উষ্ণতার উল্লেখ আছে। "Dusk as India and as warm." নবম সর্গে বায়রণ নাদির শাহ কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"But Juan turned his eyes on the sweet child
Whom he had saved from slaughter—what a
trophy.
Oh ! ye who build up monuments, defiled
With gore, like Nadir Shah, that costive sophy,
Who, after leaving Hindostan a wild,
And scarce to the Mogul a cup of coffe
To soothe his woes withal, was slain, the sinner !
Because he could no more digest his dinner !"

পাপের পরিণাম ও অত্যাচারীর শাস্তি যে কি তাহা বায়রণ নানা স্থানে নানা ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। উক্ত কাব্যের দ্বাদশ সর্গে কবি ভারতের বাণিজ্যের আভাস দিয়াছেন।

"The ship
From Ceylon, Inde, or far Cathay, unloads
For him the fragrant produce of each trip."

উক্ত কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগের উল্লেখ করিয়া কবি লিখিয়াছেন,—

"The party might consist of thirty-three,
Of highest caste—the Brahmins of the ton."

"দ্বীপ" (The Island) নামক কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে তাম্রকূটকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিয়াছেন,—"Divine in hookas, glorious in a pipe." লর্ড বায়রণ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ ও ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক-গমন করেন। কবির সমকালে ইংলণ্ডীয় সমাজের উপর এদেশের প্রাচীন সাহিত্য ও সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যার প্রভাব যে কতকটা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই সময়-কার একাধিক ইংরাজ কবির পদ্যময় রচনায় পাওয়া যায়। লর্ড বায়রণ হিন্দুস্থানী সুরসম্বলিত কয়েকটি ক্ষুদ্র গীত রচনা করিয়া সঙ্গীতামোদী ইংরাজ শ্রোতার কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছিলেন। এস্থলে বায়রণের রচিত দুইটি গীতের প্রথম কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল।

(১)

"Oh! my lovely—lovely—lovely—pillow!
Where is my lover? Where is my lover?
Is it his bark which my dreary dreams discover?
Far—far away! and alone along the billow?"

(২)

"But once I dared to lift my eyes—
To lift my eyes to thee;
And since that day, beneath the skies,
No other sight they see."

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে সেরিডানের মৃত্যুতে বায়রণ যে শোক-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে মৃত ব্যক্তির গুণের প্রশংসা করিয়া কবি একস্থানে লিখিয়াছেন,—

"Where the loud cry of trampled Hindostan
Arose to heaven in her appeal from man,
His was the thunder—his the avenging rod,
The wrath—the delegated voice of God!
Which shook the nations through his lips, and blazed
Till vanquished Senates trembled as they praised."
(*Monody on the death of Mr. Sheridan*)

উৎপীড়িতা অযোধ্যার বেগমের পক্ষে সেরিডান পার্লা-মেণ্টে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, উদ্ধৃত শ্লোকে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। সেরিডান ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ও তৎপরে ৩রা, ৬ই, ১০ই ও ১৩ই জুন ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কবি বলিতেছেন যে, পদদলিতা ভারতবর্ষের অভিযোগ সেরি-ডানের বাগ্মিতার কৃপায় স্বর্গে পঁহুছিয়াছিল। ইংরাজি কাব্য-সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে, অনেক সুলেখক ও সুবক্তা ইংরাজের খ্যাতি ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর ইতি-হাসের সহিত বিজড়িত। লর্ড বায়রণ ভারতবর্ষ ও ভারত-বাসীর কথা লইয়া কোনও সুসম্পূর্ণ কাব্য রচনা না করি-লেও "সার্ডানাপেলস" (Sardanapalus) নামক নাট্য-কাব্যের প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। উক্ত দৃশ্যে নিনেভা ও আসিরিয়ার রাজা সার্ডানাপেলস ও তাঁহার শ্যালক সালিমিনেসের মধ্যে কথোপকথন আরম্ভ হইলে রাজা বলিলেন,—"আমি বুঝিয়াছি, তোমরা চাও যে আমি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হই।" রাজা কোনও রূপ অভিযানের প্রস্তাবের অনুকূলে মত দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সালিমিনেস বলিলেন,—"আমাদের সৈন্যগণ আপনার সেনাপতিত্বে কেন যশঃ অর্জ্জন করিবে না? সেমিরামিস্ যে স্ত্রীলোক হইয়াও আসিরিয়ান বাহিনীকে গঙ্গার তীরবর্ত্তী দেশে লইয়া গিয়াছিলেন।"

'Wherefore not?
Semiramis—a woman only—led
These our Assyrians to the solar shores
Of Ganges.'

সার্ডানাপেলস বলিলেন—"হাঁ, সত্য বটে, কিন্তু তিনি কি ভাবে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন?" সালিমিনেস উত্তরে বলিলেন,—"কেন, পুরুষের মত—ব্যর্থ মনোরথ বীর যেমন পরাস্ত না হইয়াও ফিরিয়া আসেন। বিশ জন মাত্র শরীর-

রক্ষক লইয়া তিনি ব্যাকট্রিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।” সার্ডানাপেলস জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আর কত জনকে তিনি গৃধ্রের আহারের জন্য ভারতবর্ষে রাখিয়া আসিয়াছিলেন?”

"And how many
Left she behind in India to the vultures ?"

সালিমিনেস বলিলেন,—“আমাদের ইতিহাস সে সম্বন্ধে কোনও কথা বলে না।” সার্ডানাপেলস বলিলেন,—“তবে, আমি বলিব যে, রাজান্তঃপুরে তাঁহার কুড়িটি পোষাক নিজ হস্তে প্রস্তুত করা উচিত ছিল। তাহা না করিয়া তিনি বিশ জন শরীর-রক্ষকের সহিত ব্যাকট্রিয়ায় পলাইয়া আসিয়াছিলেন, আর তাঁহার অসংখ্য রাজভক্ত প্রজাকে দাঁড়কাক, নেকড়ে বাঘ, ও অধিকতর নিষ্ঠুর মানুষের হস্তে নিহত হইবার জন্য ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। ইহাকেই কি যশঃ বলে? তাহা হইলে আমি চিরকাল কলঙ্কের ভাগী হইতে সম্মত আছি।” সালিমিনেস কহিলেন,—“সকল যোদ্ধারই যে সেইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে তাহার কিছু স্থিরতা নাই। শত নরপতির মাতৃস্থানীয় সেমিরামিস্ ভারত জয় করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তিনি পারস্য, মিডিয়া ও ব্যাকট্রিয়াকে আসিরিয়ার অধীনে আনিয়াছিলেন। যে সকল দেশ তিনি এক সময়ে শাসন করিতেন, আপনিও সেই সকল দেশ শাসন করিতে পারেন।”

"All warlike spirits have not the same fate.
Semiramis, the glorious parent of
A hundred kings, although she failed in India,
Brought Persia—Media—Bactria to the realm
Which she once swayed—and thou mightst sway."

* * * *

রাজা সার্ডানাপেলস মদ্যপান করিতে করিতে বলিলেন,—“যদি দূরবর্ত্তী স্থানের বর্ব্বর গ্রীকগণ অসত্যবাদী না হয়, তাহা হইলে এই মদের দেবতা বেকাসই সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করেন নাই কি?”

"If these barbarian Greeks of the far shores
And the skirts of these her realms lie not, this Bacchus
Conquered the whole of India, did he not ?"

সালিমিনেস বলিলেন,—“হাঁ, তাই ত, আর তদবধি বেকাস দেবতা হইয়াছেন।” সার্ডানাপেলস ইহার উত্তরে বলিলেন,—“না, না, তাঁহার জয়ের নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি মাত্র স্তম্ভ বর্ত্তমান আছে, যাহা তাঁহারও হইতে পারে আর আমারও হইতে পারে, যদি আমি সেগুলিকে ক্রয় করিয়া লইয়া আসি, কিন্তু এই স্তম্ভগুলি বাস্তবিক তিনি যে রক্তের সমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যে দেশসমূহ ধ্বংস করিয়াছিলেন ও যে সকল হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, তাহারই নিদর্শন।”

বলা বাহুল্য যে, আসিরিয়ার রাণী সেমিরামিস্ ও গ্রীক দেবতা বেকাস (Bacchus) বা ডায়োনিসাস (Dionysus) কেহই ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন। পুরাতত্ত্বে ইহাদের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণার আলোকে সেমিরামিস ও বেকাস কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বায়রণের টীকাকার বলেন যে, গ্রীক ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো (খৃঃ পূঃ ৬৪ অব্দ) উপরোক্ত স্তম্ভের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া অনুমান করিয়াছিলেন যে, ঐ স্তম্ভগুলি হয় ছোট ছোট দ্বীপ আর না হয় পথ-নিদর্শক স্তম্ভবৎ ছোট ছোট পাহাড়। প্লুটার্কের (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) মতে আলেকজাণ্ডার গঙ্গার তীরে বলির জন্য উন্নত বেদীসকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আর স্থানীয় রাজারা সেই সকল বেদীর উপর গ্রীকদিগের প্রথা অনুসরণ করিয়া বলিদান কার্য্য সম্পাদন করিতেন। ইহা হইতেই বোধ হয় ডায়োনিসাস কর্ত্তৃক স্তম্ভ সকল নির্ম্মিত হওয়ার কিম্বদন্তী প্রচারিত হইয়াছিল। বায়রণ তাঁহার নাট্যকাব্যে গ্রীক পুরাবৃত্ত হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া যে ভাবে ইংরাজ পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছেন, তজ্জন্য ভারতবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। সেমিরামিস্ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণের কথা সত্য হইলে ভারতবাসীর বীরত্বের কাহিনী প্রাচীনতম যুগে আসিরিয়ার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বলিতে হইবে। গ্রীকদিগের দেবতা বেকাস ভারত জয় করিয়াছিলেন, এ কথাও সত্য হইলে ভারতবাসী যে বিদেশী দেবসেনাকে কিছুদিন পরে এদেশ হইতে বিদূরিত করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমরা

প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে এইরূপে যতটুকু শিক্ষা লাভ করিতে পারি, তাহার মূল্য নেহাত কম নহে। আসিরিয়ান ও গ্রীক সভ্যতার সহিত আর্য্য সভ্যতার যে সংঘর্ষ হইয়াছিল, তাহাতে প্রাচীনতম বিদেশী সভ্যতা ভারতীয় সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই, ইহা স্মরণ করিলে স্বদেশপ্রেমিক মাত্রেরই হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে। বাস্তবিক, ইংরাজি কাব্য-সাহিত্য পাঠ করিতে করিতে আমরা যদি নিজেদের অতীত গৌরবের কথাগুলি বাছিয়া বাহির করিতে পারি, তাহা হইলে ইংরাজি কাব্য পাঠ করার উদ্দেশ্য কতকটা সফল হইল মনে করা যাইতে পারে। ইংরাজ কবি প্রাচীন ভারতকে যে ভাবে দেখিয়াছেন, আমরা যদি সেই ভাবেও দেখিতে শিখি, তাহা হইলে যে জ্ঞানকে দেশাত্মবোধ বলে তাহার কতকটা আমাদের লাভ হইবার সম্ভাবনা। বর্ত্তমান যুগে ইংরাজি কাব্য-সাহিত্য পাঠ করা সেইজন্য অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয় না। রোমান্টিক যুগের ইংরাজ কবি স্বাধীন ভারতের যে চিত্র-গুলি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজ জাতির উদার হৃদয়ের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বিচারপতি।

[শ্রীঅবনীকুমার দে]

ঘুমানটা খুব প্রয়োজনীয় এবং ন্যায়সঙ্গত কার্য্য, তাই বিচারপতি ডেরিং নিদ্রা যাচ্ছেন।

আমার মনে হয় মহামান্য সম্রাটের জজেরা ঠিক এ রকমই একটা কিছু ভেবে ঘুমকে এতটা প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন।

আপনাদের বুঝে নিতে হবে যে, বিচারপতি ডেরিং এখন আর তাঁর আদালত ঘরটিতে নন। তিনি এখন ব্রাইটনে—মনোপোল হোটেলের দোতলায় ২৪নং কামরা-টিতে নিদ্রিত। তাঁর নিশ্বাসের ক্রিয়াটা খুবই মন্দ ভাবে চলছিল। এমন কি, তখন যদি কেউ সেই কামরাটিতে প্রবেশ করত তবে কিছুতেই সে অনুমান করে উঠতে পারত না যে, অই বৃহৎ চারি-খুঁটিওয়ালা খাটটির একজনও অধি-বাসী থাকা সম্ভবপর।

আমার মনে হয় এইরূপ নিতান্ত গোবেচারার মত ঘুমান একটা মস্ত গুণ এবং প্রত্যেক বুদ্ধিমান জজই অতিরিক্ত মাত্রায় সে গুণের পক্ষপাতী।

সোমবার থেকে শুক্রবার পর্য্যন্ত সমস্ত হপ্তাধরে' বিচার-পতি ডেরিং ফৌজদারী আদালতে একটা গুরুতর মামলা নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। প্রত্যেক বিচারপদ্ধতির মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের বৈশিষ্ট্যটুকু বেশ ফুটে উঠতে দেখা যায়। যদিও তাঁর বিচারে দণ্ডের মাত্রাটা খুবই অতিরিক্ত বলে বিখ্যাত, তবু তার মধ্যে একটা রকম আছে। এমনি কায়দায় তাঁর মুখ দিয়ে রায়টি বেরোয় যেন তাতে করে সঙ্গে সঙ্গেই দণ্ডের পরিমাণ অনেকটা কমে গেছে বলে মনে হয়। শুধু তাই নয়, তাঁর বিচারে বেশ একটু রস-কশেরও সম্পর্ক থাকে।

স্যর উইল্যাম ডেরিং এর 'উইক্-এণ্ড' বাই নেই। তবে সম্প্রতি আদালতে একটি নূতন ধরণের আলো-বাতাসের বন্দোবস্ত হয়েছে বলে এবং এই পাঁচদিন ধরে তাঁর ধাতে সেটি বরদাস্ত না হওয়ায়—তাঁর একটু টাট্‌কা হাওয়ার দরকার হ'য়ে পড়েছে। সেইজন্যই তাঁর ব্রাইটনে আসা।

তাঁর বিছানার পাশে খোলা জানালা দিয়ে সমুদ্রের স্বচ্ছ মৃদু-মন্দ-হিল্লোল ব'য়ে যাচ্ছে—আর বর্দ্ধিতমান জোয়া-রের নৃত্যশীলা ঢেউগুলো তাঁর কানের কাছে 'ঘুম-পাড়ানির' সুর ধরেছে।

ধর্ম্মাবতার ঘুমুচ্ছেন।

* * *

ধর্ম্মাবতার জেগে উঠ্‌লেন। আপনি—আমি হ'লে এ

অবস্থায় যেমন আচম্‌কা জেগে উঠতুম সে রকম জাগা নয়; —বেশ ঠাণ্ডা এবং ধীরে সুস্থে। তিনি যেন এই ঘুমুচ্ছিলেন—এই না। উৎকৃষ্ট জজ্‌মাত্রেই এই রকম ঘুম থেকে জেগে উঠেন।

স্যর উইল্যাম জেগেই দেখলেন তাঁর আশ্চর্য্য স্বপ্নটি সত্যে পরিণত হয়ে গেছে। তাঁর কাম্‌রায় যেন কে একজন!

পর্দ্দা-ছাকা মৃদু রাস্তার আলোতে তিনি দেখতে পেলেন—একটি ছায়ামূর্ত্তি ইতস্ততঃ নিঃশব্দ পদশ্চারণ কর্‌ছে।

তিনি ত দেখেই অবাক! যদিও খুব মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন নয়, তবু বেশ দামী এবং জমকালো গাউন পরা একটি সুদর্শনা যুবতী তাঁর অতিথি। স্যর উইল্যামের মনে হ'ল তিনি যেন তাকে বিকেলে তাঁর টেবিলের অদূরে বসে জলযোগ কর্‌তে দেখেছেন। 'কে এই যুবতীটি এবং কি'—এই প্রশ্ন নিয়ে সে সময়টা কিছুক্ষণের জন্য তাঁর বেশ একটু মৌতাতেই কেটেছিল। শেষটায় কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে না পেরে—তাঁকে সেই মীমাংসাটি বর্জ্জন করতে হয়েছিল। অনুমানের যে ছাই কোনও মাথা মুণ্ড নেই!

তবু তিনি ঠিক ধারণা করে উঠ্‌তে পারলেন না। চোর—বিশেষতঃ মেয়েমানুষ চোরকে কখনও এমন-ধারা ফাঁকা দৃষ্টিবিহীন উদাস চোখ চেয়ে সম্মুখে হাত বাড়িয়ে কোন মানুষ-থাকা আলো-জ্বালা ঘরে বরাবর সটান্‌ হেঁটে চলে যেতে দেখা যায় না।

আগন্তুকটি হেঁটে হেঁটে ঘুমোচ্ছিল। এরূপ 'নিশিতে পাওয়া' পদার্থকে হঠাৎ জাগিয়ে দেওয়া কতটা বিপদজনক সে বিষয়ে স্যর উইল্যাম কতকটা শুনেছিলেন। আর সকল জজেরা যদিও এসব মুখে ততটা স্বীকার করেন না, তবু মনে মনে বেশ মানেন!

তিনি রুদ্ধশ্বাসে যুবতীর কার্য্যকলাপ দেখতে লাগলেন। 'ঘুমে-হাঁটা' লোক যেরূপ স্বভাবজাত বুদ্ধিবলে চলে যুবতীটি সেইরূপ ধীরে ধীরে দোরের দিকে এগুতে লাগল। তাঁর মনে দৃঢ়বিশ্বাস হ'ল যে জাগবার পূর্ব্বে সে নিরাপদেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। এই দুপুর রাত্রে শোবার ঘরে কোন রকম বিপর্য্যয়ের অভিনয় করাটা স্যর উইল্যাম ডেরিংএর মত লোক কোন মতেই পছন্দ করেন না।

বেশ চলে যাচ্ছিল—কিন্তু স্ত্রীলোকটি দুর্ভাগ্যবশতঃ সহসা স্যর উইল্যামের বুটজোড়াটার সহিত হোঁচট্‌ খেয়ে হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ছোটখাট জিনিষ ঠুন্‌ ঠুন্‌ শব্দে মেজের উপর গড়িয়ে পড়ল—তার মধ্যে স্যর উইল্যামের সোণার ঘড়িটি! অমনি যুবতীর কণ্ঠ ভেদ করে একটি করুণ আর্ত্তনাদ শোনা গেল।

'আঃ—মরণ দশা!'

একথাটা কোন ঘুমন্ত যুবতীর মুখ দিয়ে বেরুন আদবেই ঠিক নয়।

স্বরটি শুন্‌তে পেয়ে স্যর উইল্যাম ঠিক করলেন এবার ওঠা উচিত।

হঠাৎ পড়ে গিয়ে ঘুমের আবেশটুকু ভাঙ্গার পর যুবতী যখন চারিদিকে আপনার অপরিচিত ব্যষ্টনগুলো দেখতে পেলে তখন যেন একেবারে ভ্যাবাচেকা মেরে গেল—তার মুখখানির তখনকার দৃশ্যটি বড়ই মর্ম্মন্তুদ!

তীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী যাতনায় রমণী নাটকীয় সুরে বলে উঠ্‌লো—'ওঃ! আমি কোথায় এসেছি!'

যদিও সে অক্স্‌ফোর্ডের ভদ্রয়ানা কায়দায় কথাগুলো বল্‌তে চেষ্টা করছিল তবু যেন সেগুলো ঠিক সম্ভ্রান্ত মহিলার মত নয়।

স্যর উইল্যাম নীচু হ'য়ে ঘড়িটি তুলতে গিয়ে কাছেই দেখতে পেলেন—তাঁর গিণির থলেটি, সোণার সিগারেট-কেস্‌, হীরের বোতাম এবং আরো দু-একটা ছোটখাট জিনিষ কার্পেটের উপর পড়ে আছে।

স্ত্রীলোকটিকে সম্বোধন করে তিনি বল্লেন—'ভদ্রে! আমার ঘরে আপনার উপস্থিতির কারণ জানিতে পারিলে সবিশেষ অনুগৃহীত হইব'।

যেন আকাশ থেকে পড়ে রমণী উত্তেজিত স্বরে বল্লে—'আপনার ঘরে? সে কি? হা ভগবান, তবে কি আমি আবার সেই ঘুমের মধ্যে হাঁটছিলুম?'

স্যর উইল্যামের কানে 'আবার সেই' কথাটি গেল।

'তবে কি তোমার এ রকম আরো হয়ে অভ্যাস আছে?

যাক্ ও সব বাজে কথা রেখে দাও। এখন বল দেখি তুমি আমার ঘড়িটি নিয়ে কি করছিলে ?'

তিনি আদালতে জেরা করার সময় যেরূপ হিংস্রভাবে খেঁকিয়ে উঠেন ঠিক্ সেইভাবে তাকে এ প্রশ্নগুলি করলেন।

রমণী ভয়ে এতটুকু হয়ে গিয়ে ঘড়িটির দিকে আড়চোখে চেয়ে রইল—ঘড়িটি যেন কেউটে সাঁপের বাচ্চা!

সে তা-না-নানা করে বল্লে—'আ-আ-আমি নিশ্চয়ই স্বপ্নেতে সময়টা জানতে চেয়েছিলুম।'

সে বলবার আগেই বুঝতে পেরেছিল যুক্তিটি ঠিক মনঃপুত হবে না।

তিনি সাধারণ জুরিদের প্রতি নাসিকা স্ফীত করে মিষ্টি খোঁচা মেরে মামুলী মুরুব্বীয়ানা কেতায় যেরূপ মন্তব্যের আলোচনা করে থাকেন অনেকটা সে ভাবে তাকে বল্লেন—'তা'হলে কতকগুলো গিনি, একটা সোণার সিগারেট কেস, একজোড়া হাতের হীরের বোতাম, আরো যা যা কিছু ঐ ড্রেসিং-টেবিলটার ওপর ছিল—সেগুলো নেবার স্বপ্নটাও দেখেচ কি ?'

জুরিদের প্রতি এরূপ মিষ্টি খোঁচা মেরে বাক্যির প্রয়োগ সময়ে সময়ে অমোঘ মন্ত্রের কাজ করে থাকে।

কিন্তু রমণীটি এরূপভাবে অপ্রতিভ হ'তে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সে এম্নি ভাব দেখাতে লাগল যেন সে স্যর উইল্যামের প্রশ্নটি আদবেই বুঝতে পারেনি। সে উত্তরে বল্লে—'বাপ্‌রে, নিশিতে পাওয়া কি ভয়ঙ্কর জিনিষ! কেমন, নয় কি মশাই ?'

ব্যঙ্গস্বরে স্যর উইল্যাম স্বীকার করলেন 'ভয়ঙ্কর; হাঁ—তা বই কি! বিশেষতঃ আরো ভয়ঙ্কর যখন নাকি তার ভেতর কোন কিছু বগল-দাওয়া করার মতলবটাও বিদ্যমান থাকে।'

রমণী উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল—'মাপ করবেন মশাই! আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারচি নে।'

এই বলে' সে দোরের দিকে ব্যস্তভাবে ছুটে গেল। কিন্তু স্যর উইল্যাম তাড়াতাড়ি চাবিটি বন্ধ ক'রে কৌশলের সহিত পথটি অবরুদ্ধ করে দাঁড়ালেন।

রুদ্ধকণ্ঠে স্ত্রীলোকটি বলিল— মশাই, আমায় যেতে দিন। আপনি কোন্ ভরসায় আপনার ঘরের ভেতর ঐরকম অসংযত পোষাক পরে আমায় আটকাতে চাইচেন ?'

স্যর উইল্যাম একবার অপাঙ্গে নতদৃষ্টি করতেই বুঝতে পারলেন—তাঁর পরিচ্ছদের অবস্থাটা বড় সুবিধাজনক নয়। কিন্তু তিনিও সহজে হটবার পাত্র নন। এটা যেন বিশেষ কিছু গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা চলে না, এরূপভাবে তিনি স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে তীক্ষ্ণভাবে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—'মেয়েমানুষ! জান আমি কে ?'

অমনি সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটি বল্লে—'না—মশাই, আপনাকে জেনেও আমার বিশেষ কোন দরকার নেই।'

জলদগম্ভীর স্বরে স্যর উইল্যাম্ বল্লেন—'আমি একজন জজ।'

মুহূর্ত্তের জন্য রমণী একটিবার চম্‌কে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে—যেন তাঁর কথাটা বিশ্বাস করতে পারেনি এমন-ধারা ভাবটা দেখিয়ে—একটু ন্যাকামী সুরে বল্লে—'জজ! মাইরি নাকি ? তা হ'লে আপনার পরচুলো কোথা ?'

'আমি সময় সময় পরচুলো পরে ঘুমোই বটে, কিন্তু শয্যাগ্রহণ করি না।'

অত্যন্ত রাগের সময়ও স্যর উইল্যাম্ তাঁর রসিকতাটুকু বর্জ্জন করতে পারলেন না।

যদিও তিনি আদালতে বসে এরূপ রসিকতা করে করে অনেকটা অভ্যস্ত, তবু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই হাস্যরসের হঠাৎ অবতারণা করতে তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। রাস্তার বাজীকর পয়সা চাইতে না চাইতে যেমন ভিড় সরে পড়ে, ঠিক সে রকম রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াসা উড়ে যাওয়ার মত—রমণীর মুখের সেই আগেকার অসন্তোষজনক ভাবটা নিমেষে মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারাটা যেন অনেকটা মানান-সই হয়ে কণ্ঠ পর্য্যন্ত চাপা হাসিতে ছেপে উঠ্‌ল। চেপে চেপে ক্রমশঃ জোরে—তারপর আরো জোরে—উচ্চস্বরে, শেষটায় হিঃ হিঃ হিঃ করে লাগামছাড়া গলায় রমণী হেসে উঠ্‌ল।

অবশেষে রুমালে মুখ মুছে সে বল্লে—'মহাশয়! এরূপ বেয়াদবের মত হাসার জন্য আমায় ক্ষমা করবেন। যা হো'ক বেশ আমোদ কিন্তু।'

তার এবারকার কথাগুলো বেশ স্বাভাবিক ভদ্রয়ানা ভাবে বেরুতে লাগল। 'বাউবেলের'-অঞ্চলবর্ত্তী কথার মত বেশ মিষ্টি!

সঙ্গে সঙ্গে তা'র হাবভাব বদ্‌লে গিয়ে যেন অনেকটা পরিচিতের মত হ'য়ে উঠল। স্যর উইল্যামের রসিকতাটি তাদের দু'জনকার মধ্যে বেশ একটু সখ্যতার বন্ধন জড়িয়ে দিয়েছে।

আমোদটি আরো ভাল করে উপভোগ করার জন্যে যুবতী ইজি-চেয়ারের হাতলটার উপর বসে বল্লে—'আপনি একটু ভেবে দেখুন। আমার এখানে এই—এ-এ-এ করতে আসা, অর্থাৎ আমি কি করতে যাচ্ছিলুম, তা বোধ হয় আপনি কতকটা ধারণা করতে পেরেছেন?'

অস্বীকার করতে গিয়ে স্যর উইল্যাম এম্নিভাবে মাথাটি নাড়লেন যাতে তার ঠিক উল্‌টো মানেটি বোঝা গেল।

যুবতী বেশ সরল এবং সোজাসুজি ভাবে বল্লে—'দেখুন, আমি মনে করেছিলুম এ ঘরটি আমেরিকার সেই নামকরা 'মিলোনেয়ার' ডি-কেম্পের। সে আজ রাত্রিতে মোটরে করে লম্বা সখের দৌড় উপভোগ করতে বেরিয়ে গেছে। এমন মজার সুযোগটা কি ছাড়া যায়? ২৪—ঠিক তা'রই নম্বর;—কিন্তু আমি একটু ভুল করে ফেলেছি—কেমন নয় কি? আরো বিশেষ আপনি একজন জজ!'

এই মজার রকমের ভুলটার কথা মনে হতেই যুবতী একেবারে হেসেই আকুল!

স্যর উইল্যাম বিষয়টিকে প্রথমে যতটা রগড়ের মনে করেছিলেন ততটা নয় দেখে রুক্ষ ভাবে বল্লেন—'চুপ কর। ব্যাপারটা দেখচ ভারী গুরুতর। দেখো মিস্—'

অমনি রমণী তাঁকে শুধ্‌রে বল্লে—'মিস্ ভেরা। ওরফে স্প্যারো—লোটী স্প্যারো।'

শাস্তির আদেশের মত সুর করে স্যর উইল্যাম বল্লেন—'মিস্ লোটী স্প্যারো। তোমাকে পুলিসে দেওয়া কর্ত্তব্য এবং আমি তাই দিচ্চি।'

মিস্ স্প্যারো আশ্চর্য্যান্বিত দৃষ্টিতে তাঁর প্রতি চেয়ে রইল। যেন একজন বিশ্বাসী বন্ধু শত্রুর সহিত মেশার অভিপ্রায় ব্যক্ত করচে।

সে নির্ভীকের মত বল্লে—'যান্—যান্—হ'লেনই বা আপনি একজন জজ,—তা'বলে আপনি ত আর অতটা নীচমনা হ'তে পারেন না? আর আপনিও তা ভুলবেন না যে, আপনার দ্বারা আমার একরত্তিও উপকার হয় নি। এই 'উইক্-এণ্ডটা'তে দেখচি আমার ভারী লোকসান্ হয়ে পড়ল। যা'হোক আপনাকে ধন্যবাদ!'

'ধন্যবাদ—আমাকে!'

বালিকার প্রগলভতার মাত্রা যতই চড়ে যাচ্ছে—স্যর উইল্যামের ততই অসহ্য বোধ হ'তে লাগল। সে যে বিশেষ কিছু গুরুতর বলে ফেলেছে এটা মনে না করে মিস্ স্প্যারো বল্লে—'হ্যাঁ মশাই—ধন্যবাদ আপনাকেই। কি জানেন—এক কথায় বল্‌তে গেলে এই হোটেলের কাজটাই হচ্ছে কেবল—মোফৎ পয়সা। এখানে আপনার কি চাই জানেন—কেবল দু' একটা জমকালো ফ্রক, আর একটু আধটু বাহারী-চ ঢাং—বাকী সব ফক্কিকা। অনায়াসেই রাতা-রাতি কিছু লাভ করে লম্ব'—সটান্ পাড়ি মারতে পারেন। কিন্তু এবারটায় আমার খরচা কম করেও অন্ততঃ দশগুণ বেড়ে যাবে দেখচি—দেখাবার মতও কিছুই থাকবে না। দেখা যাচ্ছে এ ক্ষতির আংশিক কারণ আপনি। অতএব আমার হোটেলের বিলটা আপনারই চুকিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য—আপনি ইচ্ছা করলে সে জন্য আমায় একখানি পাঁচটেকি ফেলে দিতে পারেন।'

বেয়াদব ছুঁড়িটার ধীর অথচ নিতান্ত স্পর্দ্ধাজনক কথা বার্ত্তায় অত্যন্ত রেগে গিয়ে খুব কর্কশ স্বরে স্যর উইল্যাম্ বল্লেন—'তোমাকে পা—পা—পুলিসে দেব। তুমি কোন্ সাহসে স্যর উইল্যাম্ ডেরিংএর সহিত এরূপ অশিষ্টের মত কথা কইচ?'

তাঁর নাম শুনেই বালিকার আপাদমস্তক বেতসীলতার মত কেঁপে উঠল! তার মুখের হাসিটুকু বাসি হয়ে গিয়ে ভয় ও বিস্ময়ের আকার ধারণ করে ক্রমে বরফের মত শাদা ফ্যাকাসে হয়ে উঠল।

সে তার পায়ের আঙুলের পাতার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঁচু হ'য়ে তাঁর মুখের দিকে বিস্ময়-সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্লে—'না—কই—আপনি ত মিঃ জজ ডেরিং নন?'

'হ্যাঁ, চিরকালটাই তিনিই আমি,—আর আমিই তিনি।' মিস্ স্প্যারো যেন তার স্ব কর্ণকে বিশ্বাস করতে পারলে না। সে যেন একেবারে হাবামেরে গিয়ে তাঁর দিকে বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। শেষটায় একটু চৈতন্য হওয়ার পর কানে কানে কথা কওয়ার মত সুর করে বল্লে—'তা হ'লে প্রভু—ধর্ম্মাবতার—আপনারই কাছে ত সোমবারে আমার 'জো'র বিচার হবে?'

'জো?—জো—কে?'

'জো ম্যেষ্টন্'।

নামটি শুনে স্যর উইল্যামের মনে পড়ে গেল।

'ম্যেষ্টন্? ওঃ আমার মনে পড়েছে বটে। সেই হীরে চুরির মাম্‌লা। হ্যাঁ, সোমবারে সাজার জন্যে দলবল শুদ্ধ আমারি কাছে তার হাজির হ'বার কথা বটে।'

বালিকার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল। কিন্তু সে বেশ সাহসের সহিত নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে প্রশ্ন করলে—'আপনি তা'কে কি সাজা দেবেন?'

'লক্ষ্মীটি! আমি আপাততঃ সে সম্বন্ধে তোমার সহিত কোন আলোচনা করতে পারছি না।'

'বলুন—বলুন—দয়া করে বলুন! কতদিন যে তাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে রাখবেন তাই ভেবে ভেবে আমার মহাপ্রাণী বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। নিষ্ঠুর হ'বেন না, আমায় যন্ত্রণার দায় থেকে রক্ষা করুন।'

'এই লোকটা—ম্যাষ্টন্—কি তোমার স্বামী?'

'এই ব্যাপারটি না ঘট্‌লে এত দিনে হ'য়ে যেত।'

করুণকণ্ঠে জজ বল্লেন—'দুঃখিত হ'লুম। পাঁচ বছরের কম হ'বে বলে মনে হচ্ছেনা।'

'পাঁচ বছর! না—না—তাও কি হয়? পাঁচ বছর! বলেন কি? আমার জো পাঁচ বছরের জন্য চলে যাবে! ধর্ম্মাবতার! গরীবের উপর দয়া করুন। আমি বোঝাতে চাইনা যে সে নির্দ্দোষ—কারণ সে তা' করেছে। কিন্তু তা বলে এতটা নির্ম্মম হবেন না। আপনি তাকে পাঁচ বছরের জন্য তফাৎ করে রাখতে পারবেন না।' এই বলে সে তাঁর হাত দুটী জড়িয়ে ধরল।

স্যর উইল্যাম্ রমণীর আকর্ষণ হ'তে তাঁর হাতদুটি যতটা সম্ভব ধীরে ধীরে মুক্ত করে মাথাটি নেড়ে নিতান্ত নিরাশ-ব্যঞ্জক সুরে বল্লেন—'এ আমার কর্ত্তব্য। এখন যাও।'

হাঁটুগেড়ে রমণী বল্লে—'প্রভো! আমার একটি নিবেদন—'

'আমি শুনতে পারব না।'

বালিকার ওষ্ঠদ্বয় ভেদ করে একটি অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শোনা গেল। সে ধীরে ধীরে তা'র পায়ের পাতার উপর দাঁড়িয়ে নিতান্ত মিনতিভাবে স্যর উইল্যামের প্রতি আপনার বাহুদুটি প্রসারিত করে দিলে। তিনি তাঁর আঁখিদুটি ফিরিয়ে নিলেন। সে মুহূর্ত্তের জন্য একবার নিরাশ-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চেয়ে অকস্মাৎ হাতদুটি এমন ভাবে ইতস্ততঃ ছুড়তে সুরু করলে, যেন সে এখনি পড়ে যাবে।

তিনি তাকে ছুটে ধরতে গেলে সে আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লে—'আমার ভয় হচ্ছে—আমার ফিট্ হ'বে।'

'ফিট্! না—না—এখানে···ফিট্ হবে কি?' সে সম্মুখের দিকে ঝুকে পড়ে একেবারে তাঁর বাহুদ্বয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তার নিশ্বাসের গতিটা প্রথমে দ্রুত হয়ে ক্রমে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে আসল, আর মস্তকটি তাঁর কাঁধের উপর ঢলে পড়ল। জীবনে আর কখনও স্যর উইল্যাম্ এতটা বেকায়দায় পড়েন নি।

তিনি অনুনয় বিনয় করে বল্লেন, 'দোহাই লক্ষ্মীটি! একটু ঠিক হয়ে দাঁড়াও—সংযত হও।'

প্রত্যুত্তরে শুধু একটিমাত্র করুণ আর্ত্তনাদ শোনা গেল। তিনি তাঁর ভুজসন্নিহিত জীবন্ত জড় মূর্ত্তিটিকে একবার নেড়ে অনুনয় করে জিজ্ঞেস করলেন—'তাঁকে কি করতে হবে?'

বালিকার দেহযষ্টি বারেক কেঁপে উঠল। সে একটিবার মুহূর্ত্তের জন্য চোক চেয়ে ঢোক গিলে বল্লে—'আমার পেছনে চাবিটা।'

সে পুনরায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

স্যর উইল্যাম তা'কে ইজি-চেয়ারটিতে তুলে দোরের দিকে ছুটে অগ্রসর হ'লেন। তিনি যেই তা'র পাশ দিয়ে

দোরের চাবিটি খুলে দিতে যাবেন, অমনি সে এম্নিভাবে সম্মুখের দিকে চেয়ারের একটু হাতলের উপর ঝুলে পড়ল, যা'তে করে চাবিটি ঠিক তা'র পেছনে পড়ে। তখনকার দৃশ্যটি দেখতে যদিও ভীতিপ্রদ, তবু চাবিটিকে আয়ত্বাধীন করতে তার এই অপূর্ব্ব কৌশলটি আবিষ্কার করার জন্য বলিহারী যেতে হয়।

ঠাণ্ডা ধাতু পদার্থটি তা'র মেরুদণ্ডে ঠেকে অঙ্গরাখার ভিতরে গলে যেতেই তার চেতনা ফিরে এলো। কোন নশ্বর রমণীকে আজও পর্য্যন্ত এতটা শীঘ্র চেতনা ফিরে পেতে দেখা যায়নি। তাকে উঠে বসে হাস্তে দেখে স্যর উইল্যাম্ একটি অস্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন।

যেন এই সবে দুর্ব্বলতা থেকে সেরে উঠেছে, সেরূপ রুগ্নস্বরে মিস্ স্প্যারো বল্লে—'আপনাকে ধন্যবাদ—আমি আপাততঃ বেশ আছি। আসুন, এবার আমরা দুজনে বসে জো'র বিষয় বেশ খানিকটা প্রাণের আদান-প্রদান করি। আপনার কাছে সিগারেট আছে?'

স্যর উইল্যাম্ রাগে বিবর্ণ হয়ে গেলেন—বুঝ্তে পারলেন যে কি ফাঁদে পড়েচেন!

তিনি অত্যন্ত রুক্ষ কর্কশকণ্ঠে বল্লেন—'রমণি! শীঘ্র আমার চাবি দাও।'

বেশ স্থিরভাবে মিস্ স্প্যারো বল্লে—'প্রিয় মহাশয়! ইচ্ছে থাক্লেও আমার সেটি সাধ্যাতীত—বরং আপনি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

ব্যর্থ ক্রোধে স্যর উইল্যাম্ একবার তার প্রতি অগ্নি-কটাক্ষ নিক্ষেপ করলেন। অবশেষে বিছানার পাশে টেলিফোনটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি গেল—তিনি ছুটে সেটি ধরতে গেলেন।

মিস্ স্প্যারো যেন তাঁর কার্য্যকলাপের দিকে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করেনি এরূপ ভাবে বল্লে—'আপনি করছেন কি?'

'এখুনি এসে দোরটি খুলে দেবার জন্যে কাউকে ডেকে পাঠাচ্ছি।'

সন্দিগ্ধভাবে মাথা নেড়ে মিস্ স্প্যারো বল্লে—'আপনার স্থলে আমি হ'লে তা করতুম না। ভেবে দেখুন দৃশ্যটি দেখে তা'রা কি মনে করবে। আপনি একজন জনপ্রিয় বহুমান্যাস্পদ হাইকোর্টের জজ এই রাত্রে পাজামা পরে আছেন,—আর আমি মেঝের উপর মূর্চ্ছা যেয়ে মরার মত পড়ে আছি! ভাবুন, তা'রা এতে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হ'বে? আর হোটেলের চাকর-বাকরগুলোই বা কি কাণা-ঘুসো করবে।'

সৌভাগ্যবশতঃ যদিও স্যর উইল্যামের কোনও মৃগীর ব্যামো ছিল না, তবু তাঁকে কিছুক্ষণের জন্যে বাক্যস্ফূর্ত্তি রহিত হ'য়ে থাকতে হ'ল। তিনি শুধু বার কয়েক নাকটি সিট্কুতে লাগলেন। শেষটায় অনেক কষ্টে চাপা গলায় বল্লেন—'কোন্ সাহসে তোমার ধৃষ্টতার মাত্রা এতটা বেড়ে উঠেছে যাতে করে তুমি একথা বল্তে পার যে আমি—আমি—আ—'

আর তাঁর বাকিটুকু বলা হ'ল না।

'এ রকম পাজামা পরা লোকের সম্বন্ধে লোকে যা তা অনুমান করতে পারে।' স্থির হয়ে এ কথাগুলো বলে মিস্ স্প্যারো অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে তাঁর পোষাকটি সনাক্ত করে দিলে।

স্যর উইল্যাম্ তার দিকে না চেয়ে বিছানার পাদদেশে ছুটলেন—সেখানে তাঁর কোচের উপর 'ট্রাউজার' ভাঁজ করা ছিল।

এবার আরো বাগে পেয়ে নাছোড়-বান্দার মত মিস্ স্প্যারো বল্লে—'রসুন—থামুন! অনুগ্রহ করে এখন আর পরিচ্ছদটা বদ্লাতে যাবেন না। কারণ তা হলে আমি সাহায্যের জন্যে চীৎকার করতে বাধ্য হব, এবং তা'রা এসেই হয়ত দেখবে আপনি পোষাকের আর্দ্ধেকটা পরেছেন এবং আর্দ্ধেকটা বাকি রয়েছে! সে অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন! তখন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, এমন কি কোন আইনজ্ঞ পর্য্যন্ত তার কোন সন্তোষজনক মানে করে উঠ্তে পারবে না।'

তর্কটি অস্বীকার করবার যো নেই। তিনি ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। মিস্ স্প্যারো আরও একটু যো পেয়ে বল্লে—'প্রভু স্বাতস্থ হউন্। এবার আপনাকে পেয়েছি, আর ছাড়লে চলচে না। এখন বলুন ত জো'র কি করবেন? আপনি মনে করবেন না আমি তাকে একেবারে ছেড়ে দিতে বলচি—'

'সে তোমার অশেষ দয়া—'

'কিন্তু দেখুন পাঁচ বছর ভারী গুরু। বেরিয়ে আসলে সে তখন চল্লিশে পড়বে। চল্লিশে-পড়া মিন্‌সেকে আমি বে করতে ঘৃণা বোধ করি। আচ্ছা! ঘানির সঙ্গে ছমাসটা কেমন? আমার মনে হয় তা'তে করে জো'র একটু উপকারও হবে। হালে সে একটা অকেজো দলে ভিড়ে রাত্রে ক্লাবে ক্লাবে হাড়হাবাতের মত ঘুরে ঘুরে একটুখানি কেমন ধারা হ'য়ে-পড়েছিল। 'এখন বেশ একটু শায়েস্তা হয়ে এসেচে। ছমাসেই একেবারে বৃষ্টির মত তরল সোজা হয়ে যাবে।'

মিস্ স্প্যারো অনুসন্ধিৎসু নেত্রে স্যর উইল্যামের মন্তব্য শুনবার জন্যে তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

তিনি দৃঢ়স্বরে বল্লেন—'দেখ বালিকা! তুমি যদি মনে করে থাক যে, আমার নামে মিথ্যা কুৎসা রটাবার ভয় দেখিয়ে আমায় কর্ত্তব্যচ্যুত করতে পারবে—তবে খুবই ভুল বুঝেচ। আমি জোসেফ্ ম্যাষ্টনের প্রতি ঠিক পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেছি, এবং কিছুতেই তার এক মিনিটও কম হ'বে না।'

মিস্ স্প্যারো আরো বেশ আরাম করে চেয়ারটিতে বসে বল্লে—'বেশ ভাল। আপনার যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে তবে তাই হোক।'

দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে তিনি আদেশ করলেন—'এখন ভাল চাও ত এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।'

'আগে জো'কে ছমাস, পরে ছেড়ে দিতে প্রতিশ্রুত হউন।'

তিনি গম্ভীর চালে ঘড়িটির দিকে তাকিয়ে বল্লেন—'আমার আদেশ পালন করবার জন্যে তোমাকে দু'মিনিট সময় দিলুম।'

মিস্ স্প্যারো সজোরে লাফিয়ে উঠে বল্লে—'আমি আপনাকে আধ মিনিট সময় দিলুম। এখনও একবার ভেবে দেখুন। আপনি মনে করছেন আমি ভাওতা মারচি, কিন্তু তা নয়! ঐ ঘড়িটি ঠিক ত্রিশবার টিক্ টিক্ করার মধ্যে যদি আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হ'ন যে, ছমাস পরে জোকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তাহ'লে আমি 'হিষ্টিরিয়ার' চীৎকারে হোটেলশুদ্ধ লোককে এই ঘরে একত্র জড় করব। তারপর মিষ্টার জাষ্টিস্ ডেরিং! একবার ভেবে দেখুন আমার মত একটি যুবতীর সহিত আপনি কি করে এই হোটেলের একটি নিভৃত শয়নকক্ষে এ রকম অবস্থায় তালাবদ্ধ হ'লেন! সেজন্যে অতিমাত্রায় উৎসুক, চক্রান্তপ্রিয় অবিশ্বাসী জনসাধারণের নিকট সারা বাকি জীবনটা ধরে কিরূপ ভাবে আপনাকে জবাবদিহি হ'তে হবে!'

তা'র চোখে মুখে এমন একটা দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভাব ফুটে উঠল, এবং সে এই কথাগুলো এম্নিভাবে বল্লে যে, তাতে আর সন্দেহের কোন কারণ রইল না। স্যর উইল্যাম্ বালিকার সাহস ও ধৃষ্টতা দেখে একেবারে বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গেলেন। তাঁর মুখের চেহারায় মনের ভাব ব্যক্ত হ'য়ে পড়ল এবং সে তাহাতে অনেকটা আশ্বাস পেয়ে বল্লে, 'কি মশাই! এখনও প্রতিজ্ঞা করতে রাজী আছেন ত?'

স্যর উইল্যাম্ ম্লানগম্ভীর ভাবে নিস্তব্ধে সমস্ত বিষয়টা মনের মধ্যে পর্য্যালোচনা করতে লাগলেন। বাইরের থেকে দেখতে গেলে ব্যাপারটি যে বড় সুবিধার নয়, সেটি তিনি বেশ বুঝতে পারলেন। অবশ্য তিনি ইচ্ছা করলে এখনি ঘণ্টা টেনে এই বর্ত্তমান অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন। কিন্তু তার পর? এই 'বস্তুটি' ত বড় সোজা নয়! সে যে তখন নিজের মন থেকে নানান বিনুনী দিয়ে কত 'কেচ্ছা' গাইবে না কে তা বলতে পারে? এই গোলাপী রঙের পাজামা পরে একদল সন্দিগ্ধমনা বোঝালে—বুঝবে—না এমনধারা হোটেলের অশিক্ষিত চাকর নাকরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাহা অপমান হওয়াটার চিত্রটিও তাঁর চোখের উপর ভাসতে লাগল! অবশ্য এটাও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাঁর মত অত বড় একজন প্রতিষ্ঠাবান্ জজের কথাটাও কেউ বিশ্বাস করবে না। এরকম একটা স্ত্রীলোকের কথা যে তাঁর কথার চাইতে বেশী ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনা চলে এটাও অসম্ভব। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে তা'কে ধরিয়ে দেওয়াই সঙ্গত। থানায় ধরে নিয়ে গেলেই সব বিপত্তি চুকে যাবে।

কিন্তু তাই কি? তিনি হাজার প্রতিষ্ঠাবান্ হ'লেও

সত্যি সত্যি কি সবাই তাঁর কথা বিশ্বাস করবে? এই সব বড় বড় জায়গায় বড় বড় 'কেচ্ছা' না শুনবার জন্যে কে কবে কার কানে আঙ্গুল বুজে থাকে? না—কই তা ত দেখা যায় না!

তিনি যেন বেশ দেখতে পেলেন তাঁর এই কুৎসা কলঙ্ক প্রত্যেক ক্লাবে-ক্লাবে, চায়ের পার্টিতে পার্টিতে, প্রত্যেক অলিতে-গলিতে লাটিমের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি দেখতে পেলেন প্রত্যেক খবরের কাগজের 'টীপ্পনী'তে এক-জন জজের সম্বন্ধে রকমারি 'ছড়া খেউড়' বাঁধা হ'য়ে গেছে। তিনি—

'ভুলাতে রূপসী ললনা
পরেন গোলাপী পাজামা" ইত্যাদি।

এবার থেকে তাঁর বিরাট নামটি ছোট বড় সব মহলে বিদ্রূপের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে! এমন কি অতিবিক্ত সাজায় ক্রোধান্ধ ঘৃণিত ফৌজদারী আসামীটা পর্য্যন্ত জেলখানার ডকে দাঁড়িয়ে নিতান্ত ইতর ও অশ্রাব্য ভাষায় চীৎকার করে প্রতিহিংসার শোধ নেবে। তাঁর এত সুনাম, মর্য্যাদা, প্রতিষ্ঠা সমস্ত বিদ্রূপের এক লহমায় ডুবে যাবে! টিট্‌কিরী —সে কি ভয়ঙ্কর জিনিষ! কত বড় রসিকের অত বড় বুকের পাটা—যে তা সয়ে চলতে পারে!

অসহিষ্ণু ভাবে মিস্ স্প্যারো বল্লে—'কই মশাই—এখনও কি আপনার ভাবনা ফুরোল না?'

তিনি আড়চোখে একবার তার পানে চাইলেন। তা'র মুখে চোখে তখনও সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব। সে একটুও গলে নি—টলে নি। অবশেষে তিনি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'লেন। তিনি মনে করলেন বিচারপতির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার চাইতে বিচার জিনিষটা জাহান্নামে যাওয়া উচিত।

'কি মশাই, ক'দ্দূর?'

এবার তাঁ'কে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতিজনক ঘাড় নাড়তে হ'ল।

অমনি যুবতী অশ্রুপ্লুতনেত্রে তাঁর হাত দুটি চুম্বনে অভিসিক্ত করে দিলে।

'ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন'! আপনাকে এর জন্যে পরে অনুতাপ করতে হবে না। আমি প্রতিজ্ঞা করচি এবার আসলে আমি তা'কে ঠিক শুধ্‌রে নেব।'

একথা শুনে তিনি আবার তাঁর নাকটি সিট্‌কুলেন দেখে মিস্ স্প্যারো বল্লে—'হ্যাঁ—নিশ্চয়ই। আমি প্রতিজ্ঞা করচি, এবার আমি তাকে ঠিক শুধ্‌রে নেব। যদি আপনার মত এত বড় একজন জজকে দিয়ে আমি যা মনে করি তা এতটা সহজে করিয়ে নিতে পারি—তা হ'লে কি আর বেচারা জো'কে একটু বনিয়ে-মানিয়ে নিতে পারব না?'

দুঃখের সহিত একবার গলাটি ঝেড়ে তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। আনন্দে মিস্ স্প্যারো একটি ক্ষুদ্র তুড়ি-লাফ মারতেই চাবিটি ঠুক্ করে মেঝের উপর পড়ে গেল। স্যর উইল্যাম্ ফিরে সেটি কুড়িয়ে তা'র হাতে দিলেন।

চাবিটি গ্রহণ করতে গিয়ে তাঁর চোখ দুটির সহিত তা'র চক্ষু দুটি মিলে গেল। সে তাঁর সেই চাউনীর ভাষাটি পড়ে একটু অস্বচ্ছন্দভাবে বল্লে—'আপনি আমায় পানে ওরকম করে তাকাবেন না।' অবশেষে সতৃষ্ণভাবে বল্লে—'আমায় আপনার লোকের মত জ্ঞান করবেন; আমায় সন্দেহ করবেন না! শুধু জো'র জন্যেই আমায় এতটা করতে হয়েচে। অবস্থাটা যদি এতই সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াত এবং আমি আপনাকে পূর্ব্বে যা ভয় দেখাচ্ছিলাম, কার্য্যতঃ যদি শেষটায় আমাকে তা'ই করতে হত, তা হ'লে যে আমি জো'কে হারাতাম এ কথাটা আপনি ভুলবেন না। যদিও আমি তার জন্য এতটা করেছি তবু সেটি ঘটলে তা'র সঙ্গে আমার আর কোনই সম্বন্ধ থাকত না।'

তিনি বল্লেন—'আমার মনে তখন অতটা উদয় হয়নি।'

হেসে হেসে মিস্ স্প্যারো বল্লে—'জানেন ত ইজ্জৎ বড় বস্তু। বিশেষতঃ মেয়েমানুষের ইজ্জৎ—চোরের মধ্যেও সে জ্ঞানটী বেশ পোক্ত।'

এইটুকু বলে সে দোরের চাবিটা খুলে দিয়ে ফিরে এসে নিজের হাতটী স্যর উইল্যামের দিকে বাড়িয়ে দিলে। তিনি সেইটি গ্রহণ করে অপর হস্তে দোরটী খুলে দিয়ে বল্লেন—'যাহো'ক, খুব চালাক মেয়ে কিন্তু তুমি!'

যাবার সময় মিস্ স্প্যারো খানিকটা কি ভেবে উচ্চৈঃ

স্বরে বলে উঠ্‌ল—'চুলোয় যাক্‌ ওসব—আমার এখনও আসল কাজটাই বাকি রয়ে গেছে।'

এই বলে সে ছুটি হাতে বৃদ্ধের গলাটা জড়িয়ে ধরে ছু'গালে ছুটি চুম্বনরেখা অঙ্কিত করে ধীরে ধীরে সোহাগ ভরে কানের কাছে একটু সাবধান করে বলে গেল—'দেখবেন যেন এ কথাটা আর সোমবার দিন জো'কে বলে ফেলবেন না!'

এসো।

[শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়, বি-এ]

১

শৈশব-উষায় মোর এস তুমি দেব,
অরুণ আলোকে,
হৃদয় নিকুঞ্জে ওগো জাগায়ে কোরক
সরল পুলকে।
বিশ্বের সারাটী অঙ্গে যেন তব রূপ
উঠে ফুটি ফুটি ;
ক্রীড়াশীল দেহ যেন চরণ ধূলায়
খেলে লুটাপুটি।

২

যৌবন মধ্যাহ্নে মোর এস প্রিয়তম
প্রেমের বিভায় ;
কোরক ফুটায়ে দাও সে আলোক পাতে
ফাগুনের বায়।
উদ্দাম উদ্যমে মোর দিও যেন সখা
তোমার পরশ ;
মধুময় করে দিও সতত আমার
সকল হরষ।

৩

জীবন-সায়াহ্নে তুমি এস শান্তিময়
সৌম্যসখা বেশে
কর্ম্মক্লান্ত দেহ-মন দিও জুড়াইয়া
সুমধুর হেসে।
ঝরায়ে জীবন-পুষ্প এনে দিও প্রভু
সুমধুর ফল,
শক্তিহীন বুকে ওগো দিও দিও নব
আশ্বাসের বল।

বিবেকানন্দের বাণী।

[শ্রীসুনীলিমা দেবী]

বিবেকানন্দ যে সময়ে এদেশে জন্মগ্রহণ করেন সে সময়ে তাঁহার উদার এবং উন্মাদনাময় ধর্ম্মমতের নিতান্তই প্রয়োজন ছিল। একদিকে দেশের কতিপয় শিক্ষিত লোক পাশ্চাত্য একেশ্বরবাদের এবং নাস্তিকবাদের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, কেহ কেহ এমন কি ধর্ম্মান্তর গ্রহণেও পশ্চাৎপদ হন নাই, আবার অন্যদিকে দুই চারি জন সুশিক্ষিত সুধী ধর্ম্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব আলোচনায় নিবিষ্টচিত্ত হইয়া যাহা কিছু হিন্দুধর্ম্মে আছে সমস্তই শুভ* বলিয়া সমর্থন করিতেছিলেন। দেশের মধ্যে অধিকাংশ নরনারীর ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ মনোযোগই আকৃষ্ট হয় নাই। পুরাতন পূজাপদ্ধতি এবং আচারবহুল ধর্ম্মের প্রভাব দিন দিন কমিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সেই

* ইংরেজী হইতে।

লাঘব পূর্ণ করিতে নূতন কোনও উচ্চতর ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তিত এবং অনুসৃত হইতেছিল না। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন একটী একেশ্বরবাদী উপনিষদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তন করেন এবং তাহাই বহুকালাগত হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ বা একমাত্র সত্যরূপ বলিয়া প্রচার করেন, তখন তাঁহার সমসাময়িক দেশবাসিগণ তাঁহার এই নূতন বার্ত্তার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

ভারতবর্ষের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে যখন চতুর্দ্দিকে সূচিভেদ্য ঘনান্ধকার ছাইয়া ছিল, তখন সহসা রামমোহন রায়ের এই উজ্জ্বল দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়া দেশবাসীরা তাঁহাকে প্রেতমূর্ত্তি বলিয়া মনে করিয়াছিল। হয়ত বা রামমোহনের চেষ্টা ঠিক স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের পথে চালিত হয় নাই। তিনি সহসা স্বয়ং জাগরিত হইয়া সুপ্ত দেশের নিদ্রাভঙ্গ করিতে যে কর্ণবিদারী তূর্য্যধ্বনি করিলেন তাহাতে অনেকের মনে আতঙ্ক ও অবিশ্বাসের সঞ্চারও হইয়াছিল। সেই জন্য তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মের সনাতন অতি বিপুল রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া তাহার পার্শ্বে একটী স্বরচিত কুটীর প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছিল।

রাজা রামমোহন রায় যে নব প্রভাতের আলোক স্বয়ং দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন,—ভারতের নব জাগরণের যে সূচনা তিনি দেশে ভাগ্যাকাশের প্রাচী প্রান্তে পূর্ণোদ্ভাসিত দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই অরুণ রশ্মির জ্যোতির্ম্ময় আভাষ তাঁহার দেশের সমস্ত ভ্রাতৃবৃন্দকে দেখাইতে এবং সেই সুপ্রভাত বার্ত্তায় যে আশা ও আনন্দ ছিল সকলকেই তাহা উপলব্ধি করাইতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সেই ব্যাকুলতার প্ররোচনায় তিনি হয়ত ভুলিয়াছিলেন যে, যাহারা চিরন্তন নিদ্রার মোহে জড়িত-চক্ষু হইয়া বহুদিন অবস্থান করিয়াছে, তাহাদের সম্মুখে সহসা আলোকচ্ছটা প্রতিফলিত করিলে তাহারা অভিভূত ও বিমূঢ় হইয়া পড়ে, তৎক্ষণাৎ তন্দ্রালস পরিহার করিয়া নবতেজে দাঁড়াইয়া উঠিতে পারে না। তাই তাঁহাকে, সকল পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তকদের যে উপেক্ষা ও যে বাধা প্রাপ্ত হইতে হয় তাহা বহন করিতে হইয়াছিল, এবং আপনার নবপ্রবুদ্ধ জ্ঞান-প্রদীপটী একটী নিভৃত কোণে অল্পসংখ্যক বন্ধুদের লইয়া প্রজ্বালিত রাখিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, ফলে রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত দেশের প্রচলিত জাতীয় আধ্যাত্মিক জীবনের যোগ রহিল না।

এই যোগ স্বামী বিবেকানন্দ করাইয়া দিলেন। হয়ত তাঁহার দেশবাসীরা এতদিনে অনেকাংশে সুপ্তির আচ্ছন্নতা পরিহার পূর্ব্বক চোখ মেলিয়া নবোদিত অরুণ-লেখা দেখিতে পাইয়াছিল, এবং বুঝিয়াছিল যে অতীত নিশীথের ছায়া ও স্বপ্নগুলি, প্রভাতের সত্য ও আলোকে নিতান্তই অমূলক ও প্রাণহীন। পাশ্চাত্য সভ্যতার দিন দিন বিস্তারের ফলে দেশের মনে যে স্বাতন্ত্র্যের সঞ্চার হইতেছিল তাহাতে আচারের কঠিন ও কঠোর বন্ধন কিছুতেই আর সহনীয় বলিয়া কেহই মনে করিতে পারিতেছিল না। তাই একটী বিপুল মুক্তির জন্য দেশের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। রামমোহনের পরে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এই প্রক্রিয়া চলিতেছিল, এবং এই জন্যই আমাদের মনে হয়, বিবেকানন্দের বাণী এত সহজেই ও এত শীঘ্রই সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল। এই স্থানেই দেখা যাউক, বিবেকানন্দ ধর্ম্মের দিক দিয়া কি বলিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ ধর্ম্মকে—শুধু হিন্দুধর্ম্মকে নয়, সকল ধর্ম্মকেই—খুব বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। মানুষের যুগযুগান্তরব্যাপী এই যে উন্নতি এবং শ্রেষ্ঠত্বের দিকে মহাযাত্রা, সমস্ত মানব জাতির ক্রমবিকাশের দিক দিয়া বিবেকানন্দ তাহার ভিতর আধ্যাত্মিকতার আসন কোথায় তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। যে অসভ্য নগ্ন মানব ধর্ম্মজীবনের অধস্তম স্তরে অবস্থিত, তাহার নিকটেও আধ্যাত্মিকতার একটী বিশেষ সহজবোধ্য এবং অধস্তম মূর্ত্তির প্রয়োজন আছে; এবং ক্রমেই মানসিক ও নৈতিক উন্নতির পথে সে যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই যে তাহার সেই ধর্ম্মবিশ্বাসের শ্রেষ্ঠতর রূপ প্রকাশিত হইতে থাকিবে, এই চিরন্তন সত্যটী সকল ধর্ম্মের সংকীর্ণ হৃদয় প্রচারকগণ ভুলিয়া যান, কিন্তু বিবেকানন্দ তাহা ভুলেন নাই। তাই তাঁহার কাছে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত

মহিমাময় মূর্ত্তিটী প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের মনে হয়, হিন্দুধর্ম্ম যেন ভারতবর্ষেরই সেই গৌরবময় গগন-চুম্বী হিমাচলের মত। যেমন হিমাচলের শীর্ষদেশে সূর্য্যকিরণ চির উদ্ভাসিত, যেমন তাহার সেই অনশ্বর তুষার কিরীট অনন্ত রহস্যের সাক্ষী স্বরূপ চির বিরাজিত, তেমনই হিন্দুধর্ম্মের শীর্ষদেশে যে বেদান্তবাদ ও অদ্বৈতবাদ তাহা জ্ঞানীদের ও মুমুক্ষুদের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে, এবং তাহাতে অজ্ঞান ও অন্ধতার লেশমাত্র নাই, তাহা যেন চির-রবিকরোজ্জ্বল হিমাচল শিখরেরই মত গভীরতম ধর্ম্মতত্বের গরিমায় চিরসমুজ্জ্বল। তাহার পর হিমালয়ের বন্ধুর শিলাসঙ্কুল এবং মেঘ-বৃষ্টি-বিক্ষুব্ধ মধ্যদেশের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মের বহু দেবদেবীর পূজার উপর প্রতিষ্ঠিত নানা অনুষ্ঠান পদ্ধতির দ্বারা সমাচ্ছন্ন পৌরাণিক লৌকিক স্বরূপ, এবং হিমালয়ের নিবিড়তম ঘন অরণ্যানীবেষ্টিত অন্ধকার তলদেশের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মেরও বহু কুসংস্কার পরিপূর্ণ ও অজ্ঞানান্ধকার সমাচ্ছন্ন অজ্ঞ ও নিম্নতম বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদিগের নিমিত্ত একটী রূপ আছে। এই তিন রূপ লইয়া আমাদের এই সনাতন ধর্ম্মটীর পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে হইবে। আমাদের মতে "সনাতন" কথাটীর ইহাই অর্থ। অন্যান্য ধর্ম্মের মধ্যে এইরূপ স্তরভেদের কোনও ব্যবস্থা নাই, এইজন্য সেই সকল ধর্ম্মে যদিও একটীমাত্র পথ নির্দ্দেশ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়, তথাপি তত্তৎধর্ম্মাবলম্বীরা আপনাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার তারতম্যানুসারে ধর্ম্মের এক একটী বিভিন্ন স্বরূপ গড়িয়া তুলে। খৃষ্টানধর্ম্মে এই জন্যই পৌত্তলিকতা প্রবেশ করিয়াছে, ঈশ্বরের মাতৃরূপের পূজা স্থান পাইয়াছে; ইসলামধর্ম্মেও মানুষকে ভগবানরূপে পূজা যদিও বিশেষ করিয়া নিষিদ্ধ এবং মূর্ত্তির কিছুমাত্র সম্পর্ক এই ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয় পাপ বলিয়া গণ্য, তথাপি নিম্নস্তরের বুদ্ধিযুক্ত মুসলমানগণ পীর পয়গম্বর প্রভৃতির উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে এবং মহরম প্রভৃতি উৎসবে মূর্ত্তিপূজার খুব নিকটে গিয়া পৌছিয়াছে। এই সার্ব্বজনীনতা হিন্দুধর্ম্মকে যে মহতী জীবনীশক্তি দান করিয়াছে তাহার রহস্য বিবেকানন্দ বুঝিয়াছিলেন এবং দেশ বিদেশে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বিবেকানন্দকে এই জন্যই ভগিনী নিবেদিতা অনেক ভিন্ন প্রকার রূপে দেখিয়াছিলেন। তিনি এক মূর্ত্তিতে ঘোর অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক, সংসারের সহিত সকল সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত সন্ন্যাসী; আর একদিকে লৌকিক ধর্ম্মের উদ্দীপনাপূর্ণ কালীমূর্ত্তির নিষ্ঠাবান সাধক ও মূর্ত্তিপূজার প্রচারক, অপর দিকে তিনি ধর্ম্মের প্রতি আপাতশ্রদ্ধাহীন, দেশের ঐহিক মঙ্গলের, সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নতির একজন প্রধান উদ্যোক্তা, রাজসিক ভাব ও পার্থিব সম্পদ জাতির মধ্যে বিস্তারিত করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াসী—দেখিতে পাই।

এই বাহ্য অসামঞ্জস্যের কারণ আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—তিনি হিন্দুধর্ম্মের সনাতনত্ব হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে গভীর ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু এই সত্যদৃষ্টি তাঁহার গুরুই তাঁহাকে দিয়াছিলেন। সেইজন্য সেই গুরুর কথা না বলিলে বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে একটা বিচিত্র আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকাশ লোকসমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিয়া সত্য সত্যই শ্রদ্ধায় ও আনন্দে স্তব্ধ হইতে হয়।

কলিকাতা নগরীর আট মাইল দক্ষিণে রাণী রাসমণির একটী কালীবাড়ী আছে। সেইখানে একটী উদাসী ও উন্মনা ব্রাহ্মণ যুবক পূজাপদ্ধতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া মন্ত্রের ধার দিয়াও না গিয়া কালীমাতা মন্দিরের পূজারীর কার্য্য করিতে থাকেন, এবং নির্জ্জন মন্দির সংলগ্ন উদ্যানে বিনিদ্র রজনী ঈশ্বরচিন্তায় অতিবাহিত করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে জনরব শুনা গেল যে তিনি কালী-সাধনায় সিদ্ধ হইয়া "পরমহংসত্ব" লাভ করিয়াছেন। ক্রমে বহুলোক তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল এবং তাঁহার কথার মাধুর্য্যে ও গভীরতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিল। তাঁহার উপদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম আসন দেওয়া হইয়াছে—উদারতা ও ঈশ্বরব্যাকুলতাকে। আধুনিক যুগের ধর্ম্ম সাহিত্যে চারিখণ্ড

পুস্তক আশ্চর্য্য প্রাণশক্তি, উদ্দীপনা ও অনুপ্রাণনা আনয়ন করিয়াছে; এই চারিটী পুস্তক রামকৃষ্ণ দেবেরই "কথামৃত"। যাঁহারা তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে দেশের সমস্ত মনীষীদেরই নাম দেখিতে পাই। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেন্দ্রলাল সরকার, বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, কেহই এই ক্ষীণকায় নিরক্ষর প্রচলিত আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ যুবকটীর আকর্ষণ এড়াইতে পারেন নাই। নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামে একটী শিক্ষিত যুবাও তাঁহার নিকট যাইত। কিছুদিন পরে তাহার জীবন সহসা অভিনব পথে চালিত হইল। এই যুবকই পরে স্বামী বিবেকানন্দ হইয়াছিলেন।

বিবেকানন্দের বাণী রামকৃষ্ণের উপদেশের উপরই যে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত সে কথা স্বামীজী বহুবার দেশবিদেশে প্রকাশ্যভাবে জানাইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ হইয়া রামকৃষ্ণ হৃদয়ের যে বিশালতা লইয়া খৃষ্টানদের গীর্জ্জায়, ব্রাহ্মদের ধর্ম্মমন্দিরে এবং মুসলমানদের মস্‌জিদে উপাসনা করিতে যাইতেন, বিবেকানন্দ সেই উদারতাকে ভারতবর্ষেরও বাহিরে সুদূর আমেরিকায় প্রসারিত করিতে প্রচেষ্ট হইয়াছিলেন। যে ধর্ম্মব্যাকুলতা রামকৃষ্ণকে ঈশ্বরসন্ধানে উন্মত্তপ্রায় করিয়াছিল সেই ধর্ম্মপিপাসা বিবেকানন্দকেও সংসারের সকল ভোগবাসনাকে তুচ্ছ করাইয়া আজীবন সন্ন্যাসব্রত বরণ করাইয়াছিল। এই শেষের বস্তুটী অর্থাৎ সন্ন্যাসব্রত বিবেকানন্দ আপামর সাধারণের নিকট প্রচার করেন নাই, কিন্তু তাঁহার আশ্রমের সন্ন্যাসীবন্ধুদের ও শিষ্য-দের সম্মুখে এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ও সংসারবর্জ্জনের আদর্শকে তিনি অতি দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা তাঁহার বাণীর আধ্যাত্মিক দিকটার বিশ্লেষণে দেখি যে তাহার মূলমন্ত্র দুইটী—উদারতা ও মুক্তিপিপাসা।

আমেরিকায় সিকাগোনগরীতে যে নিখিলধর্ম্ম মহা-মণ্ডলী আহূত হয় তাহাতে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন সেটী পড়িলে মনে হয় যে বেদান্তকেই তিনি ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন। সেইজন্য তাঁহাকে বিদেশী ভক্তগণ বেদান্তের প্রচারক বলিয়াই গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই বেদান্তবাদটী কি?—সচরাচর বলিয়া থাকি ইহাই বেদান্তের মূল তত্ত্ব, যে ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা।—ইহা যে শুধু অদ্বৈতবাদ তাহা নয়, ইহাকে "ঐক্যবাদ"ও বলা যাইতে পারে। পরমাত্মা ও জীবাত্মা মূলতঃ এক কিম্বা জীবাত্মা পরমাত্মারই প্রকাশ মাত্র, যেমন সূর্য্যের ছায়া জলের উপর প্রতিভাত হয়; এই সমস্ত দৃশ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ এই অর্থে মিথ্যা যে আমাদের মন এই জগতকে যেরূপভাবে দেখিতেছে বা গ্রহণ করিতেছে তাহা তাহার প্রকৃত স্বরূপ নহে। মুক্তির পথ, এই জড় জগতের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া পরম চৈতন্যময় ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হওয়া। সংক্ষেপতঃ ইহাই বিবেকানন্দ ব্যাখ্যাত বেদান্তের মূল কথা। দেখিতে পাইতেছি, এই কথার সহিত তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য আদর্শের ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। তাঁহার "সন্ন্যাসীর গীতি" নামক ক্ষুদ্র কবিতা-টীতে এই কথাটীই অপূর্ব্ব তেজোময়ী ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে।

বিবেকানন্দ শুধু যে ধর্ম্মেরই মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া তাহার সত্যরূপটী দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহা নহে, অর্থাৎ শুধুই যে তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি দ্বারা তিনি ইতিহাসের, সমাজতত্ত্বের, বিজ্ঞানের ও দর্শনের দিক দিয়া হিন্দুধর্ম্মকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ ও প্রণিধান করিতে পারিয়াছিলেন তাহা নয়; তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়া, তাঁহার বিশাল প্রাণের সমস্ত সমবেদনা ও প্রেম দিয়া তিনি মানবকে, বিশেষতঃ তাঁহার দেশবাসীকে ভালবাসিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার বাণীর মধ্যে একটী অপূর্ব্ব আন্তরিকতা এবং উন্মাদনা আছে, তাহা শুধু নীরস তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, দার্শনিকের অথবা পণ্ডিতের গবেষণা ও আবিষ্কার নহে। জগতে এইখানেই মহা-পুরুষদের বিশেষত্বটুকু নিহিত,—তাঁহাদের জ্ঞান যেরূপ সর্ব্ববাধাকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত রহস্যের দ্বারে গিয়া বারংবার আঘাত করিতে থাকে, তাঁহাদের সার্ব্বজনীন করুণাও তেমনি নিখিল মানবকে স্পর্শ করিতে চায়; জগতের সমস্ত বেদনা, গ্লানি ও দুঃখের অপসারণের জন্য তাঁহাদের প্রাণ নিরন্তর কাঁদিতে থাকে। অতএব

আমরা বিবেকানন্দের ধর্ম্মবাণীর সহিত তাঁহার প্রাণের যোগকে উপলব্ধি করিয়া তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব, নচেৎ তাহার ভিতরে যে উদ্দাম তেজঃপ্রবাহ, যে অদম্য ভাবের তরঙ্গ নিরন্তর সঞ্চারিত হইতেছে, তাহার কারণ উদ্ঘাটিত করিতে পারিব না।

"উদ্বোধন" পত্রিকার প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে তিনি একস্থলে বলিতেছেন—"ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব, পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরের তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণ প্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন হইবে, ইহাও নিশ্চিত। এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনের' জীবনোদ্দেশ্য।"

স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থ প্রাণময় ধর্ম্মের নিমিত্ত যেরূপ ব্যাকুলচিত্ত ও সদা-প্রচেষ্ট ছিলেন, সেইরূপ মিথ্যা লোকাচারের বন্ধন, হানিকর সংস্কারের জড়তার বিরুদ্ধেও অবিচলিত তেজে ও অদম্য উৎসাহে অক্লান্ত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। পবিত্র সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত যে সকল প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতি, যে সমস্ত নৈতিক বিধি-বিধান ক্রমে সময়ের প্রভাবে নিস্তেজ ও প্রাণহীন হইয়া উঠিতেছিল, এবং বর্ত্তমান সময়ের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হওয়ায় দেশের কল্যাণ না করিয়া বরং অকল্যাণ করিতেছিল, তাহাদের সংরক্ষণের জন্য তিনি কিছুমাত্র চেষ্টা করা আবশ্যক মনে করেন নাই।

বিবেকানন্দকে হিন্দুদের মুখপাত্রস্বরূপ আমেরিকায় প্রেরণ করা হয়। তিনি সেখানে বক্তৃতায় এবং পরে অন্যান্য স্থানেও বক্তৃতাকালে হিন্দুধর্ম্মের মূল বস্তুটী কি, তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "আমাদেরও তাহা জানা প্রয়োজন; কারণ যদি কোনও বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মতভেদ থাকে তাহা হইলে তাহা হিন্দু ধর্ম্মের সংজ্ঞা লইয়াই। "শ্রুতি" যাহার প্রামাণ্য গ্রন্থ (শ্রুতি অর্থে 'বেদ') "গীতা" যাহার ভগবদ্বক্ত বিনিঃসৃত টীকা, শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রণীত 'বেদান্ত ভাষ্য' যাহার সুপ্রণালীবদ্ধ বিবৃতি, তাহাই হিন্দুধর্ম্ম প্রণালী। "আমাদের ধর্ম্মের এক কেন্দ্রীভূত সত্য—যাহা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সকলেরই সাধারণ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই মানবাত্মা—অজর, অবিনশ্বর, সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত মানবাত্মা, যাঁহার মহিমা স্বয়ং বেদ প্রকাশ করিতে অক্ষম, যাঁহার মহিমার সমক্ষে অনন্ত সূর্য্য চন্দ্র তারকা ও নীহারময় নক্ষত্রপুঞ্জ বিন্দুতুল্য।"

তাঁহার দেশবাসীকে বিবেকানন্দ কোনও সংকীর্ণ ধর্ম্ম শিক্ষা দেন নাই, কারণ তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ শাশ্বত ও সার্ব্বজনীন ছিল। একস্থলে তিনি বলিতেছেন,—"হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ অথবা অন্য কোনরূপ কপটতা করিবার আবশ্যকতা নাই। সেই প্রাচীন ঋষিগণকে ধন্যবাদ যাঁহারা এরূপ সর্ব্বব্যাপী, সদাবিস্তারশীল ধর্ম্মপ্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা জড়রাজ্যে যাহা কিছু আবিস্কৃত হইয়াছে ও যাহা কিছু হইবে, সবই সাদরে গ্রহণ করিতে পারে।...ভারতে ধর্ম্মকে কখনও ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় নাই। কোনও ব্যক্তিকেই তাঁহার ইষ্টদেবতা, সম্প্রদায় বা আচার্য্য মনোনয়নে বাধা দেওয়া হয় নাই, সুতরাং এখানে ধর্ম্মের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, অন্য কোথায়ও সেরূপ হইতে পায় নাই।"

ক্রমশঃ।

সফল-সন্ধ্যা ।

[শ্রীতামসরঞ্জন রায়]

নীল আকাশের কোল-ঘেঁসে ঐ
সাঁঝের আঁধার নাবল রে,
আমার প্রাণের সবগুলি তার
তারই সনে বাজ্‌ল রে ।
ফুলের গন্ধ আকাশ ছেয়ে,
আপন মনে চল্‌ল ধেয়ে,
জীব জগতের হৃদয় নিয়ে
কাহার পায়ে লুটল রে ?
দিন শেষের ঐ ক্লান্ত গীতি,
হৃদয় মাঝে জাগিয়ে নীতি
বিষাদ মাখা পুলক প্রীতি,
অসীম পানে ছুটল রে !
আঁধার-ঘেরা বসনখানি,
জগৎ মাতার বুকে আনি,
ফাগুন-সন্ধ্যা অবাক মানি
নীরব হ'য়ে রইল রে ।
নীথর সাঁঝের আকুল গানে
উদাসতা জাগ্‌ল রে,
হৃদয় আমার ভুলোক ছেড়ে
তাঁর চরণে মিল্‌ল রে ।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

[৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ]

[আমার পিতামহ ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রাতঃস্মরণীয় স্বদেশবৎসল ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহকর্ম্মী ও অভিন্নহৃদয় সুহৃদ ছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র "হিন্দু পেট্রিয়ট" নামক ইংরাজী সংবাদপত্র প্রবর্ত্তিত করিয়া উহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিলে হরিশ্চন্দ্র উহাতে তাঁহার সহকারীরূপে লিখিতে আরম্ভ করেন এবং কয়েক বৎসর পরে (১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে) হরিশ্চন্দ্র উক্ত পত্রখানি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারাণ-চন্দ্রের নামে ক্রয় করিয়া উহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। অতঃপর উভয় বন্ধু তাঁহাদের প্রতিভা ও শক্তির পূর্ণ প্রয়োগে উক্ত পত্রের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠ করেন। লর্ড ড্যালহৌসীর পররাজ্যগ্রাসিনী নীতির, সিপাহী বিপ্লবে বিকৃতমস্তিষ্ক ইংরাজ সাধারণের বৈরনির্য্যাতননীতির এবং দুর্বৃত্ত নীলকরগণের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে উভয়ে সম্মিলিত হইয়া অক্লান্তভাবে মসীযুদ্ধ চালনা করিয়া সকলকে যেরূপ চমৎকৃত করিয়াছিলেন তাহা সংবাদপত্রের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র অকস্মাৎ অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিলে গিরিশচন্দ্রই তাঁহার শোকাকুলা জননী ও অসহায়া সহধর্ম্মিণীর সাহায্যার্থে পুনরায় উক্ত পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। পরে "হিন্দু পেট্রিয়ট" ৺কৃষ্ণদাস পালের হস্তে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসো-সিয়েশনের জমীদারগণের মুখপত্রে পরিণত হইলে গিরিশচন্দ্র প্রজাপক্ষ অবলম্বন করিয়া "বেঙ্গলী" পত্র প্রবর্ত্তিত করেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উহা অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত সম্পাদিত করেন। নীলকরগণের বিরুদ্ধে লিখিত কোনও নির্ভীক তেজোগর্ভ প্রবন্ধের জন্য জনৈক নীলকর হরিশ্চন্দ্রের নামে মানহানির মোকদ্দমা করেন। উক্ত মোক-দ্দমার ব্যয়ের জন্য যখন সম্প্রতি-পরলোকগত হরিশ্চন্দ্রের বাসগৃহ বিক্রয় হইবার উপক্রম হয় তখন গিরিশচন্দ্রই কতিপয় মহানুভব বন্ধুর সাহায্যে গৃহখানি ক্রয় করেন। হরিশ্চন্দ্রের কীর্ত্তি ও স্মৃতি জীবিত রাখিবার জন্য গিরিশচন্দ্র যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র উভয়ের পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। গিরিশচন্দ্র যেমন হরিশ্চন্দ্রের অসাধারণ রাজনৈতিক জ্ঞান এবং অকাট্যযুক্তিসমন্বিত দার্শনিকোচিত রচনার জন্য তাঁহার অনুরাগী হইয়াছিলেন, হরিশ্চন্দ্রও তেমনই গিরিশচন্দ্রের ওজস্বিনী ভাষা এবং সাহিত্য-প্রতিভা সন্দর্শন করিয়া তাঁহার একান্ত গুণপক্ষপাতী হইয়া-ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পরে আহূত সাধারণ স্মৃতিসভায় গিরিশ-চন্দ্র স্বর্গগত বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া যে হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, রাজা

রামমোহন রায়ের পর এরূপ মহাপ্রাণ হিন্দু আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। হরিশ্চন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র উভয়ে সৈন্য-সংক্রান্ত হিসাব-বিভাগে একই আফিসে দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষকাল একত্রে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং উভয়েই অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগী ও অকপট স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন বলিয়া উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জীবনচরিত একমাত্র গিরিশচন্দ্রই লিখিতে পারিতেন। বন্ধুগণের অনুরোধে তিনি হরিশ্চন্দ্রের একটি বিস্তৃত জীবনী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার পাণ্ডুলিপি তাঁহার কোনও আত্মীয় পড়িতে লইয়া গিয়া হারাইয়া ফেলেন, সেজন্য জীবনচরিতটী প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অন্যতম বন্ধু (পরে "রেইস এণ্ড রায়ত" সম্পাদক) ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "মুখার্জীস ম্যাগাজিনে" গিরিশচন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত পত্রিকা বিলুপ্ত হওয়ায় প্রবন্ধটি শেষ হয় নাই। আমরা উক্ত অসম্পূর্ণ প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত করিলাম। হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত এখনও রচিত হয় নাই এবং প্রবন্ধটিতে কতকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য আছে, সেইজন্য আশা করি উহা বাঙ্গালী পাঠকগণের অপ্রীতিকর হইবে না। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, মূল প্রবন্ধের লিপিচাতুর্য্য অক্ষম অনুবাদে প্রতিফলিত করা অসম্ভব। যাঁহারা মূল প্রবন্ধটি পাঠ করিতে চাহেন, তাঁহারা মৎসম্পাদিত "Selections from the Writings of Girish Chunder Ghose, the founder and first Editor of the *Hindoo Patriot* and the *Bengalee*" নামক গ্রন্থের ৯৯ পৃষ্ঠা হইতে ১০১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখিবেন।]

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

বঙ্গসমাজের উপর সহসা বজ্রপাত হইয়াছে! সকলেরই কণ্ঠ রুদ্ধ, সকলেরই চক্ষুঃ স্থির। দরিদ্রের সহায়, ধনীর উপদেষ্টা, সমাজের মুখপাত্র, দেশের হিতৈষী, নির্ভীকহৃদয় বীর, যিনি সকল বিপদ্ অবহেলা করিয়া রাজনীতিক সংগ্রামে সকলের অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন —অদ্য আমাদের বাষ্পাকুল নয়নের অন্তরালে স্বপ্নের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যৌবনের মধ্যাহ্নে, প্রতিভার পূর্ণবিকাশাবস্থায়,—যখন নীলকরপীড়িত কৃষকগণ সূর্য্যদেব-সমক্ষে নমিতমস্তকে তাহাদের পরিত্রাণকারীর কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছে, এবং দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আনন্দ-কোলাহলেমুখরিত—তখনই কৃতান্তের করালদণ্ড প্রচণ্ড বেগে নিপতিত হইল, এবং দেশের গৌরব ও অলঙ্কার সহসা জ্যোতির্ম্ময় দৈবরথে আরোহণ করিয়া শূন্যমার্গে অন্তর্হিত হইলেন। আমাদের যে ক্ষতি হইল তাহা অপরিমেয়। আমাদের সবে মাত্র সুস্থ জীবনের কুসুমকলি অঙ্কুরিত হইতেছিল। বহুযুগব্যাপী অন্ধকারের মধ্য হইতে আমরা সবে মাত্র আলোকরশ্মির সন্ধান পাইতেছিলাম। কুসংস্কারের নিবিড় ব্যূহ ভেদ করিয়া, বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমরা বহু আয়াসে ক্ষীণপদে (যদিও আগ্রহের সহিত) পথ অন্বেষণ করিতেছিলাম। আমরা সবে মাত্র রাজনীতিক স্বাধীনতার মূল্য বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমাদের দেশের নেতারা একত্র হইয়া দেশের অভাব অভিযোগাদি কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট ধীরভাবে অথচ অটল দৃঢ়তার সহিত যথাযথ জ্ঞাপন করিবার মহৎ কার্য্যে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহারা যেরূপ গাম্ভীর্য্যের সহিত শাসনকর্ত্তাদিগের অনুচিত কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাতে শাসনকর্ত্তারা তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্ভ্রম প্রদর্শন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই মহদনুষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। যে তেজঃ, যে উদ্যমশীলতা, যে অভিমতের উদারতা ও যুক্তিকুশলতার বলে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশন দেশের রাজনীতিক ক্ষেত্রে একটা মহাশক্তির কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা একা হরিশ্চন্দ্রেরই প্রদত্ত। তাঁহার একাগ্র মন সততই অতীতের পর্য্যালোচনা ও ভবিষ্যতের পরীক্ষা বিষয়ে নিয়োজিত থাকিত। অদৃষ্টচক্রে, লোকনয়নের অন্তরালে, দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি সমাজের উচ্চতম পদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং কেবল স্বীয় প্রতিভাবলে উহার উপর অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। চিন্তা ও ভাবের রাজ্যে তিনি যে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার সম্মুখে ধনী ও সজ্জন সকলেই মস্তক সসম্ভ্রমে অবনত করিয়াছিলেন। এরূপ ব্যক্তির জীবনের আলোচনা নিশ্চয়ই চিত্তাকর্ষক হইবে। অতএব আমরা এই জীবনবৃত্ত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। আশা করি, যাঁহারা এই পরলোকগত হিন্দু দেশহিতৈষীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

হরিশ্চন্দ্র ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি

এক দরিদ্র বহুপত্নীক কুলীন ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় পুত্র, এবং শৈশবে তাঁহার জননীর মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। য়ুরোপীয় পাঠক এরূপ দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়গণের মধ্যে কিরূপ বন্ধন থাকিতে পারে তাহা বোধ হয় সহজে কল্পনা করিতে পারিবেন না, কিন্তু যাঁহারা কৌলিন্য প্রথার গূঢ় রহস্য অবগত আছেন, তাঁহারা ইহাতে কোনরূপ অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিবেন না। অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে, প্রতিপালন অর্থে মোটা ভাত ও সুলভ শাকব্যঞ্জনাদি দ্বারা উদর-পোষণ। অত্যল্প ব্যয়েই ভরণকার্য্য নির্ব্বাহ হইত, এবং শিক্ষার ব্যয় তদপেক্ষাও লঘুতর ছিল—কারণ তাহাতে কিছুই ব্যয় হইত না। যে ব্যক্তি ভবিষ্যতে ইংরাজী ভাষায় এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন যে, ইংরাজের মত অনর্গল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মত ওজস্বিনী ভাষায় ইংরাজী লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি কতিপয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর বদান্যতায় পরিপুষ্ট একটি সামান্য গ্রাম্যবিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষায় প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়েই অসাধারণ মেধাসম্পন্ন বালক ভবিষ্যতে মহিমান্বিত পুরুষে পরিণতির সূচনা ও আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন। পাঠ্য বিষয়ের তালিকায় এরূপ কোন বিষয় ছিল না যাহাতে ছাত্র অন্ততঃ শিক্ষকের শিক্ষাদানশক্তির শেষ সীমা পর্য্যন্ত অভিজ্ঞতা লাভ করে নাই। কথিত আছে একজন দেশীয় শিক্ষক ছাত্রের কূট প্রশ্নের বিভীষিকায় এরূপ শঙ্কিত হইয়াছিলেন যে, পড়াইবার অগ্রে পাঠ্য বিষয়গুলি আপনি উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া প্রস্তুত থাকা তাঁহার পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তথাপি সময়ে সময়ে পাঠের কোন কোন কঠিন অংশের বিশ্লেষণে শিক্ষক অপেক্ষা ছাত্রের প্রদর্শিত পথ অধিকতর সুগম ও অন্বর্থ বোধ হইত। তাঁহার সাহস ও কর্ম্মকুশলতা অসাধারণ ছিল। জনৈক সুরামত্ত ইংরাজ নাবিক একবার বিদ্যালয়ের কতিপয় যূথভ্রষ্ট বালককে অপমান করায় হরিশ্চন্দ্র তদ্দণ্ডেই একটি ক্ষুদ্র যোদ্ধৃদল সৃজন করিয়া, প্রত্যেকের হস্তে এক-গাছি 'রুল' দিয়া, নিজে দলের অগ্রণী হইয়া, আততায়ীকে এরূপ প্রহার দিয়াছিলেন, যে সে পলায়ন করিতে পথ পায় নাই। এই সকল ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে সচরাচর এদেশের বালকেরা যে বয়সে পায়রা পুষিয়া ও ক্রীড়া কৌতুকে সময় ক্ষেপণ করিয়া থাকে সেই বয়সে হরিশ্চন্দ্রের মানসিক বল কিরূপ ছিল তাহাই প্রদর্শন করা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হরিশ্চন্দ্রের পরিবারে অর্থাগমের আশা অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। যে কারণে তিনি ভবানীপুর ইউনিয়ন স্কুলে অবৈতনিক ছাত্ররূপে প্রবেশ করিতে বাধ্য হন সেই কারণেই তাঁহাকে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। গৃহে অন্নাভাবের করুণ আর্ত্তনাদ তাঁহার ন্যায় স্নেহমমতাশীল যুবককে কিছুতেই নিরুদ্বেগ থাকিতে দিল না। তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন বটে কিন্তু অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন নাই। সে সময়ে কেরাণীগিরি সহজলভ্য ছিল না। তখন বিদ্যালয়ে সম্মানলাভ বা উচ্চশিক্ষাসঞ্জাত পাণ্ডিত্য, বিনা বিদ্যায় বহুবর্ষব্যাপী ক্রমোন্নতির ফল উচ্চপদপ্রাপ্ত গর্ব্বোদ্ধত রাজ-পুরুষদের নিকট উপহাসের বিষয় ছিল। যাহারা কখনও সেক্ষপীয়রের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই, অথবা উক্ত নামে স্যর রবার্ট সেক্ষপীয়র নামক রেসিডেণ্টকেই বুঝিত, তাহারা সেক্ষপীয়রের বচন আবৃত্তিকারিগণকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিত। তখন সুপারিশপত্র ভিন্ন আফিসে প্রবেশলাভের অন্য উপায় ছিল না। হরিশ্চন্দ্রের অর্থাভাবও যেমন, সুপারিশের অভাবও তেমনই ছিল। তাঁহার উন্নতির পক্ষে ইহা প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জন করিতেই হইবে, নতুবা অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইবে। অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন হইল। লিপিকুশলতার গুণে কখনও কখনও আবেদনপত্রাদি লিখিয়া দুই একটি টাকা পাইতেন, কিন্তু তাহাতে অভাব ঘুচিত না, যদিও সময়ে সময়ে তিনি বিশেষ উপকৃত হইতেন। আমাদের মনে পড়ে তাঁহারই মুখে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম, তাহা হইতে বিদ্যালয় পরি-ত্যাগের কিছু দিন পরেই তাঁহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল তাহার আভাস পাওয়া যায়। দুরদৃষ্টক্রমে একদিন তাঁহার গৃহে আহারীয় সামগ্রী এরূপ নিঃশেষিত হইয়া যায় যে একটি তণ্ডুলকণা পর্য্যন্ত ছিল না। কি আহার করিবেন তাহাই চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল। ভয়ানক বৃষ্টি নামিল। বাটীর বাহির হইয়া যে পিতলের

বাসন বন্ধক রাখিয়া খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করিবেন সে পথ পর্য্যন্ত নাই। বিষণ্ণচিত্তে বসিয়া নিজ দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে এ বিপদে পরিত্যাগ করিবেন এ কথা কিছুতেই তাঁহার বিশ্বাস হইল না। তিনি একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। সহসা গৃহের দ্বার খুলিয়া গেল এবং একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার বসিবার গৃহে প্রবিষ্ট হইল। একি, ভগবান স্বয়ং ছদ্মবেশে তাঁহাকে অনাহারে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন না কি? অসম্ভব নহে। শীঘ্রই জানা গেল, যে আগন্তুক একজন বিখ্যাত জমীদারের মোক্তার, কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজপত্র ইংরাজীতে অনুবাদ করাইতে আসিয়াছেন। পারিশ্রমিক দুই টাকা দিবার প্রস্তাব হইল। হরিশ্চন্দ্রের তখন টাকার এত অভাব এবং উহা এরূপ সুসময়ে উপস্থিত, যে দুই টাকার মূল্য তাঁহার নিকট দুই মোহরের সমান বিবেচিত হইল।

কিন্তু এরূপ অনিশ্চিত উপার্জ্জনে তাঁহার অভাব দূর হইতে পারে না। নিয়মিত উপার্জ্জন ব্যতীত তাঁহার বিদ্যাচর্চ্চার অবসর হয় না। সুতরাং তিনি প্রসিদ্ধ নিলাম বিক্রেতা টুলো কোম্পানীর অধীনে মাসিক আট টাকা বেতনে চাকুরী গ্রহণ করিলেন। পরে বেতন বাড়াইয়া দশ টাকা করা হয়। একজন দেশীয় যুবকের পক্ষে দশ টাকা বেতন তাঁহার প্রভুরা এরূপ প্রচুর বিবেচনা করিতেন যে তাহা আর কিছুতেই বর্দ্ধিত করিতে সম্মত হন নাই, যদিও হরিশ্চন্দ্র এরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন যে আর দুই টাকা অধিক দিলে তিনি বহুদিন কোনরূপ বেতন বৃদ্ধির দাবী করিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবেন না। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই টলিলেন না। কারণ সে সময়ে সরকারের অভাব ছিল না। নিলাম সরকারদের চৌর্য্যবৃত্তির প্রলোভন ও সুবিধা যথেষ্ট ছিল। এবং হরিশ্চন্দ্র সেরূপ নীচ প্রবৃত্তির লোক হইলে অনায়াসেই উক্ত কর্ম্মে বাহাল থাকিয়া প্রভুর কার্পণ্যের প্রতিশোধ লইতে পারিতেন। কিন্তু অর্থাভাবে পীড়িত হইলেও অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন হরিশ্চন্দ্রের নিকট অতীব ঘৃণার্হ ছিল। তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং শীঘ্রই মিলিটারী অডিটর জেনারেলের আপিসে একটি সামান্য পদ লাভ করিলেন। বেতন মাসিক পঁচিশ টাকা হইল, কিন্তু ভবিষ্যৎ উন্নতির যথেষ্টই আশা ছিল। ঐ সময়ে ম্যাকেঞ্জি সাহেব (যিনি এক্ষণে কলিকাতার লোকপ্রিয় এবং উদ্যমশীল আবকারী ও ইনকাম ট্যাক্স কলেক্টর) তাঁহার দুর্লভ বন্ধুরূপে দর্শন দিলেন। উক্ত মহোদয় য়ুরোপীয় হইলেও জাতি ও বর্ণ বিচার নীচতার লক্ষণ বোধে অবহেলা করিয়া সদয়ভাবে তাঁহার হস্তধারণ করিলেন এবং সুবিধা দেখিলেই তাঁহার পদোন্নতি বিধান করিতে যত্নশীল হইলেন। তিনি পূর্ব্বাহ্নেই এই যুবক বন্ধুটির প্রতিভা (যাহার জ্যোতিঃ পরে বিদ্যুৎবৎ দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিল) লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তাৎকালীন ডেপুটী মিলিটারী অডিটর জেনারেল, কর্ণেল চ্যাম্পনিজ্ সাহেবের নিকট তাঁহাকে একজন অসাধারণ কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচিত করিয়া দেন। এখন হইতে হরিশ্চন্দ্রের উন্নতির পথ ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইতে আরম্ভ হইল। উক্ত কর্ণেল মহোদয় শীঘ্রই এই যুবক কর্ম্মচারীর গুণ বুঝিতে পারিলেন। যে তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির জন্য তাঁহার শত্রুরাও তাঁহার প্রশংসা করিত এবং যে চিত্তের উদারতায় রাসেল্ সাহেব তাঁহার "Indian Diary" নামক পুস্তকে তাঁহাকে কলিকাতার Lucullus বলিয়া অভিহিত করেন, সেই বুদ্ধি ও উদারতার গুণে তিনি এই কেরাণী-জীবন-বরণকারীর উজ্জ্বল প্রতিভা গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের সৌভাগ্যক্রমে সে সময় সৈন্যসংক্রান্ত হিসাব বিভাগ সেই উদারচিত্ত বীরপুরুষ কর্ণেল গোল্ডির অধীনে ছিল, যাঁহার তুল্য উন্নতমনা ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সে সময়ে বেঙ্গল আর্মি নামক যোদ্ধৃদলে অতি অল্পই ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে অদ্ভুত প্রতিভাবলে তিনি ভারতীয় সৈনিক বিভাগের কার্য্যাবলী সুনিপুণ কর্ণধারের ন্যায় অবলীলাক্রমে চালনা করিতেন তাহাতে নীচজনোচিত পক্ষপাতিত্ব কখনও স্থান পাইত না। তিনি দ্বিধা না করিয়া এই সামান্য কর্ম্মচারীকে অডিটরের পদে ও বেতনে উন্নীত করিলেন,—যে পদ পূর্ব্বে কেবল য়ুরোপীয় ও য়ুরেসীয় ভিন্ন কেহ অধিকার করিতে পায় নাই। আপত্তির স্বর উঠিয়াছিল, কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের প্রতিবাদে তাহা নিস্তব্ধ হইয়া যায়। সে প্রতিবাদ হরিশের

স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর ও অপগুনায় যুক্তিবিশদ ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। তিনি যাহাই লিখিতেন বা যে লেখাই সংশোধিত করিয়া দিতেন তাহা উক্তবিধ গাম্ভীর্য্য ও বিশদতাগুণে মণ্ডিত হইত। কর্ম্মজীবনে এইরূপে ক্রমোন্নতি ঘটিতে লাগিল কিন্তু হরিশ্চন্দ্র কিছুদিন পরে যে ঝটিকাময় রাজনৈতিক সমুদ্রে তরণী চালনা করিয়াছিলেন তাহার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিবার যে সুযোগ উক্ত উন্নতি দ্বারা উদ্ঘাটিত হইল তাহা কখনও অবহেলা করেন নাই। সে সময়ে এখানকার সুপ্রসিদ্ধ সরকারী উকিল শম্ভুনাথ পণ্ডিত সদর কোর্টের একজন মুহুরী মাত্র ছিলেন। তিনি ভবানীপুরে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার অন্ধকারময় ক্ষুদ্র কক্ষে তাঁহার সদ্গুণে মুগ্ধ ও অবাধে বিতরিত চাটনী-লুব্ধ এক দল যুবক শীঘ্রই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। হরিশ উক্ত দলের নেতা ছিলেন। শম্ভুনাথ বা হরিশ কেহই অনর্থক গল্পগুজবে কালক্ষেপ করিতে ভালবাসিতেন না। উভয়েই কর্ম্মপ্রিয় ছিলেন, এবং তাহার ফলে শীঘ্রই একটি আইন সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই ক্ষুদ্র ঘরটিতে আইন সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ হইত তাহা অতি উচ্চদরের। কোন অপরিচিত ব্যক্তি সহসা সে গৃহে প্রবেশ করিলে তাহা ব্যবহারাজীবদিগের শিক্ষাস্থান বলিয়া ভ্রমে পতিত হইতেন। আইনের বিভিন্ন বিধি ব্যবস্থাদি পরস্পরের প্রতি নবশিক্ষার্থীর উৎসাহ এবং প্রবীণ ব্যবহারাজীবের নিপুণতার সহিত নিক্ষিপ্ত ও প্রতিনিক্ষিপ্ত হইতেছে। তর্ক বিতর্কের স্রোত এরূপ বেগে প্রবাহিত হইতেছে যে অবিশেষজ্ঞের পক্ষে তাহার গতি নিরীক্ষণ করা দুঃসাধ্য, মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া যায়। প্রথম আদালত যে রায় দিয়াছেন আপীল আদালতে তাহা রহিত হইয়াছে, তাহার পর সদর আদালতে তাহার আলোচনা হইয়া পুনর্বিচারের আদেশ হইয়াছে। শম্ভুনাথের বাড়ীতে যে কাল্পনিক আদালত বসিয়াছে তাহাতে সমস্ত মোকদ্দমা আদ্যন্ত আগ্রহের সহিত পুনরালোচিত হইল, উভয় পক্ষেই কৌন্সিলী নিযুক্ত হইয়া যেরূপ উৎসাহের সহিত বাক্-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা প্রকৃত বিচারালয়ের যুদ্ধ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। যে সকল অভিমত প্রকাশিত হইল তাহা সারবত্তা ও মৌলিকতায় সদর আদালতের বিজ্ঞতম বিচারকের অভিমতের সমতুল্য। তাহার পর এক অত্যুগ্র বাদানুবাদ আরম্ভ হইল। অমুক আইনের অমুক বিধান এই মতের অনুকূল, কিন্তু অমুক আইনের অমুক বিশেষ বিধান ইহার প্রতিকূল। উক্ত বিশেষ বিধানের মূল বিশ্লেষিত হইল। উক্ত আইনের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে উদ্ঘাটিত হইল। হরিশ্চন্দ্রের তীক্ষ্ণ প্রতিভা এই সকল সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পথ দেখাইয়া দিতে লাগিল, তাঁহার কণ্ঠস্বর অপর সকলের কণ্ঠস্বর অতিক্রম করিয়া উঠিল। তাঁহার অসাধারণ মানসিক শক্তি তর্কে এবং শেষ মীমাংসায় সকলের উপর আধিপত্য স্থাপন করিল। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় সদর আদালতের উকীল সম্প্রদায় কি অলঙ্কারই হারাইয়াছিলেন! তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবর্গ তাঁহাকে কেরাণীগিরি পরিত্যাগ করিয়া আপনার উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু বিপদের সময় তিনি যে ব্যবসায় আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহা কিছুতেই পরিত্যাগ করিলেন না। লোকে বলে তিনি এই বলিয়া আপনার কার্য্যের ঔচিত্য সমর্থন করিতেন যে অন্য কর্ম্ম অপেক্ষা কেরাণীগিরিতেই দুঃস্থজনকে পরামর্শদান এবং আবেদনাদি লিখিয়া দিবার অধিকতর অবসর হইত। তিনি যে সকল আবেদনপত্র লিখিয়া দিতেন তাহা পাঠ করিয়া দেশের প্রত্যেক অন্যায়কারীর মুখমণ্ডল ভয়ে ও লজ্জায় বিবর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি যে ওকালতীতে প্রতিষ্ঠালাভের উপযুক্ত হইয়াও কেরাণীগিরিতেই আবদ্ধ থাকিয়া আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত কারণ লোকে এ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই। নিজের সদ্গুণ ব্যক্ত করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু তিনি যে মিলিটারি অডিটর জেনারেলের আপিসে চিরকাল আবদ্ধ ছিলেন, সে কেবল তাঁহার কৃতজ্ঞতাগুণের বশে। বন্ধুত্বের বিশ্রম্ভালাপে তিনি একবার মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যে পর্য্যন্ত কর্ণেল চ্যাম্পনিজ (যাঁহার নিকট তিনি এতদূর ঋণী ছিলেন) চলিয়া না যাইবেন সে পর্য্যন্ত তিনি মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কৃতজ্ঞতার খাতিরে তাঁহার পদ কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত তর্ক নিষ্ফল

হইয়াছিল। তাঁহার প্রতিজ্ঞা টলিল না। একবার মাত্র প্রতিজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিয়া কর্ম্মে ইস্তফা দিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত কর্ণেল মহাশয়ের একটিমাত্র স্নেহপূর্ণ বাক্যে উহাতে পুনরায় দৃঢ়তরভাবে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

যে অসাধারণ ব্যক্তির জীবনী আমরা লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার কার্য্যক্ষমতা ও অধ্যবসায় সম্বন্ধে এই ঘটনা হইতেই কিঞ্চিৎ ধারণা করা যাইতে পারে যে, ডাক্তার ডফ্ সাহেবের মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য তিনি ভবানীপুর হইতে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার পর্য্যন্ত পাকা ১০ মাইল পথ পদব্রজে যাতায়াত করিয়াছিলেন। যে জ্ঞানস্পৃহার উত্তেজনায় তিনি সময় ও দূরত্ব তুচ্ছ করিয়া এতদূর ধাবিত হইয়াছিলেন তাহা সাধারণ নহে। আজকালিকার দিনে কয়জন যুবক ইহা অপেক্ষা অধিকতর উত্তেজনার বশে এতদূর পথ চলিতে প্রস্তুত আছেন? কেহ কেহ গাড়ী খুঁজিবেন, কেহ বা সঙ্গী খুঁজিবেন। সকলেই একটা না একটা ওজর করিয়া বসিবেন। কিন্তু হরিশের, কার্য্যশক্তি ইংরাজের মত ছিল। কেরাণীজীবনে একবার বাধ্য হইয়া তাঁহাকে একখানি তিনপায়া টেবিল ও একখানি ভগ্ন চেয়ার লইয়া কাজ করিতে হইয়াছিল। তাহাতে একজন তাঁহাকে তাঁহার অসুবিধার কথা বড় সাহেবকে জানাইতে উপদেশ দিলেন। তিনি তাহাতে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা জাতিগর্ব্বে পরিপূর্ণ বলিয়া লিখিয়া রাখিবার যোগ্য। তিনি তাঁহার ফিরিঙ্গী পরামর্শদাতাকে বলিলেন—বাঙ্গালী জানুর উপর কাগজ রাখিয়া লিখিতে অভ্যস্ত। তেপায়া টেবিল তাহা অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক।

খেদ।

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন]

হ'তেম যদি কৃষক মোরা দেশটা থাকতো ফলে-জলে,
দুধে-ভাতে থাকতুম সুখে খিদের জ্বালা যেত চ'লে।
টাকি-কুড়ির কেরাণীগিরি করতুম না আর চরণ ধরি'
করতুম না আর দাসত্ব গো জীবন আমার ব্যর্থ করি'।
শিখতুম না ছাই লেখাপড়া—যায় ভরে না পেটের ভাত,
থাকতুম ওগো নিরেট মূর্খ—লেখাপড়ার মুণ্ডপাত!
চাষবাসে মোর ঘরের লক্ষ্মী পড়তো বাঁধা আপন ঘরে,
বিদেশী আর ঘরের লক্ষ্মী নিত না হায়! দু'হাত ভ'রে!
কাপাস বুনে' চরকা কেটে' করতুম সবাই সুতোর কাজ,
লজ্জা-ঢাকার বসন হতো—হতো আরো গো পোষাক সাজ।
শিখেছি ছাই লেখাপড়া গো ভিটে বাড়ী বন্ধক দিয়ে;
নিজের পেটের ভাত জুটে না, সংসার চালাই কি আর নিয়ে?
কৃষক হ'লে হতো না দায়—রাখতে ও ছাই বিদ্যের মান,
ভাত-কাপড়ে থাকতুম সুখে, দুঃখের হতো অবসান!

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

বিবাহ-প্রথা।

এস্কিমোদের মধ্যে বর এসে কনের পিতা মাতার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক করে। পিতা মাতা সম্মত হলে শীতকালটা বর শ্বশুরবাড়ীতেই কাটায়। সূর্য্য উঠলে (সে দেশে ছ'মাস দিন আর ছ'মাস রাত) বর কনেকে নিয়ে বরফের কুঁড়েয় চলে যায়! কিছুদিন পরে আবার কনেকে তার বাপ মার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে যেতে হয়। যদি বনিবনাও হয়, তাহ'লে এম্নি করে প্রত্যেক বার গরমের সময় তারা একত্র থাকে আবার পৃথক হয়। সন্তান জন্মিলে আর পৃথক হ'তে হয় না। সে দেশে কনের ১৩।১৪ বৎসর বয়সে প্রায় বিয়ে হয়। কিন্তু ১৯।২০ বৎসরের আগে প্রায়ই তারা রজঃস্বলা হয় না। সাধারণতঃ এক স্বামী এবং এক

স্ত্রী থাকে। তবে বিশেষ কড়াকড়ি কিছু নেই। তাদের দেশের আইন অনুসারে একজন পুরুষ এক সঙ্গে দু'জন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে।

গ্রীনল্যাণ্ডবাসীদের মধ্যে বর কনেরা নিজেদের বিয়ে ঠিক করে। পিতা মাতা প্রায়ই এতে হস্তক্ষেপ করে না। বিয়ের সময় কনে এমন ভাব দেখায় যেন তার সম্মতি নেই। সে দৌড়ে পালায়, চীৎকার করে। তারপর বর তাকে ধরে জোর করে নিয়ে যায়, এই হয়ে গেল তাদের বিয়ে।

উত্তর আমেরিকায় বর কনের পিতা মাতাকে কোন জন্তু শীকার করে এনে উপঢৌকন পাঠায়। তারা জামাতাকে পছন্দ করলে—বর আবার কনেকে কিছু উপঢৌকন পাঠায়। কনে তা গ্রহণ করলে তার সম্মতি জ্ঞাপন করা হল। এই বিয়ে হয়ে গেল। স্ত্রী সকল কাজ করে; স্বামী কেবল শীকার করে বেড়ায়। ক্যানাডাতে এককালে একাধিক পতি বা পত্নী গ্রহণ আইন অনুসারে দণ্ডনীয়।

হাওয়াই দেশে বন্ধুজনের সম্মুখে বর কনে নাসিকা ঘর্ষণ করলেই বিয়ে হয়ে গেল। এদেশের রাজপরিবারে ভ্রাতা ভগ্নীতে বিয়ে হয়। উদ্দেশ্য—যাতে বংশের কৌলিন্য রক্ষা হয়।

পোর্টো রিকোতে বিয়ে করতে গেলে ৬২॥৹ টাকা ফি দাখিল করতে হয়। তাই অনেক সময়ে তারা কোন রকম আচার অনুষ্ঠান না করে স্ত্রী পুরুষ স্বামী-স্ত্রী ভাবে একত্র বাস করে। অভিভাবকের সম্মতি নাহ'লে কিন্তু বিয়ে হওয়া অসম্ভব। কন্যাদের অতি সাবধানে পাহারা দিয়ে রাখা হয়।

কিউবাতে বরের বয়স ২৫ বৎসর না হলে, সে অভিভাবকের বিনানুমতিতে বিয়ে করতে পারে না। কিন্তু বালিকার ১৫ বৎসর বয়স হলেই ফি দাখিল করলে সে পরবনিতা হ'তে পারে।

পুরাতন মেক্সিকোতে কনে লাভ করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। অনেক সময় এমনও হয় যে কনের সম্মতি পেতে ৫ ৬ ৭ বৎসরও কেটে যায়। ততদিন বর বেচারা কনের জানালার নীচে দাঁড়িয়ে শুধু চোখের ঠারে মনের কথা জানাতে পারে—কনের কাছে যেতে পারে না। মধ্য আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কোন বিবাহ-প্রথা নাই।

নরওয়েতে ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম ব্যতিরেকে ২০ বৎসরের চেয়ে কম বয়সের পুরুষ আর ১৮ বৎসরের চেয়ে কম বয়সের নারীর বিয়ে হ'তে পারবে না। বিয়ের আগে বর কনে উভয়কে লিখে জানাতে হবে যে, তাদের উন্মাদ রোগ, মৃগী, কুষ্ঠ বা কোন রকম উপদংশিক রোগ নাই। যদি কোন ডাক্তারের জানা থাকে যে, কোন পক্ষের এই রকম কোন ব্যারাম আছে, তাহ'লে সে কর্ত্তৃপক্ষকে সে কথা জানিয়ে বিবাহ বন্ধ করতে বাধ্য। বর কনেকে লিখে জানাতে হয় যে, এর পূর্ব্বে তাদের বিবাহ হয়েছে কি না; আর সে বিয়ের কোন সন্তান সন্ততি আছে কি না। বিয়ের পর যদি কোন গুপ্ত রোগ প্রকাশ পায়, অথবা যদি স্বামী বা স্ত্রীর কোন রকম দুরারোগ্য ব্যারাম হয়, তাহ'লে বিয়ে ভেঙ্গে যেতে পারে। —সহচর, ১৩২৮।

গ্রন্থ সমালোচনা।

শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্বদর্পণ—ভগবদ্ভক্ত কবিভূষণ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় প্রণীত "শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্বদর্পণ" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। পুস্তকখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত ভাবে সরল ভাষায় ভাগবদ্ধর্ম্মের সকল তত্ত্বই ইহাতে সুসন্নিবিষ্ট। অপিতু, প্রত্যেক তত্ত্বপ্রসঙ্গই কবিরাজ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও ভক্তিপ্রবণতার পরিচায়ক। ব্রহ্মতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব, কর্ম্মতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব—সকল তত্ত্বেরই স্বরূপতা ইহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এবং ঐ সকল তত্ত্বের ব্যাখ্যায় মানবের ঐহিক পারত্রিক অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। মায়া-বিজৃম্ভিত সংসারের নিবিড় মোহান্ধকারে যাঁহারা অন্ধীভূত ও অনুতপ্ত, তাঁহাদের পক্ষে এই দর্পণপ্রতিভা, দর্পণ প্রতিফলিত উজ্জ্বল আলোকের ন্যায় শান্তিলাভের পথপ্রদর্শক। আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান কল্পে এইরূপ পুস্তকের যতই প্রচার হইবে, ততই দেশের মঙ্গল।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১৯শ ভাগ] আশ্বিন, ১৩২৯। [৮ম সংখ্যা

এযার কবি।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

অক্ষয়কুমার বড়াল যদি এষা-কাব্য না লিখিতেন, তাঁহার কবি-জীবন যদি "প্রদীপ" নামক গীতি-কাব্য লিখিবার পর শেষ হইত, তাহা হইলেও তিনি বঙ্গভাষার কাব্য-সংসারে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সম্পূর্ণ প্রতীচ্য-ভাবাপন্ন বঙ্গদেশে যদি কোনও কবি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া কাব্য-জগতে কল্পনার বিকাশ দেখাইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি বড়াল কবি ছাড়া অপর কেহ নহেন। অক্ষয়কুমারের কাব্যগ্রন্থগুলি পাঠ করিলে সুখে দুঃখে ভরা গৃহস্থ বাঙ্গালীর জীবনের ছবি মনে পড়ে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব এখানে বহির্বাটী অতিক্রম করিয়া হিন্দুর পবিত্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। অবগুণ্ঠনবতী রমণীগণ যেখানে গৃহদেবতার পূজারতি লইয়া দিন রাত ব্যস্ত, তাহার ত্রিসীমানায় পৌছিবার পূর্ব্বেই অবাধ প্রেমের গতি আপনা হইতে রুদ্ধ হইয়া যায়। অক্ষয়কুমারের প্রথম বয়সের রচনাতেও সেইজন্য আমরা যৌবনের অসংযত বাসনার উদ্দামতা অনুভব করি না। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কবির প্রতিভা শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল তাহার চারিধারে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষণনীতির সুদৃঢ় প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছিল। নব্যতন্ত্রের কালাপাহাড় যখন বাঙ্গালীর ধর্ম্ম ও সমাজের উপর খড়্গাঘাত করিতেছে, কবি ও নভেল লেখকেরা যে সময়ে সমাজ সংস্কারের নামে সাহিত্যের ভাঁজে ভাঁজে কুৎসিত ব্যভিচারের লীলারহস্য বুনিয়া দিতেছে, অক্ষয়কুমারের প্রাচীর-বেষ্টিত ধর্ম্মমত তাঁহাকে মানসিক বিকারের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। স্বদেশহিতৈষিতা—পেট্রিয়টিজম্—যখন অন্তরে বক্তৃতা দান ও অসংখ্য ইংরাজি ও বাংলা প্রবন্ধ লিখিয়া দেশের সর্ব্বত্র ক্রন্দন ও আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছিল, আর কবিতার পর কবিতা লিখিয়া, গানের পর গান গাইয়া বাঙ্গালী বালকবীরদিগকে উত্তেজিত করিতেছিল, অক্ষয়কুমারের হিন্দুসমাজ তখনও কুম্ভকর্ণের ন্যায় ঘুমাইতেছে। বড়াল কবির গীতি কাব্যে আমরা সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের বাংলা সুরে বাঁধা বা দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাতি সুরসম্বলিত স্বদেশ সঙ্গীতের মত কিছুই শুনিতে পাই না। বঙ্গদেশের হিন্দু সমাজরূপ কুম্ভকর্ণের উপর নব্যবঙ্গ অসংখ্য বিদ্রূপ-বাণ হানিয়াছে, কিন্তু তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। কুম্ভকর্ণের

অকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে যে বাঙ্গালী সমাজ, বিশেষতঃ সভ্যশৌর্য্যের পক্ষপাতী দলের সমূহ বিপদ, তাহা আমরা এক্ষণে হাড়ে-হাড়ে বুঝিতে পারিতেছি। নির্য্যাতন ও কারাবাস হইতে দূরে সঙ্কীর্ণ গৃহের অন্ধকার কোণে অবস্থান করিয়া বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজ কোনও রূপে যখন দিন কাটাইয়া দিতেছিল, অক্ষয়কুমার সেই সময়ে তাঁহার "প্রদীপের" আলোয় মানব-জীবনের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে-ছিলেন।

অক্ষয়কুমারের এক জন সমালোচক (স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি) বলিয়াছেন যে, তাঁহার "কবিতায় Human interest—'মানবিকতা' আছে।" একথা খুব সত্য, কিন্তু বড়াল কবির মানবিকতার অবলম্বন গৃহস্থ বাঙ্গালীর জীবন-সংগ্রাম রূপ ব্রত। গৃহস্থ বাঙ্গালী বলিলে আমরা সাধারণতঃ ভদ্রপরিবারভুক্ত কেরাণী শ্রেণীর নিরীহ বাঙ্গালী বুঝি। কেরাণীর জীবনে কি কবিত্ব সম্ভবপর? এই প্রশ্ন যাহার মনে উদয় হইতে পারে সে কখনও মানব-জীবনের রহস্য উন্মোচন করিবার চেষ্টা করে নাই। য়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি দান্তে কেরাণী ছিলেন। অক্ষয়-কুমারের এবার সহিত বোধ হয় সেইজন্য দান্তের বিয়েট্রি-সের সামান্য সাদৃশ্য আছে। অক্ষয়কুমার তাঁহার কবি-জীবনের সর্ব্বশেষ গানটি রচনা করিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই গার্হস্থ্য প্রেমের সুমধুর নেশায় ভরপুর হইয়াছিলেন। অক্ষয়কুমারের প্রদীপ-কাব্যে যে কয়টি প্রেমের কবিতা স্থান পাইয়াছে, সেগুলি যে তাঁহার জীবনের সঙ্গিনী ছাড়া অপর কোনও রমণীর উদ্দেশে রচিত, ইহা আদৌ মনে হয় না। অক্ষয়কুমারকে প্রেমিকার অনুসন্ধানে অভিসারে বাহির হইতে হয় নাই। 'অভেদে প্রভেদ' নামক কবিতায় অক্ষয়কুমার নারীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"এ জগতে সুখে দুখে, ফুল্ল বা বিষণ্ণ মুখে,
পাশাপাশি আছি দোঁহে দাঁড়ায়ে সংসারে;
দারিদ্র্যে বা অভিমানে, দু'জনায় জ্বলি প্রাণে;
এক শোকে তাপে দোঁহে কাঁদি হাহাকারে।"

তরঙ্গহীন সুগভীর পারিবারিক প্রেমের খাতিরে কত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী যে হৃদয়ের সমুদয় পাপড়িগুলি দলিয়া দিয়া ইহ জগতে মানব-জীবনের সার্থকতা সপ্রমাণ করিয়াছেন, তাহা কে ভাবিয়া দেখিয়াছে? পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন ও পোষ্যবর্গের সুখের জন্য যাহারা নীরবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া অকালে জীবনলীলা সাঙ্গ করে, তাহাদের বুকের ভিতরের অন্তরতম স্থান স্বর্গীয় প্রেমের কি যে এক অপূর্ব্ব সৌরভে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে তাহার মর্ম্ম হৃদয়ের দ্বারাই অনুভব করা যায়—বাক্য দ্বারা বুঝান যায় না। হিন্দুর শাস্ত্র বোধ হয় সেইজন্য বলিয়াছেন,—"চতুর্ণামাশ্রমাণাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমাশ্রমম্।" মানব-জীবনের পরিপূর্ণতা এই গার্হস্থ্য আশ্রমেই লাভ করা যায়। মানুষের প্রথম জীবনের কত ভুল বাস্তব জগতের দ্বারে আসিয়া স্বপ্নের মত ঝরিয়া পড়ে!

"বিষম জীবিকা-রণ
যুঝে' যুঝে' অনুক্ষণ,
—হা বিধি-লিখন!
ঘুচে' গেল সে মত্ততা,
সে সুখ-কল্পনা-কথা,
সে দূর-স্বপন!
আর সে কৈশোর স্মৃতি
নাহি ফুটে নিতি নিতি
কবিতা সুবাসে;
আর সে যৌবন-রাগে
শত প্রাণ নাহি জাগে
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে!"

(জীবন-সংগ্রাম)

অক্ষয়কুমার যদি সৌখিন সম্প্রদায়ের কোনও কেশ ও বেশ বিন্যাসপ্রিয় ধনীর গৃহে বিলাসিতার মধ্যে তাঁহার শৈশব ও যৌবন অতিবাহিত করিতেন তাহা হইলে তিনি স্বপ্ন-রাজ্যের কাব্য-কুঞ্জে কেবল কূজন-গুঞ্জন লইয়া দীর্ঘ-কাল কাটাইয়া দিতেন, তাঁহার চারিপার্শ্বে বাঙ্গালী-জগতের যে দুঃখ দারিদ্র্য জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিবার তাঁহার অবসর হইত না। জীবন-সংগ্রামের পথে কবির হৃদয়ের অন্তঃপুর নিদারুণ হাহাকার শব্দে ভরিয়া উঠিয়াছে।

"কোথা শত চিত্রে ভরা,
নিত্য-নব আশে গড়া
দূর ভবিষ্যৎ—
ফুল ফুটে, জ্যোৎস্না লুটে,
নূপুর গুঞ্জরি' উঠে
কুঞ্জবন-পথ!"—(জীবন-সংগ্রাম)

বুক-ভাঙ্গা দলিত আশার কি সুন্দর স্মৃতি-চিত্র! অথচ, কেমন স্বাভাবিক! মানুষ দৈনন্দিন জীবনে অনবরত তাসের বাড়ী গড়িতেছে ও ভাঙ্গিতেছে। আকাশ-কুসুম রচনা করিতে মানুষ, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থ বাঙ্গালী যেমন পটু, আবার কথায় কথায় নৈরাশ্যের অশ্রু বর্ষণে তেমনি অভ্যস্ত। অবসাদময় বাঙ্গালীর জীবনে সেইজন্য এত নিরুৎসাহের আধিক্য। পারিবারিক প্রেমের পর্ণকুটীরখানিকে স্বার্থপর স্ফূর্ত্তির স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া ধর্ম্মভীরু গৃহস্থ বাঙ্গালী যে কমলবিলাসে ডুবিতে চাহে না। তাই তাহার জীবনে এত কষ্ট, এত দুঃখ; নৈরাশ্যের দংষ্ট্রাঘাতে তাই তাহার অন্তর বাহির জর্জ্জরিত। অক্ষয়কুমার মানব-জীবনের এই অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিয়াছেন।

"গত দিন স্মরি' মনে,
কেন আর রণাঙ্গনে
আলস্য-লুণ্ঠন!
অনিবার্য্য এ সংগ্রাম—
যুঝি তবে অবিশ্রাম
করি' প্রাণপণ।"—(ঐ)

অক্ষয়কুমারের কবিতা পাঠ করিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কবির চিন্তাশীলতার পশ্চাতে কল্পনা ছুটিয়া গিয়া কাব্যাকারে তাঁহার মনের সুচিন্তিত ভাবটিকে পরিস্ফুট করে। বড়াল কবি কল্পনাকে অনুসরণ করিয়া ভাব সংগ্রহ করেন না। অক্ষয়কুমার বাস্তবিক পাঠককে দার্শনিকের ন্যায়, বন্ধুর ন্যায় উপদেশ দেন। তাঁহার কাব্যে সেইজন্য অতিরঞ্জন বা অস্বাভাবিকতা দোষ লক্ষিত হয় না। সংযত ভাষায়, সরলভাবে কবি আমাদিগকে যাহা বলেন, তাহা আদৌ হেঁয়ালির মত দুর্ব্বোধ নহে। কল্পনাসর্ব্বস্ব বাকপটু কবি হয়ত অক্ষয়কুমারের অবস্থায় পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেক ছিন্ন শিরামুখে বিগলিত রক্তধারার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হা হুতাশের ঝড় সৃষ্টি করিতেন, অদৃষ্টের নিন্দা করিয়া মানুষের ক্ষুদ্রত্ব প্রমাণে সচেষ্ট হইতেন, আর শেষে 'যা হবার তাই হবে' এই অলস-নীতি স্মরণ করিয়া মনকে অসাড় করিয়া তুলিতেন। অক্ষয়কুমারের কাব্যে নাকি সুরে কান্না বা জ্যাঠামি নাই, কিন্তু তাই বলিয়া কবির অন্তরে যে অনুভূতির অভাব আছে, তা'র প্রমাণ তাঁহার কোনও রচনায় পাওয়া যায় না। যে কবির হৃদয় সহানুভূতি ও সমবেদনায় পরিপূর্ণ তাঁহার কাব্যে মানব-হৃদয়ের অনেক লুকান কথা আপনা হইতে ব্যক্ত হইয়া পড়ে। "দুর্ব্বহ জীবন" নামক কবিতায় অক্ষয়কুমার মানব-জীবনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে সেইজন্য গৃহস্থ বাঙ্গালীর হৃদয়ের ভাবগুলি সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। কিছুতেই শান্তি নাই, সুখ নাই, তৃপ্তি নাই, "আশা যেন অলীক বচন।" অসাড় হৃদয়ের এই অবস্থায় মানব-জীবন যথার্থই দুর্ব্বহ নহে কি?

"পড়ে' আছি স্তিমিত নয়ন।
নাহি শোক, নাহি তাপ,　　নাহি পাপ, পরিতাপ,
নাহি দুঃখ, রোগের তাড়ন;
নাহি অভাবের জ্বালা,　　সংসারের ঝালা-পালা,
দারিদ্র্যের বৃশ্চিক দংশন।
সুখের অভাব নাই,　　তবু সুখ নাহি পাই—
সুখে এ কি অসুখ-দহন!
কি দুর্ব্বহ আমার জীবন!

সুখে এ কি অসুখ-দহন!
জননীর স্নেহরাশি,　　প্রেয়সীর প্রেম-হাসি,
সুহৃদের রস-আলাপন,
জনকের আশীর্ব্বাদ,　　কোলে শিশু মায়া-ফাঁদ,
সোদরের ভক্তি-সম্ভাষণ—
তবুও সুখের তরে,　　কেন প্রাণ হা-হা করে?
কার শাপে হৃদি অচেতন!
সুখে এ কি অসুখ দহন!"
—(দুর্ব্বহ জীবন)

ইহা শুধু কবির আত্মকথা নহে। কেবল পরিবার বা সম্প্রদায়বিশেষের ছবিও ইহা নহে। মানব-হৃদয়ের চিরন্তন অশান্তি, অসুখ, অতৃপ্তি, অভাব, এই দুর্ব্বহ জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। অক্ষয়কুমার দার্শনিকের ন্যায় মানব-হৃদয়ের এই অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন।

"কার শাপে হৃদি অচেতন!
জীবনে নাহিক দীপ্তি, হৃদয়ে নাহিক তৃপ্তি,
কুয়াসায় ঘেরা প্রাণ-মন!
কামনার নাহি স্ফূর্ত্তি, দুঃখের নাহিক মূর্ত্তি,
মর্ম্মে মর্ম্মে তবু জ্বালাতন!
গড়ি' দুঃখ নিজ হাতে, যুঝি যেন তার সাথে—
নিজ মৃত্যু করিতে সাধন!
কি দুর্ব্বহ আমার জীবন!"—(ঐ)

অক্ষয়কুমারের মতে মানুষ নিজেই নানা দুঃখ ও অভাব সৃষ্টি করিয়া মরণকে টানিয়া আনে। এই মরণ এত ধীরে ধীরে আসে যে, আমরা ইহার সান্নিধ্য অনুভব করিতে পারি না। এ মরণ ত দেহকে কষ্ট দেয় না, ইহা যে মানসিক সুখ শান্তির শত্রু। কবি আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই পলে পলে মরণের হাত হইতে কি রক্ষা নাই?

"ভেঙ্গে' দেয় কে এ দুঃস্বপন?
এ কি রোগ, কোথা মূল? এ কি জন্মান্তর-ভুল!
এ পাপের নাহি প্রশমন?
শুষ্ক পত্র ঝটিকায়, স্রোতে কাষ্ঠখণ্ড-প্রায়,
এ জীবন কেন বিড়ম্বন!
কেন হ'য়ে লক্ষ্য-হারা, ছিন্ন—ধূমকেতু পারা,
নিরুদ্দেশে করি পর্য্যটন!
ভেঙ্গে' দেয় কে এ দুঃস্বপন?"—(ঐ)

অক্ষয়কুমারের কাব্যে আমরা আত্মানুসন্ধানের যে পরিচয় পাই, তাহা যথার্থই শিক্ষাপ্রদ। মানুষ যদি এইরূপে চিন্তা করিতে শিখে, তাহা হইলে সে সুখ'ও শান্তির পথ নিশ্চয়ই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে। আত্মানুসন্ধানের পথে একটি কথা কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। ভগবানের কৃপা ভিক্ষা না করিলে মানুষ ঠিক রাস্তায় আসিয়া পৌছিতে পারে না। বিদ্যা বুদ্ধি, যুক্তি তর্ক, কল্পনা শক্তি ও প্রতিভার উপর নির্ভর করিয়া যে কবি মানব-জীবনের রহস্য দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন তিনি গোলকধাঁধাঁর আশে পাশে সজ্জিত অকিঞ্চিতকর জিনিষের চটক দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। অক্ষয়কুমার কাতরকণ্ঠে জীবনের জীবন চিত্ত-বিহারী নারায়ণকে ডাকিয়া বলিয়াছেন—

"কোথা তুমি জীবন-জীবন!
আত্মদ্রোহী আত্মঘাতী ডাকে— ভূমে জানু পাতি',
কর তারে কৃপা বিতরণ!
বল তারে বল এসে;— কোন্ পথে চ'লবে সে,
কি উদ্দেশ্য করিবে সাধন?
অকারণে দেহ-ভার পারে না বহিতে আর—
সহিতে এ অবস্থা-পীড়ন।
কোথা তুমি জীবন-জীবন!"—(ঐ)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজি শিক্ষা বাঙ্গালীর অন্তর্জগতে যে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, অক্ষয়কুমারের কবি হৃদয় তাহাতে বিচলিত হয় নাই। সনাতন হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসহীনতার ফলে পরিবর্ত্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে তিনি যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার আস্থা কমিয়া যায় নাই। দ্বৈতবাদী, সাকার দেবতার উপাসক অক্ষয়কুমার ঘাটে বসিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া লক্ষ্যহীন জাতীয়-জীবনের তরল গতি অনুসরণ করিতেছে দেখিয়া যথার্থই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। কবি অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনের উৎসের নিকট পৌছিতে পারিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ তিনি "দুর্ব্বহ জীবন" নামক কবিতার শেষ শ্লোকের ছাঁচে নিপুণ শিল্পির ন্যায় ঢালিয়া দিয়াছেন।

"কোথা তুমি জীবন-জীবন!
দাও, দেব, কর্ম্মে শক্তি; দাও, দেব, লক্ষ্যে ভক্তি;
দাও, সুখ-দুঃখ-আবর্ত্তন!
সাধি হে জীবের কর্ম্ম, পালি হে জীবের ধর্ম্ম.
সহি নিত্য উত্থান-পতন!

কর এই আশীর্ব্বাদ,— অবসাদে পেয়ে সাধ
তব সাধ করি সমাপন!
হে চিত্ত-বিহারী নারায়ণ!"

বৈষ্ণব কবির ন্যায় অক্ষয়কুমার বুঝিয়াছিলেন যে, এই কর্ম্মময় জগতে 'সুখ দুখ দুটি ভাই' মানুষের সাথী হইয়া তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করে। অক্ষয়কুমারের "প্রদীপের" আলো গৃহস্থ বাঙ্গালীর জীবন-যাত্রার পথে প্রধান সহায় বটে, কিন্তু শুধু এই কারণে "প্রদীপ" বঙ্গ-ভাষার কাব্য-জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে না। মানব-জীবনের বিবিধ গূঢ় রহস্য ইহার প্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া সার্ব্বজনিক কাব্য-মন্দিরেও "প্রদীপের" স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। অক্ষয়কুমার যদিও সংসারাশ্রমের কবি কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তাঁহার কাব্য পাঠ করিতে করিতে আমরা মায়াজালে ঘেরা পারিবারিক সঙ্কীর্ণতার বাহিরে উন্মুক্ত বায়ুর মধ্যে আসিয়া পড়ি। মানুষ যখন মায়ার কার্য্যগুলিকে বাছিয়া বাহির করিতে পারে তখন তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে কুয়াসার অস্পষ্টতা আপনা হইতে সরিয়া যায়। সংসারাশ্রম তখন আনন্দের নিকেতন বলিয়া মনে হয়। ভাবুক কবি অক্ষয়কুমার সংসারীকে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপায় বলিয়া দিয়াছেন। সংসারে থাকিয়াও যে ভূমানন্দ লাভ করা যায়, ইহা তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রদীপের কবি আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা ও বৈরাগ্যের আদৌ পক্ষপাতী নহেন। ভাবের জগতে আমরা তাঁহাকে আত্মহারা হইতে দেখি না। "হৃদয়-সংগ্রাম" নামক ক্ষুদ্র কবিতায় অক্ষয়কুমার যে ভাবে মায়ার মায়া কাটাইয়া, অথচ ভাবের ঘূর্ণিপাকে কবির বাহন কল্পনাকে ডুবিতে না দিয়া, প্রিয়জন রূপ শত্রু সেনার হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছেন, তদ্বিষয় ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রিয়জনের সহিত হৃদয়ের সংগ্রাম চিরকাল চলিবে। এই অবিরাম রণে পরাজয় হইলেও সুখ। "ক্ষত হৃদি, তবু কি আরাম!"

অক্ষয়কুমার কল্পনার সাহায্যে পৃথিবীতে পরীর রাজ্য সৃষ্টি করিয়া মানব-জীবনের রহস্য সোণার কাটির স্পর্শে উদ্ঘাটন করেন নাই। বাস্তব জগতে মানুষের জীবনলীলার অভিনয় দেখিয়া কবি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, ভাবুকতার স্পর্শমণি তাহাকে কবিত্বময় রচনায় পরিণত করিয়াছে মাত্র। অক্ষয়কুমারের প্রতিভা চঞ্চল প্রজাপতির ন্যায় বাহ্য জগতের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ফুলরেণু মাখিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই, উদ্যমশীল মক্ষিকার ন্যায় অভিজ্ঞতার মধুচক্রে অমৃত সঞ্চয় করিয়াছে। অক্ষয়কুমার বাস্তবিক সমসাময়িক বাঙ্গালী সমাজের পাঠশালায় মানব-জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। চারিদিকের কোলাহল ও আড়ম্বরের মধ্যে তিনি ধীরভাবে জাতীয়-জীবনের যথার্থ অবস্থা চিকিৎসকের ন্যায় সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বুঝিয়া লইয়াছিলেন।

"তোমারি প্রদত্ত জ্ঞান—হের, জ্ঞানময়,
লুপ্ত অহঙ্কারে!
ভক্তি বাচালতাময়, সুখ-শান্তি স্বার্থে লয়,
স্নেহ-প্রীতি মৃত-প্রায় অবিশ্বাস-ভারে!"
—(কোথা তুমি)

বাঙ্গালী-জগতের ত এই অবস্থা! অক্ষয়কুমার বাঙ্গালী-জগতকে বৃহত্তম মানব-জগতের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছেন। সেখানেও জীবের এই অবস্থা, তাই তাঁহার কবি-হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়া কারণের অজ্ঞাত দেশে বিধাতাকে ডাকিয়া বলিয়াছে,—

"জগতের দুঃখ, নাথ, যত তুচ্ছ ভাব,
তত তুচ্ছ নয়!
কে জানে প্রলয়ে কবে এ বিশ্ব বিলীন হবে—
সহিতেছি নিত্য ভবে সে দুর-প্রলয়!

* * * *

পারি না বহিতে আর দুঃখের পসরা,
সুপ্রসন্ন হও!
জীবনে আশ্বাস দিয়া, মরণে বিশ্বাস দিয়া,
যেমন গড়িয়াছিলে, পুনঃ গড়ে' লও!"—(ঐ)

বাস্তবিক, পৃথিবীর সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ কবির নিজের দেশে দুঃখ দারিদ্র্য এত বেশী যে, অক্ষয়কুমারের সহিত আমাদেরও হতাশ হৃদয়ে বলিতে ইচ্ছা হয়,—

"আয় রে দারিদ্র্য, দুঃখ,
নিরন্ন উলঙ্গ রুক্ষ—
নিত্য অপমান!
দূরে যাক্ মানবতা—
কল্পনা-কবিত্ব কথা,
লজ্জা, অভিমান!"
—(জীবন-সংগ্রাম)

অক্ষয়কুমার বাঙ্গালী সমাজে একদিকে হৃদয়হীন ভোগীর চিত্র ও অপর দিকে দেশ-জোড়া দুঃখ দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব দেখিয়া যেন মরিয়া হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় যে, অক্ষয়কুমারের বাস্তব জগত, বিশেষতঃ বাঙ্গালী-জগত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা শুধু কথার কথা নহে। অক্ষয়কুমারের অনেক কবিতায় কবির আত্মকথার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

"অবস্থার শিখরে উঠিয়া,
অবস্থার গহ্বরে লুটিয়া,
বুঝিয়াছি আমি যাহা, তর্কে কি বুঝাব তাহা?
প্রকৃতির জড়পিণ্ড তুমি—
বুঝাইব কেমনে তোমারে?
জীবন নহে ত সমভূমি—
দেখিয়া লইবে একেবারে।"
—(তর্কে)

অক্ষয়কুমারের "প্রদীপের" আলোয় আমরা বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনের আর একটা দিক দেখিতে পাই। যে অক্ষয়কুমার মানব-জীবনের চিত্র দুঃখবাদের পটে অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই অক্ষয়কুমার আবার "কত-না অস্পষ্ট লিখা, কত ছত্র অর্থ-হীন, ব্যর্থ হাহাকার" তাঁহার কাব্যের স্থানে স্থানে গুছাইয়া রাখিয়াছেন! কিশোর কবি যুগের প্রভাব উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তবে, অক্ষয়কুমারের দুঃখবাদে যেমন আশা ও সান্ত্বনার একটা প্রলেপ আছে, তাঁহার স্বপ্নময় রচনায় সেইরূপ গাম্ভীর্য্য ও শীলতার একটি সুস্পষ্ট ভাব প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, অক্ষয়কুমারের কল্পনা সংযম মানিয়া চলাতে কবি-হৃদয়ের ভাবটুকু তাঁহার কাব্যে পরিস্ফুট হয় নাই। এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না, কারণ আধ্যাত্মিকতা যে কবিতার প্রাণ সে কবিতায় সংযম রাখিতে গেলে যে কবি-হৃদয়ের ভাব পরিস্ফুট হয় না, এরূপ সংস্কার সম্পূর্ণ ভুল বলিয়া মনে হয়। অল্পভাষী কবি অক্ষয়কুমার সাধনার ফলে পুনরুক্তি ও ভাববিস্তৃতি দোষ হইতে তাঁহার 'শিল্পকলাকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। অক্ষয়কুমারের কাব্যে সেইজন্য নাটকীয় ঘটনা, উক্তি প্রত্যুক্তি ও উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের অর্থহীন বাক্যের অভাব দেখা যায়। অনন্তরহস্যময়ী প্রকৃতি দেবী যখন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া কবির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, তখনও অক্ষয়কুমারের হৃদয় আহ্লাদে আটখানা হইয়া বাক্‌কৌশিক্ত অভিনয়ন করে নাই। শুকতারার মত রজনীর শেষভাগে নিভৃতে বসিয়া কবি ঘুমন্ত প্রকৃতির দিকে একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে বিশ্বের অন্তরাত্মার অনুসন্ধান পাইয়াছেন। তিনি ইহাতে যে রহস্যানন্দ উপভোগ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। সে আনন্দে উচ্ছ্বাস নাই, প্লাবন নাই; তাহাতে আছে কেবল অতলস্পর্শী গম্ভীরতা ও অপরিমেয় শান্তি। অক্ষয়কুমারের কবিতার ভাব, ভাষা ও ছন্দ সেই কারণে গাম্ভীর্য্যের মিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। অক্ষয়কুমারের কাব্যে আমরা ফিলম্ হইতে পর্দ্দার উপর প্রক্ষিপ্ত সচল আলোক-চিত্রের অভিনয় দেখিতে পাই না। অক্ষয়কুমারের চিত্রগুলি মর্ম্মর প্রস্তরে অনুদিত মূর্ত্তিময়ী ভাবের অভিব্যক্তি। কবির কাব্যে আমরা সুনিপুণ ভাস্করের শিল্প-চাতুর্য্যের যতটা পরিচয় পাই, নাটকীয় শিল্পকলার ততটা পরিচয় পাই না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতিদেবী জীবন্ত প্রতিমার ন্যায় কবির সহিত কথা কহিতেছেন। অক্ষয়কুমারের কাব্যে তিনি নেপথ্যে অবস্থান করিয়া "শব্দশূন্য ভাষায়" তাঁহার বাণী শুনাইতেছেন। অক্ষয়কুমার যদি সুখবাদের কবি হইতেন, তাঁহার সমসাময়িক হিন্দুসমাজে যদি প্রতীচ্য ধরণের স্বাধীনতা প্রবেশ লাভ করিত, তাহা হইলে তাঁহার কাব্যভবন বাচালতার রঙ্গমঞ্চে পরিণত হইত। অবস্থার পীড়নে মুমূর্ষু প্রায় গৃহস্থ বাঙ্গালীর বাটীতে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ

ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করে, ইন্দ্রিয়কে অভিভূত করিয়া ফেলে না। কবি যখনই বাটীর বাহিরে আসিয়াছেন, তখনই তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আমোদ আহ্লাদের আস্বাদ পাইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে বা লোকারণ্যের মাঝে অক্ষয়কুমার অধিকক্ষণ কখনও অবস্থান করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বাটীর বাহিরে যাহা তিনি দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, অনুভব করিয়াছেন, গৃহে ফিরিয়া আসিয়া নিজের কক্ষে নির্জ্জনে বসিয়া তৎসম্বন্ধে তিনি মনে মনে আলোচনা করিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের কাব্য পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে কবি দিবসের অভিজ্ঞতা গভীর রাত্রে প্রদীপের আলোয় বিশ্লেষণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ঊষালোকে, রৌদ্রে, প্রদোষে, চন্দ্রাতপে প্রকৃতির দিগন্তব্যাপী প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে বসিয়া তাঁহার মানস-সুন্দরীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে সেইজন্য আমরা দীপশিখা হইতে উত্থিত তৈলের বাস আঘ্রাণ করি না। অক্ষয়কুমারের কাব্য যদিও প্রদীপের আলোয় সমুজ্জ্বল, তাঁহার দীপাধার কিন্তু তৈলের পরিবর্ত্তে দেবার্চ্চনার উপযোগী পবিত্র ঘৃতে পরিপূর্ণ। অক্ষয়কুমারের কাব্যে সেইজন্য আমরা যদিও বর্ণ-সৌন্দর্য্যের আভাস পাই না, আলো-ছায়ার সমাবেশ দেখি না, ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ করি না, সঙ্গীতের শব্দে মুগ্ধ হই না, কিন্তু এই সকল ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর অতীত এমন একটি জিনিষের অস্তিত্ব অনুভব করি যদ্দ্বারা আমাদের অন্তর বাহির প্রেমানন্দে রসিয়া উঠে। অক্ষয়কুমার শুধু কবি নহেন, তিনি সাধক ও ভক্ত। অক্ষয়কুমারের অন্তর প্রেমময়ীর প্রেমে ওতপ্রোত। বাহ্য জগতের যাহা কিছু সেখানে ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া পশিয়াছে তাহা কবির হৃদয়ের প্রেমে মিলায়ে মিশায়ে গিয়াছে। এ জগতে ক্ষুদ্র নগণ্য উপেক্ষণীয় কিছুই নাই। আমরা যাহাকে অবজ্ঞার সহিত দেখি, মন্দ বলিয়া পরিত্যাগ করি, ভাবুক কবি অক্ষয়কুমারের চক্ষে তাহার মূল্য অনেক বেশী। "নরকে জন্মিল স্বর্গ, পুণ্য—পাপে তাপে।" জড় জগতের প্রত্যেক "অণু-পরমাণু-স্তরে, ব্রহ্মাণ্ড চাতুরী।" কবি প্রেমকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন,—হে পিরীতি, সমুরতি কর অধিষ্ঠান। লহ অর্ঘ্য, রাখ নর-মান।" "ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয় নর।"

"কিছু তুচ্ছ নাহি তার,
সে যে দেব অবতার—
কল্পনায় কুতূহলী,
দর্শনে বিজ্ঞানে বলী,
অদৃষ্টের নিয়ামক, সৃষ্টি-সংস্কারী,
বিশ্ব-প্রভু, গদা-পদ্ম-ধারী।"—(আবাহন)

অক্ষয়কুমারের প্রেমে যে কতটা উদারতা আছে তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকে কবির মত প্রেমিক হইতে হয়। নর-নারায়ণের যে যুগল মূর্ত্তি তিনি আঁকিয়াছেন তাহা হিন্দু কবির পক্ষেই সম্ভবপর। অক্ষয়কুমারের ভাবুকতা তত্ত্বজ্ঞানকে যে ভাবে আয়ত্ত করিয়াছে তাহার তুলনা অপর কোনও কবির রচনায় পাওয়া যায় না। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে প্রেমের যে বাঁধন আছে তাহা কবি-কল্পিত নহে।

"বিনা মন্দাকিনী-তীর
কোথা খেলা অমরীর?
বিনা মাধবের বুক
কোথা রাধিকার সুখ?
কর্ম্ম বিনা কারণের কোথায় আশ্রয়?
মর্ত্ত্য বিনা স্বর্গ-বিপর্য্যয়।"—(ঐ)

কবি আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন। দ্বৈতাদ্বৈত ও তন্ত্রের সারতত্ত্ব মন্থন করিয়া প্রেমের আকর্ষণী শক্তি ও উপযুক্ত আসন সম্বন্ধে কবিত্বময় শ্লোক রচনা করিয়া অক্ষয়কুমার হিন্দু কবির কৃতিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন।

"অয়স্কান্ত মণি 'পর
কেন্দ্রীভূত রবিকর;
শঙ্করের জটাপাকে,
ভাগীরথী বাঁধা থাকে;
প্রকৃতির অবিকৃতি পুরুষ-হিয়ায়;
কালিকা আগমে বিহরায়।"—(ঐ)

অক্ষয়কুমার কবিতার ভিতর দিয়া শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই, হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার অভিমতও প্রকাশ

করেন নাই। প্রেমিক কবি হৃদয়ের আবেগে "মধুরতি পিরীতিকে" 'আবাহন' সঙ্গীতে কবি-হৃদয়ের অর্ঘ্য দান করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞান রূপ যে অমূল্য নিধি দান করিয়াছিলেন, কবির হৃদয়ের প্রেম সেই জ্ঞান হইতে এই মনোহর অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়াছে। প্রেম বিনা মানুষের বিদ্যা বুদ্ধি, জ্ঞান ধনাধ্যক্ষতা, এ সকলি যে বৃথায়! প্রেম বিনা "বৃথা যুগ-বিবর্ত্তন, মিছা কুরুক্ষেত্র রণ; সভ্যতার এত শ্রম বৃথায়—বৃথায়!" কবি "প্রেম-রাণী"কে সম্বোধন করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিয়াছেন,—

"উর, দেবী, রাখ সৃষ্টি,
কর প্রেম-সুধা বৃষ্টি!
ধুয়ে যাক্—মুছে' যাক্
অদৃষ্টের দুর্ব্বিপাক—
অচল অটল সেই দুর্ভেদ্য আঁধার—
প্রকৃতির প্রথম বিকার!"—(আবাহন)

মানব-জগতে প্রেমের অভাব যত অমঙ্গলের কারণ, যত পাপের, অত্যাচারের, কষ্টের হেতু। কবি সেইজন্য মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় আবার বলিয়াছেন,—

"উর শত সূর্য্য ভাসে—
নীচতা পলাক্ ত্রাসে,
জ্বলে' যাক্ অহঙ্কার,
ধন-জন-হুহুঙ্কার,
হিংসা-দ্বেষ-অত্যাচার, মিথ্যা-কোলাহল;
মঙ্গলে মরুক অমঙ্গল।"—(ঐ)

কবি-হৃদয়ের উচ্চ ভাব যে ওজস্বিনী ভাষায় বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহার তুলনা এই শ্রেণীর কবিতায় সহজে মিলে না। প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাবলী হইতে অক্ষয়কুমার উপমা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার ব্যথা-ভরা হৃদয়ের ভাবটিকে আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন—

"যথা বজ্র-বৃষ্টি-ঝড়ে
দুর্ভিক্ষ মড়ক মরে;
জ্ঞান যথা মহাজ্ঞানে;
প্রাণ যথা মহাপ্রাণে;
মরুক এ অপূর্ণতা পূর্ণতা-ভিতরে!
এস, দেবী, এস ঘরে-পরে!"—(ঐ)

প্রেমই সত্যম্ শিবম্ সৌন্দর্য্যম্; প্রেম অহংজ্ঞানকে বিনাশ করে; প্রেম পরের জন্য বাঁচিয়া থাকে; প্রেমই আনন্দম্ যাহাকে হিন্দুর বেদ ভূমানন্দম্ কহে। কবি 'আবাহন' সঙ্গীতের শেষ শ্লোকে "যুগ-যুগ চিন্তারাজি" একত্র করিয়া কবিত্বের যে "উন্মাদনা-স্রোত" প্রাণের ভিতর অনুভব করিয়াছেন তাহার পরিণতি দেখাইয়াছেন।

"এস, ভেদি' ব্রহ্মরন্ধ্র,
হে আনন্দ—ভূমানন্দ!
উৎপাটিয়া মর্ম্মস্থল
সদ্যঃ-রক্তে ঝল-ঝল—
এস আত্ম-বিনাশিনী, পরার্থ-জীবিতে,
সত্য-শিবে, সৌন্দর্য্য-সম্মিতে!"—(ঐ)

অক্ষয়কুমারের ঘৃত-প্রদীপের আলোয় আমরা প্রেমের যে ছায়া-মূর্ত্তি দেখিলাম তাহা বঙ্গভাষার কাব্য-মন্দিরে কবি-কল্পনার নূতন অভিব্যক্তি। এই দেবীমূর্ত্তি ক্রিয়াহীন স্বার্থশূন্যতার (altruistic passivity) আদর্শ নহে, ইহা বিশুদ্ধ প্রেমভাবেরও (platonic love) চিত্র নহে। সুখবাদের কবিরা ক্রিয়াহীন, বিশুদ্ধ প্রেমের অসংখ্য মূর্ত্তি সৃজন করিয়াছেন। বঙ্গদেশে এক রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ভবনে এই শ্রেণীর যে কত সুন্দর মূর্ত্তি সাজান আছে তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে সুখবাদের কবিরা যে একটা আনন্দলাভ করেন, সেই আনন্দে বিভোর হইয়া তাঁহারা প্রেমের যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন তাহা সত্য হইলেও, সুন্দর হইলেও রক্ত মাংস স্বার্থে গঠিত মানব-সমাজের উপর তাহার শাসন চলে না। যদি চলিত, তাহা হইলে এতদিনে পৃথিবী হইতে জাতিভেদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ লোপ পাইত। দুঃখবাদের কবি অক্ষয়কুমার বাস্তব জগতকে ভুলিয়া গিয়া আপনার আনন্দে আপনি মত্ত হইয়া পড়েন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশমাতার ন্যায় অক্ষয়কুমারের 'প্রেম রাণী' বহুবলধারিণী। অক্ষয়কুমার কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বা অপর কোনও বাঙ্গালী কবির অনুকরণে প্রেমের এই দেবী-মূর্ত্তি সৃজন করেন নাই। অক্ষয়কুমারকে আদর্শ সংগ্রহ করিবার জন্য হিন্দু দেবমণ্ডলীর বাহিরে যাইতে হয় নাই। মানব-জগতের

মঙ্গলের জন্য অসুরমর্দ্দিনী পৃথিবীতে যখন অবতীর্ণা হইয়াছিলেন তখন জগন্মাতা প্রেমের যে লীলা দেখাইয়াছিলেন তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। হিন্দু কবি অক্ষয়কুমার কিন্তু ভুলেন নাই। সুখবাদের কবি যদি প্রকৃতির আনন্দ-ভবনে সারাটা জীবন অতিবাহিত না করিতেন, শান্তি-নিকেতনের চৌহদ্দীর বাহিরে আসিয়া যদি তিনি কিছুদিন মানব-সমাজে, বিশেষতঃ বাঙ্গালী সমাজে অক্ষয়কুমারের সহিত সমসাময়িক বাঙ্গালী-চরিত্রের ইতিহাস পাঠ করিতেন, তাহা হইলে তিনিও লিখিতেন,—

"আজো সেই পশু-ধর্ম্মে
ভ্রমি লক্ষ্যহীন কর্ম্মে ;
আত্ম-প্রতিষ্ঠার ছলে
বিশ্ব দেই রসাতলে ;
কামে ক্রোধে লোভে মদে সৃষ্টি শত চূর ;
হা-হা, নর সাক্ষাৎ অসুর !"—(ঐ)

এই নরাসুরের "গর্ব্ব", "জয়", "সর্ব্বগ্রাসী স্বার্থ-হুহুঙ্কার", "লক্ষ্যহীন কর্ম্ম", "নীচতা", "অহঙ্কার", "হিংসা-দ্বেষ-অত্যাচার", "মিথ্যা-কোলাহল" হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য বড়াল কবি প্রেমের দেবীকে 'আবাহন' স্তোত্রে অনুনয় করিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের প্রেমভাব ব্যক্তিগত পূর্ণতার ভিখারী নহে। কবির প্রেমে যে উদারতা আছে তাহা সমগ্র সমাজকে লক্ষ্য করিতেছে। প্রাচীনতম বৈষ্ণব কবি শ্রীকৃষ্ণের যৌবন লীলায় যে প্রেমের পরিচয় পাইয়াছিলেন তাহাতে ব্যক্তিগত প্রেমভাবের প্রাধান্যই বর্ত্তমান। শ্রীচৈতন্যদেব ব্যক্তিত্বের সীমানা ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রেমের অদ্ভুত প্রসারণ-শক্তির লীলাভিনয় দেখাইয়াছিলেন। ইহার ফলে বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ে যে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল, রাষ্ট্রবিপ্লবেও তাহা সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই। মহাভারতের কৃষ্ণ-চরিত্রে আবার আমরা প্রেমের যে বিশ্বব্যাপী কর্ম্মময়তার পরিচয় পাই তাহার তুলনা কোথাও নাই। হিন্দু কবি অক্ষয়কুমার বঙ্গদেশের নৈতিক অবস্থা বিষয় চিন্তা করিয়া ভীরু বাঙ্গালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় অসুরমর্দ্দিনীকে প্রেমের দেবী-রূপে কল্পনা করিয়াছেন। কবির দেশে অপর কোনও দেব-দেবী বাঙ্গালী নরাসুরের হৃদয় হইতে আত্মঘাতী স্বার্থপরতাকে উৎপাটিত করিতে পারেন না। দরিদ্র বাঙ্গালী আনন্দ-দায়িনী দশভুজার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বৎসরের ছয় মাস আশায় বুক বাঁধিয়া থাকে। বাঙ্গালীর জাতীয়-হৃদয় তিনটি দিনের তরে জগন্মাতার অপার করুণার আস্বাদ পাইয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া থাকে। বাঙ্গালী যে দিন কবি-কল্পিত কর্ম্মহীন প্রেমের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবে, অক্ষয়কুমারের ন্যায় দেবীর পূজা সাত্ত্বিকভাবে করিতে শিখিবে, জাতীয়-হৃদয়ের স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিনিচয়কে বলিদান করিবে, সে দিন সে মহত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইবে আর সে দিন সে প্রেমের যে শক্তি অনুভব করিবে তাহা বহির্মুখী হইয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিবে। অক্ষয়কুমারের প্রেমের দেবী কবিমানা ধরণের প্রেমের আদর্শ নহেন। তিনি জীবন্ত জাগ্রত দেবী ; মাতৃরূপে বাঙ্গালীর গৃহে তিনি অবস্থান করিতেছেন, দেশমাতার বিরাট মূর্ত্তিতে তিনি প্রাকৃতিক জগতের সর্ব্বত্র প্রকট, শরৎ-সমাগমে তিনি বাঙ্গালীর ধর্ম্মরূপে দয়া দাক্ষিণ্য প্রীতি ও সদ্ভাবের ভিতর দিয়া কর্ম্মময় প্রেমের বিকাশ দেখাইয়া থাকেন। এষার কবি অক্ষয়কুমার প্রেমের যে দেবীমূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন, তাহা যে কোনও যুগে হিন্দু কবির উচ্চতম আদর্শরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য।

রহস্যময়ী।

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল বি-এ]

প্রথম তাকে দেখেছিলুম, ঐ-গিরিডির সেই বিস্তৃত পথের একটা তে-মাথার মোড়ে প্রকাণ্ড মহুয়া গাছের তলায়। সন্ধ্যার সেই ম্লান আলোকে পথ হারিয়ে সে একা সেই গাছের গুঁড়িতে হেলান্ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, অনেকটা মূর্ত্তিমতী সন্ধ্যারাণীর মতই। আমি আন্‌মনে হাল্কাভাবে আমার 'চেরী'র ছড়িটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে বাড়ী ফিরছিলুম। প্রথমটা তাকে দেখেই আমি একবার কেমন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে' পরে আবার মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিলুম। অথচ, সেই একটীবারের দর্শনেই ঐ নিরাশ্রয়া মেয়েটীর কিছু-না-কিছু একটা বিপদের কল্পনা করে আমার পা দুটো যেন কোনমতেই যেতে চাচ্ছিল না। ঠিক সেই সময় যখন সে একটা ভারী করুণ কণ্ঠে আমায় ডেকে তার বিপদটুকু জ্ঞাপন কল্লে, তখন আমি ফিরে এসে আবার সেই গাছটার কাছে দাঁড়ালুম। আমার তরুণ বুকের নীচে তখন যৌবনের ভাবময় উদার প্রবৃত্তিগুলি পূর্ণতেজে বেজে চলেছে। এত বড় একটা পরোপকারের সুযোগ জীবনে সব সময়ে ঘটেনা; কেন না, সে উপকারের পাত্রী হচ্ছে, একটী শান্ত করুণ রূপসী তরুণী!

মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলুম,—কোন্ দিকে আপনার বাড়ী?

চাঁপার কলির মত একটী অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে' সে বল্লে,—ঐ ব্রাহ্মপাড়ায়,—'রোজ-ভিলা'!

রোজ-ভিলা! তাহ'লে আমারই বাড়ীর হাতকয়েক দূরে সেই গোলাপী রংয়ের ফ্যান্সী বাংলোখানা! স্মিতহাস্তে বললুম,—তবে তো আপনাদের বাড়ী আমার খুব চেনা! আমাদেরই পাড়ায়!—লক্ষ্য করে' দেখ্‌লুম, তার চোখদুটী একবার মাটীর ওপর নুয়ে পড়্‌ল। আমি বল্‌লুম,—তাহ'লে এখন যদি আপনি আমার সঙ্গে আসেন—

মনে হোল মেয়েটী একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস টেনে নিয়ে বল্লে—চলুন!

আকাশের বুক হ'তে তখন গোধূলির বিচিত্র বর্ণরাশি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। দু'জনেই আমরা নিতান্ত মূকের মত পথ চল্‌ছিলুম। শুধু সেই কাঁকরের রাস্তার উপর দিয়ে আমাদের জুতোর শব্দগুলোই যেন সমস্ত নীরবতাকে চঞ্চল করে' তুল্‌ছিল।

সামনেই রোজ-ভিলা! অন্ধকারে তার মুখখানি আর তেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না; কিন্তু এবার তার কথার মধ্যেই আমি পুলকের ঝঙ্কারটুকু অনুভব করলুম। সে বল্লে—আপনি যে আজ আমার কত উপকার করলেন—

ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে আমি শুধু তাকে জানিয়ে দিলুম যে, এ সামান্য কাজটুকু আমি কেন, যে কোন মানুষই স্বচ্ছন্দে করত। তার জন্যে প্রশংসার দাবী করবার আমার কিছুই নেই।

সেই সময় দু'জনে ফটকের কাছে এসে পড়তে কার একটা মোটা গলার আওয়াজে আমি চম্‌কে উঠলুম। ফিরে দেখি, একটা বর্ম্মা চুরুট মুখে দিয়ে একটা খুব মোটাসোটা লোক এসে সেই মেয়েটীর হাত ধরে বলচে,—Ah Baby! we were so anxious—! মেয়েটী কিন্তু তার কথার কোন উত্তরই দিলে না। যাই হোক, এই সুযোগে আমি পাশ কাটাব মনে করচি, এমন সময় সেই লোকটী বলে উঠ্‌ল,—ওঃ, আপনি আমাদের অমিয়ার বন্ধু! বুঝিচি আসুন্, আসুন্. নইলে অমিয়া যে ভারী দুঃখিত হবে!

অমিয়া একবার আমার পানে তার চোখদুটী তুলে ধরলে। তার চোখের সেই নীরব ভাষাটুকু অন্ধকারে দেখা না গেলেও আমি বেশ বুঝতে পারলুম, সে তার পিতার কথাটারই সমর্থন করলে। অগত্যা আমিও আর কোন কথা না বলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে ফটকের ভেতর প্রবেশ করলুম।

বাড়ীর ভেতরে অমিয়ার মা এসে আমায় আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন। সকলে একসঙ্গে একটা টেবিলের

চারিপাশে বসে' গল্প হচ্ছিল। অমিয়ার পিতা মিঃ দাস একাই অনেক রকম কথা কইতে লাগ্‌লেন। আমি মাঝে মাঝে তার উত্তর দিচ্ছিলুম। আর, একদিকে অমিয়াও যেমন নিতান্ত মৌন হয়ে থেকে-থেকে কেবল আমাদের মুখের পানে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল, ওদিকে তার জননীও তেমনি স্তব্ধের মত বসে'-বসে' আমাদের একটা কথাতে যেন চেষ্টা করে'ও যোগ দিতে পারছিলেন না। চাকরটা চা দিয়ে যেতে তিনি যেন একটা নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। কিন্তু মিঃ দাসের মুখ চা খেতে-খেতেও বড় কামাই গেল না। আমি বেশ একটা কৌতুক অনুভব কর্‌ছিলুম যে, এই দুটী দম্পতীর ভেতর স্বামীটি হচ্ছেন যেমন অশ্রান্তভাষী, পত্নীটি আবার ঠিক তেমনি স্বল্পভাষিণী! এই একটা বিষয়ে এঁরা পরস্পরের ত্রুটীটুকু বেশ ভাল রকমই পূর্ণ করে' দিয়েছেন!

চায়ের মজ্‌লিসের পর মিঃ ও মিসেস্ দাস অন্যত্র চলে' গেলেন। আমারই একটু দূরে একখানা চেয়ারে অমিয়া চুপটী করে' ব'সেছিল। আমি টেবিলের ওপরকার ম্যাগাজিনখানা অনর্থক নেড়ে-চেড়ে দেখে শেষে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লুম,—তাহ'লে মিস্ দাস—

অমিয়া একেবারে তার দুটী আয়ত চোখ আমার মুখের ওপর রেখে বল্লে,—আমার নাম অমিয়া।

তার এই কথায় আমি বেশ একটু লজ্জিত হয়ে' গিয়ে মৃদু হেসে বল্‌লুম,—কিন্তু, হঠাৎ নাম ধরে' ডাকাটা শিক্ষিত সমাজে একটা অভদ্রতা।

এবার সে তার চোখ দুটী নামিয়ে নিলে বটে, কিন্তু বেশ দৃঢ় স্বরেই বল্লে—কিন্তু, আমার নাম ধরে' ডাক্‌লে আপনার একবিন্দু অভদ্রতা হবে না! একটু ইতস্ততঃ করে' শেষে বল্‌লুম,—তা বেশ, তাহ'লে এখন আসি অমিয়া।

প্রত্যুত্তরে সে মুখ ফুটে কোন কিছুই বল্লে না। কেবল আবার একবার আমার মুখের পানে তাকিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সেই মৌন দৃষ্টিতে যেন আমার সর্ব্বশরীর অকস্মাৎ কণ্টকিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

২

আমার বাড়ীতে শুধু আমি, একটা চাকর, আর একটা বামুন।

রাত্রিতে সেদিন বেশ ভাল ঘুম হোল না। থেকে-থেকে ঐ অমিয়ার কথাটা আমার এই চিন্তালেশহীন বুকের ভেতর স্বপ্নের মত একটা রঙ্গীন জাল রচনা করতে লাগ্‌লো। আজ হঠাৎ মনে হোল, এই প্রায় একমাস্ কাল গিরিডি-বাসের মধ্যে ঐ একটা বছর-পনেরোর তরুণীর সঙ্গে পরিচয়ই হচ্ছে আমার সব চেয়ে বড় লাভ! না, তাই বা কেন, এই আমার দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের নীরস জীবনের মধ্যে এইটুকুই বুঝি আমার একমাত্র সার্থকতা! সন্দেহ হোল, একি আমার সেই ব্যাধি, যা'র পাষাণ-মন্দিরে যুগ-যুগান্তরের কত নরনারী তাঁদের বুকের রক্ত ঢেলে এসেছেন?

পরদিন ভোরে যখন নিতান্ত নিঃসঙ্গভাবে বেড়াতে বেরিয়েছি,—এই বিদ্রোহী পা-দুটো যেন বারম্বার ছুটে যেতে চাইলে, সেই রোজ-ভিলার দিকে! জোর করে' সে আকাঙ্ক্ষা সাম্‌লে নিয়ে বিপরীত দিকে চল্‌তে লাগলুম। দূরে 'পরেশনাথ'-গিরি গাত্রে প্রথম-সূর্য্যের স্নিগ্ধ আলোটুকু লেগে তাকে ক্রমশঃ গাঢ় নীল করে' তুলছিল। আমি গায়ের গাল্‌ফ কোটটার সব বোতামগুলো এঁটে দিয়ে এত জোরে পথ চল্‌ছিলুম যে, সেই শীতের মাঝেও আমার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হয়ে ওঠ্‌বার উপক্রম হ'য়েছিল। হঠাৎ একটা উৎরাইয়ের কাছে এসে নাম্‌তে গিয়েই আমি স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালুম। সাম্‌নেই এক হাত নীচে অমিয়া, আর তার পিছনে তাদের বুড়ী চাকরাণীটা। অমিয়া আজ একেবারে কাছে ঘেঁসে এসে আমার হাতখানা ধরে' ফেল্লে। তার এই আকস্মিক ব্যবহারে আমার মাথা হ'তে পা পর্য্যন্ত কে যেন একবার একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে গেল। পরক্ষণেই জোর করে' মুখের ওপর হাসি টেনে এনে বল্‌লুম,—তুমিও এই দিক দিয়েই বেড়াতে আস' নাকি অমিয়া?

খুব মৃদু একটু হাসি তার সেই পাত্‌লা ঠোঁট দুখানি কুঞ্চিত করে' দিয়ে গেল। আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে বল্লে,—কতদূর যাবেন আপনি?

আমি বল্লুম,—তার কিছু ঠিক নেই। তবে এখনো বাড়ী ফেরবার সময় হয়নি—

সে বল্লে,—তবে চলুন, এক সঙ্গেই ফেরা যাবে।

কিন্তু খানিকটা এসেই আর বেশী দূর আমার যাবার ইচ্ছা হোল না। কেন না, আমার খেয়ালের ঝোঁকে ফেলে এই সুকুমার বালিকাটীকে সামান্য একটু কষ্ট দিতেও আমার মন সর্‌ছিল না। বল্লুম,—না অমিয়া, চল, বাড়ী ফিরি।

ফিরে যেতে-যেতে আজ কথায়-কথায় তার বিষয়ে আমি আরও অনেক পরিচয় সংগ্রহ কর্‌লুম। তারা কল্‌কাতায় থাকে,—সে বেথুন কলেজের স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। আর সে যে অবিবাহিতা, তাতো আমি কালই টের পেয়েছিলুম! তাছাড়া এটাও জান্‌লুম যে তারা দীক্ষিত ব্রাহ্ম নয়, শুধু মার্জ্জিত হিন্দু-পর্য্যায় ভুক্ত। মোট কথায়, আজ যখন তাকে ছেড়ে আমি আমার বাড়ী ফিরে এলুম, তখন এই একটা কথা হঠাৎ আমার মনে হ'য়ে গেল,—যদিই কোনোদিন ঐ সরল সুন্দর মেয়েটীকে আমি আমার এই নিঃসঙ্গ জীবনের রাণী করে' নেবার ইচ্ছা করি, তা'হলে, অন্ততঃ একটা দিক দিয়ে তার কোন বাধা, কোন বিঘ্নই থাকবে না। কথাটা আমার মাথার ভেতর জেগে উঠ্‌ল—একটা ক্ষীণ আলোকশিখার মত, কিন্তু, তার পরক্ষণেই সেটা হঠাৎ আরও অনেকখানি দীপ্ত হ'য়ে উঠে আমার হৃৎপিণ্ডের সমস্ত রক্তটুকু উদ্দাম করে দিয়ে গেল! তারপর একে-একে যতই দিন যেতে লাগলো, যতই অমিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাটুকু আমার বাড়্‌তে লাগ্‌লো, ততই যেন ঐ একটা কথা সব চেয়ে বড় হ'য়ে উঠে আমার সমস্ত জীবনের গতিটুকুকে একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ করে' ফেল্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো।

শেষে বাধ্য হ'য়ে আমায় পরাস্ত হ'তে হ'ল। সুযোগ খুঁজ্‌তে লাগ্‌লুম, কেমন করে' একথা আমি অমিয়ার কাছে ব্যক্ত করতে পারি, কেমন করে' তার মতামতটা আমি সংগ্রহ করতে পারি। কেন না, আমি জানতুম, অমিয়ার নিজের সম্মতি হ'লে এ বিবাহে তার পিতা-মাতা কোনো অমতই কর্‌তে পার্‌বেন না। আমার বাবা একজন নামজাদা ব্যারিষ্টার, তাঁর ছেলে আমি সম্প্রতি এম্‌-এ পাশ করে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হ'য়েছি; অর্থে বল, সমাজে বল, আমি যে তাঁদের মেয়ের কোনো অংশেই অযোগ্য নই, একথা তাঁরা কোনমতেই অস্বীকার করতে পার্‌বেন না।

প্রতীক্ষা করে-করে শেষে আমার গোপন কথাটী প্রকাশ করে' ফেল্‌লুম—সেদিন যখন সে আর আমি নিতান্ত নির্জ্জনে সেই বালুকাময় নদীর তীরে বসে'। দূরে পশ্চিমের একটা শালবনের ভেতর দিয়ে সূর্য্য ক্রমশঃই ডুবে যাচ্ছিল, এবং তার অসংখ্য গরিমা গায়ে মেখে মুমূর্ষু দিবস তার শেষ হাসিটুকু হেসে নিচ্ছিল। অমিয়ার মুখে-চোখে সেই হাসির রক্তিমা ঠিক্‌রে পড়েছিল। আর আমি, আমার দুই চোখে হাজার চোখের দৃষ্টি নিয়ে নির্ব্বাক হ'য়ে তাকে দেখ্‌ছিলুম,—সাধকের তন্ময়তা নিয়ে, উন্মত্তের বিহ্বলতা নিয়ে!

হঠাৎ অমিয়া মুখ তুলে বল্লে,—চলুন অশোকবাবু, বাড়ী যাই। কিন্তু, বোধ করি আমার মুখের সেই অস্বাভাবিক ভাবটুকু দেখেই সে লজ্জায় একটুখানি কুঁক্‌ড়ে উঠে বল্লে,—কি ভাব্‌চেন?

প্রথমটা আমি কেমন থতমত খেয়ে গেলুম, তারপর সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লুম,—ভাব্‌চি? সে অনেক কথা। দেখ অমিয়া! ক'দিন থেকেই আমি একটা কথা তোমায় বলি-বলি করে'ও বলে' ফেল্‌বার ফুরসৎ পাচ্ছি না। কিন্তু আজ আর আমি এ সুযোগ নষ্ট করতে পাচ্ছি না। কেন না, তারই ওপর আমার সমস্ত জীবন নির্ভর কর্‌ছে!

অমিয়া একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে বল্লে,—কি কথা?

আমি পরের-পর দু'তিনটা ঢোঁক গিলে নিয়ে বল্লুম,—তুমিতো জান, অমিয়া, আজ পর্য্যন্ত আমি বিবাহ করিনি; আর, ঐ জিনিষটার অভাব আমি কখনো এমন প্রাণ দিয়ে অনুভবও কর্‌তে পারি নেই, যেমন আজ কচ্ছি!...অমিয়া! আমার সমস্ত অন্তরাত্মা আজ হাঁফিয়ে উঠ্‌চে, অপর এক জনের হৃদয়ের ভেতর নিজেকে মিশিয়ে দেবার জন্য!... বুঝেছ কি, সে কে?..... বলে' আমি হঠাৎ তার একখানা হাত ধর্‌তেই সে তার সবটুকু দৃষ্টি একেবারে সেই বালুকাশয্যার ওপর নামিয়ে দিয়ে স্তব্ধের মত বসে'

রইল। এত স্তব্ধ যে, বাইরে হ'তে তার জীবনের কোন লক্ষণই টের পাবার যো ছিল না। সন্দেহ ও আশঙ্কায় আমি দুলতে লাগ্‌লুম। আমার কাছ থেকে এমন অকস্মাৎ এই কথাটা অমিয়া যে কখনো বিন্দুমাত্র আশা করেনি, তা' আমি এতক্ষণে নিজেই স্পষ্ট বুঝতে পার্‌লুম। শেষে, সে ধীরে ধীরে আমার মুখের উপর তার পাণ্ডুর মুখখানি তুলে ধর্‌লে। অশোকবাবু!—ক্লান্তস্বরে শুধু এই কথাটী বলে' সে বোধ করি অসাবধানে তার বাম বাহুখানি আমার কোলের উপর শুইয়ে দিলে। আমি তখন পূর্ণ আবেগে একেবারে তাকে আমার পাশটীতে টেনে নিয়ে বললুম,—বল, বল অমিয়া! তোমার মুখের কথা পেলে—

অমিয়া নির্জ্জীবের মত আমার বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ে' অস্ফুটে বলে' উঠল,—আমার কথা!—কিন্তু,—আমি কি আপনাকে সুখী করতে পার্‌বো?......স্পষ্ট অনুভব কর্‌লুম, আমার বাহুবন্ধনের ভেতর সর্ব্বশরীর তার থেকে-থেকে কেঁপে উঠ্‌ছে।

৩

অমিয়ার সম্মতি আমি পেয়েছি; আর তার বাবা মা'ও এ বিষয়ে কোনো আপত্তিই করেন নি। তবু, কেন জানি না, এত আদরের এই একটীমাত্র কন্যার বিবাহে মিসেস্‌ দাসের মুখে সামান্য একটুখানি হাসির রেখা দেখা গেল না। তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর সাম্‌নে যখন সেদিন আমি এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করলুম, সহসা যেন কি-এক অস্পষ্ট মেঘে তাঁর মুখখানা একেবারে আঁধার হ'য়ে এল।

বিবাহ হোল, সনাতন হিন্দুমতেই। অমিয়ার এ বিষয়ে একটা খুব বেশী জিদ দেখা গেল। আমার এতে আপত্তি তো মোটেই ছিল না, বরং এইটাই আমি বিশেষ করে' সমর্থন করলুম।

.........সেই এক অপরিস্ফুট সুখস্বপ্নের মত যাকে আমি দেখেছিলুম, ভালবেসেছিলুম,—তাকেই যখন আমি এত অনায়াসে আমার হৃদয়ে-বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করলুম, তখন আমার মনে হোল,—এ জগতে আমার মত ধন্য কে?—এ সৌভাগ্য ক'জনের হয়? আনন্দে, গৌরবে হৃদয় আমার ফুলে উঠ্‌ল'।

কিন্তু হায়, সে কতদিন! যে অভ্রভেদী আশার প্রাসাদ নিয়ে আমি সেদিন অমিয়ার সেই ফুলের মত হাত দুখানি আমার হাতের মধ্যে বেঁধে নিয়েছিলুম, ছ'মাস যেতে-না-যেতেই দেখ্‌লুম, সেই আমার অত-সাধের মোহন হর্ম্যখানি যেন দিন-দিন ভূগর্ভে বিলীন হ'য়ে যেতে ব'সেছে। আমি জানতুম, অমিয়া আমায় ভালবাসে। সময়ে-সময়ে এক-একটী ছোট্ট কথায়, কাজে সে বিশ্বাস আমার প্রাণের মধ্যে সম্পূর্ণই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠত। কিন্তু অনেক সময়ই দেখ্‌তুম, অমিয়া শুধু এক নির্ব্বিকার সুন্দর পাষাণমূর্ত্তি! তা'র মধ্যে দুঃখ কি সুখ, যেন কোন অনুভূতিই বর্ত্তমান নেই; সে যেন আমার কেউ নয়, এ সংসারের কেউ নয়! তা'র এই নির্লিপ্তভাব আমার বুকে শেলের মত বিঁধত; অভিমানে এই আমার আহত বুকের ভিতরটা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ত এমন কি, সময়ে-সময়ে দু'একটা কঠিন কথাও আমার ক্ষুব্ধ অন্তর হ'তে অসাবধানে বাইরে এসে পড়্‌ত'। সে তখন চকিতে তার পরিম্লান চোখদুটী নিয়ে আমার পানে চাইত; পরে ধীরে ধীরে আমার বুকের উপর ক্লান্ত ভাবে হেলে' পড়ে' ভারী করুণকণ্ঠে শুধু বল্‌ত;—আমার ওপর রাগ কর্‌চ তুমি! পায়ে পড়ি, রাগ ক'রোনা—

এই এক কণ্ঠস্বরেই আমি আমার সব অভিমান ভুলে গিয়ে একেবারে তাকে বুকে চেপে ধরতুম, এবং সেও সেই দৃঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে এলিয়ে পড়্‌ত—প্রাণহীন ছিন্ন মূল লতাটীর মত!

কিন্তু, এই নির্লিপ্ত ভাবটুকু তার চিরকাল একভাবে স্থায়ী হোল না। সময়ের গুণে তার মুখখানির ওপর থেকে মলিনতার পর্দ্দাটুকু খসে' পড়ে' গিয়ে অম্লান হাসির জ্যোৎস্না ফুটে উঠ্‌ল। আমিও একটা প্রবল আরামের নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লুম। তখন আমি খুলনার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। সেখানকার সেই একটা বৎসর যেন আমার সেই কুকুর মত শুষ্ক অভিশপ্ত জীবনটার ওপর একটা স্বপ্নময় সোণার কাঠি বুলিয়ে দিয়ে তাকে ফলে-ফুলে মুঞ্জরিত করে' তুলেছিল।

৪

কিন্তু হঠাৎ আমাদের সে আবেশনিদ্রা ভেঙ্গে গেল, একদিনের একখানা চিঠিতে।

সবেমাত্র সেদিন কাছারী হ'তে ফিরে এসে ব'সেছি। অমিয়া তার প্রতিদিনের অভ্যাসমত এসে আমার গলার 'বন্ধনী' প্রভৃতি সাজ-সরঞ্জামগুলো খুলে দিচ্চে, আর একথা-সেকথা নিয়ে গল্প করচে। এমন সময় চাকরাণীটা এসে একখানা খামে মোড়া চিঠি দিয়ে গেল। আমি সেখানা হাতে নিয়েই খুলতে যাচ্ছিলুম; কিন্তু অমিয়া সরিয়ে রেখে দিয়ে' বল্লে,—থাক্, আগে হাত-মুখ ধুয়ে তারপর ওসব ক'রো।

এর উত্তরে আমারও কিছু বল্‌বার ছিল না। মুখ হাত ধুয়ে অমিয়ার নিজের হাতে প্রস্তুত জলখাবারে উদরপূর্ত্তি করে' যখন চিঠিখানা খুল্‌লুম, তখন হঠাৎ যেন আমার মাথার ওপর বজ্রপতন হোল। এ চিঠি কা'র লেখা, তা কিছু বুঝ্‌লুম না। নীচে যার নাম সহি করা, তাকেও কিছু চিন্‌লুম না। কিন্তু, তার মর্ম্মটুকু এত সুস্পষ্ট যে, বুঝ্‌তে মোটেই দেরী হ'ল না। মাত্র চারিটী লাইনে এইটুকু লেখা হ'য়েচে,—'শনিবার রাত্রে হঠাৎ এপোপ্লেক্সি হ'য়ে মিঃ দাস মারা গিয়েছেন।......' অমিয়া আমার সামনেই বসেছিল। একবার চকিতে তার পানে চেয়েই আমি ভয়ে-ভয়ে চিঠিখানা হাতের মুঠোর মধ্যে মুড়িয়ে ফেল্‌ছিলুম। কিন্তু, ঠিক সেই সময় অমিয়া মুখ তুলে চাইতেই—আমার মুখের ভাব দেখে সে স্তব্ধ হ'য়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে,—কিসের চিঠি ও?

তখন আমি নিরুপায়। একটু আম্‌তা-আম্‌তা করে' কি বল্‌তে গিয়ে ব্যর্থ হ'লুম। অগত্যা তখন চিঠিখানা তার কোলের ওপর ফেলে দিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে নিজের চেয়ারে হেলান্ দিয়ে বসে রইলুম।

অমিয়া নতমুখে চিঠির সেই ক'টা লাইন বোধ হয় পুরো পনের মিনিট ধরে' পড়্‌তে লাগ্‌ল। এই আকস্মিক শোচনীয় দুঃসম্বাদে সে যতটা বিচলিত হ'বে মনে ক'রেছিলুম, তার কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু, যখন সে ধীরে-ধীরে মুখ তুল্‌লে, তখন তার সেই মুখের চেহারা দেখেই আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম। এই কতক্ষণের ভেতর কি ভয়ঙ্কর ফ্যাকাশে হ'য়ে প'ড়েচে সে! তার একখানা হাত তারই কোলের ওপর, আর একখানা চেয়ারের হাতলে; দুখানা হাতেরই আঙুলগুলো যেন কোন্ বৈদ্যুতিক প্রবাহে আপনা-আপনি কাঁপ্‌ছিল আমি তাড়াতাড়ি তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার হাতদুখানা জড়িয়ে নিয়ে ডাক্‌লুম,—অমি,—অমিয়া—!

সে কিন্তু একটা কথাও কইলে না। শুধু তেম্‌নি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' আমার মুখের পানে চেয়ে রইল। আমি তার মুখখানিতে গভীর স্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বল্‌লুম, ছিঃ, অমন ক'রোনা অমিয়া! বুঝ্‌ছ তো সবই! একটু স্থির হ'য়ে থাকো। তোমার বাবা যে—

হঠাৎ তার সেই পাংশু মুখখানা যেন একবার লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে নিয়ে বল্লে,—তুমি—তুমি কি কোথাও বেরুবে এখন?

—হ্যাঁ, চল না, তোমায় নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি!

সে অত্যধিক আগ্রহে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই চল—।

* * *

সেই থেকে অমিয়ার মুখের সেই স্বচ্ছ হাসি আবার যে একটা ঘনমেঘে আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল, শত চেষ্টাতেও যেন আর তাকে মুক্ত করা গেল না। আগের চেয়েও সে এখন ঢের বেশী অন্যমনা হ'য়ে পড়্‌ল; কৃষ্ণতার চক্ষুদুটীর সেই ভাস্বর জ্যোতিঃ যেন কুয়াসায় ঢেকে আস্‌তে লাগ্‌লো। অথচ, যে আকস্মিক দুঃসম্বাদে তার এই ভাবান্তর, সেই তার নিরাশ্রয়া বিধবা মায়ের কথাটা তুল্‌লে সে যেন প্রাণপণে সে প্রসঙ্গ চাপা দেবার চেষ্টা কর্‌ত'! রহস্যময়ীর এ রহস্য আমি কোনমতেই ধর্‌তে পার্‌ছিলুম না।

দিনকতক পরে একদিন আমি সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে এসে শোবার ঘরে ঢুকেই কিন্তু চম্‌কে উঠ্‌লুম। খোলা মেঝের ওপর উপুড় হ'য়ে পড়ে' অমিয়া যেন কিসের একটা দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। আমার আগমন সে মোটেই টের পায়নি। তাই আমিও খানিকক্ষণ দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাপারটা বোঝ্‌বার চেষ্টা করলুম। কিন্তু বৃথা! অমিয়ার মুখে একটী কথাও নেই। শুধু একটা অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট আর্ত্তধ্বনি তার কণ্ঠ হ'তে বাহির

হ'য়ে আসচে। আমি আর থাকতে না পেরে হঠাৎ তাকে একেবারে আমার বুকের কাছে টেনে নিয়ে ডাকলুম,—'অমিয়া!'

হঠাৎ সে যেন থতমত খেয়ে,—যেন কত ভয়ে আমার সেই তপ্ত আলিঙ্গনের মধ্যে গুটিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল। কোনমতেই সে মুখ তুলে আমার মুখের পানে চাইতে পারলে না। আমি আবার তাকে ডাকলুম, কিন্তু কোন সাড়া পেলুম না।... হঠাৎ কি-একখানা কাগজ আমার পায়ের কাছে পড়ে' থাকতে দেখে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখি, একখানা চিঠি। ভেতরে তার এই ক'ছত্র লেখা ;—

'মা অমিয়া,

মনে করেছিলুম, তোমাকে আর চিঠি দিয়ে বিরক্ত করবো না। কিন্তু বড় দুঃখেই লিখতে হ'ল। মা, আমি আজ বড় কষ্টে পড়িচি। এখানকার বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত পাওনাদারে বেচে নিয়েছে; আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। তোমার কাছে চাইবার আমার মুখ নেই,—এখন আমার মরাই উচিত। তবে, যদি পারো আমায় কিছু ভিক্ষা দিয়ে পাঠিয়ো।..

—তোমার হতভাগী মা।'

চিঠিখানা পড়তেই অমিয়ার এখনকার অবস্থাটা আমার কাছে বেশ স্পষ্ট হ'য়ে এল। কিন্তু, একটা জিনিষ যেন বেশ পরিষ্কার হোল না; মা তাঁর মেয়েকে এত কাকুতি করে' কেন লিখেচেন?...খানিক স্তব্ধ হ'য়ে থেকে বললুম,—ছিঃ অমিয়া! এতই কি ছেলেমানুষ তুমি? শুধু বসে' বসে' কাঁদলেই ত আর মায়ের দুঃখ ঘোচাতে পারবে না! তাঁর কি উপায় করবে, কিছু ভেবেছ?

অমিয়া এবার ধীরে-ধীরে তার আনত চোখদুটী আমার মুখের ওপর তুলে ধরে' অতি সন্তর্পণে—ভয়ে ভয়ে শুধু বল্লে,—মাকে যে আমি তিরিশটী টাকা পাঠিয়ে দিয়েচি!—তোমাকে না ব'লেই—

তার এই একান্ত ত্রস্তভাবে আমি বড়ই ব্যথিত—বড়ই ক্ষুব্ধ হ'লুম। বললুম,—ছিঃ অমিয়া, তুমি কি আমায় এত নীচ মনে কর যে—

হঠাৎ এক অতিক্ষীণ হাস্যরেখা তার ঠোঁটদুটী সঞ্জীবিত করে' দিলে। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস চাপা দিয়ে সে বলে' উঠল,—না গো না, তা কি আমি—বলেই হাত দিয়ে সে আমার মুখখানা চেপে ধরলে।

সেই দিনই রাত্রে আমি তাকে বললুম,—দেখ অমিয়া, মায়ের ত এখন এই কষ্ট, তার চেয়ে কেন তাঁকে এইখানে, আমাদের কাছেই এনে রাখো না?

এ কথার ভিতর এমন কি ছিল জানি না, অমিয়া বিদ্যুদ্বেগে তার মুখখানি তুলে একেবারে আমার চোখো-চোখি চেয়ে রইল। আমি বললুম,—কি বল?

সে তার সেই অর্থহীন শূন্যদৃষ্টি বিছানার ওপর নামিয়ে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্পন্দ হ'য়ে বসে' রইল। পরে হঠাৎ দৃঢ়ভাবে ঘাড় নেড়ে বললে,—না, না, না,—

আমার বিস্ময়ের মাত্রা ক্রমশঃই বাড়ছিল। তার একখানি হাত আমার কোলের ওপর টেনে নিয়ে বলে' উঠলুম,—কেন, 'না' কেন অমিয়া? এ বাড়ীতে আর তো কেউ নেই, যে তাঁর কষ্ট হবে? তবে তুমি একথায় আপত্তি কচ্চ' কেন? এর কারণ তোমায় বলতেই হবে।

হঠাৎ আমার এই দৃঢ় কথায় তার সেই পাংশু মুখ-খানা আরও পাংশু হ'য়ে গেল। স্পষ্ট অনুভব করলুম,—আমার মুষ্টিবদ্ধ তার সেই পুষ্পপেলব হাতখানি আপনা-আপনি ভয়ঙ্কর রকম কাঁপছে। আমার সন্দেহ তখন শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে কোনরূপ সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা না করে' রুদ্ধনিশ্বাসে আবার বললুম,—বল, বল অমিয়া, কেন তুমি—?

এবার যেন সে আর নিজেকে সামলাতে না পেরে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললে,—কি বলবো গো, তোমায় আমি কি বলবো? মেয়ে হ'য়ে মায়ের কলঙ্কের কথা আমি কেমন করে' বলবো?

... ...আমার বুকে যেন কে সজোরে একটা ধাক্কা দিয়ে গেল। চোখের সামনে যেন কি-একখানা অস্পষ্ট মেঘ ভেসে উঠে আমার দৃষ্টি-শক্তি আচ্ছন্ন করে' দিলে। আমার দৃঢ়মুষ্টি হ'তে অমিয়ার হাতখানা খসে' পড়ে' গেল। ...অমিয়া বালিশে মুখ গুঁজে এক অতি নিদারুণ ভাষায় বলতে লাগলো,—না, না, আর আমি

তোমায় প্রতারণা করবো না। ... আমি—আমি একটা কুলটার মেয়ে! ...আমি তখন আট বছরের, আমার বিধবা মা আমাকে নিয়ে বাবার ঘর ছেড়ে ঐ লোকটার সঙ্গে পালিয়ে আসে...।

হঠাৎ সে থেমে পড়তেই মনে হ'ল, যেন সেই ঘরখানিতে পৃথিবীর সমস্ত নির্জীবতা এক মুহূর্ত্তে জমাট বেঁধে উঠেচে; যেন কোথাকার কত কুৎসিত কাহিনী নিমেষমধ্যে উড়ে' এসে ঘরের আষ্টেপৃষ্ঠে ছেয়ে ফেলেচে। অমিয়ার পানে চাইতে গিয়ে যেন আমার আপাদমস্তক শিউরে উঠ্‌ল।

ঠিক সেই সময় খোলা জানালা দিয়ে হঠাৎ খানিকটা দমকা বাতাস এসে বাতিদানের বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে গেল। মনে হোল,—অন্তর্য্যামী ভগবান আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে পরস্পরের মুখখানা ঢেকে রাখ্‌বার জন্যই বুঝি এই অন্ধকারটুকু পাঠিয়ে দিলেন।

৫

উঃ! সমস্ত বিশ্বজগৎ কি নির্ম্মম, কি হৃদয়হীন! কোথায় গেল সেই আলো, সেই সৌরভ, সেই কমনীয়তা যা' আমি একদিন এই পৃথিবীর সকল জিনিষটিতেই পরিস্ফুট দেখেছিলুম?

কিছু নেই,—আর কিছু নেই। আজ আমি বড় নিঃস্ব—বড় দীন। সংসারের সকলের উপর আমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেচি, বেঁচে থাকবার সবটুকু অবলম্বন যেন দিন-কে-দিন আমার বুকের ভেতর থেকে শুকনো ফুলের পাপ্‌ড়ির মত ঝরে ঝরে পড়্‌চে। মাঝে-মাঝে চম্‌কে উঠি, মনে হয়, এই নিঃস্বল জীবনের অস্তিত্বটুকু একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেছে; কেবল...এই যে আমি এই নির্জ্জন ঘরে নিশ্চল হয়ে বসে রয়েছি, এ একটা প্রেতাত্মা বই আর কিছুই নয়!...আর অমিয়া, কোথায় অমিয়া? অন্তরে-বাহিরে অন্ধের মত দু'হাত দিয়ে হাতড়ে বেড়াচ্চি, কিন্তু, সে আজ কোথায়—কোথায়? একই বাড়ীতে বাস, তবু দু'জনের দিনান্তে দেখা সাক্ষাৎ নেই! আর কেমন করেই বা থাকবে? কালবৈশাখীর নিষ্ঠুর ঝড়ে আমাদের দুজনের এই দুখানা খেয়া-তরীর মাঝখানে যে এক উত্তাল নদীর ব্যবধান পড়ে গিয়েছে। বুঝি, এরই দুরন্ত ঢেউয়ের নীচে উভয়েরই মগ্ন হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই!!

এক-এক করে' পুরো চারদিন কেটে গেল। সব স্থির—সব নিস্তব্ধ! সারা দিন-রাত্রি আমি এখন বহির্ব্বাটীতেই থাকি। মাঝে মাঝে আহারাদির জন্য যখন ভেতরে আসি, তখনই একবার চকিতে বাড়ীর এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি; সঙ্গে-সঙ্গে বুকের নীচে যেন কি একটা এলোমেলো অনুভূতি তোলপাড় করে' উঠে। কিন্তু, চোখ দুটো তাদের ব্যর্থ চাহনি নিয়ে প্রত্যাহত হয়ে ফিরে আসে। রাঁধুনী বামুন এসে সাম্‌নে খাবারের থালা এগিয়ে দিয়ে যায়, তবু অমিয়া আসে না। আমি তাড়াতাড়ি কোনরকমে এই আহারের পালা শেষ করে আবার বাইরের ঘরে ফিরে আসি।

সকাল হ'তে সারাদিন আজ অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়্‌চে। বাদ্‌লার এই কুৎসিত দিনটাতে আমার অবসন্ন মনখানা যেন আরও অনেকখানি এলিয়ে পড়্‌ছিল। কাছারীর কাজকর্ম্ম সেরে বাড়ীতে ফিরে কোনরকমে কাপড় জামা বদ্‌লেই বাইরের ঘরের কৌচখানায় এই শ্রান্ত দেহ বিছিয়ে দিয়েছিলুম। আজ নিজেকে যত দুর্ব্বল মনে হচ্ছিল, তত আর কোনদিনই হয়নি। সমস্ত বুকখানার নীচে ঐ শ্রাবণের আকাশের মতই ঘনঘটা করে এসেছিল। মনে হচ্ছিল, যেন ঠিক তারই মত অমনি একটা অশ্রান্ত বর্ষণ আমার পক্ষেও একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। হঠাৎ চাকরাণীটা এসে ডাক্‌লে,—বাবু, মা ডাক্‌চেন।

হঠাৎ বিশ্বাস হোল না। চম্‌কে উঠে বস্‌লুম। তারপর খানিকক্ষণ নিশ্চল হয়ে থেকে ধীরে ধীরে বল্লুম,—আচ্ছা যা, যাচ্চি—

ঘরের ভেতর ঢুকে দেখি, পশ্চিমের সেই বড় জানালাটা খুলে দিয়ে তারই ধারে খোলা মেঝের ওপর অমিয়া ঊর্দ্ধমুখে বসে রয়েছে। তার রুক্ষ এলো চুলের গোছা তার কোমর বেয়ে মাটীতে লোটাচ্ছে। দম্‌কা জলো বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে অজস্র বৃষ্টিকণা জান্‌লা দিয়ে এসে তাকে স্নান করিয়ে দিয়ে মেঝের অর্দ্ধেকটা পর্য্যন্ত ছেয়ে ফেল্‌চে। সেদিকে

তার কোনো সংজ্ঞাই নেই। আমি আরও কাছে সরে যেতে সে মুখ ফিরিয়ে বল্লে,—এসো।

মেঘ্লা দিনের অস্পষ্ট আলোয় তার মুখখানা ঠিক দেখা গেল না। আমি আস্তে আস্তে তার কাছে এসে বস্লুম। সে আবার তেমনি বাইরে আকাশের দিকেই চেয়ে রইল। বৃষ্টিকণাগুলো এসে আমার খালি গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে আমার তো সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হয়ে উঠল। থাকৃতে না পেরে বল্লুম—জান্লাটা বন্ধ করে দেবে কি? নিজে যা ভেজবার তাতো ভিজেইছ, আমিও যে—

হঠাৎ অতিমাত্রায় লজ্জিতা হয়ে সে উঠে জানালাটা বন্ধ করে দিলে। তারপর একখানা তোয়ালে এনে আমার মাথা ও গায়ের জল মুছিয়ে দেবার উদ্যোগ করতে আমি বাধা দিয়ে বল্লুম,—থাক্, এমন কিছু আমি ভিজিনি; বরং নিজে যে এতক্ষণ ঐখানে বসে বসে স্নান কর্‌লে, তারই একটা ব্যবস্থা কর।

আচ্ছা!—খুব মৃদুস্বরে এই কথাটী বলে সে তোয়ালেখানা রেখে দিয়ে খানিকক্ষণ চুপ্‌টী করে দাঁড়িয়ে রইল। পরে হঠাৎ মুখ তুলে বল্লে,—এ ক'দিনের পর আজ যে কেন তোমায় এখানে ডেকেচি, তা' তোমায় এখনো বলা হয়নি। আমার মাও মারা গিয়েছে। এই দেখ, টেলিগ্রাম।

টেলিগ্রামের হল্‌দে খামখানা সে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে একান্ত সহজস্বরে বল্লে—যে অন্ধকার, এতে তো দেখ্‌তে পাবে না। দাঁড়াও, আলোটা জ্বালি।...আমার সর্ব্বশরীর তখন পাষাণের মত নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল। সে বাতিদানটা জেলে আমার কাছে এনে ধর্‌তে নিঃশব্দে খামের ভেতরকার কাগজখানা পড়ে দেখ্‌লুম "Your mother died suicide. Last night" কাগজখানা হাত থেকে মাটীতে পড়ে গেল। অমিয়া সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বাতিদানটা নামিয়ে রেখে দিলে।

তারপর দু'জনে আমরা কতক্ষণ নীরব তা' বল্‌তে পারি না। আমার বুকের ভেতর তখন যেন আর কোন অনুভূতিরই স্থান ছিল না। শেষে কিন্তু, এই বিশ্রী অবস্থাটাকে বেশীক্ষণ সহ্য কর্‌তে না পেরে বল্লুম—তাহ'লে আমায় এখন কি কর্‌তে বল?

অমিয়া মুখ তুলে চেয়ে বল্লে,—তোমায়? তোমায় আর আমি কি বল্‌ব? তারপর খানিক চুপ করে থেকে বল্লে,—যা' বল্‌বার তোমায় তো সব বলিচি। আর, যে ভয়ে এতদিন ধরে তা' বল্‌তে সাহস হয় নি, সে কষ্টও এই সাত আটদিন ধরে সহ্য করিচি।

হঠাৎ তার এই সহজ গলার স্থির কথাগুলি যেন সোজাসুজি এসে ঠিক আমার এই হৃৎপিণ্ডের উপর বেত্রাঘাত করে' গেল। এতক্ষণে আমার পূর্ণদৃষ্টি তার মুখের পানে তুলে ধরেই চম্‌কে উঠ্‌লুম। কি এ! কি এ! অমিয়ার সেই ফুলের মত মুখখানির আজ এ কি ভীষণ পরিণতি! তার চোখদুটী নিষ্প্রভ—কোটরগত, গণ্ডের উপরকার হাড় দুখানা চাম্‌ড়া ভেদ করে' ঠেলে উঠেছে; সমস্ত মুখখানার ওপর নিয়তি যেন তার নিষ্ঠুর হাতে একরাশ কালী ঢেলে দিয়েছে। শুধু, সেই কপালের উপর সিঁথির মাঝখানে যে উজ্জ্বল সিন্দুররেখা জ্বল্‌জ্বল কর্‌চে, সেটা বোধ করি কোনো দিনই এত বেশী জ্যোতির্ম্ময় ছিল না।......আমি তাড়াতাড়ি তার একান্ত নিকটে সরে' এসে তাকে স্পর্শ করতেই পূর্ব্বের সে বিস্ময় একটা অবিমিশ্র ভীতিতে পরিণত হোল! অমিয়ার তখন রীতিমত জ্বর! তাড়াতাড়ি কি বল্‌তে যাচ্ছিলুম, কিন্তু অমিয়া বাধা দিয়ে তফাতে সরে' গিয়ে বল্লে,—না, না, না, তোমার পায়ে পড়ি গো, আর আমায় অমন করে' লোভ দেখিয়ো না। এ ক'দিনে আমি নিজেকে অনেকটা শক্ত কর্‌তে পেরেছি; নিজের পথ একরকম মনে-মনে বেছে নিইচি, এখন আর তুমি আমায় সে পথ থেকে টেনে নিও না।

আমি তাড়াতাড়ি দু'তিনটা ঢোঁক গিলে নিয়ে আবার কঠোর হ'বার চেষ্টা করে' বল্লুম,—তা বেশ। কিন্তু, কি পথ বেছে নিয়েছ' শুনি?

অমিয়া ধীরে-ধীরে এসে আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে' নতমুখে বল্‌তে লাগ্‌লো,—তুমি দেবতা, আমি হীনা, একথা তুমি-আমি দুজনেই তো বুঝেচি, আমাকে নিয়ে তোমার সংসার চল্‌তেই পারে না। কিন্তু, তবু তুমি আমার স্বামী! স্ত্রীর আসন থেকে আমি নেমে গিয়েছি, তুমি আর একজনকে এনে সে-আসনে প্রতিষ্ঠা কর।

তাতে আমার সুখ বই দুঃখ নেই। কিন্তু, ষ-টা দিন বেঁচে থাকি, ততদিন আমার এই দাসীর অধিকারটি থেকে আমায় বঞ্চিত ক'রোনা। নৈলে আমি কোথায় যাবো?

বাইরে ঝড়ো হাওয়ার মাতামাতিটা যেন আমার বুকের ভেতর পর্য্যন্ত এসে আছড়ে পড়তে লাগ্‌লো। অমিয়া যেখানটীতে যেভাবে বসেছিল, আর সেথান থেকে মুখ তুলে চাইলে না।' আমি তার পানে নির্নিমেষে চেয়ে-চেয়ে আকাশ-পাতাল কি ভাব্‌ছিলুম, কিছুরই স্থিরতা নেই। হঠাৎ কোন্ সময়, আমার ভেতরের সুপ্ত আত্মা বর্ষা-শেষের দীপ্ত সূর্য্যরশ্মির মত জেগে উঠে বুঝি আমার অজ্ঞাতেই চীৎকার করে উঠ্‌ল,—তা হবে না, তা হবে না অমিয়া! তোমার পথ আর আমার পথ কথনই ভিন্ন হ'তে পারে না। যতই তুমি চেষ্টা কর, এ বুকের বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে আমি তোমায় কিছুতে দোব না, কিছুতে না।

তারপর কি হ'ল, সংজ্ঞা ছিল না। যখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেলুম, তখন আমরা পরস্পরের আলিঙ্গনে বদ্ধ, দু'জনের তপ্ত অশ্রু একসঙ্গে মিশে অমিয়ার শুভ্র কপোল বেয়ে ধারাকারে গড়িয়ে পড়্‌ছে। বাইরে চেয়ে দেখি, সেই দিগন্তব্যাপী মেঘের যবনিকা ভেদ করে' অমল জ্যোৎস্নার ধারা ফুটে উঠেছে!

বিবেকানন্দের বাণী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীসুনীলিমা দেবী]

বিবেকানন্দ তাঁহার সমস্ত প্রচণ্ড চারিত্রিক বল দিয়া নিজ বাণীর মধ্যে এমন একটী অলৌকিক তেজের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন যে, প্রথম আমাদের সেই তেজকেই পূজা করিতে ইচ্ছা হয়, ভিতরকার অর্থটী আমরা ভুলিয়াই যাই। বজ্রগম্ভীর নির্ঘোষে বঙ্গের যুবক সম্প্রদায়কে তিনি আহ্বান করিলেন—"প্রথম আমরা ব্রহ্মত্ব লাভ করি আইস, পরে অপরকে ব্রহ্ম হইতে সাহায্য করিব। আপনি সিদ্ধ হইয়া অপরকে সিদ্ধ হইতে সহায়তা কর।......কাহারও প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইও না। সকল শুভকর্ম্মানুষ্ঠায়ীকেই সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক। ত্রিলোকের প্রত্যেক জীবের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা প্রেরণ কর।............গৃহ যদি অন্ধকার থাকে তবে সর্ব্বদা 'অন্ধকার' 'অন্ধকার' বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে অন্ধকার দূর হইবে না। আলো লইয়া আইস।.........ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নহে, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয় পতাকা লইয়া নহে, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর বেশ-সহায়ে, অর্থের শক্তিতে নহে, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে। বলিও না, তোমরা দুর্ব্বল; বাস্তবিক সেই আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্।...তোমাদের অভ্যন্তরীণ ব্রহ্মশক্তি জাগরিত কর, উহা তোমাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণ সমুদয় সহ্য করিতে সমর্থ করিবে।........আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, আমাদের সেই প্রাচীনা মাতা আবার জাগরিতা হইয়াছেন, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মহিমান্বিতা হইয়া পুনর্ব্বার নবযৌবনশালিনী হইয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছেন। শান্তি ও আশীর্ব্বাণী প্রয়োগ সহকারে তাঁহার নাম সমগ্র জগতে ঘোষণা কর।"

খৃষ্টানধর্ম্মের প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে স্বামীজীর বিশেষ বিবাদ ছিল। কারণ, খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক মানুষকে পাপী বলিয়া মনে করেন, এবং দুঃখকেই অথবা দুঃখ বহনকেই জীবনের চরমতম আধ্যাত্মিক আদর্শ বলিয়া মনে করেন, বিবেকানন্দ মানুষকে "অমৃতের পুত্র" বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। শিকাগোয় আশা ও উৎসাহের বার্ত্তা দিকে দিকে বিস্তার করিয়া তিনি মহিমাময়, সকল সংকীর্ণতা-শূন্য হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া হর্ষকম্পিত কণ্ঠে বলিয়া

উঠিলেন—"Children of immortal bliss—what a sweet, what a hopeful name! Allow me to call you brethern by that sweet name —heirs of immortal bliss,—yea, the Hindu refuses to call you sinners. Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings. Ye are divinities on earth. Sinners?—It is a sin to call a man so. It is a standing libel on human nature."

তাঁহার বৈদান্তিকতার মধ্যে এই যে আশার জলন্ত বহ্নি অনির্ব্বাণভাবে স্বামীজী আমাদের জন্য জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে যেন জগতের সমস্ত নৈরাশ্য ও দুর্ব্বলতা দূরে পলায়ন করে, তাহাতে যেন নিখিল নরনারীর মুমূর্ষু-প্রাণ নবসঞ্জীবনী সুধারসপানে নববল লাভ করে। কোনও পাপীরই যে হতাশ হইবার কারণ নাই, সকলেরই যে উদ্ধারের পথ সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রহিয়াছে—সে সহজ হউক বা দুরূহ হউক—এই আনন্দবাণী বিবেকানন্দ দৃঢ়কণ্ঠে সকলকে শুনাইলেন।

সামাজিক বিষয়ে বিবেকানন্দ যে সমস্ত পরিবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির মধ্যে একটী ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঐক্য কিসে?—ইহা স্বামীজীর প্রাণের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতম আকাঙ্ক্ষা তাঁহাতে, তাঁহার সমস্ত দেশবাসীকে মানুষ করিয়া তুলিবার চেষ্টায়। আমাদের সমাজে দিন দিন যে জড়ত্ব আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল এবং অনেক বিষয়ে আমাদিগকে নির্জ্জীব ও অসাড় করিয়া দিতেছিল সেই জড়ত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিতে তিনি অক্লান্তচেষ্ট বীরের ন্যায় সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। যাহা-কিছু জীবনকে সরস, উজ্জ্বল ও সতেজ করিয়া তুলিতে পারে, তাহাকে সাদরে তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে দেশের জীবন-ধারা সংকীর্ণতার বদ্ধপল্বলে আসিয়া ঠেকিয়াছে। যেখানে গতি চাই সেখানে শুধু স্তব্ধতা ও অচলতা আসিয়া জুটিলে যে মহা অকল্যাণের সূচনা হয় তাহার নিরাকরণ সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমাজ-সংস্কার। এই সূত্রই তাঁহার সমস্ত সামাজিক আলোচনার মূলকথা। সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই যে, বিবেকানন্দের সমাজ সংস্কারের আদর্শে অধুনাতন শিক্ষিত সমাজের সমস্ত প্রস্তাবগুলিই স্থান পাইয়াছে। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মসংস্কারকদিগের যে সকল সংকল্প, পশ্চিম ভারতের আর্য্য সমাজীদের যাহা যাহা চেষ্টা, দক্ষিণভারতের প্রার্থনা সমাজের যে সমস্ত উদ্যোগ, সেগুলির প্রায় সমস্তই স্বামীজী স্বীকার করিয়া তাঁহার দেশবাসীকে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এইটুকুই কৃতীত্ব যে, তিনি সমাজের প্রাণস্পন্দন সঠিক ধরিতে পারিয়া একেবারে সমাজের প্রাণের উৎসমূলে গিয়া সেখানে নূতন চেতনা দিবার চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সহজ কথায়, তিনি বুঝিলেন যে, হিন্দুসমাজ ধর্ম্মের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সুতরাং যদি সমাজের প্রণালীকে দেশের উপযোগীভাবে পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের দিক দিয়াই তাহা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া এই পরিবর্ত্তনকে ফলবান ও কার্য্যকরী করিতে হইলে তাহা ক্রমবিকাশের পথে চালাইতে হইবে; বিপ্লব আনয়ন করিলে চলিবে না, ক্রমশঃ সহাইয়া সহাইয়া পরিবর্ত্তনকে সকলের মতগ্রাহ্য করাইয়া লইতে হইবে, এবং উহাকে জীবনের কতকগুলি মূলসূত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। এইজন্যই আমরা বিবেকানন্দকে এত সহজেই আমাদের আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছি। এই ধরুন, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যে মত পোষণ করিতেন তাহা কি চমৎকার অবস্থানুযায়ী ছিল! তিনি স্পষ্ট বুঝিতেন যে দেশের অর্দ্ধেক অধিবাসী—দেশের নারী-সমাজ—বহুকালাগত আচারাবর্ত্তে পড়িয়া নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলে চলিবে না; যাহাদের পিতা, স্বামী, ভ্রাতা ও পুত্রগণ নবযুগের নূতন পথের পথিক হইয়াছে এবং নবোদ্যমে জীবনযাত্রাকে সুসংস্কৃত করিতে প্রয়াস পাইতেছে, তাহাদিগের কন্যা, পত্নী, ভগিনী ও জননীরা বিগত কালের বহুধূলিসমাকীর্ণ ভগ্নপ্রায় সংস্কারস্তূপের উপর চিরদিন বসিয়া থাকিলে, জাতির জীবনকে পঙ্গু ও শক্তিহীন করা হইবে—এ সত্যটী তাঁহার মনে অত্যন্ত তীব্রভাবে জাগ্রত ছিল। তিনি পুরাতনকে যেমন গভীরভাবে শ্রদ্ধা করিতেন, নূতনের

দাবীকেও তেমনই অকুণ্ঠিতভাবে মানিয়া লইতেন। যদিও পাশ্চাত্য ভাব তাঁহার সামাজিক মতগঠনে সহায়ক হইয়াছিল, তথাপি অন্ধ অনুকরণ চেষ্টাকে তিনি সর্ব্বতোভাবে গর্হিত ও নিন্দনীয় মনে করিতেন। তাঁহার বেলুড়মঠের স্ত্রীশাখাকে এইজন্য আজকালকার সাধারণ বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাঁচে সংগঠিত করিবার কিছুমাত্র বাসনা তাঁহার ছিল না। পরানুকরণকে তিনি এইজন্য বিশেষ হেয় মনে করিতেন, কারণ তাহা স্বশক্তিতে বিশ্বাসহীনতার পরিচায়ক। সকলের চেয়ে যেটা তাঁহার বড় কথা তাহার দ্যোতনাই এই অনুকরণবিমুখতার মূলে। এই বড় কথাটী তাঁহার ধর্ম্মবাণীতে আমরা দেখিয়াছি,—তিনি প্রত্যেক মানবকে চৈতন্যময় বিপুলবলবীর্য্যের আধার স্বরূপ এক একটী জলন্ত ব্রহ্মসত্বার কণিকা বলিয়া স্বীকার করিতেন, "অমৃতের পুত্র" বলিয়া কলুষলিপ্ত মহাপাপীকেও তিনি সম্বোধন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এই ঋষি বাক্যটী তাঁহার সমস্ত উপদেশ-বাণীর বীজমন্ত্র বলিয়া আমরা ধরিতে পারি। "আবার তোরা মানুষ হ" এই তেজের বাণী দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় তিনিও ঘুরিয়া ফিরিয়া বহুবার নানা ভাষায় দেশের কর্ণে শুনাইয়াছেন। "হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?.........ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ে'র জন্য বলি-প্রদত্ত, ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র, ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত, —"হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।" যাঁহার প্রাণ দেশের দুঃখে সত্য সত্যই কাঁদে, তাঁহার মুখে আমরা যে উৎসাহবাণী শুনিতে পাই তাহা যেন জলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় স্ফুরিত ও সহস্র জ্বালাময়ী জিহ্বা বিস্তার করিয়া মানসগগনে চিরদীপ্যমান থাকে; বাইবেল-বর্ণিত Holy Ghost যেন তাঁহার রসনায় আসিয়া অধিষ্ঠিত হন। স্বামীজীর শিষ্যগণ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি দেশের জন্য বহু রজনী অশ্রুপাত করিয়া কাটাইয়াছেন। সেই অশ্রুপাত হইতে যে শত শত কল্যাণের ধারা তাঁহার দেশবাসী নরনারীকে অভিষিক্ত করিতে ধাবিত হইয়াছে তাহার পুণ্যসলিলে অবগাহন করিয়া আজ ভারতের সকল প্রদেশের লোক কৃতকৃতার্থ।

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মত এই ছিল যে, প্রত্যেক নারীকে শিক্ষিত কর, কিন্তু হিন্দু নারীকে অহিন্দু করিয়া তুলিও না, তাহার জাতীয়ত্ব ভুলাইও না, তাহার নারীত্ব হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিও না। সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর আদর্শ তাহার গৃহস্থ-জীবনের আদর্শ হউক; গার্গী, মৈত্রেয়ী ও অরুন্ধতির আদর্শ তাহার তপস্বিনী-জীবনের আদর্শ হউক। ভগিনী নিবেদিতা এ বিষয়ে বিশদভাবে তাঁহার মতের আলোচনা করিয়াছেন। কলিকাতায় বাগ্‌বাজারের একটী ক্ষুদ্র গলিতে এই স্বর্গীয়া মহাপ্রাণা পাশ্চাত্য মহিলার যে বালিকাবিদ্যালয়টী ছিল, যাহার ভিতর দিয়া নিবেদিতার প্রাণ উৎসুক হইয়া হিন্দু-নারীসমাজকে আপনার করিয়া লইতে আজীবন ব্যাকুল ছিল, সেই সামান্য শিক্ষালয়টুকু ছাড়া আমরা যদিও স্বামীজীর স্ত্রী-শিক্ষা প্রচেষ্টার বিশেষ কিছু নিদর্শন পাই না, তথাপি তাঁহার স্ত্রী-শিক্ষাবিষয়ক উপদেশকে আমরা ঐটুকুর মধ্য দিয়াই স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি।

জাতিভেদ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মত যে উদার হইবেই তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি কোন বিষয়েই বাঁধাবাঁধির বা সংকীর্ণতার ভিতরে যাইতে চাহেন নাই। সে জন্য এ বিষয়েও তিনি সপক্ষে কিংবা বিপক্ষে কিছুই সুস্পষ্ট মত

প্রকাশ করিয়া যান নাই; তবে এইটুকু, আমাদের মানিয়া লইবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বংশগত জাতিভেদ, গুণকর্ম্ম বিভাগানুযায়ী না হইলে তাহা অন্যায় ও অসত্য হইয়া পড়ে ইহাই তিনি মনে করিতেন। তিনি এ কথা অনেকবার বলিয়া গিয়াছেন যে, সকল দেশেই, সকল সমাজেই, সকল যুগেই কোন না কোন প্রকারের জাতিভেদ ছিল; এবং ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথার এইটুকু অন্ততঃ গৌরব করিবার আছে যে, প্রথম যখন তাহা প্রবর্ত্তিত হয় তখন তাহাতে পার্থিব ধনসম্পদের তারতম্য বা অন্য কোনও বৈষয়িক বিষয়ে প্রভেদের নামগন্ধ ছিল না, তাহা শুধু মানসিক ও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চরিত্রগত পার্থক্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল।

"চতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ"—গীতায় শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির প্রকৃত তথ্যই যে জাতিভেদ প্রথার মর্ম্মকথা, তাহা এ বিষয়ে যিনিই ধীর ভাবে ও পক্ষপাতিত্ব বর্জ্জন করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সুতরাং আজকালকার প্রচলিত জন্মগত জাতিভেদ যে নূতন যুগের শিক্ষার সাম্য-নীতির বিরোধী তাহা স্বামীজী উত্তমরূপেই বুঝিয়াছিলেন।

স্বামীজী মানসচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, ইতিহাসের যে নূতন দৃশ্যপট ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হইতেছে, তাহাতে পৃথিবীর শূদ্রজাতির প্রাধান্য ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিবে, তাহাতে আভিজাত্যমূলক জাতি-শ্রেষ্ঠতা বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।

বিবেকানন্দ "জনসাধারণ"কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। যাহারা অজ্ঞানের ঘনান্ধকারে আবৃত, যুগযুগান্তব্যাপী পেষণে যাহাদের বলবীর্য্য সম্পূর্ণ নিষ্পিষ্ট অথচ যাহারা পৃথিবীর মেরুদণ্ড স্বরূপ, যাহারা আমাদিগকে শস্য উৎপাদন করিয়া খাওয়াইতেছে, কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করিয়া আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতেছে, যাহারা স্বয়ং অশুচি হইয়া জগতের শুচিতা রক্ষা করিতেছে, সেই হীন "অস্পৃশ্য" নিম্ন জাতিভুক্ত লোকদিগের, চণ্ডালদিগের জন্য তাঁহার হৃদয়ের করুণার অপার ভাণ্ডার সর্ব্বদা উন্মুক্ত ছিল। উহাদিগকে শিক্ষাদানের দ্বারা উন্নত করিতে হইবে, ইহা তাঁহার জীবনের একটী মুখ্য আকাঙ্ক্ষা ছিল।

এই সম্পর্কেই তিনি তাঁহার বিরাট্ সেবাধর্ম্মের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। আজ বিবেকানন্দের নাম আমাদের এই পুণ্য দেশের বহু বিভিন্ন স্থানে তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমগুলির তোরণে তোরণে অক্ষয় স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হইয়া রহিয়াছে। রামকৃষ্ণদেব আর্ত্ত মানবকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দের এই সেবামূলক আদর্শ দয়ার ভিত্তির উপর তিনি স্থাপিত করেন নাই। তিনি লোকসেবাকে প্রেমের মহিমাময় মঞ্চের উপর অধিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আর একটী কথা, সেবাকে স্বামীজী নিষ্কামভাবে, অর্থাৎ সেবার ফলাফলের অপেক্ষা না করিয়া, আপনার কর্ত্তব্যরূপে বরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে বলিতেন, হাঁসপাতাল কি অনাথাশ্রম স্থাপন করিয়া যদি জগতের দুঃখ ঘুচাইতে চাও, তাহা হইলে সে আশা বৃথা; দুঃখ জগতে থাকুক্ ইহাই বিধাতার বোধ হয় অভিপ্রেত; শুধু দুঃখ দূরীকরণের চেষ্টায়, অর্থাৎ লোক-সেবায় সেবকের চিত্তশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে—ইহাই সেবার একমাত্র ফল বলিয়া ধরিতে হইবে। ইউরোপের যেখানে যেখানে এবং যখন যখন মানুষ আত্মত্যাগের মহত্তম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, সেখানে তাহার চেষ্টা এই জন-সেবাকেই আশ্রয় করিয়াছে। খৃষ্টানধর্ম্মের মূলভিত্তি দুঃখীর প্রতি করুণা প্রদর্শন ও তাহার অক্লান্ত সেবা। কিন্তু আমাদের দেশে আধ্যাত্মিকতা ঠিক এই সেবার মধ্যেই কোন দিন পর্য্যবসিত হয় নাই; তাহা নীরবে, নির্জ্জনে আত্মসমাহিত ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। স্বামীজী এই দুই বিভিন্ন আদর্শের সামঞ্জস্য করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মঠের প্রত্যেক অধিবাসী ব্রহ্মপিপাসু মুক্তিপিয়াসী যোগী হইবে, অথচ করুণায় উচ্ছ্বসিত হৃদয় এবং জগত-সেবায় সমর্পিত দেহ লোকসেবক হইবে, ইহাই তাঁহার অভিলাষ ছিল।

বিবেকানন্দকে আর এক দিক দিয়া দেখা যাউক,—তাঁহার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই ভিন্নমুখী সভ্যতা ধারা সম্মিলন-চেষ্টার দিক দিয়া। তিনি বলিতেন, ভারতবর্ষ

নিখিল জগদ্বাসীর আধ্যাত্মিক গুরু হইবে, কিন্তু তাহাকেও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের রাজসিক উন্নতিপ্রবর্দ্ধক ভাবগুলি শিক্ষা করিতে হইবে। যে দেশে সর্ব্বদা ক্ষুধিতের একমুষ্টি অন্নের জন্য কাতর হাহাকার, নানা রোগ শোক, ব্যাধি, নৈরাশ্যের সহিত অবিরাম যুদ্ধ, ইহাই চতুর্দ্দিকে শ্রুত ও দৃষ্ট হয়, সে দেশে সর্ব্বাগ্রেই সত্বগুণের চর্চ্চার কথা বলিতে যাওয়া, মুক্তির পথনির্দ্দেশ করিতে যাওয়া, দেশের দুঃখের প্রতি নিষ্ঠুর পরিহাস মাত্র। তাই স্বামীজী প্রথমেই মানুষকে শারীরিক সামর্থ্যে বলবান করিতে বলিয়াছেন, তাহার পর তাহার আত্মার শক্তিকে উদ্বোধিত করিলেই চলিবে। এইজন্য অনেকে বিবেকানন্দকে ভারতের বর্ত্তমান জাতীয়ত্বভাবের মন্ত্রগুরু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাস্তবিক, সমস্ত দেশকে নব জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ ও নব প্রাণে অনুপ্রাণিত করিতে তাঁহার উপদেশাবলীর মত এমন আর কিছুই নাই। তাঁহার এক একটী কথায় যেন বিরাট্ সমুদ্রকল্লোলের অন্তহীন গাম্ভীর্য্য, অথচ একটী সমগ্র সেনাদলকে সমরে প্রাণবলি দিতে প্রণোদিত করিতে পারে এমন উন্মাদনানিষ্যান্দনী তূর্য্যধ্বনির তীব্রতায় তাঁহার প্রত্যেক কথাটী পরিপূর্ণ। তিনি কিন্তু বাহিরের বলকেই, দৈহিক বলকেই পাশ্চাত্য জড়বাদীর ন্যায় কখনও অসঙ্গত ভাবে বড় করিয়া দেখেন নাই; আত্মার শক্তিকে, ভিতরকার প্রাণের জোরকেই তিনি তাহার প্রাপ্য শ্রেষ্ঠতর আসন দিয়াছেন। তাই যাঁহারা তাঁহাকে বর্ত্তমান রাজনৈতিক বিপ্লববাদীদের উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারা এই হিন্দু যোগীর ও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর আদি কথাটাই ভুল করিয়া বুঝেন।

সর্ব্বশেষে তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আর একটী আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের কথা পুনরুত্থাপন করি। তিনি হিন্দু ধর্ম্মকে 'প্রচারশীল' বা 'মিশনারী' ধর্ম্মরূপে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হিন্দুত্বের সংজ্ঞা যে কিরূপ উদার ছিল, তাহা বারংবার বলিয়াছি, কিন্তু এতদূর হয়ত বলি নাই যে, ভারতীয় জাতিত্ব ও হিন্দুত্ব তাঁহার নিকট প্রায় সমার্থজ্ঞাপক ছিল। স্বামীজী বলিতেন,—ব্রাহ্ম বা আর্য্যসমাজভুক্ত বলিয়াই যে একজন হিন্দু নয় ইহা হাস্যকর ধারণা। শিখ 'খালসা'কেও তিনি হিন্দুধর্ম্মেরই অন্তর্গত একটী খুব সুগঠিত সম্প্রদায় বিশেষ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মতে আমাদের ধর্ম্মের মূল প্রবাহকে কালানুযায়ী তিনটী ধারায় বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমটী বহুকালাগত পরিবর্ত্তনবিরোধী "গোঁড়া" ধর্ম্মমত, দ্বিতীয়টী মুসলমান শাসনকালীন নানক, কবীর প্রভৃতি যে ধর্ম্মসংস্কারকগণের আবির্ভাব হয়, তাঁহাদের উপদেশ বাণী, এবং তৃতীয়টী আধুনিক সময়ে যে ধর্ম্ম সংস্কার প্রচেষ্টা হইয়াছে বা হইতেছে তাহাদের মূল সূত্রসমষ্টি। কিন্তু এ সকলকেই বিবেকানন্দ হিন্দু বলিতেন। জৈনেরা যে হিন্দু তাহা সকলে সহজেই স্বীকার করিয়া থাকেন, স্বামীজী অবশ্যই করিতেন। স্বামীজীর মুসলমানদিগের মধ্যেও শিষ্য ছিল, এবং ভারতীয় খৃষ্টান সমাজ যে ভবিষ্যতে হিন্দুজাতির বিরাট্ সংঘের মধ্যেই স্থান পাইবে, একথাও তিনি দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত বলিয়া গিয়াছেন। ইসলামধর্ম্মের প্রতি বিবেকানন্দের গভীর প্রীতি ও ভক্তি ছিল। এই ধর্ম্মের সকল মানবের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বভাব প্রচারের দিকটাই তাঁহাকে প্রধান ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। আর ভারতের মুসলমানগণের এদেশকে একটী গুণ শিক্ষা দিবার কথা তিনি ভুলেন নাই,—তাহারা প্রথমতঃ ত বহু নিম্নশ্রেণীকে সামাজিক হিসাবে অনেকাংশে তুলিয়া দিয়াছে, এবং দ্বিতীয়তঃ হিন্দুজাতির মত নিরীহ ও শান্ত জাতিকে কিরূপে দলবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম করিতে হয়, নির্ভীকভাবে বাধা দিতে হয়, তাহা শিখাইয়াছে। আবার বলি, আজ বিবেকানন্দের কথা ভাবিতে গেলে, এবং তিনি যে বাণী তাঁহার দেশবাসীকে শুনাইয়াছেন তাহার অনুধাবন করিতে গেলে প্রথমেই মনে আসে তাঁহার বলের পূজা, সামর্থ্য ও শক্তি ও নির্ভীকতার প্রতি তাঁহার প্রাণের সদা উচ্ছ্বসিত ও অবিচলিত গভীর শ্রদ্ধা। ধর্ম্মে ও সমাজে, রাজনীতিক্ষেত্রে ও সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি বারবার ইহাই কামনা করিয়াছেন যে, তাঁহার দেশবাসীরা স্বীয় সামর্থ্যে বিশ্বাসবান্ হইয়া জাগিয়া উঠুক,—তাহারা আত্মার অমিত তেজকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সকল নৈরাশ্য, সকল দুর্ব্বলতাকে সজোরে অবসারিত করিয়া ফেলুক। "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত,

প্রাপ্য বরান্নিবোধত"—"Awake, arise and stop not till the goal is reached"—এই দুন্দুভি-নিনাদোপম বাণী তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং দেশের ক্ষণে ক্ষণে মুহ্যমান প্রাণকে বারংবার সচেতন করিতেছে, আশা ও উৎসাহের অবিশ্রান্ত ফুৎকারে দেশের নির্ব্বাণপ্রায় উদ্যোগবহ্নিকে নবতেজে জ্বলন্ত, আকাশলেহী পাবকশিখায় পরিণত করিতেছে। তিনি এইজন্য বিশেষ কোনও নিয়ম প্রণালী বা কোনও অপরিবর্ত্তনীয় মতামত প্রকাশ করিয়া যান নাই,—কারণ তিনি বলিতেছেন যে আগে সুপ্তি ভঙ্গ হউক,—প্রাণ স্বশক্তিতে স্থির প্রতিষ্ঠিত হউক,—তাহার পর প্রণালী উদ্ভাবন আপনিই আসিয়া পড়িবে, মতভেদের আপনা হইতেই মীমাংসা হইয়া যাইবে। তাই দূর আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে তাঁহার উদ্দীপনাময় আহ্বানে বহু নরনারী ছুটিয়া আসিয়াছিল এবং এখনও আসিতেছে। বিবেকানন্দ সকল সংকীর্ণতার উর্দ্ধে ছিলেন বলিয়াই তাঁহার বাণী আজ এত সর্ব্বগ্রাহ্য এবং এত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে।*

দুর্গেশনন্দিনী।

"বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের নাম আজি বিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু ৫৮ বৎসর পূর্ব্বে যখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশ-নন্দিনী" লইয়া বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত সমালোচকগণ কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত শ্লেষবাণ তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় নাই এমন নহে। যে কয়েকজন সহৃদয় সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রশংসা-দ্বারা প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'রহস্য সন্দর্ভ'-সম্পাদক প্রত্নতত্ত্ববিশারদ ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অন্যতম। 'রহস্য সন্দর্ভে'র সমালোচনা প্রশংসাপূর্ণ বলিয়া কেবল অন্ধ স্তাবকতায় পূর্ণ নহে। উহা পাঠ করিলে সমালোচনা কিরূপ নির্ভীক ও পক্ষপাত-বিহীন হওয়া উচিত তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। আমরা পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্ত্যর্থে নিম্নে 'রহস্য সন্দর্ভে' প্রকাশিত 'দুর্গেশনন্দিনী'র সমালোচনাটি পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

বিলাতে প্রবাদ আছে যে এতদ্দেশীয় মনুষ্যের কল্পনা-শক্তি যেরূপ বলবতী এমত আর কোন দেশীয়ের নাই। বোধ হয় পুরাণাদির আখ্যায়িকা ও পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশাদি উপন্যাস গ্রন্থের উদ্দেশে এই প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। পরন্তু নব্য বাঙ্গালী গ্রন্থ দেখিলে সে কল্পনা-শক্তির কোন চিহ্নও এতদ্দেশে দেখা যায় না, প্রত্যুত বঙ্গদেশে কল্পনা-শক্তির তিরোভাব হইয়াছে বোধ হয়; যে কোন গ্রন্থ নূতন হইতেছে তৎসমুদায়ই এক আদর্শের অনুকরণ সর্ব্বত্র প্রতীয়মান হয়। বাঙ্গালাতে যত গদ্য কাব্য হইয়াছে তৎ-সকলই প্রায় বিদ্যাসুন্দরের ছায়াস্বরূপ বোধ হয়; এবং সেই বিদ্যাসুন্দরও সংস্কৃত চৌর পঞ্চাশতের অনুকরণ মাত্র। ফলে এখনকার গ্রন্থকারেরা আমাদিগের এক প্রাচীনা কুটুম্বিনীর সদৃশ বোধ হন। ঐ কুটুম্বিনীর নিকট আমরা বাল্যকালে "রূপকথা" শুনিতাম, এবং তিনি প্রত্যহ আমা-দিগকে কহিতেন "এক রাজার দুই রাণী, সো আর দো, সোকে রাজা বড় ভালবাসিতেন, দোকে দেখিতে পারি-তেন না।" তিনি এক দিবসের নিমিত্তেও এই উপাখ্যানের অন্যথা করিতেন না, নব্য গ্রন্থকারেরাও সেইরূপ আদর্শের অন্যথা করিতে বিমুখ। রত্নাবলীতে শ্রীহর্ষ নায়কের আদর্শ স্বরূপে বৎসরাজকে পৌরুষ-বিহীন অল্প-বুদ্ধি রোদনশীল কামাতুর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তদবধি সেই ভাব নায়ক-মাত্রেতেই দৃষ্ট হয়, কুত্রাপি অন্যথা দেখা যায় না। এই প্রযুক্ত আমরা বঙ্গীয় সাময়িক পত্রের সম্পাদক হইয়াও বাঙ্গালী গদ্য-কাব্য পাঠে অত্যন্ত অনুরাগ-বিহীন। পরন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করায় সে বিরাগের দূরীকরণ হইয়াছে। আমরা তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহার কল্পনা, গ্রন্থন, রচনা, সকলই নূতন প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং তাহাতে কাহাকেই চর্ব্বিত-চর্ব্বণের ক্লেশ পাইতে

* কটক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শরৎচন্দ্র রৌপ্য পদক প্রাপ্ত।

হয় না। যাঁহারা ইংরাজি গদ্য-কাব্য পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মনে দুর্গেশনন্দিনীর অনেক স্থানে ইংরাজি নবেলের প্রতিভা লক্ষ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রতিভার কোন বিশেষ হানি হয় না। যাঁহারা নূতন সরস মনোমুগ্ধকর গল্পের অনুযায়ী; যাঁহারা বীর্য্যবৎ বাক্যের আদরকারী; যাঁহারা বিনানুপ্রাসে রচনার চাতুর্য্য হইতে পারে এমত জ্ঞান করেন; যাঁহারা মহদ্গুণে পরিতৃপ্ত হন, তাঁহারা দুর্গেশনন্দিনীতে আপন আপন অভীষ্টসিদ্ধ করিতে পারেন; কারণ ইহা তাঁহাদের সকল অভীষ্টের সম্যক্ প্রকারে পোষক, সন্দেহ নাই।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য গল্পটী সমস্ত অলীক নহে। ইহার মূল আখ্যায়িকাটি জাহাঁনাবাদে অদ্যাপি ইতিবৃত্ত বলিয়া প্রচলিত আছে, তাহারই সম্প্রসারণ করিয়া গ্রন্থকার আপন গল্পটী সম্পন্ন করিয়াছেন। আমরা ঐ ইতিবৃত্ত শ্রুত হই নাই, অতএব বর্ত্তমান গল্পের কি পর্য্যন্ত ইতিবৃত্তমূলক ও কোন অংশই বা কল্পিত তাহার নিরূপণ করণে অক্ষম। গল্পের স্থূল তাৎপর্য্য এই যে তিন শত বৎসর হইল জাহাঁনাবাদের নিকট গড়মান্দারণ নামক দুর্গ বীরেন্দ্র সিংহ নামা একজন রাজপুত্র প্রধানের অধিকারে ছিল। তাঁহার কন্যা তিলোত্তমা বিমলা নাম্নী সহচরী সমভিব্যাহারে একদা গ্রামপ্রান্তে এক মহাদেবের মন্দিরে সন্ধিপূজার উপলক্ষ্যে গিয়াছিলেন, এমত সময়ে কাল-বৈশাখীর এক ঝড় আসাতে তাঁহাদের শিবিকাবাহক ও পরিচরবর্গ তাঁহাদিগকে সে মন্দিরে ফেলিয়া পলায়ন করে। তাঁহারা ভয়ে ভীতা হইয়া মন্দিরমধ্যে দ্বাররুদ্ধ করিয়া আছেন এমত সময়ে সুবিখ্যাত মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ পথভ্রমে আপন সৈন্য হইতে পৃথক্ হইয়া ঝটিকার দুর্যোগ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত ঐ মন্দিরে উপস্থিত হন। ঐ অবকাশে তিন জনের সাক্ষাৎ হয় এবং ঐ প্রথম দৃষ্টিতেই তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের পরস্পর অনুরাগ উৎপন্ন হয়। ঐ সাক্ষাৎ সময়ে তিলোত্তমা আপনার পরিচয় দেন নাই, কিন্তু তাঁহার সহচরী এক পক্ষ পরে রাজকুমারকে ঐ মন্দিরমধ্যে আসিয়া তিলোত্তমার পরিচয় দিবার অঙ্গীকার করেন। পক্ষান্তে ঐ অঙ্গীকার রক্ষার সময় রাজকুমার অত্যন্ত অনুরাগ প্রকাশ করাতে বিমলা তাঁহাকে সেই রাত্রিতেই তিলোত্তমার নিকট লইয়া যাইতে স্বীকৃত হন। বিমলা প্রত্যক্ষতঃ পরিচারিকারূপে থাকিতেন, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি বীরেন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী এবং তিলোত্তমার বিমাতা ছিলেন। দুর্গমধ্যে তাঁহার বিলক্ষণ আধিপত্য ছিল, এবং তন্মধ্যে যাতায়াতের এক গুপ্ত দ্বারের চাবি তাঁহার নিকট থাকিত। ঐ চাবির সহকারে তিনি দুর্গমধ্যে রাজকুমারকে আনয়ন করেন; কিন্তু কিঞ্চিৎ অসাবধানতা প্রযুক্ত ঐ অবকাশে বীরেন্দ্রের শত্রু জনৈক পাঠান সৈন্যাধ্যক্ষ কএকজন সহচর সমভিব্যাহারে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুর্গ অধিকৃত করত বীরেন্দ্রকে বধ ও তাঁহার স্ত্রী কন্যা ও জগৎসিংহকে বন্দী করে। এতদবস্থায় কিয়দ্দিবস গত হইলে বিমলা পাঠানদিগের প্রধান কতলুখাঁকে গোপনে বধ করিয়া আপন ও তিলোত্তমার উদ্ধার করেন। তদনন্তর কিয়ৎকাল ক্লেশভোগের পর জগৎসিংহ তিলোত্তমাকে বিবাহ করেন। এই গল্পের বিন্যাসে অনেক প্রকার অকস্মাৎ ঘটনার উল্লেখ হইয়াছে, তাহাতে পাঠকদিগের মনকে একান্ত বশীভূত করে, এবং গ্রন্থ পাঠ-সমাপ্তি পর্য্যন্ত গ্রন্থত্যাগের মানসকে এক কালে দূরীভূত করে। গল্পের মুখ্য পদার্থ আদিরস হইলেও তাহার কুত্রাপি অসহনীয় বর্ণন হয় নাই, ও স্থানে স্থানে উপহাস বর্ণনদ্বারা চিত্ত বিস্ফারণের উপায় করা হইয়াছে।

গ্রন্থকারের বর্ণনা-শক্তি বিলক্ষণ বলবতী এবং যে কোন বিষয়ের আদর্শ শব্দে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাই মনোজ্ঞ বোধ হয়। নায়িকার রূপ বর্ণনা গ্রন্থকারদিগের এক প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু এতদ্দেশের নব্য প্রচলিত প্রথায় তিল কলা তাল বেল প্রভৃতি কএক ফলমূলের সমাহার করিলেই তাহা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, কেহই তাহার পরিবর্ত্তন করেন না। বঙ্কিমবাবু তাহার অন্যথায় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধ সঙ্কল্প হইয়াছেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত তিলোত্তমার রূপবর্ণনে প্রতীত হইবে।

"তিলোত্তমা সুন্দরী। পাঠককে সুন্দরীর রূপানুভব করাইতে বাসনা করি, কিন্তু কিরূপে সে রূপরাশি অনুভূত করাইব? পাঠক! কখন কি কিশোর বয়সে কোন স্থিরা, ধীরা, কোমল-প্রকৃতি কিশোরীর নবসঞ্চারিত লাবণ্য প্রেম-

চক্ষে দেখিয়াছেন? একবার মাত্র দেখিয়া চিরজীবন মধ্যে যাহার মাধুর্য্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; কৈশোরে, যৌবনে, প্রাগল্‌ভ্য বয়সে, কার্য্যে, বিশ্রামে, জাগ্রতে, নিদ্রায়, পুনঃ ২ যে মনোমোহিনীমূর্ত্তি স্মরণপথে স্বপ্নবৎ যাতায়াত করে, অথচ তৎসম্বন্ধে কখন চিত্তমালিন্য-জনক লালসা জন্মায় না, এমন তরুণী দেখিয়াছেন? যদি দেখিয়া থাকেন, তবেই তিলোত্তমার অবয়ব মনোমধ্যে স্বরূপ অনুভূত করিতে পারিবেন। যে মূর্ত্তি সৌর্য্যপ্রভা প্রাচুর্য্যে মনঃ প্রদীপ্ত করে, যে মূর্ত্তি লীলা লাবণ্যাদির পারিপাট্যে হৃদয় মধ্যে বিষধর দন্ত রোপিত করে, এ সে মূর্ত্তি নহে; যে মূর্ত্তি কোমলতা, মধুরতাদি গুণে চিত্তের সন্তুষ্টি জন্মায়, এ সেই মূর্ত্তি। যে মূর্ত্তি সন্ধ্যাসমীরণ-কম্পিতা বসন্তলতার ন্যায় স্মৃতি মধ্যে দুলিতে থাকে, এ সেই মূর্ত্তি।"

পরন্তু তিনি যে কেবল পূর্ব্ব প্রথার পরিহার করিয়াছেন এমত নহে; পূর্ব্ব প্রথার শ্লেষে আশমানির রূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও অনুপযুক্ত হয় নাই। আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে সেই বাক্যগুলি এই স্থানে উদ্ধৃত করিব, কিন্তু তন্মধ্যে কএকটা স্পষ্ট বর্ণনা থাকা প্রযুক্ত আমাদিগের স্ত্রী পুত্রাদির পাঠ্য সন্দর্ভে তাহা গ্রহণীয় হইল না। পরন্তু তাহার গৌরচন্দ্রিকা স্বরূপে যে শ্লেষ ও বক্রোক্তি পূর্ণ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে তাহার পাঠে অনেকে হর্ষোৎফুল্ল হইবেন বিবেচনায় তাহা এইস্থলে পরিগৃহীত হইল।

"হে বাগ্‌দেবি! হে কমলাসনে! শরদিন্দুনিভাননে! অমল-কমল-দল-নিন্দিত-চরণ-ভক্ত-জন-বৎসলে! আমাকে সেই চরণ কমলের ছায়া দান কর; আমি আশ্মানির রূপ বর্ণনা করিব। হে অরবিন্দাননসুন্দরী-কুল-গর্ব্ব-খর্ব্বকারিণি! হে বিশাল-রসাল-দীর্ঘসমাস-সঙ্কুল-সৃষ্টি-কারিণি! একবার পদ-নখের এক পার্শ্বে স্থান দাও, আমি রূপ বর্ণনা করিব। হে পণ্ডিত কুলেপ্সিত-পয়ঃ প্রস্রবিণি! হে মূর্খ জনপ্রতি-কচিৎ-কৃপাকারিণি! হে অধমতারিণি, হে অঙ্গুলি-কণ্ডূয়ন-বিষম-বিকার-সমুৎপাদিনি, হে বটতলাবিদ্যা-প্রদীপ-তৈল-প্রদায়িনি! আমার বুদ্ধির প্রদীপ একবার উজ্জ্বল করিয়া দিয়া যাও মা! তোমার দুই রূপ, যেরূপে তুমি কালিদাসকে বরপ্রদা হইয়াছিলে, যে প্রকৃতির প্রভাবে রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা জন্মিয়াছিল, যে প্রকৃতির ধ্যান করিয়া বাল্মীকি রামায়ণ, ভবভূতি মালতী-মাধব, ভারবি কিরাতার্জ্জুনীয় রচনা করিয়াছিলেন, সে রূপে আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পীড়া জন্মাইও না; যে মূর্ত্তি ভাবিয়া শ্রীহর্ষ নৈষধ লিখিয়াছিলেন, যে প্রকৃতির প্রসাদে ভারত-চন্দ্র বিদ্যার অপূর্ব্ব রূপ বর্ণনা করিয়া বঙ্গদেশের মনোমোহন করিয়াছেন, যাহার প্রসাদে দাশরথি রায়ের জন্ম, যে মূর্ত্তিতে আজিও বটতলা আলো করিতেছ, সেই মূর্ত্তিতে একবার আমার স্কন্ধে আবির্ভূত হও, আমি আশ্মানির রূপ বর্ণনা করি।"

শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবু হাস্য-রসোদ্দীপনে বিলক্ষণ ক্ষমতাশীল; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এইক্ষণে বাঙ্গালী পুস্তক ভদ্র মহিলারা পাঠ করিয়া থাকেন ইহা তিনি সর্ব্বত্র স্মরণ রাখেন নাই, অথবা তাঁহার পুস্তক তাঁহাদিগের গ্রাহ্য করিবার সম্যক্‌ চেষ্টা পায়েন নাই। অনেক কথা আছে যাহা স্পষ্টাপেক্ষা পরোক্ষে ভদ্র হয়, ইহা বিস্মৃত হওয়া অনেক গ্রন্থকারের সহৃদয়তার হানিকর হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, এস্থলে বঙ্কিম বাবুর হাস্যরসের পরিচয়-দায়ক-স্বরূপে একটি আখ্যান উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য-বিধায়ে আশ্‌-মানির সহিত দিগ্‌গজাচার্য্যের রসাভাস প্রগৃহীত হইল।

তদ্যথা—

"আশ্মানি দিগ্‌গজের কুটীরে আসিয়া দেখিল, যে, কুটীরের দ্বার রুদ্ধ; ভিতরে প্রদীপ জ্বলিতেছে।" ডাকিলেন,

"ও ঠাকুর!" কেহ উত্তর দিল না।

"বলি ও গোঁসাঞি!" উত্তর নাই।

"মর! বিট্‌লে কি করিতেছে? ও রসিকদাস প্রভু!" উত্তর নাই।

আশ্মানি কুটীরের দোয়ারের ছিদ্র দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণ আহারে বসিয়াছে, সেই জন্যে কথা নাই; কথা কহিলে ব্রাহ্মণের আহার হয় না। আশ্মানি ভাবিল, ইহার আবার নিষ্ঠা; দেখি দেখি কথা কহিয়া আবার খায় কি না।

"বলি ও রসিকদাস!" উত্তর নাই।

"ও রসরাজ।"

"হুম্!"

"বামন ভাত গালে করিয়া উত্তর দিয়াছে, ও ত কথা হলো না" এই ভাবিয়া আশ্মানি কহিল,

"ও রসমাণিক!"

"হুম্।"

"বলি—তাই কও না, খেও এর পরে।"

"হু—উ—উম্।"

"বটে, বামন হইয়া এই কাজ—আজই স্বামী ঠাকুরকে বলে দেব; ঘরের ভিতর কে ও?"

ব্রাহ্মণ সশঙ্কচিত্তে শূন্য ঘরের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।. কেহ নাই দেখিয়া পুনর্ব্বার আহার করিতে লাগিল।

আশ্মানি আবার কহিল,

"ও কি, আবার খাও যে? কথা কহিয়া আবার খাও?"

"কই কখন কথা কহিলাম?"

আশ্মানি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল,

"এই ত কহিলে।"

"বটে, বটে, বটে, তবে আর খাওয়া হইল না।"

"হাঁ ত; উঠে আমায় দ্বার খুলিয়া দাও।"

আশ্মানি ছিদ্র হইতে দেখিতেছিল ব্রাহ্মণ যথার্থই অন্ন ত্যাগ করিয়া উঠে। কহিল,

"না, না, ও কয়টী ভাত খাইয়া উঠিও।"

"না আর খাওয়া হইবে না, কথা কহিয়াছি।"

"সে কি? না খাও ত আমার মাথা খাও।"

"রাধে মাধব! কথা কহিলে কি আর আহার করিতে আছে?"

"বটে, তবে আমি চলিলাম; তোমার সঙ্গে আমার অনেক মনের কথা ছিল, কিছুই কথা হইল না। আমি চলিলাম।"

"না, না, আশ্মান্, তুমি রাগ করিও না; আমি এই খাইতেছি।"

ব্রাহ্মণ আবার খাইতে লাগিল; দুই তিন গ্রাস আহার করিবা মাত্র কহিল,

"উঠ, হইয়াছে; দ্বার খোল।"

"এই কটা ভাত খাই।"

"এ যে পেট আর ভরে না; উঠ, নহিলে কথা কহিয়া ভাত খাইয়াছ বলিয়া দিব।"

"আঃ নাও; এই উঠিলাম।"

ব্রাহ্মণ গণ্ডূষ করিয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

দ্বার খুলিলে আশ্মানি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দিগ্‌গজের হৃদ্বোধ হইল, যে প্রণয়িনী আসিয়াছেন, ইহার সরস অভ্যর্থনা করা চাই; অতএব হস্ত আন্দোলন করিয়া কহিলেন,

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি!"

আশ্মানি কহিল, "এটি যে বড় সরস কবিতা; কোথা পাইলে?"

"তোমার জন্যে এটি আজ রচনা করিয়া রাখিয়াছি।"

"সাধ করিয়া কি তোমায় রসিকরাজ বলেছে।"

"রসিকঃ কৌষিকো বাসঃ—সুন্দরি! তুমি বইস; আমি হস্ত প্রক্ষালন করি।"

আশ্মানি মনে মনে কহিল, "আলোপ্ পেয়ে, তুমি হাত ধোবে? আমি তোমাকে ঐ এঁটো পাতে আবার খাওয়াব।"

প্রকাশ্যে কহিল, "সে কি! হাত ধোও যে, ভাত খাও না।"

গজপতি কহিলেন, "কি কথা! ভোজন করিয়া উঠিয়াছি, আবার ভাত খাব কিরূপে?"

"কেন? তোমার ভাত রহিয়াছে যে, উপবাস করিবে?"

দিগ্‌গজ কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "কি করি; তুমি তাড়াতাড়ি করিলে।" এই বলিয়া সতৃষ্ণ নয়নে অন্ন পানে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

আশ্মানি কহিল, "তবে আবার খাইতে হইবেক।"

"রাধে মাধব! গণ্ডূষ করিয়াছি, গাত্রোত্থান করিয়াছি, আবার খাইব?"

"হাঁ, খাইবে বই কি—এই খাও, দেখ" বলিয়া আশ্মানি হস্ত ধরিয়া টানিয়া বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে ভোজনপাত্রের নিকট বসাইল। ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,

"ছি! ছি! ছি! রাম, রাম, রাম! করিলে কি? করিলে কি? উচ্ছিষ্ট মুখ, তুমি আমাকে স্পর্শ করিলে?"

"ক্ষতি কি? পিরীতে সব হয়।"

ব্রাহ্মণ নীরব হইয়া রহিলেন।

"খাও।"

"গণ্ডূষ করিয়াছি, গাত্রোত্থান করিয়াছি, তুমি আবার স্পর্শ করিলে, আবার খাইব?"

"হাঁ খাইবে বই কি? আমারই উচ্ছিষ্ট খাইবে।"

এই বলিয়া আশ্মানি ভোজনপাত্র হইতে এক গ্রাস অন্ন লইয়া আপনি খাইল। ব্রাহ্মণ অবাক্ হইয়া রহিলেন। আশ্মানি উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজনপাত্রে রাখিয়া কহিল, "খাও।"

ব্রাহ্মণের বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই।

"খাও; শোন।"

আশ্মানি গজপতির কাণে কাণে কি কহিল।

ব্রাহ্মণ আসন হইতে অর্দ্ধ হস্ত লাফাইয়া উঠিলেন।

"তবে খাই", বলিয়া দিগ্‌গজ উচ্ছিষ্ট অন্ন গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলেন। নিমেষমধ্যে ভোজনপাত্র শূন্য করিয়া, কহিলেন—

"সুন্দরি! কই?"

"মর্, এঁটো মুখে?"

"হুম্ হুম্—আঁচাই আঁচাই" বলিয়া গজপতি আস্তে ব্যস্তে মুখে জল দিতে লাগিলেন; কতক জল লাগিল, কতক জল লাগিল না; দন্তমধ্যে আধ পোয়া চালের অন্ন পান্তা হাঁড়িতে রহিল।

"কই সুন্দরি—অধর সুধা কই?"

"মর্ আগে হাত মুখ মোছ।"

ব্রাহ্মণ ত্রস্ত হইয়া কোঁচায় হাত মুখ পুঁছিতে লাগিলেন।

* * *

"এখন সুন্দরি?"

"এদিকে আইস।" দিগ্‌গজ আশ্মানির কাছে গিয়া বসিলেন।

"মুখের কাছে মুখ আন।" দিগ্‌গজ আশ্মানির মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন।

"হাঁ কর।" যা বলে তাই, দিগ্‌গজ আধ হাত হাঁ করিলেন। আশ্মানি রুমাল হইতে একটি তাম্বূল লইয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিল। দিগ্‌গজ হাঁ করিয়াই রহিলেন।

পান চিবাইয়া পানের পিকে গাল পরিপূর্ণ হইলে আশ্মানি সেই সমুদায় ছেপ্ দিগ্‌গজের হাঁর ভিতর নিক্ষেপ করিল।

দিগ্‌গজ এক গাল থুতু মুখের মধ্যে পাইয়া মহা অকষ্ট-বন্ধে পড়িলেন; প্রেয়সী মুখে পান দিয়াছে, ফেলিতে পারেন না, পাছে অরসিক বলে; গিলিতেও পারেন না, এই ভোজনের পর এক গাল থুতু কেমন করেই বা গেলেন; নীলকণ্ঠের বিষের ন্যায় গালের মধ্যেই রহিল।

এই অবকাশে আশ্মানি একটি খড়িকা লইয়া দিগ্‌গজের বিপুল নাসিকার মধ্যে প্রেরণ করিল; হাঁচি আসিল, আর মুখমধ্যস্থ সমুদয় অমৃতরাশি বেগে নির্গত হইয়া দিগ্‌গজের ক্ষীণ বপুঃ প্লাবিত করিল।"

এ পর্য্যন্ত গ্রন্থের প্রশংসনানন্তর ইহা বক্তব্য হইয়াছে যে, গ্রন্থকার ইংরাজী গদ্যকাব্যের ভাবে আর্দ্র থাকায় কোন কোন স্থলে হিন্দু ও মোসলমান সম্বন্ধে ইংরাজী বা বিলাতী আচার ব্যবহারের আরোপ করিয়াছেন, তাহাতে স্বভাব বর্ণনার ব্যাঘাত হইয়াছে। ইউরোপ খণ্ডে কোন দুর্গপতির কন্যা অনায়াসে রাজপুত্র বা সম্মানবিশিষ্ট কোন বন্দীর শুশ্রূষা করিতে পারেন; দেশাচারে তাহা প্রশংসনীয়ও হয়, কদাপি নিন্দনীয় বোধ হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থকারের বর্ণনায় প্রধান সেনাপতি কতলুখাঁর কন্যা আয়েষা যে প্রকারে জগৎসিংহের বন্দী ও পীড়িতাবস্থায় সেবা করিয়াছে তাহা কদাপি কোন যবন-সম্বন্ধে সংলগ্ন বোধ হয় না। আশ্মানির চরিত্রও স্থানে স্থানে ইউরোপীয় প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর আশ্মানির রূপ ব্যাজস্তুতিতে যে প্রকার বর্ণিত হইয়াছে, প্রকৃত বর্ণনে তাহার লক্ষণ রক্ষা করা হয় নাই, পরস্পর অত্যন্ত অসংলগ্ন বোধ হয়। গ্রন্থের রচনা সম্বন্ধে বক্তব্য যে, তাহা সাধারণতঃ শুদ্ধ ওজোগুণ-বিশিষ্ট এবং স্বভাবসিদ্ধ হইলেও স্থানে স্থানে চ্যুত সংস্কৃতিতে আক্লিষ্ট আছে। কয়েক স্থানে গ্রন্থকার "লম্ফ ত্যাগ করিয়া" পদ লিখিয়াছেন, ইহা পরিশুদ্ধ গৌড়ীয় নহে। লোকে লম্ফ

"প্রদান" করিয়া থাকে, কদাপি "ত্যাগ" করে না, কেবল পল্লীগ্রামবাসীরা "লাফ ছাড়িয়া" থাকে, বোধ হয় বঙ্কিমবাবু তাহারই অনুবাদ করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক, তাঁহার গ্রন্থখানি যে রসব্যঞ্জক, ভাবদ্যোতক ও নূতন প্রণালীর আদর্শ স্বরূপ হইয়াছে, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে সম্যক্ সাধুবাদ করিলাম।

বিচার।

[শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল]

(১)

—সালে আমি তখন লণ্ডনে। সে সময় এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। আসল নাম ধামটা গোপন রাখিয়াই বলিতেছি। ধরুন, হ্যারী ও জন দুইজনেই মেরী নাম্নী এক কুমারীকে খুব ভালবাসিত। মেরী একজন সুন্দরী অভিনেত্রী। হ্যারী ও জন দুইজনেই হাস্যরসের প্রসিদ্ধ অভিনেতা। তিনজনে একই থিয়েটারের দলভুক্ত ছিল।

জনসাধারণ হ্যারীর এত ভক্ত ছিল যে, সে তাহার অভিনয়ের অংশের প্রথম কথাটি উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বেই সকলে হাসিয়া লুটিয়া পড়িত। জনও এত বেশী দর্শকবৃন্দের প্রিয় ছিল যে, সে চুপ করিয়া থাকিলেও, তাহাদের সমস্ত শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও দুইজনের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। মেরী দুইজনের প্রতিই সমানভাবে অনুরক্ত ছিল এবং দুইজনের সহিতই সমতুল্য ব্যবহার করিত। পরে দুইজনেই যখন তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য জ্বালাতন করিয়া তুলিল, সে উত্তর করিল, "দুজনের মধ্যে যে ভাল অভিনয় করে, আমি তাকেই বে করবো।"

সর্ব্বনাশ! রঙ্গালয়ের এমন কোন অভিনেতা নাই, সমালোচক নাই, যে জোর করিয়া বলিতে পারে একের অপেক্ষা অন্য উচ্চদরের অভিনেতা।

হ্যারী উত্তর শুনিয়া হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"মেরী, এ সমস্যার মীমাংসা কি করে হবে? কার মতামত তুমি স্বীকার করবে?"

জন হতবুদ্ধি হইয়া বলিয়া উঠিল—"এ মামলার বিচার করবে কে?"

মেরী দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল, "বিচার দেশবাসী করবে। আমরা দেশবাসীর সেবক। তাদের অভিমত আমি বিনা বাক্যব্যয়ে মাথা পেতে স্বীকার করে নেব।"

উত্তর শুনিয়া দুইজনেই গভীর চিন্তায় মগ্ন হইল। দেশবাসী সমভাবেই দুইজনের অভিনয়ের প্রশংসা করে ও তাহাদের গুণকীর্ত্তন করে। তাহাদের মতামতের জন্য অপেক্ষা করাও যা, আর চিরদিনের জন্য এ মামলা মুলতুবি রাখা, একই কথা। হ্যারী এ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের কোনও পন্থা নিরূপণ করিতে পারিল না। জনও বহু মাথা ঘামাইয়াও যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেল।

কিছুদিন পরে একটি হোটেলের ভিতর বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে জন হ্যারীকে বলিল,—"দেখ, আমরা দুজনে একটা মিটমাট না করে নিলে, তার আর কোনও উপায় নেই। আমরা দুজনেই হাস্যরসের অভিনেতা, নিজেকে অন্যের চেয়ে ভাল মনে করি। আর জনসাধারণের মতামতের জন্য অপেক্ষা করতে গেলে, বোধ হয় জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমাদের দুজনকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। একমাত্র উপায় হচ্ছে, করুণরসের অভিনয়ে আমাদের মধ্যে কে ভাল, সেই পরীক্ষা করা যাক্।"

হ্যারী ভাবিল, এ প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত। সে বন্ধুর কথায় সম্মত হইল।

জন বলিতে লাগিল,—"তবে এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার পক্ষেও একটা অন্তরায় আছে। রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা কেউ আমাদের করুণরসোদ্দীপক পার্ট অভিনয় করতে দিতে সম্মত হবে না। আমরা যে হাস্যরস ছাড়া আর কোন রসের অভিনয় করতে পারি, তা কেউ বিশ্বাস করবে না।"

"তা হলে কি করা যায়?"

"সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বাইরে আমাদের এ পরীক্ষা দিতে হবে!"

"তাহলে জনসাধারণে ত আমাদের পারদর্শিতার বিচার করতে পারবে না!"

জন বিষণ্ণভাবে উত্তর করিল,—"সেও ত ঠিক কথা!"

দুইজনে স্তম্ভিত ভাবে চায়ের পাত্র মুখে তুলিল। অন্যান্য আগন্তুকেরা তাহাদের পাশ দিয়া চলাফেরা করিতেছে; যাহারা তাহাদের চেনে, সকলেই টুপি খুলিয়া তাহাদের অভিবাদন করিয়া যাইতেছে।

দুইজনেই নিজেদের চিন্তায় এত বেশী মগ্ন ছিল যে, পাশেই একজন ভদ্রলোক তাহাদের সহিত কথা কহিবার জন্য যে উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা তাহারা আদৌ লক্ষ্য করে নাই। ভদ্রলোকটি শেষে নিরুপায় হইয়া সাহস সহকারে তাহাদের সম্মুখীন হইয়া বলিল, "আপনাদের কথাবার্ত্তায় বাধা দিলুম বলে, আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাদের নিকট আমি অভিনয় সম্বন্ধে কিছু উপদেশ চাই। অবশ্য তার জন্যে সামান্য পারিশ্রমিকও দিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

জন বলিয়া উঠিল,—"মশাই, এখন আমরা এক গুরুতর বিষয়ে বিশেষ ব্যস্ত আছি। অন্য সময় আপনার কথা শুনবো।"

ভদ্রলোকটি উত্তর করিল,—"মশাই, আমার আর অপেক্ষা করবার সময় নেই। আমি এতদিন জেলে ঘাতকের কাজ করে এসেছি। সম্প্রতি সে কাজ ছেড়ে দিয়েছি। আমার কাজ যে কতদূর জঘন্য ছিল সে বিষয়ে আমাকে এক প্রকাশ্য জনসভায় কালই বক্তৃতা দিতে হবে। বক্তৃতা আমি পূর্ব্বে আর কখনও করি নাই। আজ ভয়ে আমার বুক গুর্‌গুর্ করছে। আপনারা একটু দয়া করলেই আমি কাজে সফল হ'তে পারি।"

জন উত্তর করিল,—"আচ্ছা বলুন। আপনি চাকুরি ছাড়লেন কেন?"

"আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে, মানুষ যত বড়ই দুর্বৃত্ত হোক, তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা মহা পাপ ও অন্যায়। এ প্রথা তুলে দেওয়া দরকার।"

"তা বেশ! আপনার বক্তৃতায় কি কি বিষয় থাকবে?"

"আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, এ কার্য্যে আমি যে জ্ঞানলাভ করেছি, সে সম্বন্ধে, আর শেষ—এই ভীষণ অনুতাপ!"

"চমৎকার!" এই বলিয়া জন সজোরে সম্মুখস্থ টেবিলের উপর এক মুষ্ট্যাঘাত করিল, "আচ্ছা, আপনাকে কেউ সেখানে চেনে?"

"না, আমাকে চেনে না কেউ, আমার নামমাত্র শুনেছে।"

"আচ্ছা, এই বক্তৃতার টিকিট বেচে আপনার কত লাভ হ'তে পারে?"

"স্থান অল্প, টিকিটের মূল্যও কম, জোর কুড়ি পাউণ্ড খরচখরচা বাদ লাভ থাকতে পারে।"

"আর বক্তৃতা দেবার ভয়ে এখন থেকেই আপনি কাঁপছেন! আপনাকে বক্তৃতা না দিতে হলেই ভাল হয়, কি বলেন?"

"তা ত ঠিক কথা! কিন্তু বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেছে, টিকিট বিক্রী হচ্ছে, এখন ত আর পশ্চাৎপদ হবার কোনও উপায় নেই!"

"আমি একটা মতলব ঠিক করেছি। আমি আপনাকে লাভস্বরূপ পঞ্চাশ পাউণ্ড দিচ্ছি, আপনার নামে আমিই বক্তৃতা দেব।"

"মশাই, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"দেখুন, এতদিন কেবল হাস্যরসের অভিনয়ই করে এসেছি। এবার একটা খেয়াল চেপেছে যে কোনও গুরুগম্ভীর পার্টের অভিনয় করবো। আপনাকে সেখানে

যখন কেউ চেনে না, তখন আর আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। আর দায়িত্ব যা কিছু সবই আমার। পরে যখন জানাজানি হয়ে পড়বে, আপনি বলবেন, এ বিষয়ে কিছু জানেন না। সময়ে ট্রেণ ধরতে না পারায় সভায় উপস্থিত হ'তে পারেন নি। আপনি কি বলেন?"

"আমি এ প্রস্তাবে সম্মত আছি। বক্তৃতাও দিতে হবে না, অথচ দ্বিগুণ লাভ হবে!"

বন্দোবস্ত সব পাকা হইয়া গেল। পরদিন জনকে বক্তৃতা দিতে হইবে। হ্যারী ও মেরীও সভায় উপস্থিত থাকিতে স্বীকৃত হইল। হ্যারী কিন্তু একটু গম্ভীর হইয়া গেল। জন ত এ কার্য্য নিশ্চয়ই বিশেষ সফলতার সহিত সম্পাদন করিবে,—এ সংবাদ যখন রাষ্ট্র হইবে, তখন দেশের সকলেই তাহার কৃতিত্বের প্রশংসা করিবে। সে কি আর কোন দিন জনের অপেক্ষা বেশী বাহাদুরি দেখাইতে পারিবে? সে বিমর্ষ অন্তঃকরণে চিন্তিত হইয়া পড়িল।

(২)

জনের স্ফূর্ত্তি দেখে কে! সারারাত্রি ধরিয়া সে বক্তৃতায় কি বলিবে মনে মনে তাহা ভাবিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে দর্পণের সম্মুখে 'রিহার্সাল'ও দিতে লাগিল।

সে স্থানের কেহই ঘাতককে চিনিত না। কিন্তু জন তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিলে নিশ্চয়ই সকলে তাহাকে চিনিয়া ফেলিবে। এইজন্য যতদূর সম্ভব ঘাতকের মত চেহারার সাদৃশ্য করিয়া ছদ্মবেশে সে নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া সভাপতির নিকট আত্মপরিচয় দিল।

যথাসময়ে সভাপতির আদেশ অনুসারে জন বক্তৃতা দিতে উঠিল। প্রথম পংক্তিতেই হ্যারী ও মেরী বসিয়াছিল। তাহাদের সহিত চোখচোখি হইতেই সে ঈষৎ হাসিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না।

"ভদ্রমহোদয়া এবং মহোদয়গণ"

শ্রোতৃবৃন্দ অপলকদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। জন ধীরে ধীরে বক্তৃতা আরম্ভ করিল। বক্তৃতার প্রথম অংশে সে সংক্ষেপে তাহার শৈশব ও কৈশরের কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে তাহাতে হাস্যরসের অবতারণা করাতে শ্রোতৃবৃন্দ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। এমন গুরুগম্ভীর বিষয়, বক্তা কি না তাহাদিগকে হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে! কিন্তু যখনই সে তাহার কর্ম্মজীবনের কাহিনী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল, তাহার মুখ একেবারে গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। কি সে ভীষণ কাহিনী, হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! উপস্থিত সকলেরই দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, শরীরের রক্ত গরম হইয়া উঠিতে লাগিল। সে হতভাগ্য আসামীদের যন্ত্রণা-ভোগের কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিল, মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের ছবিখানি দর্পণের ন্যায় সে তাঁহাদের সম্মুখে ধরিল। জন নিজেই সে দৃশ্য স্মরণ করিয়া যেন শিহরিয়া উঠিল। সে ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল,—"আমি একজন হত্যাকারী, ঘোর পাতকী!"

সকলে এত নিশ্চল নীরব হইয়া তাহার কাহিনী শুনিতেছিল যে, সভাস্থলে সে সময় একটি ছুঁচ পড়িলেও তাহার শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইত। তাহার বক্তৃতা শেষ হইলেও কেহ কোন প্রকার শব্দ করিল না। জন সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া বসিয়া পড়িল। সভাস্থল নিস্তব্ধ। তাহা হইতেই সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, সে চরম সফলতা লাভ করিয়াছে। পরে সভাপতি উঠিয়া তাহার অসাধারণ বক্তৃতার শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিল। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা একবাক্যে বুঝিল,—এমন সুন্দর বক্তৃতা তাহারা খুব কমই শুনিয়াছে।

জনের বুকখানা দশ হাত ফুলিয়া উঠিল। হ্যারী ও মেরীও তাহার সফলতায় তাহাদের আন্তরিক সন্তোষ জ্ঞাপন করিল। সঙ্গে সঙ্গে লর্ড—র এক নিমন্ত্রণ পত্র তাহার হাতে আসিয়া পৌছিল,—তিনি জনকে সভাভঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে আসিবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন।

জন আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"দেখ, লর্ড—র নিমন্ত্রণ পত্র! এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে আমার সকল শ্রমই সার্থক হয়েছে।"

হ্যারী জিজ্ঞাসা করিল,—"লর্ড—কে? তাঁর নামও পূর্ব্বে কখনও শুনি নি!"

জন উত্তর করিল,—"নাম না শুনলেই বা! তিনি ত একজন লর্ড, আমার সঙ্গে বাড়ীতে দেখা করতে চান। এ একটা কম গৌরবের কথা! আমাকে নিশ্চয়ই যেতে হবে।"

অল্পক্ষণ পরেই সে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া লর্ডের বাসাভিমুখে অগ্রসর হইল। পত্রে তাঁহার ঠিকানা দেওয়া ছিল। ঠিকানায় আসিয়া একটি ছোটখাট সাধারণ ধরণের বাড়ী দেখিয়া সে একটু দমিয়া গেল। একজন সাধারণ ভৃত্য আসিয়া তাহাকে ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গেল। বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিয়া সে আরও আশ্চর্য্য হইল। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র কিছুই নাই। ভৃত্য তাহাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে অনুনয় করিল, তাহার প্রভু হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় ভিতরে ডাক্তারের সহিত আলাপ করিতেছেন। জন চেয়ারের উপর হতাশভাবে বসিয়া পড়িল। ইহার অপেক্ষা যে হোটেলে বসিয়া মেরীর সহিত গল্পগুজব করা শতগুণে ভাল ছিল!

জন প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বসিয়া থাকিবার পর ঘরের দ্বার উন্মুক্ত হইল। জন উঠিয়া দাঁড়াইল।

লর্ড—বৃদ্ধ, এত বৃদ্ধ যে, লাঠিতে ভর দিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবার সময় মনে হইল যেন মাটির সহিত তিনি মিশিয়া যাইতেছেন। তাঁহার গাত্রের চর্ম্ম শিথিল হইয়া গিয়াছে, চক্ষু কোটরগত, মাথার চুল সব পাকা। কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টি ঠিক যেন পাগলের মত!

তিনি অতি কষ্টে বলিতে লাগিলেন,—"মশাই, বড়ই দুঃখিত আপনাকে আমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। আমার হৃদ্‌রোগ আছে, আপনার বক্তৃতা শুনে বাড়ী ফিরবার সময় বুকটা হঠাৎ কি রকম করে উঠলো, তাই ডাক্তার ডাকতে বাধ্য হয়েছিলুম। আপনার বক্তৃতা, —সে এক অদ্ভুত জিনিষ! বড়ই কৌতূহলজনক ও শিক্ষাপ্রদ! আমি কখনো তা ভুলতে পারবো না।"

জন অবনত মস্তকে তাঁহার প্রশংসা গ্রহণ করিল।

"আপনি বসুন—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বৃদ্ধের যা কিছু ত্রুটি হবে, নিজগুণে ক্ষমা করবেন।"

জন কৃতজ্ঞহৃদয়ে উত্তর করিল,—"আপনার মত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা আমার পক্ষে গৌরবের কথা!" বলিয়া সে চেয়ারের উপর বসিল।

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য আপনাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি। আচ্ছা, অনেক আসামী ত আপনার হাতে প্রাণ হারিয়েছে,—র কথা আপনার কিছু মনে পড়ে? মরবার পূর্ব্বে বোধ হয় সে একটুও চঞ্চল হয় নি,? —ওঃ! আপনাকে বাড়ীতে ডেকে আনলুম—অতিথি সৎকারের কোন চেষ্টা করছি না। বৃদ্ধের মতিভ্রম! কিছু মনে করবেন না!" বলিয়া তিনি ভৃত্যকে মদ্য আনিতে আদেশ করিলেন।

মদ্যপান করিতে করিতে জন উত্তর করিল,—"অমন সাহসী ও বীর আমি আর কাকেও দেখিনি!"

"মরবার আগে তার শরীর বোধ হয় একটুও কাঁপে নি? সে শান্তভাবেই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিলো!"

"বীরের মত!" জন তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানিত না।

"এ তারই উপযুক্ত কাজ! অন্য কোন আসামীকে এমন বুক ফুলিয়ে মরতে কখন দেখেছিলেন?" তাঁহার কণ্ঠস্বরে যেন গর্ব্বের একটা ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল।

"তার স্মৃতি সর্ব্বদাই ভক্তিভরে আমি পূজা করবো!"

"কিন্তু সে সময় তার উপর তোমার একটুও দয়া হয় নি? তার যন্ত্রণা কষ্ট দেখে তোমার মনে এতটুকুও করুণার সঞ্চার হয় নি?"

"যন্ত্রণা ত কিছুই তার—"

বৃদ্ধ একটু চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"মানসিক যন্ত্রণার কথা আমি বলছি। একজন নির্দ্দোষ লোক, এরকম লজ্জাজনক ভাবে তার প্রাণ বধ করা হচ্ছে, তার তখনকার মনের ভাবগতিক আপনি কিছু বুঝতে পারেন নি?"

"নির্দ্দোষ? সে ত সব আসামীই বলে যে তারা বিনা অপরাধে দণ্ডিত হয়েছে!"

"তার নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই। বিচারের সময় সে সত্য কথাই বলেছিল, আমি তা ভাল জানি। সে আমারই পুত্র,—অন্ধের যষ্টি!"

জনের মুখের ভাব সাদা কাগজের মতই বিবর্ণ হইয়া গেল,—"এঁ্যা, আপনারই পুত্র!"

"আমারই একমাত্র পুত্র! পৃথিবীতে আমার সবেধন স্নেহের সামগ্রী! যথার্থই সে নির্দ্দোষ। আর আপনিই তাকে বধ করেছেন—আপনার হাতেই তার মৃত্যু ঘটেছে!"

জন থতমত খাইয়া উত্তর করিল,—"আমি,—আমি ত উপলক্ষ মাত্র। তার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই।"

"আপনি চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছেন। বক্তৃতায় আপনি যা কিছু বলেছেন, তার সবের সঙ্গেই আমি একমত। আপনিই তার হত্যাকারী! মদটা ভাল লাগছে বোধ হয়! ওকি! ফেলে রাখবেন না, বাকিটুকু খেয়ে ফেলুন!"

"মদ!" জন তাঁহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ শান্তভাবে বলিলেন,—"ও মদ বিষাক্ত! এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনার মৃত্যু নিশ্চিত।"

সর্ব্বনাশ! ইতিমধ্যেই তাহার শিরার মধ্যে যেন কি রকম একটা উত্তেজনা হইতেছে বলিয়া তাহার মনে হইল,—শরীরের রক্ত একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল,—তাহার চোখের সম্মুখে ছায়ার মত কত কি উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল!

"আর আমার কোন ভয় নেই! আমি বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, কিন্তু তুমি এখন আর আমার উপর বলপ্রয়োগ করতে পারবে না। তোমার অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে। প্রতিশোধ! পুত্রহত্যার প্রতিশোধ!"

কিছুক্ষণের জন্য দুইজনে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; জন ভয়ে নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ,—লর্ডের মুখে পাগলের হাসি!

আর বেশী বিলম্ব করিলে সত্য সত্যই বন্ধুর জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিবে দেখিয়া লর্ড ধীরে ধীরে ছদ্মবেশ ত্যাগ করিতে লাগিলেন, জনের গলায় হাত দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"বন্ধু হে, এবার চিন্‌তে পার?"

সমস্ত সংবাদ যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল, দেশবাসী হাসিয়া লুটাপুটি খাইতে লাগিল। তাহারা একমত হইয়া হ্যারীকেই জয়মাল্য প্রদান করিল। জন শ্রোতৃবৃন্দকে ঠকাইয়াছে বটে, কিন্তু হ্যারী তাহারও চক্ষে ধূলি দিয়াছে!

* * * *

হ্যারীর সহিত মেরীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের দিন জন এক মহামূল্য হীরার কণ্ঠহার কিনিয়া বন্ধু-পত্নীকে উপহার দিল। *

* বিদেশী গল্পের অনুকরণে।

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

মঙ্গল-গ্রহ হইতে সঙ্কেত প্রেরণ।

মহাত্মা মার্কনী তারহীন যন্ত্রের (wireless telegraphy) আবিষ্কার দ্বারা জগতে এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিয়া মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। পৃথিবীর যে কোন স্থানে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে, এখন এক সেকেণ্ডের ১০ ভাগের এক ভাগ সময় লাগে। পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব আর নাই।

কেবল মাত্র পৃথিবীতে সংবাদের আদান-প্রদানে মানুষের আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই; গ্রহ, উপগ্রহে সংবাদ-প্রেরণের চেষ্টা চলিতেছে, হয়ত কোন দিন কৃতকার্য্য হইবে এই আশা।

পৃথিবীর পাশেই মঙ্গল গ্রহ (Mars)। এই গ্রহ যখন খুব কাছে থাকে, তখন পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব হ'ল ৩ কোটী ৫০ লক্ষ মাইল; যখন খুব দূরে থাকে, তার দূরত্ব তখন হ'ল ২৫ কোটী মাইল। এত কাছে রয়েছে এই গ্রহ, তার সঙ্গে সংবাদের আদান প্রদান না হওয়া দুঃখের বিষয়!

একজন পণ্ডিত বল্লেন "খুব বড় দেখে একটা হাউই তৈরি ক'রে ছোঁড়; চাঁদের দিকে লক্ষ্য ক'রে, দেখা যাক্, হাউই চাঁদে পৌছিতে পারে কি না।" অনেক তর্ক হল; সকলে বল্লে "অসম্ভব"। চাঁদ বেচারা হাউয়ের হাত থেকে

অব্যাহতি পেলে। এইবার মঙ্গলকে নিয়ে টানাটানি পড়্‌ল। অনেকে বল্লে, "সার্চ্চলাইট ফেলা হোক্।" কেউ কেউ বল্লে, "ওতে কিছু হবে না; নিয়ে এসো বড় বড় আয়না, তাতে আলো ফেলে সেই আলো পাঠাও মঙ্গলগ্রহে; দেখি তারা আমাদের এই আলোর নিশানা ধর্‌তে পারে কি না।" তর্ক হ'ল অনেক, অনেকে বল্লে, এই মতলবটাকে একবারে উড়িয়ে দিলে চল্‌বে না। তারপর এলেন একজন ইঞ্জিনিয়র। তিনি বল্লেন, "নিয়ে এসো ১২০টা শক্তিশালী সার্চ্চলাইট, প্রত্যেক সার্চ্চলাইটে থাক্‌বে ১২.০ কোটী বাতীর জোর। সব সার্চ্চলাইট গুলো এক ক'রে ১ হাজার ২ শত কোটী বাতীর আলো মঙ্গলগ্রহে পাঠাতে হবে, দেখা যাক্ এই আলোর ইঙ্গিতে তারা কিছু জবাব দেয় কি না।" তর্ক হ'ল অনেক, কাজে কিছুই হ'ল না। সে যাত্রা মঙ্গলের লোকেরা ১ হাজার ২ শত কোটি আলোর তেজের হাত থেকে রক্ষা পেলে।

১৯২০ সালে একদিন রাত্রে মার্কনীর শিষ্যেরা বেতারের যন্ত্রপাতি কাণে গুঁজে সংবাদের অপেক্ষায় যখন বসেছিল, তখন একটা অদ্ভুত রকমের শব্দ তারা শুন্‌তে পেয়েছিল। কেবলমাত্র একটা বেতার ষ্টেসনে যে ঐ রকম শব্দ শোনা গিয়েছিল তা নয়, অনেক ষ্টেসনেই শব্দটী শোনা গিয়েছিল; সে শব্দটা হল "এস্ এস্" "টক্ টক্ টক্"।

সকলে ভাব্‌তে বস্‌ল, এ শব্দটা কিসের, কোথা থেকে এটা আসে? কিছু পাত্তা পাওয়া গেল না। একজন আস্তে আস্তে বল্লে "এই শব্দটা কি মঙ্গলগ্রহ থেকে আস্‌ছে?" সকলে শুনে ভীষণ তর্ক বাঁধিয়ে দিয়ে বল্লে "হতেই পারে না, ওটা হল পৃথিবীর চৌম্বক-ঝটিকা, কিম্বা সূর্য্য মণ্ডলের ঘূর্ণিপ্রবাহ, অথবা বায়ু মণ্ডলের তাড়িত-স্রোত।"

মার্কনী তখন বড় গলা করে বল্লেন, "কোনও গ্রহ থেকেই এই শব্দ আস্‌চে, গ্রহবাসীরা আমাদের নিশ্চয় ইঙ্গিত পাঠাচ্ছে, কিন্তু আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি নেহাইত কম, তাই কিছু ঠিক্ করতে পার্‌ছি না, তারা আকাশ কাঁপিয়ে যে ইঙ্গিত আমাদের জানাচ্ছে, তা কখনই. বাজে হ'তে পারে না।"

আমেরিকার বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়র চার্‌লি ষ্টিন্‌মেজ (Charles Steinmetz) হিসাব খতাইয়া দেখিলেন যে মঙ্গলগ্রহে বেতার যোগে, আকাশ-তরঙ্গ পাঠাইতে হইলে যন্ত্রপাতির জন্য ১০০ শত কোটী ডলার পর্য্যন্ত খরচ হইতে পারে। মার্কিন দেশের যাবতীয় ইলেকট্রিক শক্তি মিলাইয়া একটী বিশাল বেতার ষ্টেসন প্রস্তুত করিলে মঙ্গলগ্রহে আকাশ-উর্ম্মি প্রেরণ সম্ভব হইতে পারে, এবং একটী ১০০০ ফিট উচ্চ গম্বুজের প্রয়োজন, তাহা বেতারের পোষ্টরূপে ব্যবহৃত হইবে। গম্বুজ না হইলেও চলিতে পারে। একটী ধাতু নির্ম্মিত বেলুন তৈরি করে, খুব হালকা হিলিয়াম (Helium) গ্যাস দিয়ে পূর্ণ কর্‌লে সেটা খুব উঁচুতে উঠ্‌বে, তখন ঐ বেলুনটা দিয়েই গম্বুজের কাজ সেরে নেওয়া যেতে পার্‌বে।

কাগজে কলমে সব তৈরি হ'ল; কি রকম আকাশ-তরঙ্গ মার্শে পৌছতে পারবে, তার মাপ পর্য্যন্ত অঙ্কপাত ক'রে বার করা হ'ল। দেখা গেল মার্শ পৃথিবীর খুব কাছে থাক্‌লে আকাশ-তরঙ্গ পাঠাতে সময় লাগবে ৪ মিনিট, যখন খুব দূরে থাক্‌বে, তখন লাগবে ২২ মিনিট। আকাশ-তরঙ্গ কোন জায়গায় বাধা পেয়ে হয়ত মার্শে নাও পৌছতে পারে, এই ভাবনাও পণ্ডিতদের মাথায় র'য়ে গেল।

পর বৎসরে জ্যোতির্ব্বিদ্ অধ্যাপক ডেভিড্ টড্ নেব্রস্কা সহরে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে একটী শক্তিশালী বেতার ষ্টেসন প্রস্তুত করাইলেন। নূতন যন্ত্রপাতি দ্বারা ধাতু নির্ম্মিত বেলুনের ভিতর হিলিয়াম গ্যাস পূরিয়া আকাশ-উর্ম্মি প্রেরণের ব্যবস্থা হইল, কোন উত্তর পাওয়া গেল না, সব পণ্ডশ্রম হইল।

অধ্যাপক টড্ এখন একটী বড় দূরবীক্ষণ-যন্ত্র-নির্ম্মাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সেই যন্ত্রটীর সাহায্যে মার্শ (মঙ্গলগ্রহ) ২ কোটী ৫০ লক্ষ গুণ বড় দেখাইবে এবং পৃথিবীর নিকট হইতে দেড় মাইল দূরে প্রতীয়মান হইবে। মতলব আর কিছু না, কেবল মাত্র মার্শে কোন লোকজন আছে কি না, তাহাই নির্ণয় করা।

১৯২৪ সালে মার্শ পৃথিবীর খুব কাছে থাকিবে। (৩ কোটী ৫০ লক্ষ মাইল)। তখন টেলিস্কোপ দিয়ে মার্শকে লক্ষ্য করা খুব সুবিধা হইবে।

মঙ্গলবাসীরা যে সঙ্কেত পাঠাতে পেরেছে, এই দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে তারা আমাদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান্, কারণ মঙ্গল আর পৃথিবীর মাঝখানে যে স্থান, সেই স্থানের অদৃশ্য পরদাখানির গুরুত্ব সব জায়গায় সমান নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সঙ্কেত আমরা স্পষ্ট ধরতে পেরেছি। কিন্তু পৃথিবী থেকে সঙ্কেত পাঠান বেশ শক্ত, কারণ এই অসম গুরুত্বের দরুণ সঙ্কেত হয়ত কোথাও হারিয়ে যেতে পারে। তবে বুদ্ধিমান্ মঙ্গলবাসীরা অন্য কোন উপায়ে এই সঙ্কেত ধরে নিতে পারে এই ভরসা।

এখন অনেক প্রশ্ন উঠ্ছে; অনেকে বল্ছে মঙ্গলবাসীরা যে সঙ্কেত আমাদের প্রথমে পাঠাবে, তার দ্বারা আমরা কি বুঝ্ব? তারা হয়ত আমাদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান্, হয়ত বা তারা অতিমানুষ, বেতার-যন্ত্র হয়ত তাদের কাছে পুতুলের খেলনা। কেউ বল্ছে তারা আমাদের চেয়ে লম্বা, সূর্য্যের তাপ অল্প বলে তারা আমাদের চেয়ে ফরসা, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমাদের চেয়ে শক্ত, কালো কালো চোখ, শক্ত ঢালু নাক, কাণ দুটো একটু বড়, সেটা তাদের সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক। আমাদের আবিষ্কার তাদের কাছে "কিছু না"। মোট কথা আমরা তাদের কাছে ছেলে মানুষ। এ সব কল্পনা মাত্র, হয়ত এই কল্পনাই একদিন সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে কি না কে বলিতে পারে?

—গন্ধবণিক্ ভাদ্র, ১৩২৯।

কবিতা-কুঞ্জ।

প্রতীক্ষায়।

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল]

(ভৈরবী—একতালা)

আমি কার পথ চেয়ে বসে আছি
যুগ যুগ কত ধরিয়া,
দিবানিশি জাগি কা'র লাগি হায়
অতৃপ্তি মরে ঘুরিয়া!
কা'র লাগি আমি নীলাকাশে চাই
হৃদয় খুলিয়া এত গান গাই
শোক তাপ জ্বালা কিছু না ডরাই
আঁখি দুটি মরে ঝুরিয়া!
সন্ধ্যায় যবে ডুবে যায় রবি
আকাশে আঁকিয়া রক্তিমা-ছবি—
কা'র দরশন, আমি, প্রাণে প্রাণে মাগি,
বিহনে রহি গো মরিয়া!
কা'র লাগি আমি গাঁথি ফুল-মালা,
সযতনে ভরি হৃদয়ের ডালা
প্রীতি-দীপ-শিখা নিতি রয় জ্বালা
সারা দিবস-রজনী ধরিয়া॥

কবি।

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন]

পথ দিয়া যবে চলে' যাই আমি—
লোকে বলে, যায় কবি,—
আঁকিতে পারে ও' লাখ জনমের
সুখ-দুঃখের ছবি।—
অতীতের স্মৃতি ছবিটীর মত
হেরিতে পারে ও' নয়নে,—
ভবিষ্যতের খাঁটি ছবিটিও
আঁকিতে পারে গো যতনে।
কল্পনা ওর তুলির লিখনে
ধরা পড়ে' যায় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
সুখ-দুঃখের অতীত ও' যে গো—
শান্তির দূত কবি।
প্রকৃতি ওর যে প্রিয় সহচর,
ভাবের-কুসুমে ও' যে মধুকর,
আঁখরে আঁখরে, ভাষার মাঝারে,—
দেখায় যুগের ছবি।
ওর কাছে নাই ছোট-বড়-ভেদ,—
(ও যে,) জগৎ-নম্য কবি॥

অঞ্জলি।

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ]

মা গো আমার প্রাণের পর্ণ কুটীর-মাঝে
তোমার পায়ের স্বর্ণ-নূপুর নিতি
মম কর্ণ বিনোদি' ক্ষুদ্র মহৎ কাজে
চৌধারে শুধু তুলুক মধুর গীতি!
যবে লক্ষ বেদনা লক্ষ ফণীর মত
দংশিতে যাবে আমারে কত না ছলে,
তারা শুনিয়া মঞ্জু গুঞ্জন রব স্বতঃ,
লুটায়ে পড়িবে আমারি চরণতলে।
মা গো তোমার চরণ নখর লাক্ষা রসে
মম চিত্ত মরুর তপ্ত বালুকারাশি
কর সিক্ত সরস—হরষ রভস বশে
তাহে ছোটাও প্রবাহ—সকল উষ্মা নাশি'!
মা গো তোমার পরম বিত্ত দানিয়া—মোরে
কর বিশ্ববিজয়ী রাজার অধিক ধনী—
মম আঁধার জীবনে তাহারে চরম করে'
বুকে জ্বালায়ে রাখিব ত্যাগের উজ্জ্বল মণি!
মা গো তোমার কমল আসন গন্ধ চির
মম হৃদি-মঞ্জুষা নিয়ত রাখুক ভরি'—
তব স্নেহের শীতল প্রলেপ লইয়া ফির'
আমার প্রাণের সকল বেদনা হরি'!
আমি চাই না মরণ বরণ করিয়া নিতে
মা গো তোমার প্রসাদে মরণ জিনিতে চাই,—
আমি যুগ যুগ ধরি বিপুল এ ধরণীতে
সুখে-দুখে শুধু তোমারে চিনিতে চাই!

আসল ও নকল।

[শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়, বি-এ]

কাগজের ফুল বলে "আমি অতি বড়,
অম্লান রূপ মোর প্রাণ-মনহর।
যেথা থাকি সেই স্থান করি কত আলো,
মুগ্ধ হয়ে লোকে তাই বাসে মোরে ভালো।
ক্ষণিকের তৃপ্তি দেয় কাননের ফুল,
জীবন নহেক তার অসীম-অতুল।"
কবি বলে "ওরে অন্ধ কৃত্রিম প্রসূন,
ক্ষুদ্র জ্ঞানে বুঝিবি কি আসলের গুণ?
স্বভাব-সরল ওই প্রতিকৃতি আনি,
রচেছে মানব হস্ত তোর দেহখানি।
কোমলতা কোথা তোর কোথা গন্ধ-মধু?
নিজস্ব বিহীন সদা শক্তিহীন শুধু।
ক্ষণস্থায়ী প্রাণ তার দিয়ে যায় যাহা,
স্মৃতির রতন সে যে কোথা পাবি তাহা?
পরিণতি হয় তার সুমধুর ফলে,
মধুর মাধুরী মরি প্রতি পলে পলে।
কোরক নাহিক তোর নাহি পরিণতি,
নাহি নিত্য নব ভাব লীলাময়ী গতি।
সসীম জীবন মধ্যে অসীম বিকাশ,
ক্ষুদ্র দেহে অনন্তের সৌন্দর্য্য প্রকাশ।
নাহি তোর, একরূপ সদা এক ভাব
আছে মূর্ত্তি—আছে রূপ—প্রাণের অভাব!
প্রলুব্ধ মধুপ-পাহে দেব যারে চায়,
বিকাশ সম্ভব যার কবি কল্পনায়।
পেলেও তাহার রূপ কমনীয় দেহ,
আসল নকলে এক করিবে না কেহ।

ওমেদার।

[শ্রীজগদীশচন্দ্র দাস।

(১)

শিশুকাল হ'তে প্রাণপাত করি
পেয়েছি চারিটী ডিগ্রি,
পড়ার খরচে ভিটামাটি বাঁধা,
মার অলঙ্কার বিক্রী।
মেসের বসতি রান্না বামুনের
মনে হ'লে কান্না পায়,
অর্দ্ধ অনাহারে শুধু দিন গণি
পাশ করা প্রতীক্ষায়।

সারা রাত জেগে চক্ষু দু'টী খেয়ে
পড়েছি পাশের পড়া,
অজীর্ণতা দোষে শরীর কাহিল
জীয়ন্তে আধেক মরা।
এক এক করি পাশগুলি দিয়া
বুকখানি উঠে ফুলে,
চরণে "প্যামসু" নাসায় চসমা
বাঁকা সিঁতি-কাটা চুলে।
দেশে ফিরে কত লভিনু আশীষ
মহা স্ফূর্ত্তি প্রাণভরা,
স্বর্গের লেখনী মস্যাধার হবে
হাকিমী ত হাত ধরা।

(২)

এবে স্ফূর্ত্তিহীন ঘৃণ্য ওমেদার
ঘুরি অফিসের দ্বারে,
গঞ্জিকা রঞ্জিত আঁখি দরোয়ান
দেয় না ঢুকিতে ঘরে,
তৈল দানে তারে তুষ্ট করি যদি
অফিস মাঝারে পশি,
বড় বাবুটীর বাঁধা বুলি শুনি
রাহু গত মুখশশী।
"গভর্ণমেণ্ট পোষ্ট্" হায় রে! সেটা যে
বামনের চাঁদ ধরা,
উচ্চ সুপারিশ ভিন্ন যা' জোটে না
আইন বেজায় কড়া।
পুলিসের কাজ, হায়! বৃথা আশা
তা'তে আরো কড়াকড়ি,
"নমিনেট্" হওয়া, ডাক্তারের "পাশ"
হাতে নাই কাণাকড়ি।
চিকণ খেয়েছি, চিকণ পরেছি,
চিকণ ক'রেছি কায়,
অশ্বে আরোহণ, দৌড়, সন্তরণ,
শুনি প্রাণ কাঁপে হায়!

(৩)

এত অপমানে ঘৃণা নাই প্রাণে
পুনঃ করি ওমেদারী,
গোলামের জা'ত গোলামীতে পটু
সে আশা কেমনে ছাড়ি?
অনলে পশিতে, অনিলে রোধিতে
সক্ষম আমরা বটে,
সপ্তসিন্ধু পারে যেতে পারি যদি
মনিবের কাজে ঘটে।
কিন্তু নিজ কাজে সিংহলে যাইতে
আত্মারাম খাঁচাছাড়া,
শিশুকাল থেকে ইতিহাসে পড়ি
বনেদি গোলাম মোরা।
বিশেষ, কলেজে যে শিক্ষা পেয়েছি
যেরূপে কেটেছে কাল,
হঠাৎ সে ভোল' বদল করিতে
কেমনে ছিঁড়িব জাল?
"ইলেকট্রিক ফ্যান" "বোর্ডিং" প্রাসাদ
বিলাসী অপটু কায়া,
কেমনে করিব পল্লীগ্রামে বাস
ছাড়ি সহরের মায়া?

(৪)

কেমনে করিব ব্যবসা বাণিজ্য
শ্রীঅঙ্গে লাগা'য়ে ধূলি,
কেমনে কর্দ্দমে চাসবাস করি
কেমনে সাজি গো কুলী?
ভেঙ্গেছে পিতার সাধের স্বপন
মাতার নয়নে নদী,
ঋণের জ্বালায় শত অপমান
সহি কত নিরবধি!
"গ্রাজুয়েট" হ'লে ধূম ধাম করি
পিতা দে'ছিলেন বিয়ে,
বসন ভূষণ কিছু দিতে নারি
নারীরে তুষি কি দিয়ে?
মুখচন্দ্রে তার সুধা নাহি আর
হায় কি বিষম ভ্রান্তি!
সুখ নাহি মনে, নিদ্রা নাহি চোখে,
জাগরণে নাহি শান্তি।
তাই পুনঃ পুনঃ বিফল যদিও
ফিরি গোলামীর আশে,
দয়া করি কেহ দাও গো গোলামী
বুট-পরা পদ পাশে!

১৯শ ভাগ] { কার্ত্তিক, ১৩২৯। } [৯ম সংখ্যা

ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে ভারতের কথা।

(৮)

[টমাস্ মুর]

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ, বি-এল]

লর্ড বায়রণের বন্ধু ও জীবনচরিত-লেখক টমাস্ মুর একাধিক খণ্ড-কবিতায় ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। কবি মুর সমসাময়িক ইংলণ্ডীয় সমাজের অবস্থা বর্ণন করিয়া বিস্তর খণ্ড-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল কবিতার মধ্যে কয়েকটিতে তিনি ভারতবর্ষে ইংরাজগণের কার্য্যকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচার-সমিতিগুলির উদ্যম ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ইংরেজগণ এদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতেন, কিন্তু তাহাতে অতি সামান্য ফলোদয় হইত। "আমার ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত" (Extracts From My Diary) নামক ব্যঙ্গ-কবিতায় মুর লিখিয়াছেন,—"বুধবার। স্মারক-লিপি—ইণ্ডিয়া মিশন সোসাইটিকে পত্র লিখিতে হইবে; আর সেই সঙ্গে বিশ পাউণ্ড (তিন শত টাকা) পাঠাইতে হইবে—ধার্ম্মিকতার উপর শুল্ক করভার! আজকাল ভারতবর্ষ হইতে যত প্রকার বিলাসিতা আমদানি করিয়া আমরা গর্ব্বিত হই তাহার মধ্যে "কোম্পানির খৃষ্টান" তৈয়ার করা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা ব্যয়সাধ্য। এই ব্যাপারে যেটুকু সকলের চেয়ে মন্দ সেটুকু এই যে, পূর্ণবয়স্ক যে সকল ব্যক্তি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ আমাদের ধর্ম্মে বহুদিন অতিবাহিত করিয়া শেষে তাহাদের নিজের ধর্ম্মে ইহজীবন সাঙ্গ করে। তাহারা মৃত্যুশয্যায় অনুতপ্ত হৃদয়ে যে দেবতার নিকট অতীত দুষ্ক্রিয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, সেই দেবতা না কি পৃথিবীতে যখন নরদেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন তিনি দধি ও ঘোল চুরী করিতেন। প্রিয়তম! এখন ভাবিয়া দেখ দেখি, কি ভয়ঙ্কর!— সব-ই ত দেখিতেছি বৃথা ব্যয়; আর এর চেয়েও ব্যাপার এই যে, যাহারা খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যে রম্ (Rum, মদ্যবিশেষ) ও চাউল ধ্বংস করিয়াছে আমাদের মত সাধুদিগকে তাহার দাম দিতে হইয়াছে। যাহা হউক, আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা কয়েক জনকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের বিবরণ

হইতে জানা যায় যে, কুন্নেনগিয়াডুতে ছয়জন, ডুরকোটচমে সাত জন আর ত্রিমন্ত্রে চার জন খৃষ্টান হইয়াছে। ক্রুসপদমে কেবল দেড় জন মাত্র খৃষ্টান হইতে বাকী আছে। এই শেষোক্ত স্থানে যদিও নরসুন্দরগণ খৃষ্টানকে স্বাধীনতায় বঞ্চিত করিয়াছে, তাহা হইলেও এই অল্পসংখ্যক বিধর্ম্মীর পরিবর্ত্তে পোপের কতকগুলি চেলা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাতে হিসাবে ঘাটতি হয় নাই।"

Extracts From My Diary.
Wednesday—Memorandum.

To write to the India-Mission Society ;
And send £20—heavy tax upon piety !
Of all Indian lux'ries we now-a-days boast,
Making "Company's Christians" perhaps costs the most.
And the worst of it is that these converts full grown,
Having lived in *our* faith mostly die in their own,
Praying hard at the last to some God who they say,
When incarnate on earth, used to steal curds and whey.
Think, how horrid, my dear !—so that all 's thrown away ;
And (what is still worse) for the rum and the rice
They consum'd while believers, we saints pay the price.
Still 'tis cheering to find that we *do* save a few—
The report gives six Christians for Cunnengeadoo ;
Doorkotchum reckons seven, and four Trivendrum,
While but one and a half 's left at Crooshpadum.
In this last mention'd place 'tis the barbers enslave'em
To atone, for this rather small Heathen amount,
Some Papists turn'd Christians, are tack'd to the account.

মুরের টীকাকার বলেন, যে সকল ভারতবাসী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিত, এদেশীয়েরা তাহাদিগকে "কোম্পানির খৃষ্টান," এই নামে অভিহিত করিত। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার কিছুদিন পরে স্বধর্ম্মে ফিরিয়া আসিত। Baptist Mission Societyর রিপোর্টের দ্বিতীয় ভাগে লিখিত আছে,—"The barber says he will not shave Yesoo Kreest's people" "নাপিত বলে যে, সে যীশুখৃষ্টের লোকদিগের ক্ষৌরকার্য্য করিবে না।" শতবর্ষ পূর্ব্বে ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাস সম্বন্ধে কবি যে আভাস দিয়াছেন তাহার মূল্য নেহাত কম নয়। মুরের সময়ে এদেশের রাজারা বিদেশীর নিকট কিরূপ ঋণগ্রস্ত হইতেছিলেন তাহা বর্ণন করিয়া কবি একটি ব্যঙ্গ-কবিতায় লিখিয়াছেন,—"ভারতবর্ষ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, "স্যার আর্চ্চি না কি একজন তাতারবাসীকে প্রায় ধরিয়াছিলেন (সর্ব্ব প্রথমটি উত্তর লাটিটিউড ২১ ডিগ্রিতে ধৃত হয়)—আর ব্রহ্মদেশের রাজা টাকা কিম্বা তৎপরিবর্ত্তে গণ্ডার দিতে অক্ষম হওয়ায় স্বর্ণপদযুক্ত বিগ্রহকে বন্ধক দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। (রাজারা যখন ইচ্ছা করিলেই উত্তমর্ণের সহিত এই প্রকারে লেন-দেন করিতে পারেন তখন তাঁহারা বাস্তবিক সৌভাগ্যশালী নহেন কি ?)"

News For Country Cousins.

"Last advices from India—Sir Archy, 'tis thought,
Was near catching a Tartar (the first ever caught
In N. Lat. 21.)—and His Highness Burmese,
Being very bad press'd to shell out the rupees,
And not having rhino sufficient, they say, meant
To pawn his august Golden-Foot for the payment.
(How lucky for Monarchs, that thus, when they choose,
Can establish running account with the Jews !)"

যে কোন উপায়ে ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থলাভের সুবিধা প্রাপ্ত হওয়ার বিরুদ্ধে মুর নিজের অভিমত প্রকাশ করিয়া একটি খণ্ড-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই কবিতায় তিনি ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন,—"এস, এস, আমার উপদেশ গ্রহণ কর, কেন মিথ্যা নিজের মাথা ঘামাইতেছ ? যেন-তেন-প্রকারেণ নিজের সুবিধা করিয়া লও। যদি হিন্দু কিম্বা চীনের দেবতার নিকট লাভের সুবিধা পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে উপেক্ষা করিও না। যদি চতুর্হস্তবিশিষ্ট বিষ্ণুর দোহাই দিয়া পেনসান, চাকরি প্রভৃতি চতুর্গুণ সুবিধা লাভ করা যায় তাহা হইলে বিষ্ণুকে প্রীত না করা খৃষ্টানের পক্ষে অন্যায় কার্য্য বলিয়া আমি বিবেচনা করি। ইহার কারণ, পৃথিবীতে যে সকল দেবতা নরদেহ ধারণ করিয়া আমাদের অভাব দূর করিবার জন্য অবতীর্ণ হন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিষ্ণুর ন্যায় আকারবিশিষ্ট

তাঁহারাই সুন্দর; আমার ইচ্ছানুরূপ পুংস্কার বা আহার্য্য দান করিবার উপযোগী অবয়ব অপর কোনও দেবতার নাই। সেই জন্য বলিতেছি যে, আমার উপদেশ গ্রহণ কর। এমন কি, যদি শয়তানও বিগ্রহের রূপ ধারণ করিয়া মানুষকে প্রলোভিত করে তাহা হইলেও টোরীদিগের তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, কারণ তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা শয়তানের নিকট কিছু না কিছু প্রাপ্ত হইবে।"

Tout Pour La Tripe (1827)

Come take my advice, never trouble your cranium,
When "Civil Advantages" are to be gain'd,
What god or what goddess may help to obtain you 'em,
Hindoo or Chinese, so they 're only obtain'd.

*

Or were I where *Vishnu*, that four-handed god,
Is the quadruple giver of pensions and places,
I own I should feel unchristian and odd,
Not to find myself also in Vishnu's good graces!

*

For, among all the gods that humanely attend
To our wants in this planet, the gods to my wishes
Are those that, like *Vishnu* and others, descend
In the form, so attractive, of loaves and of fishes!

*

So, take my advice—for, if even the devil
Should tempt man again as an idol to try him,
'T were best for us Tories, even then, to be civil,
As nobody doubts we should get something by him.

কবি মুর হিন্দুর দেবতা বিষ্ণু ও কৃষ্ণকে তাঁহার ব্যঙ্গ-কবিতার আসরে যে ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে হিন্দুবিদ্বেষী বলিয়া মনে হয়। নরকের কথায় তিনি ভারতবাসীর বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়াছেন,—"While hell itself, in India nought but smoke, In Spain 's a furnace, and in France—a joke" (The Sceptic) কবি অপ্সরীদের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"The Arabian pilgrim, smiling here, Beside the mymph of India's sky," (Evenings in Greece) মুর যে সংস্কৃত ভাষা জানিতেন না তাহা 'Sanscrit or High Dutch,' এই কয়টি কথা হইতে বেশ বুঝা যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপর তিনি যে সন্তুষ্ট ছিলেন না তাহাও একটি শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। "An East-India pamphlet 's a thing that would tell—And a lick at the Papists is sure to sell well." (Intercepted Letter) আয়র্লণ্ডে ইংরাজের শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে কবি মুর "হিন্দুস্থানের স্বপ্ন" (A Dream of Hindostan) নামক কবিতা রচনা করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। কবি বিশপ অব ফারন্স (Bishop of Ferns) প্রণীত "আইরিশ চার্চ্চ এষ্টাবলিশমেণ্ট" (Irish Church Establishment) নামক পুস্তক পাঠ করিতে করিতে নিদ্রামগ্ন হইলে একটি স্বপ্ন দর্শন করেন। স্বপ্নে কবি হিন্দুস্থানের একটি সুন্দর নগরীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাহারা অন্ন ব্যতীত অপর কিছু ভক্ষণ করে তাহাদিগকে লোকে পাপী বলে,আর সেখানে মেষ ও গো-জাতিকে দেবতা স্বরূপ সকলে পূজা করে। সেই কারণে, এই সকল পশু হনন করিয়া কেহ আহারের নিমিত্ত ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে না। কবি সেই নগরীর মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রস্তর নির্ম্মিত রাস্তার ধারে সারি সারি কশায়ের দোকান দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এ কেমন কথা? যেখানে লোকেরা মাংসভোজী নয় সেখানে এরূপ জাঁকজমকের সহিত ভোজনার্থে কর্ত্তিত পশুর শিরদাঁড়া ও মাংসখণ্ড সকল প্রদর্শিত হইবার অর্থ কি?" কবির প্রশ্নের কেহ উত্তর দিল না। তাঁহার মনে হইল যেন ভয়প্রযুক্ত কেহ উত্তর দিতেছে না। পথ হইতে পথান্তরে গমন করিতে করিতে কবির মনে হইল যে, রক্তাক্ত কশায়েরা এমন এক বিসদৃশ চিত্রের ন্যায় সেখানে অবস্থান করিতেছে যে তাহার অনুরূপ কিছু কল্পনা করা যায় না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাংস বিক্রয়াভাবে বেঞ্চের উপর নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। পবিত্র গাভীগণও তাহাদিগের অপেক্ষা স্থূলকায় নহে। কবি এই প্রকার অবৈতনিক ব্যবসায় বিষয় চিন্তা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই

অদ্ভুত উৎসবের ব্যয় বহন করে কে ?" সেই শত গোবলি-রূপ যজ্ঞের একজন কর্ম্মকর্ত্তা বলিল, "ব্যয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? আঃ, তাহা ঐ পাপিষ্ঠ অন্নাহারীরা বহন করে।" "কি! যাহারা আদৌ মাংস ভক্ষণ করে না!" "তাহাতে কি হইয়াছে ? ঐ বদমায়েসরা তণ্ডুল ভক্ষণ করিতে পারে কিন্তু তাহাদিগকে আমাদের দোকান চালাইবার খরচ যোগাইতেই হইবে। আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, নিরামিষভোজী-বিরুদ্ধবাদীকে ব্যয় বহুল 'আমিষ বিভাগের' সকল ব্যয় বহন করানই ন্যায্য ও কর্ত্তব্য।" এই কথাগুলি শুনিয়া কবির নিদ্রাভঙ্গ হইল।

"But, lo, in sleep, not long I lay,
When Fancy her usual tricks began,
And I found myself bewitch'd away
To a goodly city in Hindostan—
A city where he, who dares to dine
On ought but rice, is deem'd a sinner ;
Where sheep and kine are held divine,
And accordingly—never drest for dinner.

*

"But how is this ?" I wondering cried—
As I walk'd that city, fair and wide,
And saw, in every marble street,
A row of beautiful butchers' shops—
"What means, for men who don't eat meat,
This gaudy display of loins and chops ?"
In vain I ask'd—'twas plain to see
That nobody dar'd to answer me.

*

So, on, from street to street I strided,
And you can't conceive how vastly odd
The butchers look'd—a roseate crew,
Inshrined in *stalls*, with nought to do ;
While some on a *bench*, half dozing sat,
And the sacred cows were not more fat.

*

Still pos'd to think, what all this scene
Of sinecure trade was *meant* to mean,
"And pray", ask'd I—"by whom is paid
The expense of this strange masquerade ?"—
"The' expense ! Oh, that's of course defray'd
(Said one of these well-fed hecatombers)
"By yonder rascally rice-consumers."
"What ! *they* who mustn't eat meat !"—

"No matter—
(And while he spoke, his cheeks grew fatter)
'The rogues may munch their paddy crop,
"But the rogues must still support our shop.
"And depend upon it, the way to treat
"Heretical stomachs that thus dissent,
"Is to burden all that wo'n't eat meat,
"With a costly Meat Establishment."

ইংরাজ কবি মুর আর একটি কবিত্বময় সুন্দর খণ্ড-কবিতায় আশা-মরীচিকার চিত্র আঁকিয়াছেন। এই কবিতার নাম তিনি "ভারতের নৌকা" (Indian Boat) দিয়াছেন। ইহার নাম "সোণার তরী" দিলেও চলিত। "গভীর রাত্রে নাবিক যখন জলের উপর দিয়া দ্রুত নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে সেই সময়ে সে অকস্মাৎ তাহার সম্মুখে তরঙ্গের বক্ষে আলোক দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল,— "একখানি নৌকা, একখানি নৌকা, ভারতবর্ষের উপকুল হইতে এই নৌকা আসিতেছে, আজ রাত্রে সুবর্ণপিণ্ডে বোঝাই এই নৌকা আমাদের হস্তগত হইবে, আমাদের নৌকা বাহিয়া চল, বাহিয়া চল।" প্রভাতের আলোকে সুবর্ণরাশি নাবিকের চক্ষে স্পষ্টতর প্রতিভাত হইল, কিন্তু তরঙ্গের উপর দিয়া নাবিক অতিদ্রুত নৌকা বাহিয়া চলিলেও সেই সোণার তরী নিকটবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। উজ্জ্বল দিবালোকেও সেই রত্নপূর্ণ তরী তাহার সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। প্রেমিক যুবকের ন্যায় সেই নাবিকের উৎসুক নেত্র লুণ্ঠনযোগ্য সেই তরীর উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল। "আরও পাইল খাটাইয়া দাও! আরও পাইল খাটাইয়া দাও!" সেই নাবিকের নৌকার মাস্তল যখন উত্তাল তরঙ্গে ডুবিতেছে, আর তাহার নৌকাখানি যখন ঝটিকা-বিতাড়িত শরের ন্যায় উড়িয়া চলিয়াছে, তখন মনে হইল যেন সোণার তরী নিকটে আসিতেছে। দিবসের শেষেও এই ভাবে নাবিকের নৌকা অগ্রসর হইতে লাগিল। এক্ষণে চন্দ্র আকাশ হইতে সেই নৌকার গতি দেখিতেছেন, কিন্তু নৌকাখানি বৃথায় দ্রুতগতিতে চলিয়াছে; সেই সোণার তরী অতি সামান্য ও নিকটবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। এইরূপে বহু দিন, বহু রাত্রি গত হইল।

চন্দ্র কতবার যে দিবসের শেষে উদয় হইলেন, তাহা গণিয়া ঠিক করা যায় না। সেই নাবিক দিবারাত্রি অবিশ্রাম গতিতে নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে। কে জানে? কে বলিতে পারে, এক্ষণে সে কোন্ সমুদ্রে ভাসিয়া চলিয়াছে? তাহার পশ্চাতে অন্তহীন গতিশীল্ বায়ু আর তাহার সম্মুখে বিদ্রূপকারী সেই সোণার তরী। যতদিন না আকাশ ও পৃথিবীর মৃত্যু হয়, আর সেই মৃত্যুতে শোকের অবসান হইয়া যায়, ততদিন সেই সোণার তরী এইভাবে ভাসিয়া চলিবে, আর সেই নাবিকের নৌকা তাহার পশ্চাতে অনুধাবন করিবে।"

The Indian Boat.
'Twas midnight dark,
The seaman's bark,
Swift o'er the waters bore him,
When, through the night,
He spied a light
Shoot o'er the wave before him.
"A sail! a sail! he cries;
She comes from the Indian shore,
"And to-night shall be our prize,
With her freight of golden ore:
Sail on, sail on!"
When morning shone,
He saw the gold still clearer,
But, though so fast
The waves he pass'd
That boat seem'd never the nearer.
The bright day light came,
And still the same
Rich bark before him floated;
While on the prize
His wistful eyes
Like any young lover's doated:
"More sail! More sail! he comes,
While the waves o'ertop the mast,
And his bounding galley flies,
Like an arrow before the blast,
Thus on, and on,
Till day was gone,
And the moon through heaven did hie her,
He swept the main
But all in vain,
That boat seem'd never the nigher.
And many a day
To night gave way,
And many a moon succeeded:
While still his flight,
Through day and night,
That restless mariner speeded.
Who knows—who knows what seas
He is now careering o'er?
Behind, the eternal breeze,
And that mocking bark, before!
For, oh, till sky
And earth shall die,
And their death leave none to rue,
That boat must flee
O'er the boundless sea,
And that ship in vain pursue it.'

(*Legendary Ballad*)

এই কবিতার মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ হইতে হয়। রবীন্দ্রনাথের 'সোণার তরী'র ন্যায় ইহাতেও সামান্য আধ্যাত্মিক ভাবের আভাস পাওয়া যায়। মানব-জীবনকে নৌকা ও অনন্ত জীবনকে সমুদ্রের সহিত কবিরা অনেকবার তুলনা করিয়াছেন। মুর "ইষ্ট ইণ্ডিজ" (The East Indies) নামক আর একটি খণ্ড-কবিতায় ইংরাজি মে মাস বা বসন্তকালের গুণকীর্ত্তন করিতে গিয়া উক্ত মাসকে একজন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান বা ভারতবাসী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। এই কবিতা পাঠ করিতে করিতে ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ছবি আমাদের মানস-নেত্রে ভাসিয়া উঠে। ভারতের ফুল ও প্রভাতকালের স্নিগ্ধ বায়ু, সুগন্ধযুক্ত সকণ্টক বৃক্ষ, সঙ্গীতপ্রিয় পক্ষী ও ক্রীড়াসক্ত মক্ষিকা প্রভৃতি বসন্ত-সহচরগণের উৎসবলীলা দর্শন করিয়া আমরা ইংরাজকবির প্রাচ্য শিল্পকলায় নৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি-না। মুর গ্রীক-কবি আনাক্রিয়নের (Anacreon) গীতিকবিতাগুলি পদ্যময় ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। আনাক্রিয়ন খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এই সকল গ্রীক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত একটি কবিতায় ভারতের উল্লেখ আছে।

"Still there lies a myriad more
On the sable India's shore;
There, and many far removed,
All are loving—all are lov'd!"

প্রেমের কবি আনাক্রিয়ন বলিতেছেন যে, তিনি সমগ্র স্ত্রীজাতিকে ভালবাসেন। অন্যান্য দেশের স্ত্রীগণের উল্লেখ করিবার পর তিনি উদ্ধৃত শ্লোকে ভারতের নারীগণের উল্লেখ করিয়াছেন। আনাক্রিয়নের আর একটি কবিতায় প্রাচ্যের বীরগণের উষ্ণীষ-শোভিত মস্তকের উল্লেখ আছে। ("And, by their turban'd heads alone, The warriors of the East are known). ইংরাজ-কবি মুর গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত সুবিখ্যাত আইরিশ সঙ্গীতমালার বিষয় ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। আইরিশ সঙ্গীত (Irish. Melodies) ছাড়া মুর আরও অনেক গেয় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত কবিতার মধ্যে তিনটি কবিতা ভারতবর্ষের স্থানবিশেষে প্রচলিত গানের সুরে বাঁধা। এস্থলে উক্ত তিনটি কবিতার প্রথম ছত্রগুলি মাত্র উদ্ধৃত হইল। (১) "ভারতীয় সুরসম্বলিত গীত" (Indian Air)—"All that's bright must fade"—(২) "কাশ্মীরি সুর-সম্বলিত গীত" (Cashmerian Air)—"Oh, no—not ev'n when first we loved"—(৩) "মারাঠা সুর-সম্বলিত গীত" (Mahratta Air)—"Ne'er talk of wisdom's gloomy schools"—প্রত্যেক গানের ভিতর দিয়া জাতীয় ভাব-বিশেষ অভিব্যক্ত। যে জাতির নাট্য-কাব্যে মানব-চরিত্রের বিস্তারিত সমালোচনা স্থান পাইয়াছে, সে জাতির পক্ষে ভারতবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা সুকঠিন নহে। বাস্তবিক, ইংরাজেরা আমাদিগকে যেমন বুঝিয়াছেন, আমরা নিজেদেরকে সেরূপ বুঝিতে পারি নাই। কবি মুর সেইজন্য ভারতীয় সুরে বিনশ্বর জগৎ সম্বন্ধে সমগ্র হিন্দুজাতির যাহা ধারণা তাহাই শুনিয়াছেন। কাশ্মীরি সুরে প্রেমের বার্ত্তা ভূ-স্বর্গের অধিবাসীদিগের প্রাণের কথা প্রকাশ করিতেছে। মারাঠা বীর কাপুরুষের যুক্তিতর্ক বুঝেন না, আর সেই কারণে কবি মারাঠা বীরের গানে সাহসিকতার আভাস দিয়াছেন। আমরা টমাস মুর ও তাঁহার সমসাময়িক ইংরাজ কবিদিগের রচনা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারি যে, ভারতের কথা লইয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে বিশেষভাবে আলোচনা চলিতেছিল। কবি মুর উদ্ধৃত খণ্ড-কবিতাগুলি ছাড়া কতকটা ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কন্যার বিবাহ প্রসঙ্গে প্রেমবিষয়ক একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই সুবিখ্যাত কাব্যের নাম "লালা রুখ" (Lalla Rookh)। রোমাণ্টিক যুগে ইংরাজি ভাষায় যতগুলি প্রাচ্য-কাব্য রচিত হইয়াছিল, লালা রুখ তাহাদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কবি মুর এই কাব্যে যে কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা উক্ত যুগের অন্য কোনও ইংরাজ কবির রচিত এই শ্রেণীর কাব্যে পাওয়া যায় না।

সাহিত্যে স্বাধীনতা।

[ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্-এ, ডি-এল্]

• • • সেই সাহিত্যই সৎসাহিত্য যাহা সাহিত্যিকের চিত্তের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। যেখানে এই স্বাভাবিক অভিব্যক্তির স্বাধীনতা নাই, সেখানে সৎসাহিত্য থাকিতে পারে না।

সাহিত্য একটা আর্ট। শিল্পীর নিষ্ঠার সহিত ইহার সেবা করিতে হয়, দীর্ঘ সাধনার দ্বারা ইহাতে সফলতা অর্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু এই সাধনা, এই শিক্ষা, এই অর্জ্জিত শিল্পকুশলতাই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান নয়। ভাষার বিন্যাস যত কেন সুললিত হউক না, অলঙ্কারের প্রয়োগ যতই যথেষ্ট হউক না কেন, তাহাতে সাহিত্য

হয় না, যদি তাহার ভিতর সাহিত্যের প্রকৃত প্রাণ না থাকে, যদি তাহাতে লেখকের দৃষ্ট সত্য-শিব-সুন্দরের কোনও নূতন প্রকাশ না পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

সাহিত্য সত্য শিব ও সুন্দরের অনুশীলন। প্রকৃত সাহিত্য-শিল্পীর চোখে এই সত্য-শিব-সুন্দরের কোনও নূতন রূপ ফুটিয়া ওঠে—তাহাই প্রচার করিয়া সাহিত্যিক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রত্যেক সাহিত্যিক কেবল সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসক বা পুরোহিত নন—তাঁহারা ঋষি বা Prophet. ঋষির চক্ষে যেমন সত্যের আলোক ভাসিয়া উঠে, মুগ্ধ ঋষি তন্ময় হইয়া তাহাকে মন্ত্রে গাঁথিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, তেমনি সত্য-শিব-সুন্দরের নিত্য নূতন রূপ সাহিত্য-ঋষির চক্ষে ফুটিয়া উঠে—তাহারই প্রকাশের চেষ্টার ফল সাহিত্য।

এটা বড় স্পর্দ্ধার কথা, কিন্তু ইহা খাঁটি সত্য। প্রকৃতির কোনও নূতন ছন্দে বা জীবনের কোনও নূতন প্রকাশে সত্য শিব-সুন্দরের কোনও নূতন রূপ—কোনও নূতন সত্য যদি আমার চক্ষে ফুটিয়া না উঠিয়া থাকে, আমি যদি বেদের ঋষির মতই স্পর্দ্ধা করিয়া জগতকে না বলিতে পারি যে "বেদাহং"—জানিয়াছি, আমি এই নূতন সত্য চিররহস্যময়ী প্রকৃতির এক নূতন রহস্য, বৈচিত্র্যময় জীবনের এক নূতন কাহিনী, তবে আমার সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা নিষ্ফল। নূতন করিয়া কিছু বলিবার যদি আমার না থাকে তবে কথা গাঁথিয়া আমি যতই বাহাদুরী লই না কেন, আমি সাহিত্য সৃষ্টির স্পর্দ্ধা করিতে পারি না। তবে প্রভেদ এই যে, বেদের ঋষির দৃষ্টি নিবদ্ধ "তমসঃ পরস্তাৎ", সমস্ত জীবের, সমস্ত জগতের অন্ধ তমসের অন্তরালে যে অদৃষ্ট আলোক তাহার উপর কিন্তু সাহিত্য-ঋষি এই মর-জগতের হাসি-কান্নার ভিতর এখানকার ভাবনা চিন্তা, খেলা ধূলার ভিতর, মানব জীবনের ভিতর, এই নশ্বর প্রকৃতির ভিতর চক্ষু ডুবাইয়া তাহার ভিতর যুগপৎ গুপ্ত ও প্রকাশিত সত্য-শিব-সুন্দরের স্বরূপ ধ্যান করেন।

যাহা কিছু লেখা হইয়াছে, বা যাহা কিছু জগতে কোনও না কোনও সময়ে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে তাহাই সাহিত্য পদবাচ্য নয়। এবং যাহা কিছু সমাজের উপকারী তাই যে সৎসাহিত্য তাও নয়। এই হিসাবে যদি সাহিত্যের পরিমাপ করা চলিত, তবে শিশুশিক্ষা ও কথামালা বঙ্গ সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত। পরের মুখে শোনা কথা বেশ গুছাইয়া উপস্থিত করিলে তাহাতে যে অনেকের উপকার হয় তাহা প্রত্যেক পরীক্ষার্থীই স্বীকার করিবেন। কান্ট বা হেগেল বা হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি মত-প্রবর্ত্তকের গ্রন্থ কয়জনে পড়িয়া থাকে? আর এই সকল মনীষির লব্ধ সত্য কুড়াইয়া মালা গাঁথিয়াছেন যে Mackenzie, Stephen প্রভৃতি তাঁহাদের গ্রন্থ দর্শন শিক্ষার্থীর ঘরে ঘরে। কিন্তু এ সব গ্রন্থ তাই বলিয়া সাহিত্য নয়।

রস-সাহিত্যে এমন পরস্বোপজীবির অভাব নাই। অনেক কবিতাই তো পরের জীর্ণরসের পুনরুদ্গার—অনেক উপন্যাসই পরের সৃষ্ট চরিত্র ও ঘটনা লইয়া নাড়াচাড়া মাত্র। সাহিত্যের ইতিহাসে যে এই রকম অক্ষম সাহিত্যের একেবারে উপকারিতা নাই, এমন কথা বলা যায় না। অক্ষম কবি বা ঔপন্যাসিক অনেক সময় দশ জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া এমন একটা অদ্ভুত খিচুড়ীর সৃষ্টি করেন যাহা আশ্রয় করিয়া প্রকৃত প্রতিভাশালী লেখক পরে অমৃতপ্রাশ রচনা করেন। শেকস্পীয়ারের রচনায় এমন ঝুড়ি ঝুড়ি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেক নাটক রচনায় শেকস্পীয়ার তাঁর পরবর্ত্তী বা সমসাময়িক এমন সব লোকদের লেখার কথা ও ভাষা আত্মসাৎ করিয়াছেন যাহাদের নাম পর্য্যন্ত অনেক পুঁথি ঘাঁটিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। এই সব অপদার্থ উপাদান তৈয়ার না থাকিলে যে শেকস্পীয়ারের প্রতিভা কোন্ পথে বিকশিত হইত তাহা লইয়া আলোচনা করা নিষ্ফল। কিন্তু এই অপদার্থ সাহিত্যও যে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য "সৃষ্টি" সম্ভব করিয়া আপনি সার্থক হইয়াছে ও জগতের হিতসাধন করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কাজেই সমাজের উপকার অপকারের মানদণ্ড লইয়া সাহিত্যের গুণ বিচার করিলে প্রকৃত সাহিত্য রসের অবমাননা করা হয়। "বিষবৃক্ষ" পড়িয়া কতকগুলি

মেয়ে বিষ খাইয়াছে; "কৃষ্ণকান্তের উইল" পড়িয়া কত হিন্দু কুলবধূ স্বামী ত্যাগ করিয়াছে আর বিধবা উন্মার্গ-গামিনী হইয়াছে; "আনন্দ মঠ" পড়িয়া কতগুলি যুবক ডাকাতি করিতে নামিয়াছে, এ হিসাব সাহিত্যের হিসাব নয়, ইহাতে সাহিত্যের ভালমন্দ যাচাই করা চলে না। তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর সামাজিক আদর্শ কতখানি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, যে সব অনুষ্ঠানের উপর আমাদের সমাজ প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তুমি বা আমি বিশ্বাস করি, তার কতটা তিনি ভাঙ্গচুর করিয়াছেন, এ সব কথা সাহিত্য সমালোচনায় নিতান্ত অবান্তর।

ভ্রমর গোবিন্দলালের সঙ্গে যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা শাস্ত্রসঙ্গত কি না এ কথার আলোচনা শুনিয়াছি। ইহা হিন্দু কুলনারীর আদর্শের সঙ্গে খাপ খায় না বলিয়া নিন্দা শুনিয়াছি। এ সব সমালোচনা যে অজ্ঞতাপ্রসূত তাহা জানি, জানি যে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের প্রাচীন সমাজেই একটা লুপ্ত আদর্শ মহাভারত হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহাই ভ্রমরের ভিতর ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, জানি যে মহাপাতকী স্বামীর সহবাস পত্নীর পক্ষে শাস্ত্রানুসারে অকর্ত্তব্য। কিন্তু এসব সমালোচনা সত্য হইলেও ইহাতে "কৃষ্ণকান্তের উইলের" গৌরবের কোনও হ্রাস বৃদ্ধি হইত না। ভ্রমর চরিত্র শাস্ত্রীয় হউক বা অশাস্ত্রীয় হউক, ইহা সত্য কি না, ভ্রমরের প্রত্যেকটি কথা ও কার্য্য তার চরিত্রের ও অবস্থার সঙ্গে সুসঙ্গত কি না, ইহাই বিবেচ্য। যদি সমস্তটা ভ্রমর চরিত্র সত্য ও সুশোভন হয়—এবং ইহার ভিতরকার সত্যটা যদি একটা নূতন দৃষ্ট সত্য হয় তবেই এ চরিত্র সাহিত্যে উচ্চপদ লাভের যোগ্য,—তাহাতে হিন্দু সমাজ থাক বা ভাসিয়া যাক।

সমাজ ভাসিয়া যাক এমন ইচ্ছা যে আমি করি না তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সমাজে যদি, এমন কিছু থাকে যাহাকে বাঁচাইবার জন্য সত্যকে ঠেলিয়া তফাৎ করিতে হইবে তবে সে জিনিষটা রাখিবার জন্য আমি ব্যস্ত নই। সমাজের ভিতর তাই স্থায়ী ও হিতকর, যাহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই সমাজ রক্ষার খাতিরে সত্যকে ভয় করিবার কোনও প্রয়োজনই নাই। কোনও সাহিত্যিক কোনও সত্যকে উলঙ্গ করিয়া সমাজের সামনে উপস্থিত করিলে যদি ভয় পাইতে হয় তবে বুঝিতে হইবে যে আমাদের সমাজের ভিতর কোথাও এমন একটা অসত্য আছে যাহা সত্যের ভয়ে কুণ্ঠিত। পক্ষান্তরে এমন গ্রন্থ থাকিতে পারে যাহাতে সমাজের ভয় পাইবার যথেষ্ট হেতু আছে, কিন্তু সে ভয়ের কারণ এই যে, এই জাতীয় গ্রন্থ একটা অসত্যকে সত্য বলিয়া চালাইতে চায়। Anatole France, Zolaর উপন্যাসের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁর সমালোচনার মূল সূত্র ইহা নয় যে Zolaর গ্রন্থ সমাজের পক্ষে অহিতকর—তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, Zola ফরাসী নরনারীর জীবন যে ভাবে দেখিয়াছেন ও চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা অসত্য এবং অসত্য বলিয়াই তাহা দূষ্য। Zola সম্বন্ধে এ অভি-যোগের সত্য মিথ্যা আমি বিচার করিতে চাই না, Zolaর ভিতর তিনি যে দোষ দেখিয়াছেন Franceএর নিজের লেখা কি পরিমাণে সেই দোষে কলুষিত তাহাও আলোচনা করিতে চাই না—আমি সুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, সাহিত্যের বিচারে এই মানদণ্ডই একমাত্র মানদণ্ড—সাহিত্য সত্য কি না তাহাই বিচার্য্য। যদি সত্য হয় তবে তাহাতে সমাজের ভয় পাইবার কিছু নাই।

উপন্যাস ও কাব্যকে সত্য বলিলে বিজ্ঞান ও দর্শনের পক্ষ হইতে ঘোরতর আপত্তির সম্ভাবনা আছে। তাঁহাদের মতে সত্য সেইটা যাহাকে পরীক্ষাগারের যন্ত্রের ভিতর দিয়া চুয়াইয়া লওয়া যায় বা লজিকের বাটখারায় মাপিয়া লওয়া যায়। কাব্য ও উপন্যাস কল্পনা। কিন্তু সত্য ও কল্পনার ভিতর এই যে বিরোধ, ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। সাহিত্যের কল্পনা সত্যের বাহন মাত্র, ইহা অসত্য নয়। কবি যখন ফুলের হাসি দেখিয়া আত্মহারা হন বা নীরব নিশীথে চন্দ্র তারকার নিভৃত প্রেমসম্ভাষণের কথা গান, তখন তিনি যাহা বলেন তাহা নিছক কল্পনা। কিন্তু এ কথা সেই উপভোগ করিতে পারে, যে ইহার ভিতর সত্যের সন্ধান পাইয়াছে—যে নিজের অজ্ঞাতসারে কোনও একদিন এই ভাবে

ভাবিত হইয়াছে এবং এই কবির ভাষায় সেই ভাবের স্বরূপ দর্শন করিতে পারিয়াছে। ইহার ভিতর যে সত্য তাহা Botanyর সত্য নয়, Astronomyতে ইহা অগ্রাহ্য, Physicsএ ইহার স্থান নাই, কিন্তু ইহা সত্য মানবের অন্তরে। প্রকৃতি মানবের প্রাণে যে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করে, এ সব কল্পনা সেই সত্য অনুভূতির একটা অসম্পূর্ণ প্রকাশ মাত্র। এই সত্য যে কাব্যে আছে তাহাই কাব্য, আর যেখানে ইহা নাই তাহা যতই অলঙ্কৃত হউক না কেন তাহা কেবলি পদ্য। তেমনি ঔপন্যাসিকেরও প্রধান ও একমাত্র উপজীব্য সত্য। উপন্যাসের পাত্রপাত্রী, তাহার ঘটনা বিন্যাস সবই কাল্পনিক, কিন্তু এ সব কল্পনার সৃষ্টি হয় হৃদয়ের তপ্ত রক্ত-ধারায়, জীবন্ত সত্যের ইহা প্রকাশ। Holmesএর Autocrat বলিয়াছেন, "আমি কখনও উপন্যাস লিখিব না, কেন না তাহা হইলে আমি আমার নিজের মনের গুপ্ত খবর সব প্রকাশ করিয়া ফেলিব আর না জানি আমার কত বন্ধুবান্ধবকে গল্পের ভিতর গাঁথিয়া দিব। এই সত্যটাই প্রকাশ করিতে Jerome K, Jerome বলিয়াছেন, "We write with our heart's blood" ঔপন্যাসিক নিজের কল্পনা-প্রসূত পাত্রীর মুখে আপনার অন্তরে প্রকাশিত সত্য ফুটাইয়া তুলেন, নিজের অনুভূত বেদনা তাহাদের ভাষার মধ্য দিয়া ধ্বনিত করেন। যেখানে আপনার ভিতর এই অনুভূতি নাই সেখানে ঔপন্যাসিকের লেখা অসার ও প্রাণ-শূন্য হয়। লেখককে আপনার সৃষ্ট নরনারীর অন্তরের ভিতর প্রবেশ করিয়া নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাদের অন্তরের কথা আয়ত্ত করিতে হয় এবং এমনি করিয়া লিখিলেই উপন্যাস সার্থক হয়। Jerome তাঁর নিপুণ রহস্যের ভাষায় এই সত্যটা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়া-ছেন যে, একদিন শীতের দিনে প্রত্যূষে তিনি Hyde Parkএ বেড়াইতে গিয়া তাঁর এক বন্ধুকে দেখিতে পান। বন্ধু অত্যন্ত অপ্রসন্ন ভাবে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কে যেন তাঁহাকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইতেছে। Jerome বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপার কি? বন্ধু অদৃষ্ট কোনও একজনকে একটা গালি দিয়া বলিলেন, তাঁর অদৃষ্টের ফের, তিনি একখানা নূতন উপন্যাস লিখিতে বসিয়াছেন। উপন্যাসের নায়িকা একটি অষ্ট্রেলিয়ার মেঠো মেয়ে। সে হতভাগিনীর অত্যাচারে তিনি জর্জ্জরিত। আজ শিকারে, কাল পাহাড়ে, পরশু সাগরে, এমনি করিয়া সে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর ঔপন্যাসিক বেচারিকে পিছু পিছু ছুটিয়া হয়রান হইতে হইতেছে। এখন সে মেয়ে আসিয়াছে লণ্ডনে; খেয়াল হইয়াছে প্রত্যূষে লণ্ডনের শোভা দর্শন করিবে, তাই গ্রন্থকারকে রাত না পোহাইতে বিছানা ছাড়িয়া ছুটিতে হইয়াছে Hyde Parkএর ঝোপে ঝাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে।

খেয়ালী পাত্র পাত্রীর হাতে পড়িয়া ঔপন্যাসিকের এমন লাঞ্ছনা ঘটিতেই হয়। তিনিই পাত্রপাত্রীর সৃষ্টি করেন সত্য, কিন্তু সৃষ্টি করিবামাত্র তাহারা স্বতন্ত্র সত্য হইয়া দাঁড়ায়, তখন আর ঔপন্যাসিকের তাহাদিগকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাই করিবার স্বচ্ছন্দতা থাকে না। তখন প্রত্যেকটি ঘটনার সৃষ্টিতে, প্রত্যেকটি কথার গাঁথুনীতে, তাঁহার এই সব সত্য নর নারীর অন্তরের ভিতর চাহিয়া লিখিতে হয়। যতক্ষণ না তিনি ইহাদের অন্তরের ভিতর প্রবেশ করিয়া নিজেকে ঠিক সেই অবস্থায় ফেলিয়া নিজের ভিতর তাদের সুখ দুঃখের ভাবনা চিন্তার অনুভূতি জাগাইয়া তুলিতে পারিবেন ততক্ষণ তাঁহার উপন্যাস সত্য হইবে না। কিন্তু যদি লেখক তাঁহার কল্পিত পাত্র পাত্রী সৃষ্টিমাত্র করিয়া তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিতে দেন এবং তাহাদেরই প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিয়া ঠিক তাহাদের ভাষায় কথা কন, তবে তাঁহার উপন্যাস প্রকৃত প্রাণবান উপন্যাস হয়— কেন না, সে উপন্যাসের উপাদান মিথ্যা নহে সত্য, কল্পিত চরিত্রের ভিতর দিয়া জীবনের যে রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা সত্য—এই সত্যই উপন্যাসের প্রাণ। ঔপন্যাসিক যদি অন্তরের সকল সত্ত্বা দিয়া সত্যকে বেদনার মত অনুভব করিয়া প্রাণের ভাষায় তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার উপন্যাসে যতই কলাকুশলতার পরিচয় থাকুক না কেন, তাহা উপন্যাস নয়, তাহা সাহিত্যের ভার বৃদ্ধি করে, সম্পদ বাড়ায় না। ঔপন্যাসিকও আর সকল সাহি-ত্যিকের মতই ঋষির দৃষ্টিতে জীবনের ভিতর সত্য-শিব-

সুন্দরকে দর্শন করিয়া লেখার মুখে তার নূতন স্বরূপ পরিস্ফুট করিয়া তুলেন।

ঔপন্যাসিক যে নিজের সৃষ্ট পাত্র পাত্রী ও ঘটনাবলীর কাছে কতটা পরাধীন তাহার দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যাইতে পারে। যে সত্য সত্য আর্টিষ্টের ঋষির দৃষ্টি লইয়া জন্মিয়াছে, সে যেমন ছবি আঁকিতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে না, ঔপন্যাসিকও লেখায় তেমনি অস্বাতন্ত্র্য অনুভব করিয়া থাকেন। নিপুণ চিত্রকরের ভাবাবেশে তার চোখের সামনে একটা ছবি ভাসিয়া উঠে—সেই ছবিকে তিনি পটের উপর ফুটাইয়া তুলিতে গিয়া যে সব রেখাপাত করেন, সেগুলি তার নিজের স্বেচ্ছাচারের ফল নয়। তাঁর তুলিকার প্রত্যেকটি স্পর্শ তাঁর স্বপ্নদৃষ্ট এই ছবির দিকে চাহিয়া নিয়মিত করিতে হয়, প্রত্যেকটি রেখা, প্রত্যেকটি বিন্দু এমন ভাবে পরখ করিয়া দিতে হয় যাহাতে সে চিত্রটী সেই ভাবের ছবির অনুরূপ হইতে পারে, তার ভিতর যে রেখাশূন্য রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারই যথাসম্ভব সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়। তাই চিত্রকর অনেক সময় এক একটা হাত, এক একটা অঙ্গুলী, একটি রেখা, কি মুখের কোণের একটী রেখা দশবার দশরকম করিয়া আঁকিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করেন, দশবার মুছিয়া শেষে একটী রূপ তাঁর ধ্যানদৃষ্ট মূর্ত্তির সঙ্গে মিলাইয়া তাহাই আঁকিয়া ফেলেন।

ঔপন্যাসিকের মনেও অনেক সময় সত্যের আভাস এমনি অস্পষ্ট আলোকের মত জ্বলিয়া উঠে, ক্রমে তাহা একটি কাল্পনিক চিত্রে আকারিত হইয়া উঠে। এই চিত্রকে নানা ঘটনার ভিতর দিয়া অসংখ্য খুটিনাটির ভিতর দিয়া পরিপূর্ণ রূপে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টায় উপন্যাস রচনা হয়। এই যে অসংখ্য খুটিনাটি, ইহার কল্পনা ও নির্ব্বাচনে ঔপন্যাসিককেও চিত্রকরেরই মত দশরকম পরিকল্পনা লইয়া তাঁহার ভাবাবেশে দৃষ্ট সেই চিত্রের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হয়, অনেক সময় গড়িয়া ভাঙ্গিতে হয়, লিখিয়া মুছিতে হয়। কতটা ভাঙ্গিতে চুরিতে হয় তাহার সামান্য ইঙ্গিত মাত্র কখনও কখনও বাহিরের জগতে প্রকাশ হইয়া পড়ে, কিন্তু অনেক সময় ঔপন্যাসিকের প্রাণের সে গোপন কথাটা প্রাণের নিভৃত কন্দরেই থাকিয়া যায়। এমনি একটা ইঙ্গিত আমরা দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে"তে। 'সবুজ পত্রে' এ গল্পের যে আরম্ভ হইয়াছিল, গল্পের সমাপ্তিটা তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গত নয়, তাই পুস্তকাকারে রবীন্দ্রনাথ আরম্ভটাকে বদলাইয়াছেন। এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে।

প্রকৃত সাহিত্যিক মাত্রেই যদি নূতন সত্যের ঋষি হন, যদি সত্য-শিব-সুন্দরের কোনও নূতন রূপ অনুভূতিমুখে লাভ করিয়া জগতে প্রচার করাই তাঁহার জীবনের ব্রত হয়, তবে তাঁহার স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। সত্য যাহার নিকট যেমন ভাবে প্রকাশ হইয়াছে, যে রূপ যাহার চোখে যেমন হইয়া ফুটিয়াছে, সেটা তেমনি করিয়া প্রকাশ করিলেই না সাহিত্য হইবে। তবেই না তাঁর জীবনের ব্রতের উদ্‌যাপন হইবে। অলঙ্কারের অষ্টবন্ধন বা সমাজের বজ্রশাসন দিয়া তাহাকে বাঁধিতে চেষ্টা করা নিষ্ফল। যে গড়িবার শক্তি লইয়া জন্মিয়াছে, সত্যকে যে নূতন করিয়া পাইবার অধিকার পাইয়াছে, এ শাসনে তাহাকে বাঁধিতে পারিবে না। তাকে জীবন সার্থক করিতে হইলে তার দৃষ্ট আলোক মাত্র শরণ করিয়া অক্ষুণ্ণ নূতন পথে ছুটিতেই হইবে।

উপন্যাস সম্বন্ধে একটা প্রচলিত সংস্কার আছে যে, ইহার আগা ও গোড়া একসঙ্গে কল্পনা করিয়া তাহার ভিতর একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয়, সমাপ্তিতে গল্পটার একটা স্বাভাবিক পরিণতি লাভ দরকার। Bernard Shaw তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে এই সংস্কারের নিগড় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এমন দুই একখানা বই লিখিয়া ফেলিলেন যাহার সমাপ্তিটা এ হিসাবে সমাপ্তিই নয়, গল্পটা যেন জীবনের মধ্যপথে থামিয়া গেল। কিন্তু এ উপন্যাসগুলি জীবনের নানা রহস্য নিপুণভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে, জীবনের সত্যস্বরূপ আর্টিষ্টের তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছে। গত বৎসর যিনি Nobel Prize পাইয়াছেন, সেই Knut Hamsunএর উপন্যাসগুলি এমনি সমালোচকের সংস্কার বিরোধী। চলিত আদর্শের মাপজোখ দিয়া পরিমাণ করিলে এগুলির ঝুড়ি ঝুড়ি দোষ ধরা পড়ে। কিন্তু তবু হামসুনের বইগুলি আদৃত হইয়াছে। কেন না, ইহা

জীবনকে জীবন্ত বর্ণে চিত্রিত করিয়াছে, অনাড়ম্বর সরল ভাষায় ও সামান্য সহজ ঘটনার স্বাভাবিক বিন্যাসের দ্বারা হামসুন নিজের জীবনে উপলব্ধ ভাব ও বেদনা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন বলিয়া তাঁর Growth of the Soil, Mothwise প্রভৃতি গ্রন্থ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

সাহিত্য ঋষির এই স্বাধীনতা স্বীকার না করিলে সৎসাহিত্যের সৃষ্টি হইবে না। সাহিত্যকে যদি পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইতে হয়, তবে তাকে যথেষ্ট হাত পা খেলাইবার অবসর দিতে হইবে। সাহিত্যিকের অন্তর-মন্দিরের সবগুলি দুয়ার জানালা খুলিয়া দিয়া তার ভাবকে খেলিতে দিতে হইবে। সৎসাহিত্যের নামে ঝুড়ি ঝুড়ি বিধি নিষেধের প্রাচীর তুলিয়া দিয়া, নানা কঠোর শাসনের বাঁধাবাঁধির ভিতর একটা ফরমায়েসী সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা জীবন্ত সাহিত্য হইবে না। বাড়ীর ভিতর আট-ঘাট বাঁধিয়া দরোয়ান ও মাষ্টার মহাশয়ের চোখের তলায় বন্ধ ঘরে যে ভালো ছেলে গড়িয়া উঠে, জীবন-সাগরের ঊর্ম্মি সংঘাতে সে কোথায় তলাইয়া যায়, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। মাঠে মাঠে ছুটিয়া খেলিয়া, লড়াই করিয়া, আছাড় খাইয়া যে মানুষ গড়িয়া উঠে, সে পরম আনন্দে ঢেউয়ের সঙ্গে লড়িয়া যুঝিয়া তাহার চূড়ায় চূড়ায় ভাসিয়া বেড়াইতে পারে। সৎসাহিত্যই আমরা চাই, কিন্তু তাকেই বলি সৎসাহিত্য, যাহার ভিতর সত্য প্রাণ আছে, যাহা খোলামাঠের আলো-হাওয়ায় স্বাধীন ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে, ঝঞ্ঝার ভিতর মাথা খাড়া করিয়া রহিয়াছে, সত্যের আলোকে আগাগোড়া উদ্ভাসিত হইয়াছে। এমন সৎসাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইলে সমাজকে চোখ রাঙ্গাইয়া গুরু মহাশয় সাজিয়া বসিলে চলিবে না, সর্ব্বদাই সনাতন, অতএব পুরাতন আদর্শে নূতনের ভালমন্দ যাচাই করিয়া কল্পিত অসৎ সাহিত্যকে পিষিয়া মারিবার আয়োজন করিলে চলিবে না। পুরাণো বেমানান পোষাক যদি নূতন লোককে পরাইতে হয়, তবে সে মানুষকে ছাঁটিয়া পোষাকের সমান করিবার কল্পনা উল্টারাজার দেশেই সম্ভব।

সাহিত্যের গৌরব বিচারে যদি প্রধান কথা এই হয় যে, সাহিত্যের প্রাণ আছে কি না, তাহার ভিতর কোনও নূতন সত্য সজীব হইয়া উঠিয়াছে কি না, তবে আমাদের পুরাতন সংস্কারের উদ্যত রোষ দমন করিয়া রাখিয়া প্রথমে বিচার করিতে হইবে এই গোড়ার কথা। পিতামহের আমলে তৈয়ারী গহনা যদি নবজাত শিশুর হাতে না ঢোকে, তবে শিশুর পক্ষে সেটা বিশেষ নিন্দার কথা নয়। এবং যে পিতামহী সেই আক্রোশে শিশুকে কোলে তুলিতে অস্বীকার করে, তাহার স্থান পাগলা গারদে। বুদ্ধিমান লোকে প্রাণপূর্ণ সুপুষ্ট শিশুটিকে কোলে করিয়া হৃষ্টচিত্তে সেকরা ডাকিয়া গহনা ভাঙ্গিয়া গড়াইতে দেয়।

স্বাধীনতা সাহিত্যপুষ্টির জন্য কতটা দরকার, তাহা একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। অনেক স্কুল-কলেজে ছেলেদের লেখার সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। সেই সমস্ত সাময়িক পত্রের লেখার ভিতর এমন একটা আড়ষ্টতা ও প্রাণশূন্যতা দেখা যায়, যাহা সেই সব লেখকেরই অন্য লেখায় দেখা যায় না। তা ছাড়া যাও বা লেখা থাকে, তাহাও ছেলেদের নিকট হইতে সংগ্রহ করা সুকঠিন হয়। ঢাকা কলেজে এমনি একটি সাময়িক পত্র পরিচালকদের নিকট শুনিয়াছি যে, ঐ কলেজের হোষ্টেলে ছেলেরা আপনা-আপনির ভিতর বেশ নিয়মিতরূপে একখানা হাতের লেখা মাসিকপত্র চালাইত, এবং তাহাতে যে সব লেখা বাহির হইত তাহা অনেক সময়ই বেশ সরস ও প্রাণপূর্ণ। এই প্রভেদের হেতু এই যে, কলেজের কাগজের জন্য লিখিতে গেলেই একটা অস্বাভাবিক আড়ষ্টতা ছেলেদের মধ্যে আসিয়া পড়ে। লেখকের সর্ব্বদাই মনে থাকে যে সে লেখা তার একজন শিক্ষকের হাতে পড়িবে; সুতরাং শিক্ষকের মনের দিকে চাহিয়া নিজেকে সে এমন অস্বাভাবিক রকমে গম্ভীর ও প্রাজ্ঞ করিয়া ফেলে যে তার লেখার আশে পাশে তার সহজ প্রাণটা খেলিতে পায় না। এমন অবস্থায় ফসল যে কেবল খুব উচুদরের হয় না তাই নহে, ফলনও কম হয়।

সাহিত্যের সেবা করিতে গিয়া যদি কেবলি চলিত সংস্কারের দাসত্ব করিতে হয়, পথ চলিতে পায় পায় যদি সনাতন শাস্ত্রের নেতি নেতি শুনিয়া চলিতে হয়, তবে

প্রতিভার অন্তরাত্মা ভয় পাইয়া বিদায় হয়। কাজেই সৎসাহিত্য যদি আমরা পাইতে চাই, তবে অসৎ সাহিত্য বা অসাহিত্যের ভয়ে অধীর হইয়া সাহিত্যের সকল পথে কাঁটা ছড়াইয়া রাখিলে চলিবে না। আগাছার ভয়ে জমী কাটিয়া পুকুর করিলে চলিবে না। আগাছার সঙ্গে সঙ্গে যে অমৃত ফলের গাছ বাড়িয়া উঠিবে তাহার আশায় জমিতে সার ছড়াইতে হইবে। সাহিত্য ক্ষেত্রে আগাছা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না, কেন না, তাহার ভিতর জীবনের বীজ যে সত্য তাহা নাই, সুতরাং আগাছা নিড়াইবার ভার কালের উপর দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত মনে অমৃত ফলের রস সম্ভোগ করিতে পারি।

সাহিত্যে স্বাধানতার পক্ষে ওকালতি করিতেছি বলিয়া কেহ একথা মনে করিবেন না যে, সাহিত্য কোনও দিনই নিজের রাজ্যে কোনও সীমা স্বীকার করিয়াছে। সাহিত্যিকের স্বাধীনতা প্রসাদলব্ধ নয়, ইহা তাহার ঈশ্বরদত্ত অধিকার। সাহিত্য কোনও দিন কাহারও কাছে ভিক্ষা করিয়া ইহা লাভ করে নাই, কোনও দিন এ বিষয়ে বিচার করিবার কোনও জুরিসডিক্‌সন স্বীকার করে নাই। সে তাহার নিজের অধিকারে চিরদিনই নিজের রাজ্যে তত্ত্বের তুঙ্গতম শিখর হইতে রস-সাগরের অতল গভীরতা পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া সত্য-শিব-সুন্দরকে আপনার ভিতর ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সমালোচক চিরদিনই ইহার পিছু পিছু ছুটিয়া কখনও বা রসের প্রসাদে তৃপ্ত হইয়াছে, কখনও বা ইহার উপর আপনার মায়ার জাল ছড়াইয়া মনে করিয়াছে সাহিত্যকে এবার শাসনে আনিয়াছি, কিন্তু প্রতিভা চিরদিনই সকল গণ্ডী অস্বীকার করিয়াছে,এ মায়ার বন্ধন তার সম্মুখে চিরদিনই লুতাতন্তুর মত অলক্ষ্যে ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

শাসনের রক্ত চক্ষুতে সাহিত্য কোনও দিন ভয় পায় নাই, পাইবে না, নিগড়ের ঝঞ্ঝনা সে চিরদিন হাসিয়া উড়াইয়াছে। এ যে বিধাতার প্রসাদপুষ্ট গরুড় পক্ষী, স্বর্গ হইতে রসাতল পর্য্যন্ত ইহার স্বচ্ছন্দ বিচরণ, ইহাকে বাঁধিবে কে? সত্যের স্নিগ্ধ তীব্র জ্যোতিঃ যার চক্ষে নিয়ত জ্বলিতেছে, আঁধার তাহাকে অন্ধ করিতে পারে না। সুন্দরের রসের অমৃতে যে অক্ষয় অমর, অনাদরের মৃদুবিষে তাহাকে মারিবে কে? শিবের অক্ষয় কবচ তার, হিংসার ক্ষীণ শায়কে বিঁধিবে কে? যে সাহিত্য জগতে বিধাতার আহ্বান পাইয়া অগ্রসর হইয়াছে, ঋষির দৃষ্টিতে যে শিব-সুন্দরকে দেখিতে শিখিয়াছে, সত্যের অভ্রান্ত আলোক যাহার হৃদয়ে নিরন্তর জ্বলিতেছে, সে বাণীর দুলাল, সে বজ্র লইয়া হাসিয়া খেলিতে পারে, আগুনের ভিতর নাচিয়া বেড়াইতে পারে। গ্লানি তাহাকে স্পর্শ করে না, ক্লেদ তাহার অন্তর কলঙ্কিত করে না। সে স্বরাট! আপনার অবিসম্বাদী রাজ্যে সে সম্রাট, বাণীর সর্ব্বেষ্টিযজ্ঞে সে হোতা, সে সর্ব্বজিৎ।

মহতের দান।

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

জ্যোৎস্নাধৌত রজনীতে একা সিরাজ চুপ করিয়া প্রাঙ্গণে একটা খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িয়াছিল। বারাণ্ডায় তাহার বিধবা ভগিনী রহিমা রন্ধন করিতেছিল। মাঝে মাঝে আপনা আপনিই বকিতেছিল; সিরাজের কানে শুধু তাহার সুরটা ভাসিয়া আসিতেছিল, কথাগুলা বুঝিবার সে আদৌ চেষ্টা করে নাই, কারণ তাহার মনটা তখন নিজের চিন্তাতেই ভারী হইয়া উঠিয়াছিল।

আকাশ-ভরা শুভ্র চাঁদের আলো; পৃথিবী চাঁদের আলোয় ভরিয়া গিয়াছে; যাহার উপর চাঁদের কিরণ পড়িয়াছে তাহাই যেন হাসিয়া উঠিয়াছে। দূরে নদীর ধারে রাত্রিচর পাখী এক একবার বিকট কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে—তাহার শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে।

বড় নিস্তব্ধ রাত্রি; সেই রাত্রিচরগুলার মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার ছাড়া আর কোনও শব্দ কোথাও শ্রুত

হইতেছিল না। সিরাজ আকাশের পানে চাহিয়াছিল, শ্রান্ত দেহ তখন তাহার এলাইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু দুইটাও বেশ মুদিয়া আসিয়াছে, এমন সময় বাহির হইতে কে কর্কশ কণ্ঠে ডাকিল—'মিঞা সাহেব, বাড়ী আছ ?'

এক মুহূর্ত্তে প্রকৃতির শান্ত ভাবটাতে অশান্তির ধাক্কা লাগিয়া সব যেন উলট-পালট হইয়া গেল। সিরাজের বুকটা একবার মাত্র কাঁপিয়া উঠিল, তন্দ্রা নিমিষে দূর হইয়া গেল ; উঠিয়া বসিয়া সে বলিল—'কে ডাকে ?'

বাহির হইতে উত্তর আসিল, 'আমি জমিদার বাবুর পাইক।'

সিরাজ উঠিয়া বাহিরে আসিল। পাইক স্বরূপ দাস মোটা বাঁশের লাঠিটায় ভর দিয়া ত্রিভঙ্গমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দৃষ্টি পাতলা বাঁশের বেড়া ভেদ করিয়া রন্ধন-গৃহের আলোকোজ্জ্বল বারাণ্ডার উপর পড়িয়াছিল।

সিরাজকে দেখিয়াই সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'তোমায় এখনি যেতে হবে।'

সিরাজ বিস্মিত ভাবে বলিল, 'কোথা ?'

স্বরূপদাস বলিল, 'জমিদার বাবু তোমায় জোর তলপ দেছেন, এখনি যাওয়া চাই।'

সিরাজ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।'

স্বরূপদাস তাহাতে কোন মতে রাজি হইল না, বলিল, 'তিনি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবার আদেশ দেছেন।'

বিরক্ত হইয়া সিরাজ বলিল, 'বাপু আমি পালাচ্ছিনে, তুমি বল গে যাও আমি যাচ্ছি।'

অগত্যা স্বরূপ দাসকে প্রস্থান করিতে হইল, কিন্তু যাইবার আগে আর একবার বেড়ার ফাঁক দিয়া রন্ধন-গৃহের পানে তাকাইয়া যাইতে ভুলিল না।

সিরাজ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। জমিদার মহাশয় যে কেন তাহাকে ডাকিয়াছেন তাহা সে জানিত। তাহার আমবাগান সহ একটি বড় পুষ্করিণী ছিল, জমিদার মহাশয়ের তীব্র দৃষ্টি এই আমবাগানটার উপরে। এই বাগান ও পুষ্করিণী তাহাদেরই বাড়ীর লাগালাগি। একদিন এমন দিন ছিল, যে দিন সিরাজের পূর্ব্ব পুরুষ ও জমিদার তারানাথ গাঙ্গুলীর পূর্ব্ব পুরুষ সমপদস্থ ছিলেন। কালক্রমে সিরাজ আজ নিঃস্ব, পথের ভিখারী বলিলেও অযথার্থ হয় না ; তারানাথ বাবু বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার।

জ্যৈষ্ঠ মাসের দিকে যখন গাছগুলি আমে পূর্ণ হইয়া উঠিত, তখন বোধ হয় তারানাথ বাবু লোভ সামলাইতে পারিতেন না। বাড়ীর মেয়েরা কাঁচা ফজলী ও কাঁচামিঠা আমগুলি যথোচিত রূপ বর্দ্ধিত হইবার পূর্ব্বেই নিঃশেষ করিয়া ছাড়িতেন। সিরাজ এ ক্ষতি সহ্য করিয়া যাইত, বাড়ীতে আম আসিত অতি সামান্য। পুষ্করিণীটি যেন তারানাথ বাবুরই ছিল। সিরাজকে না বলিয়া তাঁহারা তাহাতে বেশ মাছ ধরিতেন। রহিমা এক একবার গর্জ্জন করিয়া উঠিতে চাহিত, কিন্তু শান্তপ্রকৃতি সিরাজ তাহাকে থামাইয়া দিত। যা' দুই চারিটা আম, মাছ ঘরে আসে, তাহাদের দুই ভাই বোনের পক্ষে তাহাই অপরির্য্যাপ্ত হইয়া উঠে। পরে খাইয়া সন্তুষ্ট হয় হোক্ তাহাতে ক্ষতি কি ?

কিন্তু রহিমা তাহা বুঝে না। সে মনে করে ক্ষতি ইহাতে যথেষ্ট। আম মাছগুলা যদি বিক্রয় করা যায়, তাহাদের আর্থিক অবস্থা অনেকটা ভাল হয়। অবস্থা বিপর্য্যয়ে আজ তাহারা দরিদ্র ; পরিধেয়ের অভাবেও অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়, মাছ আম বৎসরে একবার করিয়া বিক্রয় করিলেও তাহাদের অভাব সঙ্কুলান হয়।

সে দিন রহিমা কাহার মুখে যখন শুনিতে পাইল তাঁরানাথ বাবুর নাতির অন্নপ্রাশনোপলক্ষে বহু লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছে এবং সেই ভোজের উপযুক্ত মাছ তাহাদের পুষ্করিণী হইতে সরবরাহ করিয়াছে, তখন তাহার পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করা বড় দুঃসহনীয় হইয়া উঠিল। সে ফিরিয়া আসিয়া সিরাজকে খুবই ভর্ৎসনা করিল ; তাহার চীৎকার সেদিন বাড়ীর সীমানা ছাড়াইয়া গিয়াছিল, সিরাজ কোন মতেই তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে পারিল না।

রহিমার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার স্বামী বিবাহের কিছুদিন বাদেই মারা যায়, সে আর বিবাহ না করিয়া ভাইয়ের সংসারে আসিয়া বাস করিতেছিল। তাহার

একটা দোষ ছিল, রাগ হইলে সে কিছুতেই নিজেকে সামলাইতে পারিত না। নিরীহ সিরাজ পর্য্যন্ত তাহার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া পড়িত। তাহাকে একটা কথা বলিবার যো ছিল না, তাহা হইলেই সে পা ছড়াইয়া বসিয়া স্বর্গগত মাতা পিতাকে স্মরণ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিত। সিরাজ এই ব্যাপারটিকে অত্যন্ত ভয় করিত, একটা কথাও সে বলিত না। বোনকে সে যেমন ভালবাসিত, তেমনি ভয়ও করিত।

সিরাজ বাড়ীর মধ্যে আসিতেই রহিমা অগ্রসর হইয়া আসিল—'কে ডাকছিল দাদা?'

সিরাজ একটু অসহিষ্ণু ভাবে উত্তর দিল, 'জমিদারের পাইক। তোর জন্যেই যত লেঠা আমার। দিব্য দিন কেটে যায়, তুই হতভাগী যত লেঠা বাধাস। এখন জমিদার ডেকে পাঠিয়েছে, কি করি বল্ দেখি? তোর সে দিনকার গালাগালি করাটা মোটেই ভাল হয় নি রহিমা।'

রহিমা দর্পভরে উত্তর করিল 'না, ভাল হয় নি বই কি; ডেকেছে তাতে এত ভয় কিসের? তুমি যেন কি দাদা—বড় ভয় তোমার। আমি যদি পুরুষ হতুম, নিজেই সব করতুম। ওরা আমাদের জিনিষ নিয়ে ভোগ করবে আর আমরা পথে ভিক্ষে করে বেড়াব—না? কি মজার কথা —বেশ।'

সিরাজ একটা অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কা করিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনটা ভারি কোমল ও কল্পনাপ্রবণ ছিল। একটা ক্ষুদ্র চিন্তা একবার তাহার মাথায় প্রবেশ করিলে আর নিস্তার ছিল না, সেইটাই তাহার সমস্ত বুদ্ধি গ্রাস করিয়া মোটা জোঁকের মত ফুলিয়া উঠিত; তখন সে আপনাকে বিপদাবর্ত্তে পতিত দেখিয়া আত্মহারাপ্রায় দাঁড়াইয়া থাকিত।

রহিমার কথা শুনিয়া রাগত ভাবে সে বলিল, 'তোর আর কি? খাবি আর ঘরের মধ্যে বসে থেকে আমার সঙ্গে ঝগড়া চালাবি। যত বিপদের বোঝা আমার মাথায় চাপাবি। আমার হয়েছে বিষম জ্বালা তোকে নিয়ে।'

রহিমার হৃদয়ে অভিমান জাগিয়া উঠিল; সে সিরাজের 'ভার' হইয়াছে, কথাটা মনে করিয়া তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল; সে পা ছড়াইয়া বসিয়া তাহার প্রধান যুদ্ধাস্ত্র কান্নার সুর বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া, বিব্রত সিরাজ বলিল, 'লক্ষ্মী দিদিটী, ওইটি এখন রাখ। কাজ হয়ে থাকে তো ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বস গিয়ে, আমি চট্ করে জমীদার-বাড়ীটা একবার ঘুরে আসি।'

রহিমা অগত্যা রোদন থামাইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি করিয়া বাহিরের কাজ সারিয়া লইয়া সে গৃহে গেল দেখিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে সিরাজ বাহির হইয়া পড়িল।

এই নিরুপমা সুন্দরী কিশোরী বোনটীর জন্য সে মোটেই শান্তি পাইত না। কে কোন্ দিক হইতে পাপ-নয়নে ইহাকে দেখিয়া ফেলিবে, কাহার বিষাক্ত নিশ্বাসে এই জলে-ধোয়া শুভ্র পবিত্র যুঁই ফুলটী কলঙ্কিত হইয়া উঠিবে, এই ভয় তাহার মনে রাতদিন জাগিত। রাত্রে ভগিনীকে গৃহে শয়ন করাইয়া সে সারারাত নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিত না, কতবার উঠিয়া সে সেই গৃহটীর চারিদিকে ঘুরিত তাহার ঠিক নাই।

হিন্দুপাড়ার মধ্যে সেই একঘর মাত্র মুসলমান বাস করিত। তাহার স্বজাতীয়েরা কিছু দূরে বাস করিত। তাহাকে উঠাইয়া দিবার জন্য প্রতিবাসী হিন্দুরা অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, অনেকে সেই বাড়ীটুকুর জন্য ডবল মূল্য দিতেও স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু সিরাজ ভিটাত্যাগ করিতে একেবারেই নারাজ। তাহার বহু পূর্ব্বপুরুষের ভিটা, তাহার পিতা মাতাও এখানে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন; এস্থান সিরাজের নিকট স্বর্গ বিশেষ।

জমীদার বাড়ী হইতে যখন সে ফিরিল, তখন রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে। রহিমা তখনও ঘুমায় নাই। সিরাজের সাড়া পাইয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল সে বারাণ্ডার এক ধারে বড় কাতর ভাবে বসিয়া পড়িয়াছে, তাহার মুখ বড় ম্লান।

আলোটা সামনে রাখিয়া রহিমা ভ্রাতার পার্শে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হ'ল দাদা?'

দাদা আকাশের পানে চাহিয়াছিল, কোনও মতে চোখ নামাইতে সমর্থ হইল না, পাছে চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়ে, পাছে নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া যায়।

রহিমা আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'জমীদার কি বললে দাদা ?'

সিরাজ উদাসভাবে উত্তর দিল, 'যা বলে গেছলুম রহিমা, যা ভেবেছিলুম—তাই।'

সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সামনের জ্যোৎস্নাসিক্ত নারিকেল গাছটার উপর একটা পেচক আসিয়া বসিল, গম্ভীর-ভীষণ-শব্দে নিস্তব্ধ রজনীকে মুখরিত-চঞ্চল করিয়া তুলিল। রজনীর শীতল বাতাস সন্ সন্ করিয়া আসিয়া সিরাজের ঘর্ম্মাক্ত ললাটটাকে শীতল করিয়া দিয়া যাইতে লাগিল।

রহিমা আর একটাও কথা কহে না দেখিয়া সিরাজ তাহার পানে চোখ রাখিল—'বুঝেছিস রহিমা, তারা এখন বাগান পুকুর সিকি দরে কিনতে চায়।'

রহিমা বলিল, 'তা তুমি দেবে কেন ?'

সিরাজ ম্লান হাসিল, বলিল, 'দেব কেন ? বাধ্য হয়ে আমায় দিতেই হবে।'

দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া রহিমা বলিল, 'দিতেই হবে ? কেন ?'

সিরাজ বলিল, 'জোর যার মুল্লুক তার—জানিস তো এ কথা, আমি যে জমীদারের সঙ্গে লড়তে যাব—কি আছে আমার বল্ দেখি ? আমার কি একটা পয়সা আছে—না লোক আছে ?'

রহিমা বলিল, 'আমাদের খোদা আছেন।'

সিরাজ মাথা নাড়িল, 'না রহিমা—খোদা আমাদের নেই। খোদা গরীবের নয়, খোদা বড়লোকের। তা' যদি না হবে তবে ভিক্ষুক ভিক্ষা করতে বড়লোকের দরজায় গেলে গলাধাকা খেয়ে কেঁদে আসে কেন ? গরীবের বুক বাঁশ দিয়ে বড়লোকে ডলে যায় কেন ? খোদা আমাদের নেই রহিমা, তা হলে আজ বড়লোকে আমায় যা তা কথা বলতে পারত না। যে সব জঘন্য কথা আমায় বলেছে তারা, তা যদি শুনতিস্ একবার, বুক ধরে সেখানেই বসে পড়তিস্। আমি যদি সিকি দামে বাগান পুকুর না ছেড়ে দেই—তারা আমায় জোর করে বাড়ী হ'তে উঠিয়ে দেবে, আর লোকে—ঈশ্বর আল্লা', ভাইয়ের সামনে এক বড় কথাটাও বলে গেল তারা—কোথায় খোদা,—খোদা নেই রহিমা—খোদা নেই।'

বলিতে বলিতে সিরাজ দুই হাতে মুখ ঢাকিল, সে সব কথা বোনের সামনে কোন ভাই-ই উচ্চারণ করিতে পারে না।

রহিমা একবারে জ্বলিয়া উঠিল, তীক্ষ্ণ কঠোর সুরে সে বলিয়া উঠিল—'দাদা—'

সিরাজ চমকাইয়া মুখ তুলিল। এমন ভীষণ কণ্ঠ রহিমা কোথায় পাইল ? তেমনি সুরেই রহিমা বলিল, 'তারা আমার নামে অত কথা বললে আর তুমি ভাই হয়ে তা শুনে আসলে ? তোমার বুকে রক্ত নেই, তোমার হাতে বল নেই, মায়ের ছবি তোমার মুখে পড়ে নি ?'

সিরাজ ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, 'আমি যে একা রহিমা ?'

রহিমা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, 'কে বললে তুমি একা ? ধর্ম্ম তোমার সহায়, তোমার ভয় কি ? তুমি বুক বেঁধে দাঁড়াও দাদা, বিপদ আসে আসবে, আমরা তা সহ্য করব, তা' বলে তারা যে আমাদের গরীব বলে পায়ে দলবে, যা না তাই বলবে, এ কখনই আমরা সহ্য করতে পারব না।'

সিরাজ ভগিনীর মুখপানে চাহিল, রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, 'আমি দাঁড়াব, কিন্তু যদি আমার কিছু হয় রহিমা—'

রহিমা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'কিছু ভেবনা দাদা, শুধু একমনে বিশ্বাস করে যাও খোদা আছেন, আর তিনি শুধু বড়লোকের নন, গরীবেরও বটে।'

দুই ভাই বোনের কেহই সে রাত্রে জলস্পর্শ করিল না। উষ্ণ মস্তিষ্ক সিরাজ সে রাত্রে ঠাণ্ডায় উঠানে খাটিয়ার উপর জ্যোৎস্নার আলোয় পড়িয়া রহিল, রহিমা গৃহে গিয়া দ্বার দিয়া শুইয়া পড়িল, কিন্তু সারারাত ঘুমাইতে পারিল না।

হিন্দুদের অত্যাচারগুলার কথা যতই তাহার মনে পড়িতে লাগিল, ততই সে অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। জাতির অভিমানটা কি এতই বড়, মানুষ কি কিছু নয় ? উহারাও তো জানে একস্থান হইতে হিন্দু মুসলমান সবাই আসিয়াছে, যাইবেও সেই এক জায়গায়। জানিয়া শুনিয়াও কেন তবে এ ভেদজ্ঞান, মাঝখানে কেন এত দূরত্ব ?

তাহারা যে এখানে থাকে কোন হিন্দুরই তাহা ইচ্ছা নয়। সকলে কেন এত তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে ?

সকাল বেলার দিকে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে। গৃহের বেড়ায় যে মাটি লেপা ছিল তাহা অনেক স্থানে খসিয়া পড়িয়াছে, সেই সব ফাঁক দিয়া সূর্য্যকিরণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

বাহিরে কাহার আহ্বান শুনিয়া সে ধড়ফড় করিয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল সিরাজ তখনও প্রাঙ্গণে সেই খাটিয়ার উপর পড়িয়া ঘুমাইতেছে। প্রভাতের সূর্য্যের আলো তাহার ঘুমন্ত মুখখানার উপর পড়িয়া দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। বোধ হয় সারারাত মানসিক উৎকণ্ঠায় সে ঘুমাইতে পারে নাই, ভোরের সময় ঘুমাইয়া পড়ায় এত বেলাতেও সে জাগিতে পারে নাই। বাহিরে দেওয়ান সিরাজকে ডাকিতেছিল, তথাপি তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। জমীদার বাবুর মহা প্রতাপান্বিত আদরের দেওয়ান অবশেষে অশ্লীল ভাষায় গালি দিতে লাগিল।

রহিমার রক্ত গরম হইয়া উঠিল, মনে হইল সে একবার মুখ সামলাইতে বলে, তখনি মনের ভাব সামলাইয়া সিরাজকে ধাক্কা দিয়া ডাকিতে লাগিল, 'দাদা ওঠ, তোমায় ডাকছে।'

সিরাজ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল; দুই হাতে চোখ ডলিয়া ভগিনীর পানে চাহিয়া বলিল, 'উঃ, এত বেলা হয়ে গেছে, আমায় এতক্ষণ ডাকিস নি কেন রহিমা ?'

রহিমা বলিল, 'আমি এইমাত্র উঠলুম। বাইরে কে ডাকছে।'

যদিও সে দেওয়ানকে বেশ চিনিত, তথাপি কেবল অত্যন্ত ঘৃণাবশতঃই দেওয়ানের নাম মুখেও আনিল না, 'কে ডাকছে' বলিয়া কথাটা সারিয়া দিল।

সিরাজ উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

দেওয়ান বেড়ার বাহির হইতে প্রস্ফুটিত পদ্মসমা রহিমার পানে চাহিয়াছিলেন, সিরাজের আগমন তিনি জানিতে পারেন নাই। তাঁহার সেই লুব্ধ দৃষ্টি দেখিয়াই সিরাজের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে আর রাগ সামলাইতে না পারিয়া কঠোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'ও কি মশাই, আপনি না ভদ্রলোক—'

দেওয়ান ভারি অপ্রস্তুত হইয়া চোখ ফিরাইলেন, 'হ্যাঁ, এই তোমার বাড়ী-ঘরগুলো দেখছিলুম। এই বেড়ার ঘরে থাক নাকি তোমরা ?'

সিরাজ ললাটে অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া বলিল, 'নসিব! আপনার কোন দরকার আছে আমার কাছে ?'

দেওয়ান বলিলেন, 'জমীদারবাবু কাল বলে দিয়েছিলেন, তোমার বোনকে জিজ্ঞাসা করতে; তোমার বোন কি বললে তা' জানতে আমায় পাঠালেন; তা' হলে আজই সব লেখা পড়া ঠিক ঠাক হয়ে যায়।'

সিরাজ বিরক্ত হইয়া বলিল, 'আমার বোন এর জানে কি, আমি তো কালই সে কথা বলে এসেছি।'

দেওয়ান বিদ্রুপের ভঙ্গিতে বলিলেন, 'সে দ্বিতীয় নুরজিহান, সে কিছু জানে না ?'

সিরাজ ভয়ানক রাগিয়া উঠিল, তাহার বড় বড় চোখ দুটিতেই রাগ প্রকাশ হইয়া পড়িল। একটুখানি নীরব থাকিয়া সে বলিল, 'বলবেন, আমি বাগান, পুকুর বিক্রী করব না, সাফ জবাব নিয়ে যান।'

দেওয়ান উষ্ণভাবে বলিলেন, 'কিন্তু এর ফল তোমায় ভোগ করতে হবে। জমীদারের সঙ্গে বিবাদ করা অমনি মুখের কথা নয়। এর শেষটা কোথায় কি ভাবে দাঁড়াবে, সেটা ভেবে উত্তর দিলে হ'ত না কি ?'

সিরাজ বলিল, 'অনেক ভেবে দেখেছি মশাই, আর ভাবতে পারা যায় না। আপনি এই কথাই জমীদার বাবুকে বলবেন।'

দেওয়ান বলিলেন, 'কিন্তু তোমার সবই যাবে, লাভে হ'তে একটী পয়সাও পাবে না তা আমি ঠিক বলে দিচ্ছি।'

সিরাজ আবার রাগিয়া উঠিল, 'আপনি কি ভয় দেখাচ্ছেন আমাকে ? কি আমার যাবে ? রীতিমত খাজনা দিয়ে বাস করছি, আদালত আছে, আল্লা আছেন।'

'আল্লা আদালত সবারই সহায়' বলিয়া দেওয়ান ফিরিলেন।

সিরাজ রহিমার কাছে গিয়া রাগত কণ্ঠে বলিল, 'তোকে পোড়ারমুখি বার বার বলি, কারও সামনে বার হোসনে; যত বলব—তত তুই যেন কি হবি।'

রহিমা সানুনাসিক সুরে বলিয়া উঠিল, 'কার সামনে আমি বার হই তা বল না?'

সিরাজ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তোর আর এখানে থাকা হবে না রহিমা, তোকে তোর শ্বশুর-বাড়ী পাঠিয়ে দেব। তুই সেখানে থাকলে আমার কিছু ভয় থাকবে না। তুই যদি কালো ভূতের মত হতিস, আমার কিছু ভয় হ'ত না।'

রহিমা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, 'তা বুঝি আমার দোষ! আমি তো এক্ষুণি কালো ভূত হ'তে চাই, কিছু করে তা' হওয়া যায় না দাদা?'

সিরাজ মলিন হাসিল। 'দূর পাগলী তা কি হয়? আমি আজ তোর শ্বশুরকে পত্র লিখে দেই তোকে নিয়ে যেতে। তারা তোকে যে রকম আবরুতে রাখবে আমার সে রকম রাখবার ক্ষমতা নেই। এ রকম বে-আবরুতে তোকে আমি আর রাখতে পারব না।'

রহিমা রাগ করিয়া কথা কহিল না।

সেইদিনই তারানাথ বাবু তাহাকে জোর তলপ দিলেন, কিন্তু সিরাজ গেল না। তিনি এই দুর্ব্বৃত্ত বিধর্ম্মী যুবকের উপর হাড়ে চটিয়া গেলেন, এবং কি করিয়া যে ইহার সর্ব্বনাশ করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

দেওয়ান বলিলেন, 'সর্ব্বনাশ করবার ভাবনা কি? আমায় আদেশ দিন না, আমি দেখি একবার।'

তারানাথ বাবু বলিলেন, 'তুমি কি করতে পারবে?'

দেওয়ান বলিলেন, 'আমি না পারি কি বলুন। এই ছোকরা মুসলমানটাকে জব্দ করতে কতক্ষণ সময় যাবে?'

সে দিন দুপুরে—যখন পথে ঘাটে কোথাও একটা লোক ছিল না, তখন রহিমা তাহার দৈনিক জল ঘাট হইতে তুলিয়া আনিতেছিল। সম্মুখেই পথের উপর দেওয়ানকে দেখিয়া সে সন্ত্রস্তে পাশ কাটাইতেছিল, কিন্তু দেওয়ান ভদ্র ভাবে অগ্রসর হইয়া একখানা পত্র দিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, 'আমাকে দেখে লজ্জা করবার কোন কারণ নেই রহিমা, আমি তোমায় এতটুকু বেলা হ'তে দেখে আসছি। আমি শুনেছি তুমি বেশ লেখাপড়া জান; এই পত্রখানা নিয়ে গিয়ে পড়গে, এতে তোমারই ভাল হবে।'

পত্রখানা সামনে ফেলিয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। রহিমা একবার ভাবিল, পত্রটা ফেলিয়া দিয়া যাই, আবার কি ভাবিয়া সেখানা তুলিয়া লইয়া সে বাড়ী আসিল। সিরাজ তখন বাড়ী ছিল না, আত্মীয়দের সহিত পরামর্শ করিতে গিয়াছিল।

রহিমা কলসীটা রাখিয়া আগেই পত্রখানা পড়িতে লাগিল। যখন পত্র পড়া শেষ হইল তখন তাহার শুভ্র মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বড় বড় দুটি চোখ দিয়া আগুনের ঝলক বহিয়া যাইতেছে। সে পত্রখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পত্রখানা কি সে সিরাজকে দেখাইবে? এ পত্র দেখাইলে রাগের মাথায় সে হয় ত জমীদারকে খুন করিয়া ফেলিবে।

কিন্তু সে কেমন করিয়া এ পত্র লুকাইবে? এ কি ভয়ানক কথা বহন করিয়া আনিয়াছে!

রহিমা খানিক গুম হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া গৃহে প্রবেশ করিল; দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া সে মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া স্বর্গীয় পিতা মাতা ও প্রিয়তম স্বামীকে ডাকিয়া খুব উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

হায়! আজ যদি তাহার স্বামী থাকিত! পিতা যাহার হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়া পরম নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, সেই রক্ষণাবেক্ষণের কর্ত্তা আজ কোথায়? সে তাহার স্ত্রীকে জগতে একা ফেলিয়া বিশ্রাম করিতে কোন্ দেশে গিয়াছে? জগতের লোক যে এত নিষ্ঠুর—তাহারা যে স্ত্রীকে স্বামীর স্মৃতি হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিবার বিরোধী, তাহা সে জানে নাই। আজ যদি সে থাকিত! করুণাময় খোদা, রহিমাকে তাহার পরিবর্ত্তে লইলে না কেন?

বাহিরে সিরাজের সাড়া পাইবা মাত্র সে পত্রখানা তাড়াতাড়ি শতখণ্ড করিয়া জানালা পথে বাহিরে ফেলিয়া দিল। তাহার পর মুখে চোখে প্রফুল্লতা আনিয়া বাহিরে ভ্রাতাকে বসিতে জায়গা দিয়া বলিল, 'কি হ'ল দাদা?'

সিরাজ বসিয়া বলিল, 'সবাই বাগান ছাড়তে নিষেধ করছে। তাই কি ছাড়া যায় রহিমা? কত পুরুষ আমাদের ওই বাগান, পুকুর দখলে রেখেছে, আমি অমনি ছেড়ে দেব?'

রহিমা শুধু 'বেশ' বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সিরাজ তাহার গম্ভীর মুখখানার পানে চাহিয়া বলিল, 'তোর মুখখানা আজ এমন ভার দেখাচ্ছে কেন রে?'

রহিমা মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'আমি আর এখানে থাকব না দাদা, আমায় শিগগীর করে আমার শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দাও।'

সিরাজ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তা বেশ, যাবি তার আর কি? কিন্তু আমি সেদিন রাগ করে বলেছিলুম বলে কি তুই যেতে চাচ্ছিস রহিমা, তাই আগে বল।'

রহিমা বলিল, 'না, সেজন্যে নয়, আমার ইচ্ছে আমি যাব' বলিয়া সে গৃহে চলিয়া গেল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, অন্ধকার নীরবে ধরাবক্ষ ছাইয়া ফেলিতে লাগিল, সিরাজ সেই অন্ধকারে একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার ভাবনা অনন্ত। প্রবল প্রতাপ জমীদারের সহিত সে বিবাদ করিতে অগ্রসর হইয়াছে, কে জানে ইহার শেষ কোথায়? যাহারা তাহাকে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি দিতেছে, বিপদের সময় তাহারা সরিয়া পড়িবেই। সে অনেকটা অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে, এখন সে কি পিছাইবে না অগ্রসর হইবে? না, আর সে পিছাইবে না। সে পিছাইবে কেন? তাহারই পিতার সম্পত্তি অন্য লোকে যে সচ্ছন্দে গ্রাস করিবে তাহা কখনই হইবে না। হউক না সে জমীদার, থাকুক তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য, সে সব সেই দীন দুনিয়ার মালিকের চোখে ঠেকিবে না। তিনি দেখিবেন কেবল ন্যায় অন্যায়, পাপ পুণ্য।

সিরাজ একবার নক্ষত্রোজ্জ্বল অনন্ত গগনের পানে চাহিল, তাহার দুটি চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, সে মাথা নত করিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল, 'দীন দুনিয়ার মালিক, এর ন্যায্য বিচার তুমিই কোরো!'

দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল; জমীদার পক্ষ নীরব ছিলেন, ইহার পর বেশী কথা তাঁহারা আর বলেন নাই। সিরাজ একটু নিশ্চিন্ত হইল। ব্যাপারটা যদি এমনিই মিটিয়া যায় তাহা হইলে সে বাঁচিয়া যায়। এ গোলমালের মধ্য হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্ত সে ভারি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু এ নীরবতা বেশী দিন রহিল না। সে দিন জমীদার বাবুর নাম স্বাক্ষরিত রহিমার নামীয় একখানা পত্র আসিয়া পড়িল সিরাজের হাতে। সিরাজ একেবারে আগুন হইয়া উঠিল, রহিমা কাঁদিয়া পাড়া মাথায় করিয়া তুলিল।

জীবনাপেক্ষা ভালবাসে সে রহিমাকে। রহিমাকে সে বড় যত্নে লেখাপড়া শিখাইয়াছে, উপদেশ দ্বারা তাহার হৃদয়কে উর্ব্বর করিয়া তুলিয়াছে। সে বোনকে বুকের আড়ালে গোপন করিয়া রাখিতে চায়—যেন কেহ তাহার সন্ধান না পায়। সারারাত সে না ঘুমাইয়া পাহারা দেয়। যাহার জন্য সে তিলার্দ্ধ শান্তি পায় না, তাহাকে লোকে এই কটূক্তিপূর্ণ পত্র দিবে?

'আজ খুন করব—সব খুন করব' বলিয়া সে লাফাইয়া উঠিল। সভয়ে রহিমা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। সজল চোখে রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল,—'দাদা'।

'রহিমা, ঈশ্বর যথার্থই নেই—' বলিতে বলিতে সিরাজ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কনিষ্ঠার কোলে মাথা রাখিল; ঝর ঝর করিয়া রহিমার চোখের জল তাহার মাথার উপর পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে রহিমা চোখ মুছিয়া বলিল, 'অত ব্যস্ত হচ্ছো কেন দাদা?'

'ব্যস্ত' সিরাজ মুখ তুলিল, তীব্র নেত্রে রহিমার পানে চাহিয়া বলিল, 'স্থির হতে বলছিস কাকে রহিমা? তোকে রাখবার জায়গা যে আমি পাচ্ছিনে। তোর শ্বশুরকে পত্র দিছি, সে তোকে নিয়ে গেলে যে আমি বাঁচি। ওরা বাগান পুকুর সব নেয় নিক; চল, আমরা দুটি ভাই বোনে এ দেশ ছেড়ে চলে যাই। তোকে তোর শ্বশুরবাড়ী পৌছে দিয়ে আমি ফকিরী নিয়ে পথে বেড়াব।'

রহিমা নীরবে কেবল চোখের জল ফেলিতে লাগিল। তাহার জন্য সিরাজের উৎকণ্ঠা যে কতদূর তাহা সে জানিত। সে যত বড় হইতেছিল ততই সিরাজ তাহাকে লুকাইয়া রাখিতেছিল। তাহার স্বামীর মৃত্যুর পরে আত্মীয়েরা রহিমার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাই বোন কেহই তাঁহাতে রাজি হয় নাই। হিন্দু পাড়ার মধ্যে বাস করিয়া তাহারা হিন্দুর অনেক আদর্শ গ্রহণ

করিয়াছিল, দ্বিতীয়বার বিবাহ করা ব্যভিচার ভাবিয়া দুইজনেই মাথা নাড়িল।

সিরাজের হৃদয় যত জ্বলিতেছিল সে ততই আস্ফালন করিতে লাগিল। তাহার আস্ফালন তারানাথ বাবুর অজ্ঞাত রহিল না। তিনি সিরাজের নামে নালিশ রুজু করিয়া দিলেন।

সিরাজ আরও রাগিয়া উঠিল। গৃহে যাহা কিছু ছিল সব বিক্রয় হইয়া গেল, রহিমার যে সব গহনাপত্রাদি ছিল তাহাও গেল, সে কিছুতেই হটিতে চাহিল না।

সেদিন সহর হইতে ফিরিতে রাত্র আটটা বাজিয়া গেল; আসিয়া আহারান্তে সে বাহিরে নিজের খাটিয়াতে শুইয়া পড়িল; রহিমা গৃহের মধ্যে শয়ন করিল। পরিশ্রান্ত সিরাজ পড়িবা মাত্র ঘুমাইয়া পড়িল।

কত রাত্রে—সে তাহা জানে না, রহিমার চীৎকারে ও গাত্রে অত্যন্ত অগ্ন্যুত্তাপ লাগায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল। একি ভীষণ! সামনে ধু ধু করিয়া দুখানা গৃহ জ্বলিতেছে, রন্ধনের চালাটীতেও এই সময় আগুন ধরিয়া গেল।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সিরাজ শুধু চাহিয়া রহিল। গৃহমধ্য হইতে রহিমা ব্যাকুল কণ্ঠে তাহাকে ডাকিতেছিল; সিরাজ লাফ দিয়া প্রজ্বলিত বারাণ্ডায় উঠিয়া পড়িল।

এ আবার কি? দরজা বাহির হইতে শক্ত করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধা। মাথার উপর হইতে আগুনের ঝলক হু হু করিয়া নামিয়া আসিতেছে, সমস্ত দেহটা তাহাতে ঝলসাইয়া উঠিতেছে। এখনি গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িবে কিন্তু সিরাজের তাহাতে দৃকপাত নাই, সে তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। ডাকিয়া ডাকিয়া রহিমা তখন চুপ করিয়াছিল, সিরাজ ডাকিল, 'রহিমা—আছিস এখনও?'

ক্ষীণকণ্ঠে রহিমা উত্তর দিল, 'আছি দাদা।'

সিরাজ উদ্বেগ ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, 'আর একটু—একটুখানি থাক দিদি, আমি দরজা ভেঙ্গে ফেলি।'

সিরাজ দরজার উপর লাথি মারিতে লাগিল, সে সবল লাথির আঘাতে দরজা ভাঙ্গিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা দগ্ধ চাল জ্বলিতে জ্বলিতে খসিয়া পড়িল।

অগ্রাহ্য করিয়া সিরাজ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। চারিদিকে আগুনের লেলিহান জিহ্বা করাল ছায়া বিস্তার করিতেছে। সিরাজের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল, চোখে অন্ধকার দেখিল, সে প্রাণপণে চাহিয়া দেখিল রহিমা উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে।

ভগিনীকে দুইটী সবল বাহুর উপর তুলিয়া লইয়া সিরাজ এক লম্ফে বাহিরে আসিল, সেই মুহূর্ত্তে গৃহখানা পড়িয়া গেল; অগ্নি দ্বিগুণ জোরে গর্জ্জিয়া উঠিল।

সিরাজের সর্ব্বাঙ্গ অগ্ন্যুত্তাপে ঝলসাইয়া গিয়াছিল। সে নিজের জ্বালা অগ্রাহ্য করিয়া আগে রহিমার সেবায় মনোনিবেশ করিল। রহিমা বড় সাংঘাতিক পুড়িয়াছে, সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে। সিরাজের বুকটা ফাটিয়া যাইতে লাগিল, সে এত ডাকিল, কিন্তু রহিমার কোন সাড়া শব্দ সে পাইল না।

নিষ্পলক নেত্রে সে রহিমার মলিন মুখখানার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সে ভাবিয়া পাইতেছিল না এখন সে কি করিবে। সামনে তাহার আপনার বলিতে যাহা কিছু ছিল তাহা লইয়া তাহার গৃহ দুইখানি পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল!

প্রভাতের আলো পূর্ব্বদিক রঞ্জিন করিয়া তুলিল; সিরাজ তখনও রহিমার পাশে বসিয়া ভগ্ন কণ্ঠে তাহাকে ডাকিতেছে। বাড়ীর কাছাকাছি অনেক হিন্দুর বাস, কিন্তু ইহাই বড় আশ্চর্য্যের কথা যে, কেহই তাহার সাহায্যার্থে আসিল না। তাহার প্রতি সহানুভূতি কাহারও ছিল না। যাহাদের সহানুভূতিতে সিরাজের পূর্ব্বপুরুষ এই স্থানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া শান্তিতে বাস করিয়াছিলেন, তাহারা কেহই আজ ছিল না।

সিরাজ ভগিনীকে একা রাখিয়াই ডাক্তারের বাড়ী ছুটিল। ডাক্তার বাবু তখন বারাণ্ডায় মুখ ধুইতেছিলেন; সিরাজ একেবারে পাগলের মত গিয়া পড়িল—তাঁহাকে এখনই যাইতে হইবে, নচেৎ সে বোনটীকে জন্মের মত হারাইবে!

মতি ঘোস জমীদারের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'তুমি যাও, আমি একটু বাদেই যাচ্ছি।'

সিরাজ গোপনে চোখ মুছিল। সে সবই জানিতেছিল, জানিয়াও সে এই ডাক্তারের পদতলে আবার কুকুরের মতই লুটাইয়া পড়িল। বিরক্ত ডাক্তার বলিলেন —তিনি চা না খাইয়া এক পাও চলিবেন না।

গাছতলে মূর্চ্ছিতা ভগিনীকে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছে, সিরাজ আর বিলম্ব করিল না, রুদ্ধশ্বাসে ছুটিল। আর না, খোদা, আর না! যথেষ্ট সহ্য করিয়াছে সে, তোমার গোলামকে আর একটু শক্তি দাও যে পর্য্যন্ত না সব শেষ করিতে পারে। দীন দুনিয়ার মালিক, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।

সামনের বড় গাছটার আড়ালে তখন সূর্য্য উঠিয়া পড়িয়াছে, তাহার রক্তিম আলো রহিমার পাণ্ডুর মলিন মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সিরাজ তাহার পার্শ্বে নতজানু হইয়া বসিয়া গদগদ কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, 'রহিমা, একবার একটা শেষ কথা বলে যা বোন, যা আমার সারা জীবনের সম্বল হয়ে থাকবে। একটীবার চেয়ে যা দিদি—'

চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল রহিমার ললাটে পড়িয়া ঠিক মুক্তার মত জ্বলিতে লাগিল।

বোধ হইল রহিমার ওষ্ঠ একটু কম্পিত হইল, অতি কষ্টে একবার সে চাহিল। সোৎসুকে সিরাজ বলিল, 'কি দিদি?'

বড় কষ্টে রহিমা উচ্চারণ করিল 'জল—'

জল নিকটে, কিন্তু পাত্র কোথায়? হিন্দু অধিবাসীরা পাত্র দিবে না। সিরাজ নিজের বসনপ্রান্ত জলে ভিজাইয়া আনিয়া ভগ্নীর মুখে দিল।

রহিমার দুই চোখ দিয়া নীরবে অশ্রুধারা ছুটিয়া সিরাজের কোলটাকে সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল। সিরাজ সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিল। ললাটে যে বড় ফোস্কাটা হইয়াছিল তাহার হাত লাগিয়া সেটা গলিয়া খানিকটা জল বাহির হইয়া পড়িল, রহিমা চোখ মুদিল। সাগ্রহে সিরাজ বলিল, 'বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে দিদি?'

রহিমা উত্তর দিল না। আর একটা কথাও সে কহিতে পারিল না, আর সে চাহিল না, জ্যেষ্ঠের স্নেহপূর্ণ ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া নিঃশব্দে সে চক্ষু মুদিল।

সিরাজ নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার চোখে আর এক বিন্দুও অশ্রু ছিল না, কিন্তু হৃদয়ে যে কি তরঙ্গ উঠিতেছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। সমস্ত দিন চলিয়া গেল, তখনও সিরাজ সেই ভাবে সেইখানে বসিয়া। বৈকাল বেলা নিজেই সে উঠিল, নিজেই সেই ক্ষুদ্র দেহ সমাহিত করিয়া সেইখানেই আবার আসিল।

কাল তাহার সব ছিল; গৃহ ছিল, স্নেহময়ী ভগিনী ছিল, আজ তাহার কেহ নাই, কিছু নাই। আজ সে দাঁড়াইবে কোথায়, আজ তাহার দগ্ধচিত্তে শান্তিধারা ঢালিয়া দিবে কে?

তারানাথ বাবুর আনন্দের সীমা নাই। তাঁহার পরম শত্রু সিরাজ খুব জব্দ হইয়াছে, আর তাহার মাথা উঁচু করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু যদি রহিমা না মরিয়া সিরাজ মরিত তাহা হইলেই কাজটা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত!

দু'দিন বাদে একদিন সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে এই কথাই চলিতেছিল। বৈঠক খুব জমিয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় সিরাজ সেই গৃহের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিবা মাত্র স্বয়ং জমীদার পর্য্যন্ত ভয় পাইয়া গেলেন, সকলেই সন্ত্রস্ত—সচকিত হইয়া উঠিল।

সিরাজ মাথা নোয়াইয়া গম্ভীর বচনে বলিল 'আপনাদের ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। ভগবান আমায় সহ্যশীল করেছেন, অধৈর্য্য করেন নি, তাই একমাত্র স্নেহময়ী বোনের শোকও আমি সামলেছি। হীন প্রতিহিংসা দ্বারা আমি আমার ঘৃণিত বৃত্তিকে চরিতার্থ করতে চাইনে। যার জন্যে আপনি এই জঘন্য নারীহত্যা পর্য্যন্ত করলেন আমি তা স্বয়ং আপনাকে দান করতে এসেছি। আশা করছি এতে আপনি সুখী হবেন। দয়াময় খোদা কৃপা করে আমাকে ফকির সাজ দেছেন, আমি ভিক্ষা করে নিজের জীবিকা নিজেই অর্জ্জন করতে পারব, সঞ্চয় কিছু করতে চাইনে।'

তাহার হাতে যে দান-পত্রখানা ছিল, দ্রুত পদে অগ্রসর হইয়া সেখানা তারানাথ বাবুর সামনে রাখিয়া একটা সেলাম দিয়া সে তেমনি ধীর পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল।

যে বাগান পুষ্করিণীর জন্য এত কাণ্ড তাহা সহজেই তারানাথ বাবুর হাতে আসিল, কিন্তু তিনি ইহাতে একটুও সুখী হইতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে এই ত্যাগীর ত্যাগ স্বীকারে এমন একটা ধাক্কা লাগিল যাহা বলবার নহে।

ইহার পর তিনি সেই বাগান ও পুষ্করিণী দিয়া নিজে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া সিরাজকে আবার গৃহবাসী করিবার জন্য তাহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু জীবনে কখনও সেই ত্যাগী ফকিরের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শুনা যায়, সে ভিক্ষা করিতে করিতে পবিত্র স্থান মক্কার পথে চলিয়াছে।

কান্ত-কবি রজনীকান্ত।

[শ্রীজলধর সেন]

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত। কলিকাতা ৩০ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, বেঙ্গল বুক কোম্পানী হইতে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৪৲ টাকা। হৃষীকেশ সিরিজের চতুর্থ গ্রন্থ।

অনেক দিনের আশা এতদিন পরে পূর্ণ হ'ল,—কান্ত-কবি রজনীকান্তের প্রতি অগাধ অপরিমেয় ভক্তিমান্ নলিনীরঞ্জন এই সুন্দর জীবন চরিতখানি বাহির করিয়াছেন।

'সবুরে মেওয়া ফলে' ব'লে যে একটা প্রবচন আমাদের দেশে চ'লে আস্‌ছে, সে প্রবচনটা এই বইয়ে ষোল-আনা সার্থক হয়েছে; সবুরে মেওয়াই ফলিয়াছে, কান্ত-কবি রজনীকান্তের জীবন-কথা যেমন হওয়া আশা করেছিলাম, তেমনই হয়েছে।

এই বইখানির মধ্যে রজনীকান্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এর বাড়া প্রশংসা যে লেখকের পক্ষে আর কি হ'তে পারে, আমি তা জানি না।

শ্রীমান নলিনীরঞ্জন লিখিত কান্ত-কবি রজনীকান্তের সমালোচনা করা যে আমার পক্ষে অসম্ভব, এ কথা; যাঁরা রজনীর সহিত আমার সম্বন্ধের কথা জানেন, তাঁদের ব'লে দিতে হবে না। সুতরাং, আমি এই যা লিখ্‌ছি, এ সমালোচনা নয়, আলোচনা নয়,—এ এই সুন্দর বহিখানির সামান্য একটু পরিচয় মাত্র; এবং সে পরিচয়ও আর কেহ দিলেই ভাল হ'ত; হয়ত আরও অনেকে দেবেনও। তবুও শ্রীমান নলিনীরঞ্জন যে এই জীবন-কথা ছাপিয়ে আমাদের অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করেছেন, সেই কথাটা বল্‌বার জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

বইখানি তিন ভাগে বিভক্ত; যথা—'সংসারের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে', 'হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায়' ও 'বঙ্গবাসীর মনো-মন্দিরে'। 'বঙ্গবাসীর মনোমন্দিরে' এই ভাগে তিনটি পরিচ্ছেদ আছে; ১। কবি রজনীকান্ত, ২। জনপ্রিয় রজনীকান্ত, ৩। সাধক রজনীকান্ত। "কবি রজনীকান্ত" পরিচ্ছেদটি আবার চারিটি ভাগে বিভক্ত,—(ক) হাস্য-রসে, (খ) দেশাত্মবোধে, (গ) সাধন-তত্ত্বে ও (ঘ) কাব্য-পরিচয়ে। এই বিষয়-বিভাগ দেখ্‌লেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে, লেখক বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক কথাগুলি বেশ গুছিয়ে বলেছেন, কিছুই বাদ দেন নাই। এই সব ভাগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণস্পর্শী—হাসপাতালে মৃত্যু-শয্যায় রজনীকান্তের 'রোজ-নামচা'য়। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের সাহিত্যের কথা বলতে পারি নে, কারণ তেমন পণ্ডিত হবার সৌভাগ্য আমার হয় নি, তবে বাঙ্গালা সাহিত্য সবই পড়েছি এবং ইংরাজী সাহিত্যও অল্প-বিস্তর পড়েছি, আর অন্য দেশের দুই চারিখানি সাহিত্য পুস্তক ইংরাজীর মারফত পড়েছি; এর কোথাও এমন কিছু পড়ি নি, যার সঙ্গে এই 'রোজ-নামচা'র তুলনা করতে পারি। অমন ভয়ানক রোগ-যন্ত্রণায় শয্যাগত থেকে, মৃত্যুকে প্রতি

মুহূর্ত্তে শিয়রে বসে থাকতে দেখে, বাক্‌শক্তি-বিরহিত মানব-সন্তান রক্ত মাংসের শরীর ধারণ করে যে, এমন কথা লিখতে পারে, এমন করে বিশ্ব-বিধাতার চরণে আত্ম-সমর্পণ করতে পারে, রোগ-যন্ত্রণায় নিপীড়িত হয়েও যে বলতে পারে 'তবুও বলব প্রভু, তুমি দয়াময়'—তাকে আমি মানুষ বলতে পারি নে—সে দেবতা! নিশ্চয়ই তার সাধনা সিদ্ধিলাভ করেছে। এই 'রোজ-নামচা' অমূল্য রত্ন, এই 'রোজ-নামচা'তেই রজনী অপার্থিব মহিমা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তাই আমার একজন সুধী বন্ধু একদিন বইখানি পড়ে বলছিলেন—'আর কিছু না লিখে যদি ঐ রোজ-নামচাটাই ছাপিয়ে দেওয়া যেত, তা হলেই রজনীকান্তের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যেত, আর কোন কথারই দরকার হ'ত না।' কথাটা খুব ঠিক্—খুবই সত্য। মৃত্যু-শয্যায় পড়ে রজনীকান্ত যে সব অমৃতময়ী বাণী বলেছেন, সে সবই তাঁর প্রাণের কথা। প্রাণের দেবতাকে সম্মুখে উপস্থিত না দেখলে এমন কথা কোন মানুষের মুখ দিয়ে বার হ'তেই পারে না।

সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ মায়ের নাম গান করেই—দিন রাত গান করেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আমাদের রজনীকান্তও গান গেয়েই সিদ্ধিলাভ করে গেছেন। জীবনী-লেখক শ্রীমান নলিনীরঞ্জন সে কথাটা অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি একাধিক স্থানে বলেছেন, রজনীর গানে, রজনীর কবিতায় কোন কৃত্রিমতা নাই;—গানের জন্য তিনি গান নাই, লিখিবার জন্য তিনি কবিতা লেখেন নাই;—তাঁর হৃদয় থেকে গান ও কবিতা আপনা থেকেই ছুটে বেরিয়েছে, কোন কষ্ট কল্পনা তাঁকে করতে হয় নাই;—ভাষার জন্য, মিলের জন্য কোন দিন তাঁকে ভাবতে হয় নাই; আর ভাব—সে ত তাঁর হৃদয়ে একেবারে ভরপুর ছিল। তাঁর সহজ ভাষাও যেমন সুন্দর, যেমন প্রাণস্পর্শী ছিল, তাঁর সাধু ভাষাও তেমনি;—কোথাও একটুও কৃত্রিমতার নাম গন্ধও নাই। প্রাণের আবেগে তিনি যেমন সরস ভাবে গেয়ে উঠেছেন—"তব চরণ-নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা।" আবার তেমনই প্রাণ খুলে মেঠো সুরে, সহজ ভাষায় গেয়েছেন—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে' রে ভাই।"

আমরা ত জানতামই; যাঁরা জানতেন না, জানেন না, তাঁদের এই সুন্দর বইখানি এই কারণেই পড়তে বলি যে, তাঁরা দেখতে পাবেন, কান্ত-কবি গানের সাধনা করেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আমরা দেখেছি, শ্রীমান নলিনীও অতি সুন্দর ভাবে বলেছেন যে, গানে রজনীকে পাগল করে দিত, গান করতে বসলে তাঁর আহার নিদ্রার কথা মনে থাকত না; তিনি এ জগৎ ছেড়ে আর এক জগতে চ'লে যেতেন; সেখানে গায়ক থাকতেন তিনি, আর সে গানের শ্রোতা থাকতেন তাঁর প্রাণের দেবতা; সংসারের কোন কথা তখন রজনীর মনে থাকত না। কতদিন সন্ধ্যার সময় রজনী গান আরম্ভ করেছেন; তার পর কোন্ দিক দিয়ে রাত কেটে গিয়েছে, তা তিনি ত জানতেই পারেন নাই, আমরাও জানতে পারি নি। সাধক না হ'লে কি এমন তন্ময়তা আসে? কত দিনের কত ঘটনা আজ মনে হচ্চে; কত কথা বলতে ইচ্ছা হচ্চে। তা আর বলা হোলো না। শ্রীমান নলিনীরঞ্জন অনেকের কাছে থেকে অনেক কথা সংগ্রহ করে, তাঁর এই বইয়ে ছেপে দিয়েছেন; তাঁর থেকেই সকলে রজনীকান্তের সংগীত-সাধনার পরিচয় লাভ করতে পারবেন।

শ্রীমান নলিনী বেশ ভাল করে দেখিয়েছেন যে, রজনী খাঁটি মানুষ ছিলেন;—তাঁর কোন স্থানে কৃত্রিমতা ছিল না,—তিনি কিছুই রেখে-ঢেকে বলেন নাই। তাঁর চাল চলন, তাঁর কথাবার্ত্তা, তাঁর লেখা সব সোজা ছিল। ঘাটপৌরে আর পোষাকী বলে কোন কথা তাঁর জীবনের ইতিহাসে কেহই খুঁজে পাবেন না। এমন লোকের, এমন মায়ের আনন্দ দুলালের জীবন-কথা লিখে শ্রীমান নলিনীকান্ত ধন্য হয়েছেন, আমাদিগকেও কৃতার্থ করেছেন।

শ্রীমান নলিনী যে এই বইখানি লিখবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব্যক্তি, তা যিনি এই বইখানি পড়বেন, তাঁকেই অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করতে হবে। শ্রীমানের ভাষার কথা বলছিনে, তাঁর রচনা-নৈপুণ্যের কথা বলছিনে, তাঁর আলোচনার পারিপাট্যের কথাও বলছিনে। আমি বলছি এই কথা যে, তিনিই প্রকৃত জীবনী-লেখক হ'তে পারেন, যিনি নিজের প্রাণমন ঢেলে দিয়ে লিখতে পারেন, যিনি

সত্য সত্যই, যাঁর জীবন-কথা লিখ্‌ছেন, তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত, তাঁর প্রতি ভক্তিমান্, তাঁর প্রতি পরম শ্রদ্ধাপরায়ণ। জীবনী-লেখকের পাণ্ডিত্য না থাকুলেও চলে, রচনা কৌশলের অভাবও বড় একটা কথা নয়; কিন্তু তাঁকে শ্রদ্ধাপরায়ণ হ'তে হবে। শ্রীমান নলিনীরঞ্জনে এই শ্রদ্ধা, এই ভক্তির অণুমাত্রও অভাব নাই; তাই তাঁর লেখা এই জীবন-কথা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ বই হয়েছে।

এইখানে শুধু একটা কথা বল্‌তে চাই। শ্রীমান নলিনীরঞ্জন এই বইয়ের 'হাস্য রসে' অধ্যায়ে যে সব কথা বলেছেন, যে রকম করে তুলনায় সমালোচনা করেছেন, তা তিনি না করলেই বেশ শোভন হ'ত; কারণ তিনি এই অধ্যায়ের অনেক স্থানেই ভাবের আতিশয্যে চালিত হয়েছেন, বিচার করে মন্তব্য প্রকাশের অবকাশ গ্রহণ করেন নাই। তাই তাঁর মন্তব্যের সঙ্গে একমত হ'তে না পেরে আমি বড়ই অস্বস্তি অনুভব করেছি। তবে, সে কথা নিয়ে একটা বার্দ বিতণ্ডা করা আমার দ্বারা কিছুতেই হবে না, কারণ বইখানি যে আমাকে চারিদিক দিয়ে মুগ্ধ করে রেখেছে;—আমার কাণে যে শুধুই ধ্বনিত হচ্চে কান্ত কবির সেই গান

"তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল-করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।"

পূর্ব্বেই বলেছি, আমি শ্রীমান নলিনীর বইয়ের সমালোচনা করতে বসিনি; সে যোগ্যতা, সে সামর্থ্য আমার নাই, আর সে চেষ্টাও আমি করি নাই। আমি বইখানির একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি; এবং সে চেষ্টাও যে বেশ সফল হয়েছে, তা মনে হচ্চে না; যেমন করে বল্‌লে এই বইখানির কথা বলা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'ত, তা আমি বল্‌তে পারিনি,—এই ক্ষোভ আমার রয়ে গেল।

গীতিমাল্যে রবীন্দ্রনাথ।

[অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত]

কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতিমাল্যে আপনার মতামত কতখানি প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় ঐ গ্রন্থখানিতে কতখানি দিয়াছেন তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা একেবারেই যে অসঙ্গত নহে তাহা এখন আর কেহও অস্বীকার করিতে পারেন না। কবিতাকে নানা দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহার স্বভাব সরল মাধুর্য্যের উপর যে অস্ত্রোপচার করা হয় তাহা আমরা জানি। কিন্তু ঐ সঙ্গে ইহাও জানি যে কোন-কিছু সম্যকরূপে জানিতে হইলে তাহাকে ভাঙ্গা-গড়ার যন্ত্রে না ফেলিয়া উপায় নাই। কেহও হয়ত বলিবেন গড়ার ক্ষমতা না থাকিলে ভাঙ্গার উপদ্রব আনয়ন করা একটা জঘন্য রকমের অন্যায় ও পাপ। ইহার উত্তরে আমরা বলিব—যে প্রণালী দ্বারা না ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গার কায সারা যায়, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিব। পুষ্পকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, পুষ্পকে যতদূর বুঝিতে পারা যায় ততখানি কিম্বা তাহার কিয়দংশ বুঝিতে পারিলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভাঙ্গিবার শক্তিও আমার নাই আর সে স্পর্দ্ধাও আমি রাখি না। আর আমার এই প্রবন্ধও সমালোচনা নয়। যাঁহারা এই প্রবন্ধকে সমালোচনা বলিয়া ধরিয়া লইবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভুল বুঝিবেন।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম মতটা গীতিমাল্যে কি ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহাই সর্ব্ব প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। কবিতার পর কবিতা গাঁথিয়া তিনি যে মালাখানি ভগবানের গলায় পরাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে কবি-হৃদয় যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই এখন বুঝিতে প্রয়াস পাইব।

যতদিন বিশ্ব সংসারের ভাবা-জননী বাঁচিয়া রহিবেন ততদিন মানুষ বুঝিতে পারিবে রবীন্দ্রনাথ একজন বিশেষ ভক্ত-কবি। তাঁহার হৃদয়-পিয়ালা সৌন্দর্য্য, বর্ণ, স্পর্শ ও গন্ধের মদিরায় ভরপূর থাকিলেও ভক্তিরস সে পিয়ালা হইতে সর্ব্বদাই উপছিয়া পড়িতেছে। যে রসের জন্য শান্তিপুর ডুবু ডুবু হইয়াছিল আর নদীয়া ভাসিয়া গিয়াছিল, সে

রস এই কবি-হৃদয়ে যে কোনও অংশে কম তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। মীরাবাই, রামপ্রসাদের গানে যে ঝঙ্কার আমরা শুনিয়াছি, এই গীতিমাল্যেও সেই ঝঙ্কারের আর এক নূতন মূর্ত্তি দেখিতে পাই। অর্দ্ধাঙ্গিনী বা Better-half যেমন প্রিয়তমা, তেমনই ভগবান মানুষের প্রিয়তমেরও প্রিয়তম। সেইজন্য ভগবৎপ্রেমে মানুষ মাতোয়ারা হইয়া পড়ে। তাঁহার বিরহ অসহ্য হয় আর তাঁহার প্রতীক্ষায় মানুষ দিবস রজনী শেষ জ্ঞানটী পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিতে পারে। এই ভগবানের জন্য প্রতীক্ষার ভাব গীতিমাল্যের কবিতায় বড়ই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য ফরাসী পণ্ডিত আঁদ্রে গীদ্ ফরাসী গীতাঞ্জলীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, ঐ গ্রন্থের কতকগুলি কবিতাকে তিনি ঈশ্বরের প্রতীক্ষা নামে অভিহিত করিতে চাহেন (সবুজপত্র, অগ্রহায়ণ ১৩২১,পৃঃ ৫৬৪) গীতিমাল্যের—"আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ (৭) উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, 'এটি যে কবিতা শ্রেণীভুক্ত তাহাতে প্রতীক্ষার সকল প্রকার দশা ও রূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এক একবার মনে হয় যে,এ প্রতীক্ষা প্রেমাস্পদের আগমনের প্রতীক্ষা; কিন্তু দেখিতে দেখিতে আবার তাহা উদ্বেলিত আধ্যাত্মিক রসে পরিণত হয়।" সবুজপত্র, ১৩২১ পৃঃ ৫৬১)

এই বিরহ যে একেবারে জন্ম হইতে আরম্ভ হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত চলিবে তাহা নয়। এই পৃথিবীতেই কবির সহিত তাঁহার প্রেমাস্পদের মিলন হইয়াছিল এবং এমনও সময় সময় হইয়া থাকে। তাই বিরহ বড়ই উন্মাদনা আনিয়া দেয়, আর মিলন মধুর হইতেও মধুর হইয়া পড়ে। যথা—

বিচ্ছেদেরি ছন্দ ল'য়ে মিলন ওঠে নবীন হ'য়ে। (৭৭)

এই মিলনের আভাস আমরা গীতিমাল্যের প্রথম ও শেষ শ্লোকে দেখিতে পাই।

রাত্রি এসে যথায় মেশে
দিনের পারাবারে
তোমায় আমায় দেখা হ'ল
সেই মোহনার ধারে। (১)

জীবনের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই অথবা কোন শুভ প্রভাত বেলায় কবির সহিত তাঁহার বঁধুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সন্ধ্যাবেলায় যে তাঁহাদের মিলন হইয়াছিল তাহারও নজীর আছে।

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেচ,
তোমায় করি গো নমস্কার। (১৪১)

সুতরাং এ বিরহ চির জীবনের বিরহ নহে—হতাশ প্রেমিকের বিরহ নহে। এই বিরহ মিলনের পর হইতে আরম্ভ হইয়া মিলনেতে আবার শেষ হইয়া যায়। কেবল তাহাই নহে, জন্ম মৃত্যুর মধ্যে সকাল সন্ধ্যায় এ মিলন সুযোগ পাইলেই ঘটিয়া থাকে। যেমন—

কত রাতে, কত প্রাতে,
কত গভীর বরষাতে,
কত বসন্তে,
তোমায় আমায় সকৌতুকে
কেটেছে দিন দুঃখে সুখে
কত আনন্দে। (১২)
রোজ দেখছি দিনের কাজে
পথের মাঝে ঘরের মাঝে
করচ যাওয়া আসা। (১২)

রাত্রিতেও কবির সহিত বন্ধুর মিলন হইয়া থাকে। যথা—

লুকিয়ে আস আঁধার রাতে,
তুমি আমার বন্ধু।
লও যে টেনে কঠিন হাতে
তুমি আমার আনন্দ। (৪৭)

এমন বন্ধু না হইলে মানুষকে তাহার দুঃখ সঙ্কট, ক্ষতি, শত্রু, ভয় ও মৃত্যু হইতে কে রক্ষা করিবে?

এইখানেই খৃষ্টধর্ম্মের মতটি হইতে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম মতে এই পৃথিবীতে আমরা চির বিরহী। মৃত্যুর অপর পারে বর কন্যার শুভ মিলনের মত আমাদের সহিত ভগবানের সাক্ষাৎ ও মিলন হইবে। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থও সেই কথা প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন।

এই যে বিরহ মিলন তাহা যে একজীবনেই শেষ হইয়া যায় তাহা নহে। অনাদি কাল-স্রোতের মধ্যে মিলনের আশা লইয়া কবির জীবন-তরী বরণডালা লইয়া অগ্রসর হইতেছে। যথা—

চলেছে ভেসে মিলন-আশা-তরী
অনাদি স্রোত বেয়ে।
কত কালের কুসুম উঠে ভরি
বরণডালি ছেয়ে।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে'
যুগে যুগে বিশ্ব ভুবন তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চির স্বয়ম্বরা॥ (৫২)

এই কবিতাটিতে জন্মান্তরবাদ বা Transmigration of the Soul সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য এ সম্বন্ধে সমালোচক থম্‌সন্ বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন। (Rabindranath Tagore P. ৭৭) রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে তাঁহার পিতার মত গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু সে বিষয়টি আমাদের আলোচনার বাহিরে। গীতিমাল্যে যে ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই ভাবই ব্যক্ত করিতে আমরা প্রয়াস পাইতেছি।

আধুনিক দার্শনিক মত যাহাতে সত্যকে এক এবং বহু অর্থাৎ একের মধ্যে বহু এবং বহুর মধ্যেও এক বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে সেই মতটিও এই কবিতাটিতে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। সুবিখ্যাত 'ধূপ ও 'গন্ধ' নামক কবিতাটিতেও এই ভাব স্পষ্টীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। ধূপ ও গন্ধের অথবা ভাব ও রূপের বিশিষ্ট কল্পনা থাকিলেও যেমন উহাদের পৃথক সত্ত্বা নাই, তেমনই বহু এবং একের পৃথক কল্পনা থাকিলেও উহাদের কোন পৃথক বা isolated সত্ত্বা নাই। একের দিক দিয়া দেখিতে গেলে মনে হয় এক বহুর দিকে চলিয়া যাইতেছে, আবার বহুর দিক হইতে দেখিতে গেলে মনে হয় বহু একের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত ব্যাকুলচিত্তে মোহন বেশে চলিয়া যাইতেছে। উপনিষদকারও এই সত্য ঘোষিত করিয়া গিয়াছেন। যথা—ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্ব্বং (ঈশ ১)। উপনিষদকার ইদং সর্ব্বং বলিয়া বহুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। কিন্তু ইহারা ঈশা বাস্যম্ অর্থাৎ ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপৃত। সুতরাং ঈশ্বর হইতে বহুকে পৃথক করিয়া দেখিতে গেলে সত্যকে পাওয়া যাইবে না। অসীমের সহিত সীমার নিবিড় সঙ্গ কবি জোরের সহিত কহিয়া গিয়াছেন।

বসন্ত বাবু রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করিতে গিয়া যে মত-বাদটি রবীন্দ্রনাথের মাথার উপর চাপাইয়া দিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক গ্রন্থে বিশেষ পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর যদি বিশ্বের সহিত সমস্ত লেঠা চুকাইয়া নিদ্রা গিয়াছেন বলিয়া কবি বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তিনি লিখিতেন না

তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভরে'
আমার করে' নিয়ে তবে নাও যে তোমার করে'। (১০১)

গীতাঞ্জলীর ৯৫ সংখ্যক কবিতাও এই সুরে গাঁথা। যথা—

বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

ইহা হইতে ভগবানের সহিত জীবের যে কেমন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহা অতি সহজেই বুঝা যায়। আবার জীবের অবস্থা সম্বন্ধে কবি কি কহিয়াছেন তাহাও একবার শুনুন—

আমার বলে' যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার করে দেব' তখন তা'রা আমার হবে। (১০১)

জীবের কথা বলিয়াই কবি ক্ষান্ত হন নাই। সূর্য্য তারার কথাও তিনি কহিয়াছেন। বিশ্বের রাখাল সাজিয়া বিশ্বপতি বেণু বাজাইয়া মহা গগন তলে সূর্য্য তারাকে চরাইয়া বেড়াইতেছেন।—

এই ত তোমার আলোক-ধেনু
সূর্য্য তারা দলে দলে;
কোথায় বসে' বাজাও বেণু
চরাও মহা গগন তলে। (১০৩)।

এরা যে কলুর বলদের মত খাটিয়াই মরিতেছে, স্বাধীনতা যে ইহাদের একেবারেই নাই একথা কবি বলেন না। ইহারা আপন ইচ্ছা মত ধূলি উড়াইয়া ছুটিয়া বেড়ায়। যথা—

সকাল বেলা দূরে দূরে
উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে।
আঁধার হ'লে সাঁঝের সুরে
ফিরিয়ে আন আপন গোঠে। (১০৩)

সুতরাং প্রত্যেক বিশিষ্ট পদার্থেরই খানিকটা ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে। এই ব্যক্তিত্বটুকু মহা মিলনের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন বলিয়া কবির মতের সহিত আধুনিক

প্রচলিত দার্শনিক মত ও প্রাচীন উপনিষদকারের মতের সহিত মিলিয়া গিয়াছে। নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া ভগবানের মন্দিরে যাওয়া কবি সমর্থন করেন না। তিনি ভাল করিয়া ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করিয়া, শূন্য ঝুলি পরিপূর্ণ করিয়া বর্ণ, রূপ, রস ও গন্ধের অপূর্ব্ব সম্ভারে বরণডালা সাজাইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে বলেন।

ভগবান যে দূরে নন, বরং অতি নিকটে—একটু হাত বাড়াইলেই যে তাঁহাকে পাওয়া যায়, সে সংবাদও কবি দিয়াছেন। যথা—

আছ যেন কাছের কোণে
একটুখানি আড়ালে
জানি যেন সকল জানি,
ছুঁতে পারি বসনখানি
একটুকু হাত বাড়ালে॥ (৯)

কবি রবীন্দ্রনাথ কেবল যে ঈশ্বরের সহিত প্রেমের মধুর সম্বন্ধ পাতাইয়াছেন তাহা নহে। দাস্যভাবে, শিষ্যভাবে ও বন্ধুভাবেও তিনি ভগবানকে আরাধনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রেমভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, মুসলমান ধর্ম্ম বন্ধু ও দাস্য ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং খৃষ্টধর্ম্ম শিষ্য ভাব ও প্রেমভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এই কয়টি ভাবেরই সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথকে সার্ব্বজনীন কবি বলা হইয়া থাকে।

ভৃত্য বা দাস্য ভাবের কবিতাও গীতিমাল্যে আছে। যথা—

নিত্য সভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে
তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না? (৪৩)

বন্ধুভাবের সাধনাও গীতিমাল্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

দুঃখ রথের তুমিই রথী
তুমিই আমার বন্ধু। (৪৭)
আমার বন্ধু যখন রাত্রিশেষে
পরশ তা'রে করবে এসে,
ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব
চরণে তার লুটবে। (৪৯)

এই বন্ধুভাবের কবিতা ডেভিডের গান মনে করাইয়া দেয়। যেমন – The Lord is my rock, and my fortress, and my deliverer ; my God, my strength, in whom I will trust ; my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower. (১৮)

বৈষ্ণব ধর্ম্মের নায়িকা ভাবের উপাসনাও কবি রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন। ভগবানকে চিরন্তন নর আর মানুষের আত্মাকে চিরন্তন নারী কল্পনা করিয়া বৈষ্ণব কবিগণ যে অফুরন্ত অভিসার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন সেই দিকেই যে রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক বেশী তাহা তাঁহার অধিকাংশ কবিতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

কাঁটার পথে ধায় সে তোমার
অভিসারে ;
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাক তা'রে। (৬৪)

রাধাও কাঁটার পথে অভিসারে বাহির হইয়াছিলেন, আর শ্রীকৃষ্ণও হৃদয়-দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়াছিলেন। রাধার মত রবীন্দ্রনাথও যে বাঁশীর সুরে পাগল হইয়াছিলেন তাহাও ধরা পড়িয়াছে। যথা—

'তোমার বাঁশী নানা সুরে
আমায় খুঁজে বেড়ায় দূরে, (৮২)
কতদিন যে তুমি আমায়
ডেকেচ নাম ধরে'—
কত জাগরণের বেলায়
কত ঘুমের ঘোরে। (৫৩)
তোমার বাঁশী উঠচে বেজে
ধৈর্য্য নারি রাখিতে। (১০)

সাপ খেলানো বাঁশীর সুরে নাগিনী যেমন গুহা হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া আসে, রবীন্দ্রনাথও তেমনই বিশ্বপতির বাঁশীর সুরে মাতোয়ারা হইয়া তাঁহার নিকট ছুটিয়া গিয়া মস্তক অবনত করিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিলেন।

রাধিকা লাজ লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া, সাজ সজ্জা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট, গিয়াছিলেন, কবিও তাহাতে পশ্চাৎপদ হন নাই। যথা—

আমার রইল না লাজ লজ্জা,
আমার ঘুচ্‌ল গো সাজ সজ্জা, (১৯)

যে ভাবেই ভগবানকে উপাসনা করা হউক না কেন সর্ব্ব শেষে ভক্তিভাব আসিয়া পড়িবেই। ভক্তি না জমিয়া উঠিলে সাধকের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। রবীন্দ্রনাথের হৃদয় যে ভক্তিতে উছলিত তাহার পরিচয় তিনি গীতিমাল্যে অনেক দিয়াছেন। গীতিমাল্যের সর্ব্বশেষ কবিতাটী ভক্তি-রসাপ্লুত। যথা—

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেচ,
তোমায় করি গো নমস্কার। (১১১)

এই শ্রেণীর কবিতা আরও যথেষ্ট আছে। যথা—

করব তোমার সেবা
দাও সে পরম শক্তি,
চাইব তোমার মুখে
দাও সে অচলা ভক্তি॥ (৫০)
চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে
নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে। (১০৪)

বৌদ্ধ ভিক্ষু দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া রিক্ত হস্তে দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। রবীন্দ্রনাথও যে সে বেশ ধরিয়া বিশ্বপতির দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সে সংবাদটিও গীতিমাল্যে আছে। যথা—

বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে
পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে, (১০৪)
পথে পথে ফেরে, দ্বারে দ্বারে যায়,
ঝুলি ভরি' রাখে যাহা কিছু পায়,
কতবার তুমি পথে এসে হায়
ভিক্ষার ধন হরিলে॥ (১০৬)

রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও ভক্তি যে স্বর্গ কিম্বা সুখ লাভের জন্য নয়, উহা যে নিষ্কাম বা অহেতুকী তাহার পরিচয়ও গীতিমাল্যে পাওয়া যায়। যথা—

বিনা প্রয়োজনের ডাকে
ডাকব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পূরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে
নামের নেশায় ডাকে
বল্‌তে পারে এই সুখেতেই
মায়ের নাম সে বলে॥ (৩২)

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আরাধ্যতমের নিকট দুইটি শেষ প্রার্থনা করিয়াছেন। কেন যে তিনি এই শ্যামল বসুমতীর ক্রোড়ে চলিয়া আসিয়াছিলেন, এই কথাটা তিনি যেন জানিতে পারেন ; আর এ জীবনের কাজ যখন শেষ হইয়া যাইবে তখন যেন তিনি এই জীবনের আলোকেই জীবন-দেবতাকে দেখিয়া যাইতে পারেন।

যাবার আগে জানি যেন
আমায় ডেকেছিলে কেন
আকাশ পানে নয়ন তুলে
শ্যামল বসুমতী ? (৪০)
এই জীবনের আলোকেতে
পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায়
আমার গলার মালা,
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা॥ (৪০)

ডাঃ হেনরী ষ্টিফেন তাঁহার সর্ব্বজন আদৃত Problems of Philosophy নামক পুস্তকে দর্শনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এই রকম কথাই কহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতায় যে উচ্চাঙ্গের ভাবুকতা দেদীপ্যমান, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করা অসঙ্গত।

প্রচলিত জ্ঞানের পথ অবলম্বন করিয়া যে রবীন্দ্রনাথ সাধনার পথে অগ্রসর হন নাই—ধূলায় বসিয়া খেলিতে খেলিতেই তিনি যে বিশ্বপতির দ্বারদেশে আসিয়া পৌছিয়াছেন, সে কথাও গীতিমাল্যে আছে। যাহারা অবোধ, তাহাদের ভয় ভাবনা অত্যন্ত কম,। সেইজন্য সত্যের সন্ধান যদি তাহারা 'একবার' পাইয়া বসে তবে তাহারা সত্যকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে না। প্রচলিত ধর্ম্ম বর্ণিত পথে অগ্রসর না হইলে বিশ্বপতির দর্শন লাভ ঘটিবার উপায় নাই, এই কথা শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন। সে কথা উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে উত্তর দিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন
তিরস্কারে
"পথ দিয়ে তুই আসিস্ নি যে
ফিরে যারে।"
ফেরার পন্থা বন্ধ করে'
আপনি বাঁধ বাহুর ডোরে,
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে
বারে বারে॥ (৭২)

সুতরাং জ্ঞানমার্গই যে একমাত্র পথ তাহা কবি স্বীকার করেন না। যিনি বিশ্বের সর্ব্বত্র বিরাজিত তাঁহাকে পাইবার পথ নিশ্চয়ই অসংখ্য। সুতরাং অবোধ শিশুও যে তাঁহাকে খেলার মধ্যে পাইয়া বসিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

মায়ের বুকের স্নেহ এ জগতে অতুলনীয়। ভগবানের এই মাতৃরূপ দেখিয়া রামপ্রসাদ ধন্য হইয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও বিশ্বপতির এই মাতৃরূপ দেখিয়া যে নয়ন সার্থক করিয়াছেন, তাহার পরিচয়ও আমরা গীতিমাল্যে পাইয়াছি। জননী ব্যতীত সন্তানের দুঃখ তেমন ভাল করিয়া কে বুঝিতে পারে ? তাই কবি লিখিয়াছেন—

ওমা, সন্ধ্যা হ'ল বুকে ধর !
অতল কালো স্নেহের মাঝে
ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ কর॥ (১০৭)

আজ এইখানেই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। বারান্তরে গীতিমাল্যের কবিকে অন্য দিক হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কবিতা-কুঞ্জ।

প্রকৃতি বরণ।

[শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ]

(১)

নিখিল-শরণ,
বিশাল প্রকৃতি তব সমাদরে করিনু বরণ।
রচিত উদ্যানে মম,
পিঞ্জরের পাখী সম,
ক্ষুদ্র তৃপ্তি লয়ে রুদ্ধ করিব না আমার জীবন,
নিখিল-শরণ।

(২)

উদার আকাশ,
পরতে পরতে আঁখি দেখে শত ফুলের বিকাশ,
বাধাহীন সমীরণ,
নদ নদী প্রস্রবণ
অচল সাগর দেয় হে বিরাট তোমারি আভাষ ;
তোমারি বিকাশ।

(৩)

মানস নয়নে,
কৃত্রিম ঠেকে না কিছু অবিকৃত তোমার ভবনে।
আজি মোর ক্ষুদ্রতায়,
অসংযত রুদ্রতায়,
ভাসায়ে দিয়েছি সুখে প্রকৃতির অমিয় শ্রবনে।
অকপট মনে।

(৪)

আপনার মনে,
আপনা লইয়া ভুলেছিনু আমি বড় নিরজনে।
সকলের পরিচয়,
আজিকে করেছি জয়,
পড়েছি সবার সনে বাঁধা আজ অটুট বাঁধনে,
অবাধ মিলনে।

(৫)

সোহাগ বাঁধনে,
ভূচর-খেচর-জীব-তরু-লতা-অচেতন সনে,
গাঁথিয়াছি মন-প্রাণ,
নাহি কোন ব্যবধান,
আজি এক হয়ে গেছে লোকালয়ে নিবিড় কাননে।

(৬)

মিলন বাসর,
ব্যাপ্ত রবে কত দেশ কত তীর্থ কতই সাগর।
সেই ভাবী শুভদিন,
ভাবিতেছি নিশিদিন,
বিলায়েছি কল্পনায় পুলকিত নিভৃত অন্তর।
বাসনা নিকর।

(৭)

নবীন জীবন,
ভ্রান্তি-অন্ধকার শেষে জ্ঞানময় নব জাগরণ।
অন্তর প্রকৃতিময়,
বাহিরে তাহারি জয়,
তরুণ উষায় আজ করিয়াছি প্রকৃতি বরণ।
নিখিল-শরণ।

আশাতুরা।

[শ্রীমতী নীহারকণা রায়]

দুরাশা আজিও সখা, মাঝে মাঝে তবু মনে জাগে,—
গড়িয়া হৃদয় মম আরক্তিম ও চরণ-রাগে,
সহাস্য সুন্দর মুখে তোমারি আনন্দলোক হ'তে,
হে মোর পরাণ প্রিয়, আসিবে এ জীবনের পথে।
উন্মুখ ব্যাকুল চিত্তে নিশিদিন আছি প্রতীক্ষায়,
কখন আসিবে নামি,—কোন এক মধু পূর্ণিমায়—
তৃষিত এ বক্ষোপরে, অমৃতের নির্ঝরিণী সম,
পুঞ্জে পুঞ্জে ফুলরাশি ফুটাইবে চিত্ত-বনে মম।
কোমল করুণ সুরে বাজাইবে পরাণের বাঁশী,
আকুল আঁখির জলে মিশাইবে অধরের হাসি।
গুঞ্জরে যে গানখানি হিয়া মাঝে চিরদিন ধরি,
সার্থক করিবে তারে, ছন্দ সুরে পরিপূর্ণ করি'।
ওগো প্রিয়, প্রিয়তম, হে আমার তরুণ দেবতা!
শ্রবণে শুনাবে মোর সুমোহন প্রেমের বারতা;
আমার কম্পিত দেহ বাঁধিবে ও বাহু পাশ দিয়া,
পুলকে ব্যাকুল হ'য়ে আপনারে দিব লুটাইয়া
তোমার চরণতলে,—জাগে মনে এই বড় সাধ!
পূর্ণ কি করিবে আশা, হে বাঞ্ছিত, হে জীবননাথ?
শুধু আশা পথ চেয়ে জেগে আছে পরাণ ব্যাকুল,
চরণ পরশে কবে বিকশিবে জীবন-মুকুল?

দান।

[শ্রীসরোজকুমার সেন]

সুরটি বাজা প্রাণের বীণে,
গা'রে নূতন গান—
এবার শুধু ধরা বুকে
বিজয় অভিযান!
নিজের লাগি পরের দোরে,
ভিক্ষা মাগিস্ চরণ ধরে',
নাই কি কোন লাজ—
বৃথা যে তোর সময় গেছে
চল্‌রে পরি সাজ!
হেলায় নিতি সবার মাঝে
আপনারে হারিয়ে লাজে,
করিস্ কোলাহল—
তরুর মতো বাড়ায়ে শির
উঠ্‌বে হীনবল!
মানের লাগি চাই যে শুধু
প্রাণের মহাদান
সাধনা তোর হবে রে জয়ী
আছেন ভগবান্!

আহ্বান।

[শ্রীহৃষীকেশ মল্লিক]

তুমি নিমিষের তরে এসো,
তুমি নিমিষের তরে এসো
তুমি আমারে না হয় হেলা ফেলা ভেবে
এই জগতেরে ভালবেসো।
তোমারি রচিত এ বিশ্বভবন—
ফুলে ফুলময় বন উপবন—
উদার আকাশ উদার তপন—
দুখিনী তটিনী ছুটিয়ে যায়—
কত যুগ ধরি অস্থির সাগর,
তলেতে সুমেরু নীরব নিথর,
হৃদে ধরি শত পাষাণ বিবর,
সকলে তোমারে দেখিতে চায়।
তাই নিমিষের তরে এসো
তুমি নিমিষের তরে এসো
তুমি আমারে না হয় দলিয়ে চরণে—
এই জগতেরে ভালবেসো,
দিয়াছ হেথায় কতই জীবন,
ভূচর খেচর জীব অগণন,
আকুল স্বপন অনন্ত রমণ—
মানব নয়ন মায়ায় ভরা।
সবে তারা আজ ভুলেছে তোমায়—
গেল গো ধরণী মলিন হিংসায়—
ভালবাসা বুঝি ফুরাইয়ে যায়—
যদিও হেথায় প্রবল জরা।
তাই নিমিষের তরে এসো
তুমি নিমিষের তরে এসো,
তুমি কঠিন মাটীর এ পাপ মুছায়ে
এই জগতেরে ভালবেসো।
এখানে মানব খেলনা পেয়েছে,
পুতুলে পুতুলে বিবাহ দিয়েছে,
কি ছল চাতুরী তাহারা শিখেছে
ভাবিলে চেতনা হারাতে হয়,
এত স্বার্থ নিয়ে দু'দিনের তরে,
কি দ্বন্দ্ব লেগেছে এ মাটীর ঘরে,
পুণ্যের তরণী লেগে পাপ-চরে
কালেতে হ'তেছে সকলি ক্ষয়।
তাই নিমিষের তরে এসো
ওগো নিমিষের তরে এসো।
(একবার)—তোমারি সৃজিতে তুমি গো বাঁচায়ে
এই জগতেরে ভালবেসো।

দেশীয় ভৈষজ্যতত্ত্ব।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত এচ্., এম্, বি]

"ত্রিকটু"

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

মরিচ।

মরিচ এক প্রকার লতা। ইহার লতা ভূমি বা বৃক্ষাদি আশ্রয় করিয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া থাকে। লতা-কাণ্ড ও শাখা গ্রন্থিযুক্ত। ইহার প্রতি গ্রন্থি হইতে শিখা নির্গত হইয়া থাকে। ইহার পত্র চৌড়া। পত্রোদর বড় মসৃণ, চিক্কণ পত্র দেখিতে ফিকে বর্ণ এবং ইহার ৫টী শিরা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

কোচবিহার ও আসাম অঞ্চলে মরিচের লতা জন্মিয়া থাকে। মরিচের পুষ্প সুগন্ধযুক্ত নহে। কোচবিহার ও আসাম অঞ্চলে কিন্তু মরিচের লতা তাদৃশ ফল প্রসব করে না। স্বর্গীয় কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত কাব্যতীর্থ, কবিভূষণ তাঁহার রচিত 'বনৌষধি দর্পণে' ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে "কোচবিহার ও আসাম অঞ্চলে প্রায় সকল ঋতুতেই পূর্ব্ব বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, যদি

ঘটনাক্রমে পূর্ব্ব দিকে পুং-পুষ্পধারিণী * এবং পশ্চিমে স্ত্রী-পুষ্পান্বিতা মরিচলতা অবস্থিত থাকে, তাহা হইলেই যথেষ্ট ফলোৎপাদনের সম্ভাবনা। যদি লোকে এই তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মরিচ লতা রোপণ করে, তাহা হইলে প্রচুর ফল লাভে সংশয় থাকে না। লোকে এই তত্ত্ব অবগত নহে; সুতরাং এতদঞ্চলের মরিচলতা আশানুরূপ ফল দান করে না, কিম্বা যে মরিচ হয় তাহা ক্ষুদ্রাকৃতি এবং তাদৃশ কটু হয় না।" ঔষধার্থ ব্যবহার ফল। মাত্রা ½—২ আনা।

মরিচের বাঙ্গালা নাম—গোলমরিচ। আঃ—ফালুক, হিঃ—কালীমরিচ, মঃ—চোকা মরিচ, কঃ—মেণসু, তৈঃ—মেরিয়া, তাঃ—মিনাগুভলী, ফাঃ—ফিল্-ফল্-ই-সিয়া, অঃ—ফিল্ফি অস্বদ্, ইং—ব্ল্যাক্পিপার।

"মরিচং বেল্লজং কৃষ্ণমূষণং ধর্ম্মপত্তনম্।
মরিচং কটুকং তীক্ষ্ণং দীপনং কফবাতজিৎ॥
উষ্ণং পিত্তকরং রূক্ষং শ্বাসশূলক্রিমীন্ হরেৎ।"

অর্থাৎ মরিচ বেল্লজ, কৃষ্ণ, উষণ ও ধর্ম্মপত্তন এই কয়টী মরিচের পর্য্যায় শব্দ। মরিচ—কটুরস, তীক্ষ্ণ, অগ্নি-প্রদীপক, কফঘ্ন, বায়ুনাশক, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকারক, রূক্ষ এবং শ্বাস, শূল ও ক্রিমিনাশক।

"তদার্দ্রং মধুরং পাকে নাত্যুষ্ণং কটুকং গুরু।
কিঞ্চিত্তীক্ষ্ণ গুণং শ্লেষ্মপ্রসেকিস্যাদ পিত্তলম্॥"

অর্থাৎ আর্দ্রমরিচ—মধুর বিপাক, ঈষৎ উষ্ণ, কটুরস, গুরু কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণগুণযুক্ত—এবং কফস্রাবক; ইহা অল্প-পিত্তকারক।

এইবার ভিন্ন ভিন্ন রোগে মরিচের ব্যবহার লিখিত হইল।—

১। কাসে মরিচ—ঘৃত, চিনি ও মধুর সহিত মরিচ-চূর্ণ লেহন করিলে সর্ব্বপ্রকার কাস বিনষ্ট হয়।

২। নিদ্রালাভার্থ মরিচ—মানুষের লালায় মরিচ ঘর্ষণ-পূর্ব্বক নেত্রাঞ্জন দিলে ত্রিরাত্র নষ্ট নিদ্রা পুনরাগত হয়।

৩। পীনস রোগে মরিচ—পিনসরোগের প্রথম হইতে পুরাতন গুড় এবং দধির সহিত মরিচচূর্ণ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার পিনস রোগ ভাল হয়।

৪। শিশুর শোথে মরিচ—শিশুর শোথে নবনীতের সহিত মরিচ চূর্ণ লেহন করাইবে।

৫। অতিনিদ্রায় মরিচ—মধু ও অশ্বের লালাসহ মরিচ ঘর্ষণপূর্ব্বক নেত্রে অঞ্জন দিলে অতিনিদ্রা প্রশমিত হয়।

৬। প্রবাহিকায় মরিচ—শীতল জলের সহিত মরিচচূর্ণ পান করিলে বহুকালজাত প্রবাহিকা রোগ নষ্ট হয়।

৭। অপতানক রোগে মরিচ—অপতানক নামক বাত ব্যাধিগ্রস্থ রোগী অন্য কোন বস্তু ভোজনের পূর্ব্বে মরিচ ও বচচূর্ণসহ অম্লদধি পান করিবে।

৮। রাত্রান্ধে মরিচ—দধিতে মরিচ ঘর্ষণ করিয়া সেই দধির অঞ্জন করিলে রাতকানা রোগ ভাল হয়।

পাশ্চাত্য মত—

Actions and uses—It is a local irritant, causing intense burning on the skin. In medicinal doses it stimulates the heart, the kidneys, and the mucous membrane of the urinary and intestinal tracts. It is eliminated in the urine and fæces. In large doses it causes abdominal pain, vomitting, irritation of the bladder and urrithra and urticaria on the skin. As a gastric stimulants it is chiefly used in flatulence, dyspepsia, and atony of the stomach; like cubebs it is given in gonorrhœa, gleet and hæmorrhoids and other rectal disorders. Pepperin acts as an antiperiodic and antipyretic. It relieves intermittent fevers, by causing perspiration, in neurosis and in congestion of the spleen it is of benefit. In toothache a paste of it is applied with benefit. The infusion is used as a gargle in relaxed uvula, sore-throat etc, with vinegar the powder is applied over the bites of venomous reptiles. Mixed with onions and salt it is rubbed over

* কোন মরিচ লতায় কেবল পুংপুষ্প, কোনটীতে বা কেবল স্ত্রীপুষ্প থাকে, একটী লতায় পুং-স্ত্রী দ্বিবিধ থাকে না। কচিৎ কোন লতায় উভয়লিঙ্গ পুষ্প এবং স্ত্রী-পুষ্প দেখিতে পাওয়া যায়।

bald head in alopecia. The oil is applied of mucular rheumatic pains, headache and pain of hœmorrhoids [*Materia Medica of India—R. N. Khory—Part II., P. 521.*] অর্থাৎ—মরিচের প্রলেপ অত্যন্ত হিতকারী। ইহা প্রকৃতরূপ প্রয়োগ করিলে হৃদয়, বৃক্কদ্বয় ও মূত্রপথ এবং অন্তরে শ্লেষ্মা ধরা কক্ষকে উত্তেজিত করিয়া থাকে। ভক্ষিত-মরিচ মূত্র ও মলের সহিত বহির্নিঃসৃত হইয়া যায়। মরিচ যদি অতি-মাত্রায় প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে উদরে বেদনা, বমন, মূত্রাশয় ও মূত্রস্রোতের উত্তেজন,কোঠান্বিত জ্বর (urticaria) জন্মাইয়া থাকে। মরিচ—উদরাধ্মান্, গ্রহণী ও পাকস্থালীর পেশী দৌর্ব্বল্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাবাবচিনির মত ইহাও গণোরিয়া, শুক্রমেহ ও অর্শ প্রভৃতি গুহ্যদেশজাত রোগে সেবিত হইয়া থাকে। মরিচের প্রলেপ দন্তশূলে হিতকর। গলক্ষত ও আলজিব বর্দ্ধিত হইলে মরিচের ক্বাথে কবল করাইবে। বিষাক্ত কীটাদি দংশনে দষ্টস্থান 'ভিনেগার' মিশ্রিত মরিচচূর্ণ দ্বারা লেপন করিবে। মরিচ-চূর্ণ ও পিঁয়াজ থেঁত টাকে হিতকর। (আর, এন্, ক্ষোরি)

ত্রিকটু—

এইবার ত্রিকটু সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'চারি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

"ত্র্যূষণং দীপনং হন্তি শ্বাস কাসত্ব গাময়ান্।
গুল্ম মেহ কফস্থৌল্য মেদঃ শ্লীপদ পীনসান্॥"

অর্থাৎ—ত্রিকটু, অগ্নিপ্রদীপক এবং শ্বাস, কাস, চর্ম্মরোগ, গুল্ম, প্রমেহ, কফ, স্থূলতা, মেদঃ, শ্লীপদ ও পীনস রোগনাশক।

ভিন্ন ভিন্ন রোগে ত্রিকটুর ব্যবহার :—

১। কফজ্বরে ত্রিকটু—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, নাগ-কেশর, হরিদ্রা, কটুকী ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ পানে কফজ্বর বিনষ্ট হয়।

২। কাসে ত্রিকটু—ত্রিকটু, কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী, জয়ফল, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা, এই সকল সমভাগে লইয়া মধুসহ লেহন করিলে কাস ও কফরোগ নষ্ট হয়।

৩। গ্রহণী রোগে ত্রিকটু—ত্রিকটু, পিপুলমূল, সাচিক্ষার, রক্তচিতার মূল, পঞ্চলবণ, (অভাবে সৈন্ধবলবণ), জোয়ান ও বচ, এই সকল দ্রব্য সমভাগ মিশ্রিত করতঃ দুই আনা মাত্রায় ছোলঙ্গলেবুর রসের সহিত সেবন করিলে গ্রহণী রোগ ভাল হয়।

৪। যক্ষ্মায় ত্রিকটু—ত্রিকটু চূর্ণ করতঃ সম পরিমাণে ৵০ মাত্রা মধুর সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যায় লেহন করিলে যক্ষ্মারোগ ভাল হয়।

৫। বিসূচিকায় ত্রিকটু—ত্রিকটু, ডহর করঞ্জারফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও ছোলঙ্গলেবুর মূল এই সকল দ্রব্য পেষণ করতঃ ছায়াতে শুষ্ক করতঃ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা চক্ষুতে অঞ্জন করিলে বিসূচিকা নষ্ট হয়।

উপরিলিখিত ঔষধগুলির যেগুলির মাত্রা দেওয়া হয় নাই তাহাদের প্রস্তুত বিধি—সমুদয় দ্রব্য মোট ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেব্য।

(ত্রিকটু সমাপ্ত)

কপালের লেখা।

[শ্রীমতী শোভনা দত্ত]

জীবনে তার প্রথম বসন্ত এল যখন তার সতেরো বছর বয়স। তার পূর্ব্বে জীবনের কোনও বিশেষ দুঃখ বা সুখ কিছুরই তীব্রতা সে উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

বাপ মা তার ছিল না। এক বহু দূর-সম্পর্কীয়া পিসির বাড়ীতে সে মানুষ হয়েছিল। খুব অনাদরে না হউক, আদরে ত সে পালিত নয়ই।

পিসির গলগ্রহ স্বরূপ নিজেকে এক ধারে রেখে কোন মতে জীবনটাকে কাটিয়ে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সেদিন স্কুল থেকে ফিরতির মুখে এক জনশূন্য রাস্তায় আগের দিনের বৃষ্টির কাদায় ঘোড়ার পা ফস্‌কে গিয়ে গাড়ীটী উল্টে যাবার যোগাড় হ'ল, তখন অযাচিতরূপে এক ভদ্রলোক এসে তাদের বাঁচাল। গাড়ীতে তখন সে ও আর একটি ছোট মেয়ে ছিল। কোনরূপে নেমে বাড়ী ফিরে এসে অসম্পূর্ণ কার্যগুলি সারতে পঞ্চাশবার ভুল ও নিজের মধ্যে কি একটা তীব্র মাদকতা সে অনুভব করতে লাগলো। নিজেকে দমন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে বিশেষ ফল হলো না। এমনি করে কাতর ভাবে ত কেউ তার সঙ্গে একটি কথা বলে নাই, একটু কথার জন্যেও ত কেউ তা'কে অমন ভাবে সাধে নাই!

তার কয়েক দিন পরেই সে দেখতে পেলো সেই ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে করে এনে পিসেমশাই তার মেয়ে দুটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু তার মনে হলো যেন কিসের আশায় ভদ্রলোকটি চারিদিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাইছেন। এটা তার অমূলক চিন্তা ভেবে মনকে সে নিরস্ত করল। কিন্তু তার পর থেকে নিজেকে দেখে, সাজবার উপকরণ তেমন না থাকলেও নিজেকে একটু সাজাবার ইচ্ছা তার জাগলো।

তখন ঘন ঘন এসে সেই ভদ্রলোকটি পিসির আত্মীয় হয়ে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে কখনও বা সামান্য একটি দুটি কথা মাঝে মাঝে হ'ত। আগের চেনার কোন পরিচয় এ পর্য্যন্ত সে দেয় নাই, নিজেকে সে এখনও আগের মত গোপনেই রাখে, তবু কেন ঐ লোকটির আসবার সময় হলে হৃদয়, মন এত উৎকণ্ঠিত হয়, সে বুঝে উঠতে পারে না।

তার যা' কিছু সামান্য ছিল তাইতেই সে পরিপাটি করে সাজে। তা'র পিসতুত বোনেরাও আবিষ্কার করে বলল— "বাণী, হঠাৎ এত সুন্দর হয়ে গেলি কি করে?"

রূপ যে একদম ছিল না তা নয়, গানের স্বর ও সুরবোধ যথেষ্ট থাকলেও সাধনা করবার সুযোগ ত সে পায় নি।

একদিন সন্ধ্যায় একলা বাড়ীতে তার সঙ্গে দেখা হলো। মেয়েদের নিয়ে পিসিমা সেদিন কোথায় গেছিলেন। ফিরে যেতে যেতে জানালার ধারে তাকে দেখে সেই ভদ্রলোকটি ফিরে এসে ব্যথিত স্বরে বল্‌লেন, "আর কতদিন আশায় থাকব বাণী? আর এক মাস পরেই ত আমায় যেতে হবে। তার পূর্ব্বে কি তুমি আমার হবে না? বল, বলে দাও। হাঁ কি না বলে আমার চিন্তার শেষ করে দাও।"

সে একথা শুনতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। পিসিমাদের ইচ্ছাও সে জানত। তাঁদের মেয়েদের একটির জন্যই যে তাঁরা তাকে এত আদর যত্ন করেন তাও সে জানত। কিন্তু কি করবে! আবেগে থর্ থর্ করে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে রেলিং ধরে সে বল্লে, "আমার কি আছে? আপনাকে আমি কি দিব! পিসিমাদের ইচ্ছা কি আপনি বুঝতে পারেন নাই? আমি বড় দুর্ভাগা, আমায় নিয়ে অসুখী হবেন কেন!"—এই কথা বল্‌তে বল্‌তে অব্যক্ত বেদনায় আবেগে সে কাঁদ্‌তে লাগল। তিনি এসে বল্‌লেন—"তোমার ত অমত নাই বাণী? আমিও বড় দুর্ভাগা। তাই প্রথম দিন থেকেই তোমাতে নির্ভর করেছি। আমার জীবনে যদি কেউ সুখ আন্‌তে পারে, তুমিই পারবে। আমায়

ছুটি ফুরিয়ে গেছে,তার আগেই তোমায় আমার হ'তে হবে। কালই তোমার পিসেমশাইদের বলব।"

"না, না, আর দুদিন থাক্, ওরা কি ভাববেন ?"

"আর তোমার কথা শুনতে পারি না" বলে তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আর সে বিছানায় পড়ে—জীবনের প্রথম, বোধ হয় অত্যধিক আনন্দেই হোক বা কাল ঐ কথা প্রকাশের পর পিসিমারা কি ভাববেন তাই ভেবেই হোক—কাঁদতে লাগল।

পিসিমার আসিবার সাড়া পেয়ে নিজেকে সম্বরণ করে সে উঠে বসল।

পিসিমা এসেই তার ঘরে ঢুকে বল্লেন, "আমার আস্তে বড় দেরী হয়ে গেল, অমল কি এসেছিল ?" লজ্জিত কুণ্ঠিত স্বরে সে কহিল, "জানি না পিসিমা, এসেছিলেন বোধ হয়।"

"অবাক করলি বাণী, বস্তে বল্তেও পারিস নি ?"—বলিয়া পিসিমা চলিয়া গেলেন।

কাল কি হবে, এই ভাবনায় সে ব্যাকুল হয়ে পড়ল, যথাসময়ে সেই কালও আসিল, ভদ্রলোকটিও দেখা দিলেন।

পিসিমাও খুব আদর আপ্যায়িত করতে লাগলেন। খানিক পরে বল্লেন—"তুমি ত শীঘ্রই চলে যাবে, একটা বিশেষ কথা আছে।"

তিনিও তাড়াতাড়ি একেবারে বলে ফেল্লেন—"আমিও একটী কথা আপনাকে বল্বার জন্য এসেছি, চলে যাবার আগে বাণীকে আপনার কাছে চাই।" বোঝা গেল, সুশিক্ষিত হইলেও অমল বাবুর কথা বলবার চাতুর্য্য বড় কম।

পিসিমা আকাশ হতে পড়ে বল্লেন, "বাণী! সে কি ?"

তিনি বললেন, "হাঁ, বাণী! আপনার পালিতা কন্যা—বাণী!"

পিসিমা তৎক্ষণাৎ একটা পথ আবিষ্কার করে বল্লেন, "তুমি দেরী না করতে চাইলেই ত আর চলবে না। বাণী বড় হয়েছে, তাকে স্বাধীন ভাবে শিক্ষা দিয়েছি, তারও ত একটা মতের দরকার।"

তিনি বল্লেন, "হাঁ, তাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমরা উভয়েই বাগদত্ত।"

সবাই আকাশ থেকে পড়ল। পিসিমার এক মেয়ে বাণীকে ডাকতে এসে বল্লে—"অমল বাবু এসেছেন, যাও বাবা! ভেতরে ভেতরে এত, আর বাইরে একবারে সাধু সেজে রয়েছেন! বল্লে কি আমরা কেড়ে নিতুম ?"

বাণী লজ্জায় কেঁদে ফেল্লে। পিসিমা বল্লেন—"হয়েছে, আর সোহাগ দেখাতে হবে না।"

এমন সময় অমল উঠে এসে বল্লেন—"বাণী, বল দেখি আমরা উভয়ে বাগদত্ত কি না ?"

"এক সপ্তাহের মধ্যেই যাতে বিয়েটা হয়ে যায় দেখবেন পিসিমা।"

পিসিমা রোষভরে বল্লেন, "বিয়ের ঠিক নিজেরাই করেছ, বিয়েটাও তোমরাই কর। আমাদের দিয়ে কি দরকার ?"

এমন সময় পেছন হ'তে পিসেমশায় এসে বল্লেন, "বড় খুসী হলুম বাণী। তোমাদের কোন চিন্তা নাই। আমি সব ঠিক করে দেব।"

তার এক সপ্তাহ মধ্যেই নির্ব্বিঘ্নে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। বাণীকে সঙ্গে নিয়ে অমল পশ্চিমে চলে গেল। পিসিমা তখন ভ্রুকুটি করিয়া পিসেমশাইকে কহিলেন—"এমন পরোপকারী সাজলে এজন্মে আর মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না—বলে রাখলুম।"

বিচিত্র সংগ্রহ।

[শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যানিধি এম-এ]

তরল বায়ুর অদ্ভুত রহস্য—বায়ু অদৃশ্য পদার্থ হইলেও, তরল রূপ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইবে, ইহাই এক রহস্য ; ইহার যে আরও রহস্য থাকিবে, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। কয়েক বৎসর হইল, একপ্রকার যন্ত্রযোগে বায়ুকে বাষ্পীয় অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় পরিণত করা হইয়াছে। এই যন্ত্র জল জমাট হওয়ার শৈত্য অপেক্ষাও ১৯২° ডিগ্রি শৈত্য যোগের দ্বারাই ইহার মধ্যস্থিত বায়ুর তরলতা আস্থাদিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

তামাসার বিষয় এই যে, এই প্রকারের স্বল্পতম তাপেই তরল বায়ু প্রকৃত পক্ষে ফুটিতে থাকিবে। (১)

খনিতে বিষাক্ত বাষ্প জ্বলিয়া উঠিয়া শ্রমজীবীদিগের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিলে, তরল বায়ুর দ্বারাই রক্ষা পায়। এরূপ স্থলে প্রভূত পরিমাণে অম্লজান যোগাইবার প্রয়োজন হয়। পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়মে চুঙ্গির মধ্যে অম্লজান পূরিয়া, সেই চুঙ্গিই খনিতে নামাইয়া দেওয়া হইত, কিন্তু তাহাতে সময় লাগিত, অথচ তেমন সন্তোষজনক কাজ হইত না। তৎপরিবর্ত্তে তরল বায়ুর ব্যবহার দ্বারা অভীপ্সিত অম্লজানই যে কেবল অধিকতর পরিমাণে যোগান যাইতে পারে, তাহা নহে, পরন্তু উহা সহজে ও অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই যোগান যাইতে পারে। অথচ ইহার ব্যবহারের পর যে নিশ্বাসের পক্ষে অপকারী বাষ্প উৎপাদিত হয়, তাহা পূর্ব্বতন প্রথায় উৎপাদিত বাষ্প অপেক্ষা পরিমাণে অনেক কম।

ব্যোমযান যাত্রীর পক্ষেও ইহা উপযোগী। নির্দ্দিষ্ট উচ্চতায় বায়ু এরূপই পাতলা যে, তখন কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের প্রয়োজন হয়। তরল বায়ু এই সময়ে বাষ্পে পরিণত হইয়া একটী থলিতে প্রবিষ্ট হয় এবং তথা হইতে একটী নলের মধ্য দিয়া চালকের মুখের ভিতর যায়।*

সম্প্রতি এই আশ্চর্য্য তরল দ্রব্য আরও কাজে লাগান হইয়াছে। বিস্ফোড়করূপে ইহা ডিনামাইটেরই স্থলবর্ত্তী হইয়া সন্তোষজনক ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা তদপেক্ষা ভাল বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ ডিনামাইটের মত ইহা তেমন বিপজ্জনক নহে।

মিডল্‌সেক্স নামক স্থানে আট ফুট ঘেরের একটী গাছের গুঁড়ি, যাহা করাতের দ্বারা কাটিতে দুইজন লোকের এক সপ্তাহেরও অধিক সময় লাগিত, ইহা দ্বারা একবারেই উঠান হইয়াছিল।

তরল বায়ুর বিস্ফোরক, যে স্থানে ইহার প্রয়োগ করা হইবে, তথায়ই নির্ম্মিত হইতে পারে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের কর্ম্মীসকল তাহাদের পরীক্ষান্তে যে সকল মূল্যবান্ রেডিয়াম্ খণ্ড এবং পারদ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া থাকে, তৎসমস্ত ইহার সাহায্যে একত্র করে। ইহা এই সমস্ত খনিজ পদার্থকে চুম্বকেরই ন্যায় আকর্ষণ করিয়া থাকে। তরল বায়ুর দ্বারা কৌতুকজনক পরীক্ষা সকল নিষ্পাদিত হইতে পারে। এক টুক্‌রা রবার কয়েক মিনিটের জন্য ইহাতে ভিজাইয়া লইলে উহা সীসার ন্যায় শক্ত হইবে এবং উহা ভাঙ্গিতে হাতুড়ির কাজ লাগিবে। ইহা তরল বায়ুর শৈত্যদ্বারা ঘনীভূত হইয়া দৃঢ় হওয়াতেই এরূপ হয়।

এক টুক্‌রা লোহ অথবা অন্য ধাতু এইরূপে তরল বায়ুতে ভিজাইয়া আগুনের মধ্যে রাখিলে, তরল বায়ু প্রথমে ইহার উপর তুষাররূপে পরিণত হইবে, পরে ক্রমে উহা গরম হইতে থাকিলে বিলীন হইয়া যাইবে। (১)

---

(১) আর একটী তামাসার বিষয় এই যে, এই তরল-বায়ু বরফের উপর রাখিলে বরফস্থিত তাপেই উহা গলিয়া যায়।

(১) Indian Daily News, Septr. 1st, 1921. কোন ইংরেজী মাসিকে পড়িয়াছি তরল বায়ু শিশিতে করিয়া বিক্রয় হয়, তাহার এক

আড়ম্বরহীন বালিকার যুগ—বিগত মহা যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই বিলাসিনী চাকচিক্যময়ী যুবতীর যুগ গিয়া, সরলা বালিকার যুগ আসিয়াছে। যুদ্ধের পর পুরুষেরা রমণীদিগকে বাহ্যিকভাবে আর তেমন দেখেন না, তাঁহারা রমণীদিগের মধ্যে সুন্দর আকৃতি ও স্বর্ণবর্ণ কেশদাম অপেক্ষাও আরো কিছু দেখিতে চান। তাঁহারা চরিত্রই দেখিতে চান। চরিত্রের সহিত কোন প্রসাধনেরই তুলনা হয় না। (১) তবে কি পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে প্রাচ্য সীতা সাবিত্রীর যুগই ফিরিয়া আসিতেছে ?

ব্রিটিশ রাজকীয় নৌযানের বয়স—একণে ২৩০ বৎসর হইয়াছে এবং ইহা দশজন ব্রিটিশ অধিরাজকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। (২)

অশ্রুজনক বোমা—ফিলেডেল্‌ফিয়াতে লোক বিতাড়িত করিবার জন্য এক প্রকার বোমা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে অশ্রু উৎপাদিত হয়। এই বোমাতে পুলিস বেশ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে। (৩)

মৃত্তিকায় ক্ষুদ্র জীবের সংখ্যা—চা পানের এক চাম্‌চায় যে পরিমাণ উৎকৃষ্ট কৃষিযোগ্য মৃত্তিকা ধরিতে পারে, তাহাতে এত ক্ষুদ্র জীব আছে যে, আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌সের লোকসংখ্যা অপেক্ষাও ইহাদের সংখ্যা অধিক হইবে। (৪)

ব্যোমরথ কর্ত্তৃক অগ্নিনির্ব্বাপণ—অগ্নিনির্ব্বাণের জন্য আর জল ও পাম্পের দরকার হইবে না, সম্প্রতি এক প্রকারের বোমা এরোপ্লেন বা ব্যোমরথ হইতে অগ্নিকাণ্ডের স্থলে নিক্ষিপ্ত হইয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়ার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই বোমা ফাটিয়া গিয়া ইহা হইতে এক প্রকারের গ্যাস উৎপাদিত হইয়া, অগ্নিকে এরূপই আচ্ছন্ন করিবে যে, অগ্নি আর বাড়িতে অবসর পাইবে না; অথচ এই গ্যাস নিকটবর্ত্তী কোন প্রতিবেশীরই কিছুই অনিষ্ট করিবে না। (১)

অগ্নিনির্ব্বাণকারীদিগের দাহ-নিবারক মুখস্‌—আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌সের রাসায়নিকেরা অগ্নিনির্ব্বাণকারীদিগের জন্য এরূপ মুখস্‌ উদ্ভাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে যে, তাহাতে অগ্নির উত্তাপ, ধূম অথবা বিষাক্ত বাষ্প সমস্ত হইতেই তাহারা নিরাপদে রক্ষিত হইবে। (২)

খাদ্যের গুণ—ম্যাঞ্চেষ্টার নিরামিষাশীদিগের সভায় ডাক্তার বারটেণ্ড এলিনসন্‌ (Dr. Bertand Allinson) মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, খাদ্যের সহিত মনুষ্য জাতির বিকাশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাঁহার বিবেচনায় ফল, বাদাম, শস্যবিশিষ্ট খাদ্যই সুপ্রশস্ত খাদ্য। তৎপর শাকসব্‌জিবিশিষ্ট খাদ্য, এবং শেষ ডিম্ব, পনীর, মাখন, দুগ্ধ প্রভৃতি জান্তব খাদ্য। মাখন ও দুগ্ধকে স্বাভাবিক খাদ্য বলা যায় কি না, তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। (৩)

তাহা হইলে ঋষিজীবনের ফলমূলাহার প্রকৃত বৈজ্ঞানিক আহারের আদর্শই যে আমাদিগকে প্রদর্শন করিতেছে, তাহাই আমরা বুঝিতে পারি।

আহারের বার—আহারের বার সম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত ডাক্তার মহাশয় বলিয়াছেন যে, ২৫ বৎসর হইতে ৫৫ বৎসরের মধ্যে দিনে দুইবার আহার করা উচিত, এবং ৫৫ বৎসরের পর দিনে একবার মাত্র আহার করা উচিত, এবং তাহাও অপরাহ্ণ প্রায় ৩ ঘটিকার সময় করাই সঙ্গত। (৪)

বা দুই শিশি গরম কোঠার মধ্যে ছাড়িয়া দিলে গরম দূর করিয়া দিয়া একেবারে ঠাণ্ডা করিয়া দেয়।

(১) Indian Daily News, Nov. 16th, 1921.
(২) Ibid. Septr. 3rd. 1921.
(৩) Ibid.
(৪) Ibid.

(১) Indian Daily News 14th Nov. 1921.
(২) Ibid. 16th Nov. 1921.
(৩) Ibid. 11th Nov. 1921.
(৪) Ibid.

১৯শ ভাগ] { অগ্রহায়ণ, ১৩২৯। } [১০ম সংখ্যা

লালা রুখ।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

টমাস্ মুরের গদ্যে-পদ্যে রচিত "লালা রুখ" নামক কাব্য কবির জীবদ্দশায় এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে ইহা কয়েক বৎসরের মধ্যে একাধিক য়ুরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। এই পাঠ্য-কাব্য জারমান ভাষায় গীতি নাট্যে পরিণত হইয়া রঙ্গমঞ্চে সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইত। এই সুদীর্ঘ রচনায় কবির কল্পনা প্রতি মুহূর্ত্তে পাঠকের মানস-চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত প্রাচ্য-জগতের নূতন নূতন ছবি ধরিয়া দিতেছে। কাব্যের মূল ঘটনা মোগল ভারতে আরম্ভ হইয়াছে। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের একাদশ বর্ষে জিঙ্গিষের বংশধর বুকারিয়ার রাজা আবদালা পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া দিয়া তীর্থ-যাত্রা করিলেন। মক্কার পথে তিনি কাশ্মীর দর্শন করিয়া দিল্লীতে অল্পদিনের জন্য যখন অবস্থান করেন সেই সময়ে তাঁহার উক্ত পুত্রের সহিত ঔরঙ্গজেবের, কনিষ্ঠা কন্যা লালা রুখের বিবাহের প্রস্তাব হয়। উভয় পক্ষে স্থির করিলেন যে, রাজকার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া বুকারিয়ার নূতন রাজা কয়েক মাস পরে কাশ্মীরে আগমন করিলে তথায় উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইবে। যেদিন লালা রুখ দিল্লী হইতে কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, সেদিন রাজধানী উৎসবের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়াছিল। ঔরঙ্গজেব প্রাসাদের বারাণ্ডা হইতে শোভাযাত্রা দর্শন করিয়াছিলেন। এই জাঁকজমকময় শোভাযাত্রার যে চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা মোগল জগতেও বিরল। রাজান্তঃপুরের প্রধান নাজির ফদলদীন শিবিকারোহণে রাজকুমারীকে অনুসরণ করিতেছেন। রাজকুমারীর শিবিকাকে ঘিরিয়া অশ্বারোহণে সখীগণ চলিয়াছেন। বুকারিয়ার রাজা এই সুন্দরী কাশ্মীরি যুবতীগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রথম কয়েক দিন লালা রুখ বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। সেই কারণে তিনি সন্ধ্যার সময় শিবিরে আমোদ আহ্লাদের মধ্যে বিশ্রাম লাভ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। বাহ্য-জগতের নূতনত্ব যখন তাঁহার হৃদয় হইতে উবিয়া গেল তখন তিনি সান্ধ্য-ভ্রমণ, সখীগণ ও প্রধান নাজির ফদলদীনের সহিত বাক্যালাপ করিয়াও মনে করিতেন যেন একটা কিছুর অভাব অনুভব করিতেছেন। রাজকুমারীর শিবিরে একজন ক্রীতদাস ছিল। সে সময়ে সময়ে বীণার সুরের সাহায্যে প্রেমের গান গাহিয়া তাঁহাকে নিদ্রাতুর করিত। ক্রমে দিন যতই গত হইতে লাগিল

গায়কের গীত ও নর্ত্তকীদের নৃত্য রাজকুমারীর প্রফুল্লতা রক্ষা করিবার পক্ষে ততই অনুপযোগী হইতে লাগিল। রাত্রি ও দিবসের মধ্যভাগ যেন আর কোনও রকমে কাটিতেছে না। শেষে একদিন রাজকুমারীর ভাবী বরের প্রেরিত কাশ্মীরবাসী একজন কিশোর কবির কথা সকলের মনে পড়িল। এই নবীন কবি প্রাচ্যের কবিতা সুন্দর ভাবে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। সেই কারণে তাঁহার প্রভু তাঁহাকে রাজকুমারীর সমক্ষে আগমন করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। লালা রুখ ইতিপূর্ব্বে পর্দ্দার অন্তরাল হইতে তাঁহার পিতার রাজসভায় একটিবার মাত্র কবি বলিয়া জিনিষটিকে দেখিয়াছিলেন আর যাহা দেখিয়াছিলেন তাঁহাতে কবিদের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় নাই। স্ত্রীগণের হৃদয়ের দেবতা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সুন্দর সুঠাম সুকুমার কবি ফিরামরস্ যখন আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া লালা রুখ ও তাঁহার সখীগণ কবিদের সম্বন্ধে তাঁহাদের পূর্ব্ব মত পরিবর্ত্তন করিলেন। সেই কাশ্মীরি যুবক বীণার সাহায্যে রাজকুমারীকে "অবগুণ্ঠনাবৃত খোরাসানের পয়গম্বরের" (The veiled prophet of Khorasan) পদ্যময় ইতিহাস শুনাইতে আরম্ভ করিলেন।

"পয়গম্বর-প্রধান মোকানা মেরু পর্ব্বতের উপর সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার মুখ অবগুণ্ঠন আবৃত, তাঁহার দুই পার্শ্বে সশস্ত্র ধর্ম্মবিশ্বাসীরা দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অদূরে অবরোধের মধ্যে সুন্দরী রমণীগণ উপবেশন করিয়া আছেন। আজিম গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধে ধৃত ও কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। যুদ্ধ শেষে সন্ধির পর তিনি আজ ফিরিয়া আসিয়াছেন। মোকানা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন আর সেই সঙ্গে সমাগত সকলকে বলিলেন যে, যতদিন না সমগ্র জগৎ তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করে ততদিন তাঁহার কার্য্য শেষ হইবে না। তিনিই এক্ষণে পৃথিবীতে আল্লার প্রেরিত পয়গম্বর। ধর্ম্মবিশ্বাসী আজিম মোকানার কথায় মুগ্ধ হইলেন। সকলে যখন মোকানাকে পয়গম্বর বিশ্বাসে তাঁহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিল, অবরোধের ভিতরে তখন একটিমাত্র সুন্দরী যুবতী আজিমের অবস্থা মনে ভাবিয়া চিন্তান্বিত হইলেন। সেই কারামুক্ত আজিম যে জেলিকার স্বামী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। জেলিকা বহুদিন তাঁহার কোনও সংবাদ পান নাই। শেষে তিনি শুনিলেন যে, আজিম যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছেন। তাহার পর মোকানার ধর্ম্মপ্রচারক মণ্ডলী এই স্বামী বিরহে কাতরা সুন্দরী যুবতীকে পয়গম্বরের অবরোধের মধ্যে আনিয়াছিল। সেখানে আসিবার পর জেলিকা রূপে ও গুণে মোকানার সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী হইয়াছিলেন। কঠিন শপথে আবদ্ধ হইয়া জেলিকা অবরোধের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। মোকানা তাঁহাকে যে স্বর্গে লইয়া যাইবেন, স্বর্গে গিয়া তিনি ত তাঁহার আজিমকে পাইবেন? কিছু দিন পরে জেলিকা বুঝিয়াছিলেন যে, মোকানা একজন ভণ্ড। অপরিণত-বুদ্ধি যুবকদিগকে ভুলাইয়া তিনি নিজের দল পরিপুষ্ট করেন, আর সহায়হীনা সুন্দরীদের তিনি ধর্ম্ম নষ্ট করেন। আজিমকে দেখিবার পর জেলিকার হৃদয়ে মোকানার প্রতি ঘৃণা জন্মিল। সন্ধ্যার পর মোকানা যখন তাঁহাকে শয্যাপার্শ্বে ডাকাইলেন, তখন তিনি তাঁহার পাশব-লীলায় যোগদান করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। মোকানা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার হৃদয় হইতে ধর্ম্মের আবরণ সরাইয়া ফেলিলেন। তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে, তিনি জেলিকাকে উপভোগ করিবেন। তাহার পর মোকানা অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলে জেলিকা তাঁহার বীভৎস আকৃতি দেখিয়া চীৎকার করিয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন।"

সেই রাত্রের মত গল্প শেষ হইল। গল্পের দ্বিতীয় রাত্রে রাজকুমারী লালা রুখ যেখানে পৌঁছিলেন সেখানকার অধিবাসীরা তাঁহার সংবর্দ্ধনার জন্য তাহাদের গৃহ ও রাস্তাগুলি আলোকমালায় বিভূষিত করিয়াছিল। লালা রুখের মন কিন্তু সেদিকে আকৃষ্ট হইল না। তিনি পূর্ব্ব রাত্রের গল্পে জেলিকা ও তাঁহার প্রণয়ীর কথা ভাবিতেছিলেন আর সেই সঙ্গে বোধ হয় যিনি গল্প বলিয়াছিলেন তাঁহার কথাও মনের মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন। সেই জন্য শিবিরে প্রবেশ করিবার পর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া তিনি ফিরা-

মরসকে ডাকাইয়া আনিলেন। কবি পত্রময় সেই গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। "আজিম সাবধান হও! গ্রীক রাহিনী হইতেও রমণীর কটাক্ষ অধিকতর শক্তিশালী! আজিম সেই আলোকিত প্রমোদ-প্রাসাদে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চারিদিকেই নয়নারাম দৃশ্য। কোথা হইতে সুমধুর বামাকণ্ঠোত্থিত সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে! গালিচা, আসবাব, আলেখ্য, আলোকাধার সবই বহুমূল্য ব্যয়ে সংগৃহীত। আজিম মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এত বিলাসিতার ভিতর দিয়া কি কেহ মুক্তির পথে আসিতে পারে? আবার সেই সঙ্গীত শুনা যাইতেছে। ঐ যে, একটি সুন্দরী বীণার সুরের সহিত নিজের কণ্ঠস্বর মিশাইয়া কি গাহিতেছে না? সেই সুন্দরী আজিমের নিকট আসিয়া বসিল। তার পরে সে গান গাহিতে আরম্ভ করিল। এমন গান কেহ কখন শুনে নাই। আজিমের মনে জেলিকার স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। না না, এই সকল ডাকিনীদের মায়ায় ভুলিব না। আবার এ কি! কোথা হইতে দুই জন নর্ত্তকী আসিয়া আজিমের সম্মুখে হাব ভাবের সহিত নৃত্য আরম্ভ করিল। আজিম মনের মধ্যে দৃঢ়তা আনিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িলেন। দেয়ালে কত সুন্দর চিত্র সাজান রহিয়াছে। আজিম নিবিষ্টচিত্তে সেগুলি যখন দেখিতেছেন তখন কিছু দূরে একটি অবগুণ্ঠনবতী সুন্দরী আসিয়া দাঁড়াইলেন। আজিমের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। ঐ না আমার সেই জেলিকা? প্রণয়ীযুগল পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন। জেলিকার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! জেলিকা আজিমকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। আজিম তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। তাহার পর সেখান হইতে দুই জনে পলায়ন করিবেন স্থির করিলেন। এমন সময় কোথা হইতে শব্দ আসিল,—"তোমার শপথ!" "তোমার শপথ!" আর ঠিক সেই সময়ে মোকানা সেইখানে দেখা দিলেন। জেলিকা বলিলেন, "না, আমার যাওয়া হইবে না, আমি যে প্রেতগণের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, রক্তপূর্ণ পাত্র হইতে পান করিতে করিতে শপথ করিয়াছি আমি মোকানার বধূ। আজিম! আমি সেই শপথ ভুলিব না।" এই কথা বলিয়া জেলিকা আজিমের আলিঙ্গন হইতে নিজেকে ছিঁড়িয়া লইয়া সেই আলোক রাশির ভিতর দিয়া কোথায় পলায়ন করিলেন।"

পর দিবস লালা রুখ আজিম ও জেলিকার দুঃখপূর্ণ জীবনের ইতিহাস স্মরণ করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে শিবিকা-রোহণে গন্তব্য পথ অতিক্রম করিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইল যেন সেই কিশোর কবি ফিরামরস্ আজিমের মত একজন হতভাগ্য প্রণয়ী। তাঁহার ভোগ করিবার অধিকার আছে, কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ পারিতেছেন না। সূর্য্যাস্তের পর যখন তাঁহারা একটি নির্জ্জন স্থান দিয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহারা একটি হিন্দু যুবতীর কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা শিবিকা থামাইয়া যুবতীর কার্য্যটি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সেই যুবতী নারিকেল তৈলে পূর্ণ একটি ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া, পুষ্পমালায় বিভূষিত একখানি মৃৎপাত্রে তাহা স্থাপন পূর্ব্বক, কম্পিত হস্তে স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া তাহার গতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। রাজকুমারীর সমভিব্যাহারী অশ্বা-রোহীদের প্রতি তিনি দৃক্পাত করিলেন না। তাহা দেখিয়া লালা রুখের কৌতূহলের সীমা রহিল না। তাঁহার একজন পরিচারিকা বলিল, সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে এইরূপে স্রোতে প্রদীপ ভাসাইয়া অনেকে প্রবাসী বন্ধুর নিরাপদে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন অনুমান করিয়া থাকে। যদি আলোকটি অচিরে জলে ডুবিয়া যায় তাহা হইলে বিপদের সম্ভাবনা, আর যদি জ্বলিতে জ্বলিতে দৃষ্টির বাহিরে ভাসিয়া যায় তাহা হইলে প্রণয়-পাত্র নিশ্চয়ই নিরাপদে গৃহে ফিরিবে। ইহার পর সকলে আবার গন্তব্য পথে চলিতে লাগিলেন। লালা রুখ সেই প্রদীপের আলোকের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, মানব-জীবনের আশা ভরসা নদীবক্ষে ঐ ক্ষীণ আলোক হইতে উৎকৃষ্টতর কিছু নয়। তাঁহার হৃদয়াকাশে কেমন যেন একটু বিষাদের মেঘ দেখা দিল। রাজকুমারীর মুখে কথা নাই, তিনি কি যেন ভাবিতেছেন। ফিরামরস্ যখন তাঁহার শিবিরের দ্বারে সন্ধ্যার পর আসিয়া বীণায় ঝঙ্কার দিলেন, তখন তিনি যেন স্বপ্ন-ভঙ্গে জাগিয়া উঠিলেন। আবার সেই পত্রময় গল্পটি আরম্ভ হইল।

"এ কি! শস্যক্ষেত্র যেখানে শস্যক্ষেত্র ছিল আর

প্রাতে সেখানে দিগন্তব্যাপী শত্রু শিবির কোথা হইতে আসিল। খালিফা বহুদিন হইতে মোকানার ভণ্ডামীর কথা শুনিতেছিলেন। তিনি সমগ্র মুসলমান জগত হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এই ভণ্ড পয়গম্বরের বিরুদ্ধে আজ যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। একদিকে খালিফার অসংখ্য সৈন্য, অপর দিকে মোকানার অসংখ্য না হউক, অন্ধ বিশ্বাসী বহুতর যোদ্ধা যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়াছে। দুই দিন ধরিয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিল। মোকানার সৈন্যগণ তাহাদিগের নেতা কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া এইবার খালিফার সৈন্যগণকে যে আক্রমণ করিল তাহারা তাহার বেগ সহ্য করিতে পারিল না। বিজয়-লক্ষ্মীর পুরস্কার যখন মোকানার হস্তগত-প্রায়, সেই মুহূর্ত্তে দেবদূতের ন্যায় কে একজন খালিফার পলায়নপর সৈন্যগণকে একত্র করিয়া শত্রুর উপর সিংহ-বিক্রমে আসিয়া পড়িল। মোকানার সৈন্যগণ হটিয়া গেল। মোকানা পলায়ন করিলেন বটে, কিন্তু অবশিষ্ট সৈন্যগণকে লইয়া তিনি এক্ষণে দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লইলেন। মোকানা জেলিকাকে ভুলেন নাই। তিনি প্রতারিত অপর সকল সুন্দরীকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল জেলিকাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। খালিফা যখন সেই বীর কেশরীকে সম্মানিত করিবার জন্য দরবারে বসিলেন তখন সকলেই দেখিল যে, অজ্ঞাতনামা সেই যুবকের মুখে বিষাদের ছায়া জমিয়া রহিয়াছে। আজিম সেই যুদ্ধে খালিফার রাজ্য রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু তিনি মোকানার প্রাণ লইতে পারিলেন না বলিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। খালিফার সৈন্যগণ কর্ত্তৃক মোকানার সেই দুর্গ অবরুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে মোকানা একবার অকস্মাৎ রাত্রে খালিফার সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিফল-মনোরথ হইয়া দুর্গাভ্যন্তরে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধের ফল যাহা হয়, মোকানার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। খাদ্যাভাবে অবরুদ্ধ সৈন্যগণ মরিতে লাগিল। তাহার উপর আনুসঙ্গিক নানা প্রকার ব্যাধিতেও, মোকানার সৈন্য সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইল। শেষে যখন তিনি দেখিলেন, যে, মুষ্টিমেয় মাত্র সৈন্য জীবিত আছে তখন একদিন তিনি তাহাদিগকে মৃত্যুর ভোজে আহ্বান করিয়া জীবনান্তকারী পানীয় সেবন করাইলেন। মোকানা জেলিকাকে সেই ভোজে আহ্বান করিয়াছিলেন। জেলিকা যখন আসিলেন, মোকানা তাঁহাকেও সেই পানীয় সেবন করাইতে চাহিলেন কিন্তু সৈন্যগণ ইতিপূর্ব্বে তাহা নিঃশেষিত করিয়াছিল। ক্ষুদ্র একটি বিন্দুমাত্র যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাই জেলিকাকে অর্পণ করিয়া মোকানা বলিলেন যে, যদি অতঃপর জেলিকা তাঁহার আজিমকে চুম্বন করেন তাহা হইলে মোকানা চরিতার্থ হইবেন। ইহার পর মোকানা বলিলেন যে, এইবার তাঁহার নিজের মরিবার পালা, কিন্তু তিনি এমন ভাবে মরিবেন যে, তাঁহার দেহের উপাদান পঞ্চভূতের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না। তিনি পূর্ব্ব হইতে একটি প্রকাণ্ড আধারে এক প্রকার তরল বস্তু রাখিয়া দিয়াছিলেন। সেই দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন যে, এইক্ষণে তিনি উহাতে অবগাহন করিবেন। তাহার পরে তাঁহার মৃতদেহের অণুমাত্র যখন কেহ খুঁজিয়া পাইবে না, তখন সকলে মনে করিবে যে, ভগবান তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন। এই বলিয়া মোকানা সেই আধারে সংগৃহীত তরল বিষের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। খালিফার সৈন্যগণ দুর্গ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। আজিম তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছিলেন। যখন দুর্গ প্রাচীরের খানিকটা ভাঙ্গিয়া পড়িল, খালিফার সৈন্যগণ ছিদ্রের ভিতর দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিল। তাহারা সেই প্রেত-পুরীতে জীবন্ত কোনও মানুষকে দেখিতে পাইল না। আজিম অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার সেই পরিচিত ব্যক্তি অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া আসিতেছেন। আজিম অনুনয় পূর্ব্বক খালিফাকে বলিলেন যে, তিনি নিজে তাঁহার সেই শত্রুকে প্রাণে বধ করিবার জন্য অনুমতি চাহিতেছেন। সেই অবগুণ্ঠনে আবৃত শত্রু দ্রুতপদে আজিমের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার বর্শার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, আর সেই সঙ্গে তাঁহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন। এ কি! এ যে জেলিকা! আজিমের ক্ষোভের সীমা রহিল না। জেলিকা মোকানার

মুখাবরণে নিজের মুখ ঢাকিয়াছিলেন। তিনি এইরূপে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। আজিম তাঁহার বর্শাবিদ্ধ দেহকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। জেলিকা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন আর বলিলেন যে, যতদিন আজিম বাঁচিয়া থাকিবেন, ততদিন যদি তিনি জেলিকার কবরের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে ভগবান তাঁহার প্রার্থনা শুনিবেন। আজিম জেলিকার এই অনুরোধ বর্ণে বর্ণে রক্ষা করিয়াছিলেন।"

গল্প শেষ হইলে ফদলদীন সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মতে গল্পে বর্ণিত কোনও চরিত্রের চিত্র ভাল করিয়া অঙ্কিত হয় নাই, ঘটনাবলীর সমাবেশও উত্তম নহে, কাব্যের ভাষা উৎকৃষ্ট নয়, ছন্দ সুবিধাজনক হয় নাই, ইত্যাদি। সমালোচক শ্রোতাদিগের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিদ্রা যাইতেছেন আর বাতির আলো নির্ব্বাণপ্রায়। সেই কারণে, এই বলিয়া তাঁহার সমালোচনা শেষ করিলেন যে, সেই কিশোর কবি যদি কাব্য-শিল্পে উন্নতি লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি সুখী হইবেন। ইহার পর কয়েক দিন গত হইল। ফদলদীনের সমালোচনার পর কেহ ফিরামরস্‌কে নূতন গল্প শুনাইবার জন্য অনুরোধ করিতে সাহসী হইলেন না। বলা বাহুল্য, ফদলদীন ইহাতে বুঝিলেন যে, তিনি সেই কবিকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছেন, আর সেই জন্য তিনি মনে মনে আনন্দিত হইয়াছিলেন। লালা রুখ কিন্তু কবির মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছিলেন, সেই সকল কথার বারংবার উল্লেখ করিতেন আর তাহাতে কেন যে তিনি সুখী হইতেন, তাহা বোধ হয় প্রেমের দেবতা ছাড়া অপর কেহ জানিতেন না। একদিন তাঁহারা পথিমধ্যে একস্থানে একটি ঝরণার নিকট দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। সেই ঝরণার গাত্রে কবি সাদির এই উক্তি খোদিত ছিল—"আমার মত অনেকেই এই ঝরণা দেখিয়াছে কিন্তু তাহারা সকলেই ইহজগত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের চক্ষু চিরকালের তরে মুদিত হইয়াছে।" লালা রুখ বলিলেন যে, বহু যুগ পরে হয়ত একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহার উক্তি পর্ব্বতের গাত্রে এই ভাবে চিরকাল খোদিত থাকে। কিন্তু এমন কোনও ব্যক্তি আছেন যিনি আকাশের চিরস্থির নক্ষত্রের মত না হইতে পারেন, তবে তিনি আমাদের গন্তব্য পথে ঝরা ফুলের ন্যায় ক্ষণকাল সৌরভ ছড়াইয়া থাকেন, আর তজ্জন্য আমাদের উচিত তাঁহার প্রতি আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। বাস্তবিক, অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, সমালোচকগণ কবির পৃষ্ঠে গল্পে কথিত সমুদ্রের মানুষের মত সর্ব্বদা চাপিয়া থাকেন। ফদলদীন বুঝিলেন যে, লালা রুখ এই কথাগুলি তাঁহার উদ্দেশে বলিয়াছেন। তিনি লালা রুখের এই কথাগুলি ভবিষ্যতে সমালোচনার জন্য মনের মধ্যে ভাল করিয়া তুলিয়া রাখিলেন। এই ঘটনার দুই একদিন পরে তাঁহারা উদ্যানময় উপত্যকায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সম্রাট তাঁহার ভগ্নি রোশেনারার জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরের পথে এই উদ্যান স্থাপন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় যখন সকলে এই সুখের কুঞ্জভবনে বসিয়া আছেন, সেই সময়ে লালা রুখ বলিলেন যে, তাঁহার মনে হইতেছে যেন এই স্থানটি ফুলরাণীর কিম্বা স্বর্গচ্যুত কোনও পরীর আবাস-ভূমি। ফিরামরস্‌ বলিলেন যে, একটি পরীর গল্প তাঁহার মনে পড়িতেছে। তিনি ফদলদীনের দিকে সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়া একবার চাহিলেন আর বলিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত কবিতার ন্যায় এই নূতন কবিতাটি খুব উচ্চ সুরে বাঁধা নয়। এই কয়টি কথা বলিয়া তিনি বীণায় কয়েকবার বিষাদপূর্ণ ঝঙ্কার দিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন।

স্বর্গচ্যুত এক পরী একদিন ইডেন উদ্যানের বহির্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া নিজের অদৃষ্টের নিন্দা করিয়া বলিতেছিল যে, যদিও মর্ত্ত্যের পুষ্পোদ্যান সকল আমার অধিকারে আছে, কিন্তু হায়! অভিশাপগ্রস্ত পরী জাতির স্বর্গোদ্যানের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার অধিকার নাই। সেই ইডেন উদ্যানের দ্বাররক্ষী দেবদূত এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "যে পরী অমরপুরীর দ্বারে ঈশ্বরের প্রিয় অর্ঘ্য আনিবে সে ক্ষমা লাভ করিবে। যাও, সেই বস্তুটি খুঁজিয়া আন, তাহা হইলে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।" এই কথা শুনিয়া সেই পরী দ্রুতবেগে পৃথিবীতে আসিল। কিন্তু

কোথায় সে ঈশ্বরের প্রিয় বস্তুটি পাইবে? "ধনরাশি, সুগন্ধ দ্রব্যাদি ঈশ্বরের প্রিয় বস্তু নহে।" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সেই পরী ভারতবর্ষে আসিল। এইখানে কবি ভারতবর্ষের যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা কবির নিজের ভাষায় বর্ণিত হইল :—

"While thus she mus'd, her pinions fann'd
The air of that sweet Indian land,
Whose air is balm ; whose ocean spreads
O'er coral rocks, and amber beds ;
Whose mountains, pregnant by the beam
Of the warm sun, with diamonds teem ;
Whose rivulets are like brides,
Lovely, with gold beneath their tides ;
Whose sandal groves and bow'rs of spice
Might be a Peri's Paradise !
But crimson now her rivers ran
With human blood—the smell of death
Came reeking from those spicy bow'rs,
And man, the sacrifice of man,
Mingled his taint with ev'ry breath
Upwafted from the' innocent flow'rs.
Land of the Sun ! what foot invades
Thy Pagods and thy pillar'd shades—
Thy cavern shrines, and Idol stones,
Thy Monarchs and their thousand Thrones ?
'Tis he of Gazna—fierce in wrath
He comes, and India's diadems
Lie scatter'd in his ruinous path—
His bloodhounds he adorns with gems,
Torn from the violated necks
Of many a young and lov'd Sultana ;
Maidens, within their pure zenana,
Priests in the very fane he slaughters,
And choaks up with the glitt'ring wrecks
Of golden shrines the sacred waters !"

"গজনীর মামুদের এই সকল নৃশংস কার্য্য দেখিতে দেখিতে সেই পরীর দৃষ্টি একজন মুমূর্ষু স্বদেশ-হিতৈষীর দিকে আকৃষ্ট হইল। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে তিনি ধমনীর শেষ রক্তবিন্দু অর্পণ করিলে, পরী সেইটি লইয়া স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইল। দ্বারী বলিলেন, "যে সকল সাহসী ব্যক্তি দেশের জন্য এইরূপে প্রাণ বিসর্জ্জন করে তাহাদের দেহের পবিত্র রক্ত হইতেও পবিত্রতর দান লইয়া না আসিলে স্বর্গের এই দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত হইবে না।" এই কথা শুনিয়া সেই পরী আবার পৃথিবীতে আসিল। মহামারীর উৎপাতে শ্মশান-প্রায় মিশর দেশ হইতে সেই পরী পতিব্রতা নারীর আত্মবলির শেষ নিশ্বাসটি লইয়া স্বর্গের দিকে চলিল। দ্বারী এবারেও বলিলেন, "ইহা হইতেও পবিত্রতর দান চাই।" বিষাদিত মনে পরী আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিল। সিরিয়া দেশে প্যালেষ্টাইনের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে সেই পরী ক্রীড়াক্লান্ত একটি বালককে প্রকৃতির পুষ্পময় শয্যায় শয়ন করিতে দেখিল। ক্ষণকাল পরে যোদ্ধৃবেশধারী পাষাণ-হৃদয় এক হত্যাকারী আসিল। ইহার কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনার সময় বিঘোষিত হইলে সেই বালকটি পুষ্পশয্যা হইতে উঠিয়া তৃণাচ্ছাদিত সেই বনস্থলীর এক স্থানে জানু পাতিয়া বসিল ও ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে ভগবানের নাম লইয়া প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল। অদূরে যে পাপাত্মা দণ্ডায়মান ছিল সে বালকটির কার্য্য দেখিয়া নিজের জীবনে পাপের কথা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহার পার্শ্বে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সেই পরীর অন্তর কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল আর সেই সঙ্গে স্বর্গের জ্যোতিঃ তাহার চক্ষে প্রতিভাত হইল। পরী বুঝিল যে, সে এইবার স্বর্গদ্বারের ভিতরে প্রবেশ লাভ করিল।"

ফজলদীন বলিলেন, "ইহার নাম কবিতা? এই প্রকার শিথিল ছন্দে কবিতা রচনার পক্ষপাতী হইলে দেশ শত সহস্র কবির উৎপাতে উৎসন্ন যাইবে। পরী যে এক ফোঁটা রক্ত, একটি নিশ্বাস ও একবিন্দু অশ্রু লইয়া গেল, তাহার মধ্যে রক্ত বিন্দুটি সে যে কি প্রকারে লইয়া গেল, আর কিরূপেই বা দেবদূতের হস্তে অর্পণ করিল তাহা ত আমি বুঝিলাম না। নিশ্বাসটি ও অশ্রু ফোঁটাটি যে কি উপায়ে পরী লইয়া গেল তাহা সেই পরী ও এই কবিই জানে, আমার কল্পনাতীত।" লালা রুখ কোন মতেই সেই হৃদয়হীন সমালোচককে বুঝাইতে পারিলেন না যে কবিদের প্রকৃতি কিরূপ ও কবি-কল্পনা বলিয়া জিনিষটি কি। অনেক যুক্তি দেখাইয়াও রাজকুমারী তাঁহার কবির প্রতি ফজলদীনের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতে পারিলেন না। যে রাত্রে

হউক, তাঁহারা যখন লাহোরে আসিয়া পৌছিলেন, তখন লালা রুখের নিকট সংবাদ আসিল যে, বুকারিয়ার রাজা তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য কাশ্মীরের উপত্যকায় আসিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া তিনি যেন চমকাইয়া উঠিলেন। লালা রুখ এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিলেন যে, তাঁহার হৃদয় ও মন কবি ফিরামরস্ অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। আর ত তিনি, ফিরামরসের সঙ্গীত ও কবিতা শুনিতে পাইবেন না। চ'খে চ'খে দেখাও এইবার শেষ হইল। লালা রুখ শেষে স্থির করিলেন যে, তিনি এখন হইতে ফিরামরসকে চক্ষের বাহির করিয়া দিবেন। তিনি মনে মনে বলিলেন যে, এতটা দূর অগ্রসর হইতে দেওয়াই তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। স্বপ্নের মত যাহা ঘটিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাওয়াই উচিত।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

তসবীর।

[শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম-এ, বি-এল]

পাশের বাড়ীর হারমোনিয়মের শব্দে কিশোর তাহার সেক্‌সপীয়রের সমালোচনামূলক পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ সে কবির কল্পনা কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। একবার মনে হইতেছিল সেই যেন ব্যাসেনিওর পরিবর্ত্তে পোর্শিয়াকে প্রেম সম্ভাষণ করিতে যাইতেছে। উৎকট পরীক্ষা-সাগর পার হইয়া প্রেমের নন্দন কাননে বিচরণ করিবার আর যেন বিলম্ব নাই। এমন সময় দুষ্ট সমালোচক আসিয়া তাহার কানে কানে কহিল—ব্যাসেনিও হইতে যাইও না, খাঁটি প্রেমের সিংহ-দুয়ার তোমার সম্মুখে তাহা হইলে চিরদিন বন্ধই রহিবে। মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন পট পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কিশোরের মনে হইল সে যেন লরেঞ্জো হইয়া জেসিকাকে লইয়া চকাচকীর মত দিক্‌দিগন্তে উড়িয়া বেড়াইতেছে। জেসিকা যেন রূপ কথার দৈত্যপুরীর রাজকন্যা, আর সে যেন সেই রাজপুত্র যে নাকি তাহাকে উদ্ধার করিয়া পলাইয়াছিল।

এমন সময় তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল ঐ পাশের বাড়ীর হারমোনিয়মের সুরটার জন্য। বোধ হইল সুরের সঙ্গে কিসের যেন একটা মৃদু রিণি ঝিণি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। বোধ হয় মৃদু মধুর কণ্ঠস্বরও এ যন্ত্র সঙ্গীতের সহিত মিশিতে চেষ্টা করিতেছিল।

কিশোরের মনে হইল এ গান যেন সে অনেক দিন শুনিয়াছে। গান ও গায়িকা যেন তাহার চির পরিচিত। আলকাইরিস নগরের বিখ্যাত কবি শাহ্‌লুমা যে গানে মোহিত হইয়া কাব্য-জগৎ পরিত্যাগ করিয়া অন্ধ আবেগে বাহু যুগল প্রসারিত করিয়া ছুটিয়াছিল, এ যেন সেই গান। ঋষ্যশৃঙ্গ প্রথম যৌবনে যে গান শুনিয়া নয়ন উন্মীলন করিয়া মুগ্ধালস নেত্রে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি দেখিয়া স্তব জুড়িয়া দিয়াছিলেন—এ যেন সেই সঙ্গীত। ভিক্ষু যে দিন ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘের আচার ভুলিয়া ভিক্ষুণীর স্বর লহরীতে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়াছিল—এ যেন সেই গান।

পাশের বাড়ীর সুর লহরী যে থামিয়া গেল সে দিকে কিশোরের খেয়ালই গেল না। তাহার মনে হইতেছিল কত যুগ যুগান্তের কথা—তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল কত দেশ বিদেশের দৃশ্য। তুষারাবৃত সাইবেরিয়ার রামধনু আঁকা প্রান্তরের সঙ্গে উত্তুঙ্গ গিরিমালার দৃশ্য যেন এক সঙ্গে গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। পঞ্চনদের জল কল্লোলের সঙ্গে মিশরের ধূ ধূ করা মরুভূমি যেন একই সুরে বাঁধা রহিয়াছে। ব্যাল্টিকের নীল সাগরের কিনারা হইতে মঙ্গোলিয়ার গিরিপ্রান্তর আর সিংহলের সমুদ্র গর্জ্জন যেন একই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া যাইতেছে। কিশোরের মনে হইল কে এই নারী যে তাহাকে এই দেশ বিদেশে যুগে যুগে

আকর্ষণ করিয়া বেড়াইতেছে? কত সুখ স্বপ্ন, কত বিচ্ছেদ মিলন, কত আহ্লাদ অবহেলার ভিতর দিয়া সে যেন চলিয়া আসিয়াছে।

একটু চুড়ীর ঝঙ্কারে কিশোরের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল তাহার দিকেই চাহিয়া ঐ পাশের বাড়ীর মেয়েটি মৃদু হাস্য করিতেছে। কিশোরের মনে হইল—মুখ খানিও যেন তাহার বিশেষ পরিচিত। অনেক কালের আলাপ পরিচয় যেন তাহার চোখে মাখা রহিয়াছে। তাই সে হাত উঠাইয়া পরিচিতের মত নমস্কার করিল। কিশোরী মৃদু হাস্য করিয়া, একটু গ্রীবা হেলাইয়া, অসংবৃত অলকগুচ্ছ কপোল হইতে সরাইয়া দিয়া মরাল গমনে চলিয়া গেল। কিশোর ভাবিল, কবি দান্তেকে দেখিয়া বিয়াট্রিস বোধ হয় এমনি করিয়াই ঝঙ্কার দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ওমর খায়ামের সাকিও বোধ হয় তাহার নয়ন সম্মুখে এমন ভাবেই সর্ব্ব প্রথমে দেখা দিয়াছিল। বিদ্যাপতির লছমিয়াও এইরূপে তাহার নয়ন মনে নূতন স্বপ্ন আঁকিয়া দিয়াছিল। সে যদি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর হইত তবে—

কিশোর আর ভাবিতে পারিল না। একখানি গাড়ীর শব্দে তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। কিশোর দেখিল গাড়ীখানি আসিয়া তাহাদেরই দরজার সম্মুখে থামিয়া পড়িল আর এক লহমার মধ্যে তালে তালে পা ফেলিয়া কিশোরী আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ীর পা-দানে পা খানি বাড়াইয়া দিয়া কিশোরী বোধ হয় অলক্ষিতে একবার কিশোরের জানালার দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সখীগণের প্রতি চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া সেই চলন্ত দুর্গে প্রবেশ করিল। কিশোরের মনে হইল আর এক অতীত জীবনের কথা। সে যেন এক হাহাকার ভরা গিরিনদ সমন্বিত এক অপূর্ব্ব দেশের কাহিনী। তপ্ত রক্তে সে দেশ যেন ভাসিয়া গিয়াছিল। কিশোরীকে, সেদিন যেন সে পাইতে বসিয়াছিল, আনন্দ যেন তাহার ধরিতেছিল না। কিন্তু তস্করের মত কোথা হইতে এক প্রৌঢ় আসিয়া একে একে সকলকে পরাজিত করিয়া কিশোরীকে লইয়া বিজয়-দর্পে চলিয়া গেল, আর সে যেন আহত হইয়া গিরিনদের রক্তস্রোতে ভাসিয়া চলিল।

কিশোর আর ভাবিতে পারিল না। টেবিলে আসিয়া বসিয়া পড়িতেই তাহার ছোট ভাই কমল আসিয়া কহিল—দাদা, কলেজ যাবে না?

কিশোর ঘড়িটা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে ছুটিয়া গেল। সেখানেও জলের শীতল স্পর্শে তাহার মনে হইল ইহা অপেক্ষা কোমল স্নিগ্ধ স্পর্শও যেন ঐ কিশোরী নারীর নিকট হইতে সে একদিন পাইয়াছে। দেব দানবের চিত্ত উর্ব্বশীকে জলধিজল হইতে উঠিতে দেখিয়া যেমন স্পর্শ-সুখ-আশে বিমোহিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিশোরের মনে হইল তাহার চিত্তও যেন সেই আশায় নাচিয়া উঠিয়াছে।

কিশোর এম্-এ পড়িত, আর তাহার বন্ধু রুদ্রকান্তের ষ্টুডিওতে বসিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া ছবি আঁকিত। ভাষার ছন্দে বৈদেশিক কবি ও নাট্যকার যে সমস্ত ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন, কিশোরের কার্য্য ছিল সেইগুলি রংএর সাহায্যে ক্যানভাসের উপর ফুটাইয়া তোলা। রুদ্রকান্ত তাহার ছবি দেখিয়া প্রশংসাই করিত আর অনুনয় বিনয় করিয়া কহিত, অন্ততঃ একখানি ছবি যেন সে প্রদর্শনীতে পাঠাইয়া দেয়। কিশোর কিন্তু কিছুতেই সম্মত হইত না। উদ্ভিন্ন-যৌবনা নারী যেমন তাহার অঙ্গ সৌষ্ঠব কাপড়ের পর্দ্দার উপর পর্দ্দা দ্বারা আবৃত করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া দেয়, কিশোরও তেমনই তাহার ছবিগুলিকে লোক-চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া দিয়াছিল।

সেদিন কলেজ হইতে ফিরিবার সময় কিশোর সাজ সরঞ্জাম শুদ্ধ ইজেলটা কুলীর মাথায় উঠাইয়া বাড়ীতে লইয়া আসিল। আলো ও ছায়ার অধিকার অনধিকার বিবেচনা করিয়া টেবিল, চেয়ার সরাইয়া ইজেলটাকে উপযুক্ত স্থানে বসাইতে তাহার বেশ একটু বেগ পাইতে হইল। সহসা কি মনে করিয়া সে জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল। মিনিট দশেক পরে বেথুন কলেজের গাড়ীটা আসিয়া থামিল। কিশোর শুনিল কিশোরী কহিতেছে—আজ তবে আসি ভাই, কাল আবার দেখা হবে। এমন সময় কিশোরের পশ্চাৎ হইতে তাহার বৌদি কহিল—ঠাকুরপো এসো, খাবার খাও।

কিশোর বিরক্ত হইয়া টেবিলে আসিয়া খাবার খাইতে বসিল। ইজেলের চেহারাখানি চোখে পড়িতেই বৌদি কহিলেন—এটি আবার কি নিয়ে এলে ঠাকুরপো ?

কিশোর তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া কাপড় দিয়া ইজেলটাকে ঢাকিয়া দিয়া কহিল—তুমি বুঝবে না। খুব দরকারী এটা আমার; কেউ যেন এটাতে হাত না দেয়, আগেই বলে রাখছি। কমলুকে আর তোমার খোকাকে আটকিয়ে রেখো; এ ঘরে যেন তারা আসে না, বলে রাখছি।

বৌদি যে কথাটা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না, তাহা তাঁহার চলিয়া যাওয়ার ভঙ্গীতেই প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

কোথায় গেল কিশোরের পড়া শুনা, কোথায় গেল তাহার কাব্য চর্চ্চা। মনের উপর যে স্মিত হাস্যময়ী মুখখানি ভাসিয়া উঠিয়াছিল, কিশোর একমনে একধ্যানে তাহাই তুলির লিখনে ফুটাইতে প্রয়াস পাইতেছিল। কোন যাদুকরের যাদুমন্ত্রে কাব্যরাণীর সিংহ-দুয়ার যেন খুলিয়া গিয়াছে। তরুণ অরুণের কনক কিরণ পড়িয়া কাব্যরাণীর সিংহাসন যেন অপূর্ব্ব আভায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে, আর সিংহাসনে আরূঢ়া রাণীর মুখের তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ জীবন্ত হইয়া কিশোরের নয়ন মন মোহিত করিয়া ফেলিয়াছে। আর থাকিয়া থাকিয়া পাশের বাড়ীর সঙ্গীত কলরব, চুড়ীর রিণি-ঝিনি, আর সেই বেথুন কলেজের গাড়ীর আওয়াজ, কিশোরের মনে ভাসিয়া আসিয়া সেখানে এক স্বপ্নরাজ্য তৈয়ার করিয়া ফেলিয়াছে।

ইজেলের ছবিটা ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। খুব সতর্কতার সহিতই কিশোর ছবিটাকে লোক-চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহার বৌদি আসিয়া সেদিন দরজাতে ধাক্কা দেওয়ামাত্রই দরজাটা খুলিয়া গেল। দরজার সিট্‌কিনি লাগাইতে যে কিশোরের ভুল হইয়া গিয়াছিল, তাহা বৌদির চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে কিশোর বুঝিতেই পারে নাই।

বৌদিকে দেখিয়া কিশোর ছবিটার উপর তাড়াতাড়ি পর্দ্দা টানিয়া দিতেছিল। বৌদি একটু হাসিতে যাইয়া অমনি থামিয়া গেলেন।

কিশোর কহিল—এ তোমার ভারী অন্যায়। তোমাদের জ্বালায় এক দণ্ডও নিরিবিলিতে একটা কাজ করতে পারব না।

বৌদি কহিলেন—ঠাকুরপো, আর ঢেকে কি হবে? আমি দেখে ফেলেছি। ও আগুন নিয়ে খেলতে যেও না। জীবনটার উপর শুধু একটা অন্ধকার আর হাহাকার নিয়ে আসবে মাত্র। নীরদ বাবুর মেয়ের ছবি যে আঁকচ তা আমি বুঝতে পেরেছি। আমার কথা শোন, ও ছবি এক্ষুণি মুছে ফেল। ওকে পাওয়া তোমার কর্ম্ম নয়।

কিশোর একটু উত্তেজিত হইয়া কহিল—কেন, তুমি আমাকে কিসে এত কাপুরুষ ঠিক করলে?

বৌদি কহিলেন—রাগ করো না ঠাকুরপো। তোমাকে আমি কাপুরুষ বলছি না। জান ত এখনকার দিন কাল। মোটর গাড়ী থাকা চাই, কল্‌কাতায় পাকাপোক্ত বাড়ী থাকা চাই, আর বিলেত থেকে খেতাব নিয়ে আসতে হয়। আমার কথা শোন, ও ছবি মুছে ফেল। ওদিকে আর চেও না।

বৌদি চলিয়া গেলেন। কিশোরের মুখের উপর অন্ধকার নামিয়া আসিল। অনেকক্ষণ খুঁটিনাটি করিয়া কিশোর বায়স্কোপ দেখিতে চলিয়া গেল।

অন্যমনস্ক ভাবে ঘণ্টা খানেক বায়স্কোপ দেখার পর ইণ্টারভালের আলো জ্বলিয়া উঠিল। সহসা পার্শ্বের দিকে দৃষ্টি পড়ায় কিশোর দেখিল কিশোরী বসিয়া রহিয়াছে। সেই দণ্ডেই কিশোরের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—কে! আপনি?

কিশোরীও খুব পরিচিতার মত কহিল—বা! আপনি যে! কি সৌভাগ্য!

কিশোর আর কি যে কহিবে তাহা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এমন সময় কিশোরী কহিল—বাবা এইমাত্র বাইরে চলে গেলেন। আমার খেয়ালই ছিল না যে আমার বড়ই পিপাসা লেগেছে।

কিশোর বলিল—একটু বসুন, এই আইসক্রীম্ নিয়ে আসছি।

মুহূর্ত্ত মধ্যে আইসক্রীম্ আসিয়া উপস্থিত হইল।

এমন সময় কিশোরীর পিতা নীরদ বাবুও আসিলেন। ঘরের আলোও সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়া গেল। বায়স্কোপের দিকে আর কিশোর মন দিতে পারিল না। সে শুধু ভাবিল, যেন কত জন্ম জন্মান্তরের পরিচিত এই কিশোরী! আমাকে একে পেতেই হবে। বৌদির কথা কিছুতেই শোনা হবে না, সে এর কি বুঝবে?

বায়স্কোপ যখন শেষ হইয়া গেল, কিশোর শুনিল পার্শ্ব হইতে কে মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—নমস্কার।

কিশোর প্রতি নমস্কার করিতে ভুলিয়া গেল। ক্ষণেকের মধ্যে কে কোথায় চলিয়া গেল তার ঠিক নাই।

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে কিশোরের দাদা সপরিবারে পুরী চলিয়া গেলেন। পড়ার আজুহাত দেখাইয়া কিশোর বাড়ীতেই রহিল। কিন্তু পড়া ছাড়িয়া সে তখন একাগ্রমনে ছবিখানি লইয়া বসিল। বৈকালে সে জানালায় দাঁড়াইয়া বেথুন কলেজের গাড়ীখানির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময় একটা মোটর আসিয়া পাশের বাড়ীর দরজায় থামিল। যে সাহেবটী মোটর হইতে নামিল, কিশোর দেখিল সে তাহারই বাল্যবন্ধু রমাকান্ত। রমাকান্ত এফ্ এ ফেল করিয়া বিলাত গিয়াছিল। সেখান হইতে ব্যরিষ্টারী পাশ করিয়া এক বৎসর হইল আসিয়াছে। হাইকোর্টে সে যে যায়, এ খবর কিশোর জানিত।

হঠাৎ কিশোর শুনিল পাশের বাড়ীর জানালা হইতে রমাকান্ত বলিতেছে—হ্যালো বয়! তুমি এখানে?

কিশোর একটু বিব্রত হইয়া কহিল—বেশ, ভাল ত? অনেক দিন পর দেখা হলো কিন্তু।

রমাকান্ত কহিল—বেরিয়ে পড়িসনে কিন্তু এই আধ ঘণ্টা পরেই আমি আসচি।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বেথুন কলেজের গাড়ীখানি আসিয়া থামিল। কিশোরী গাড়ী হইতে নামিতেই রমাকান্ত জানালা হইতে জোরের সহিত কহিল—Good evening. কিশোরী উপরের দিকে চাহিয়াই লজ্জিত হইয়া উঠিল। গাড়ীর মেয়েগুলি যদি দেখিত কে Good evening দিচ্ছে তবে কি তারা তাকে না ক্ষেপিয়ে থাকত? ভাগ্যে গাড়ীর দরজার মেয়ে দুটি একেবারে শিশু! এতখানি লজ্জার মধ্যে জড়িত হইয়া পড়িয়াও কিশোরী দরজাটিতে ঢুকিতে গিয়া একবার কিশোরের জানালার দিকে তাকাইল। সে কিন্তু বড়ই অলক্ষিতে—শুধু এক লহমার জন্য। সেই তড়িৎ-ক্ষণের মধ্যেই কিশোর দেখিল কিশোরীর মুখে যেন এক নূতন কাব্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভ্রমর গুঞ্জনের শব্দ পাইয়া ফুলের ভিতর যে কাব্য ফুটিয়া উঠে, সাগরের গর্জ্জনের শব্দে নদীবক্ষে যে নূতন ঢেউ খেলিয়া যায়, বিদ্যুতের আলোক রেখা লাগিতে মেঘের বুকে যে শিহরণ জাগিয়া উঠে; তরুর প্রথম স্পর্শে মাধবী লতার প্রতি অঙ্গ যে স্বপ্নে কাঁপিয়া উঠে, বিশ্ব প্রকৃতি অনাদি পুরুষের গন্ধে যে স্বপ্নে আপনার মুখের ঘোমটা অপসারিত করিয়া ফেলে, এ যেন সেই স্বপ্ন। কিশোর ভাবিল, এই কাব্যটুকুকে তাহার ছবিখানিতে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া ইজেলের পাশে বসিয়া ছবির গায় রং লাগাইতে সুরু করিল।

এক ঘণ্টা কাজ করিয়া জানালায় আসিয়া দাঁড়াইতেই কিশোর দেখিল রমাকান্ত, কিশোরী আর নীরদবাবুকে লইয়া মোটরে করিয়া কোথায় যাইতেছে। অলক্ষিতে কিশোরের মুখ হইতে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল। মোটরখানি অদৃশ্য হইয়া গেলে কিশোর আসিয়া কাপড় বদলাইয়া কি মনে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

এই ঘটনার দুই দিন পরে পাশের বাড়ীর দরজা জানালা সব বন্ধ হইয়া গেল। বেথুন কলেজের গাড়ীখানিও আর সে বাড়ীর পার্শ্বে থামিল না; হারমোনিয়মের আওয়াজ, চুড়ীর রিণি-ঝিণি, সকলই যেন বন্ধ হইল। কিশোর মাথায় হাত দিয়া বসিল। তাহার মনে হইল সে যেন এ কয়টা মাস স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছে। পাশের বাড়ীতে যেন কেউ ছিল না। সে যেন নিজের মনগড়া এক ছবি আঁকিয়া বসিয়াছে। এত বড় ভুল সে করিয়া বসিল, তবুও তাহার মনে হইল সে মুখখানি যেন তাহার বড়ই পরিচিত—মানুষটী যেন তাহার বড়ই আপনার।

পরের দিন সকালে উঠিয়া কিশোর দেখিল তাহার গায়ে যেন আর সামর্থ্য নাই, মনে যেন আর নবীন উৎসাহ

নাই। তবুও ছবিটার কাছে সে তুলি লইয়া বসিল, কিন্তু একটী টান দিয়াই সে বুঝিল সে ভুল রেখা টানিয়া ফেলিয়াছে। কেমন করিয়া রেখাটিকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে তাহা তাহার মাথায় আসিল না। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া সে উঠিয়া আসিয়া আবার জানালায় দাঁড়াইল; দেখিল, পাশের বাড়ীখানির উপর কেমন একটী অন্ধকার নামিয়া পড়িয়াছে, আর বাড়ীখানি একটি নির্য্যাতিতা মূক নারীর মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

একে একে সাত দিন চলিয়া গেল, তবুও পাশের বাড়ীর জানালা খুলিল না। কিশোর দেখিল দ্বারবানটি তাহার টুলে বসিয়া শুধু শুধু ঝিমায় আর মাঝে মাঝে পথের লোকের সঙ্গে দুই একটা বাতচিৎ করে।

কিশোর বৈকালে গিয়া দ্বারবানকে কহিল, বাবু হ্যায়?

দ্বারবান কহিল—নেহি, বাহর গয়া।

কিশোর কহিল—কব্ লোটেঙ্গে?

দ্বারবান বলিল—দো মাহিনে বাদ।

কিশোর হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। সেই দিনই তাহার কেতাব আর ইজেল লইয়া সে পুরী যাত্রা করিল। পথে কিশোরের কেবলই মনে হইতেছিল, এ জীবনে বোধ হয় নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকারের মধ্যেই তাহাকে ডুবিতে হইবে।

কেবল নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিবার আয়োজন হইতেছিল, এমন সময় বৌদি আসিয়া কহিলেন—ঠাকুরপো, এ তোমার কি আক্কেল। ঐ ছবির ডাণ্ডাটা এখানেও বয়ে নিয়ে এসেছ! ভাল কথা ত শুনবে না। ভাল চাও ত লাখটাকার স্বপ্ন ছেড়ে আমাদের কথা শোন। নইলে তুমি দুঃখে কষ্টে মরবে বলে রাখছি।

কিশোর উঠিয়া বসিয়া কহিল—তা নয় মরবো। কিন্তু তুমি একটু দয়া করে ঐ নীরদবাবুকে চিঠি লেখ দেখিন। একটু ঘটকালী না করলে তুমি যা' বলেছ তাই হবে।

বৌদি কহিলেন—হাঁ, আমার ত খেয়ে কাজ নাই, তাই ঘটকালী করতে যাই। আর ঐ দাড়ী-মুখো মানুষটার কাছে বুঝি আমি পত্র লিখতে পারি? তোমার যা আক্কেল।

কিশোর কহিল—আমার আক্কেল নাই, তাই ত তোমার শরণ নিয়েছি। তুমি না লিখতে পার, কিন্তু দাদাকে দিয়ে ত লেখাতে পার। তুমি বললে ত দাদা আর—

বৌদি বাধা দিয়া কহিলেন—নাও তোমার লেক্‌চার রাখ। ভদ্রলোকের যদি বৌটাও বেঁচে থাকত তবে নয় আমিই লিখতুম।

আর কোনও কথা না বলিয়া বৌদি চলিয়া গেলেন।

পরের দিন বৈকালে ইজেলটাকে সমুদ্রের ধারে বসাইয়া তন্ময় ভাবে কিশোর ছবিটা আঁকিতেছিল। সহসা একটা তপ্ত শ্বাস যেন তাহার পিঠের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। কিশোর ফিরিয়া দেখিল, পশ্চাতে কিশোরী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

তাহাকে দেখিয়া কিশোর অবাক হইয়া কহিল—বা! আপনি এখানে!

কিশোরী অপরিচিতার মত মুখ বাঁকাইয়া দ্রুত পদে সেখান হইতে চলিয়া গেল। পরে দূর হইতে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ছোট্ট একটী কীল দেখাইয়া কহিল—আপনি বড়ই দুষ্টু।

এই ক্ষুদ্র তিরস্কারটুকু কিশোরের পুরস্কার বলিয়াই মনে হইল। তাহার নির্ব্বাপিতপ্রায় আশা আবার জ্বলিয়া উঠিল। কিশোরীর শ্যাম্পেন রংএর শাড়ীখানি যখন আর দেখা গেল না, তখন সে দ্বিগুণ উৎসাহে আবার ছবি আঁকিতে বসিয়া গেল।

প্রায় পোনর মিনিট পরে কিশোরের পশ্চাতে কে যেন আসিয়া দাঁড়াইল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কিশোর ছবিখানিকে আরও সজীব করিয়া তুলিতে লাগিল। এমন সময় রমাকান্তের কথায় সে ফিরিয়া দেখিল তাহার পশ্চাতে রমাকান্ত আর নীরদবাবু দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। নীরদবাবু তন্ময় চিত্তে ছবিখানি দেখিতেছেন, আর রমাকান্ত কহিতেছে—দেখছেন কাণ্ডখানা! এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে।

কিশোর তাড়াতাড়ি ছবির উপর পর্দ্দা টানিয়া দিল। নীরদবাবু ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। রমাকান্ত তখন খুব উত্তেজিত হইয়া বলিল—তোর মনের ভাব কি বল দেখি?

কিশোর হাসিয়া কহিল—কালাপানির গুণেও এই সাদা কথাটা বুঝতে পারছিস্ না?

রমাকান্ত একপদ অগ্রসর হইয়া কহিল—কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা! দু'দিন বাদে যে আমার স্ত্রী হবে তার ছবি তুমি আঁকছ! দাঁড়াও, এ ছবি যদি আমি ঐ সমুদ্রের জলে ছিঁড়ে না ফেলে দেই, তবে আমার নাম রমাকান্তই নয়।

আর একটু হইলেই ছবিটার উপর রমাকান্ত হাত দিয়া ফেলিত, কিন্তু কিশোর উঠিয়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, আর সঙ্গে সঙ্গে রমাকান্তকে এক ধাক্কা দিয়া কহিল—দূর হ হতভাগা! এটা গুণ্ডামী করবার যায়গা নয়।

রমাকান্ত পড়িতে পড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইল! "এর প্রতিশোধ নেব, বুঝবে মজা"—বলিয়া রমাকান্ত রাগের মাথায় টলিতে টলিতে চলিয়া গেল।

ছবিখানি শেষ হইবার তখন আর বেশী বাকী ছিল না। সূর্য্যের আলোও অনেক কমিয়া আসিয়াছিল। কিশোর তাহার ইজেলটা লইয়া সেদিনের মত বাড়ী ফিরিয়া গেল।

পরের দিন কিশোর আর ছবি লইয়া সমুদ্রের ধারে গেল না। একখানি ছড়ি হাতে করিয়া ফিন্‌ফিনে একটা পাঞ্জাবী পরিয়া কাঁধের উপর একটা ততোধিক পাতলা চাদর ফেলিয়া সে বেড়াইতে বাহির হইল। হাঁটিতে হাঁটিতে সে প্রায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এমন সময় তাহার মনে হইল সম্মুখে কে যেন কাঁদিতেছে। একটু অগ্রসর হইয়া কিশোর দেখিল রমাকান্ত ভীষণকায় দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে আর তাহারই সম্মুখে বসিয়া কিশোরী কাঁদিতেছে। পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া চোখের রুমাল সরাইয়া কিশোরী খুব দৃঢ়ভাবে কিশোরকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—তুমিই আমার শত্রু—তুমিই আমার পায়ের কাঁটা।

মস্তক অবনত করিয়া কিশোর কহিল—ক্ষমা করবেন। আর পরক্ষণেই পশ্চাৎ ফিরিয়া সে দ্রুত চলিয়া গেল। রমাকান্তের বিদ্রুপমাখা হাসি শুধু তাহার কানে ভাসিয়া আসিল। অনেক দূর একটানা চলিয়া আসিয়া কিশোর একটা পাথরের উপর বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া পড়িল। তাহার মনের ক্ষীণ প্রদীপটুকু প্রবল ঝড়ে আজ যেন নিবিয়া গেল।

কতক্ষণ যে সে ঐখানে বসিয়াছিল তাহা তাহার খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ রমাকান্তের গলার শব্দে সে ফিরিয়া দেখিল যে নীরদবাবুর সহিত কথা কহিতে কহিতে রমাকান্ত বিজয় গর্ব্বে অগ্রসর হইতেছে, আর প্রায় কুড়ি হাত পশ্চাতে কিশোরী যেন অন্যমনস্ক ভাবে চলিয়া যাইতেছে। কিশোরের উপর চোখ পড়িতেই কিশোরী দুই হাত জোড় করিয়া কিশোরের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিল। আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে বন্য হরিণীর ন্যায় দ্রুত গমনে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিশোরীর এই লীলাময় চিত্ত-রহস্য আলোচনা করিতে করিতে কিশোরের মনে যেন আশার প্রদীপ আবার একটু জ্বলিয়া উঠিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে সন্দেহ-দোলায় দুলিতে দুলিতে কিশোর বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। আপনার ঘরে আসিয়া ভাল করিয়া না বসিতেই বৌদি আসিয়া কহিলেন—তুমি কি সকলের কাছে আমাদিগকে অপমানিত করিতে চাও? ভারী ত বিদ্যাধরী! তার বাপের আবার এত দেমাক্!

কিশোর সন্ত্রস্ত হইয়া কহিল—কেন, কি হয়েছে বৌদি? 'আমার মাথা আর মুণ্ডু'—এই বলিয়া একখানা চিঠি বিছানার উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া বৌদি চলিয়া গেলেন। কিশোর চিঠিখানি খুলিয়া পড়িয়া দেখিল লেখা আছে—

"যে ছেলে তস্কর বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কুল মহিলার ছবি আঁকে, তাহার সহিত আমার কন্যার বিবাহ হইতে পারে না। আমার কন্যার বিবাহ অন্যত্র সুস্থির হইয়াছে। আপনার যদি মর্য্যাদাবোধ থাকে, তবে যেন ছবিখানি আপনার গুণধর ভাইকে ফেরৎ দিতে, নয় নষ্ট করিয়া ফেলিতে বলেন। ইতি—

নীরদকান্ত রায়।"

চিঠিখানি অনেকবার করিয়া কিশোর পড়িল। তারপর কি মনে করিয়া চুপচাপ শুইয়া পড়িল। অনেক সাধ্য সাধনাতেও সে রাত্রে কিশোর আর আহার করিল না। পরের দিন সকালে চা খাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া সে ছবির উপর রং লাগাইতে সুরু করিল। প্রায় বারটার সময়

ছবি শেষ করিয়া একটি কোণে ছোট্ট করিয়া গোপন-ভঙ্গীতে তাহার নাম ও তারিখ লিখিয়া রাখিল। এমন সময় বৌদি আসিয়া দরজা ঠেলিলেন। কিশোর দরজা খুলিয়া দাঁড়াইতেই বৌদি কহিলেন—কি, আহার নিদ্রা আজও স্থগিত থাকবে না কি?

কিশোর কহিল—এই যাই বৌদি। আমার হয়ে গেছে। হঠাৎ ছবিটার উপর দৃষ্টি পড়ায় বৌদি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন—না, তস্করের বাহাদুরী আছে বটে!

বৌদি যখন চলিয়া গেলেন কিশোরের কানে যেন একটা তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ আসিয়া পৌঁছিল। সেদিকে মন না দিয়া কিশোর তাড়াতাড়ি স্নান করিতে গেল।

পরের দিন সকালে কিশোর বৌদিকে গিয়া কহিল—বৌদি, নীরদবাবুর ঠিকানাটা বল দেখি। আমি একবার জগদেওয়াকে ওখানে পাঠাব।

বৌদি ঠিকানাটা দিয়া কহিলেন—কেন? ছবিটা ফেরৎ দিবে নাকি? কিশোর মুখ ফিরাইয়া কহিল—হাঁ, তাই দেব।

জগদেওয়া ঘুরিয়া আসিয়া খবর দিল, নীরদবাবুরা কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন।

আরও পোনর দিন পুরীতে থাকিয়া বৌদির সঙ্গে কিশোর বাড়ী ফিরিল। বাড়ী পৌঁছিয়াই কিশোর তাহার ঘরের জানালা খুলিয়া দেখিল পাশের বাড়ীর কিশোরীরা ফিরিয়াছে কি না। ভোরের স্বপ্নের মত কিশোরীর যুক্ত কর আর বিষণ্ণ আঁখি পল্লব তখনও তাহার চোখে ভাসিতেছিল।

পাশের বাড়ীর উপরের জানালা ইত্যাদি খোলা দেখিয়া কিশোরের মনে আবার আশা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সমস্ত দিন উন্মুখ হইয়া বসিয়া থাকিয়াও সে যখন কিশোরীর কলহাস্য মুখরিত সঙ্গীত ধ্বনি শুনিতে পাইল না, তখন তাহার মনটা বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। এমন সময় রমাকান্তের মোটর আসিয়া পাশের বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল। রমাকান্ত যখন আসিয়াছে কিশোরীরা তাহা হইলে নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাহার মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল হয় ত তাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

পরের দিন সকালে উঠিয়া বৌদিকে গিয়া কিশোর কহিল—বৌদি, একবার খোঁজ নাও ত, ওরা এসেছে কি না।

বৌদি এক ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন—আমার আর খেয়ে কাজ নাই। আমি আবার অপমান হ'তে যাই?

কিশোর আর দ্বিরুক্তি না করিয়া মর্ম্মাহতের ন্যায় আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল। এক ঘণ্টা খুঁটিনাটি করিয়া ছবিখানিকে ভাল করিয়া জড়াইয়া সে রুদ্রকান্তের ষ্টুডিওতে চলিয়া গেল। খুব নিপুণতার সহিত সুন্দর ফ্রেমে ছবিখানি বাঁধিয়া দুপুর বেলায় কিশোর বাড়ী ফিরিয়া দেখিল বৌদি তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

ছবিখানি দেখিয়াই বৌদি কহিলেন—গরীবের কথা বাসী হলে কাজে লাগে। তখন বল্লুম আকাশ চাওয়া ছেড়ে দিতে। তা শুনবে কেন? আমরা হলুম মুখ্যু মানুষ। এখন বসে বসে সারা জীবন পস্তাও!

কিশোর কহিল—কেন, কি হয়েছে বৌদি?

বৌদি বলিলেন—কি আর হবে? এখন ঠাণ্ডা হয়ে নেয়ে এসে খাও দাও। আমি খোঁজ নিয়েছিলুম। ওরা ফিরে এসেছে আর মাসে বিয়ের উদ্যোগ করছে।

কিশোর একটু অদ্ভুত রকমে হাসিয়া কহিল—তা করুক গিয়ে। আমিও আশা ছেড়ে দিয়েছি।

বৌদি মাথা ঝাঁকিয়া কহিলেন, হাঁ, তা' সত্যিই বটে।

বৈকালে কিশোর জগদেওয়াকে দিয়া নীরদবাবুর নিকট ছবিটা পাঠাইয়া দিল।

ছবিখানি দেখিয়া নীরদবাবু কহিলেন, বেশ হয়েছে। সব ঝঞ্ঝাট এইবার চুকে যাবে। এইবার এটাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। নীরদবাবু একটা দেয়াশলাই আনিয়া ছবিটায় আগুন লাগাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় কিশোরী আসিয়া ছবি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া উঠিল। নীরদবাবুর হাত হইতে ম্যাচ কাটিটা পড়িয়া গেল।

কিশোরী কহিল—ছবিটা বাবা, আমার ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখব। চমৎকার এঁকেছে কিন্তু।

নীরদবাবু কহিলেন—না, না, তা হবে না। এটাকে আমি পুড়িয়ে ফেলব।

কিশোরী দেখিল পিতা কথার মতই কায করিতে যাইতেছেন। অভিমান ভরে পাঁচ হাত সরিয়া গিয়া কিশোরী পিতার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল—বাবা, আমার ছবির গায় তুমি আগুন লাগিয়ে দেবে? আর অমনই ক্ষুদ্র শিশুটির মত সে কাঁদিয়া ফেলিল।

কোথায় রহিল ছবি, আর কোথায় রহিল দেয়াশলাই! নীরদবাবু উঠিয়া আসিয়া মেয়েকে একটি শোফায় বসাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

কিশোরী প্রকৃতিস্থ হইলে তিনি কহিলেন—তোর ঘরে ছবিটা নাই রাখলি মা! রমাকান্ত তোকে যখন নিয়ে যাবে, তখন ও ঘর ত বন্ধই থাকবে, ওটাকে আমি আমার ঘরেই রেখে দেব। তোর পরিবর্ত্তে ঐ ছবিটাই আমাকে সান্ত্বনা দেবে।

সুতরাং ছবিটা তাহার বিজয় নিশান উড়াইয়া নীরদবাবুর নিজ কক্ষে আপনার আসন জুড়িয়া বসিল। নীরদবাবু ছবিখানিকে ভাল করিয়া দেখিয়া কহিলেন—ছেলেটি একটি আর্টিষ্ট বটে। বিলাত হ'লে ওর যথেষ্ট সুখ্যাতি হ'তো।

পরের দিন রমাকান্ত আসিয়া ছবিখানি দেখিয়াই জ্বলিয়া উঠিল। সে নীরদবাবুকে কহিল—এমন করিয়া আমাকে অপমান করিলে আমি আর আসব না বলে দিচ্ছি।

কিশোরী সেখানে ছিল না তাই যা' রক্ষা। নীরদবাবু রমাকান্তকে বুঝাইয়া কহিলেন—তুমি এখনও ছেলে মানুষ। তুমি যখন কিশোরীকে নিয়ে যাবে তখন আমার যে কেমন করিয়া দিন কাটবে তা' তুমি এখনও বুঝতে পারবে না। যদ্দিন না আর একটা ভাল ছবি না আঁকাতে পারি তদ্দিন ওটা এখানেই থাকবে। এতে আর তোমার কি অপমান?

এই ঘটনার একমাস পরে একদিন বেড়াইয়া আসিয়া কিশোর দেখিল তাহার টেবিলের উপর ল্যাভেণ্ডার মাখান একখানি রঙীন চিঠি। খুলিয়া দেখিল—সেটা কিশোরী আর রমাকান্তের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র। আর দুই দিন পরেই তাহাদের বিবাহ। চিঠিখানির এক পার্শ্বে মোটা অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—With compliments from Ramakanto.

ঐ লেখার মধ্যে যে অহঙ্কার দর্প আর বিদ্রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে কিশোরের মন যেন পুড়িয়া গেল। এ কয় দিন সে বৌদির একটা ছবি আঁকিতেছিল। তার খেয়ালই ছিল না যে এত শীঘ্রই এই শুভ কর্ম্মটী সম্পন্ন হইতে বসিবে।

এমন সময় বৌদি আসিয়া কহিলেন—কি, আমার ছবিটা কতদূর হলো?

কিশোর তাড়াতাড়ি চিঠিখানি লুকাইতে চাহিতেছিল কিন্তু পারিল না। বৌদি কহিলেন—আর লুকিয়ে কি হবে? পরশুই ওদের বিয়ে হবে। বেশ, তুমি যেয়ে ভোজ খেয়ে এসো।

বৌদির ঠাট্টাতে কিশোরের মনটা একটু হাল্কা হইয়া পড়িল। কিশোর কহিল—বৌদি, তোমার ছবিটা ম্যাডোনার মত করে এঁকে দেব। তাই দেরী হবে। তুমি একবার খোকাকে নিয়ে এস দেখি।

বৌদি খোকাকে সাজিয়ে গুজিয়ে লইয়া আসিলেন। কিশোর একটু হাসিয়া বলিল—খোকাকে আঁকব বলেছি, কিন্তু খোকার পোষাক যে আঁকব তাত বলি নাই।

তারপর কিশোর খোকাকে কোলে লইয়া তাহার সঙ্গে খেলা জুড়িয়া দিল।

"ও! এই বুঝি তোমার ছবি আঁকা।" এই বলিয়া বৌদি নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

পরের দিন রমাকান্ত আসিয়া দেখিল নীরদবাবু মেয়েকে যে সমস্ত গয়না পত্র দিবেন তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া আলমারীতে তুলিয়া রাখিতেছেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। রমাকান্তকে বসিতে বলিয়া নীরদবাবু কিশোরীকে ডাকিতে গেলেন। কিশোরী তখন একখানি চিঠি লিখিতেছিল। পিতাকে দেখিয়া কিশোরী কহিল—এই আমার হলো বলে। তুমি যাও—এই একটু পরেই আমি যাচ্ছি।

নীরদবাবু ফিরিয়া আসিয়া রমাকান্তের সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। গল্পের ঝোঁকে এক ঘণ্টা কাটিয়া

গেল। রমাকান্ত তখন বলিতেছিল—তা' যাই বলুন না কেন, ঐ ছবিটা রেখে আপনি ভাল করেন নাই।

নীরদবাবু যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন—এমন সময় দারবান আসিয়া নীরদবাবুর হাতে একখানি চিঠি দিল। অন্যমনস্ক ভাবে চিঠিখানি খুলিয়া দুই ছত্র পড়িতেই তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল।

তিনি এক দৌড়ে কিশোরীর ঘরে আসিয়া দেখিলেন সেখানে কেউ নাই। ছাদে গিয়া দেখিলেন সেখানেও নাই। বাড়ী শুদ্ধ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন তবুও কিশোরীকে দেখিতে পাইলেন না। একেবারে হতাশ হইয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—রমাকান্ত তখনও অপেক্ষা করিতেছে।

নীরদবাবু চেয়ারটায় ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। একটু ঠাণ্ডা হইয়া কহিলেন—রমাকান্ত! তুমি আমার সর্ব্বনাশ করলে। চলে যাও এখান থেকে। এক্ষুণি চলে যাও। তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হ'তে পারবে না। যে আমার মেয়েকে অপমান করতে চায়, যে তাকে ভ্রষ্টা বলে ভাবে, এবং সেই কারণেই তাকে তিরস্কার করতে ত্রুটি করে না, তার স্থান আমার বাড়ীতে নাই। সরে পড়, পালাও। খবরদার! আর দেরী করো না।

নীরদবাবুর কথা শুনিয়া রমাকান্তের আপাদ মস্তক গরম হইয়া উঠিল। তারপর কি ভাবিয়া হো, হো করিয়া হাসিয়া কহিল—রত্নটী পালিয়েছে বুঝি? আহা, morality incarnate! কিন্তু তাই বলে আমি ছাড়ছি না। আপনি দশ জনের সামনে কথা দিয়াছেন খেয়াল রাখবেন। ভাল হউক মন্দ হউক, আমি ওকে বিয়ে করবই।

নীরদবাবু রাগিয়া কহিলেন—বের হ, হতভাগা, গুণ্ডামী করবার আর জায়গা পান নি!—আর অমনি টেবিলের রুলটা সাঁ করিয়া রমাকান্তের দিকে ছুড়িয়া ফেলিলেন। রুলটা রমাকান্তের হাতের আঙ্গুল স্পর্শ করিয়া দেয়ালে গিয়া ঠেকিল। নীরদবাবু রুলটাকে ব্যর্থ হইতে দেখিয়া মোটা কাঁচের দোয়াতটা টেবিল হইতে উঠাইয়া লইলেন। রমাকান্ত বেগতিক দেখিয়া তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতেই সে চেঁচাইয়া কহিল—হাইকোর্টে ডামেজ সুট এনে এর মজা দেখাব। দুটোকেই কাটগড়ায় দাঁড় করিয়ে যদি বাঁদর নাচ না নাচাই, তবে আমার নাম রমাকান্তই নয়।

রমাকান্ত চলিয়া যাওয়ার এক ঘণ্টা পরে কিশোরের দাদা চন্দ্রনাথবাবু আসিয়া দেখিলেন, নীরদবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন। নীরদবাবুর নিকট ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তিনি কহিলেন—নীরদবাবু! আপনি একবার আমাদের ওখানে আসুন।

নীরদবাবু চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন—কে তুমি?

চন্দ্রকান্তবাবু কহিলেন—ভয় খাবেন না। আমাকে আপনি খুব জানেন। আপনার মেয়েটি আমাদের বাড়ীর সিঁড়িতে গিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। আমার স্ত্রী তাঁর শুশ্রূষা কচ্ছেন। মিস্ সরলাকে আমি ফোন করেছি। সে এল বলে।

নীরদবাবু বলিলেন—কি! কিশোরী আপনাদের ওখানে আশ্রয় নিয়েছে! মরে নাই সে? ভাল আছে? এখনও বেঁচে আছে?

চন্দ্রকান্তবাবু কহিলেন—ব্যস্ত হবেন না, তিনি ভালই আছেন। আপনি আসুন।

নীরদবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া চন্দ্রকান্তবাবুর হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তার পর অন্ধ আতুরের মত পা ফেলিতে ফেলিতে পাশের বাড়ীতে চলিয়া আসিয়া দেখিলেন, কিশোরীর মূর্চ্ছা তখনও ভাঙ্গে নাই। কিশোরের বৌদি তখনও তাহার পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছিলেন। নীরদবাবুকে দেখিয়া তিনি উঠিতে যাইতেছিলেন।

নীরদবাবু কহিলেন—যেও না মা। আমার মত বুড়ো মানুষ ওর যত্ন নিতে তেমনটি পারবে না। এ তোমারই কাজ।

এমন সময় মিস্ সরলা আসিয়া উপস্থিত হইল। কিশোরীর হৃদ্‌পিণ্ড এত জোরে চলিতেছিল যে, ডাক্তারেরও মনে ভয় হইল। তাড়াতাড়ি প্রেস্‌ক্রিপশনটা লিখিয়া দিয়া তিনি কহিলেন—এ যেন shell shock case. তা ভয়

নাই। ওষুধটা খাওয়াবেন, মাথায় বরফ দিবেন। আর খুব হাওয়া করবেন।

পরের দিন কিশোরীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। কিন্তু ভয়ানক জ্বর দেখা দিল।

ছয় মাস ভুগিয়া যখন সে সারিয়া উঠিল, তখন নীরদবাবুরা দার্জ্জিলিংএ। কিশোর ও তাহার বৌদিকে নীরদবাবু সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। এই দার্জ্জিলিংএ বসিয়াই কিশোর তাহার বৌদির ম্যাডোনা মার্কা ছবিটা শেষ করিয়া ফেলিল। নীরদবাবু কহিলেন—খুব চমৎকার হয়েছে। তুমি বাস্তবিকই একজন আর্টিষ্ট।

আরও ছয় মাস পরে কিশোরের সঙ্গে কিশোরীর বিবাহ হইয়া গেল। দুইটা বাড়ীই তখন একে পরিণত হইল। নীরদবাবুর আনন্দ আর ধরিল না।

তিন বৎসর পরে কিশোর, কিশোরীর সেই ছবিটার গায় বার্ণিস লাগাইয়া চকচকে করিয়া তুলিতেছিল। এমন সময় দেখিল ছবির ওপিঠে একখানি চিঠি পড়িয়া রহিয়াছে। ধুলা ঝাড়িয়া কিশোর চিঠিখানি পড়িয়া দেখিল, লেখা আছে—

"বাবা! অবাক হয়ো না, আমি তোমায় চিঠি লিখচি। মেয়ে হয়ে বাপকে আমি কেমন করে আমার লজ্জার কথা বলবো তা' আমি ভেবে পাই নেই। তাই এই চিঠি। রমাকান্তটার সঙ্গে আমার কখখনো বিয়ে হবে না। সে আমাকে একদিন পুরীতে অপমান করতে চেয়েছিল। সে আমাকে ভ্রষ্টা বলে মনে করে, আর সেই ধারণা নিয়ে সে আমাকে তিরস্কার করে থাকে। তুমি না কি অন্ধ। তোমার চোখে ধুলি দিয়ে আমি না কি কত না কুকার্য্য করেছি। ঐ ছবিটার জন্য রমাকান্ত আমাকে কত না খোটাই দিয়াছে। তুমি মনে কর, যে নারীর মনে সামান্য একটু মর্য্যাদা বোধ আছে, সে কখনও এমন মানুষকে বিয়ে করতে পারে?

কিন্তু তুমি কথা দিয়েছ। সে কথা তুমি কেমন করে ফিরিয়ে নেবে? তাই সকল ঝুকি আমার মাথায় তুলে নিয়ে আমি পালিয়ে চল্লুম। তোমাকে ছেড়ে যেতে অত্যন্ত কষ্ট হলো। তোমার অপরাধিনী মেয়েকে ক্ষমা করো। আমি আজ বিদায় হলুম। ইতি

প্রণতা—কিশোরী।"

কিশোরের মনে হইল—উঃ! রমাকান্তটা কি পাষণ্ড! তারপর পত্রখানি কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

সাহিত্য আলোচনা।

[শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল]

(১) সাহিত্য কাহাকে বলে?

(বিখ্যাত ইংরাজ সাহিত্যিক লর্ড মর্লির ভাব লইয়া লিখিত)

সাহিত্য কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ অনেকেই সাহিত্যের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এমার্সন বলিয়া গিয়াছেন যে, "সাহিত্য উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ ভাবসমূহের রেকর্ড বিশেষ।" অপর একজন বিখ্যাত সমালোচক, বোধ হয় ষ্টপফোর্ড ব্রুক বলিয়াছেন, "সাহিত্য বলিতে আমরা প্রতিভাসম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষের লিপিবদ্ধ চিন্তা ও মনের ভাবসমূহ বুঝিয়া থাকি। চিন্তাগুলি এরূপ সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে সুসজ্জিত হইয়াছে যে, তাহা পাঠে পাঠকগণের মনে আনন্দের সঞ্চার হইবে।" আর একজন এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ভাবসমূহ উপলব্ধি করাই সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির প্রধান উদ্দেশ্য।"

যে লেখক মনুষ্যের মনের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন, তাহাকে নূতন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, যিনি কোন অখণ্ডনীয় নৈতিক সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, কিংবা মনুষ্য হৃদয়ের কোন সনাতন আসক্তি বা অনুরাগের ভিতর প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, যিনি তাঁহার চিন্তা, ভাব, মন্তব্য ও আবিষ্কারসমূহ, মহৎ, সুন্দর, উন্নত, সুস্থ, ন্যায়সঙ্গত,

সুন্দ যে কোন আকারেই হউক প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেগুলি নিজের স্বতন্ত্র রচনা-প্রণালীতে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার রচিত পুস্তকই ইংরাজীতে classic আখ্যা পাইবার উপযুক্ত এবং এইরূপ পুস্তকের সমষ্টিই সাহিত্য।

যে পুস্তকে নৈতিক সত্য, মনুষ্যের অনুরাগ, ভাব ও passions উদার, নির্ম্মল ও সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সেই পুস্তকই সাহিত্যের অন্তর্ভূত হইবার যোগ্য। যিনি পুস্তকের ভিতর দিয়া মনুষ্যের নৈতিক বিচারশক্তির অদ্ভুত ক্ষমতা, মনুষ্য হৃদয়ের প্রবৃত্তিসমূহ, আমাদের ধর্ম্ম, সুখ ও আচার ব্যবহারের আদর্শসমূহে যে সকল পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সকল পরিবর্ত্তন এবং সত্য ও ধর্ম্মসংক্রান্ত মহান কল্পনাপুঞ্জের পরিবর্ত্তনশীল ধনরত্নসমূহ আবিষ্কারার্থে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ সাহিত্যানুরাগী। কবি নাট্যকার, ব্যঙ্গকাব্য লেখক, ঔপন্যাসিক, ধর্ম্মপ্রচারক, জীবনীলেখক, উপদেশাবলি-রচয়িতা ও রাজনৈতিক বক্তা সকলেই যে পরিমাণে আমাদিগকে মনুষ্য ও মনুষ্যচরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে শিক্ষা দেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদের রচিত পুস্তক সাহিত্যক্ষেত্রে আদৃত হয়।

এইরূপ ভাবতঃ ছাঁকা ও বাছা পুস্তকাবলীই সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত। আমাদের কল্পনা ও সহানুভূতি, আমাদের স্বাস্থ্যকর ও নানারূপধারী নৈতিক চেতনাশক্তির সুনিয়মিত শিক্ষার জন্যই সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ভাবে বিবেচনা করিলে আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, পুস্তকসমূহ আকস্মিক ঘটনা বা খেয়াল হইতে কেবল উৎপন্ন নহে। ক্ষণিকের জন্য আমোদের সৃষ্ট করা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নহে। পৃথিবীতে যাহা কিছু সত্য, সনাতন ও সুন্দর আছে, সাহিত্যে তাহাই ভাষার আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটি সুশৃঙ্খল নিয়ম আছে। সাহিত্য সৃষ্টির বিশেষ কোন কারণ আছে এবং সেই কারণ সমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্য ও সমাজ উভয়ই পরস্পর সংবদ্ধ। যেমন প্রাকৃত-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা পৃথিবীস্থ উদ্ভিদ ও প্রাণীর যথাযথ বণ্টন ও বিভাগের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে ও ব্যখ্যা করিতে চেষ্টা করেন, ভূতত্ত্ববিষয়ক ও সমুদ্র জলবায়ু সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন সমূহের জন্ত তাহাদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পান; সেইরূপ যে সকল সংস্কার, ধারণা, চিন্তা, রুচি, আসক্তি, কল্পনা, মানসিক ভাব ও উদ্ভাবনা মনুষ্য চারিত্রের নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অভিজ্ঞতাকে এবং মানবসমাজের নিত্যপরিবর্ত্তনকারী সময় ও সাময়িক অবস্থাকে ভাবান্তরিত করে বা তাহাদের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়, সেই সকলের সঠিক সংবাদ রাখাই জ্ঞানবান সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির প্রধান কর্ত্তব্য।

—০—

(২) পদ্য ও গদ্য।

প্রায় সকল জাতিরই প্রাচীনতম পুস্তকগুলি কাব্যগ্রন্থ। তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের পুরাতন ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, সর্ব্বত্রই সর্ব্বপ্রথম কাব্য সাহিত্যের আবির্ভাব এবং তৎপরে কালক্রমে গদ্য রচনার উৎপত্তি হইয়াছে। তাহার কারণ,—কাব্যে আমরা ভাবের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই; কিন্তু গদ্য রচনায় ভাবসমূহ সংযত ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পদ্যে কল্পনাশক্তির, গদ্যে বিবেকশক্তি বা যুক্তিতর্কের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের উর্ব্বর মানসক্ষেত্রে যুক্তি অপেক্ষা কল্পনার বীজই প্রথম অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। সেইজন্য প্রায় সকল জাতিরই সাহিত্যে প্রথম কাব্য, পরে গদ্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ইহা হইতে কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন যে, পদ্য হইতেই গদ্যের উৎপত্তি।

গদ্য সাহিত্যকে কাব্যেরই একটি স্বতন্ত্র বিভাগ বলা যাইতে পারে। নিম্নলিখিত দুইটি প্রমাণের দ্বারা আমরা এই যুক্তিসঙ্গত উক্তির সমর্থন করিতে পারি।

প্রথমতঃ কাব্যের সহিত উপন্যাসের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কারণ উভয় সাহিত্য-সমুদ্রেই উদ্দাম ভাবলহরী সানন্দে নৃত্য করিতেছে; কাব্যের প্রধান উপাদান কল্পনাশক্তি, উপন্যাসক্ষেত্রেও অতীব প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এবং উভয়েই বিবেকযুক্তির প্রভাব অতিশয় তুচ্ছ। কেবল রচনা-প্রণালীর পার্থক্যেই যে কাব্য ও উপন্যাস সাহিত্যের দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগ বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহা অত্যুক্তি নহে। কবির ভাবসমূহ ছন্দে গ্রথিত, ঔপন্যাসিক গদ্যে তাঁহার মনের ভাব

প্রকাশ করিয়াছেন। Metrical romance হইতেই গদ্যসাহিত্যে romanceএর প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ,—কাব্য প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা—গীতিকাব্য (Lyric and Elegiac), মহাকাব্য (Epic), বর্ণনাত্মক (Narrative), নাটক সম্বন্ধীয় (Dramatic) ও ভাবপ্রধান বা চিন্তাশীল (Reflective) কাব্য।

গীতিকাব্য কাহাকে বলে? ইংরাজীতে Lyric কথাটি যেমন Lyre হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ বাঙ্গালায় গান হইতে গীতিকাব্যের উৎপত্তি। উভয়ের মধ্যেই এক ঘনীভূত সাদৃশ্য দেখিতে পাই। গানে ও গীতিকাব্যে কবি-চিত্তের হর্ষাপ্লুত বা শোকাত্মক ভাবসমূহ স্বাধীনভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এবং যাহা পাঠ করিয়া পাঠকমণ্ডলীরও মানস-সমুদ্রে ভাবতরঙ্গ উঠিতে ও পড়িতে থাকে। গীতি-কাব্যে সুর, লয় ও তান সংযোজিত হইলেই গানের সহিত তাহার আর কোন প্রভেদ থাকে না। গীতিকাব্য রচনায় সিদ্ধহস্ত কবিসম্রাট রবিবাবুর গীতিকাব্য ও গান পড়িলেই আমরা এই উভয় প্রকার কবিতার মধ্যে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। ইংরাজীর Lyric ও Elegiac পদ্য বাঙ্গালা গীতিকাব্যের অন্তর্ভূত। এই শ্রেণীর কাব্যের সহিত বাগ্মিতা সম্বন্ধীয় (oratorical) কিংবা অলঙ্কারপূর্ণ (rhetorical) গদ্য সাহিত্যের তুলনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। কবি ও বাগ্মী উভয়েই কাব্যে বা বক্তৃতায় একই মনের ভাব প্রকাশ করিতেছেন। তবে উভয়ের রচনাপ্রণালী স্বতন্ত্র। বাগ্মীবর অলঙ্কারপূর্ণ গদ্যে শ্রোতার এবং কবি প্রাণস্পর্শী কাব্যে পাঠকের মনোমধ্যে পেলব ভাবপ্রসূননিচয় প্রস্ফুটিত ও সুপ্ত কল্পনাশক্তি প্রবুদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

মহাকাব্য ও বর্ণনাত্মক কাব্য হইতেই যে বর্ণনাত্মক গদ্য সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ, কোন প্রমাণ সাপেক্ষ নহে। উপন্যাস (Fiction) সত্যমূলক ঘটনা, সত্যমিথ্যামিশ্রিত গল্প, ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতি গদ্য রচনা বর্ণনাত্মক গদ্য সাহিত্যের (narrative prose) অন্তর্গত। ছন্দোবিশিষ্ট নাট্যকাব্য হইতে গদ্য নাটকেরই উৎপত্তি হইয়াছে এবং চিন্তাশীল কবিতা হইতেই গদ্যে সন্দর্ভ নিবন্ধ প্রভৃতি রচনার সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সমস্ত প্রমাণ একত্র করিলে আমরা বোধ হয়, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, গদ্য সাহিত কে পৃথক না ভাবিয়া কাব্যেরই একটি স্বতন্ত্র বিভাগ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

শক্তিমানের প্রতি।

[শ্রীঅবনীকুমার দে]

দরিদ্র দুর্ব্বল বলে কর যদি হেলা
কিবা আসে যায়,
আপনারে লয়ে তুমি থাক সারাবেলা
আপন ইচ্ছায়।

তোমার ও বল বুদ্ধি থাক্ তব কাছে
—দম্ভ অভিমান,
করুণার তরে তব কে ছুটিবে পাছে
হ'তে অপমান?

ঐশ্বর্য্যের তব অই গর্ব্ব-অহঙ্কার
তোমাকেই সাজে,
দুঃখী বলে চাইনাক কণাটুকু তা'র
এতটুকু কাজে।

চিত্ত মোর দরিদ্রতা অতি গরবের
—মান্য করি তা'রে,
দৈন্যকেই করিয়াছি ব্রত জীবনের
মহা সমাদরে।

মনে রেখো তুমি শুধু চিরদিন তব
রবে না এমন,
টুটে যাবে ধন মান গরিমা বিভব
নিশার স্বপন।

দ্বারে তব আজি যেই দরিদ্র ভিখারী—
কভু দ্বারে তাঁর,
পার তুমি দাঁড়াইতে করযোড় করি'
তরে করুণার।

অশ্রুসিক্ত ব্যথারুণ করুণ চাহনি
দেখে যা' দেখনা,
বুকভরা লক্ষ লক্ষ নির্ম্মম কাহিনী—
শোনে যা' শোননা।

—একদিন হয়ত বা অই আঁখিজলে
দেবের আসন—
টলাবে—ডুবাবে বিশ্ব অসীম অতলে
কে জানে কখন?

বিদগ্ধ পঞ্জর-ভরা সুদীর্ঘ নিশ্বাস
দেবতার প্রাণে,
একদা করিতে পারে করুণা বিকাশ
কবে কে তা জানে?

কোথা তবে যাবে তব ধন মান বল
গর্ব্ব অহঙ্কার,
বিনিময়ে একবিন্দু তুচ্ছ অশ্রুজল
কৃপা হ'লে তাঁর?

দুর্ব্বলের দীর্ঘশ্বাস নহে উপেক্ষার
—নহে অকারণ,
শক্তিতে পার কি কভু এতটুকু তার
রোধিতে কখন?

বশীভূত করিতে সে মৃগ শিশুটীরে
লৌহ শক্তিবলে,
পারিবে কি কোন দিন শত চেষ্টা করে'
প্রেম নাহি দিলে?

ফোটাতে পার কি কলি সহস্র চেষ্টায়
না হ'লে মলয়,
শক্তিতে কখন কেহ পেরেছে কি তায়
সোহাগে যা' হয়?

হেমচন্দ্রের গদ্য রচনা।

[সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র ১২৭৯ সালে যখন বিখ্যাত 'বঙ্গদর্শন' মাসিকপত্রের প্রবর্ত্তন করেন, তখন যে সকল প্রতিভাশালী লেখক তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৺কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বাগ্রগণ্য। সাধারণ পাঠকগণ হেমচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থাবলীর সহিতই সমধিক পরিচিত, তিনি যে একজন উৎকৃষ্ট গদ্যলেখক ছিলেন, তাহা হয় ত অনেকেই অবগত নহেন। 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বিতীয় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯) হেমচন্দ্র "মনুষ্য জাতির মহত্ত্ব কিসে হয়" শীর্ষক একটি সুন্দর সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধার করিলাম।]

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

মনুষ্য জাতির মহত্ত্ব কিসে হয়?

[৺কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

মহৎ হইবার ইচ্ছা মনুষ্য জাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। সকল ব্যক্তি এবং সকল জাতিরই অভিলাষ, যে তাহারা জনসমাজে অগ্রগণ্য এবং প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাপি সকল জাতিকে অথবা এক জাতিকেই সকল সময়ে মহৎ হইতে দেখা যায় না। কেবল মহৎ হইবার ইচ্ছা থাকিলেই হইতেছে না। যে সমস্ত গুণের সদ্ভাবে লোক মহৎ হয়, তাহা আয়ত্ত করা আবশ্যক। সেই সকল গুণ এবং উপায় প্রণালী সর্ব্বদা মনোমধ্যে চিন্তা করা এবং তদনুসারে কার্য্য না করিয়া, কেবল মহত্ত্বলাভের ইচ্ছা করা, বামনের চন্দ্রধারণের আশার ন্যায় নিষ্ফল। অতএব এই সংস্কার, যে জাতির মনে বদ্ধমূল আছে, সেই জাতিই মহত্ত্বলাভ করে, এবং যতদিন এই সংস্কার অবিচলিত থাকে ততদিনই তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতি সাধন হয়, ইহার অন্যথা হইলেই পতনদশা আসিয়া উপস্থিত হয়।

আমাদিগের দেশে এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহৎ হইবার বাসনা লোকের অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়াছে, এবং সুশিক্ষিত যুবা পুরুষদিগের ন্যায় অনেকের মনে সেই বাসনা বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। অতএব সেই বাসনাকে পরিণামে, ফলপ্রদ করিবার নিমিত্ত, মনুষ্যজাতি কিসে মহৎ হয়, এই বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। সেই জন্যই আমরা এই প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

মনুষ্য জাতি কিসে মহৎ হয়, এই সমস্যাটী অতি গুরুতর। ইহার শেষ মীমাংসা করিয়া উঠা অনেক পরিশ্রম, বিবেচনা এবং আয়াসসাধ্য। এ বিষয়ের সম্যক্‌রূপ সিদ্ধান্ত করিয়া উঠি, আমাদিগের তাদৃশ ক্ষমতা নাই, এবং তাহাও আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। ইহার প্রতি লোকের দৃষ্টি থাকে, তাঁহারা মনোমধ্যে এই চিন্তাকে স্থান দান করেন, এবং ইহার তত্ত্বনির্ণয়ে মনোযোগী হইয়া, প্রকৃত সিদ্ধান্ত করিতে উদ্যোগী হন, ইহাই আমাদিগের অভিপ্রেত। অতএব আমরা এ বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ যাহা স্থির করিতে পারিয়াছি, এস্থানে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

মনুষ্যজাতি কিসে মহৎ হয়, এই কথার মীমাংসা করিবার জন্য ইতিহাসই প্রধান অবলম্বন। পৃথিবীর যে সকল জাতি মহৎ হইয়াছে, কিম্বা এখনও যাহারা মহৎ হইতেছে, তাহাদিগের ইতিহাস আলোচনা করিলে, সর্ব্বত্রই প্রায় একটী সাধারণ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন একটী প্রবৃত্তির প্রাধান্য করিতে কৃতসঙ্কল্প ও সেই প্রবৃত্তির চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তদর্থে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করাই সে নিয়ম। দেশ কাল এবং জাতিভেদে সেই প্রবৃত্তিটী বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। কখন বা মাতৃভূমির প্রতি স্নেহ, কখন বা ধর্ম্মানুরাগ, কখন বা জ্ঞানতৃষ্ণা, কখন বা বাহুবল গৌরব, কখন বা অর্জ্জনস্পৃহা ইত্যাকার কোন না কোন একটী প্রবৃত্তি সমাজমণ্ডলীতে প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ফলাফল সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ হইয়া থাকে। সমাজের সকল ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠিত প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে যত্নবান এবং তদর্থে জীবনসর্ব্বস্ব পরিহার করিতে পরাঙ্মুখ না থাকায়, সেই জাতির লোকদিগের মধ্যে একতা, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা সংস্থাপিত হয়। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম বলিয়া, সকলেরই মনে একটা শ্রদ্ধা জন্মে, এবং সঙ্কল্পিত কামনা সফল করিবার নিমিত্ত পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস করিয়া, সকলেই কায়মনোবাক্যে তদনুকূল আচরণ করিতে থাকে, এবং অচিরাৎ এই সমস্ত গুণের সহযোগে মহত্ত্ব লাভ করে। প্রাচীন গ্রীস, রোম, আরব, ভারতবর্ষ এবং বর্ত্তমান ইংলণ্ড ইহার উদাহরণস্থল।

গ্রীস্—প্রাচীন গ্রীকেরা জগতের মধ্যে এক অপূর্ব্ব জাতি ছিল। কোন্ জাতিই আজি পর্য্যন্তও ইহাদিগের তুল্য মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে নাই। বুদ্ধি, বিক্রম, সাহস, বিদ্যা, শিল্প, সাহিত্য এবং দর্শন, সকল বিষয়েই ইহারা অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছে। ইহাদিগের কীর্ত্তি দেখিয়া, আজি পর্য্যন্তও পৃথিবীর সমস্ত লোক চমৎকৃত হয়। আজকাল যে সকল ইউরোপীয় জাতিদিগের এত প্রাদুর্ভাব, তাহারাও অনেক বিষয়ে সেই গ্রীকদিগের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কাব্য, শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতি অনেক বিষয়ে এখনও ইহাদিগের ছায়া অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। গ্রীকেরা এই অনুপম মহত্ত্ব অতি অল্পকালের মধ্যেই লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টের প্রায় ৪৯০ বৎসর পূর্ব্বে তাহাদিগের উন্নতি আরম্ভ হয়, এবং খৃষ্টের ৩২৩ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা সংসারলীলা সম্বরণ করে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা যে সকল কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছে, সে সকল ভাবিয়া আথিনীর ধ্যান করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

গ্রীকদিগের মহানুভাবতা এবং উৎকর্ষপ্রিয়তাই এই অপূর্ব্ব উন্নতির প্রধান কারণ। উৎকর্ষজনিত আনন্দই যেন তাহাদিগের একমাত্র বাঞ্ছনীয় পদার্থ ছিল। তাহাদিগের মন ক্ষুদ্র বিষয়ে ধাবিত হইত না এবং যখন যে বিষয়ের প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ জন্মিত, তাহার সম্পূর্ণ উৎকর্ষ সম্পাদন না করিয়া, তাহারা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইত না। কাব্য, নাটক, শিল্প, দর্শন, ন্যায়, বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং যুদ্ধকৌশল, যখন যাহাতে মনোনিবেশ করিয়াছে,

তখনি তাহারা তাহার একশেষ করিয়া ছাড়িয়াছে। শিল্প-নৈপুণ্যে প্রস্তরের পরুষভাব দূর করিয়া, এরূপ কোমলাঙ্গ মূর্ত্তি এবং গৃহাদি প্রস্তুত করিয়াছিল যে, দুই সহস্র বৎসর গত হইল, আজিও সেই সকল প্রস্তরময়ী প্রতিমা এবং গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দেখিয়াও, নয়ন মন বিস্ময়রসে মুগ্ধ হইতে থাকে। তাহাদিগের ইতিহাস, দর্শন, এবং নাটকাদি আজিও ইউরোপখণ্ডে আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তাহারা নিজে অতি সুশ্রী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল, এবং সকল বিষয়ের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করাই যেন, তাহাদিগের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিরাও সেইরূপ মহাশয় এবং মহানুভব ছিলেন। আলেকজণ্ডরের জড়ব্রহ্মাণ্ড জয় করিবার ইচ্ছা এবং অরিস্ততলের মনোব্রহ্মাণ্ড করতলস্থ করিবার ইচ্ছা, উভয়ই তুল্য এবং তাঁহারা উভয়েই স্ব স্ব অভিপ্রেত বিষয়ে অলোকসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহাদিগের পণ্ডিতমণ্ডলী জ্ঞানের জ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল আলোকময় করিয়াছিলেন। সে জ্যোতি আজিও অপ্রতিহত হইয়া, ভূমণ্ডলে প্রদীপ্ত রহিয়াছে। যে সক্রেতিস্ জ্ঞানার্জ্জন এবং জ্ঞান বিতরণের জন্য বিষ ভক্ষণে অপমৃত্যু স্বীকার করিয়াছিলেন, পৃথিবীর সকল লোকে আজিও তাঁহাকে নমস্কার করিতেছে। মহামতি প্লেটোর নিকট আজিও লোকে সমাদরে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে, এবং পণ্ডিতমণ্ডলী অক্ষয়কীর্ত্তি আরিস্ততলের বাক্য আজিও শিরোধার্য্য করিতেছেন।

গ্রীকদিগের সাহস, বীর্য্য এবং রণনৈপুণ্যও ইহার অনুরূপ ছিল। যেদিন পারসীক সম্রাট গ্রীকদিগের পবিত্র মাতৃভূমিতে পদার্পণ করিয়া, তাহাদের মর্ম্মগ্রন্থিতে দারুণ প্রহার করেন, সেইদিন অবধি উহাদিগের সৌভাগ্য-সূর্য্য সহস্র কিরণ বিস্তার করিয়া উদয় হইয়াছিল। কেবল আথিনীয়েরাই দশ হাজার সৈন্য লইয়া, মারাথনক্ষেত্রে দুই লক্ষ পারসীককে পরাজয়, এবং তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া, অনতিবিলম্বে তাহাদিগের রাজ্য আক্রমণ করে। থার্ম্মপলির যুদ্ধের কথা স্মরণ হইলে সর্ব্বশরীরে লোমহর্ষণ হয়। সেই আত্মঃস্মরণীয় গিরিসঙ্কটে কেবল তিন শত জন স্পার্টীয় বীরপুরুষ উদ্বেল সাগর তরঙ্গ-সদৃশ বিপক্ষ সেনাকে সুদীর্ঘ কাল প্রতিরোধ করিয়া, সম্মুখ সমরে শয়ন করে। সেইদিন হইতেই গ্রীকদিগের উন্নতি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং উহারা বল, বুদ্ধি, বিদ্যা এবং সভ্যতায় অদ্বিতীয় হইয়া, মাতৃভূমিকে নানাবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া, জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

রোম—বাহুবল গৌরব ও অর্জ্জনস্পৃহা হইতে যে মহত্ত্বের উদয় হয়, প্রাচীন রোমকেরা তাহারই উদাহরণ স্থল। বীরত্ব, সাহস এবং রাজনীতিকুশলতায়, কি প্রাচীন, কি বর্ত্তমান, কোন জাতিকেই ইহাদিগের তুল্য দেখিতে পাওয়া যায় না। জগতের মধ্যে রোম নগরী অদ্বিতীয় হইবে, রোমনগরবাসীর নাম, আর ক্ষিতিনাথের নাম, অভিন্ন হইবে, লাটিন জাতির বাহুবল ও পরাক্রমে ধরাতল শঙ্কিত হইবে, ইহাই উহাদিগের মহাসঙ্কল্প ছিল। এই সঙ্কল্পের সাধন জন্য, উহারা ধন প্রাণ নষ্ট করিয়া, অর্দ্ধভাগেরও অধিক বসুমতী জয় করিয়াছিল। পূর্ব্বদিকে পারথিয়া (এক্ষণকার পারস্য এবং কাবুল,) পশ্চিমে হিস্পানী, (এক্ষণকার স্পেন এবং পর্টুগেল,) উত্তরে দানুমাকুল (এক্ষণকার জর্ম্মণ রাজ্য,) এবং আরো উত্তরে বৃটনদ্বীপ (আধুনিক ইংলণ্ড,) এবং দক্ষিণে সমস্ত উত্তর আফ্রিকা, রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। প্রায় এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এই বিপুল সাম্রাজ্যে রোমকেরা একচ্ছত্রে আধিপত্য করে। উহাদের শাসনপ্রণালী অতি পরিপাটী ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল এবং রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইত। এই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষ হইতে এক্ষণে কত শত প্রধান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাদিগের ব্যবহারশাস্ত্র এবং ব্যবহারজ্ঞদিগের ব্যবস্থা এক্ষণে সমস্ত ইউরোপখণ্ডে আলোচিত হয়। রোমকদিগের ঐক্য, একাগ্রতা এবং অধ্যবসায় যে, কিরূপ ছিল, তাহা ইহা দ্বারাই উপলব্ধ হইতে পারে।

আরব—আরবেরা প্রভৃত ধর্ম্মানুরাগ হইতেই মহত্ত্ব লাভ করে। খৃঃ ৫৭০ অব্দে মহম্মদের জন্ম হয়। মহম্মদ জন্মিবার পূর্ব্বে আরবেরা অসভ্য, শ্রীভ্রষ্ট ও যাযাবর ছিল। প্রণালীবদ্ধ সমাজের নিয়মাধীন ছিল না। পরস্পর অসম্বদ্ধ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র দলভুক্ত হইয়া, যাহার যেখানে ইচ্ছা বাস করিত। তাহাদের মধ্যে কোন কোন দল, নগর, গ্রাম কিম্বা পল্লীতে থাকিয়া, বাণিজ্য ব্যবসায় এবং কৃষিকার্য্য দ্বারা দিনপাত করিত; কিন্তু অনেকেই কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বা দেশে স্থায়ী হইয়া বাস করিত না। বিবাদ, বিসম্বাদ এবং শ্রমশীল জাতিদিগের প্রতি অত্যাচারে রত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এই অসভ্য অসম্বদ্ধ মানবদিগকে মহম্মদ, এক অলৌকিক ধর্ম্মসূত্রে বন্ধন করিয়া যান। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিবলে একখানি অদ্ভুত গ্রন্থের সৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে এরূপ ঐক্য এবং একাগ্রতা সংস্থাপন করেন, যে নিমেষকাল মধ্যে, সেই অসভ্য শ্রীভ্রষ্ট আরবেরা ঘৃতসিক্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া, সমস্ত বসুন্ধরাকে উদরসাৎ করে। পৃথিবীর যাবতীয় রাজ্য প্রায় রণদুর্দ্দ আরবদিগের হস্তে নিপতিত হয়। এইরূপে বহুকাল উহারা গৌরবের সহিত পৃথিবীতে একাধিপত্য করে। এখনও ইউরোপ, আসিয়া, এবং আফ্রিকা খণ্ডের বহুতর স্থানে মুসলমানদিগের নাম ও আধিপত্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে। মহম্মদ যে কোরাণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আজিও তাহা ভূমণ্ডলের কোটি কোটি লোককে শাসন করিতেছে। আর সকল ধর্ম্মই প্রায় অন্তঃসারহীন হইয়া পড়িয়াছে; মুসলমান ধর্ম্ম এখনও সজীব আছে। পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আরবেরা কেবল রণকুশল এবং যুদ্ধপ্রিয় ছিল। তাহাদের মধ্যে সাহিত্য, শিল্প এবং গণিতাদির বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। ফলে, কোন একটি প্রবল মনোবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া, একবার সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারিলে, সমাজের শ্রীবর্দ্ধক সকল বিষয়ই আপনা হইতে উন্নত এবং পরবর্দ্ধিত হয়। আরব্য ইতিহাস দ্বারা আরো একটি বিষয় প্রতিপন্ন হইতে পারে। কেবল বলিষ্ঠ; তেজস্বী এবং স্বাধীনতাপ্রিয় হইলেই মনুষ্য জাতির মহত্ত্ব হয় না। আরবেরা আজন্ম মহাবলবান্ এবং স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল; আসুরীয়, মিদি প্রভৃতি কোন জাতিই বহু আয়াসেও তাহাদিগের স্বাধীনতা লোপ করিতে পারে নাই, তথাপি যতদিন মহম্মদ ধর্ম্মসূত্রে তাহাদিগের একতাবন্ধন না করিয়াছিলেন, এবং অনন্যকাম করিয়া, তাহাদিগকে এক মহাসঙ্কল্পে ব্রতী করিতে না পারিয়াছিলেন, ততদিন তাহারা মহৎ হইতে পারে নাই।

ভারতবর্ষ—প্রাচীন ভারতনিবাসীরা যে কিরূপ উন্নত, প্রতিভান্বিত এবং সমৃদ্ধ ছিল, তাহা পাঠকগণকে বিশেষ করিয়া জানাইবার প্রয়োজন নাই। আমরাই সেই প্রতিষ্ঠিত আর্য্যবংশের ধ্বংসাবশেষ। এক্ষণে হেয় অপকৃষ্ট, অপদার্থ, অক্ষম এবং অসার হইয়াছি। তথাপি সেই শ্রেষ্ঠ জগন্মান্য মহামতি পূর্ব্বপুরুষদিগের কথা স্মরণ করিলে, এখনও হৃদয়-শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এখনও সেই মহাত্মাদিগের কীর্ত্তি ও গৌরব ভাবিয়া, অনেক সময়ে তাপিত হৃদয়কে শীতল করিতে হয়। কিন্তু সেই মহাপুরুষদিগের মহত্ত্বের কারণ কি, তাহা আমরা কতবার অনুসন্ধান করিয়া থাকি? ইদানী ব্রাহ্মণদিগকে নিন্দা, এবং তাঁহাদিগকে এদেশ উৎসন্ন করিবার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা, একটি প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কাহাদিগের কীর্ত্তিতে ভারত নাম এখনও ভূমণ্ডলে সজীব আছে, সে কথা আমরা একবারও ভাবি না। ভারতের পুরাবৃত্ত নাই; কিন্তু যৎসামান্য যাহা আছে, নিবিষ্টচিত্তে তাহারই আলোচনা করিলে, সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ব্রাহ্মণেরাই সেই মহত্ত্বের একমাত্র কারণ ছিলেন। অনিবার্য্য জ্ঞানতৃষ্ণায় অধীর হইয়া, তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। সংসারের বিলাসবাসনা সমাজের অন্যান্য জনগণকে সমর্পণ করিয়া, তাঁহারা কেবল জ্ঞানান্বেষণ এবং বিদ্যার উপাসনাকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া, বনে বনে দারুণ কষ্টে কালাতিপাত করিতেন। জ্ঞানের আলোক কিসে পৃথিবীতে দিন দিন সমধিক উজ্জ্বল হইবে, ইহাই তাঁহাদিগের ধ্যান, চিন্তা এবং কামনার বিষয় ছিল। এই অনুপম অধ্যবসায় এবং জিতেন্দ্রিয়তা গুণে তাঁহারা অভিলষিত বিষয়েও অপরিসীম মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বেদ, বেদান্ত, সাহিত্য ও দর্শন এখনও পৃথিবীর পণ্ডিতকুলের বিস্ময়জনক হইয়া রহিয়াছে। এই ব্রাহ্মণমণ্ডলীর প্রতি অবিচলিত ভক্তিই তৎকালীন সমাজবন্ধনের একমাত্র দৃঢ় সূত্র ছিল। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সকলেই একমত, একোদ্যোগী হইয়া ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ-

দিগের প্রতিষ্ঠিত পূজ্য শাস্ত্রকলাপকে রক্ষা করিবার জন্য জীবন সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও আনন্দ অনুভব করিত। এস্থলে আমাদিগের বলিবার এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, মাতৃভূমিস্নেহ এবং বাহুবল গৌরব প্রভৃতি অন্যান্য প্রবৃত্তি তৎকালে সমাজমণ্ডলীকে সংস্পর্শ করিত না। সে সকল কারণ যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। কিন্তু যে প্রবৃত্তির প্রাধান্যে তৎকালের জনসমাজ একমত ও একোদ্যোগী হইয়া কার্য্য করিত, আমাদিগের বিবেচনায়, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অবিচলিত ভক্তিই তাহার মূল হেতু, এবং ব্রাহ্মণদিগের নিরতিশয় জ্ঞানতৃষ্ণাই প্রাচীন ভারতবাসীদিগের মহত্ত্বের অদ্বিতীয় কারণ। কালধর্ম্মে ব্রাহ্মণেরা মতিচ্ছন্ন হইবার পর, এদেশ উৎসন্ন হইয়াছে। কিন্তু যে কোন প্রবৃত্তিরই প্রাধান্যে জাতিবিশেষের মহত্ত্ব হউক না কেন, তাহার হ্রাস হইলেই সেই জাতির অধোগতি হইবে। কিসে যে সেই হ্রাস হয়, তাহা নির্ণয় করা মনুষ্যবুদ্ধির অসাধ্য। কিন্তু কোন একটি প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার না করিলে, সমাজের যে উন্নতি হয় না, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ড—অর্জ্জনস্পৃহার প্রাধান্য হইতেই এই দেশের মহত্ত্ব হইয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই দেশে অর্জ্জনস্পৃহা উত্তেজিত হইয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ পরস্বাপহারী দুর্দ্দান্ত নর্ম্মাণ জাতি, ইউরোপের উত্তরখণ্ড হইতে আসিয়া, এদেশের আদিমবাসী সক্‌সনদিগকে পরাজয় করিয়া, তথায় বাস করে। কাল সহকারে নর্ম্মাণ এবং সক্‌সন জাতি মিলিত হইয়া, এক্ষণকার ইংরাজদিগের উৎপত্তি হয়। সহজেই নর্ম্মাণ জাতির দুরন্ত অর্জ্জনস্পৃহা উহাদিগকে অনেকাংশে আশ্রয় করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ড অতি ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় এবং অনুর্ব্বর দ্বীপ। মনুষ্যের জীবিকা নির্ব্বাহ এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী দ্রব্য সামগ্রী তথায় তাদৃশ সুলভ নহে। সুতরাং তাহার অন্বেষণে, উহাদিগকে পৃথিবীর নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কিরূপে সংসারযাত্রা স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইবে, প্রত্যেক ইংরাজেরই মনে আজন্ম এই চিন্তাটী বলবতী হইয়া আসিয়াছিল, এই চিন্তার অনুগামী হইয়া সকলেরই চিত্ত, ক্রমশঃ একদিকে ধাবিত হইতে লাগিল, সকলেরই বল, বুদ্ধি, যত্ন একপথাবলম্বী হইয়া উঠিল। উহাদের মধ্যে, সমধিক সাহসিক পুরুষেরা অল্প চেষ্টায় দুস্তর পারাবার অতিক্রম ও বিদেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগত হইতে থাকায়, সকলেরই মন ক্রমে বাণিজ্য পথে পরিচালিত হইতে লাগিল। অর্থোপার্জ্জনই উহাদিগের একমাত্র কাম্য এবং উপাস্য হইয়া উঠিল। সকলেই তখন নিরতিশয় উৎসাহের সহিত বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিরত হওয়ায়, বাণিজ্যলক্ষ্মী সদয়া হইলেন। সহিষ্ণুতা, সাহস, স্বাবলম্বন, অধ্যবসায় এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি যে সকল গুণ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিকর, তৎসমুদয় ক্রমশঃ ইংলণ্ডবাসীদিগের মনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতিগৌরব এবং স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার আধিক্য হইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে বাণিজ্যলক্ষ্মীর ঐকান্তিক উপাসনাই ইংলণ্ডের মহত্ত্বের মূলীভূত কারণ। ইংলণ্ডেশ্বরীর অতুল ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারমধ্যে অমূল্য রত্ন স্বরূপ যে ভারতভূমি, তাহাও ঐ অর্জ্জনস্পৃহার আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। এইরূপে ফরাসী, জর্ম্মাণ, স্পেন প্রভৃতি রাজ্যের ইতিহাস অন্বেষণ করিলে, আরো বহুল উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলতঃ কোন একটী প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া, তাহার চরিতার্থতা সাধনে কৃতসঙ্কল্প হওয়াই মনুষ্য জাতির মহত্ত্ব লাভের একমাত্র উপায়। পুরাকালে যে যে জাতি মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে, সকলেই এই অপরিহার্য্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াছে, এবং এক্ষণেও তাহাই ঘটিতেছে। কেবল ধনিষ্ঠ এবং বুদ্ধিমান্ হইলে অথবা কেবল মহৎ হইবার বাসনা করিলেই, মনুষ্য জাতি কখন মহৎ হয় না, এই কথাটী সর্ব্বদা আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। আমরা মহৎ হইতে বাসনা করিতেছি, কিন্তু যে নিয়মে মনুষ্য জাতি মহৎ হয়, তাহা অবলম্বন না করিলে, সকলই নিষ্ফল হইবে।

পরিশেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। অনেকেই আশঙ্কা করেন যে, ভারতবাসীরা আর কখন মহৎ হইতে পারিবে না। ইহা কত দূর সত্য, তাহার নির্ণয় করা, মনুষ্য বুদ্ধির অসাধ্য। একবার এক জাতির উন্নতি হইয়া গেলে, সেই জাতি আবার সৌভাগ্যশিখরে

আরোহণ করিতে পারে কি না, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, তিনিই তাহা অবগত আছেন। কিন্তু তাহা না হইবার পক্ষে আপাততঃ কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে নিয়মে একবার মহৎ হইয়াছিল, সেই সকল নিয়মাবলী পুনর্ব্বার সমবেত হইলে,আবার মহৎ হইতে পারে। পরন্তু বর্ত্তমান কালেও ইহার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখা গিয়াছে। প্রাচীন রোমেকদিগের কীর্ত্তিমন্দির যে ইতালীদেশ, তাহা বহুকালাবধি হতশ্রী এবং হীনাবস্থ হইয়াছিল; কিন্তু সম্প্রতি পুনরায় সেই দেশের লোকেরা একমত হইয়া একটি প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করায়, পুনরায় সেই দেশ প্রতিভান্বিত হইয়া, জনসমাজে গণনীয় হইয়াছে। ভারতভূমির পুনরুত্থানের পক্ষে অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য, ইহা বহু বিস্তৃত দেশ এবং ইহার মধ্যে অনেক জাতি, অনেক ভাষা এবং অনেক ধর্ম্ম প্রবল আছে। তথাপি সম্যক্ উপযোগী একটী প্রবৃত্তি, সকলের মনকে আকর্ষণ করিলে, এই সমস্ত লোক যে এক সঙ্কল্পে ব্রতী হইতে পারে না, আমরা এরূপ আশঙ্কা করি না। ভাল, তাহা না হইলেও, ইহার মধ্যে কোন একটী জাতি যে পুনরুত্থিত হইয়া, সমুদায় ভারতভূমিকে উজ্জ্বল করিতে পারিবেন না, তাহার কোন হেতুই দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন গ্রীক অঞ্চলও এইরূপ বহুসংখ্যক নগরীতে পরিপূর্ণ ছিল; তথাপি আথিনীয়েরা গ্রীক নামের সার্থকতার নিমিত্তে কি না করিয়াছে। ভারতভূমির এক্ষণকার এই সকল বিবিধ জাতির মধ্যে কোন্ জাতির যে পুনর্ব্বার ভাগ্যোদয় হইবে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু কোন জাতিরই হতাশ হইয়া, নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নহে। সকলেরই প্রকৃতবিধানে স্বীয় স্বীয় উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক;—কেবল মহৎ হইবার বাসনা করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।

শ্রীশ্রী৺কঙ্কালী পীঠ।

[শ্রীক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়]

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে বোলপুর ষ্টেশনের উত্তর-পূর্ব্বাংশে পাঁচ মাইল ব্যবধানে কোপাই নদীর তীরে ৺কঙ্কালী মহাপীঠ, স্মরণাতীত কাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পীঠস্থানের দেবীর নাম দেবগর্ভা, ভৈরবের নাম রুরু। সতী কঙ্কাল (কাঁকালি অংশ) এস্থানে পতিত হওয়ায় ইনি কঙ্কালী নামে অভিহিত। কোপাই নদীর দক্ষিণে (অনতিদূরে) একটী গভীর কুণ্ড মধ্যে দেবীর শ্রীমূর্ত্তিবোধক প্রস্তরখণ্ড পঙ্ক নিমগ্ন রহিয়াছে। এবং কুণ্ডের অনতিদূরে দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে ভৈরব মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন।

ইহা ব্যতীত ভৈরব মন্দিরের দক্ষিণাংশে গগনস্পর্শী শিরিষ বৃক্ষতলে ষষ্ঠীদেবী, এবং পূর্ব্বাংশে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মন্দিরে "কাঞ্চিশ্বর" (১) নামে শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। এই কাঞ্চিশ্বর ও ভৈরবনাথের মন্দির দুইটী স্থানীয় আমডহরা-নিবাসী জনৈক ভক্ত ৺শঙ্করসিংহ মহাশয় সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

এই পীঠস্থানটী স্বাভাবিক শোভায় ও গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। দেবীর অধিষ্ঠানভূত কুণ্ড সংলগ্ন (কোপাই নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত) আন্দাজ দুই শত বিঘা ভূমি ব্যাপী একটী নিবিড় অরণ্য। এই বনভূমির (২) পশ্চিম ও উত্তর দিক বিধৌত করিয়া কোপাই নদী মন্থর গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। তজ্জন্য এই স্থানটীর নৈসর্গিক শোভা অতীব মনোরম। যখন এই সকল বন-বৃক্ষের কুসুমদাম বিকসিত ও নানাবিধ লতাকুল কুসুমিত হইয়া সুগন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিতে থাকে, তখন ইহার অনির্ব্বচনীয় রমণীয়তায় ভক্তি ও আনন্দে হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠে। এমন বিবিধ বৃক্ষলতা সমাকুল নয়ন-মন-বিমোহন

(১) ইনি কাঞ্চিদেশের পূজিত বলিয়া কাঞ্চিশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছেন।

(২) এই স্থানে কোপাই নদী উত্তরবাহিনী হইয়াছে।

সেবস্থান সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন মানবশূন্য পীঠস্থান দর্শন করিলে, নিতান্ত ধর্ম্মজ্ঞানহীন মূঢ় ব্যক্তিরও হৃদয়ে অপূর্ব্ব দৈব ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। কঙ্কালী কুণ্ডের পূর্ব্ব দিকে মহা শ্মশান, উত্তরে কোপাই নদী, দক্ষিণে উন্মুক্ত প্রান্তর, পশ্চিমে শ্যাম শাখা পল্লব দলমণ্ডিত মনোরম অরণ্য উন্নত মস্তকে মায়ের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

কঙ্কালী কুণ্ডে কখনও জলাভাব হয় না। এবং উহা যে কত কালের, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু এত কালেও ইহার আকৃতিগত কোন পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না। প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তির দুই দিন পূর্ব্বে স্থানীয় ব্রাহ্মণদের দ্বারা এই কুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার হয়; এই সময় দেখা যায় দেবীর প্রস্তর মূর্ত্তি পঙ্ক মধ্যে প্রোথিত রহিয়াছে। কুণ্ডের বায়ু ও নৈঋত কোণে দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুরঙ্গ আছে, পঙ্কোদ্ধারের পর ঐ সুরঙ্গ মুখের পঙ্ক উন্মুক্ত করিয়া দিলে তাহা হইতে জল নির্গত হইয়া কুণ্ডটী পূর্ণ হইয়া যায়। প্রবাদ, ইহা কাশীর ভাগীরথীর সহিত সংযোগ আছে। দেবীর উদ্দেশে সকলেই এই কুণ্ড মধ্যে পূজাদি করিয়া থাকেন; এবং প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে সাধারণের দ্বারা মহা সমারোহে দেবীর পূজার্চ্চনা হয়। এই সময় দেশ বিদেশ হইতে অসংখ্য পুজোপহারাদি সমাগত হইয়া থাকে, এবং নানাবিধ ফল মূল, মিষ্টান্ন, ও শঙ্খ বস্ত্রাদি দেবীর উদ্দেশে এই কুণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং কুণ্ডের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি ছাগ মেষাদি বলির রক্তে প্লাবিত হইয়া যায়। এই উপলক্ষে এ স্থানে সপ্তাহাধিক কালব্যাপী একটী মেলা বসিয়া থাকে।

কুণ্ডের পূর্ব্ব দিকস্থ নদী তীরবর্ত্তী মহাশ্মশানে এতদঞ্চলের সমুদায় শব দাহ হইয়া থাকে। এই স্থানের দৃশ্য অতীব ভয়াবহ। চিতা চুল্লী সকল মৃতের দেহাবশেষ ভস্ম স্তূপে পরিপূর্ণ, এবং মৃতের শয্যা, উপাধান ও শ্মশান-কলস আদিতে সমাচ্ছন্ন। ফলতঃ, কঙ্কালী পীঠের এই করাল মধুর ভাব একবার দর্শন করিলে বর্ণনা দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা।

এই প্রসিদ্ধ পীঠস্থানে কত কত মহাপুরুষ তপশ্চারণ করিয়াছেন, এবং আজিও কত মহাত্মা করিয়া থাকেন। কঙ্কালী কুণ্ডের পূর্ব্ব পাহাড়ে একটী প্রাচীন বিল্ব বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এই, কোন সময় এই বীরভূম জেলার অন্তর্গত খোস্ কদম্বপুর গ্রাম নিবাসী ৺নিরঞ্জন (নীরন) ঘটক মন্ত্র সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন, এবং দেবীর দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হন্। তিনি তপস্যা কালে এস্থানে বিল্ব কাষ্ঠের কীলক প্রোথিত করিয়া চরু পাক করিয়াছিলেন, উক্ত চরু পাকের কীলক হইতে এই বিল্ব বৃক্ষটী উৎপন্ন হইয়াছে।

শিল্পী।

[শ্রীমাধবচন্দ্র মিত্র]

(১)

রস্তা ষ্টেষণে যখন গাড়ী থামিল তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। মালপত্র গোছাইয়া ডাক-বাঙ্গালার সন্ধানে যাইতে যাইতে রাত্রি হইয়া গেল। রাত্রির আহার সমাপন করিয়া ভ্রমণের ক্লান্তি অপনোদনের জন্য যখন কিশোরীমোহন শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাইতেছিল, তখন ত্রাস্তভাবে তাহার স্ত্রী সুরসুন্দরী আসিয়া বলিল, "আমার বড় ভয় ক'চ্ছে, জায়গাটা ভাল নয়, একলা আমি পাশের ঘরে শুতে পারব না।"

কিশোরী স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়া বলিল, 'ভয় কি, বাইরে ত বেয়ারা দারোয়ান সব আছে।'

সুর স্বামীর বিছানার উপর বসিয়া কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, 'এ বাড়ীতে আর একটা লোক আছে ও দিকের ঘরে, দেখনি তুমি? চিঠি লিখে বেয়ারাকে যখন দিতে যাইয়ে গিছ্লুম, সেই লোকটা আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল; তার চোকটা বড় ভাল নয়।'

কিশোরী মৃদু হাসিয়া স্ত্রীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল, "আমি তোমায় এত দিন বলি নি, তুমি বাস্তবিক ভারী সুন্দরী!"

লজ্জায় সুরর মুখ ঈষৎ আরক্তিম হইয়া উঠিল।

কিশোরী নীরব হইয়া রহিল, কোন কথা বলিল না। বিবাহের পূর্ব্বেও যখন সুরর সহিত কিশোরীর পরিচয় ছিল, তখনও তাহার এই দুর্ব্বলতা কিশোরী লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে, এবং যখনই তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার দরকার মনে করিত, সে তাহার এই অব্যর্থ শর সন্ধান করিত।

সুর স্বামীর পার্শ্বে আপনার দেহভার বিন্যস্ত করিয়া বলিয়া উঠিল, 'আর আমি কোথায়ও যেতে পারব না, এখানেই শুয়ে প'ড়লুম।'

কিশোরী কোন কথা না বলিয়া স্ত্রীকে আপনার উপাধানের অংশ দান করিল।

(২)

ভোরে উঠিয়াই চিল্কাহ্রদ দেখিতে যাইতে হইবে। নৌকা ঠিক করা হইয়াছিল, কিন্তু কে সঙ্গে যাইবে, এই কথা যখন কিশোরী চিন্তা করিতেছিল, ডাক-বাঙ্গালার বারাণ্ডায় একটা লোক উঠিয়া নমস্কার জানাইল। সুর ত্রস্তভাবে একদিকে সরিয়া গিয়া লোকটার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কিশোরী বলিল, 'তা ভালই হ'ল, আপনি যখন এখানে অনেক দিন আছেন, জায়গাটার সঙ্গে পরিচয় আছে বেশী আপনার।'

আগন্তুক মৃদুস্বরে বলিল, 'আমি ত এখানেই থেকে অনেক ছবি এঁকেছি, কাগজে দেখেন নি কি?'

কিশোরী একটু দ্রুতবেগে বলিয়া উঠিল, 'ও, ও, আপনাকে চিনেছি, 'মুরলী' কাগজে আপনার চিল্কাহ্রদের কতকগুলি ছবি বেরিয়েছিল, আমার স্ত্রী তা' দেখে ভারী খুসি হ'য়ে যান। তাঁর ইচ্ছেতেই আমি এখানে এসেছি। আপনার খুব প্রশংসা ক'রলেন তিনি।'

কিশোরী স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'ওগো, অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন, এই যে তোমার সেই শিল্পী, পরিচয় ক'রে দেই।'

সুর মৃদু পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া একটু সঙ্কোচের সহিত দাঁড়াইয়া রহিল।

কিশোরী বলিল, 'আপনার নাম কাগজে বেরিয়েছিল সুরপতি, সেইটেই কি ঠিক?'

সুরপতি পরিষ্কার গলায় বলিল, 'হাঁ, ঐ নামটাই আমার।'

সুর মুহূর্ত্তের জন্য একটু কাঁপিয়া উঠিল।

(৩)

চিল্কাহ্রদ দেখিতে যখন সকলে বাহির হইয়া পড়িল, সুরপতি আপনার চিত্রাঙ্কনের বাক্সটী সঙ্গে লইল।

কিশোরী বলিল, 'আমি একটা ক্যামেরা নিচ্ছি, ভাল দৃশ্য পেলে তুলে নেব।'

সুরপতি মৃদু হাসিয়া বলিল, 'এখানে ত তেমন ভাল দৃশ্য পাবেন না, তবে এ সৌন্দর্য্য যার চোখে লাগে; কন্দর্পদেব তাই অন্ধ হ'য়ে ব'সে আছেন, কার পরশ পেয়ে যে তিনি শিউরে ওঠেন, এইটে বোঝা বড় দুষ্কর।'

সুর নৌকার একদিকে বসিয়াছিল; সে একবার চোখের কোণে এই বাক্যচতুর লোকটাকে দেখিয়া লইল।

কিশোরী বলিল, 'আপনি এই সব দৃশ্য হ'তে কি ক'রে ভাল ছবি আঁকেন?'

সুরপতি একটু গর্ব্বের হাসি হাসিয়া বলিল, 'মনের ছবি যেখানে ফুটে ওঠে সেখানে কি আর বাহিরের ছবির দরকার হয়; বাহিরের ছবিই ত আমাদের মনের ভিতর ছাপ মেরে র'য়ে যাচ্ছে।'

কিশোরী বলিল, 'আপনি একবার দেখেই কি কিছু আঁকতে পারেন?'

সুরপতি বলিল, 'হাঁ, পারি বই কি, যদি একবার মনের ভিতর দেখবার জিনিষকে ভাল ক'রে ধ'রে নিতে পারি।'

কিশোরী তাহার স্ত্রীর ছবি আঁকিবার জন্য সুরপতিকে অনুরোধ করিল। সুরপতি হাসিয়া বলিল, 'সে ত আমার সৌভাগ্য।'

দিন স্থির করিয়া সুরপতি ছবি আঁকিতে বসিয়াছে। দুই তিন দিনে ছবি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সেদিন কিশোরী কি একটা কাজের জন্য বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। বাহিরে বেড়াবাড়া বসিয়া কিমাইতেছিল।

সুরপতি ছবি আঁকা ফেলিয়া কিছু সময়ের জন্য সুরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। সুর চমকিয়া উঠিল।

সুরপতি অঙ্কিত ছবির দিকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিয়া দেখিয়া বলিয়া ফেলিল, 'কোন্‌টা সত্য?' অঙ্কিত ছবি-খানি যেন তাহার কাছে অনেক মধুর লাগিতেছে। সুরর মুখের দিকে চাহিয়া সে একবার হাসিল। ভয়ে সুররর মুখ বিবর্ণ হইয়া আসিল। সুরপতি যখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন সুররর চক্ষু ভয়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে। এ কয়-দিন সুরপতি ছবি আঁকিতেছে; অন্য দিন কিশোরী উপস্থিত ছিল, কিন্তু তবু সুররর মন, এই অপরিচিতের নিষ্পলক দৃষ্টির কাছে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া থাকিত। আজ তাহার মনের ভয় মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

সুরপতি বিরক্তির সঙ্গে দেখিল, যে মুখখানি ছবিতে ফুটাইতে সে এত পরিশ্রম করিয়াছে সে বৃথা; সে কোন্ অসত্যের আশ্রয় লইয়াছে; চিরদিনই কি সে এমনি করিয়া এই মিথ্যাকে অমর করিয়া রাখিতে চায়; সে অনিত্য আপনার গতি অবলম্বন করিয়াছে।

কিশোরী ঘরে ঢুকিয়া দেখে সমাপ্তপ্রায় ছবিখানি দীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে; সুরপতি সেখানে নাই!

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

আবেস্তা সাহিত্যে দণ্ডনীতি।

আমাদের মনুসংহিতা মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে দণ্ডনীতি যেমন ধর্ম্মনীতির অংশ মাত্র, আবেস্তা সাহিত্যেও তাহাই। আবেস্তা সাহিত্যে ধর্ম্ম হইতে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ধর্ম্মরক্ষার্থই রাজা, ধর্ম্মরক্ষার্থই রাজনীতি। সুতরাং ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিভিন্ন হইতে পারে না। সংস্কৃত সাহিত্যেও না, আবেস্তা সাহিত্যেও না। প্রাচীন কালে মিসর, গ্রীস প্রভৃতি সকল দেশেই একরূপ প্রথা ছিল। প্রাচীন মানবের শিক্ষা ও সভ্যতা ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন হয় নাই। ধর্ম্মছাড়া শিক্ষা, বা ধর্ম্ম-ছাড়া সভ্যতা আধুনিক ভারতবর্ষ ব্যতীত বোধ হয় কোথাও নাই। অসভ্য কাফ্রিজাতি, আরণ্য সাঁওতালজাতি, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্যজাতি, সকল জাতির মধ্যেই ধর্ম্মচিন্তা ও সভ্যতা অভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। ধর্ম্মচিন্তা একটা জিনিস এবং শিক্ষা বা সভ্যতা আর-একটা জিনিস—এ প্রকার চিন্তা বিশেষজ্ঞগণেরই নিজস্ব। সাধারণ লোকের চিন্তা ও কল্পনায় ধর্ম্মহীন যে, অসভ্য সে, অশিক্ষিত সে। সে যাহাই হউক, প্রাচীনকালে শিক্ষা ও দীক্ষা এক আচার্য্যের হস্তেই ন্যস্ত থাকিত এবং ধর্ম্মশিক্ষা ও কর্মশিক্ষায় বিশেষ প্রভেদ ছিল না। তাই রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি পরস্পর অভিন্নভাবে সম্পর্কে বিজড়িত।

আমাদের মনুসংহিতার ন্যায় পার্সীদিগের প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ 'বেন্দিদাদ্'। এই গ্রন্থে প্রাচীন পার্সীদিগের ইতিহাসের কথা এবং ধর্ম্ম ও রাজনীতিবিষয়ক বিধান-সমূহ তাঁহাদিগের পরমেশ্বর 'অহুরো মজ্‌দা' এবং ধর্ম্ম-প্রচারক 'জরথুস্ত্রে'র কথোপকথনচ্ছলে সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থখানি তাঁহাদিগের প্রধান ও অতি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র বা Law-book। ইহার অনেক পহ্লবী (Pehlevi) টীকা আছে। টীকায় মূলগ্রন্থের নানাস্থানে নানারূপ ব্যাখ্যা আছে। টীকা ও মূলগ্রন্থ সাধারণতঃ একসঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হয়। টীকাবিহীন মূলগ্রন্থকে 'বেন্দিদাদ্ সাদা' বলা হয়। এই গ্রন্থে স্বয়ং অহুরো-মজ্‌দার মুখনিঃসৃত বাণী লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া ইহা পার্সীদিগের নিকট আমাদের বেদের ন্যায় অতি পবিত্র। আমাদিগের যেমন শ্রুতি ও স্মৃতিতে ভেদ আছে, ইহাঁদের তাহা নাই। অবশ্য প্রাচীনতার তারতম্য আছে। পার্সীদিগের রাজনীতি বা আইন এই 'বেন্দিদাদ্' গ্রন্থের অনুমোদিত হওয়া চাই।

ইহাদের ধর্ম্মে, প্রত্যেক অপরাধের জন্য অপরাধীর দ্বিবিধ দণ্ড হয়; ঐহিক ও পারত্রিক। সুতরাং রাজসভা বা রাজশক্তির আদেশে যে দণ্ড তাহাই চরম নহে। ইহলোকে দণ্ডভোগ করিলেও পরলোকের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে দ্বিবিধ শ্রেণীবিভাগ—(১) 'পেশোতন্থ' অর্থাৎ কায়িক

দণ্ডভোগ বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যাহার নিবৃত্তি হয়, এবং (২) 'অনাপেরেথ' বা দণ্ডভোগ বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যাহার পাপক্ষালন হয় না। 'পেশোতনু' অপরাধসমূহ আবার গুরুত্ব অনুসারে সপ্ত-বিধ। এই অপরাধসমূহের প্রথম তিনটির নাম যথাক্রমে 'আগেরপ্ত', 'অবওইরিষ্‌ত' এবং 'অরেদুষ্‌'। অপরাধের মাত্রা অনুসারে দণ্ডেরও গুরুলাঘব হইয়া থাকে। বেত্রদণ্ডই প্রধান দণ্ড। তাহা আবার দ্বিবিধ। প্রথম শ্রেণীর বেত্রের নাম 'অশ্‌পহে-অশ্‌ত্র' ও দ্বিতীয় প্রকার বেত্রের নাম 'শ্রওষো-চরণ'।* অপরাধের মর্য্যাদা অনুসারে বেত্রাঘাতের সংখ্যা যথাক্রমে ৫, ১০, ১৫, ৩০; ৫০, ৭০, ৯০, ২০০। দ্বিবিধ বেত্রের দ্বারা আঘাত করা হয় বলিয়া প্রত্যেক সংখ্যাই আবার দ্বিগুণিত হইবে। গুরুদণ্ডের পরিমাণ হইল ২০০ বেত। এইরূপ পাপীকেই সাধারণতঃ 'পেশো-তনু' পাপী এবং 'তনু-পেরেথ' পাপ বলা হয়। এই দুইটি শব্দের অর্থ 'যে নিজের শরীর দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করে' এবং 'নিজের শরীর দান'। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে এটি মৃত্যুদণ্ড। পহ্লবী টীকাতেও বহু স্থলে 'পেশোতনু' শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে 'মর্‌-গর্‌-জান্‌' বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয়। কিন্তু বেন্দিদাদে স্বয়ং অহুরো-মজ্‌দা যে বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে 'পেশোতনু' দণ্ডের পরিমাণ ২০০ বেত।

যদি কেহ কাহাকেও প্রহার করিবার জন্য উদ্যত হয় তাহা হইলে সে 'আগেরেপ্ত' অপরাধ করে। যদি কোনও ব্যক্তি অপর কোনও ব্যক্তিকে প্রহার করিবার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে এবং প্রহার না করে, তাহা হইলে 'অবওইরিষ্‌ত' অপরাধ হয়। যদি কেহ প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রহার করে তাহা হইলে 'অরেদুষ্‌' অপরাধ হয়। 'আগেরেপ্ত' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে অস্ত্রধারণ; 'অবওইরিষ্‌ত' অস্ত্র নিষ্কাসন; এবং 'অরেদুষ্‌', ক্ষত-বিহীন আঘাত, অথবা যে ক্ষত তিনদিনের মধ্যে আরোগ্য হয় সেই-প্রকার ক্ষতবিশিষ্ট আঘাত। 'আগেরেপ্ত' অপরাধের দণ্ড ৫ বেত, 'অবওইরিষ্‌ত' অপরাধে ১০ বেত, 'অরেদুষ্‌' অপরাধে ১৫ বেত। ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধে গুরুতর দণ্ড; যেমন গুরু আঘাতে ৩০ বেত, শোণিতপাতে ৫০ বেত, অস্থিভঙ্গে ৭০ বেত, নরহত্যায় ৯০ বেত, তদপেক্ষা গুরু পাপে ২০০ বেত। অপরাধের পৌনঃপুনিকতায় দণ্ডের গুরুত্ব বাড়ে। 'আগেরেপ্ত' অপরাধ সাতবার হইলেই 'পেশোতনু' অপরাধের তুল্য ২০০ বেত দণ্ড হয়।

বেন্দিদাদে বর্ণিত বা বিহিত বিবিধ অপরাধের দণ্ডের বিচার করিতে গেলে আধুনিক রাজনীতির চক্ষে বড়ই বিচিত্র বোধ হয়। আমরা যাহাকে গুরু অপরাধ বলিয়া মনে করি বেন্দিদাদের নীতিতে তাহা হয়ত গুরু নহে; বেন্দিদাদে যাহাকে গুরু অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে আমাদের বিবেচনায় হয়ত তাহা অতি লঘু। মেষপালকের কুকুরকে অখাদ্য খাইতে দেওয়া নরহত্যা অপেক্ষা গুরু পাপ; নরঘাতকের দণ্ড ৯০ বেত, কিন্তু কুকুরকে অখাদ্য খাইতে দেওয়ার অপরাধে হইবে ২০০ বেত। যে ভূমিতে শব প্রোথিত করা হইয়াছে, শব প্রোথিত করিবার এক বৎসরের মধ্যে তাহাতে হলকর্ষণ করিলে পেশোতনু বা ২০০ বেত দণ্ড; সন্তান প্রসবের পর প্রসূতি জল-পান করিলে ২০০ বেত; রমণীর রজোরোধ করিলে ২০০ বেত; যে গৃহে কেহ মারা গিয়াছে সেই গৃহে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে ২০০ বেত; যদি কেহ মৃত-দেহ বাঁধিয়া না রাখে আর শকুনে তাহার অংশ লইয়া বৃক্ষ বা জল অপবিত্র করে, তাহা হইলে

---

* দণ্ডবিধানের সাধারণ ভাষা এইরূপ—" পুরোহিত বা 'শ্রওষা-বরেজ' (শ্রওষ—দেবরক্ষী অর্থাৎ দেবতাদিগের পুলিশ-কর্ম্মচারী, 'শ্রওষা-বরেজ্‌'=যে পুরোহিত 'শ্রওষ' নির্দ্দিষ্ট ঐহিক দণ্ডবিধান করেন) 'অশ্‌পহে-অশ্‌ত্র' দ্বারা এত বেত এবং 'শ্রওষো-চরণ' দ্বারা এত বেত মারিবেন।' সংস্কৃত ভাষায় 'অস্ত্র' শব্দে হস্তীকে প্রহার করিবার অঙ্কুশ বা 'ডাঙ্গস' বুঝায়। সুতরাং 'অশ্‌পহে অশ্‌ত্র' (=অশ্বস্য-অস্ত্রম্‌) বোধ হয় অশ্বচালনায় ব্যবহৃত হইত। ইহাতে রজ্জু সংলগ্ন থাকে। "শ্রওষো-চরণ' আধুনিক 'চাবুক'। সংস্কৃতে এই প্রকার পাপ ও তাহার দণ্ডের কথা আছে—'ষট্‌ ত্রিভির্গোচর্ম্মপাটঘাতৈঃ প্রায়শ্চিত্তম্‌ ভবতি তাবন্মাত্রম্‌', অর্থাৎ তিনটি গোচর্ম্মপাটঘাতের (চাবুক-আঘাতের) দ্বারা সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। বোধ হয় 'অশ্‌পহে-অশ্‌ত্র' ও 'শ্রওষো-চরণ' একই চাবুকের দ্বিবিধ নাম।

তাহার ২০০ বেত দণ্ড। মাটিতে মনুষ্যাস্থি নিক্ষেপ করিলে, অথবা দুই-খানি পঞ্জরের পরিমাণ কুকুরের মৃতদেহ ফেলিলে ২০০ বেত। বক্ষস্থ অস্থির ন্যায় বৃহৎ অস্থি নিক্ষেপ করিলে দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪০০ বেত; মানুষের মাথার খুলি ফেলিলে ৬০০ বেত এবং সমগ্র শবদেহই ফেলিলে ১০০০ বেত। অপবিত্র ব্যক্তি জল বা বৃক্ষ স্পর্শ করিলে ৪০০ বেত, মৃতব্যক্তির চরণ বস্ত্রাবৃত করিলে ৪০০ বেত, সমগ্র পদষষ্টি আবৃত করিলে ৬০০ বেত, সমস্ত দেহ আবৃত করিলে ৮০০ বেত। কুকুরের বাচ্চা মারিলে ৫০০ বেত, অপরিচিত কুকুরকে মারিয়া ফেলিলে ৬০০ বেত, গৃহ-কুকুরকে হত্যা করিলে ৭০০ বেত, মেষপালকের কুকুরকে হত্যা করিলে ৮০০ বেত, বন্‌হাপর কুকুরকে হত্যা করিলে ১০০০ বেত এবং জলচর কুকুরকে হত্যা করিলে ১০০০০ বেত। স্পষ্ট মৃত্যুদণ্ডের কথা কেবল মাত্র দুই স্থলে আছে। নবম ফর্গর্দে যে ব্যক্তি শৌচ বিধান জানে না সে শৌচ বিধানের জন্য পৌরোহিত্য গ্রহণ করিলে তাহার মৃত্যুদণ্ড হয়। তৃতীয় ফর্গর্দে আছে যে, যদি কেহ একক শবদেহ বহন করে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুদণ্ড হইবে। ইহা ছাড়া আর মৃত্যুদণ্ডের কথা স্পষ্টভাবে কোথাও নাই। এই-সকল দণ্ডের বিষয় ভাবিলে আমাদের মনে হয় যে, ইহাদের ধর্মগ্রন্থে নিতান্তই লঘু-পাপে গুরু-দণ্ড ও গুরু-পাপে লঘু-দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কিন্তু প্রাচীন আর্য্যধর্মের প্রাণস্বরূপ বিধানগুলির আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, নরহত্যা অপেক্ষা গুরু পাপ অনেক হইতে পারে এবং তাহার জন্য গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা আবশ্যক। কারণ নরহত্যায় একজন লোকের বিরুদ্ধে অপরাধ করা হয়। দেবতাদিগের নিকট অপরাধ করিলে সমগ্র মানবজাতির প্রতি অপরাধ করা হয়। সুতরাং তাহার গুরুত্ব অধিক। সমষ্টির তুলনায় ব্যষ্টির মূল্য অল্প হওয়াই স্বাভাবিক, ব্যষ্টি ত সমষ্টিরই অন্তর্গত। আর্য্যজাতিসমূহের মধ্যে সর্ব্বত্রই এই ভাব অল্পবিস্তর পরিদৃষ্ট হয়। মৃতদেহ ভূপ্রোথিত করার জন্য পার্সীদের যেরূপ দণ্ডের বিধান ছিল, ডেলসের (Delos) পবিত্র মন্দির শবদেহ দ্বারা দূষিত করিলে গ্রীকগণ তদপেক্ষা কঠোরতর দণ্ড ভোগ করিতেন। এথিনীয়গণের মধ্যে কুকুর মারা মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। বেন্দিদাদে বর্ণিত বিধানসমূহ আপাত-দৃষ্টিতে যতই বিচিত্র ও উপহাসাস্পদ বোধ হউক না কেন, অন্যান্য দেশের প্রাচীন ইতিহাস খুঁজিলে অনুরূপ ব্যবহার পাওয়া যাইবে, অবশ্য পারস্য বা ইরাণ দেশে এই প্রকার ব্যবহারের মাত্রাধিক্য হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

Theory বা মতবাদের হিসাবে এই দণ্ডনীতি-প্রথা উপহাসাস্পদ বা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত না হইলেও কার্য্যতঃ কোনও কালে এই প্রকার দণ্ডনীতি অনুসৃত হইয়াছে কি না সন্দেহ। মেষপালকের কুকুরকে বধ করিলে কখনও ৮০০ বেত দণ্ড হইয়াছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। জলচর কুকুর হত্যার অপরাধে ১০০০০ বেত আরও সন্দেহের কারণ। কারণ মানুষের সহ্য করিবার শক্তির একটা সীমা আছে। এরূপ দণ্ডের ব্যবস্থার স্বীকার করিতে হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে পৃথিবীর অন্য দেশের লোক এবং আধুনিক পারস্যদেশের লোকের শরীর অপেক্ষা প্রাচীন পারস্যের অধিবাসিগণের শারীরিক গঠন ও সহিষ্ণুতার কোনও একটা বৈচিত্র্য ছিল, যাহাতে, সব সহ্য করা যায়। Chardinএর সময়ে বেত্রদণ্ড তিন শতের উপরে উঠিত না। প্রাচীন জর্ম্মাণীতে দুই শতের অধিক এবং হিব্রু আইনে চল্লিশের অধিক বেত্রদণ্ড দেখা যায় নাই। ইহার অধিক সংখ্যা বোধ হয় কোন দেশেই ছিল না। ইরাণ দেশে আধুনিক যুগে বেত্রদণ্ডের পরিবর্ত্তে অর্থদণ্ড অনুমোদিত আছে। সম্ভবতঃ বেন্দিদাদের সময় হইতেই বেত্রদণ্ডের বিকল্পে অর্থদণ্ড চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু বেত্রদণ্ডের পরিবর্ত্তে অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা কাহার ইচ্ছায় হইত জানা যায় না—বিচারকের? না অপরাধীর? পহ্লবী 'রবাএৎ' গ্রন্থে ২০০ বেত=৩০০ ইস্তীর্=১২০০ দির্‌হেম=১৩৫০ টাকা। অর্থাৎ এক বেত=৬৲ টাকা।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত ত্রিবিধ—(১) অর্থদণ্ড, (২) প্রওবো-

চারণ, ও (৩) শৌচ। তৃতীয় বিধি ধর্ম্ম-সংক্রান্ত। ইহাতে অনুতাপের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়—তাহার নাম 'পতেৎ'। 'পতেৎ' করিলে ইহলোকের অপরাধ যায় না, ইহা পরলোকের দণ্ড নিবারণের জন্য বিহিত হইয়াছে। 'পতেৎ' বা প্রায়শ্চিত্ত বিধির অনুষ্ঠান করিলে ঐহিক দণ্ডের পরিমাণ কমে না—কিন্তু 'পতেৎ' না করিলে ঐহিক দণ্ড বাড়িতে পারে।

'অনাপেরেথ' বা প্রায়শ্চিত্তবিহীন পাপে ইহলোকে মৃত্যুদণ্ড ও পরলোকে নানা উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়। এরূপ পাপের মুক্তি নাই। এই পাপ মহাপাপ বা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুপাপ। (১) শবদাহ, (২) শবদেহকে ভূপ্রোথিত করা, (৩) মৃত দেহ বা তদংশ ভোজন, (৪) অনৈসর্গিক পাপ, (৫) ইচ্ছাপূর্ব্বক অস্বাভাবিক উপায়ে শারীরিক ক্ষতি সাধন প্রভৃতি অনাপেরেথ পাপ। এই-সকল পাপে কাহারও মৃত্যুদণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই বটে, তবে শাস্ত্রের বিধানে মৃত্যুদণ্ডই এ-সকল পাপের ঐহিক দণ্ড।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

—প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩২৯

রবার ও তাহার প্রস্তুত-প্রণালী।

আমরা প্রায়ই আজকাল যথা-তথা রবারের প্রস্তুত-দ্রব্যাদি দেখিতে পাই। রবার জিনিসটা যে গাছের আঠা হইতে প্রস্তুত হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন; কিন্তু তাহার প্রস্তুত-প্রণালী কিরূপ, তাহা বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত নহেন।

রবার-বৃক্ষ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; এবং তাহার মধ্যেও নানা জাতি আছে।

১ম শ্রেণী—ইউফরবিয়াসিয়া (Euphorbiaceæ)। ইহার ভিতর চারি জাতি আছে, যথা—

(ক) হিভিয়া (Hevea)

(খ) ম্যানিহট (Manihot)

(গ) সেপিয়াম (Sapium)

(ঘ) উরক্যানড্রাস (Urcandras)

২য় শ্রেণী—এপোসায়েনেসিয়া (Apocynaceæ)। ইহার মধ্যে পাঁচ জাতি, যথা—

(ক) ফুন্টুমিয়া (Funtiumia)

(খ) ল্যানডল্‌ফিয়া (Lanndolphia), ইহা এক প্রকার লতা।

(গ) ক্লাইটেণ্ড্রা (Clitandra)

(ঘ) হেনকর্ণিয়া (Hancornia)

(ঙ) ডায়েরা (Dyera)

৩য় শ্রেণী—আরটিকেসিয়া (Urticaceae)। ইহার মধ্যে দুই জাতি, যথা—

(ক) ফিকাস ইল্যাসটিকা (Ficus Elastica)। ইহাকে ব্রহ্মদেশে রামবং (Rambong) কহে।

(খ) ক্যাস্‌টিলোয়া (Castilloa)

৪র্থ শ্রেণী—কম্পোজিটে (Compositae)। ইহার মধ্যেও দুই তিন জাতি আছে। কিন্তু এগুলি সবই গুল্ম জাতীয়।

প্রথম-শ্রেণীর বৃক্ষগুলি প্রায় সবই দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে (ক), (খ) ও (গ) কেবল মাত্র আফ্রিকা দেশে জন্মে; (ঘ) দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল দেশে জন্মে, এবং (ঙ) মালয় উপদ্বীপে জন্মে। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে (ক) ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মলয় উপদ্বীপ, লঙ্কা, যবদ্বীপ এবং এসিয়ার অপরাপর স্থানে জন্মে; (খ) কেবলমাত্র মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকায় জন্মে।

এই সকল গাছের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর হিভিয়া গাছই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার চাষ আজকাল মলয় উপদ্বীপ, লঙ্কা প্রভৃতি দেশে বেশ ভালরূপই হইতেছে। ইহা হইতেই জগদ্বিখ্যাত "পারা" রবার প্রস্তুত হয়। এই গাছ উচ্চতায় প্রায় এক শত ফিট এবং প্রস্থে প্রায় ৪০ ইঞ্চি পরিমাণ হয়।

উপরিউক্ত বৃক্ষগুলির ত্বক ছেদন করিলে এক প্রকার দুগ্ধবৎ আঠা নির্গত হয়। ইহাকে ইংরাজিতে ল্যাটেক্স (latex) কহে। এই দুগ্ধকে জমাইলে তাহা হইতে প্রকৃত কাঁচা রবার পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে জলের পরিমাণ শতকরা ৫২ ভাগ ও রবারের পরিমাণ ৩০ ভাগ। ইহা ব্যতীত উহাতে শর্করা (sugar) রজন (Resin),

প্রোটিন (Protein) এবং ছাই (Ash) আছে। হিভিয়া গাছ পাঁচ বৎসরের না হইলে তাহা হইতে দুগ্ধ বাহির করা হয় না; ইহার বয়স অনুসারে দুগ্ধ নির্গত হয়।

৫ বৎসর বয়সে বৎসর মোট	একপোয়া	দুগ্ধ পাওয়া যায়
৭ " " "	তিন পোয়া	" " "
১২ " " "	দুই সের	" " "
৩০ " " "	দশ সের	" " "

এবং প্রতি বৎসরে ইহার ত্বক ১৬০ বার ছেদন করা হয়। ক্যাস্‌টিলোয়া গাছ বৎসরে মোট ৪।৫ বার মাত্র ছেদন করা হয়। ইহা হইতে বৎসরে অর্দ্ধসের মাত্র দুগ্ধ পাওয়া যায়। গুল্মগুলির ডালপালা জলে সিদ্ধ করিয়া আঠা বাহির করা হয়।

এই সকল গাছের ত্বক ছেদন আমাদের দেশের খেজুর গাছ কাটার ন্যায় নহে। প্রথমে ইহার তলদেশ হইতে ৮ ফিট উচ্চ পর্য্যন্ত ঋজুভাবে একটি দাঁড়ি ছেদন করা হয়। তাহার পর মৎস্যের মেরুদণ্ডাকৃতিতে ট্যারচা ভাবে দুই পার্শ্বে কর্ত্তন করা হয়। ইহা ১/৬ ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া। এইরূপ আকারে কর্ত্তন করাকে ইংরাজিতে Herring bone অর্থাৎ হেরিং মৎস্যের মেরুদণ্ডাকৃতি কর্ত্তন কহে। প্রথম কর্ত্তন প্রায় ৭।৮ ফিট উচ্চ করা হয়, এবং প্রতিদিন বা একদিন অন্তর দুই ইঞ্চি নিম্নে নিম্নে V-আকৃতিতে ছেদন করা হয়। ক্রমে এই ছেদন বৃক্ষের তলদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছে। পুনরায় এইরূপ প্রথাই অবলম্বন করা হয়। বৃক্ষের তলদেশে কোনও মৃৎ পাত্র বা টিনের পাত্র রাখিয়া দুগ্ধ সংগ্রহ করা হয়। এইরূপে দুগ্ধ সংগ্রহ করা হইলে, তাহাকে জমাইয়া কাঁচা রবার বাহির করা হয়। ইহাকে জমাইবার তিন চারি প্রকার পন্থা আছে।

১। ইহাকে কোনও কাষ্ঠফলকের উপর মাখাইয়া ধূমের উপর কিয়ৎকাল ধরিয়া থাকিলে, ক্রমশঃ উহা জমিয়া যায়। এইরূপ বারবার উহাতে আঠা লাগাইয়া ধূমে ধরিয়া জমানর পর, কাষ্ঠফলক হইতে উহা চাঁচিয়া লওয়া হয়। এরূপে প্রায় ৮।১০ সের পরিমাণ কাঁচা রবার পাওয়া যায়। ইহাকে গোলাকৃতি করিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

২। রাসায়নিক উপায়েও ঐ দুগ্ধ জমান যায়। উহাতে সিরকা বা (Acetic acid), গন্ধকদ্রাবক (Sulphuric Acid) কিংবা স্পিরিট (Alcohol) মিশ্রিত করিলে উহা জমিয়া যায়।

৩। ঘূর্ণায়মান যন্ত্রে (Centrifugal machine) এই দুগ্ধকে খুব জোরে ঘুরাইলে ইহার জল ও রবার পৃথক হইয়া যায়।

৪। এই দুগ্ধের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি প্রেরণ করিলে উহা জমিয়া যায়।

৫। কতক প্রকার গাছের দুগ্ধ কেবল মাত্র ফুটন্ত জলের (100°c) উত্তাপে রাখিলেও জমিয়া যায়।

উপরিউক্ত যে কোনও প্রকার উপায়ে পৃথকীকৃত কাঁচা রবারের মধ্যে নানা প্রকার পদার্থ থাকে বলিয়া, উহাকে উত্তমরূপে জলে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়; এবং বারম্বার বাষ্পে গরম করিয়া ময়দা মাখার ন্যায় প্রণালীতে তাপ দিয়া ও নিংড়াইয়া উহাকে বেশ নরম ও স্থিতিস্থাপক করা হয়। এইরূপে প্রস্তুত রবারই হইল বিশুদ্ধ রবার। কিন্তু ইহা দ্বারা বিশেষ কোন প্রকার দ্রব্যাদি তৈয়ার করা যায় না। এই নিমিত্ত ইহাকে Vulcanize বা গন্ধক মিশ্রিত করিতে হয়। শতকরা ৮।১০ ভাগ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কোনও যন্ত্রের মধ্যে অধিক চাপে দুই তিন ঘণ্টা কাল ১৩০°—১৪০° ডিগ্রি (130°—140°c) উত্তাপে উহাকে রাখিয়া দিলে, উহা গলিয়া বাজারে প্রচলিত সাধারণ রবার প্রস্তুত হয়। এইরূপ রবারকে যন্ত্র সাহায্যে চাপিয়া পাতলা পাতলা চাদর তৈয়ার করা হয়; এবং উহা হইতে ইচ্ছানুযায়ী নল প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু তৈয়ার করা যায়।

বিশুদ্ধ রবারের সহিত শতকরা ৪০ ভাগ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া, ছয় ঘণ্টা কাল উপরিউক্ত উপায়ে "ভল্‌ক্যানাইজ" করিলে, এক প্রকার কঠিন পদার্থ প্রস্তুত হয়। ইহাকে ইংরাজিতে "ভুল্‌কানাইট্, ইবনাইট বা হার্ড রবার" কহে। ইহা হইতে মাথার চিরুণী, কাঁকই, দ্রব্যাদির হাতোল, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির অংশ প্রভৃতি বস্তু তৈয়ার হয়।

গন্ধক মিশ্রিত রবারে সকল প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইবে বলিয়া, তাহাতে নানা প্রকার ভেজাল সামগ্রী মিশ্রিত করা হয়।

১। মূল্য হ্রাস এবং পরিমাণ বৃদ্ধির নিমিত্ত উহাতে ফুলখড়ি, দস্তা ভস্ম (Zinc oxide), Barium Sulphate. পুরাতন রবারের দ্রব্যাদি প্রভৃতি মিশ্রিত করা হয়।

২। খুব ঘন করিবার জন্য উহাতে পিচ্ (Pitch), bitumen (গন্ধক জাতীয় দ্রব্য বিশেষ), Asphalt, মাটি হইতে জাত মোম (Ozokerite) প্রভৃতি দ্রব্য মিশ্রিত করা হয়।

৩। স্থিতিস্থাপকতা ও ভার রাখিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত উহাতে সীসা ভস্ম (Litharge), চূণ ও ফুলখড়ি, ম্যাগ্নেসিয়া (Magnesia) দস্তাভস্ম (Zinc oxide), লিথোপোন (Lithopone), কাঁচচূর্ণ, ব্যালাটা (Balata, ইহা রবার জাতীয় দ্রব্য) প্রভৃতি দ্রব্যাদি মিশ্রিত করা হয়।

ইহা ব্যতীত নানা রঙ্গে রঞ্জিত করিবার নিমিত্ত উহাতে সিন্দুর, Cadmium yellow, Chrome yellow, Chrome green, Prussian blue, Antimony Sulphiyde, ধূলিবৎ ধাতুচূর্ণ, পিতলচূর্ণ প্রভৃতি দ্রব্যাদিও মিশ্রিত করা হয়।

রবারের দ্রব্যাদি যে জগতে কতকাল হইতে প্রচলিত, তাহার সঠিক নির্ণয় করা বড় সুকঠিন। তবে য়ুরোপীয় পুস্তকে পাঠ করা যায় যে, ১৫২৫ খৃঃ Martyrd', Anghiera মেক্সিকো (Mexico) দেশে রবারের খেলিবার বলের প্রচলন দেখেন। ১৬শঃ শতাব্দীতে যখন স্পেন ও পর্টুগাল দেশবাসীরা দক্ষিণ আমেরিকা জয় করেন, সেই সময় তাঁহারা তথাকার আদিম অধিবাসীদের রবারের প্রস্তুত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে দেখেন। ঐ সকল জাতিরা কেবলমাত্র খেলিবার বল, দ্রব্যাদি রাখা ছোট ছোট থলি, জুতা এবং বৃষ্টি-নিবারক জামা তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করিত। ১৭৭০ খৃঃ অম্লজান বাষ্প আবিষ্কারক Pristley সাহেব রবারের দ্বারা কাগজে লিখিত পেন্সিলের দাগ যে মুছিয়া ফেলা যায়, তাহা আবিষ্কার করেন; এবং উহাকে ঐরূপ ভাবে ব্যবহার করিবার প্রণালীর প্রচার করেন। তৎকালীন সকল রবারই আমেরিকার ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া (West India) দেশ হইতে আসিত বলিয়া, উহার নামকরণ India rubber হইল। সেই হইতেই উহা ঐ নামেই আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত।

ব্যবসায়ের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত রবারের দ্রব্যাদি সর্ব্বপ্রথম ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮২৫ খৃঃ C. Macintosh নামক ম্যাঞ্চেষ্টার-নিবাসী জনৈক ইংরাজ বস্ত্রাদির উপর রবারের প্রলেপ দিয়া তাহাকে জল রোধক করিবার প্রথা আবিষ্কার করেন। কিন্তু গন্ধক মিশ্রিত করিয়া তাহাকে "ভলকানাইজ" করিবার উপায় ১৮৩৯ খৃঃ Charles Goodyear নামক জনৈক আমেরিকাবাসী সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। ১৮৪৪ খৃঃ Hancock নামক জনৈক ইংরাজও ঐরূপ প্রথা আবিষ্কার করেন। ১৮৪৬ খৃঃ A. Parkes নামক জনৈক ইংরাজ যাহাতে শীতল অবস্থাতে ঐরূপ গন্ধক মিশ্রিত করা যায়, তাহার উপায় আবিষ্কার করেন। ইহাকে ইংরাজিতে Cold Vulcanization কহে। রবারে এই সকল গন্ধক সংমিশ্রণের উপায় যদি আবিষ্কৃত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় জগতে রবারের দ্রব্যাদির এত বহুল-প্রচলন হইত না।

জগতের মধ্যে অর্দ্ধেক কাঁচা রবার কেবলমাত্র দক্ষিণ আমেরিকার পেরু, বলিভিয়া এবং ব্রেজিল দেশ হইতে রপ্তানি হয় এবং ঐ সকল রবার কেবল ঐ হিভিয়া জাতীয় বৃক্ষ হইতেই উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষ, লঙ্কা, মলয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে এত রবার গাছ আছে যে, ১৯১৩ খৃঃ ঐ সকল দেশ হইতে ৮,৮৭,০০০ মণ কাঁচা রবার বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল; এবং উহার মূল্য অনুমান ১৬০,০০০,০০০্ টাকা। দুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল ব্যবসা বিদেশীয়দের হস্তে রহিয়াছে; এবং ভারতবর্ষে একটিও রবারের কল-কারখানা নাই।

উপরিউক্ত রূপ রবার কেবল স্বাভাবিক উদ্ভিদজাত রবারের বর্ণনা। আজকাল মানব-বুদ্ধিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আল্কাতরা হইতে জাত নকল রবারেরও

দ্রব্যাদি বাজারে অনেক প্রচলিত হইতেছে। ইহা স্বাভাবিক রবার হইতে কোনও অংশে ন্যূন নহে। ইহাকে ইংরাজিতে সিন্‌থেটিক রবার (Synthetic Rubber) কহে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম-বি-এ-সি
—ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩২৯।

বাদশাহ্‌দের পড়াশুনা ও বিদ্যানুরাগ।

অনেকের ধারণা, মোগল-বাদশাহ্‌রা লেখাপড়ার ধার ও ধারিতেন না—তাঁরা সব অশিক্ষিত লোক—কেবল নাচ গান ফূর্ত্তি লইয়াই জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাস এ মতের পরিপন্থী। বাদশাহ্‌ ও শাহজাদাদিগের অন্য সব কীর্ত্তিকাহিনীর কথা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহারা যে সব অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সবই যে তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহাদেরই সাহিত্য-রচনার কৃতিত্ব ও শিক্ষাদীক্ষার কথা এই প্রবন্ধে একটু আলোচনা করিব।

বাবর (১৫২৬-১৫৩০)

ভারতের মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর সাহিত্যিক গুণপনায় পূর্ব্বপুরুষদের অপেক্ষা উচ্চাসন পাইবার যোগ্য। শৈশবে তাঁহার সুশিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে। আরবী, ফার্সী, তুর্কী ও হিন্দী ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল অসাধারণ। অল্প বয়স হইতেই তিনি কবিতা-রচনার চর্চ্চা করিতেন; ইহার ফলে আমরা তাঁহার নিকট হইতে ফার্সী ও তুর্কীতে লেখা একখানি 'দিউয়ান্‌' পাইয়াছি। তাঁহার আত্মীয় মীর্জ্জা হায়দরের গ্রন্থে প্রকাশ, তুর্ক ভাষায় কবিতা-রচনার কৃতিত্বে একমাত্র আমীর আলি শিরের পরেই বাবরের নাম করা যাইতে পারে।' (*Tarikh-i Rashidi*, Ross & Elias, 173.) এমন কি ধর্ম্মমতের উপর বাবর 'মুবায়ান্‌' নাম দিয়া ফার্সী ভাষায় একটি সুন্দর মসনবী রচনা করেন (Badaoni, i. 150.) সে যুগের সমালোচকেরা ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। শেখ জৈনের লিখিত 'মুবয়ীন্‌' নামে এই কবিতার এক টীকা আছে। খাজা অহ্‌রারের 'রিসালা-ই ওয়ালিদীয়া' গদ্যগ্রন্থকে বাবর কবিতাকারে গ্রথিত করিয়াছিলেন। তা ছাড়া আবুল-ফজল 'আকবর-নামা'য় (i. 279) এবং M. Pavet de Courteille-এর *Dictionary of Eastern Turkish* গ্রন্থে বাবরের কতকগুলি ফার্সী কবিতা উদ্ধৃত আছে। কাবুলের কাছে এক পাহাড়ের কোলে বাবরের নির্ম্মিত লাল পাথরের একটি ছোট চৌবাচ্ছা ছিল। উহা সময়ে সময়ে টুকটুকে লাল মদিরায় ভরিয়া দেওয়া হইত। বাবর এইখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেন; সুন্দরী তরুণীরা গান গাহিয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিত, পিয়ালা ভরিয়া মদ্যপান করাইত। চৌবাচ্ছার গায়ে বাবরের এই কবিতাটি খোদিত আছে—

"মধুর হচ্ছে ধরার পরে নববর্ষ-আগমন,
মধুর হাসি মধুমাসের দেখ্‌লে ভোলে দু'নয়ন;
আঙুর পাকা ফলের সেরা, রসটি তাহার সুমধুর।
তাহার চেয়ে অতি মধুর হচ্ছে প্রেমের কোমল সুর।
বাবর, তোমার তিয়াস মিটাও, উড়ে পালায় সুখপাখী;
উড়লে পরে ফিরবে না আর, হবে তোমার
সব ফাঁকি।"

শুধু কবিতা নয়—গদ্য রচনাতেও বাবরের বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। ছন্দঃশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি কয়েকখানি ছোট ছোট বই লেখেন—তাহার একখানির নাম 'মুফস্‌সল।' (*Akbarnama*, Eng. tr. I. 278-79). ইহার রচনায় বাবর পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণকে সর্ব্বাংশে ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

সঙ্গীতশাস্ত্রেও বাবরের বেশ অধিকার ছিল। তিনি এক নূতন ধরণের হাতের লেখার প্রবর্ত্তক, তাঁহার এই লেখার ধরণটা 'খৎ-ই-বাবরী' নামে পরিচিত। ইহা সেকালে খুব আদরণীয় হইয়াছিল। এই হস্তাক্ষরে একখানি কোরাণ লিখিয়া তিনি মক্কায় পাঠাইয়াছিলেন। (Badaoni, i. 451).

বাবরের আর আর সব কথা ছাড়িয়া দিলেও, একমাত্র তুর্ক ভাষায় লেখা 'আত্মকাহিনী—বাবর-নামা—যে তাঁহার অমরকীর্ত্তি তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই

আত্মকাহিনীর ভিতর তিনি সত্যসত্যই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার দোষ-গুণ ত্রুটি-বিচ্যুতি সমস্তই অকপটে ব্যক্ত করা হইয়াছে। বাবর-নামা একখানি অতি উচ্চাঙ্গের আত্মজীবনী। বয়রাম খাঁর পুত্র আবদুর রহিম খান্ খানান্‌কে দিয়া আকবর, ইহা ফার্সীতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন (*Ain i-Akbari*, i. 105). মিসি বেভারিজ সম্প্রতি মূল্যবান্ টীকাটিপ্পনীসহ 'বাবর-নামা'র বিশুদ্ধ ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

হুমায়ুন্ (১৫৩০—১৫৫৬)

আবুল-ফজল্ লিখিয়াছেন,—'মধুর-স্বভাব হুমায়ুনের মধ্যে আলেকজান্দারের তেজ ও আরিষ্টটলের পাণ্ডিত্য ছিল।' কথাটা মিথ্যা নহে। পিতা বাবরের মত তিনি ফার্সী ও তুর্ক ভাষা রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; নানা দুজ্ঞেয় তত্ত্ব তাঁহার আলোচনার বিষয়ীভূত ছিল। বদায়ুনীর মতে তিনি দর্শন শাস্ত্রে, নক্ষত্র ও জ্যোতিবিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। (Badaoni, i. 602.) গণিত ও ভূগোলের আলোচনাতেও তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার বড় ইচ্ছা ছিল, এই জন্য তিনি স্থান পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন।

হুমায়ুনের প্রতিভা কেবলমাত্র শুষ্ক গবেষণা লইয়াই নিবদ্ধ ছিল না। তাঁহার মনটি ছিল খাঁটি কবির। অবসরকালে তিনি সুন্দর সুন্দর কবিতাও লিখিতেন। তাঁহার রচিত 'দিউয়ান্' আকবরের রাজপাঠাগারে রক্ষিত হইয়াছিল। (*Akbarnama*, i. 665). আকবর-নামায় ও ফিরিস্তায় (Briggs, ii. 75) হুমায়ুনের কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত আছে।

শাহ্‌দেশে অবস্থানকালে সেখানকার নামজাদা কবি-ও পণ্ডিতদের সঙ্গে সাহিত্যাদি নানাবিষয়ে তাঁহার প্রায়ই আলোচনা হইত। একদিন কাশানের 'মুল্লা হাইরাতি তাঁহার একটি কবিতা সংশোধন করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে ধরিয়া বসেন। হুমায়ুন্ এরূপ দক্ষতার সহিত কবিতার একটি চরণ বদলাইয়া দিয়াছিলেন যে, মুল্লা তাঁহার কৃতিত্বের তারিফ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। *A. N.* i. 446-7).

পুস্তকের উপর হুমায়ুনের অতিশয় টান ছিল; লড়ায়ে চলিয়াছেন, তখনও প্রিয় পুস্তকগুলি তাঁহার সঙ্গে। "শের শাহ্‌র সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলাইতেছেন, তবু কিন্তু পুস্তকাধ্যক্ষ ও প্রিয় পুস্তকগুলি সঙ্গছাড়া করেন নাই। (Noer's *Akbar*, 136). দ্বিতীয়বার দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া তিনি পুরাণো কিল্লায় অবস্থিত শের শাহ্‌র শের-মণ্ডলকে রাজপাঠাগাররূপে পরিণত করিয়াছিলেন।

শাহজাদা কামরান্

হুমায়ুনের বৈমাত্রেয় ভাই মীর্জ্জা কামরানের সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা আবশ্যক মনে করি। উচ্চাঙ্গের কবি বলিয়া কামরানের খ্যাতি ছিল। তাঁহার লেখা 'দিউয়ান্' পাটনায় খুদাবখ্‌শ্ লাইব্রেরীতে আছে। ফার্সী ও তুর্ক ভাষায় তাঁহার বেশ দখল ছিল। কামরানের আর একটা গুণ, তিনি 'হাজির জবাব'—কোন কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া সময়োপযোগী কবিতা—মুখে মুখে রচনা করিতে পারিতেন। কাব্য-সাহিত্যে বিশেষ দখল থাকায়, প্রখর স্মৃতিসম্পন্ন কামরান্ সময়োপযোগী কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার লেখা কবিতার নমুনা বদায়ুনীর গ্রন্থে (i. 502) ও আবদুল মুক্তাদীরের প্রবন্ধে (*J. M. Inst.* 1907) পাওয়া যায়।

আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)

সুপণ্ডিত হুমায়ুনের পুত্র হইলেও মোগল-গৌরব সম্রাট্ আকবরের অক্ষর-জ্ঞান ছিল না। আলাউদ্দীন খিলজী, হায়দর আলী, ছত্রপতি শিবাজী, পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহও বর্ণমালায় অভিজ্ঞ ছিলেন না, কিন্তু জ্ঞানে গুণে শাসনদণ্ড পরিচালনায় ইঁহারা সকলেরই স্মরণীয় এবং বরণীয়। হুমায়ুন পুত্রকে শৈশবে লেখাপড়া শিখাই-বার বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমোদপ্রিয় বালক কিছুতেই শিক্ষাপ্রণালীর কঠোরতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে চাহিলেন না। তিনি শিক্ষকগণের নিরন্তর প্রয়াস এরূপভাবে ব্যর্থ করিলেন যে, জীবনের শেষদিন

পর্য্যন্ত তাঁহার অক্ষর-পরিচয় হয় নাই—নিজের নামটি পর্য্যন্ত সহি করিতে পারিতেন না। পশুপক্ষিপ্রিয় বালক দিবসের অধিকাংশ ভাগ উট, ঘোড়া, কুকুর, পায়রা প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন।

পাঠে বীতশ্রদ্ধ হইলেও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শাহ্জাদার কৌতূহল ও জ্ঞানপিপাসা বাড়িতে লাগিল। পুস্তকপাঠ-শ্রবণে তাঁহার অপরিসীম আনন্দ;—শ্রুতিধরের মত আকবর সুফি কবি হাফিজ ও জলাল্-উদ্দীন রুমীর ধর্ম্মভাবাত্মক কবিতাগুলি শুনিয়া শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিতে লাগিলেন। বেতনভোগী পাঠকেরা তাঁহাকে নিয়মিত রূপে ইতিহাস, ধর্ম্মগ্রন্থ প্রভৃতি পাঠ করিয়া শুনাইত। দর্শন-শাস্ত্রে আকবরের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। (*Ain-i-Akbari*, i. 103)। অসাধারণ স্মরণশক্তি বলে তিনি পঠিত পুস্তকসমূহের সারমর্ম্ম স্মরণ রাখিতে পারিতেন। এই স্মরণশক্তির বলে তিনি বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতালাভ করেন, আর এইজন্যই নানা জটিল বিষয় লইয়াও তর্ক-বিতর্ক করিতে পারিতেন;—'Anybody who heard him arguing with acuteness and lucidity on a subject of debate would have credited him with wide knowledge and profound erudition, and never would have suspected him of illiteracy.' (Smith's *Akbar*, 338).

আকবরের যত্নচেষ্টায় অনেক সদ্‌গ্রন্থ ফার্সীতে অনূদিত হয়;—যেমন মহাভারত, রামায়ণ, অথর্ব্ব বেদ, হরিবংশ, লীলাবতী প্রভৃতি। (*Ain*, i. 103-6.)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
—শিক্ষক, কার্ত্তিক ১৩২৯।

টাকের ঔষধ।

টাকের জ্বালায় অনেকেই জ্বলেন—নানারকম তেল মেখে মাথায় চুল গজাবার চেষ্টায় হায়রাণ হন,—অর্থও তাতে যথেষ্ট নষ্ট করেন—অথচ যে টাক, সেই টাকই মাথায় থেকে যায়।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন তেলে টাক পাকে না। একগাছি চুল মাথা থেকে উঠে গেলে, সেই জায়গায় আবার চুল গজাতে চারটি বছর সময় লাগে। যে চুল টেনে ছিঁড়তে হয়,সে চুলের গোড়া খুব শক্ত আর তা রবারের মত সঙ্কুচন-শীল। একটি প্রমাণ লোকের মাথায় কত চুল থাকে, জানেন? চুলের রঙ যদি লাল হয় তাহলে ৩৫০০০ গাছি; কটা রঙের হলে ১০৫০০০ গাছি, কালো চুল ১৫০০০০ গাছি। চুল পাকে কেন? মাথার চামড়া শক্ত হলে—চুলের গোড়া রস পায় না—এই রসই চুলকে কালো রাখে, পাকতে দেয় না। সমুদ্রে নিত্যস্নান করলে মাথার চুল শীঘ্র পাকে। লোণা জল শুকিয়ে মাথায় নুণ রেখে যায় আর তাতে টাক পড়ারও আশঙ্কা খুব। যাঁদের উপায় নেই, সমুদ্রে স্নান করতেই হবে, তাঁরা যদি সমুদ্র-স্নানের পর ভালো অর্থাৎ অ-লোণা জলে মাথা ধুয়ে না ফেলেন, তাহলে তাঁদের চুল চট্ করে পাকতে পারে না, মাথার টাকও পড়ে না।

যাঁরা মাথায় তেল মাখেন, কিম্বা যাঁদের মাথায় ধূলো লাগে, তাঁদের উচিত প্রতি মাসে দু'বার কি তিনবার মাথা সাফ করা। নিজে নিজে মাথায় ব্রশ চালালে মাথার চুল পাকে, মাথায় টাক পড়ে। ঘনঘন ব্রশ চালালে চুলের গোড়া আলগা হয়, মাথার চামড়ায় কড়া পড়ে, চুলে রস পাওয়া দুর্লভ হয়। অবশ্য স্বাস্থ্য যাঁদের খুব ভালো, তাঁদের চুল চট্ ক'রে উঠে যায় না।

"চুলের দিকে নজর রাখা দরকার। যাঁরা কলে-কারখানায় কাজ করেন, তাঁরা যতই সৌখীন বা ধনী হন মাথায় তাঁদের টাক ধরেই। মাথায় অতিরিক্ত রৌদ্র লাগালে টাক পড়ে। মেয়েদের মাথায় টাক পড়ে খুব কম। তার কারণ, মেয়েদের চুলের বাড় খুবই বেশী রকমের, আর সে চুল এত ঘন যে চুলের গোড়া সহজে নষ্ট হতে পারে না।

অনেকের মাথায় আবার টাক পড়ার কারণ, পুরুষানুক্রমিকতায়। প্রায় দেখা যায় বাপের মাথায় যেমন টাক, ছেলের মাথাতেও তেমনি টাক পড়ে। পুরুষানুক্রমিক হ'লে এ ব্যাধির প্রতিকার নেই।

টাইফয়েড বা নিউমোনিয়া রোগে ভুগলে অনেকের মাথায় টাক পড়ে—যত্ন নিলে এ টাক শীঘ্রই সারে। আর এক রকম টাক পড়া আছে,—সেটা মগজের দোষে। এ টাকের ব্যাধি ছোঁয়াচে। এই ব্যাধিগ্রস্ত টাক-মাথায় যে চিরুণী ব্রুশ চালানো হয়; সেই চিরুণী ব্রুশে মাথা আঁচড়ালে সুস্থ লোকেরও মাথায় টাক পড়ে। দোকানের হেয়ার কাটারের কাছে চুল ছাঁটলে এ ভাবে টাক পড়ার ভয় আছে।

পুরুষানুক্রমিক ভাবে যাঁদের মাথায় টাক পড়ে, তাঁদের মাথার চুল প্রথমে খুব পাৎলা হতে থাকে, তারপর ক্রমশঃ টাক ধরে। এঁদের টাক সারানো একরকম অসম্ভব। তবে বাকী চুলগুলিকে কোনমতে রক্ষা করা যায় মাত্র। শক্ত অসুখের পর যাঁদের মাথায় টাক পড়ে, তাঁদেরও সময়ে চিকিৎসার গুণে টাক সারে। আর যাঁদের মগজের দোষে মাথায় টাক পড়ে, প্রায় দেখা যায় তাঁদের মাথায় প্রথমে মরা মাস দেখা দেয়. ক্রমে চুল পাৎলা হতে থাকে, শেষে টাক পড়ে। এই টাক পড়া ছোঁয়াচে রোগ।

তেলে এ টাক সরে না। বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন, এ টাক সারে একমাত্র তীব্র ভায়োলেট আলোর রশ্মিতে (ultra violet rays) এই আলোর রশ্মি বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে ওজোন গ্যাস (ozone) উৎপন্ন করে। মাথায় এই আলোক-রশ্মি দিলে প্রথমে চিড় চিড় করে এবং ভিতরকার রক্তকোষকে চঞ্চল করে তোলে। এই চঞ্চল রক্ত-প্রবাহ মগজের দুষ্ট বীজাণুগুলিকে মেরে ফেলে—এবং তাতে নতুন চুল বেরুবার সুযোগ হয়।

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়

—ভারতী, কার্ত্তিক ১৩২৯।

কারাগারে।

[শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী]

এই কারাগারে—
বদ্ধ, ক্ষুদ্র, চিরম্লান অপবিত্র নিবিড় আঁধারে,
পেয়েছ কি আলোর সন্ধান?
রাখিতে হইবে তাঁ'রে ভরি' নিজ প্রাণ।
সার্থক করিতে হ'বে ব্যর্থ আয়োজন,
আজি অনুখণ
এই কথা রহি রহি বাজি' উঠে হৃদয়-বীণায়।
ওগো মাঝি তোল' আজি না'য়—
যত কিছু দীন পূজা যত কিছু ব্যর্থ অর্ঘভার।
আজি যে আমার
হইবে নূতন করি জীবনের খেলা।
পুরাণো জীবন সাথে আজি মোর বিদায়ের বেলা।
সর্ব্ব মিথ্যা সর্ব্ব লজ্জা ভয়,
জীবনের পলে-পলে করিতেছে ক্ষয়।
আজি সে সবারে
চাহি যে করিতে জয় এই কারাগারে।

যুগ যুগ ধরি' যা'র পথ চাহি রহিনু দুয়ারে
তা'রে কি নিমেষ মাঝে পা'ব এই বদ্ধ কারাগারে?
না—না, সে হ'বার নয়; নাড়ীতে নাড়ীতে
মিথ্যার বন্ধন মোরা পারি না ছাড়িতে।
আজি সে বন্ধন—
ছাড়িবার লাগি মোরা করিব ক্রন্দন?
বাহিরিয়া এস আজি পরিপূর্ণ শতদল প্রায়—
প্রশান্ত সন্ধ্যায়:—
বিথারিয়া পঙ্ক ক্লেদ মৃত্যু-অন্ধকার—
তবে ত ফুটিবে আলো হৃদি-চন্দ্রমার।

তীব্র বেগে চ্যুত শর সম;
বিদারি' আঁধার ঘোর ধাও প্রিয়তম,
নির্ভয়ে সত্যের সাথে চিরমুক্ত জয়ধ্বজা বহি
জগতে পরীক্ষা মাঝে হও চিরজয়ী।
বদ্ধ ক্ষুদ্র সংসারের সাথে,
অনুদিন অনুখণ আঘাতে আঘাতে
মিথ্যারে বিধ্বস্ত করি সত্যালোক হ'বে—
মুক্তির প্রসাদ পা'ব, কবে, কবে, কবে?

১৯শ ভাগ | পৌষ, ১৩২৯ | [১১শ সংখ্যা

লালা রুখ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

লালা রুখ লাহোরে কয়েকদিন অবস্থান করিবার পর আবার তাঁহারা কাশ্মীরের পথে যাত্রা করিলেন। প্রথম কয়েক দিবস লালা রুখ অসুস্থতার ভাণ করিয়া তাঁহার শিবিরে সেই গায়ক কবিকে আহ্বান করিলেন না। তাঁহার সখীগণ ফদলদীনের সমালোচনা শুনিতে শুনিতে বিরক্তি বোধ করিতেছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় রাজকুমারী অশ্বারোহণে বায়ু সেবনের জন্য বহির্গত হইয়া একটি লতা-কুঞ্জ হইতে বাঁশীর স্বরের সহিত মানুষের কণ্ঠস্বর মিশিয়া আসিতেছে শুনিতে পাইলেন। সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর যে কাহার তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন। লালা রুখ সেই বিরহীর গান শুনিয়া স্পষ্ট বুঝিলেন যে, ফিরামরস্ তাঁহাকে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। সেইদিন সন্ধ্যা-কালে তাঁহারা যেখানে শিবির স্থাপন করিলেন তাহার অনতিদূরে, একটি বুরুজের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া সকলেই তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইলেন। ফদলদীন এই বুরুজ সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন শুনিয়া লালা রুখের সখীগণ ফিরাম-রসকে ডাকাইয়া আনিতে চাহিলেন। লালা রুখ ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে ক্রীতদাস তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলে রাজকুমারী তাঁহার মুখে বিষাদের ছায়া দেখিয়া এতদিন তাঁহাকে উপেক্ষা করার জন্য মনে মনে দুঃখিত হইলেন। ফিরামরস্ বলিলেন যে, সেই বুরুজ পূর্ব্বে অগ্নিদেবতার মন্দির ছিল। অগ্নির উপাসক পারশিকেরা নিজেদের দেশ হইতে পলাইয়া আসিয়া উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার পর বিদেশী ধর্ম্মান্ধ আক্রমণকারিদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে পারশিরা এই স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। "ধর্ম্মান্ধ আক্রমণ-কারী"র উল্লেখ শুনিয়া ফদলদীন স্তম্ভিত হইলেন। ফিরামরস্ বলিলেন, যদি রাজকুমারী অনুমতি দেন তাহা হইলে আরবদের হস্তে অগ্নির উপাসকদিগের নির্য্যাতনের একটি গল্প তিনি বলিবেন। লালা রুখের অনুমতি পাইয়া ফিরামরস্ পদ্যময় গল্প আরম্ভ করিলেন।

"ওমান সমুদ্রের উপকূলে প্রাসাদের একটি প্রকোষ্ঠে আল্ হাসানের কন্যা হিন্দা নিদ্রাভঙ্গের পর একাকী বসিয়া আছেন। অর্দ্ধরাত্রে জাগিয়া উঠিয়া কাহার জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন? এই সু-উচ্চ স্থানে কেহ কি আসিতে পারে? একজন মাত্র বীর যুবক যিনি চুম্বনের

লোভ সংবরণ করিতে পারেন না, কেবল তিনিই সেই ভীষণ তরঙ্গময় সমুদ্রে নৌকা বাহিয়া আসিয়া, বিপদসঙ্কুল পর্ব্বতের দেয়াল অতিক্রম করিয়া হিন্দার কক্ষে আসিতে পারেন। সেই অসমসাহসী যুবক সেই মুহূর্ত্তে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া পর্ব্বতময় প্রাচীরে উঠিতেছিলেন। তিনি এক্ষণে হিন্দার কক্ষাভ্যন্তরে আসিয়াছেন। হিন্দা কাহাকে ভালবাসেন? তিনি যে তাঁহার প্রণয়ীর নাম পর্য্যন্ত জানেন না! নিভৃত কুঞ্জে অকস্মাৎ একটি সুন্দর পাখীকে দেখিয়া যেমন আমরা তাহার প্রতি প্রীতির টান অনুভব করি, হিন্দাও সেইরূপ অপরিচিত সেই যুবককে তাঁহার কক্ষে অকস্মাৎ একদিন দেখিয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন। কিন্তু, না, আর তিনি তাঁহার সহিত এইভাবে দেখা করিতে পারিবেন না। পাহাড়ের দেয়াল বহিয়া উঠিতে কোন্ দিন সেই যুবকের পদস্খলন হইবে আর তিনি চিরকালের তরে বিরহজনিত কষ্ট ভোগ করিবেন। হিন্দা বিদায় চাহিলে সেই যুবক বলিলেন, তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। "বিপদের কথা আমাকে বলিবেন না, বিপদ কাহাকে বলে আমি জানি না।" হিন্দা তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "তবে, আপনি কেন পারশিদের বিরুদ্ধে আমার পিতার সৈনিকদের সহিত যোগদান করুন না? আমার পিতা বীরত্বের মর্য্যাদা জানেন। তিনি আমাকে অনেকদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, আমাকে যিনি বিবাহ করিবেন, তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আমার পাণিগ্রহণের অনুমতি চাহিবেন।" বীর যুবক হিন্দার কথা শুনিয়া বলিলেন, "আপনি এই অপরিচিতকে জানেন না। আমি ইরাণবাসী একজন পারশি। আপনার পিতা আরবদিগের নেতা। পারশিদের উপর তিনি যে অত্যাচার করেন তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ব্যতীত আমার জীবনের অন্য উদ্দেশ্য নাই। যে রাত্রে সর্ব্বপ্রথমে আমি আপনাকে এই কক্ষে দেখি, সে রাত্রে আমি আপনার পিতার অনুসন্ধানেই এখানে আসিয়াছিলাম।" এই কথা বলিয়া সেই যুবক হিন্দার কক্ষ হইতে বেগে বহির্গত হইয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেলেন। তিনি যাইবার সময় বলিলেন, "ঐ সমুদ্র হইতে একটি আলো আমাকে যে সংবাদ দিতেছে তাহাতে আমার এখানে এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করা উচিত নয়, করিলে আমাদের উভয়েরই বিপদ।" যুবক চলিয়া যাইবার পর হিন্দা সমুদ্র জলে গুরুভার জিনিষের পতন শব্দ শুনিয়া মনে করিলেন যে, তাঁহার প্রণয়ীর পদস্খলন হইয়া জলময় কবর হইল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'আমিও আপনার সহিত যাইব, মরণে একসঙ্গে থাকিয়া সুখী হইব।' পরক্ষণেই সেই যুবকের নৌকা সমুদ্র বক্ষে দ্রুত বাহিয়া চলিয়াছে দেখিয়া হিন্দা তখনকার মত নিশ্চিন্ত হইলেন।"

লালা রুখের মনে হইল যে, ফিরামরস্ বিরহের কথা না বলিয়া অন্য কোনও কথা বলিলে ভাল হইত। লালারুখের সখীদের মতে এই কবি যখন বিষাদের সঙ্গীত শুনান তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনে হয় যেন তিনি তানসেনের কবরের উপর যে ঐন্দ্রজালিক লতা জন্মে তাহার পত্র চর্ব্বণ করিয়াছেন। পরদিন তাঁহারা একটি জঙ্গল পার হইয়া সন্ধ্যাকালে যখন সুন্দর মুক্তস্থানে শিবির স্থাপন করিলেন, ফিরামরস্ তখন আবার সেই পদ্যময় গল্প আরম্ভ করিলেন।

"অগ্নির উপাসক ইরাণবাসীরা আরবদিগের শাসনকর্ত্তা হিন্দার পিতা আল্ হাসানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাহাদের নেতা হাফেজ অবশিষ্ট দলবল লইয়া ওমান সমুদ্রে একটি দ্বীপে উচ্চ পর্ব্বতের গহ্বরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। একজন বিশ্বাসঘাতক পারশি তাহাদের এই গুপ্ত স্থানের কথা আল্ হাসানকে জ্ঞাত করিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। আল্ হাসান হিন্দাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, আগামী কল্য রাত্রের মধ্যে তিনি শত্রুদের নেতার মস্তক প্রাপ্ত হইবেন। হিন্দা এই কথা শুনিয়া যে মর্ম্মপীড়া ভোগ করিলেন তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার পিতা, কন্যার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, কল্য প্রাতেই তাঁহাকে তিনি হিন্দার জন্মস্থান আরবদেশে পাঠাইয়া দিবেন।"

লালা রুখ গল্পের এই রাত্রে একটি সুখের স্বপ্ন দেখিলেন। পরদিন তিনি সখীগণকে স্বপ্নের কথা বলিলেন। স্বপ্নে তাঁহার মনে হইল যেন তিনি প্রাচ্যের কোনও সমুদ্রে নৌকায় বসিয়া ঊর্ম্মিবক্ষে ভাসিয়া চলিয়াছেন। একা সময়

তিনি দেখিলেন যে, আর একখানি চিত্রিত নৌকা তাঁহার দিকে আসিতেছে। প্রথমটা তিনি মনে করিলেন সেই নৌকায় আরোহী নাই, কিন্তু নৌকা তাঁহার দিকে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল—

সখীগণকে লালা রুখ এই পর্য্যন্ত স্বপ্ন বর্ণন করিবার পর ফিরামরুস্ আসিলেন। তখন সকলে রাজকুমারীর স্বপ্নের কথা ভুলিয়া গিয়া সেই কিশোর কবির গল্প শুনিতে বসিলেন।

"হিন্দা পরদিন নৌকারোহণে সমুদ্রের উপর দিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাকে বিদায় দিতে কেহ আসে নাই। নৌকা যখন ওমান সমুদ্রে সেই উচ্চ পর্ব্বতের নিকট দিয়া যাইতেছে তখন হিন্দা পর্ব্বতের শিখরদেশে বুরুজের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন, "কোথায় তুমি সেই অপরিচিত প্রণয়ী!" জলেস্থলে যুদ্ধ চলিয়াছে, মৃত ও আহতের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। হিন্দার নৌকা শত্রুরা আক্রমণ করিল। অসির ঝণঝণা, যোদ্ধ‍্গণের চীৎকার ও রক্তের স্রোতে, হিন্দার জ্ঞান লোপ পাইবার মত হইল। ঐ যে সেই অপরিচিত প্রণয়ী না? পরক্ষণেই হিন্দা অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। যখন তাঁহার চেতনা হইল তিনি দেখিলেন যে, চারিদিকে শত্রুদের মূর্ত্তি তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। নৌকা চলিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সেই পর্ব্বতময় দ্বীপে নৌকা লাগিল। তাহারা সেই গুপ্ত গহ্বরের দিকে চলিল। হিন্দার কপালে কাহার হস্ত জলের পটী বাঁধিয়া দিল? পরিচিত স্বর হিন্দাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ভয় করিবেন না, আপনার সেই কিঙ্কর, এই আমি এখানে রহিয়াছি।" হিন্দা মুহূর্ত্ত মধ্যে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রণয়ী তাঁহাকে হাফেজের সেই গুপ্ত দুর্গে আনিয়াছেন। তাঁহার প্রণয়ীর তাহা হইলে ত রক্ষা নাই। মুসলমানের কন্যাকে যিনি আশ্রয় দিয়াছেন তাঁহাকে হাফেজ নিশ্চয় বধ করিবেন। এই ভাবনায় কাতর হইয়া হিন্দা ভগবানের নিকট তাঁহার প্রণয়ীর জীবনের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।"

পরদিন সন্ধ্যার সময় সখীগণ লালা রুখকে তাঁহার স্বপ্নের শেষাংশ বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন। হিন্দার দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে রাজকুমারী স্বপ্নের সূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, সুতরাং সকলে ফিরামরসের গল্প শুনিতে বসিলেন।

"হিন্দার কপাল হইতে যখন শীতল প্রলেপ অপসারিত হইল তখন তিনি আশা ও ভয়ের ক্রীড়া-পুত্তলীবৎ সেই নির্জ্জন গহ্বরে একাকী বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার পর জয়ধ্বনির সহিত হাফেজের নাম উচ্চারিত হইতেছে শুনিয়া হিন্দা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। হাফেজ আসিতেছে, এই কথা শুনিলে অসম সাহসী আরবও ভয়ে কাঁপিতে থাকে। হাফেজ আসিলেন। হিন্দার কম্পিত হস্ত ধারণ করিয়া তিনি ডাকিলেন,—"হিন্দা!" কণ্ঠস্বর শুনিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে হিন্দা বুঝিলেন হাফেজ কে। যাহার নাম শুনিয়া সকলে ভীত হয় সেই হাফেজ-ই হিন্দার প্রণয়ী! প্রণয়ীযুগল পরস্পরের চক্ষের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ের কথা মৌন ভাবে জ্ঞাপন করিলেন। তাহার পর হাফেজ বলিলেন, 'আজ রাত্রেই আপনি পলায়ন করুন। আপনার পিতা আজ রাত্রে নিশ্চয়-ই আক্রমণ করিবেন আর আপনাকে হত্যা করিবেন। আমার মনে হইতেছে যেন এই মুহূর্ত্তে তিনি আক্রমণ করিয়াছিলেন।" হিন্দা ভয়ে হাফেজকে আঁকড়াইয়া ধরিলেন। হাফেজ বলিলেন, "এই নিরাপদ স্থানে আপনার ভয় নাই। এই স্থানে আসিবার পথ কেহ জানে না। অন্ধ রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই আপনি আপনার পিতার নিকট ফিরিয়া যাইবেন।" হিন্দা বলিলেন, "অন্ধকার রাত্রি শেষ হইবে না, পিতা আসিয়া আপনাকে হত্যা করিবেন। চলুন, আমরা এইক্ষণে দুইজনেই পলায়ন করি। এই গহ্বরের গুপ্ত পথ একজন বিশ্বাসঘাতক পারশি আমার পিতাকে বলিয়া দিয়াছে।" হাফেজ হিন্দার কথা শুনিয়া মনে মনে বলিলেন, তাহা হইলে স্বদেশের সেবায় অদ্য রাত্রেই তাঁহার আত্মবলি হইবে। হিন্দা হাফেজের চিন্তাপূর্ণ বদনমণ্ডল দেখিয়া বলিলেন, "চলুন, আমরা কোনও শান্তিময় স্থানে পলাইয়া যাই, সেখানে আপনি আমার জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করিবেন আর আমি আপনার জন্য ভগবানের নিকট আপনার জন্য দিবারাত্রি প্রার্থনা করিব।" হাফেজ বলিলেন, "পৃথিবীতে যদি কোনও

শান্তি ও প্রেমপূর্ণ স্থান থাকিত তাহা হইলে আমরা সেখানে যাইতাম। যাহা হউক, আপনি নিজেকে সান্ত্বনা করুন, কারণ আমরা ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া নিরাপদে ঐরূপ কোনও জগতে সাক্ষাৎ করিব।” এই কথা বলিয়া সেই বীর-যুবক শিঙ্গায় ফুৎকার দিয়া তাঁহার সর্দ্দারগণকে একত্র করিলেন এবং এক্ষণে বীরের যাহা কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে বলিলেন। তাহার পর হাফেজ হিন্দাকে একখানি ডুলিতে বসাইয়া তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। হিন্দা মনে করিলেন যে, এই নির্ব্বাক ব্যবহারের অর্থ এই যে, হাফেজ তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছেন, কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, বাহক ও রক্ষীরা তাঁহাকে লইয়া দ্রুত গমন করিতেছে, তখন তিনি বুঝিলেন যে, হাফেজ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতে চাহেন। হিন্দা কাতর কণ্ঠে হাফেজকে ডাকিয়া বলিলেন, “যদি যুদ্ধে মৃত্যুই আপনার শ্রেয়ঃ হয়, তাহা হইলে আমাকেও আপনার সহিত মরিতে দিন।” হিন্দার কথা কেহ শুনিল না। সেই রাত্রে মুসলমান সৈন্তের সহিত পারশিদের যে ভয়ানক যুদ্ধ হইল তাহা বর্ণনাতীত। হাফেজের দলের কেহই রহিল না। সকলেই দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, স্বাধীনতার জন্য মরিল। হাফেজও যুদ্ধে আহত ও মৃতপ্রায় হইয়া সেই পর্ব্বতের শিখরদেশে অগ্নির মন্দিরে প্রবেশ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে পবিত্র অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। হিন্দার নৌকা যখন সেই দ্বীপের তীরদেশ ছাড়িয়া চলিল, তখন যুদ্ধের কোলাহল তাঁহার কর্ণগোচর হইল। সেই পর্ব্বত-শিখরে যখন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা সমুদ্রের সকল স্থান আলোকিত করিল, হিন্দা নৌকা হইতে দেখিলেন যে চিতার পার্শ্বে হাফেজ দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার পর যাহা তিনি দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। হিন্দা সেই চিতার অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া নিজেকে অনুসন্ধান্বিত করিলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সমুদ্রের অতল যুবক হিন্দারকালের তরে ডুবিয়া গেলেন।”

মিশিয়া গেলেন এই কয়টির ধরিয়া মুসলমান কবির মুখে হইতে একটি আদিগের সম্বন্ধে গৌরবমূলক গল্প শুনিতে [illegible]য়াছিলেন যে, যখন তাঁহারা কাশ্মীরে যাইবেন তখন বুকারিয়ার রাজাকে ফিরামরসের মুসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাসহীনতার কথা বলিয়া দিবেন, আর তাহাতে ফিরামরসের যে রাজাজ্ঞায় রীতিমত শাস্তি হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ফদলদীন আশা করিয়াছিলেন যে, সেই সঙ্গে তাঁহার নিজেরও পদোন্নতি হইবে। সেই কারণে, পর দিন সন্ধ্যার সময় যখন সকলে লালা রুখের শিবিরে সমবেত হইলেন তখন তিনি বলিলেন যে, শেষ কবিতাটির সমালোচনা উপযুক্ত বিচারালয়ে হইবে। কয়েক দিন পরে তাঁহারা নূর মহালের প্রতিষ্ঠিত কাশ্মীরের সুবিখ্যাত উদ্যানে পহুঁছিলেন। সেখানে তাঁহারা যে কয়দিন অবস্থান করিয়াছিলেন, সে কয়দিন সকলেই সেই উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। কেবল লালা রুখ ফিরামরসকে অতঃপর দেখিতে পাইবেন না, এই চিন্তায় বিষাদিত হইয়াছিলেন। বুকারিয়ার রাজার বধূ-রূপে তাঁহাকে কয়েক দিবসের মধ্যে তাঁহার হৃদয়ে নবোদিত প্রেমের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। ফিরামরস্ একদিন নূরমহাল ও জাহাঙ্গীরের মধ্যে প্রেমের কলহ-বিষয়ক একটি গীতি কবিতা বীণার সুরের সাহায্যে লালা রুখকে শুনাইলেন। ফদলদীন এই কবিতার যে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে, সেই কিশোর কবি ফিরামরস্ কবি নামের অযোগ্য। এইবার তাঁহারা কাশ্মীরের পার্ব্বত্য পথে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় হইতে ফিরামরস্ অদৃশ্য হইলেন। লালা রুখের বিষাদ-ভরা হৃদয় দিন দিন তাঁহার সৌন্দর্য্যের পাপড়িগুলি একটি একটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। সখীরা লালা রুখের আকৃতিতে পরিবর্ত্তন দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন তাঁহারা রাজধানীর দিকে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, লালা রুখের মুখে ততই বিষাদের ছায়া ঘনীভূত হইতে লাগিল। তাঁহারা যখন কাশ্মীরের উপত্যকায় পৌঁছিলেন তখন তাঁহাদিগকে সুসজ্জিত রাজবর্ম্মে আলোকমালা রাজা সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিল। রাত্রি কালে তাঁহারা এই স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে শালিমারের রাজ প্রাসাদে উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইবে। [illegible] হইতে চতুর্দ্দিকে নৃত্য গীত, পুষ্পবর্ষণ, ও আলোর [illegible] আর

হইয়াছে। লালা রুখের কিছুই ভাল লাগিতেছে না। নৌকারোহণে তাঁহারা চলিয়াছেন। যদি তিনি একবার ফিরামরসের মুখখানি দেখিতে পান, এই আশায় লালা রুখ হরিণীর ন্যায় প্রত্যেক সজ্জিত নৌকা ও জনতার দিকে উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া আছেন। ধীরে ধীরে শোভাযাত্রা অগ্রসর হইতেছে। শেষে তাঁহারা রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। স্বর্ণময় আবরণে ঢাকা মর্ম্মর প্রস্তরের সোপানে লালা রুখ যখন উঠিতেছেন তখন তাঁহার পা যেন আর চলিতে চাহিতেছে না। সোপানাবলীর প্রান্তদেশে প্রকাণ্ড দরবার গৃহে দুইখানি সিংহাসন রহিয়াছে। এক খানিতে বুকারিয়ার রাজা আলিরিস্ বসিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে অপর সিংহাসন খানিতে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী রাণী এখনি বসিবেন। দরবার গৃহে লালা রুখ প্রবেশ করিবামাত্র রাজা সিংহাসন হইতে নামিয়া তাঁহাকে প্রত্যুদগমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রাজা লালা রুখের করকমল গ্রহণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় লালা রুখ বিস্মিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আর তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া রাজার পদপ্রান্তে পড়িয়া গেলেন। লালা রুখ দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে স্বয়ং ফিরামরস্ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ফিরামরস্‌ই বুকারিয়ার রাজা। তিনি ছদ্মবেশে তাঁহার নববধূকে দিল্লী হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। কবির বেশে লালা রুখের হৃদয় অধিকার করিয়া এক্ষণে রাজবেশে সেই হৃদয় উপভোগ করিবার তিনি অধিকারী হইয়াছেন।

টমাস্ মুর বার্ণিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, (Bernier's Travels) ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী-সম্বন্ধে ডি. হারবেলটের (D'-Herbelot) ও ডাউ-লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস (Dow's History of India) হইতে 'লালা রুখ' কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া কাশ্মীরের পথে যে সকল মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তিনি এই কাব্য রচনা করিবার সময় ভারতের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা লর্ড ময়রার (Lord Moira) নিকট বিবিধ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাশ্মীরের উপত্যকা ও পর্ব্বতমালা, উদ্যান ও সরোবরের যে বর্ণনা কবি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, য়ুরোপীয় পরিব্রাজকেরা তাহা পাঠ করিয়া ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর দর্শন করিবার জন্য এদেশে আসিয়া থাকেন। মিসেস্ ফ্লোরেন্স পারবরি (Mrs. Florence Parbury) আধুনিক সময়ে 'লালা রুখের' পথে ভ্রমণ করিয়া যে সকল বর্ণ-সৌন্দর্য্যে গরীয়সী চিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেগুলি উক্ত কাব্যের সুশোভন সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়া পাঠকের কৌতূহল শতগুণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, তিনি গাইডো জাকলির (Guiddo Zaccoli) সাহায্যে মুর কর্ত্তৃক রচিত 'লালা রুখ' কাব্যের কয়েকটি গীতি-কবিতা সুর-সম্বলিত করিয়া স্বর-লিপির সাহায্যে সেগুলিকে সঙ্গীতপ্রিয় ইংরাজ মহিলার নিজস্ব করিয়া দিয়াছেন। সেক্সপীয়রের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া টমাস্ মুরের সময় পর্য্যন্ত যে সকল জগদ্বিখ্যাত ইংরাজ কবি পদ্যময় রচনায় ভারতের উল্লেখ করিয়াছেন কিম্বা ভারতবাসী ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ও বৃহদায়তন কবিতা, নাট্য-কাব্য, মহাকাব্য, গীতি-কবিতা প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও এদেশে পদার্পণ করেন নাই। এই সকল বিদেশী কবির সহৃদয়তা, আন্তরিকতা ও কল্পনা শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। টমাস্ মুর ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। পলাশীর যুদ্ধের পর শতবর্ষের মধ্যে ইংরাজি কাব্য সাহিত্যে ভারতের যত কথা স্থান পাইয়াছে তাহার তুলনায় আজ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার সমগ্র কাব্য-সাহিত্য মন্থন করিয়া আমরা ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডীয় সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অতি সামান্য সংবাদ প্রাপ্ত হই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর এদেশে দীর্ঘকাল-ব্যাপী শান্তি স্থাপিত হইলে ইংরাজগণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র নিরুপদ্রবে ও নির্বিঘ্নে বসবাস ও যাতায়াত করিয়া রাজ্য-শাসন ও বাণিজ্য বিস্তারের সুবিধা লাভ করিলে বহুতর প্রবাসী ইংরাজ কবি ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে যে সকল কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন তদ্দ্বারা ইংরাজি কাব্য সাহিত্যের কলেবরে প্রাচ্য-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-শ্রী দিন দিন ফুটিয়া উঠে। ইংরাজজাতি কিন্তু রক্ষণ-নীতির একান্ত পক্ষপাতী যে, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কবি-সম্প্রদায়কে তাঁহারা

কাব্য-সংসারে খাঁটি ইংরাজ কবির সহিত এক পংক্তিতে বসাইতে একান্ত অনিচ্ছুক। সেই কারণে, আমরা স্যার এডউইন্ আরনল্ড (Sir Edwin Arnold) প্রমুখ কয়েকজন মাত্র প্রবাসী ইংরাজ কবির নাম ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে দেখিতে পাই। শিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে যে সকল এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কবি এদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম হইলেও তাঁহারা স্বচক্ষে যে সকল ঘটনা দেখিয়াছিলেন ও ভারতবাসীর আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তৎসমুদয়ের বিবরণ তাঁহারা মনোরম কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। টমাস্ মুরের "লালা রুখ" কাব্যে নদীবক্ষে জলন্ত প্রদীপ ভাসাইয়া দেওয়ার প্রথা সম্বন্ধে যাহা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাহা লইয়া এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কবিদিগের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বেশ একটু আন্দোলন হইয়াছিল। মিসেস্ মেরী কারসোর (Mrs Mary Carshore) নামে এক মহিলা-কবি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাহাতে "বিয়ারা উৎসব" (The Beara Festival) নামে তাঁহার একটি কবিতা স্থান পাইয়াছিল। এই কবিতাটি টমাস্ মুরের "লালা রুখ" কাব্যে বর্ণিত উক্ত প্রথার সুন্দরতর চিত্র। মিসেস্ কারসোরের সমসাময়িক আর একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান উক্ত কবিতাটির তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। তার কারণ, টমাস্ মুরের ন্যায় তিনিও উক্ত প্রথা সম্বন্ধে যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে হিন্দু রমণী কর্ত্তৃক জলে প্রদীপ ভাসাইবার প্রথা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু মিসেস্ কারসোরের মতে উক্ত প্রথা মুসলমান রমণীদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। এতদ্ব্যতীত, মিসেস্ কারসোর "কাশ্মীরের একটি গল্প" (A Tale of Cashmere) নামক কবিতায় টমাস্ মুরের "প্রাচ্য বিষয়ক ভ্রান্ত মত" (erroneous Orientalism) সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। মিসেস্ কারসোরের রচিত উক্ত পদ্যময় কাশ্মীরের গল্পের সূচনাতে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা "লালা রুখ" কাব্যের পদ্যময় সমালোচনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"There's a valley so bright in the beautiful east,
Where the roses bloom wild 'neath the wanderer's feet.
O ! a breath of that vale is to pilgrims a feast,
The flowers are so fragrant, the air is so sweet ;
And the maids are so fair, that the spirits of bliss,
Have deserted Elysium to win but their kiss ;
And the sons of the west pause in glory's career,
To look back with sighs on the vale of Cashmere.
Thus sang the sweet minstrel of Erin one day,
And how sweet and how precious, tho' false is his lay ;
Yes false tho' still sweet, for the valley so blest
Is trampled with scorn by the sons of the west.
And the maidens, tho' beautious, are dusky, not fair,
And the roses, tho' bright, not uncultured, grow there ;
Yet all is not false that the minstrel has sung,
Save the veil of poetic enchantment he flung.
The night's moonlight beauty is soft as he told,
The day-beam as gorgeously bright to behold,
And the glories of sunset that light up the skies
Might ravish with rapture unprejudiced eyes.
But that fairy-like blending of gems, lights and flowers,
And that meeting of merry young groups of the gay
And the lovely, beguiling the sweet moonlight hours
With sport, love and music, with dancing and play
O these are not there, for the maidens and youths
May mingle O never in moments of mirth ;
Let my muse then confine her to genuine truths,
And sing the sad tale of a daughter of earth."

(*A tale of Cashmere*)

কবি মুর কাশ্মীর দর্শন না করিয়াও "লালা রুখ" কাব্যে যে ভাবে কল্পনার বিকাশ দেখাইয়াছেন তাহার তুলনায় তাঁহার কোনও কোনও চিত্রে সামান্য অসঙ্গতি দোষ যাহা লক্ষিত হয় তাহা মার্জ্জনীয়। ইংলণ্ডে বসিয়া কোনও কবির পক্ষে ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমানের আচার ব্যবহার ও সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা অসম্ভব। কেবল টমাস্ মুর কেন, অধিকাংশ ইংরাজ কবি ভারতবাসীর ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক অলীক কথা বলিয়াছেন। তাহা হইলেও ইংরাজি কাব্য-সাহিত্য পাঠ করিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে ইংরাজ কবির উপর প্রাচ্য প্রকৃতি কতটা

প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইংরাজের কবি-হৃদয়ে বাহিরের জগত যতটা প্রবেশ করে, বাঙ্গালীর কবি হৃদয়ে ততটা প্রবেশ করিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান যুগে ভারতের সর্ব্বপ্রধান বাঙ্গালী কবি একাধিক বার প্রতীচ্যের প্রায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহার তুলিকা বিদেশের কোনও উৎকৃষ্ট ছবি আঁকিয়াছে বলিয়া ত আমরা জানি না। রবীন্দ্রনাথ প্রতীচ্যের অন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি বাহ্য প্রকৃতির সিংহদ্বার দিয়া ভিতরে ঢুকিতে পারেন নাই। ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের হৃদয়-স্পন্দন অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইংরাজ কবি কিন্তু প্রাচ্য প্রকৃতির ভিতর দিয়া প্রাচ্যের হৃদয়-স্পন্দন অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারত-প্রবাসী ইংরাজ কবির দর্পণে সেই জন্য আমাদের জাতীয়-জীবনের যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে তাহা সুস্পষ্ট সুন্দর ও যাথার্থ্যের অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। টমাস্ মুরের পরবর্ত্তী যুগে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে প্রবাসী ইংরাজ কবির লেখনী প্রসূত প্রাচ্য-প্রকৃতির পদ্যময় বর্ণনা পাঠ করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি ও ভাবুকতা অনেক সময়ে বহির্জগতের আড়াল সরাইয়া ভারতের অন্তর্জগতে মহাপ্রাণের সাড়া পাইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে মুরের "লালা রুখ" কাব্যের উক্ত প্রথা সম্বন্ধে হোরেস্ হেম্যান্ উইলসনের (Horace Hayman Wilson) রচিত একটি কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"But chief do India's simple daughters
Assemble in these hallowed waters,
With vase of classic model laden,
Like Grecian girl or Tuscan maiden,
Collecting thus their *urns* to fill
From gushing fount or trickling rill,
And still with pious fervour they
To Gunga veneration pay ;
And with pretenceless rite prefer
The wishes of their hearts to her.
The maid or matron, as she throws
Champa or lotus, *Bel* or rose,
Or sends the quivering light afloat
In shallow cup or paper boat,
Prays for a parent's peace and wealth,
Prays for child's success and health,
For a fond husband breathes a prayer,
For progeny their loves to share ;
For what of good on earth is given
To lowly life, or hope in heaven."

বিগত শতাব্দীতে আর একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কবি, যিনি ইংরাজি ভাষার কাব্য-সংসারে "বুলবুল অব্ ইণ্ডিয়া" (Bulbul of India), এই নামে সুপরিচিত, উক্ত প্রথা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

Scene on The Ganges.

"The shades of evening veil the lofty spires
Of proud Benares' fanes ! A thickening haze
Hangs o'er the stream. The weary boatmen raise
Along the dusky shore their crimson fires
That tinge the circling groups. Now hope inspires
You Hindu maid, whose heart true passion sways,
To launch on Gunga's flood the glimmering rays
Of love's frail lamp, but, to the light expires !
Alas ! what sudden sorrow fills her breast !
No charm of life remains. Her tears deplore
A lover lost : and never, never more
Shall hope's sweet vision yield her spirit rest !
The cold wave quenched the flame—an omen dread
That telleth of the faithless, *or the dead* !"

বলা বাহুল্য, হিন্দুদিগের 'ভুয়া ভুয়া' উৎসবের যে চিত্র টমাস্ মুর 'লালা রুখ'-কাব্যে কল্পনার সাহায্যে অঙ্কিত করিয়াছেন, উপরোক্ত ভারত-প্রবাসী ইংরাজ কবিদ্বয় সেই চিত্র এই উৎসব স্বচক্ষে দেখিয়া ইংরাজি পদ্যে অনুদিত করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুললনার হৃদয়ে যে কতটা প্রেম আছে ইংরাজ কবিরা তাহার খবর লইয়াছেন। মিসেস্ কারসোরের রচিত "বিয়ারা পার্ব্বণ," নামক কবিতায় মুসলমান রমণী হৃদয়গত গভীর প্রেমের বিকশিত সৌন্দর্য্যে কবির তুলিকা আঁকিয়া দেখাইয়াছে। রাজকুমারী লালা রুখের ন্যায় এই মহিলা-কবি গঙ্গাবক্ষে ভাসমান প্রদীপের আলোকে আশা ভরসায় পূর্ণ মানব-হৃদয়ের কাহিনী পাঠ করিয়াছিলেন।

"How eager eyes all watched the lonely light
As jocundly it glided out of sight ;
But was the omen's promise all fulfilled ?
O ! who may say, perchance it was, perchance
In vain, the maiden all her hopes did build
Upon it, and with disappointed glance
Saw them all fade away. Such is, alas !
Many a heart's sad history ; let it pass."

হতভাগিনী।

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু]

(১)

বিশ্বেশ্বর মিত্র মহাশয় স্বয়ং কন্যা দেখিয়া কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিলেন। তিনি বৈবাহিকের নিকট কিছুরই প্রত্যাশা করেন নাই, শুধু কন্যার রূপ গুণ দেখিয়া শুনিয়াই মালতীকে পুত্রবধূ করিয়াছিলেন। আর মালতীর পিতা শুধু শাঁখা সাড়ী দিয়া একমাত্র কন্যাকে জমীদার পুত্রবধূ করিতে পারিয়াছেন মনে ভাবিয়া আশাতীত আনন্দে তীর্থযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

নববধূর পাল্কীখানি যখন শঙ্খ ও উলুধ্বনির আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে অন্দরে প্রবেশ করিল, তখন মিত্র-গৃহিণী জগদম্বা, বধূবরণ করিয়া ঘরে তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; পাল্কী আসিলে তাহার মধ্য হইতে বধূকে নামান হইল। মালতীর অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ, কমনীয় দেহলতার স্নিগ্ধ সৌরভ সকলের মনটাকেই আকৃষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু মিত্রগৃহিণী জগদম্বা মালতীকে দেখিয়া একটুকুও সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। মালতীর আভরণশূন্য হস্ত, অলঙ্কারবিহীন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়া মনে মনে তিনি আগুন হইয়া উঠিলেন। কোথা হইতে নির্ব্বোধ স্বামী তাঁহার এ লক্ষীছাড়া ঘরের মেয়ে ঘরে আনিল! পুত্রের বরশয্যা প্রভৃতির কোন সম্বন্ধ ত নাই, শুধু হাতে একটা এক ভরির আংটী দিয়াছে; কিন্তু মেয়ের গায়ে সোণার আঁচড় পর্য্যন্ত নাই; ক্রোধে তিনি বরণ পর্য্যন্ত করিলেন না। পুত্রের বিবাহে জননীর কত আনন্দ! ভাবিয়াছিলেন হাজার গরীব হইলেও জমীদার ঘরের পুত্রবধূ করিবার জন্য যখন পিতা কন্যার বিবাহ দিতেছেন, তখন কি শুধু শাঁখা সাড়ী দিয়া মেয়ে পার করিতে পারে? অন্ততঃ হাজার টাকার গহনা দিবেই, আর বরশয্যাও কিছু না দিয়া পারিবে না। একে জমিদার পুত্র, তাহার উপর বিবাহে পণ নাই। কিন্তু হা অদৃষ্ট! সব কল্পনা স্বপ্নে পর্য্যবসিত হইল।

বধূকে বরণ করিয়া সকলে ঘরে তুলিলেন। গৃহিণী এক পার্শ্বে নীরবে বসিয়া বসিয়া ক্রোধে ফুলিয়া উঠিতে-ছিলেন। কান্ত পিসি গৃহিণীর নিকট গিয়া বলিলেন, “ও জগ, তোর ছোট ছেলের বৌ কিন্তু খাসা বৌ হ'য়েছে। যেমন রং তেমনি গড়ন, যেন মা লক্ষী।”

দক্ষিণ বাড়ীর বড় গিন্নী বলিলেন, “যা ব'লেছ কান্ত পিসি, এমন একটী মেয়ে পাড়াগাঁয়ে বড় দেখা যায় না। মুখখানি হাসি হাসি; চোখ দুটিও বেশ শান্ত। তা দিদি, তোমার বড় বৌয়ের চেয়ে ছোট বৌ সুন্দরী। এখন তোমার ভাল হলেই ভাল।” গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, “কি বল তোমরা? রূপ কখন কি চোখে দেখনি? ও কি রূপ; ওকে আবার সুন্দরী বল তোমরা! আর শুধু রূপই যদি চাও তাহ'লে হাড়ি ডোমের ঘরেও ত এমন অনেক রূপসী আছে তাদের কেন ঘরে লওনা। ও মা, কি ছোটলোক, কি প্রবৃত্তি, মেয়েকে একটু সোণা পর্য্যন্ত দেয় নি। এমন ছোটলোকের ঘর থেকে মেয়ে এনেছে।” একটুখানি চুপ করিয়া আবার কহিলেন, “আহা, কি রূপসী বৌ! ওই আবার রূপ! ছাই রূপ, বড় বৌমার রূপের কাছে ও ছোটলোকের মেয়ের রূপের তুলনা হয় না। তার পায়ের কাছে এ হতভাগীর মাথা রাখবারও স্থান হওয়া উচিত নয়।”

বড়বধূ একজন ধনী কন্যা, তাহার পিতা কন্যার বিবাহে অনেক দান সামগ্রী, বরশয্যা প্রভৃতি দিয়াছিলেন, এবং এখনও যথেষ্ট খরচ করিয়া তত্ত্ব পাঠাইয়া থাকেন, তাহা প্রতিবেশিনীগণ জানিতেন। তাই দত্তগৃহিণী বলিলেন, “সকলেই ত আর বড়লোক নয় দিদি। সকলের অবস্থা কি সমান? তাদের যদি ক্ষমতা থাকত তা' হলে কি মেয়ে জামাইকে”—বাধা দিয়া বিরক্তভাবে গৃহিণী কহি-লেন, “তাইত্বে সমান ঘরে কাজ করতে হয়, এমন ছোট-লোকের ঘরে কে কাজ করতে চেয়েছিল?”

দত্তগৃহিণী কহিলেন, "কিন্তু বাপ্‌হ'মার তা ত' হয়ে গেছে, এখন বৌকে ত আর ফেলতে পারবে না। আর গরীবের ঘরের মেয়েরাই শিষ্ট, শান্ত, লক্ষ্মী। তোমার নূতন বৌয়ের মুখের দিকে ভাল করে একবার চেয়ে দেখ, বুঝতে পারবে তোমার ঘরে রত্ন এসেছে।" গৃহিণী চীৎকার করিয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন, "এ সব রত্ন তোমাদের মত রত্নের ঘরেই শোভা পায়, জমিদার ঘরে ঘুঁটে কুড়ুনীর আদর হয় না।" "তা' ঠিক" বলিয়া দত্তগৃহিণী একটু ম্লান হাসি হাসিলেন। প্রতিবেশিনীগণ মালতীর ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট ভাবিয়া তাহারই আলোচনা করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন। যাইবার সময় দত্তগৃহিণী একবার মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিলেন, হায়! এমন স্থলপদ্মের মত মুখখানি অকালেই কি শুকাইয়া যাইবে? ওই পবিত্র, করুণ-বেদনা-ব্যথিত নয়ন আজ শাশুড়ীর বাক্য যন্ত্রণায় অশ্রুভরে টলমল করিতেছে; লক্ষ্মীরূপা এই দেবী প্রতিমার অদৃষ্টে কত দুঃখ লিখিয়াছ ভগবান!

(২)

মালতীর বিবাহের পর একটী বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে মালতীর পিত্রালয়ে যাওয়া ঘটে নাই। মালতীর পিতা তিন চারিবার কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু বৈবাহিকার অজস্র তিরস্কারে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে মালতীর শোকে তাহার জননী শয্যাগ্রহণ করেন। পিতা আবার কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য বৈবাহিকার নিকট শেষ মিনতি করিতে আসিলেন, কিন্তু গৃহিণী কহিলেন, 'তাঁহাদের বধূ জীবনে কখন আর ছোটলোক বাপের ঘরে যাইতে পাইবে না।' নিদারুণ ব্যথায় ব্যথিত হইয়া মালতীর পিতা ফিরিয়া গেলেন। পত্নীকে সব কথা বলিলেন, বজ্রাঘাতের মত একটা আঘাত পত্নীর বক্ষঃপঞ্জর জ্বালাইয়া পুড়াইয়া দিয়া গেল। স্নেহময়ী জননী কন্যার অদর্শন যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া পৃথিবীর নিকট বিদায় লইলেন। মালতীর পিতাও পত্নীর মৃত্যুর পর শোকতাপদগ্ধ প্রাণটা লইয়া কাশীধামে চলিয়া গেলেন। মিত্র মহাশয় প্রায় মালতীর পিত্রালয়ে যাইতেন। মালতীর মাতার মৃত্যু সময়েও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু বাড়ীতে কেহ সে সংবাদ পায় নাই। মালতী একদিন স্বামীর মুখে সব খবর পাইয়া অশ্রুজলে মাটী ভিজাইল। চীৎকার করিয়া কাঁদিলে শ্বশ্রূমাতার তীব্র ভর্ৎসনা সহ্য করিতে হইবে, তাই হতভাগিনী কাঁদিয়াও তৃপ্তি পাইল না। অত বড় শোক বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া শুধু চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল। স্বামী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বুকে তুলিয়া লইলে মালতী সব শোক বিস্মৃত হইয়া যাইত। স্বামীর প্রসারিত বক্ষে আশ্রয় পাইয়া মুখের দিকে করুণ ভাবে তাকাইয়া একটা তৃপ্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ করিত। মিত্র মহাশয় মালতীর সম্মুখে আসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতেন, "মা লক্ষ্মী! তোমার মায়ের শোক একটু বেশী লাগবে জানি, কিন্তু তবু তা' তোমায় সহ্য করতে হবে, কিন্তু তোমার বাপের অভাব তুমি অনুভব করতে পারবে না। বাড়ীর সকলের সহিত একটা অবশ্যম্ভাবী বিবাদ হবে জেনেই তোমায় আমি মায়ের মৃত্যু সময়ে বাপের বাড়ীতে পাঠাই নাই, সে আমার অপরাধ। আমি তোমায় ঘরে এনেছি, সংসারে লক্ষ্মী-প্রতিষ্ঠা করেছি, শাশুড়ীর অত্যাচার, নিদারুণ যন্ত্রণা, সংসারে সব যে তোমায় বুক পেতে সহ্য করতে হবে মা! আজ তুমি মাতৃহারা, কিন্তু পিতৃহারা হও নাই; যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন তোমার কিসের অভাব মা!" মালতী শ্বশুরের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া ডাকিল—"বাবা।"

(৩)

দিন কখন সমান যায় না। মালতী শাশুড়ীর অত্যাচার যন্ত্রণা শ্বশুরের স্নেহ-সমুদ্রে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিত। স্বামীর অগাধ ভালবাসায় সব ভুলিয়া যাইত, কিন্তু এ সুখ সৌভাগ্যও তাহার অদৃষ্টে অধিক দিন ঘটিল না। একটা নিষ্ঠুর দানব আসিয়া তাঁহাকে সব ভালবাসা স্নেহ-সমুদ্রের মাঝখান হইতে টানিয়া তুলিয়া একটা দুরন্ত অত্যাচারের অন্ধকারময় গর্ত্তে ফেলিয়া দিল, মালতী সর্ব্বস্ব হারাইল। যে প্রসারিত বক্ষে তাহার অবাধ অধিকার, যাহার বুকের উপর মাথা

রাখিয়া সে কত কাঁদিয়াছে, যে বক্ষখানিকে আশ্রয় করিয়া সকল অত্যাচারের মধ্যেও শান্তির পুণ্য জ্যোতিঃ, পূর্ণ আনন্দ, অফুরন্ত তৃপ্তি সে অনুভব করিত, কোন্ পাপে, কার অভিশাপে, কোন্ নিষ্ঠুর দানবের অগ্নিময় নিশ্বাসস্পর্শে তাহাকে চির হতভাগিনী করিয়া তিনি সরিয়া গেলেন। বিধবা হইবার কিছুদিন পরেই আবার একটা নিদারুণ ব্যথা তাহার কোমল কাতর বক্ষখানিকে ভাঙ্গিয়া দিল। যে পিতৃতুল্য শ্বশুরের পবিত্র স্নেহে সে স্বামীর শোকটাকেও ভুলিতেছিল, যাঁহার স্নিগ্ধ করস্পর্শ সে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত নিয়ত মস্তকে অনুভব করিয়া তাহার অতৃপ্ত কাতর হৃদয়কে শান্ত করিতেছিল, হতভাগিনী আজ তাহার দগ্ধ অদৃষ্টের ফলে তাহাও হারাইয়া বসিল। পুত্রবধূকে সংসারের নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া মিত্র মহাশয়ও ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

পুত্রহারা হইবার অল্পদিন পরেই কন্যা কিরণ বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে আগমন করিল। উপর্য্যুপরি দুটী আঘাতে মিত্রমহাশয়ের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। পুত্র শোকের প্রবল তরঙ্গ যখন তাহার বুকটার মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া হৃদপিণ্ডটাকে আঘাত করিতেছিল তখন জামাতার মৃত্যু সংবাদ সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বক্ষঃ স্পন্দন একেবারে থামাইয়া দিল। মালতীর অদৃষ্টের দোষ! সে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই যখন এই সব সর্ব্বনাশ ঘটিতে আরম্ভ করিল তখন সে অলক্ষণা ছাড়া আর কি? গৃহিণীর চোখের উপর মালতী পড়িলে আর রক্ষা থাকিত না; যখনই তাহাকে দেখিতেন তখনই "অলক্ষণা, রাক্ষসী, তুই আমার বাছাকে খেয়েছিস, তোর জন্য সোণার জামাই আমার মরেছে, এমন সোণার সংসার তোর নিশ্বাসে পুড়েছে, কি রাক্ষসী বৌ ঘরে এসেছিল রে" এই সব মধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া মালতীর বক্ষে বজ্র হানিতেন। কিন্তু হায়! দোষ কি তাহার? মালতী ত শত চেষ্টা করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছে তাহার কোন্ পাপে এ সর্ব্বনাশ ঘটিল! কি তাহার অপরাধ? সে ত' নিজেই জানেনা সে কি দোষে দোষী; তবে কি পূর্ব্ব জন্মের পাপ? দোষ কি সত্যই তাহার? না, যিনি জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা সেই বিধাতার; অথবা স্ব স্ব অদৃষ্টের?

(৪)

দিন দিন শ্বশ্রূমাতার লাঞ্ছনা গঞ্জনায় মালতী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। অনেক সময় সে মনে ভাবিয়াছে এ নিদারুণ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না, যে দিকে দুয় চলিয়া যাই, কিন্তু তথাপি এই স্নেহ-প্রীতি মাখা স্বামীর স্মৃতি বিজড়িত, দেবতা শ্বশুরের পুণ্য নিকেতন, তাঁহারা নাই বলিয়া কি সে আজ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে? আর যাইবেই বা কোথায়? এ পৃথিবীতে তাহার আপনার বলিতে আর কে আছে? হিন্দুনারীর সর্ব্বাপেক্ষা যাহা আপনার, যেখানে অবাধ অধিকার, যে বাড়ীর মৃত্তিকা পর্য্যন্ত তাহার নিকট চির-পবিত্র সেই রমণীয় চির-প্রিয় স্থান শ্বশুরভবনে যদি তাহার স্থান না হয়, তবে এত বড় পৃথিবীটার মধ্যে আর কোথায় সে আশ্রয় পাইবে? তাই হতভাগিনী মালতী বুকের অশ্রু বুকে চাপিয়াই পড়িয়া রহিল।

এই বিরাট সংসারক্ষেত্রে তাহার একমাত্র শান্তির স্থান ছিল ক্ষুদ্র এক শিশু। মালতী যখন অসহ্য মর্ম্মযাতনায় দগ্ধ হইয়া ঈশ্বরের নিকট মরণ কামনা করিত, যখন মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া অশ্রুজলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে, মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিত, "ওগো দয়াময়, এত নিষ্ঠুর কেন তুমি? কি দোষে এ শাস্তি দিতেছ আমার, আমি কি করেছি? ওগো পরমেশ্বর, আমাকে আমার স্বামীর কাছে, আমার শ্বশুরের কাছে পাঠাইয়া দাও, এ যন্ত্রণা আর যে আমি সহ্য করিতে পারি না, আমায় মৃত্যু দাও ভগবান্!" তখন ক্ষুদ্র শিশু নাচিতে নাচিতে আসিয়া তাহার সেই ক্ষুদ্র কোমল হাত দুখানি দিয়া মালতীর কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া বলিত, "মা, মা, কোলে" তখন মালতীর দুঃখ যাতনা পূর্ণ হৃদয়ে যেন কি এক পুলক লহরী নাচিয়া উঠিত। ব্যগ্র বাহু বেষ্টনে বালককে কোলে লইয়া তাহার সেই কমনীয় অধরে শত চুম্বন দিয়া বলিত, "ওরে তুই আমার শান্তি, তোর মায়ায় এখনও বাঁচিয়া আছি, শুধু তোর মুখ চাহিয়াই মরিতে পারি না আমি।"

কিরণ পিত্রালয়ে আসিয়া ভ্রাতৃবধূ মালতীর উপর পুত্রের ভার চাপাইয়া দিয়াছিল। স্বামী-বিয়োগ-বিধুরা মালতী দুঃখের নিদারুণ কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াও কিরণের সন্তানকে পালন করিতেছিল। বালক এখন কিরণকে দিদি বলিয়া ডাকে, সে জানে মালতী তাহার মা, খোকা একদণ্ড মালতীর কাছ ছাড়া হয় না, একটু চক্ষের অন্তরাল হইলে মালতীও ভাবনায় আকুল হইয়া উঠে। সেদিন খোকা বাহিরে বসিয়া খেলা করিতেছিল আর মালতী শ্বশ্রূমাতার তীব্র তিরস্কারে নির্জ্জন কক্ষে অশ্রু-ধারায় বুক ভাসাইতেছিল। কিরণ পুত্রকে বাহিরে খেলায় মত্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খোকা, তোর মা কোথায় রে?" খোকা দুই চক্ষে হাত দিয়া কিরণকে বুঝাইয়া দিল, মা কাঁদিতেছে। কিরণ খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার পর সন্তানকে মালতীর কোলে দিয়া বলিল, "কাঁদিস কেন বোন, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই, সবই ভগবানের হাত, বিধির লেখা আমরা কি খণ্ডন করতে পারি? শুধু কাঁদলে যদি সব দুঃখ কষ্ট ভোলা যেত, চক্ষের জলে মাটী ভিজাইলে যদি সব ফিরিয়া আসিত, তাহা হইলে ভাবনা কি ছিল? আমিও যে বোন, সব হারাইয়াছি, আমিও যে তোর মত দুঃখিনী।"

মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দিদি, তোমার তবু একটা অবলম্বন আছে, সংসারে পরিচয় দেবার মত, দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সান্ত্বনার স্থল আছে, কিন্তু আমার যে কিছু নেই, আমি যে একা!"

কিরণ কহিল, "তুই এখন আর একা কোথায় বোন; খোকা যে তোরই সন্তান, ওর উপর আমার আর কোন অধিকার নাই। আমি ওকে তোর হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত। হতভাগ্য সন্তান জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই পিতাকে খেয়েছে। তাই আমি ওর মুখের দিকে তেমন ভাবে চাইতে পারি না, ওকে দেখলে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। তুই ওর মায়ের আসন গ্রহণ করে আমায় নিশ্চিন্ত ক'রেছিস, মালতী, নতুবা মায়ের কর্ত্তব্য আমি পালন করতে পারতেম না।"

"কিন্তু দিদি"—মালতী আর বলিতে পারিল না, চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল, শীতের শিশিরসিক্ত গোলাপের মত মালতীর মুখখানি অশ্রুধারায় স্নাত হইয়া গেল। কিরণ সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "কাঁদিস নে বোন, চুপ কর, অদৃষ্টে যা আছে কেউ তা রোধ করতে পারে না। আমার মায়ের অত্যাচার খোকার মুখ চেয়ে সহ্য কর মালতী।"

মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া খোকা এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এইবার সে মালতীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। দুই হস্তে কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া মুখের দিকে চাহিয়া আধ আধ স্বরে বলিল, "মা, মা, কাঁদিস নে, চুপ কর" বলিয়া তাহার ছোট হাত দুইখানি দিয়া মালতীর চক্ষের জল মুছাইয়া দিতে লাগিল। কোথায় সে অত্যাচার-প্রপীড়িতা মালতীর বুকভরা নিদারুণ যন্ত্রণা! তাহার সে মর্ম্মব্যথা, সে কাতরতা মুহূর্ত্তে কোথায় ভাসিয়া গেল। খোকাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া মালতী কহিল, "দিদি, দিদি, কি রত্ন দিয়েছ আমাকে! সংসারে এর চেয়ে বড় যে আমার আর কেউ নাই!"

(৫)

কয়েকদিন হইতে মালতীর জ্বর হইয়াছিল, আজ তিন দিন সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এ তিন দিবস সে একরূপ অনাহারেই আছে, কিরণ একটু একটু দুধ গরম করিয়া আনিয়া দিয়াছে, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও শুধু কিরণের অনুরোধে তাহাই খাইয়াছে। আজ একাদশী। অভাগিনী মালতী অনাহারে, জ্বরের প্রকোপে শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিল। অপরাহ্নের সুলোহিত তপন পশ্চিম দিগন্ত শোভা ম্লান করিয়া ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছিলেন, পাখীগুলি অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে বনভূমি মুখরিত করিয়া নীড়ে ফিরিতেছিল, মুক্ত প্রকৃতির বক্ষের উপর দিয়া হিমসিক্ত বাতাস উন্মত্তের মত ছুটিয়া আসিয়া মালতীর সারা দেহ-খানিকে কাঁপাইয়া দিতেছিল। মালতী কাতরস্বরে বলিল, "উঃ মাগো"। এমন সময় বজ্রের মত তাহার কর্ণে বাজিয়া উঠিল, "ও নবাবের বেটী, এমন ক'রে শুয়ে শুয়ে কতদিন কাটাবে? নিচে থেকে দুধটা গরম ক'রে আনলে হাতে কি [illegible]? তোমার বাপের বাড়ী ক'টা দাসী বাঁদী কাজ

কখন্ত যে এখানে এসে রাজরাণীর মত পালঙ্কে শুয়ে থাকবে? ছোটলোকের মেয়ে, একটা কাজ করতেও কি তোর বাপ মা শেখায় নি?"

মালতী কোন কথা কহিল না, নীরব কাতর দৃষ্টিতে শুধু শ্বশ্রূমাতার মুখের দিকে চাহিল, ব্যথাভরা নয়ন দুইটীর কোণ দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া তাহার শীর্ণ গণ্ডে মুক্তার মত জল জল করিতে লাগিল।

গৃহিণীর কর্কশ কণ্ঠ আবার গর্জ্জিয়া উঠিল, "বলি এখনও যে শুয়ে আছিস? কিরণের আজ একাদশী সে গা ধুতে গেছে, বড়বৌমা রাঁধছে, তুই রাজরাণীর মত বিছানায় ঘুমুবি? ওঠ্ ছোটলোকের মেয়ে।"

সে কণ্ঠস্বরে কে এমন মানুষ আছে যে চুপ করিয়া থাকিতে পারে? মালতী উঠিল, সেই জ্বর-বিকম্পিত দেহ লইয়া দেওয়াল ধরিয়া ধীরে ধীরে নিচে নামিয়া আসিল। তাহার মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ শব্দ হইতেছিল, সমস্ত দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, কিন্তু তথাপি উপায় নাই, শাশুড়ীর আদেশ, যতক্ষণ না জীবনের শেষ হইবে ততক্ষণ তাহা পালন করিতেই হইবে। ভগবান যখন তাহাকে নিষ্ঠুর ভাবে আহত করিয়া সংসারে ফেলিয়া রাখিয়াছেন, তখন শত অত্যাচারের মধ্যেও তাহাকে বুকের আগুন বুকে চাপিয়া ধরিয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে। ইহার কোন প্রতীকার সে করিতে পারিবে না, ইহার প্রতীকার নাই। কি করিয়া প্রতীকার করিবে? সে ত' তাহার সাধ্যমত সংসারের কার্য্য করিতে কার্পণ্য করে না, কিন্তু তথাপি শাশুড়ী তাহাকে একদিনের জন্য একটা মিষ্ট কথা বলেন নাই। সে ত' এ সংসারে দাসীর ন্যায় খাটিতেই আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে সে দাসীত্বের অধিকার হইতে নামাইয়া শুধু তীব্র ভর্ৎসনায় ক্ষত বিক্ষত করা হইতেছে। হতভাগিনীর সকল জ্বালার নিবৃত্তি হইত যদি সে মরিতে পারিত! কিন্তু মরণটাকেও ত সে এখন আর কামনা করে না, তাহার ভাঙ্গা বুকের অনেকখানি জুড়িয়া যে খোকা বসিয়া আছে, তাহাকে রাখিয়া কেমন করিয়া মরিবে সে! খোকা যে তাহার নিরালম্ব জীবনের একমাত্র আলোক, তাহার দগ্ধ অদৃষ্ট আকাশের একমাত্র ধ্রুবতারা—তাহার সর্ব্বস্ব। খোকাই যে এতদিন তাহার ক্ষত বিক্ষত বক্ষে প্রলেপ দিয়া সংসারে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

মালতী নিচে আসিয়া দেখিল খোকা দুধের প্রায় অর্দ্ধাংশ ফেলিয়া দিয়াছে। বড় বধূ রান্নাঘরে, দাস দাসীরাও যে যাহার কার্য্যে ব্যস্ত, কেহ সেদিকে লক্ষ্য করে নাই। মালতী কাঁপিতে কাঁপিতে অবশিষ্ট দুধটুকুই জ্বাল দিতে আরম্ভ করিল। খোকা মালতীর নিকটে আসিয়া তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল, মালতী তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "করিস কি হতভাগা, পুড়ে মরবি যে।"

খোকা অভিমানে উনানের এক পার্শ্বে গিয়া মুখ ফুলাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মালতী দুগ্ধ জ্বাল দিয়া বাটীতে সেগুলি রাখিয়া একটা থালার উপর করিয়া সাজাইয়া উপরে লইয়া চলিল। সিঁড়ির কয়েক ধাপ থাকিতেই নিচে হইতে খোকার উচ্চ কান্নার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার রোগ দুর্ব্বল মস্তকটী ঘুরিয়া উঠিল, দ্রুত পদে নিচে নামিয়া আসিতে হস্ত হইতে দুগ্ধপূর্ণ বাটী-থালা পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে মালতীও অচৈতন্য হইয়া গড়াইতে গড়াইতে নিচে আসিয়া পড়িল।

থালা বাটীর ঝন্ ঝন্ শব্দে ও খোকার বিকট ক্রন্দনে গৃহিণী নিচে নামিয়া আসিলেন। দেখিলেন সমস্ত দুগ্ধ সিঁড়ি দিয়া গড়াইতেছে, থালা বাটী চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে; ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল, "হতভাগী, রাক্ষসী সমস্ত দুধ ফেলে দিয়ে এখন আবার মূর্চ্ছার ভান ক'রে পড়ে থাকা হয়েছে?" বলিতে বলিতে ভূপতিতা সংজ্ঞাশূন্যা মালতীর কোমল বক্ষে সজোরে কয়েকটী পদাঘাত করিলেন, কিন্তু মালতী নিশ্চল। খোকা আবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, গৃহিণী দ্রুতপদে তথায় ছুটিয়া গেলেন, তিনিও চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কিরণ গা ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল খোকার গায়ের জামা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। দ্রুতপদে ছুটিয়া গিয়া জ্বলন্ত জামাটী খোকার অঙ্গ হইতে খুলিয়া ফেলিয়া দিল, খোকার সর্ব্বাঙ্গ তখন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে একবার "মা, মা" করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। বহির্ব্বাটী হইতে গৃহিণীর

জ্যেষ্ঠ পুত্র জমীদার রমেশচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে ধরাধরি করিয়া খোকাকে উপরে লইয়া গেল। কিরণ আসিয়া মালতীর সম্মুখে বসিয়া তাহার অঙ্গ ধরিয়া নাড়া দিয়া ডাকিল, "মালতী, মালতী!" কোন উত্তর পাইল না, বক্ষে হাত দিয়া দেখিল স্পন্দনহীন, কিরণ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রমেশবাবু খোকার জন্য তখনই ডাক্তার ডাকিতে লোক পাঠাইলেন, অবিলম্বে ডাক্তারবাবু আসিলেন। খোকাকে দেখিয়া মালতীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "দুর্ব্বল শরীর, হার্টফেল হইয়া মৃত্যু হইয়াছে। এমন অনেক হয়, তাহাতে সিঁড়ির উপর দিয়া পড়িয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আসিলে বাঁচাইতে পারিতাম বোধ হয়। অধিকক্ষণ মৃত্যু হয় নাই, শরীরে এখনও উত্তাপ আছে।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। রমেশবাবু বাড়ীর সকলকে ডাকিয়া মালতীর দেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার আদেশ প্রদান করিলেন।

(৬)

সন্ধ্যাপ্রমাণ। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী রজনীর ঘোর অন্ধকার ভীষণ শ্মশানভূমি গ্রাস করিতে বসিয়াছে। ঘন-কৃষ্ণবর্ণ মেঘে সমস্ত নৈশ গগন পরিপ্লাবিত। তারাশূন্য আকাশ কি এক ভয়াবহ মূর্ত্তি লইয়া আজ সমস্ত পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অকস্মাৎ কাদম্বিনী শ্রেণী গুরু গম্ভীর নাদে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বাত্যায় রজনীকে আরও ভীষণতর করিয়া তুলিল। এই ঝটিকা-স্রোতপ্লুত অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্মশান বক্ষে মৃতদেহ লইয়া মিত্র বাড়ীর কয়েকজন লোক আসিয়া দাঁড়াইল। একজনের হস্তে একটী বহুদিনের পুরাতন লণ্ঠন ছিল, তাহাতেই কোনরূপে পথ দেখিয়া সকলে শ্মশান পর্য্যন্ত আসিতে সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু প্রবল ঝটিকা বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া দুই একবার দপ্ দপ্ শব্দ করিতে করিতে তাহাও নিভিয়া গেল। মৃতদেহ নামাইয়া সেই অন্ধকারময় শ্মশানে বসিয়া সকলেই পরামর্শ করিতে বসিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা ভাবিয়া পাইলনা যে এই দুর্য্যোগে কেমন করিয়া চিতা ধরান সম্ভব হইতে পারে। দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি আসিল এবং সেই সঙ্গে সকলের কর্ণে যেন কি একটা অদ্ভুত শব্দ প্রবেশ করিল। সকলেই ভীত হইয়া উঠিল, একবার মৃতার চালির দিকে চাহিল, অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল না। কিন্তু আবার যেন সকলের কর্ণে সেই শব্দ প্রবেশ করিল। শব্দ মৃতদেহের নিকট হইতেই আসিতেছিল, ঠিক যেন মানুষের কণ্ঠস্বরের মত। আর আলোকবিহীন অবস্থায় শ্মশানে অবস্থান যুক্তিযুক্ত নয় বিবেচনা করিয়া সেই অন্ধকারময় শ্মশানে মালতীর দেহ ফেলিয়া রাখিয়া সকলে চলিয়া গেল। ঘোররবে বজ্রনাদ, প্রবল জোরে ঝটিকার সহিত বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন যে মালতীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু মালতী মরে নাই। সে যখন সিঁড়ির উপর হইতে দেখিল খোকার জামায় আগুন ধরিয়া গিয়াছে তখন তাহার রোগদুর্ব্বল মস্তকটী ঘুরিয়া উঠিল। একটা অজানা ভয় ও ব্যাকুলতা তাহার সমস্ত স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল, তাই সে গড়াইতে গড়াইতে সিঁড়ি হইতে একেবারে নিচে আসিয়া পড়িল। তাহার পর সেই মূর্চ্ছাবস্থাতে শাশুড়ীর পদাঘাতে হৃৎপিণ্ডের সমস্ত রক্ত জমাট বাঁধিয়া তাহাকে মড়ার মতই করিয়া ফেলিয়াছিল। হয়ত আর দুই একটা পদাঘাত বক্ষে পড়িলে হতভাগিনীর সমস্ত যন্ত্রণারই অবসান হইয়া যাইত, কিন্তু ভগবান তাহা হইতে দিলেন না, হতভাগিনীর অদৃষ্টে যে দুঃখটুকু তিনি লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ উপভোগ না করিয়া সে মরিবে কেমন করিয়া? তাই অভাগিনী মরিয়াও বাঁচিয়া রহিল। যে দুঃখ কষ্ট তাহার জন্য তোলা রহিয়াছে তাহা তাহাকে ভোগ করিতে হইবে বলিয়াই ঘোর বজ্রাঘাত, ঝঞ্ঝা, বৃষ্টিতে শববাহকদের প্রাণে আতঙ্ক জন্মাইয়া বিধাতা তাহাদের শ্মশান হইতে দূরে পাঠাইয়া দিলেন। আজ যদি মালতীর সব দুঃখ কষ্টের অবসান হইয়া যাইত, যদি আর কোন ভোগ তাহার অদৃষ্টে নাই থাকিত, তাহা হইলে ত' সে চিতায় পুড়িয়া মরিত। কিন্তু তাহার ভোগের যে এখনও শেষ হয় নাই, তাই সে মরিয়াও বাঁচিয়া উঠিল। যখন তাহার জ্ঞান ফুটিল তখন দেখিল এক বিরাট অন্ধকারের মধ্যে সে পড়িয়া আছে। যেখানে সে শয়ন করিত এ

ত' সে স্থান নহে, তাহার ঘরে তাহার বুকের উপর তাহার মেহের ধন একমাত্র সম্বল, নয়নের মণি তাহার অশান্তিময় জীবনের একমাত্র শান্তি খোকা যে শয়ন করিয়া থাকিত সে ত' নাই, তাহার বুক যে শূন্য। মালতী একবার ডাকিল, "খোকা" কেহ সাড়া দিল না; শুধু একটা উদাস বায়ু সেই অন্ধকারে ক্রীড়া করিয়া গেল। সভয়ে সে উঠিয়া বসিল, চক্ষের উপর অন্ধকার ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইল না। সেই ঘোর অন্ধকারে শ্মশানে বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল। সমস্ত স্মৃতি, লুপ্ত চৈতন্য এক মুহূর্ত্তে ফিরিয়া আসিয়া তাহার রুদ্ধ হৃদয় দ্বারে সজোরে আঘাত করিয়া সব কথা মনে করাইয়া দিল। সে সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়াছিল, খোকার জামায় আগুন ধরিয়াছিল, সব সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, কিন্তু তাহার পর আর কিছু তাহার মনে নাই। অকস্মাৎ বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, তাহারই ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোকে চারিদিক মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখিয়া ভয়ে সে কাঁপিয়া উঠিল। এ কি! সে কোথায় আসিয়াছে? এ যে মানবের চরমের স্থান শ্মশান প্রান্তর। তবে কি সে মরিয়াছে? অনন্ত অজ্ঞাত মরণ-যাত্রীর পথে চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে শেষ বিদায় লইয়া সে ছুটিয়া চলিয়াছে! এই কি সে চির নির্জ্জন চির অন্ধকারময় স্থান! এইখানেই কি তাহার সর্ব্বস্বধন, তাহার নারীজীবনের সম্বল, আপনার বলিতে পৃথিবীতে যা' কিছু ছিল সব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে! মালতীর নয়ন দিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, সে তীব্র আলোকে তাহার নয়ন ধাঁধিয়া গেল। কড়্ কড়্ রবে জীমূতমালা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সম্মুখে কলনাদিনী স্রোতস্বতী যমুনা। তীরে বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র, সুদূর বৃক্ষরাজি বিদ্যুতালোকে সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তবে ত সে মরে নাই, সে ত বাঁচিয়া আছে, তবে এখানে কেন? হঠাৎ একটা কথা স্মরণ করিয়া তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাই কি, তাই কি, যদি তাহাই হয় তবে আর ত তাহারা সেখানে আশ্রয় দিবে না। তাহারা যখন শ্মশানে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছে তখন সেই সঙ্গে সে বাড়ীতে তাহার প্রবেশের অধিকারও ত সে জন্মের মত হারাইয়াছে। মালতী আবেগ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "না, না, আর আমার কোন আশ্রয় নাই, পবিত্র সংসার বক্ষঃ হইতে আমি বহুদূরে পতিতা, পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিতা আমি, আমার স্থান কোথায়?—ওগো কোথায় তুমি দেবতা! হৃদয়েশ্বর! অভাগিনীর সর্ব্বস্বধন! যদি গিয়াছ তবে আমাকে এ অন্ধকূপে জীবন্মৃত রাখিয়া গেলে কেন? বড় আশায় তোমার কাছে যাইব বলিয়া আসিয়াছি, ওগো দেবতা আমার! স্বামী আমার! সর্ব্বস্ব আমার! আমাকে গ্রহণ কর। তুমি ব্যতীত আমার যে আর আশ্রয় নাই, আমাকে চরণে ঠেলিও না প্রভু।"

কেহ আসিল না, অভাগিনীর করুণ আহ্বান শ্মশান দেবতার কর্ণে পৌঁছিল না। মালতী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহার পর ঝড়ের বেগে সে এক দিকে ছুটিয়া চলিল।

ক্রমশঃ।

বৈষ্ণব সাধ্যতত্ত্ব।

[শ্রীবিপিনবিহারী দাস গুপ্ত]

প্রাপ্য পুরুষার্থ, যাহা আদর্শ—সাধক যাহা সাধনা দ্বারা প্রাপ্ত হন তাহাই সাধ্য। এই সাধ্য বা আদর্শ দেশভেদে, সমাজভেদে, মানসিক উৎকর্ষভেদে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। সুতরাং সাধ্য, আদর্শ বা ideal কখনো এক নহে। এক-এক জাতীয় সাধক এক-একটী আদর্শ ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। আবার এক অবস্থায় সাধকের যে সাধ্য, উচ্চতর অবস্থায় আর সে সাধ্য থাকে না; তখন শ্রেষ্ঠতর সাধ্য তাঁহার সাধনার বিষয় হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত রামানন্দ রায়ের এই সাধ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে গোদাবরীতীরে আলোচনা হইয়াছিল। মহাপ্রভু প্রশ্নকর্ত্তা, রামানন্দ রায়

উত্তরদাতা। মহাপ্রভু রাম রায়কে ধারাবাহিক ক্রমে নিম্নতম আদর্শ হইতে উচ্চতম আদর্শে লইয়া গেলেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিপথের আদর্শসকল এরূপ শৃঙ্খলাক্রমে উক্ত হইয়াছে যে, সাধককে সাধনার পথে ঠিক পর পর আদর্শ অবলম্বন করিতে হয়। এখানে আর একটা কথা বলা দরকার যে পাশ্চাত্যেরা একবাক্যে যাহাকে উচ্চতম আদর্শ ঠিক করিয়াছেন সেই আদর্শ হইতে রাম রায় যাত্রা সুরু করিলেন, পাশ্চাত্যদের যেখানে যাত্রার শেষ আমাদের সেখানে যাত্রার আরম্ভ। পাশ্চাত্য নীতিবিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মানুষের পক্ষে তাহার সকল প্রকার কর্ত্তব্য সুন্দররূপে সাধন করাই জীবনের পরম আদর্শ। রামরায়কে মহাপ্রভু সাধ্যসম্বন্ধে প্রশ্ন করামাত্রই রায় স্বধর্ম্মাচরণকেই সাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥

এ বিষয়ে প্রমাণ বিষ্ণুপুরাণে সগররাজার প্রতি ঔর্ব্ব বলিতেছেন—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণং॥

বর্ণাশ্রমী ও আচারবান্ পুরুষদিগের দ্বারা পরমপুরুষ বিষ্ণু আরাধিত হন। তাঁহার সন্তোষের ইহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, কিন্তু বিষ্ণু-আরাধনাহেতু বলিয়া তাহাতে ভক্তিত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ইহাকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলে। এখানে বলা হইয়াছে যে, শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করাই জীবের উদ্দেশ্য। যাঁহার যে কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে সেই কর্ত্তব্য করাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য করিবে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য করিবে। বর্ণী বর্ণীর কর্ত্তব্য করিবে, যতি যতির কর্ত্তব্য করিবে, গৃহস্থ গৃহস্থের কর্ত্তব্য করিবে। আমাদের শাস্ত্রে কর্ম্মের বিভাগ থাকিলেও পাশ্চাত্যদের সিদ্ধান্ত এবং বর্ণাশ্রমীদের সিদ্ধান্ত একই। উভয় দলই বলেন কর্ত্তব্য কর। কিন্তু মহাপ্রভু উত্তর করিলেন—

"এহো বাহ্য আগে কহ আর।"
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার॥

কেবল কর্ম্মের দিক্ দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায় যে পূর্ব্বোক্ত আদর্শে এক বিশেষ দোষ আছে। কর্ম্মমাত্রই বন্ধনের হেতু; পুণ্য কর্ম্ম, শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মও বন্ধনের হেতু। সুতরাং সে সকল কর্ম্ম করিয়া সাধক কিরূপে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইবে? এ জন্যই রাম রায় উক্ত দোষ সংশোধন করিবার জন্য উচ্চতর দ্বিতীয় আদর্শের উল্লেখ করিলেন। এ আদর্শ সম্বন্ধে ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

"হে কৌন্তেয়! যাহা কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাতে অর্পণ কর"। কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম দ্বারা জীব বদ্ধ হয় না। এই জন্যই ভগবান কর্ম্মফল তাঁহাতে অর্পণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। এইরূপ ভাবে কর্ম্ম করিলে "কর্ম্মণা ন স লিপ্যতে পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।" এই অবস্থায় নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা সাধকের হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। কিন্তু বাহ্যিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সাধকের সহিত ভগবানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় না। এই জন্য মহাপ্রভু বলিলেন "এহো বাহ্য আগে কহ আর।" রায় পরবর্ত্তী আদর্শটী উল্লেখ করিয়া বলিলেন "স্বধর্ম্মত্যাগ ভক্তিসাধ্যসার।" এ আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

"হে উদ্ধব, যে ব্যক্তি গুণ ও দোষসকল জানিয়াও আমা কর্ত্তৃক আদিষ্ট স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করে সেও উত্তম।"

শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন:—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

হে অর্জ্জুন, সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার

শরণাপন্ন হও; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব—শোক করিও না। ভগবান্ পূর্ব্ব পূর্ব্ব আজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া এখানে অর্জ্জুনকে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইতে বলিলেন। ভগবানকে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্য দিয়া ভগবানকে উপলব্ধি করা অপেক্ষা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হওয়া উচ্চতর অবস্থা। পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় ভগবানকে কর্ম্মফল অর্পণ করিলেও সাধক কর্ম্মের উপরই নির্ভর করে। কিন্তু শাস্ত্রোক্ত সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিলে ভগবানের সহিত সাধকের সম্পর্ক গাঢ়তর হয়। যাহার কোন অবলম্বন নাই, তাহার কেবল আছেন ভগবান। সাধক সকল আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অকিঞ্চন হইয়া শ্রীভগবানকে আত্মসমর্পণ করিবেন।

শরণাগত ও অকিঞ্চনের লক্ষণ এক। আত্মসমর্পণ সেই লক্ষণের অন্তর্গত।

শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ।—চরিতামৃত

হরিভক্তিবিলাসে শরণাগতির ছয়টী লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনং।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥
তৎক্রিয়াবিনিক্ষেপঃ ষড় বিধা শরণাগতিঃ॥

ভজন আনুকূল্যের সঙ্কল্প, ভজন প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন, ভগবান রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস, ভগবানকে রক্ষকরূপে বরণ, ভগবানকে আত্মনিবেদন এবং রক্ষা কর, রক্ষা কর বলিয়া ভগবানের নিকট আর্ত্তি, এই ছয়টী শরণাগতির লক্ষণ।

এ আদর্শও মহাপ্রভুর মনোনীত হইল না। ইহাকেও তিনি বাহ্যের অন্তর্ভূত করিলেন।

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার॥

মহাপ্রভুর পূর্ব্বোক্ত আদর্শ অনুমোদন না করার কারণ এই যে শরণাগতের ভক্তি নিষ্কাম নহে, কামগন্ধহীন নহে; পাপতাপশোক হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সাধক ভগবানের শরণাপন্ন হয় বলিয়া তাহার ভক্তি সকাম। তাই রায় উত্তর করিলেন—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার। ভক্তির ধারাটী সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম এবং কর্ম্মত্যাগের মধ্য দিয়া আসিয়া জ্ঞানমার্গে উপস্থিত হইল। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥ গীতা

শ্রীভগবান কহিলেন, "হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি আমা ভিন্ন কোন বস্তুর জন্য শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি সর্ব্বভূতে সমজ্ঞানী হইয়া পরা মদ্ভক্তি লাভ করেন।"

গীতার ৭ম অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন যে, চারি প্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। তাহাদের মধ্যে জ্ঞানীই নিত্যযুক্ত ও একভক্তি বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পরে বলিয়াছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

সাধকের যখন সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতি হয়, যখন তিনি ব্রহ্মে অবস্থিতি করিয়া "সুখেষু বিগতস্পৃহঃ দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ" হন, যখন তাঁহার জ্ঞানাগ্নি সকল কর্ম্মকে ক্ষয় করে, তখন তাঁহার "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্" এইরূপ জ্ঞান হওয়াতে তিনি ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন।

এই যে জ্ঞানের ভিতর দিয়া ব্রহ্মানুভূতি, ইহা পূর্ব্বোক্ত আদর্শ অপেক্ষা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু মহাপ্রভু এ আদর্শকেও অনুমোদন করিলেন না, ইহাকেও বাহ্য বলিলেন।

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার॥

ইহার কারণ মহাপ্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুত বুদ্ধি শুদ্ধ নহে ভক্তি বিনে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদ-
বিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনা-
দৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

হে অরবিন্দলোচন, মুক্তাভিমানীগণ আপনার প্রতি ভক্তির অভাবহেতু অবিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া বহুকষ্টে পরমপদ আরোহণ করিয়াও পুনর্ব্বার অধঃপতিত হন।

অন্যত্র—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাং।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥ ভাগবত

তথাহি শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যং—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥
ভাগবত

এই জন্যই সাধক নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা যে সালোক্যাদি পদ প্রাপ্ত হন, শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণ প্রেমসেবা বিনা তাহা গ্রহণ করেন না।

সালোক্য-সার্ষ্টি সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

শুদ্ধাভক্তি নিরালম্ব, নিরুপাধি হইবে, অহৈতুকী হইবে। যাহা উপাধিযুক্ত তাহা সকাম, যাহা নিরুপাধি তাহা নিষ্কাম। এইজন্য রায় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উপর জ্ঞানশূন্যা কেবলা ভক্তির স্থান দিলেন। ভক্তির ধারাটী কর্ম্মের ভিতর দিয়া আসিয়া কর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। এখন দেখিলাম আবার জ্ঞানের ভিতর দিয়া আসিয়া জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া নিজের মুক্ত রাজ্যে প্রবেশ করিল। ভক্তি যখন কর্ম্ম ও জ্ঞানে আবদ্ধ ছিল তখন উপাধিযুক্ত ছিল। এখন উপাধিশূন্য হইয়া অহৈতুকী হইয়া শুদ্ধ গঙ্গাজলের ন্যায় নির্ম্মল হইয়াছে। এখন মহাপ্রভু একটু মাথা নাড়িলেন।

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্যসার॥

ভক্তি দুই প্রকার, সাধনভক্তি এবং প্রেমভক্তি। সাধনভক্তি প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়। সাধন অবস্থার ভক্তিকে সাধনভক্তি বলে। তখন ভক্তের সহিত ভগবানের দূর-সম্পর্ক,—তখন ভজনের ভাব প্রবল, তাঁহার প্রতি মমত্ব জন্মে না। এই অবস্থাকে সাধারণতঃ আমরা ভক্তি বলি। ভক্তি যখন গাঢ় হইয়া প্রেমে পরিণত হয়, তখন তাহাকে প্রেমভক্তি বলে। এই অবস্থায় ভক্তের সহিত ভগবানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, ভগবানের প্রতি ভক্তের মমত্ব জন্মে। যিনি পূর্ব্বে অতি দূরে ছিলেন, সমস্ত বিশ্বে যাঁহার সত্তা অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যাঁহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হার মানিয়াছি, তিনি এখন আমার অন্তরে; তিনি আমার প্রাণের প্রাণ, তিনি প্রিয় হইতেও প্রিয়তর, তাঁহার সহিত এখন আমার দুশ্ছেদ্য প্রেমের বন্ধন। তাঁহার সহিত সম্পর্ক বিনা এখন অন্য সম্পর্ক মানিনা। তিনি আমার প্রভু, তিনি আমার পিতা মাতা, তিনি আমার সখা, তিনি আমার বাৎসল্যের ধন, তিনি আমার স্বামী। মমত্ববোধ হেতু ভক্ত এইরূপে ভগবানকে নানারসে নানাভাবে আস্বাদন করেন। এ অবস্থাকে প্রেম বলে। এই অবস্থায় ভক্ত, ভক্তির রাজ্য ছাড়িয়া প্রেমের রাজ্যে উপনীত হন। ভক্তি প্রেমে প্রভেদ এই যে, ভক্তি সাধন, প্রেম সাধ্য; ভক্তি উপায়, প্রেম উপেয়; ভক্তি লতা, প্রেম ফল। রঘুনাথদাস গোস্বামীর শ্লোকে "প্রেমরসফলাং ভক্তিলতিকাং" উক্ত হইয়াছে। রাম রায় প্রেমের প্রাধান্যহেতু কেবলাভক্তি ছাড়িয়া প্রেমভক্তির উল্লেখ করিলেন।

প্রেমভক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ কবিরাজগোস্বামী রামরায়কৃত, নিম্নলিখিত শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটীসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

কৃষ্ণভক্তিরস দ্বারা ভাবনা দেওয়া হইয়াছে এরূপ মতি যদি কোথাও লাভ করিতে পার, তবে ক্রয় করিয়া ফেল, এমন দুর্লভ জিনিষ কোথাও পাইবে না। লৌল্য অর্থাৎ লালসাই হইতেছে তাহার একমাত্র মূল্য। কোটী জন্মের পুণ্য দ্বারা তাহা লাভ করা যায় না।

শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধনাঙ্গ দ্বারা কেবলাভক্তি লাভ করা যায়; কিন্তু প্রেমভক্তি পাইতে হইলে কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতা মতি চাই। যাঁহাদের তীব্র পিপাসা আছে তাঁহারাই কেবল তাহা লাভ করিতে সমর্থ।

রামরায় যে প্রেমভক্তির উল্লেখ করিলেন, তাহা প্রেমের অঙ্কুরের অবস্থা, তখনও প্রেম কোন আকৃতি ধরে নাই, প্রাণের টান থাকিলেও কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই। রাম রায় যাহাকে প্রেমভক্তি বলিয়াছেন তাহাই শান্তপ্রেম। এই শান্তপ্রেম নির্ব্বিশেষ রস, কোন রঙ্গে রঞ্জিত হয় নাই। শান্তের দুইটী গুণ কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ। শান্তরসে ঈশ্বরে মমত্ব হয় না, কেবল স্বরূপজ্ঞান হয়। মমত্বই প্রেমের মাপকাঠি। এইজন্য মহাপ্রভু বলিলেন—

"এহো হয় আগে কহ আর।"

রায় কহে—"দাস্য প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥"

দাস্যের প্রধান গুণ সেবা। দাস্যপ্রেমে ভগবানের পূর্ণৈশ্বর্য্য জ্ঞান হয় এবং ভক্ত ভগবানকে প্রচুর সম্ভ্রম ও গৌরব দেখান। ইহা ছাড়া শান্তের গুণ দাস্যে আছে। দাস্যপ্রেমে তুমি প্রভু, আমি দাস, এইভাব যেরূপ ফোটে এরূপ আর কোন প্রেমে ফোটে না। কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে ব্যবধান থাকিয়া যায়, ভক্তের মমত্ববোধের খর্ব্ব হয়। এইজন্য মহাপ্রভু দাস্যপ্রেম অনুমোদন করিলেও তাহাকে উত্তম বলেন নাই।

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥

সখ্যপ্রেমে গৌরব-সম্ভ্রমের সঙ্কোচ, ভগবানে বিশ্বাসময়, মমতাধিক্য ও আত্মসমজ্ঞান; ভগবানের সহিত গলাগলি কোলাকোলি ব্যবহার।

কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ।
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণকে করায় আপন সেবন॥

ইহা ভিন্ন শান্তের গুণ ও দাস্যের সেবন সখ্যে আছে। সখ্যপ্রেমে মমতাধিক্যবশতঃ ভগবানের সহিত ভেদবুদ্ধি রহিত হয় বলিয়া সখ্যপ্রেমকে মহাপ্রভু উত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥

বাৎসল্য প্রেমে—ভক্ত নিজকে পালক জ্ঞান ও ভগবানকে পাল্য জ্ঞান করেন। বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন, সখ্যের অসঙ্কোচ অগৌরব আছে। দাস্যের সেবা এখানে লালন-পালনে পরিণত, সখ্যের অসঙ্কোচ এখানে মমতাধিক্যে তাড়ন ভৎর্সনা প্রভৃতি ব্যবহার। এই চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান। রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্! শ্রেয়এবং মহোদয়ং।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥

হে ব্রহ্মন্! নন্দগোপ মহাফলযুক্ত কি শ্রেয় আচরণ করিয়াছেন এবং তাহা অপেক্ষাও মহাভাগ্যবতী যশোদাই বা কি শ্রেয় আচরণ করিয়াছেন যে, ভগবান হরি তাঁহার স্তন পান করিলেন?

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥

কান্তভাবে ভক্ত নিজাঙ্গ দিয়া ভগবানকে সেবা করেন। এটী কান্তভাবের বিশেষত্ব। এই মধুর রসে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ, বাৎসল্যের লালন ও মমতাধিক্য, উপরোক্ত চারিটী গুণও আছে।

এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥

এ অবস্থায় ভক্ত ও ভগবান যেন সতী ও পতি। তখন ভক্ত ভগবানকে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া বলেন—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মনভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥

ভগবানকে প্রেমিকেরা নানা ভাবে উপলব্ধি ও আস্বাদন করেন। কেহ দাস্যভাবে, কেহ সখ্যভাবে, কেহ বাৎসল্য-ভাবে, কেহবা কান্তভাবে ভগবানকে আস্বাদন করেন। কিন্তু সকলের রসাস্বাদন বা কৃষ্ণপ্রাপ্তি এক রকম নহে। পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি একমাত্র এই কান্তাপ্রেম দ্বারা হয়। তথাপি একথা বলিতে হইবে যে—

সার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হ'য়ে বিচারিলে আছে তারতম ॥

হরিদাস ঠাকুর দাসভক্ত, মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার কাতর এই প্রার্থনা—"তুমি প্রভু আমি দাস, এই ভাব যেখানে নাই—সেখানে আমাকে কখনো ফেলিবে না।" যাঁহার যে ভাব তিনি সে ভাব ছাড়িতে চান না। সে ভাব ছাড়িলে তাহার প্রকৃতি নষ্ট হয়। ভগবান একরস নহে; তিনি রসময়, ভক্তগণ এক একটী রসধারা। নানা রস আস্বাদন করিয়াই তিনি রসময়, রসিকশেখর হইয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেক রসেরই একটী বিশেষত্ব ও প্রয়োজন আছে।

মহাপ্রভু সাধ্যাবধি বলিয়া স্বীকার করিয়াও নিবৃত্ত হইলেন না।

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রে ত বাখানি ॥

সকল কান্তভক্তে প্রেমের মহিমা এক নহে। কান্তরতি তিন প্রকার—সাধারণী, সামঞ্জসা ও সমর্থা। যাঁহারা নিজ সুখের জন্য কৃষ্ণসেবা করেন তাঁহাদের সাধারণী রতি। যাঁহারা কৃষ্ণ সুখে সুখী, কৃষ্ণ দুঃখে দুঃখী অথচ নিজের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি আছে, তাঁহাদের সামঞ্জসা রতি। আর যাঁহারা কৃষ্ণসুখী, কৃষ্ণ দুঃখে দুঃখী, যাঁহারা কৃষ্ণের জন্য অনন্ত সুখ পরিত্যাগ করিতে এবং অনন্ত দুঃখ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, অর্থাৎ যাঁহাদের আত্ম সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি নাই, তাঁহাদের সমর্থা রতি। গোপীদের সমর্থ রতি।

"কাম গন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥" চরিতামৃত
"অতএব গোপীগণে নাহি কাম গন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগিমাত্র কৃষ্ণের সম্বন্ধ ॥" চরিতামৃত

গোপীদের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠা।

অভিব্যক্তি অনুসারে প্রেমের মহত্ত্ব আবার সকল ভক্তে সমান নহে; রতি বৃদ্ধিক্রমে নাম, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়। যাঁহাদের সমর্থা রতি তাঁহাদেরই অধিরূঢ় মহাভাব হয়। গোপীরা অধিরূঢ় মহাভাবের অধিকারী। কিন্তু মহাভাবের উচ্চতম অবস্থা সম্ভোগে মাদন, বিরহে উদ্‌ঘূর্ণা (দিব্যোন্মাদ) ও চিত্রজল্প একমাত্র শ্রীরাধিকায় সুপরিদৃষ্ট হয়। রাধাপ্রেম এ প্রবন্ধে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা অসম্ভব। মহাপ্রভু ইহাকে সাধ্যশিরোমণি কেন বলিলেন, বুঝাইবার জন্য সংক্ষেপে দিগ্‌দর্শন করিলাম। [কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রীরাধিকার স্বরূপ বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী ॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার ॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায় ব্যূহরূপ ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ ॥
কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম ॥
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা শ্যামপট্ট সাড়ী পরিধান ॥
কৃষ্ণ অনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন।
প্রণয়মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥
সৌন্দর্য্যকুঙ্কুম সখী প্রণয়চন্দন।
স্মিত কান্তি কর্পূর তিনে অঙ্গ বিলেপন ॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥
প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধম্মিল্লবিন্যাস।
ধীরাধীরাত্মগুণ অঙ্গে পটবাস ॥
রাগ তাম্বুল রাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম কৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল ॥
সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাব ভূষণ প্রতি অঙ্গে ভরি ॥

কিলকিঞ্চিতাদিভাব বিংশতি ভূষিত।
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত॥
সৌভাগ্যতিলক চারুললাটে উজ্জ্বল।
প্রেম বৈচিত্র্য রত্ন হৃদয়ে তরল॥
মধ্য বয়স্থিতা সখী স্কন্ধে করন্যাস।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ॥
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্বপর্য্যঙ্ক।
তাতে বসিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥
কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংশ কাণে।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণে পূর্ণ কলেবর॥
যাহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যার ঠাঞি কলা বিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যার সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মীপার্ব্বতী।
যার পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যার সদ্গুণগণের কৃষ্ণ না গান গায়।
তার গুণ গণিবে কেমনে জীবু হায়॥

রায়ের শেষ উত্তর শুনিয়াও মহাপ্রভু নিবৃত্ত হইলেন না।

"প্রভু কহে আগে কহ শুনি পাইয়ে সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃত নদী বহে তোমার মুখে॥"

রায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রাধাকৃষ্ণলীলা, রাধাতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণ প্রেমবিলাস বর্ণনা করিতে লাগিলেন—

রায় কহে আমি নট তুমি সূত্রধার।
যেমত নাচহ তৈছে চাহি নাচিবার॥
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই তাহা উঠয়ে উচ্চারী॥

প্রভু তার পরও শুনিতে চাহিলে রায় বলিলেন—

যেবা প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥
এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে মহাপ্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥

মহাপ্রভু প্রেমবিলাসবিবর্ত্তকে সাধ্যাবধি বলিয়া স্বীকার করিলেন। 'প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত' পৃথক প্রবন্ধের বিষয় হইতে পারে। এ সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে বুঝান অসম্ভব। প্রেমের অবতার শ্রীমান মহাপ্রভুর মধ্যে প্রেমের পরাকাষ্ঠা মহাভাবের মহাপ্রকাশ যেমন দেখিতে পাই, প্রেমবিবর্ত্তবিলাসও তেমনি দেখিতে পাই। তাই তিনি অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব; একাধারে রসরাজ মহাভাব।

তবে প্রভু হাঁসি তারে (রায়কে) দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ॥

যে কৃষ্ণপ্রেমকে সাধ্য বলিয়া বর্ণনা করা গেল তাহা প্রকৃত পক্ষে নিত্যসিদ্ধ বস্তু কখনো সাধ্য হইতে পারে না। তবে নিত্যসিদ্ধভাবের হৃদয়ে অভিব্যক্তি করা সম্ভব বলিয়াই 'সাধ্য' বলা হয়—

'নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা'।

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥

কৃষ্ণপ্রেম স্বরূপতঃ সাধ্য না হইলেও কার্য্যতঃ সাধ্য। সাধনা ব্যতীত সাধ্য বস্তু লাভ করা যায় না। সাধনা সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করা যাইবে।

অভিসার।

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল বি-এল]

পরিমলের কথা

রাস্তার দু'ধারে আলোগুলো জ্বলচে দেখ, যেন দু'ছড়া লম্বা হীরের হার! এত বড় রাস্তা তো আমি আমার জীবনে কখনো দেখিনি। গাঁয়ে বসে' বসে' শুধু কল্‌কাতার নামই শুনেছিলুম, কিন্তু এই বিরাট সহরটা প্রত্যক্ষ করবার ফুরসৎ একবারও হয়নি। সমস্ত সহর জুড়ে কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে রয়েচে; আর, দিন নেই রাত নেই ওই হাওয়া গাড়ীগুলো কি বিকট শব্দ কর্‌তে কর্‌তে ছুটে চলেছে, যেন এক একটা হাউইবাজী।

কিসের এত তাড়াহুড়ো, কিসের এত ছুটাছুটি, আমি ত কিছু বুঝিনে। এই যে ফুটফুটে জ্যোৎস্নাটি আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েচে, এর কদর কিন্তু এ সহরের লোক কেউ কিছু বোঝে না। আমাদের গাঁয়ের বাড়ীর সেই চাতালটুকু মনে পড়চে। এমনি চাঁদের আলোয় গা ভাসিয়ে সেই চাতালের উপর আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়ে আমি একলাটি শুয়ে থাক্‌তুম, আর ভাব্‌তুম—সে কত কথা!

কিন্তু সে চিন্তাতে ত সুখ ছিল না! তবে কেন আজও এই ঘরে বসে' আমার মনে হচ্চে ভেতরের ঐ দপ্‌দপে বিজলীর আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ঐ প্রকাণ্ড জানালার ধারে জ্যোৎস্নায় বসে' বসে' আবার তেম্‌নি করে ভাবি! সে দুঃখের চিন্তায় মগ্ন হ'য়েও যে আমার কি শান্তি, কি তৃপ্তি, তা আমি বুঝতে পারি নে; অথচ, এই সৃষ্টিছাড়া অলস মনটা যেন কেবল সেইটেকেই আঁক্‌ড়ে ধর্‌তে চায়।

এই পনর বছর বয়সের মধ্যে আমাদের গ্রামখানিকেই কেবল আমি চিনেছি। তাকে ছেড়ে এই যা' আজ এতদিনের পর কল্‌কাতায় মামার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছি, আর—আর একবার—সে প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে ক'নে সেজে শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলুম, তা'ও মোটে আটটী দিনের জন্যে। সেই আটটী দিনের কথাই আমার স্বামীর গৃহে বাস করার চরম স্মৃতি! তাই, সেইটুকুকেই আমি দিনের-পর-দিন ধুয়ে মুছে' খুব উজ্জ্বল করে' আমার বুকের মধ্যে গেঁথে রেখেছি। কেন না, যদি আর ইহজীবনে আমার সে সৌভাগ্য না ঘটে, তাহ'লে এইটীকেই যে প্রাণপণ বলে আঁক্‌ড়ে ধরে' আমার এই নারী-জন্মের দেনা-পাওনা শেষ করে দিতে হবে!

পোড়া চোখে এত জলই বা আসে কেন? চোখের জলে ত' আকাশের দেবতার মন গলে না! তবে স্বামী—যিনি এ পৃথিবীতে নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ দেবতা—তাঁরই বা কেন গল্‌বে, তাঁর হৃদয়েই বা কেন দয়া হবে? মনকে কতদিন বুঝিয়েচি, তিনি যাতে সুখে থাকেন সেই ত আমার পরম সুখ! কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ যে আমি, এ আশ্বাসকে আমি কেমন করে' জড়িয়ে ধরে থাকব? শুনেচি, এই কল্‌কাতাতেই তিনি কোথায় থাকেন। মামার সঙ্গে যখন আসি, তখন এ আশাও আমার কম ছিল না যে, এখানে এসে একদিন-না-একদিন তাঁর দেখা পাবো। কিন্তু, কি বিষম ভুল! এই সমুদ্রের মাঝখান থেকে সেই একফোঁটা লোকটীকে কেমন করে' আমি খুঁজে তুলে নেব?

রাস্তা দিয়ে কোন্ বড়লোকের বাড়ীর একটা বিয়ে যাচ্ছে। উঃ, অন্ধকার ঘরখানা আমার আলোয় ভর্ত্তি হ'য়ে গেল। পুষ্পিত চতুর্দ্দোলায় বসে' বর ক'নে। বাঃ, দিব্যি মেয়েটী! আজ ওদের মনে কি হচ্চে! আমার মত রাস্তার দু'ধারের ঐ লোকগুলো ওদের পানে চেয়ে চেয়ে ভাব্‌ছে, ওরা আজ কি সুখী! তা সত্যি! কিন্তু, সুখ তো ঐ আলো আর বাদ্যির জাঁকজমকে নয়। ঐ যেমন দুটীতে ওরা পাশাপাশি বসে রয়েচে, ওদের বুকের নীচের তরুণ মন দুটীও যদি সব আড়াল কাটিয়ে দিয়ে ঠিক অম্‌নি পাশাপাশি এসে দাঁড়াতে পারে তবেই ত সার্থক! নইলে, বৃথা এই এত হাসি—এত আলো—

এত আয়োজন! কিন্তু একি! ছিঃ, কি মন আমার! আমার নিজের বরাত দেখে অন্য সকলের সুখ দুঃখের ওজন করি কেন!

* * *

আজ দশহরা। আমি, মামীমা, নীলুদিদি সকলে মিলে গঙ্গাস্নানে এসেছি। সকাল থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে; ঘাটের সিঁড়িগুলো দিয়ে তো চলবার যো নাই। দু'তিনবার আমি পা পিছলে পড়ে' যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছি। আর তেমনি ভিড়! গঙ্গার জলটুকু হয়েচে যেন একখানি কাদামাখা গেরুয়া কাপড়!

আমি একটু আগে জল থেকে উঠে একখানা সানের উপর দাঁড়িয়ে মাথা মুছছিলুম। একটু দূরে বুড়ী চাকরাণী দাসুর মাও উঠে এসে দাঁড়িয়েছিল। নীলুদিদি খাস্ সহরের মেয়ে; এক-গলা জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাজার চেষ্টা করেও সে একটা ডুব দিতে পারছে না। মামীমা গামছা করে' জল ছেঁচে ছেঁচে তার মাথায় দিচ্চেন। আমার দেখে এমনি হাসি পাচ্ছিল, কি বলবো!

হঠাৎ একবার অন্যদিকে চোখ ফেরাতেই দেখি, একটা লোক খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে গা মুছছে আর এমন হাঁ করে' আমার মুখের পানে তাকিয়ে আছে যে, এক মুহূর্ত্তে লজ্জায় আমার দেহের সমস্ত রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠল। আমি আমার গায়ের ভিজে কাপড়খানা এদিক-ওদিক টেনে-টুনে নিয়ে আবার চোখ তুলতেই দেখি, লোকটা আমার মুখের পানে চেয়ে ফিক্ করে' হেসে ফেল্লে। সারা অঙ্গ আমার জ্বালা করে' উঠল। দাসুর মাকে নিয়ে ভিজে কাপড়েই এসে গাড়ীতে উঠে বসলুম।

গাড়ীতে সারা পথটা আমি সহরের লোকগুলোর মুণ্ডপাত করতে করতে এসেচি। কিন্তু, মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে পারলুম না। বিকেলে নীলুদিদি চুল বাঁধছিল, আমি আমার সেই ঘরখানিতে একা বসে'-বসে' 'স্বর্ণলতা' বইখানা একটু পড়বার চেষ্টা করছিলুম, আর ভাবছিলুম, সেই অচেনা লোকটার নির্লজ্জতার কথাই! বইটা হাতে নিয়ে একটিবার সেই রাস্তার ধারের জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েচি, এমন সময় একটা কাশির শব্দ; নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি,—ওমা! ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে সেই লোকটা পায়চারী করচে, আর আমার পানে তাকিয়ে এক-একবার মুচকি হাসচে!—গায়ে একটা তার ধবধবে গিলে-করা পাঞ্জাবী, মাথায় লম্বা টেড়ী, হাতের আঙুলে একটা চুরুট। আমার হাতের বইখানা শিথিল মুষ্ঠি হ'তে খসে' পড়ে' জানলার বাইরে কার্ণিশে আটকে গেল। কিন্তু সেদিকে আমার খেয়াল ছিল না। হৃৎপিণ্ডটার ঠিক ওপরেই টিপ্ টিপ্ করে' একটা শব্দ হচ্ছিল,—যেন কে অলক্ষ্যে বসে' সেখানে কিসের ঘা মারছে! সেই বেহায়া লোকটার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবার কথাটা প্রথমে আমার মনেই ছিল না, শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে হাজার কথা ভাবছিলুম,—কে এই লোকটা? কত বড় এর সাহস! আর, আজই সকালে গঙ্গার ঘাটে দেখা দিয়ে বাড়ী পর্য্যন্ত সে কেমন করে' ধাওয়া করলে? একবার মনে হোল, —বাড়ীর সকলকে ডেকে বলে' দিই! কিন্তু, তখনি আবার খেয়াল হোল, সে কত বড় লজ্জার কথা।

লোকটা তখনো তেমনি বেড়াচ্ছিল, আর ওপর পানে চাচ্ছিল। আমি জানলার আড়ালে সরে' এসে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে তার রকম দেখছিলুম। অনেকক্ষণ তার মুখের পানে একদৃষ্টে চেয়ে হঠাৎ আমার একটা কথা মনে হ'য়ে গেল। এ মুখ কি আমার চেনা? কথাটা মনে হ'তেই আমার হৃৎপিণ্ডের গতি যেন প্রথম একেবারেই স্তব্ধ হ'য়ে গেল, তারপর হঠাৎ মনে হোল, ঝড়ের মত কি একটা এসে আমার ভেতরের সবটা তোলপাড় করে' দিচ্ছে!

মুখ তুলে দেখি, সে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্চে। ঘরের এক কোণে আমার যে একটা ছোট বাক্স ছিল, আমি রুদ্ধনিশ্বাসে ছুটে গিয়ে সেটা খুলে ফেলে ভেতর থেকে একখানা ফটো বার করলুম! ওগো, এ যে ঠিক তাই! এ যে—হে ঠাকুর!

—•—

মহিমের কথা

কোন্ এক খুব বড় ইংরেজ কবি নাকি বলে' গেছেন, সৌন্দর্য্য দেখবার জিনিষ, অন্তঃপুরে পুরে রাখবার জিনিষ

নয়। কথাটা খাঁটি। ইংরেজরা এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুভব করতে পারে,—শুধু ইংরেজ কেন, অপর অনেক জাতই পারে, পারে না কেবল আমাদের এই বাঙালী জাতটা! তাই আমার আগাগোড়া বড় ইচ্ছে ছিল, যদি কখন বিয়ে করি, তাহ'লে সমস্ত দেশকে এই নিয়ে একটা উদাহরণ দেখিয়ে দোব!

কিন্তু, বাপ-মা দেখে শুনে শেষে এমন এক জায়গায় বিয়ে দিলেন যে, সে মেয়ে আমার সঙ্গে ফিটনে চড়ে' হাওয়া খেয়ে বেড়ানো ত' দূরের কথা, ঘোমটা খুলে ভাল করে' দুটো কথা কইতেও জানে না! কাজেই, আমার আশা অঙ্কুরেই নষ্ট হ'য়ে গেল!

"সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" কপালক্রমে সাধু বাক্য আমার ভাগ্যে কতকটা ফলে' গেল। ফুলশয্যার রাত্রিতে তাকে দেখেই আমি বুঝেছিলুম, ঐ বউ নিয়ে ঘর করতে হলে' আমার জীবনের সব আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিতে হবে। কিন্তু, তাকে নিয়ে আমার ঘর করতে হোলও না। মা আমার কি-সব দেনা পাওনা নিয়ে শ্বশুর মহাশয়ের ওপর দিন-দিন চটে' উঠতে লাগলেন, এবং শেষে হঠাৎ একদিন সপ্তমে চড়ে' উঠে একেবারে এক ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে' বসলেন, অমন চসমখোরের মেয়েকে তিনি আর ঘরে আনবেন না। বলা বাহুল্য, আমার পক্ষে এটা শাপে বর হ'য়ে দাঁড়াল।

ইচ্ছা ছিল, এবার একটা বেশ accomplished দেখে মেয়েকে বিয়ে করবো; কিন্তু, আমার নামের পাশে অন্ততঃ 'বি-এ' শীলমোহরটা মারা নেই বলেই হোক্, আর যে জন্যেই হোক্ একে একে আমার সব দরখাস্ত না-মঞ্জুর হ'তে লাগলো। দিনকতক বাদে দেখলুম, অবস্থাটা আমার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—অনেকটা সেই কথামালার ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকটার মত!

এমনি করে' জোয়ারের কুটোর মত লক্ষ্যহীনভাবে যখন আমি ঘুরে বেড়াচ্চি, তখন হঠাৎ আমার বে-ওয়ারিশ মনখানা বাঁধা পড়ে' গেল, সেই দশহরার দিন গঙ্গাস্নানের ঘাটে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভেতর হঠাৎ ঐ মেয়েটীকে দেখেই আমার সুপ্ত আকাঙ্খা কেন এমন চঞ্চল হ'য়ে উঠল তার কৈফিয়ৎ আমি দিতে পারবো না। বোধ হয় বিজ্ঞান-শাস্ত্রের মতে শীগ্‌গীর এ বিষয়েও একটা কিছু "থিওরি" বেরুবে; আর বোধ হয় সেটা ঐ magnetismকেই ভিত্তি করে। হয়ত' কোন খুব বড় বৈজ্ঞানিক এমনি কিছু একটা উদ্ভাবন করে' ফেলবেন যে, রাসায়নিক পরীক্ষায় জানা গিয়েছে, স্ত্রীলোকের শরীরে চুম্বকের ধাতুটা এবং পুরুষের শরীরে লোহার ভাগটা কিছু বেশী পরিমাণে আছে, তাই এই আকর্ষণ।

যাক্, প্রেমতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে বসিনি; আমার প্রেমের কাহিনীটুকু শুধু সংক্ষেপে বলিতে চাই। গাড়ীখানা তাদের যে গাছতলায় দাঁড়িয়েছিল, তারই খানিক দূরে এক উড়ে পাণ্ডার কাছে আমার 'সাইকেল' ছিল। তারা স্নান করে' উঠে গেলে কোচ্‌ম্যান যেমন গাড়ী ছেড়ে দিলে, অমনি আমার মাথায়ও এক মৎলব এসে গেল। আমি আমার সাইকেল নিয়ে গাড়ীর পিছু নিলুম।

বাড়ীর ত' সন্ধান হোল। কিন্তু আমার এ ভালবাসার প্রতিদান আমি কেমন করে' পাবো! সে রইল, এক প্রকাণ্ড বাড়ীর দোতালার একটা ঘরের জান্‌লায়, আর আমি নীচে ফুটপাথের ওপর! কিন্তু, তবু তো ভুলতে পারিনি! রোজ দু'বেলা শ্যামবাজারের সেই পথের পাশে দাঁড়িয়ে আমি সেই জান্‌লার পানে চেয়ে থাকি, রোজই তার দেখা পাই, সেও আমার পানে চায়, কিন্তু বেশীক্ষণ না দাঁড়িয়েই সে আড়ালে সরে যায়।

একটা বিকট নেশার মত সে আমায় ছেয়ে ফেলেচে। হোক্ না সে গৃহস্থের মেয়ে, স্বেচ্ছায় যদি সে আমায় ভালবাসে,—ভালবাসায় দোষ কি? তাকে নিয়ে আমি খুব দূরদেশে গিয়ে বাস করব, আমার যা কিছু সম্বল, সব তার পায়ে বিকিয়ে দোব। একটা লোকের জীবন বেশী, না, প্রাণহীন সমাজের বিধি-নিষেধ বেশী? যেখানে ভালবাসার বিমল আলো মাঝখানে এসে কিরণ দেয়, সেখানে যে সব বাধা, সব মলিনতা ধুয়ে মুছে যায়!

অবসর খুঁজছিলুম, আমার প্রাণের কথা তাকে কেমন করে' জানাই। কিন্তু সে অবসর না পেয়ে যখন আমি

দিনের পর দিন করে' ধৈর্য্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছি, সেই সময় হঠাৎ একদিন আমি যেন হাত বাড়িয়ে চাঁদের নাগাল পেয়ে গেলুম।

সেদিন দুপুরবেলা তাদের বাড়ীর পাশের সেই গলিটার মোড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, খবরের কাগজ পড়্‌ছিলুম। রাস্তায় লোক চলাচল খুব কম। সেদিন আমি একরকম মরিয়া হ'য়েই বাড়ী হ'তে বেরিয়েছিলুম।

একজন বুড়ী চুড়ীওয়ালী গলি হ'তে বেরিয়ে হাঁক্‌লে—"বেলোয়ারী রেশমী চুড়ী চাই"—আর ঠিক সেই সঙ্গে গলির ওপরকার একটা জান্‌লা খুলে সেই মেয়েটী হাত নেড়ে ডাক্‌লে,—"এই চুড়ীওয়ালী!" ডেকেই কিন্তু হঠাৎ এদিকে আমায় দেখে সে মুচ্‌কি হেসে সরে গেল।

আমার বুকের অন্ধকার আকাশে আশার বিজলী খেলে গেল। চুড়ীওয়ালী তাদের বাড়ীর ভেতর ঢুকছিল, আমি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে এক টুকরো লেখা কাগজ আর একটা টাকা বার করে' তার হাতে গুঁজে দিয়ে চুপি চুপি বল্লুম, "এই কাগজটুকু ওই মেয়েটীর হাতে দিস্—আর তোর নিজের জন্যে এই টাকাটা।"

প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে চুড়ীওয়ালী ফিরে এসে আবার আমায় একটুকরো কাগজ দিলে। বুকের অসম্ভব রকম দ্রুত স্পন্দনটাকে যথাসাধ্য সাম্‌লে নিয়ে আমি সেই লেখাটুকু পড়ে ফেল্লুম,—'হ্যাঁ। কিন্তু, কেমন করে' দেখা হবে আমি তো জানিনে। যা ভাল বোঝেন আপনি করবেন।'

সেই অমৃতের টুকরোটুকু বুকপকেটে পুরে নিয়ে তাড়াতাড়ি ট্রামে করে বাড়ী ফিরলুম।

—•—

পরিমলের কথা

যা করেছি, সে কেবল আমার নীলুদিদির মস্তিষ্কের জোরে। সব শুনে দিদি আমার চিবুক ধরে' নেড়ে দিয়ে বল্লে,—এইবার আমার কপাল ফিরেছে। কিন্তু, কৈ, আমি তো তা' বুঝ্‌তে পারিনে! বরং মনে হয়, আমার এই পোড়া কপাল এবার বেশী করেই ভাঙ্‌তে চলেছে!

কেমন করেই বা হবে বল! তিনি যাকে চাচ্ছেন, সে তো ঠিক আমি নই! আমার সত্যিকার পরিচয় যখন তিনি জান্‌তে পারবেন, তখন হয়ত' যেমন করে' তিনি দেখা দিয়েছেন, ঠিক তেমনি অতর্কিতেই আবার কোথায় লুকিয়ে পড়বেন!

সারা জীবনের মাঝে এ আমার একটা অগ্নি-পরীক্ষা। নইলে, এই প্রাণ-মন-দেহ যাঁর চরণতলে নিবেদিত, সেই স্বামীর সঙ্গে আজ আমার পরিচয় করতে হচ্ছে—ছলনার আশ্রয় নিয়ে,—একটা হীন কুলটার পোষাক পরে!

নীলুদিদিকে তাই গোড়াতেই বলেছিলুম,—কাজ নেই ভাই, অত হাঙ্গামায়! তার চেয়ে একদিন চাকরাণীর হাতে চিঠিতে সব খুলে লিখে বরং তাঁকে এখানে ডেকে পাঠাই। একবার মুখোমুখি দেখা ত' পাবো! নীলুদিদি আমায় মুখ্যু বলে' গালে ঠোনা মেরে বল্লে—ওলো, তা হয় না! দেখা যদি হয়, এইদিক দিয়েই হবে। নইলে, এমন একটা চতুর চোরকে কি আর সোজাসুজি গিয়ে ধরতে পারা যায়! ভেবে দেখলুম, কথাটা মিথ্যে নয়! পুরুষ-মানুষের স্বভাবই যে এই, যে জিনিষটি পাওয়া যত শক্ত, সেই জিনিষটারই ওপর তার তত লোভ হয়। সাদা চোখ মেলে যখন সে দেখ্‌বে,—যাকে পাবার জন্যে তার এত আকাঙ্ক্ষা, সে তারই চরণের দাসী বই আর কেউ নয়, তখন—তখন হয়ত' যে মাধুরী তাকে ভুলিয়েছিল, তার একটা কণাও আর আমার মধ্যে খুঁজে পাবে না! কিন্তু থাক্; ওই কথাটা যখনই মনে পড়ে, তখনই একটা আকুল কান্না যেন বুকের এই রুদ্ধ দুয়ারে মাথা কুটে কুটে বারম্বার হাহাকার করে' ওঠে!

হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলুম, বাধ্য হয়ে আমায় এই বাঁকা পথ ধ'রেই চল্‌তে হ'য়েছে। এ অভিনয়ের শেষ পরিণতি যে কোন্ দিক্ দিয়ে হবে, বুঝ্‌তে পারিনে, তবু অভিনয় করে' চলেছি। কেমন করে' আমাদের দু'জনের দেখা হবে, তাও সেদিন ঠিক হ'য়ে গেছে। সেই যেদিন বুড়ী চুড়ীওয়ালীর হাতে সে আমায় তার অগাধ ভালবাসার কথা জানিয়ে পাঠালে, এবং আমিও প্রত্যুত্তরে তার মনের মত কথাটি লিখে দিলুম, তার পরদিন থেকে রোজ দুপুরবেলা ঐ গলির জান্‌লা দিয়ে আমি আমার একখানা শাড়ী শুকোতে দেবার অছিলায় অনেক নীচে পর্য্যন্ত ঝুলিয়ে দিই,

আর সে সেই কাপড়ের খুঁটে ছোট-ছোট চিঠি বেঁধে দেয়। সে সব কত কথা—কত হা-হুতাশ! পড়্‌তে-পড়্‌তে আমার তরুণ হৃদয়ের সুপ্ত সিন্ধু যেন জুয়ারের বেগে উদ্বেল হ'য়ে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার বুকের মাঝে কি-একটা ক্ষতের তীব্র জ্বালা অনুভব করে' আর্ত্তের মত দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভাবি,—হা আমার দেবতা! এ যে শুধু অভিনয়, এ যে শুধু স্বপ্নের রাজপ্রাসাদ!!

কারণে-অকারণে হঠাৎ দু'চোখ ছাপিয়ে কান্না এসে পড়ে। মাঝে মাঝে মনে হয়,—ফিরে যাই। সেই আমার শ্যামল পল্লীর নিভৃত আশ্রয়ে,—মায়ের কোলে—বাবার চরণতলে আবার গিয়ে তেমনি করে' বসি! যদি কখনো দয়া করে' এই আমাকে 'আমি' জেনেই পায়ে স্থান দিতে চাও, তবেই আবার সে অধিকার মাথায় তুলে নেব। নইলে আর এ মিথ্যা অভিনয়ে কাজ নেই গো কাজ নেই!

মন যখন এমনি অবসন্ন হ'য়ে পড়্‌ত' তখন আমার সুযোগ্য সারথি নীলুদিদি এসে আমায় উজ্জীবিত করে' তুল্‌ত। আবার আমি তার কথা-মত কাজ করে' যেতুম।

তারপর সেদিন সব ঠিক হোল, পরশু রাত্রে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। শুধু সাক্ষাৎ নয়! পরশু সন্ধ্যার পর বাড়ীর সকলে মামার সঙ্গে থিয়েটার দেখ্‌তে যাবেন; থাক্‌ব কেবল, আমি আর নীলুদিদি। গভীর রাত্রে একখানা গাড়ী নিয়ে তিনি ঐ গলিটার মধ্যে এসে দাঁড়াবেন, আর আমি এই জানলায় তাঁর প্রতীক্ষায় থাক্‌ব। গাড়ী এলে আমি চুপি-চুপি নেমে গিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌ব। তারপর দু'জনে কোথায় যাব, তা' সে কিছু খুলে লেখে নি, আমিও কিছু জিজ্ঞেসা করি নি।

একের পর এক করে' শেষে ভবিষ্যতের সেই দিনটি আজ বর্ত্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে। সকাল হ'তেই আমার বুকের ধ্বক্‌ধ্বকানি শব্দটা যেন সর্ব্বদা আমি কানে শুন্‌তে পাচ্চি। নীলুদিদি উঠে এসে আমার গালটা টিপে দিয়ে বল্লে,—'পরি, আজ সুভদ্রা-হরণের রথযাত্রা'। আমার চোখদু'টা ভারী হ'য়েছিল; কোন উত্তর দিতে পারলুম না।

সন্ধ্যার পর থেকে আকাশে তারাগুলি ফুট্‌ছে—যেন তেত্রিশ কোটী দেবতাদের সজাগ চক্ষু! আমার অভিসারের এঁরাই আজ মৌন সাক্ষী! জানি না, ঐ অগণিত দৃষ্টি আমার মাথার ওপর বর্ষণ করবে আজ—আশীর্ব্বাদ, না অভিশাপ!

মামীমারা থিয়েটার দেখ্‌তে চলে' গিয়েছেন। আমাদের দু'জনকে এত বলে'-ক'য়েও তাঁরা কিছুতেই নিয়ে যেতে পারলেন না। নীলুদিদি হাস্‌তে-হাস্‌তে এসে আমার সমস্ত কাপড়-জামা-গয়না নিয়ে আমায় সাজাতে বসে' গেল। এ ব্যাপারটায় আগাগোড়া তারই আমোদ যেন সব চেয়ে বেশী! কিন্তু, আমি তো এত চেষ্টা করেও প্রাণ খুলে তার হাসি-তামাসায় যোগ দিতে পাচ্চিনে! থেকে-থেকে হৃদয়খানা এমন ভাবে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌ছে যে বুঝ্‌তে পাচ্চিনে, এ দারুণ পরীক্ষায় আমি কেমন করে' উত্তীর্ণ হব'!

ঘরের মধ্যে বিজ্‌লীর আলো জ্বল্‌ছিল। নীলুদিদি ঠিক যেন আমায় কলের পুতুলটার মত এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সাজিয়ে দিয়ে শেষে সেই উজ্জ্বল পূর্ণালোকে সন্তর্পণে আমার মুখখানি তুলে ধরে' বলে' উঠ্‌ল—'কি বলিস্ পরি! এমন চাঁদটি দেখ্‌লে চোর চূড়ামণির মাথার কি আর ঠিক থাকে রে?'

লজ্জায় আমার কাণদুটো গরম হ'য়ে উঠ্‌ল!

মহিমের কথা

রাত্রি বোধ হয় এগারটা! গাড়ীখানাকে দেখে কোন লোক কিছু মনে কচ্চে' না ত? বাড়ীর ভেতর হয়ত কেউ জেগে নেই,—সব নিস্তব্ধ!

ওই! সিঁড়িতে খুব অস্পষ্ট পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চে না? বোধ হয় নাম্‌ছে। প্রেমিক কবি জয়দেবই লিখে গেছেন,—"মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলং।" ভারী দামী কথা কিন্তু! প্রণয়িনীর পায়ের মলের আওয়াজটুকু এ জগতে যত মধুরই হোক্, এই সব Critical moment-এ কিন্তু ওটা শত্রুর চেয়েও বাড়া!

উঃ, বুকের ভেতরের পাঁজরগুলো পর্য্যন্ত কেঁপে-কেঁপে

উঠ্‌চে। যাকে এত দূরে-দূরে ভেবে হতাশায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছিলুম, সে—সে আজ এত কাছে!

ওই যে! অন্ধকারে ছায়ার মত কে আস্‌ছে না?—হ্যাঁ।

সসব্যস্তে উঠে দাঁড়ালুম। সে ধীরে ধীরে ভেতরে এল। আমি কোনক্রমে রুদ্ধনিশ্বাসে বলে' ফেল্‌লুম,—বোস' ঐখানটায়।

গাড়ী ছুটে চলেছিল। একান্ত মৌন হ'য়ে আমি ভাব্‌ছিলুম, প্রথমে কি বলে' কথা সুরু করা যায়! কিন্তু একটু পরেই সে নিজে হ'তে ঘোম্‌টা খুলে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেসা কর্‌লে,—'কোথায় যেতে হবে?'

বল্‌লুম,—আজ রাত্রিটার মত আমার বাড়ীতেই। সেখানে বাবা মা কেউ নেই, আমি একা। কেমন, আপত্তি নেই?

'না, আপত্তি কিসের? আমি তো সেইখানেই যেতে চাই!' লক্ষ্য করলুম, তার আগের সে মৃদু জড়িত স্বরটুকু কেটে গিয়েছে। আমি কিছু বল্‌বার আগেই সে আবার বল্লে,—'বাবা, মা কবে আস্‌বেন?' বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লুম, 'দু'চার দিনের মধ্যেই! তবে, তার আগেই আমরা অপর কোথাও চলে যেতে পার্‌বো!'

সে বল্‌লে,—'না! তাঁদের না দেখে আমি কোথাও যাব না।' আমার আগের বিস্ময়টুকু চতুর্গুণ বেড়ে গেল। একি পাগল, না, এ শুধু ছেলেমানুষী! একটু হেসে বল্‌লুম—'কি বল্‌ছ—'

তাই ত! কি বলে আমি একে সম্ভাষণ কর্‌বো? নাম তো আমার জানা নেই! একটা ঢোঁক গিলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমার নামটি কি?'

'পরিমল।'

প-রি-ম-ল্! কি আশ্চর্য্য! আর একদিন আমার ভাগ্যে আর একটী পরিমল জুটেছিল! কিন্তু সে পরিমল তো এমন্ করে' আমার হৃদয়টুকু পর্য্যন্ত সুগন্ধে ভরপুর করে দিতে পারে নি?

সে জিজ্ঞাসা করলে, চুপ করে' রইলেন যে?

থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বলে' ফেল্‌লুম, 'না! ভাব্‌ছিলুম ঐ নামের আর একজনের সঙ্গে আমার একদিন পুতুলখেলার বে' হয়েছিল।'

রাস্তার একটা উজ্জ্বল গ্যাসের আলো তার মুখে এসে পড়তে দেখ্‌লুম, সে একটুখানি হেসে বল্‌লে, 'পুতুল খেলার বে' কি রকম? সে আপনাকে ভালবাসে না, না, আপনি তাকে ভালবাসেন না?'

একটু যেন ভড়্‌কে গিয়ে বল্‌লুম, 'কেউ কাউকে না।'

'মিথ্যে কথা!' গম্ভীরস্বরে সে এই কথাটা বলে উঠ্‌ল।

তারপর কি একটা জিনিষ আমার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বল্লে, 'এইটেই তার প্রমাণ!'

গাড়ী চল্‌ছিল বড় রাস্তা দিয়ে। খানিকটা উজ্জ্বল আলো আমাদের গাড়ীর ভেতর ঢুকেছিল। সেই আলোকে আমি যা' দেখ্‌লুম, তাতে আমার সর্ব্বশরীর নিস্পন্দ হ'য়ে গেল।

এ যে আমার বিয়ের সময়ের বর-ক'নের ফটো!!

—০—

পরিমলের কথা

মনে মনে আমার এমনি হাসি পাচ্ছিল, কি বল্‌বো; অথচ বুকের ভেতরটা দুর্ দুর্ করে কাঁপছিল! মুখে তার আর কথাটী নেই! যেন দৈবুনি বসে' থাকতে থাকৃতেই সে তার সংজ্ঞাটুকু পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেচে! জীবনের এই মুহূর্ত্তটা আমার শেষের দিনটা পর্য্যন্ত মনে থাক্‌বে। এর সঙ্গে যে আমার ইহকাল পরকালের সব সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না একসঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

মনের ভেতর তখন তার কি হচ্ছে, তা আমি যেন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম! তার জাগরিত বিবেক বুদ্ধি লজ্জা তাকে এককালে বিধ্বস্ত করে' তুল্‌চে। তাদের আক্রমণ এড়িয়ে সে যেন আর কোনক্রমে আমার সামনে মাথা তুল্‌তে পারচে না!

তার একখানা শিথিল হাত টেনে নিয়ে বল্‌লুম, 'কি, কথা ক'চ্ছ না যে?'

সহসা সে মুখ তুল্‌লে। ভাঙ্গা গলায় শুধু বল্‌লে, 'কিন্তু তুমি সব জেনে শুনে আমার সঙ্গে এলে কি বলে?'

তাই ত! এর উত্তর আমি কি দোব! কেন এলুম? স্বামীকে তার পাপের মোহ থেকে সজাগ করে' দিতে?

কিন্তু সে জবাব ত' ঘোঁটহুটো ঠেলে একবারও বাইরে এলো না?

সে বাইরের দিকে চেয়ে বল্লে, 'তাহ'লে এখন কোথায় যাবে?'

কোথায় যাবো? একবার মুখে এল, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে! কিন্তু কে যেন আমার মুখখানা চেপে ধর্লে। আমার ভেতরকার নারীহৃদয়টা হঠাৎ আহতের মত ফুঁপিয়ে উঠ্ল। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলে' ফেল্লুম, 'মামার বাড়ীতে ফিরে যাবো!'

সে চকিত হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে আমার কথার প্রতিধ্বনি করে' উঠ্ল—'ফিরে যাবে?'

আমি সাধ্যমত নিজেকে সাম্লে নিয়ে বল্লুম, 'হ্যাঁ। নইলে, এই হীন কুলটার মত বাড়ী থেকে বেরিয়ে আমি কেমন করে' তোমার সঙ্গে যাবো? তোমার ধর্ম্মপত্নী আমি, এতদিন পরে যদি সে অধিকার তুমি দিতে চাও আমায়, তবেই আবার ঠিক সেই গৌরব নিয়ে তোমার পাশে এসে দাঁড়াব। স্ত্রী স্বামীর দাসী হ'লেও সে স্ত্রী। স্বামী হ'য়ে তুমি আমার সে মর্য্যাদা-টুকু ক্ষুণ্ণ ক'রোনা।' কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে আমার আজ্ঞাতেই দু'চোক বেয়ে অশ্রু ঝরে' পড়্ছিল। আর নিজেকে সাম্লাতে না পেরে আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্লুম।

সে কতক্ষণ জানি না। ধীরে ধীরে সে আমার হাতদুখানি চেপে ধরে বল্লে, 'তাই হোক্ পরিমল! কিন্তু দু'দিন বাদে যখন আবার তোমায় নিয়ে আস্ব, তখন যদি পার, আজ্‌কের এ অপরাধ আমার মার্জ্জনা ক'রো।'

তার গলা কাঁপ্ছিল। বাইরে চেয়ে দেখ্লুম, গাড়ী আবার শ্যামবাজারের দিকেই চলেছে।

গতি ও পরিণতি।

[শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন]

ইতস্ততঃ পরিদৃশ্যমান নামরূপবিশিষ্ট যাহা কিছু তৎসমুদয়ের সাধারণ নাম পদার্থ।

পদার্থ সাধারণতঃ দুই প্রকার—জড় ও চেতন। এস্থলে জড় শব্দে বুঝিতে হইবে যে, যে সকল পদার্থের স্বাধীনতা ও ইচ্ছাশক্তি পরিচালনক্ষমতা স্থূল দৃষ্টির অননুভবনীয়। জড় বলিলে অত্যন্তচেতনাভাব অর্থাৎ অচেতন বুঝায় না। কারণ জগতের কার্য্য ও কারণস্বরূপ ব্রহ্ম সৃষ্টপদার্থের অভ্যন্তরে ওতপ্রোত ভাবে অনুপ্রবিষ্ট। তিনি চৈতন্যময়; চৈতন্যময় হইতে জাত পদার্থ কখনো অচেতন হইতে পারে না। তবে কি না এই চেতনা কোনো পদার্থে বেশি আর কোনো পদার্থে কম। জড় ও জীবের পার্থক্য কেবল চৈতন্যের পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই নহে।

এখন প্রশ্ন এই যে, যদি জড়োপহিত পদার্থের মধ্যেও চৈতন্য-কণিকার স্পন্দনই থাকে, তবে অচেতন পদার্থের পুরুষকার ও ইচ্ছাশক্তি নাই কেন? যে কারণে চেতন পদার্থের ভিতরে পুরুষকার বর্ত্তমান, তথা কথিত জড়োপাধি বিশিষ্ট পদার্থেও তো তাহাই আছে; অর্থাৎ জড়ের ভিতরেও চৈতন্য কণিকার স্পন্দন আছে। অল্লাধিক চেতনা সমন্বিত পদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম্মই পুরুষকার, স্বাধীনতা ও ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়া—অতএব জড়ে উল্লিখিত গুণসমূহ নাই, ইহা অপসিদ্ধান্ত। বক্ষ্যমান শক্তিসমূহ তথা কথিত জড়পদার্থ নিচয়ের মধ্যে এত অল্প পরিমাণে সূক্ষ্মভাবে নিহিত যে, উহা স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহে।

অতএব চৈতন্য আছে যদি ইহাই সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াও আছে এবং তাহাও এত সূক্ষ্ম যে একান্ত অনুভবনীয়। এই সূক্ষ্মতাটুকু অনুভব করিতে পারি না বলিয়াই জড় পদার্থকে আমরা সম্পূর্ণরূপে অচেতন বলিয়া মনে করি।

অতএব নামরূপ বিশিষ্ট পদার্থ-ধর্ম্মী পদার্থের তিনটী বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা—অল্পচেতন, অল্পাধিক চেতন ও চেতন। অল্পচেতন যথা—ধাতুদ্রব্যাদি। অল্পাধিক চেতন—উদ্ভিদাদি। আর চেতন যথা—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি। অনেকে প্রশ্ন করেন যে, যদি চৈতন্য বিনা কোনো পদার্থেরই অবস্থিতি কোনো কালেই সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে মৃত্যু কথাটির অর্থ কি? মৃত্যুর পর "এদেহে চৈতন্য নাই" এরূপ বলা হয় কেন ইহার উত্তর এই যে,মৃত্যুর পরে ও পূর্ব্বে চৈতন্যটুকু সর্ব্বদাই সমভাবে থাকে। চিচ্ছক্তির কখনো হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। তবে কিনা তন্মাত্র-সমূহের যৌগিক সমবায়ে যে প্রাণশক্তি উৎপন্ন হইয়াছিল তাহাই বিশ্লিষ্ট হইল। অর্থাৎ জৈবিক ক্রিয়া-নিষ্পত্তির স্থূল শক্তি, স্থূলভাবে বিশ্লিষ্ট হইল। ইহারই নাম মৃত্যু। জৈবিক ক্রিয়াশক্তি ও চিচ্ছক্তি (চৈতন্য) এক কথা নহে।

জড় ও জীবনির্ব্বিশেষে সকল পদার্থই গতি ও পরিণাম-শীল। গতি ও পরিণামবিহীন পদার্থের কল্পনা করা অসম্ভব। ফলতঃ পদার্থ তাহাকেই বলে, যাহার গতি ও পরিণাম আছে। মনে রাখিবেন, যাঁহারা অদ্বৈতবাদী, জগতের নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তা মানেন না, তাঁহারা সহজে এসকল কথা বিশ্বাস করিবেন না। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁহাদের মত খণ্ডন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমরা আগে নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তা মানিয়া একটু ব্যবহারিক ভাবে পদার্থের স্বরূপ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিব।

পদার্থের উন্নতি ও অবনতি সম্পূর্ণরূপেই গতি ও পরিণামের উপর নির্ভর করে। পদার্থের স্বাভাবিক চেষ্টাই এই যে, সে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে এমন করিয়া লইতে চাহে, যে সেগুলি যেন তাহার গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে সাহায্য করে। পদার্থের উন্নতি ও অবনতি দুইই আছে; যেমন মানুষ মৃত্তিকা হইতেছে, আবার মৃত্তিকাও মানুষ হইতেছে। এই উন্নতি ও অবনতির কারণ নির্ণয় করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

পদার্থের গতি ও পরিণাম মানিলেই তাহার আরম্ভ আছে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ন্যায়দর্শন বলেন—পদার্থের অবয়াবয়বিধারায় কোন স্থানে বিশ্রাম হয়, ইহা নিশ্চয় বিশ্বাস করিতে হইবে।

অবয়াবয়বি-প্রবাহ অনন্ত হইলে "অমুক বস্তু ক্ষুদ্র, অমুক বস্তু বৃহৎ, এরূপ ব্যবহার থাকে না। পর্ব্বত ও সর্ষপের পরিণাম সমান নহে, ইহা সকলেই পরিজ্ঞাত কিন্তু কার্য্য-দ্রব্যের কোন স্থানে বিশ্রাম না মানিলে পর্ব্বত বৃহৎ ও সর্ষপ ক্ষুদ্র এইরূপ সর্ব্বজন-স্বীকৃত ব্যবহার কিরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে? কারণ তোমার মতে পর্ব্বত ও সর্ষপ উভয়েরই অবয়াবয়বিধারা অবিশ্রান্ত। পর্ব্বত ও সর্ষপের পরিণাম-বৈষম্যের যুক্তি দেখাইতে হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে পর্ব্বতের কারণীভূত পরমাণুর সংখ্যা সর্ষপের কারণীভূত পরমাণুর সংখ্যা হইতে অত্যন্ত অধিক। সুতরাং অধিক সংখ্যক পরমাণু হইতে উৎপন্ন বলিয়া পর্ব্বত বৃহৎ, আর অল্প সংখ্যক পরমাণু হইতে উৎপন্ন বলিয়া সর্ষপ ক্ষুদ্র। কাজে কাজেই অবয়াবয়বিধারা যে অবিশ্রান্ত নহে ইহা একান্তই মানিতে হইল। পদার্থের চরম পরিণতি ইহাই যে, যে যাহা ছিল ক্রমে তাহাতেই পরিণত হইবে। নানা আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া পদার্থ তাহার চরম পরিণামের দিকে চলিয়াছে।

যেখানে আরম্ভ সেইখানেই পরিণতি। নদীতে তরঙ্গ উঠিতেছে আবার তাহাতেই বিলীন হইতেছে। ফুল ফল ও বীজ তিনটি পদার্থ ক্রমান্বয়ে জন্মিতেছে ও লয় পাইতেছে। ইহাদের আদভূত নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ব্রহ্ম।

বিবেকানন্দ-তত্ত্ববিচার।

[শ্রীসাহাজী]

"বিবেকানন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া কোনও সাধুকে বলিতে শুনিয়াছিলাম, "অন্তরে দিব্য কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করি, হৃদয়ে পূর্ণ জ্যোতিঃ উছলিয়া পড়ে, চিন্ময় গোপাল আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ান। ইঁহারই সেবায় আত্মহারা আমি। সংসারে কে না খাইল, কোন্ রাজ্যে মানবসমাজ নিপীড়িত হইল, কোন্ দেশ বিধবার জীবন্ত অগ্নিদাহের ব্যবস্থা করিল, এ সকল দেখিয়া আমার কি হইবে? বিবেকানন্দ সামান্য কর্ম্ম লইয়াছিলেন। ব্রজের মধুর প্রেমের আস্বাদ তিনি পান নাই। তাঁহা যদি পাইতেন, তাহা হইলে ঐ প্রকার ভুয়া "খোসাভুঁষি" লইয়া থাকিতেন না।"

সত্য হউক, মিথ্যা হউক, সাধুর এই কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। অন্তরে যে চিন্ময় গোপাল আছেন, ঐ শ্রেণীর সাধুরা থাকেন তাঁহারই সেবায় বিভোর। কিন্তু চিন্ময় গোপাল যিনি, যাঁহার জন্ম নাই মৃত্যু নাই, যাঁহার অভাব নাই অভিযোগ নাই, স্বয়ং পূর্ণ যিনি, তাঁহার সেবা কিরূপে সম্ভবপর হয়? তিনি কিসের অভাবে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির সেবার প্রার্থী হইবেন? ফলতঃ, চিন্ময় গোপাল সেবার প্রার্থী নহেন, সেবার কাঙ্গাল বিশ্বের এই সকল লীলা-গোপাল। চিন্ময় গোপালের নামে ঐ সকল সাধু বস্তুতঃ আত্মসেবা করেন। প্রকৃত কথা এই যে, ইঁহারা আনন্দের অত্যন্ত ভিখারী, দুঃখের ভয়ে সতত সন্ত্রস্ত। ইঁহারা চাহেন দুঃখময় সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের নেশায় ভরপুর রহিতে। ইঁহারা মনে করেন, আনন্দ ভগবানের সৃষ্টি, আর দুঃখ সৃষ্টি সয়তানের। ইঁহারা জানেন না, আনন্দ যে মঙ্গল হস্তের দান, দুঃখও তাঁহারই দান। ইঁহারা তাই সর্ব্বপ্রযত্নে দুঃখকেই এড়াইতে চাহেন। অথচ বুঝিতে পারেন না, আনন্দ ও দুঃখ একই সত্তার দুই দিক, সেই নিরবচ্ছিন্ন অপার্থিব আনন্দ পাইতে হইলে, তাহা এই পার্থিব সুখ-দুঃখের মধ্যে থাকিয়াই পাইতে হইবে, ইহা ভিন্ন তাহা পাইবার নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে * * *।

প্রেম ভিন্ন সেবার অধিকার পাওয়া যায় না। যথার্থ প্রেমিক শত লাঞ্ছনা, সহস্র গঞ্জনা অম্লান বদনে সহ্য করেন, অথচ তাহাতেও অতুলানন্দেরই অধিকারী হন। প্রকৃত সেবকের নিকটে সুখ ও দুঃখ, বিষও অমৃত তুল্য হইয়া যায়।

এই যে আত্মবিস্মৃতি, সেব্যের জন্য এই যে আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দেওয়া—ইহাই যথার্থ সেবকের লক্ষণ। সুতরাং ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐ শ্রেণীর সাধুরা আর যাহাই হউন, প্রেমিক ও সেবক নহেন। ফলতঃ, ইঁহারা ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরকে ভালবাসেন না, ইঁহারা ঈশ্বরকে ভালবাসেন আত্মতৃপ্তির জন্য। আত্মতৃপ্তি যেখানে নাই, দুঃখ সেখানে, সেখানে ইঁহারা ভগবানকে দেখিতে পান না।

"দুঃখ যেখানে, দৈন্য সেখানে,
তোমারে সেখানে ধরিব নিবিড় করিয়া।"

একথা ইঁহারা বুঝেন না। ইঁহারা সুখের কাঙাল। তাই, এই সুখের লালসাতেই ইঁহারা "কণ্টকময় সংসার পথে" ছুটাছুটি করিয়া কোথাও উহার সন্ধান না পাইয়া অবশেষে শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে আপনাকেই আপনার মাঝে রুদ্ধ করিয়া ফেলেন। ব্যাধ-বিতাড়িত শশক যেমন প্রাণভয়ে সমস্ত বন দৌড়াদৌড়ি করিয়া পরিশেষে আপন বাসগহ্বরের প্রান্তে বিবশদেহে অবশচিত্তে মুদিত নয়নে শুইয়া পড়িয়া আপনাকে পরম নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ মনে করে, ইঁহারাও তেমনি কূর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করত মনে করেন, ইহাই বুঝি পরামুক্তি, পরাশান্তি এবং পরম আনন্দ। কিন্তু হায়! যে স্থানে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত মানবের নিপীড়ন, বিধবার অগ্নিদাহন হইতেছে, নিরন্নের হাহাকার, আর্ত্তের চীৎকার ধ্বনি উঠিতেছে,

"সেথা সুখ ইচ্ছ, মতিমান?"

সমষ্টি যেখানে দুঃখী, সেখানে ব্যষ্টি তুমি, তুমি হইতে চাও

সুখী? সমষ্টির সুখভিন্ন ব্যষ্টির সুখ নাই, হইতেও পারে না। জড়বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলেও বলা যায়, একই ইলেকট্রোন প্রকম্পনী শক্তির (Vibration) তারতম্যানুসারে এখানে হইয়াছে গাছ সেখানে হইয়াছে পাথর; এখানে হইয়াছে পশু, সেখানে হইয়াছে পক্ষী; এখানে হইয়াছে সাধু, সেখানে হইয়াছে অসাধু; এখানে হইয়াছি আমরা, সেখানে হইয়াছেন তাঁহারা। হওয়া বাঁচা মরা, শোওয়া বসা খাওয়া, হাসা ও কাঁদা, এই যে আমাদের অসংখ্য কার্য্যকলাপ, এ সকল আর কিছুই নহে, শ্রীকৃষ্ণরূপী ইলেকট্রোনকে আশ্রয় করিয়া নিত্যলীলারাস-রসময়ী রঙ্গিনী শ্রীরাধারূপিনী প্রকম্পনী শক্তির পলকে পলকে পরিবর্ত্তনশীল নব নব তরঙ্গ উচ্ছ্বাস, সুতরাং অনন্তবিশ্বের সর্ব্ব পদার্থের (অতএব আমাদেরও) মূল উপাদান যখন একই, ঐ সাধুরা এবং আমরা যখন একই বস্তু, একই সূত্রে গ্রথিত; সমগ্রের আমরাও যখন এক অংশ; তখন, আমরা যে দুঃখ ভোগ করি তাঁহারাও সেই দুঃখের হাত কিরূপে এড়াইতে পারেন? আমাদের প্রত্যেকের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একজনেরও সদসৎ চিন্তা ও কার্য্যের ধারা অর্থাৎ প্রকম্পনী শক্তির প্রত্যেক তরঙ্গ উচ্ছ্বাস যখন তাঁহাদিগেতে—শুধু তাঁহাদিগেতে কেন, নিখিলের সর্ব্বত্রই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে প্রসারিত হইতেছে, তাঁহারাও যখন আমাদের সেই সদসৎ চিন্তা ও কার্য্যের ফলে প্রতিমুহূর্ত্তেই তদনুগতভাবে অনুপ্রাণিত ও স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছেন, তখন বিশ্বের সকলকে দুঃখী রাখিয়া তাঁহারা একাকী কিরূপে সুখী, সকলকে অসৎ রাখিয়া একাকী কিরূপে সৎ এবং সকলকে বদ্ধ রাখিয়া তাঁহারা একাকী কিরূপে মুক্ত হইতে পারেন? ফলতঃ, যতক্ষণ বিশ্বের এক জনও অভুক্ত, অভক্ত, অসুখী, অজ্ঞান এবং অমুক্ত থাকিবে, ততক্ষণ ভুক্তি, মুক্তি, ভক্তি, জ্ঞান এবং আনন্দের অধিকারী তাঁহারাও হইবেন না এবং আমরাও হইব না। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম ঋষি বিবেকানন্দের হৃদয়-সমুদ্রে এই মহাসত্যের তরঙ্গ উচ্ছ্বাস জাগিয়াছিল। তাই, তাঁহার ধ্যান, ধারণা, সমাধি যাহা কিছু সকলই নিয়োজিত হইয়াছিল এই মহাসত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য। তাঁহার "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" জীবন নিঃশেষে অর্পিত হইয়াছিল, এই মহাসত্যকে কর্ম্মের মধ্য দিয়া মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলিবার জন্য। আর তিনি স্বয়ংও ছিলেন এই মহাসত্যেরই পূর্ণ প্রকট মূর্ত্তি।

* * *

বাংলা আমাদের জন্মভূমি। জননী জন্মভূমির সেবা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু যিনি বঙ্গজননীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করেন, তিনি জননীর যথার্থ ভক্ত নহেন; তিনি শুধু প্রবর্ত্তক। আবার যিনি মানস অন্তরে জননীর স্বর্গীয় দিব্য মূর্ত্তি দর্শন করতঃ তাহাতেই বিভোর থাকেন, তিনিও প্রকৃত স্বদেশভক্ত নহেন। মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি জড়জগতের, আর মানসী মূর্ত্তি ভাবজগতের জিনিস, ইহাই যাহা কিছু পার্থক্য। সাধকের নানাবিধ miracle দর্শন হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল miracle দর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য নহে। ফলতঃ, প্রকৃত স্বদেশসেবক তিনি, যিনি স্বদেশ বলিতে স্বদেশবাসীদিগকে বুঝিয়া তাহাদেরই সেবায় কায়মনঃপ্রাণ অর্পণ করেন। স্বদেশের স্বরূপ স্বদেশবাসীদের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া চাই। এইরূপ, ঈশ্বরের সেবা করিতে হইলে, বিশ্বের ঈশ্বর এই কথা বুঝিয়া বিশ্ববাসীদেরই সেবা করিতে হয়। ফলতঃ, বিশ্বেশ্বর বিশ্বময়, এই বাক্যের উপলব্ধি হওয়া চাই। অন্যথা, ঈশ্বরসেবার অধিকারী হওয়া যায় না। এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই শিক্ষার শেষ হইল, এইরূপ মনে করা ভুল। বরং অধীত শিক্ষাকে কার্য্যসফলতায় সার্থক করিয়া তুলিবার সময় তখন হইতেই পাওয়া গেল। সমাধি লাভও সেইরূপ, ধর্ম্মরাজ্যের এম এ পরীক্ষা। সমাধির পর হইতেই প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শুধু সাধনারই সময়। আগে সাধন, পরে ভজন। সাধনায় সিদ্ধ হইলে তখনই ভজন অর্থাৎ ঈশ্বরসেবার অধিকারী হওয়া যায়। তখনই চৈতন্যের ন্যায় "যাহা যাহা নেত্র পড়ে, তাহা কৃষ্ণস্ফুরে," এই অবস্থা লাভ হয়। বিশ্বেশ্বর তখনই বিশ্বময় হন। ঈশ্বর সেবার অবসর মেলে তখনই। ইহাই সাধনার চরম পরিণাম।

* * * *

সিদ্ধজীব দুই শ্রেণীর; সাধারণ সিদ্ধসাধক এবং নিত্যসিদ্ধ অবতার পুরুষ। সাধারণ সাধকের চিত্ত বহু হইতে একের

দিকে, সৃষ্টি হইতে লয়ের দিকে, লীলা হইতে নিত্যের দিকে ধাবিত হয়। ইঁহার চিন্তার ধারা নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে গমন করে। আর নিত্যসিদ্ধের মন এক হইতে বহুর অভিমুখে অর্থাৎ সৃষ্টির দিকে,—লীলার দিকে প্রসারিত হয়। ইঁহার চিন্তার-ধারা ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে "অবতরণ" করে। সাধারণ সাধক সিদ্ধাবস্থায় যে চরম সত্য প্রাপ্ত হন, অবতার-পুরুষ জীবনের প্রারম্ভেই সেই সত্য মূলধন স্বরূপ পাইয়া থাকেন। একজন ভূমা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন অতএব আপনাকে ক্ষুদ্র ও বদ্ধ ভাবেন, অন্যজন আপনাকে ভূমার সহিত সংযুক্ত অতএব আপনাকে শুদ্ধ বদ্ধ মুক্তস্বরূপ বলিয়া জানেন। একের উদ্দেশ্য হয় সংসারের দুঃখ কষ্ট হইতে পরামুক্তি ও তন্নিবন্ধন পরাশান্তি লাভ। অন্যে কিন্তু স্বয়ং আনন্দ-স্বরূপ, সুখ দুঃখের অতীত, তাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হয় বিশ্বলীলায় যোগ দেওয়া, লীলার সৃষ্টিসাধন করা। একজন শুধু আপনারই জন্য; অন্যজন আত্মবিস্মৃত, সুতরাং তিনি বিশ্বের জন্য 'বহুজন হিতায়'। একজন রজনীকান্ত, অন্যজন রবীন্দ্রনাথ। একজন গান করেন,

"আর কারো কথা কব না আমি
তোমারি কথাই কব গো।"

অন্যজন গান করেন,

"কণ্ঠ আমার সকল কথায়
তোমার কথাই ববে।"

একজন সংসারের সকলের কথাকে ঠেলিয়া রাখিয়া শুধু একের কথাই কন। কিন্তু সকলের কথাকে ছাড়িয়া যে একের কথা, তাহা অপূর্ণ। পরমহংসদেবও বলেন, বেলের "খোলা মাল" বাদ দিলে ওজনে কমতি হয়। অন্যের কিন্তু কাহারও কথা ঠেলিয়া ফেলিবার প্রয়োজন হয় না। সকলের কথাই ইঁহার নিকটে সার্থক। ইনি সকলের কথায় সেই একেরই কথা শুনিতে পান। একজন প্রতিমা দেখিয়া উহার মূলে কি আছে, তাহাই জানিবার জন্য ব্যস্ত হন। অন্যে খড় খুঁটি দেখা নিষ্প্রয়োজন জানিয়া প্রতিমাখানিকেই সার্থক করিয়া তুলিতে যচেষ্ট হন।

* * * * *

আত্মসুখ তাৎপর্য্য কাম সেই হয়।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য প্রেম তারে কয়॥

সাধক জপ তপ, দান ধ্যান সাধনা সমাধি যাহা কিছু করেন, ধর্ম্ম মোক্ষ ঈশ্বর যাহা কিছু চান, তাহার সকলই আত্মসুখের জন্য। সুতরাং তিনি যে তখনও কামনারই দাস থাকেন, তাহা কোন প্রকারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যাঁহার আত্মতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত ঘুচিয়া যায়, সন্ধ্যা তাঁহার বন্ধ্যা হয়, সমাধি ব্যাধি তুল্য হয়, তাঁহার তখন "যন মন তনু সিদ্ধি" হয়। যশোদার ন্যায় নিজ বাঞ্ছিতের প্রতি তখন তাঁহার ঈশ্বরত্ব জ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়া মমত্ব বুদ্ধির উদয় হয়। এই যে মমত্ববুদ্ধি, সাধারণ সংসারী স্বামী স্ত্রী, অথবা পিতামাতা পুত্র কন্যার মধ্যে যে আমার বোধ,—ইহা কিন্তু তাহা নহে। ইহাতে সংকীর্ণতার গণ্ডী থাকে না, আত্মসুখ আকাঙ্ক্ষার লেশ থাকে না। তিনি তখন তাঁহার বাঞ্ছিতকে পান "ঈশ্বরের" মধ্যে নহে, যশোদার ন্যায় হয়ত সামান্য এক "অক্ষম শিশুর" মধ্যে। বাঞ্ছিত তখন তাঁহার নিকটে ছোট হইয়া যায়। যশোদার ন্যায় তাঁহারও তখন মনে হয়, আমি না দেখিলে গোপালকে দেখিবে কে? ভক্তের এই যে বড় হওয়া, ইহা অহঙ্কারের নহে, প্রেমের ফল। মহাপুরুষের চিত্তের এই যে ভাব, বৈষ্ণবের ভাষায় ইহারই নাম কামগন্ধলেশহীন ব্রজের প্রেম। আর চিত্তের এইরূপ অবস্থায় মহাপুরুষ যাঁহার বাঞ্ছা করেন, বৈষ্ণবের ভাষায় তাহাকেই বলা হয় ব্রজের কৃষ্ণ। এ অবস্থায় "ঈশ্বর" "দেবতা" "অবতার" প্রভৃতি তাঁহার বাঞ্ছিত হইতে পারে না, কারণ এই সকলের সহিত ঐশ্বর্য্যের ভাব বিজড়িত থাকে। সেরূপ অবস্থায়, জগতে যেখানে যে যত ছোট আছেন, তাঁহার বাঞ্ছিতই ঐরূপ ছোট হইয়া প্রকটিত হইয়াছেন—তাঁহার সেবা লইবার জন্য, তখন তাঁহার এইরূপ দিব্যদর্শন লাভ হয়। মহাপুরুষের সর্ব্বসংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে ঈশ্বরও অক্ষম শিশু, ব্রহ্মও ক্ষুদ্র ক্রিমিকীট, এই প্রকার ছোট বড় ভেদ ঘুচিয়া যায়। ইনি আমার স্ত্রী, অতএব আমার পরম আদরের, আর এ আমার বাড়ীর দাসী, সুতরাং আমার তেমন আদরের নহে,—আমাদের এই প্রকার ভেদবুদ্ধি জন্মে, আমাদের প্রয়োজনের তারতম্য অনুসারে—স্ত্রীতে আমাদের যতখানি প্রয়োজন, দাসীতে আমাদের ততখানি প্রয়োজন থাকে না

বলিয়াই। কিন্তু এই আত্মপ্রয়োজন বোধ যখন লুপ্ত হইয়া যায়, তখন স্ত্রী ও দাসীতে সমবুদ্ধি হয়; ফলতঃ, মানবের যতক্ষণ স্বার্থবুদ্ধি থাকে—সে স্বার্থ যত বড়, যত মহৎই হউক—ততক্ষণই ঈশ্বর তাহার নিকটে সর্ব্বশক্তিমান বিভু দয়াময় ইত্যাদি নামে পূজিত হন। ইহা ধনীর নিকটে ভিক্ষুকেরই কাঙাল বৃত্তির অনুরূপ। কিন্তু এই কাঙালপনা যাহার ঘুচিয়া যায়, মন্দিরের বিগ্রহের দিকে অথবা মন্দিরের সেবাইত মোহন্ত প্রভুর দিকে, তাহার ততখানি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না, যতখানি দৃষ্টি পড়ে তাহার মন্দিরের প্রাঙ্গণ পরিষ্কারক অস্পৃশ্য ঝাড়ুদারের প্রতি।

যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের এই নিগূঢ় তত্ত্ব না বুঝিবেন, তাঁহারা বিবেকানন্দের এই কর্ম্মযোগরহস্যও বুঝিতে পারিবেন না। তাঁহাদের চক্ষে স্বামীজির এই দরিদ্রসেবা- সাধারণ জীবের অনুষ্ঠেয় সামান্য কর্ম্ম বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু তাঁহার নিকটে ইহাই ছিল তাঁহার যথার্থ কৃষ্ণসেবা। তাঁহার এই সেবার উৎস ছিল 'দয়া' নহে,—প্রেম—কামগন্ধলেশহীন ব্রজের প্রেম—যে প্রেমে আত্ম সুখেচ্ছা দূরীভূত হয়, মুক্তি বন্ধন, সুখ দুঃখ তুচ্ছ হইয়া যায়, ঈশ্বরত্ব বোধ পর্য্যন্ত ঘুচিয়া যায়। ব্রজের সেই প্রেম—কৃষ্ণপ্রেম ধন মানবের অন্তরে উদিত হইলে সেই ভাগ্যবানের জীবন কিরূপ হয়, মহাত্মা বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁহার জ্বলন্ত নিদর্শন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের যুগোপযোগী নব সংস্করণ। একথা যাঁহারা বুঝেন না, তাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ব, কৃষ্ণপ্রেম কি বস্তু, তাহা আজও বুঝিতে পারেন নাই।

শ্রীচৈতন্য মুণ্ডিতমস্তক ছিলেন, তিনি বিশুদ্ধ দেবভাষায় শ্লোক রচনা করিতেন, আর বিবেকানন্দ ছিলেন "বাবু বিশেষ," বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন ম্লেচ্ছভাষায়,—ভাব, বিষয়ে দীনাতিদীন বাক্যসর্ব্বস্ব বদ্ধ সংস্কার। যে সকল ব্যক্তির যুক্তির দৌড় এই পর্য্যন্ত, তাঁহাদের নিকটে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। তাঁহারা কবে আবার হয় ত বলিয়া বসিবেন, বিবেকানন্দ ম্লেচ্ছদের গাড়ীতে চড়িতেন, সুতরাং তিনি সনাতন হিন্দু সমাজে একান্তই অচল। বিবেকানন্দ কর্ম্ম করিতেন এ কথা সত্য, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, চৈতন্য-দেব কি নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতেন? "কর্ম্মত্যাগ" কথার যথার্থ অর্থ কি, তাহা বুঝিয়া দেখিবার বিষয়।

ডলীর কথা।

[শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত, এম এ, বি-এল]

১

মানুষ, জানোয়ার আর পাথর এরা যতই কাছে আসে, ততই তারা বড় দেখায়। আর যখন এরা আমার উপর চেপে বসে তখন বড়ই ভারী বোধ হয়। আমি কিন্তু তেমন নই। যেখানেই থাকি না কেন সেখানেই আমি একই রকম বড় থাকি।

২

"যে খাদ্য-আমার প্রভু মুখে দিতে উদ্যত হইয়া আমার ...ত্যের তরঙ্গ উচ্ছ্বাস জাগেন তাহা শুধু আমাকে প্রলোভিত ধারণা, সমাধি যাহা কিছু সকলোভী সাব্যস্ত করিয়া শান্তি মহাসত্যকে উপলব্ধি করিবার একেকটা বটে।
বিজং" জীবন নিঃশেষে অর্পিত হই ...আগে।

৪

আমার প্রভু যখন চেয়ারে বসেন তখন তাঁহার পশ্চাতে গিয়া শয়ন করিলে তিনি আমার শরীরটাকে গরম করিয়া দেন। তিনি একজন দেবতা কিনা তাই অমনটি করিতে পারেন। আগুনের চিমনীর সম্মুখে একটী গরম পাথর আছে। সেটিও দৈবশক্তিসম্পন্ন।

৫

যখন খুসী তখনই আমি কথা বলি। আমার প্রভুর মুখ হইতেও আমার মত শব্দ বাহির হয়। সে শব্দেরও অর্থ আছে। কিন্তু আমার কথার অর্থের ন্যায় তাহা তত সুস্পষ্ট নয়। আমার প্রত্যেক শব্দেরই অর্থ থাকে, কিন্তু আমার প্রভুর মুখ হইতে অর্থশূন্য অনেক শব্দ বাহির হয়। আমার প্রভু যাহা ভাবেন তাহা কঠিন হইলেও অনুধাবন করা নিতান্ত আবশ্যক।

খাওয়াটা একটা উত্তম কাজ। খাওয়া শেষ করিয়া ফেলা আরও ভাল। কারণ যে সকল শত্রু খাদ্য কাড়িয়া লইতে গোপনে নীরবে অপেক্ষা করে তাহারা খুব চতুর ও দ্রুতগামী।

সকলই পরিবর্ত্তনশীল। আমিই কেবল অপরিবর্ত্তনীয়।

সমস্ত জীবজন্তু বস্তু প্রভৃতির কেন্দ্রস্থলে আমি বাস করি। আর শত্রু মিত্র সকল প্রকারের জীবজন্তু বস্তু দ্বারা আমি পরিবেষ্টিত থাকি।

৯

ঘুমাইলেই নানা প্রকারের সুখজনক ও দুঃখদায়ক কুকুর ঘোড়া মানুষ ও গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জাগিলেই এই সব অদৃশ্য হয়।

১০

আমার প্রভুকে আমি ভালবাসি। কারণ তিনি খুব শক্তিশালী আর খুব ভয়ানক।

১১

যে কার্য্যের জন্য কেহও প্রহার প্রাপ্ত হয় তাহা নিতান্ত মন্দ। যাহার জন্য আদর ও খাদ্য পাওয়া যায় তাহা অত্যন্ত ভাল।

১২

রাত্রিতে যত সব মন্দলোক গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমার প্রভু জানিলেই ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিবেন, এইজন্য তাঁহাকে সতর্ক করিতে চীৎকার করি।

১৩

উপাসনা

হে আমার প্রভু! হে মোর সাহসী দেবতা! তোমায় আমি ভক্তি করি। সকলেই তোমার প্রশংসা করে। তুমি যে ভয়ঙ্কর সেজন্য তোমার প্রশংসা হউক। তুমি যে দয়ালু সেজন্য তোমার যশ হউক। আমি তোমার পায়ের কাছে পড়িয়া থাকি আর তোমার হাত চাটি। তুমি যখন টেবিলে বসিয়া অপর্য্যাপ্ত মাংস খাইতে থাক তখন তোমায় বড়ই মহৎ ও সুন্দর দেখায়। আর যখন তুমি একখণ্ড সরু কাঠ ঘসিয়া আগুন জ্বাল আর রাত্রিকে দিনে পরিণত কর তখনও তোমায় খুব মহৎ ও সুন্দর দেখায়। তুমি আমাকে গৃহে রাখিয়া আর সকল কুকুরকে তাড়াইয়া দিও। আর হে রাঁধুনী এঞ্জেলিক, তুমিও স্বর্গীয়, মহৎ ও প্রবল। তুমি আমাকে যথেষ্ট খাইতে দিবে এইজন্য তোমাকে ভয়ও করি সম্মানও করি।

১৪

যে কুকুর মানুষের প্রতি দয়ালু নয় আর যে তাহার প্রভুগৃহের সমাগত ব্যক্তিকে ঘৃণা করে, তাহার জীবন বড়ই শোচনীয়। কারণ তাহাকে ভবঘুরে হইয়া জীবন কাটাইতে হয়।

১৫

একদিন দেখিলাম একটা ফুটো কলসী ভরিয়া কে একজন বৈঠকখানা ঘর দিয়া যাইতেছিল আর ঝক্‌ঝকে মেজের উপর কলসী হইতে জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। খুব কড়া প্রহার দিলে তবে ঐ নোংরা কলসীর উপযুক্ত শাস্তি হইত।

১৬

মানুষের এমন ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে যাহার বলে সে সকল দরজাই খুলিতে পারে, আমি নিজে খুব অল্প কয়টাই খুলিতে পারি। এই দরজাগুলার মত জঞ্জাল আর নাই, কারণ ইহারা কুকুরের হুকুম সহজে মানিতে চায় না।

১৭

কুকুরের জীবন বড়ই বিপদসঙ্কুল। দুঃখের হাত এড়াইতে হইলে তাহাকে সদা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয় —আবার সময়েও, এমন কি যখন সে ঘুমায় তখনও।

১৮

মানুষের প্রতি কেহও সদাচরণ করিল কি অসদাচরণ করিল তাহা বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। মানুষকে বুঝিতে না চাহিয়াই উপাসনা করা আবশ্যক। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি আশ্চর্য্য রকমে অস্পষ্ট।

১৯

হে ভর্ত্তা! তুমি মাতার মত মহৎ ও স্নেহশীল। তুমি

উপকারী ও পবিত্রতা পূর্ণ। তুমি আমার মনের মধ্যে বিরাজ কর। বিপদের সময় তুমি আমার মনে উপস্থিত হইও। তোমার সাহায্যে যেন আমি যত কিছু অনিষ্টকর তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি। আমি যেন শত্রুগণের মধ্যে যাইয়া আপনাকে বিপদগ্রস্ত না করি।

২০

যে সকল গাড়ী ঘোড়ায় টানে সেগুলি বড়ই ভয়ানক। আর যেগুলি জোরে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে নিজে নিজেই চলিয়া যায় তাহারাও খুব ভয়ানক। যে সব ব্যক্তি ছেঁড়া জামা পরে তাহারা ঘৃণার্হ। সেইরূপ যাহারা মাথায় ঝুড়ি বহন করে কিম্বা জিনিষ পত্র রাস্তা দিয়া গড়াইয়া নেয় তাহারাও ঘৃণার্হ। যে সমস্ত বালক বালিকা চীৎকার করিয়া জোরে ছুটাছুটি করে আর পরস্পরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাস্তা দিয়া ধাবিত হয় তাহাদিগকেও আমি পছন্দ করি না। এই জগৎটাই শত্রু ও ভয়াবহ পদার্থে পরিপূর্ণ।*

কবিতা-কুঞ্জ।

নিশীথের পাপিয়া।

[শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়, বি-এ]

নীল গগনের দিল্ বাহারে,
এ কোন্ মধুর সুর আহা রে!
এ কোন্ পরীর প্রাণের গীতি—
উঠ্‌ল কেঁপে দূর পাহাড়ে!
ওই যে সরিৎ কল্‌কলিয়ে,
উঠ্‌ছে সদাই ঝলমলিয়ে,
মন্ত্র এ কোন্ সে গীত জয়ী—
আজকে দিল মন গলিয়ে?
জগতের ওই প্রাণের কানে,
বিপুল মদির আজকে আনে,
চাঁদের আলোয় মিশিয়ে দিয়ে—
বাঁধ্‌ল হৃদি ফাঁদের টানে!
রাতের আলোয় দিবস গণি'
চমক দেওয়া গমক আনি
পাপিয়া আজ গাইল মধুর—
পূর্ণ করি প্রাণের ধনি।
উপরে ওই সুনীল আকাশ,
মর্ত্ত্যে কানন শান্তি-নিবাস,
শীতল জলের লহর-বুকে—
পড়্‌ল লুটে ফুলের সুবাস!
মৌন আলোর আব্‌ছায়ে হায়,
জগৎ আজি থম্‌কে দাঁড়ায়,
'চোখ গেল'—ওই ডাক্‌ল পাখী
ডাক্‌ল মরি মোহন সাড়ায়!
শুধুই রূপের বিকাশ দেখি,
পাপিয়ার হায় চোখ গেল কি?
কিম্বা ওগো নয়নতারায়—
বিষাদ গেল ছাপ্‌টা রাখি?
দিল্‌দরিয়ায় জোয়ার ডাকি',
কোন্ সুরে আজ গাইল পাখী!
হৃদ্-পিয়ালায় সুরের ধারা—
রাখ্‌ল ধরে স্মরণ-সাকী।

—

স্বাগত!

[শ্রীমতী-প্রতিভা দেবী]

যদি, না চাহিতে সখা, এসেছ হেথায়
হৃদয় আসনে বস হে।
আমি, কি ফুলে ভূষিব কি মন্ত্রে পূজিব
কি গান আজিকে গাহিব হে।
সোণার স্বপন কতনা বাসনা
কত মনে ছিল খুঁজিয়া পাই না
দীন হীন জনে করিয়ে করুণা
হৃদি মাঝে সদা বিরাজ হে।

* বিদেশী পত্র হইতে।

বিদায়।

(L. G. Moberly)

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, বি-এ]

বিদায়ের কালে তিনটি মিনতি
জানাই তোমারে হে প্রিয় মোর ;—
প্রতি দিবসের বিদায়-লগনে
মোরে স্মরি ফেলো একটু লোর।
তব হৃদয়ের একটি কোণায়
মোর স্মৃতি যেন পায় গো ঠাঁই ;
আরাধনা কালে আমার লাগিয়া
করুণা যাচিও, এটুকু চাই।
যাই তবে যাই মরুভূ ছাড়িয়া
শান্ত-শীতল ভুবনে যাই,
প্রণয়ের ডোর ছিন্ন করিতে
মৃত্যুর ছায়া যে দেশে নাই।
তোমার বারতা স্বর্গ-পরীরা
বহিয়া আনিবে আমার দেশে;
মোর হৃদয়ের গোপন কথাটি
পবন তোমারে জানাবে এসে।
অমৃতের দেশে মিলিব আবার,
এ যে ওগো ধ্রুব সত্য বাণী—
প্রণয় আমার চুম্বক সম
মোর পাশে তোমা' আনিবে টানি।

কেন ভালবাসি।

[শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ]

মরুর মাঝারে কেন ওরে পারিজাত!
নন্দন হৃদয়-ধন প্রিয় দেবতার!
নিরস পরশে শুধু সহিবি আঘাত ;
সুখ ছাড়ি দুখে মতি কেমন আচার ?

সেথায় কতই আছে ; কে আছে হেথায়!
নিরসে সরস করি ফুটাইতে হাসি ?
পীড়িতের এত ব্যথা দেখিনি কোথায় ;
আহা! এর বড় জ্বালা তাই ভালবাসি।

পূর্ণিমায়।

[কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ]

পাতিয়া রূপের ফাঁদ
নিশীথ নীলাম্বরে তুমি হাসিতেছ চাঁদ!
আমি দীন হীন কবি—
পড়ে আছি একধারে মূর্ত্ত মরণ ছবি!
গেছে মোর, গেছে সব-ই—
জ্বলিয়া পুড়িয়া যায় যেন শ্মশানের ছবি।
চেয়ে আছি তব পানে—
বাঁশী হয়ে এ পরাণ চাহিছে কাঁদিতে গানে।
কত কথা জাগে মনে—
বসিয়া কাটাই নিশা—নিদ্ নাহি দু'নয়নে।
হাস চাঁদ, হাসো আরো—
আমি যে তোমারি কবি—আমি আর নাহি কারো
শেষের সে দিনে প্রিয়
দুঃখী কবিরে চাঁদ কোলে তব টেনে নিও!

গোপন।

[শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী]

আমার গোপন প্রেম রাখিব গোপনে
সুশীতল তরুকুঞ্জে, তৃণগুল্মছায়।
তরুণী কিশোরী সম আনত-নয়নে
রহিবে সে দীর্ঘরাত্রি মিলন-সজ্জায়।
আমার কৈশোর প্রেম রাখিব লুকায়ে
নিভৃত নির্ঝর ধারে কাশবন মাঝে,
কানন রাণীর মতো অঞ্চল লুটায়ে
রহিবে সে দীর্ঘ দিন বিরহের সাজে।
যদি বায়ু বহে' যায় বসন্তের দিনে
উড়ায়ে মুকুল-গন্ধ-সুমন্দ মন্থর—
যদি কোনো অজানিতে ফেলে তারে চিনে
তথাপি কি কাঁপিবে না আমার অন্তর ?
গীতিহীন বনভূমি নিস্তব্ধ নির্জ্জন,
আমার কৈশোর প্রেম রহিবে গোপন।

অতিথির আবেদন।

(নূতন নক্‌সা)

[রায়সাহেব শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত]

বাদ সাধা যে স্বভাব ওদের,
পরের ভাল দেখ্‌তে নারে।
হিংসুকে-ঠগ-খল যে ওরা,
আপনার বিষে আপনি মরে॥
কানা হবে সেও ভাল,
অন্যে অন্ধ কর্‌বার তরে।
রাজা হ'তেও চায় না সে যে,
পাছে হয় ভায়ের লক্ষ্মী ঘরে॥
(নিজের) নাক কাটে সে বিষের জ্বালায়,
অন্যের যাত্রা ভঙ্গ ক'রে.
সয়তান-সঙ্গী ওরা দুষ্‌মন,
ঘুরে বেড়ায় সকল দোরে॥
খুব হুঁসিয়ার থেকো রে ভাই,
চিনে রেখ' ঐ ভবঘুরে।
মন-মজানো কথা ওদের,
মিছরীর-ছুরী বুকে পুরে॥
ভাগ্যে ছিল যা হ'য়েছে,
এখন তুমি যাও রে সরে'।
নইলে আবার মার্‌বে ছোবল,
বাগে পেলে দ্বিগুণ জোরে॥
ঘেঁটিয়ো না আর ওদের তুমি,
ভাল মন্দ কথার ফেরে।
তফাৎ থেকো, জেনে রেখো,
এই পর্য্যন্ত হে শিক্ষা ক'রে॥
মন-খারাপে কাজ কি তোমার,
ওদের ভাবনায় মনে ম'রে।
ভাব্‌ছে সেজন, কে দুরজন,
সুজন, শান্ত, চরাচরে॥
কাজ আছে তাঁর ওদের রেখে,
সৃষ্টির ভিতর কৌশল ক'রে
(তাঁর) খেলা নইলে জোম্‌বে কেন,
বৈচিত্র্যময় এই সংসারে॥
তোমারো ইথে লাভ অনেক হে,
হ'চ্ছ নির্ম্মল যে অন্তরে।
আঁকড়ে ধ'রছ গুরুর চরণ,
অকূল এ ঘোর পাথারে॥
প্রতিহিংসা না নিও কখন,
এই মিনতি হে তোমারে।
দাও সুমতি, হে সারথি,
অতিথি যে, তোমার দ্বারে॥

গ্রন্থ-সমালোচনা।

যুগলজীবন—ইহা একখানি সরস পদ্যকাব্য। শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত ও ২২নং কৃষ্ণদাস পাল লেন গোবিন্দ কুটীর হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৷৷০ আট আনা। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা অবলম্বনে লিখিত। জীবনবাবুর যুগলজীবন কাব্যখানি পাঠ করিতে করিতে আমাদের কাব্যকুঞ্জের কলকণ্ঠ কোকিল স্বর্গীয় মধুসূদনের কথা মনে পড়ে। মধুসূদনের 'অশেষ সুষমাময়ী ব্রজাঙ্গনার সেই—"নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে বাঁশরী রে রাধিকারমন" ইত্যাদি মধুর বংশীরব অনেক দিন যাবৎ নীরব থাকিয়া সহসা আজ যেন জীবনকৃষ্ণের যুগলজীবনে আবার নূতন তানে বাজিয়া উঠিয়াছে। কাব্যখানি সরস এবং বার বার পড়িতে ইচ্ছা করে।

সমদর্শিনী "ভালবাসা" তত্ত্বগীতি—শ্রীযুক্ত রামপদ বেদবিদ্যামণি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত এবং ৩নং শ্রীদাম মুদীর লেন দর্জ্জিপাড়া হইতে প্রকাশিত।

ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ কি? তিনি সগুণ কি নির্গুণ; ইহাই বিশদভাবে সাধারণ ভক্তবৃন্দকে বুঝাইবার জন্য পরম ভাগবত ভট্টাচার্য্য মহাশয় বেদ ও উপনিষদ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্বনিরূপক প্রমাণ সমূহের সারভাগ গ্রহণ করিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় ভক্তিরসোদ্দীপক বহুসংখ্যক গীত রচনা করিয়া এই গ্রন্থখানিতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। রচনায় লেখকের কবিত্ব-প্রতিভা প্রস্ফুট। আশা করি, গ্রন্থখানি সাধারণ্যে আদরলাভ করিবে।

১৯শ ভাগ] মাঘ, ১৩২৯। [১২শ সংখ্যা

কারকের বিকাশ।

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম-এ]

এটা খাঁটি সত্য কথা যে, ভাষাসৃষ্টির প্রথম যুগে আট আটটা কারক ছিল না। সংস্কৃত ব্যাকরণে স্বীকৃত না হইলেও সম্বন্ধ ও সম্বোধনকে আমরা কারক বলিয়াই ধরিব। ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক আর্য্যভাষাসমূহের সাক্ষ্য হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, এতগুলি কারক না হইলেও ভাষার কাজ বন্ধ হয় না। পালি ও প্রাকৃত ভাষাতেও এতগুলি কারক ছিল না। সম্প্রদানটাকে গ্রাস করিয়াছিল সম্বন্ধ; আর করণ ও অপাদানে রূপের বিভিন্নতা লোপ পাইয়াছিল। বাঙ্গালাতেও দ্বিতীয়া ও চতুর্থীর প্রভেদ নাই। ইংরাজীতেও এক Objective case দিয়াই অনেক কারকের কাজ চলে। সুতরাং একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যখন ভাষার উপাদান কিছুই নাই, মনের ভাব আত্মপ্রকাশের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেছে, কোনওরূপ বৈশিষ্ট্য যখন কল্পনার অগোচর, তখন ভাষা এতগুলি কারকের সহিত পরিচিত ছিল না।

ভাষার মূল উপাদান বাক্য। বাক্য দ্বারাই ভাষার কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। সুতরাং বাক্যের অপরিত্যাজ্য উপাদানসমূহের বিশ্লেষণ করিতে পারিলেই সৃষ্টির প্রথম যুগে ভাষায় কি কি ছিল ধরা যাইবে। দুইটী অপরিহার্য্য উপাদান লইয়া বাক্য। মনের মধ্যে কয়েকটী ভাব বা ideaর একত্র সমাবেশ এবং ভাষা দ্বারা তাহার অভিব্যক্তি। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যাহা অপরিহার্য্য তাহাই বাক্যের

	কর্ত্তৃ	কর্ম্ম	সম্প্রদান	অধিকরণ	করণ	অপাদান	সম্বন্ধ
সংস্কৃত	কর্ত্তৃ	কর্ম্ম	সম্প্র	অধি	করণ	অপা	সম্বন্ধ
আবেস্তা	কর্ত্তৃ	কর্ম্ম	সম্প্র	অধি	...	অপা	...
স্লাবনিক	কর্ত্তৃ	কর্ম্ম	সম্প্র	অধি	করণ	অপা	...
লাতিন	কর্ত্তৃ	কর্ম্ম	সম্প্র	...	...	অপা	সম্বন্ধ
গ্রীক	কর্ত্তৃ	কর্ম্ম	সম্প্র	...	...	...	সম্বন্ধ
প্রাঃ জর্ম্মণ	কর্ত্তৃ	কর্ম্ম	সম্প্র	...	...	...	সম্বন্ধ
আঃ জর্ম্মণ	কর্ত্তৃ	কর্ম্ম	...	...	...	...	...

উপাদান। মৌলিক ভাষার বাক্যে ইহা ছাড়া আর কিছু ছিল না একথা অবশ্য স্বীকার্য্য।

আমাদের ব্যাকরণ বলে যে, একটী কর্ত্তা ও একটী সমাপিকা ক্রিয়া না থাকিলে বাক্য গঠন হয় না। আমরা সেকথা স্বীকার করিতে পারি না। 'ছি!' বলিলে একটী কথায় যখন বক্তার মনোমধ্যে ভাব-সম্পর্কের বাহিরে অভিব্যক্তি হয়, শ্রোতা যখন এই একটি মাত্র পদের প্রয়োগ হইতে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্পর্ক বুঝিয়া লইতে পারে, তখন ইহাতেই সম্পূর্ণ ভাব-প্রকাশক বাক্যের যথেষ্ট উপাদান বলিতে হইবে।

তবে একটা আপত্তি এই যে ইহাতে উদ্দেশ্য ও বিধেয় সমগ্রভাবে প্রকাশ পায় নাই। শ্রোতার মানসিক ক্রিয়া দ্বারা অপ্রকাশিত সম্পর্কটী গড়িয়া লওয়া হইতেছে। সমগ্র ভাব প্রকাশ করিতে দুইটী অপরিহার্য্য উপাদান চাই—উদ্দেশ্য ও বিধেয়। মনের মধ্যে অন্ততঃ দুইটী পৃথক্ ভাবের সম্পর্ক চাই। ব্যাকরণে এই দুইটি ভাবের নাম উদ্দেশ্য ও বিধেয় বা Subject ও Predicate. কিন্তু ব্যাকরণের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের ভিত্তিই হইল মানসিক উদ্দেশ্য ও বিধেয় অর্থাৎ পরস্পর পৃথক্‌ভাবে চিন্তিত দুইটী ভাব। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রেও কর্ত্তৃপদ ও ক্রিয়াপদের উল্লেখ না করিয়াই বাক্যের সংজ্ঞা হইয়াছে—"বাক্যং স্যাদ্ যোগ্যতা কাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ।" অর্থাৎ কয়েকটী পদ পরস্পর আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ অন্বয়-সামর্থ্য ও আসত্তি অর্থাৎ ভাব-প্রকাশের যোগ্যতা সহ একত্র হয় তাহা হইলেই বাক্য হইবে। যে যাহাই হউক, সম্পর্কের সম্ভাবনার জন্য দুই সংখ্যা অপরিহার্য্য, কারণ দুই সংখ্যার কমে সম্পর্ক অচিন্তনীয়। সুতরাং বাক্যের উপাদানও দুইটী চাই। উদ্দেশ্য ও বিধেয় এই দুইটী উপাদান লইয়াই মৌলিক ভাষার মৌলিক বাক্য গঠিত হইত একথা স্বতঃসিদ্ধ। তারপর ভাষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাক্যমধ্যে অন্য নানা উপাদানের স্থান হইয়াছে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়রূপ বাক্যের দুইটী উপাদানের মনোবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়। বক্তার মনোমধ্যে অনুনন একটা ভাব জাগরূক হয় অর্থাৎ Consciousness বা জ্ঞানের আলোকে বিকসিত হয়। তারপর আর একটী ভাব প্রবুদ্ধ হইয়া ঐ পূর্ব্বোক্ত ভাবের সহিত মিলিত হয়। বক্তার মনোমধ্যস্থ এই ভাবের মিলন ভাষার সাহায্যে শ্রোতার মনের মধ্যে প্রেরিত হয়। এই ভাবের বাহন স্বরূপ ভাষারূপ বাহ্য উপাদান ব্যতীত এক চিত্ত হইতে অন্য চিত্তে ভাব বাহিত হয় না। তাই বলে—"পর চিত্ত অন্ধকার।"

সাধারণতঃ এই উদ্দেশ্যভূত প্রথম ভাবটী একটী বস্তু বা ব্যক্তির নাম, অথবা গুণবাচক বিশেষ্য পদ হইয়া থাকে। কিন্তু বিধেয় পদটী যে ক্রিয়াপদ হইবেই তাহার কোনও কারণ নাই। যদি বিধেয় পদটী বিশেষ্য হয়, তবে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে তিন প্রকার সম্পর্ক হইতে পারে। (১) উদ্দেশ্য প্রকাশক বস্তু ও বিধেয় বাচ্য বস্তুর পরিমাণ সমান বা identical হইতে পারে। (২) দুইটীর একটী অন্যটীর অন্তর্গত হইতে পারে। অথবা (৩) বিধেয় পদটী উদ্দেশ্য মধ্যস্থ কোনও গুণ বা ধর্ম্মের বাচক হইতে পারে। কিন্তু প্রবাদ বাক্যাদিতে সাধারণতঃ কার্য্য-কারণের ভাব প্রকাশ পায়।

আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইব যে, উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক হইতেই নানাবিধ কারকের সম্পর্ক ভাষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সৌরকরস্পর্শে শতদল দলের শতধা বিকাশের ন্যায়, স্বাধীন সত্তা লাভ করে।

উদ্দেশ্যভূত কর্ত্তৃপদ ও বিধেয়ভূত ক্রিয়াপদ যোগে যদি মৌলিক বাক্যের কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে একই বাক্যে একই ক্রিয়ার দুইটী কর্ত্তৃপদের অভিব্যক্তির জন্য ভাষাকে একটা অভিনব কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। 'যাওয়া' বা 'দেখা' ক্রিয়ারূপ বিধেয়ের সহিত যদি দুই দুইটী উদ্দেশ্যের সম্পর্ক হয়, তবে এই সম্পর্ক হইতে উদ্দেশ্যদ্বয়ের একতরের কর্ম্মকারকে পরিণতি হইবে। আমি যাই+কাশী যাই = আমি কাশী যাই। আমি দেখি + চাঁদ দেখি = আমি চাঁদ দেখি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এক বিধেয়ের সহিত দুই উদ্দেশ্যের সম্পর্ক হইলে, তাহাদের একটীর প্রকাশক পদ যেমন কর্ত্তৃকারকে বলিয়া ব্যাকরণে

প্রসিদ্ধ হয়, অন্যটী সেইরূপ কর্ম্মকারকে পরিণত হয়। অর্থাৎ এক ক্রিয়ার দুই কর্ত্তা হইলে কালক্রমে একটির কর্ম্মত্বে পরিণতি হয়। ইহাই ভাষায় কর্ম্মের অভিব্যক্তির কারণ।

আবার এক ক্রিয়ার একাধিক কর্ম্ম হইলে তাহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন কারকের উদ্ভব হইতে পারে। বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছে। অর্থাৎ এক কর্ম্মকারক হইতে করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ ও অধিকরণ কারকের ক্রমে ক্রমে উদ্ভব হইয়াছে।

কর্ত্তৃপদ, কর্ম্মপদ ও ক্রিয়াপদ লইয়া যে বাক্য তাহাতে স্বাভাবিক চিন্তায় ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কবান্ পদদ্বয়ের সমান মর্য্যাদা এবং উভয়েই সমানভাবে ক্রিয়ার অর্থটী বিশেষিত ও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। অর্থাৎ কর্ম্মপদটী ক্রিয়াপদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া কতকটা যেন তাহারই অঙ্গীভূত হইয়া কর্ত্তৃপদকে পৃথক্ করিয়া দেয়। ফলে ক্রিয়া ও কর্ম্ম-পদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে উভয়ে উভয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

কথাটা আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার সাক্ষ্য হইতে পরিস্ফুট করিব। বেদে ও তারপর রামায়ণ মহাভারতাদি যেসকল গ্রন্থের ভাষা পাণিনির ব্যাকরণের শাসন মানে নাই, সেই সকল গ্রন্থের ভাষায় একটি বাক্যের মধ্যে একাধিক কর্ত্তৃপদের প্রয়োগের এরূপ উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে যে, সেই কর্ত্তৃপদদ্বয়ের একটাকে কর্ম্ম ধরিলেই বেশ সঙ্গত অর্থ হয়। নতুবা ভাবটা আমাদের চিন্তা-প্রণালীর সহিত খাপ খায় না।

ইন্দ্রো ব্রাহ্মণো ব্রুবাণঃ (তৈ, সং)—ইন্দ্র আপনাকে ব্রাহ্মণ বলেন। এখানে 'ব্রাহ্মণঃ' শব্দ দ্বিতীয়া বিভক্তিতে থাকিলেই আমাদের বুঝিবার সুবিধা হয়।

সোমং মন্যতে পপিবান্ (ঋ, সং)—তিনি মনে করেন যে তিনি নিজে সোমপান করিতেছেন। এখানেও 'পপিবান্' স্থানে 'পপিবাংসং' থাকিলে ব্যাকরণসঙ্গত হইত।

কৃষ্ণো রূপং কৃত্বা (তৈ, সং)—আপনার রূপ কৃষ্ণবর্ণ করিয়া। 'কৃষ্ণং' হইলে ভাল হইত না?

বিশ্বেদেবা যজমানশ্চ সীদত (তৈ, সং)—হে বিশ্বেদেব-গণ! বসুন। যজমান! তুমিও উপবেশন কর। এখানে একটী সম্বোধন পদ ও একটী কর্ত্তৃপদ। কথাটা একই। একটী অতিরিক্ত উদ্দেশ্যের সহিত বিধেয়ের সম্পর্ক স্থাপনের জটিলতাই পরিস্ফুট।

ইন্দ্রশ্চ সোমং পিবতং বৃহস্পতে! (ঋ, সং)—হে ইন্দ্র সোমপান কর। বৃহস্পতি তুমিও সোমপান কর। দুইটী কর্ত্তৃপদ বলিয়া ক্রিয়াপদে দ্বিবচন।

এই ত গেল বেদের ভাষা। বেদের পরেও এইরূপ ভাষা দেখা যায়। "বিদর্ভরাজতনয়াং দময়ন্তীতি বিশ্রুতাম্" (মহাভা.)। এখানে 'দময়ন্তীম্' থাকিলেই ঠিক পরবর্ত্তী যুগের ভাষায় খাপ খাইত। "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্" (কুমার)। এটা ত কালিদাসের ভাষা। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে সমর্থিত হইয়াছে। আবার দুই প্রকার প্রয়োগের একত্র উদাহরণও আছে—

"অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ
পিতেত্যেব তু মন্ত্রদম্।" (মনু)।

'বালম্' পদটী দ্বিতীয়া ও 'পিতেত্যেব' প্রথমা বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে—একই বাক্যে।

আমরা মনে করি ভাষার বিকাশের ক্রম এই প্রকারই ছিল। অভিব্যক্তির এই প্রকার অসুবিধা লইয়াই ভাষা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। পরে অভিজ্ঞতার ফলে সকল গোলযোগ ত্যাগ করিয়া প্রত্যেক পদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিয়াছে স্ব স্ব স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে আর কে পরের ঘরে মাথা গুঁজিতে চায়? তাই কর্ম্ম স্বাধীন, এবং কর্ম্মবাচ্যে আবার কর্ত্তৃপদকেও ঘর-ছাড়া করে।

আবার দেখুন করণের স্থানে কর্ম্মের ব্যবহারও ছিল।

সর্ব্বাণি ভূতানি গর্ভ্যভবৎ (শত, ব্রা)=সর্ব্ব প্রাণীকে লইয়া তিনি গর্ভী হইলেন। "সর্ব্বৈঃ ভূতৈঃ" হইলেই ঠিক হয় না?

তম্ অন্তর্বত্নীঃ (ঋ, সং)=তাহাকে লইয়া অন্তঃসত্ত্বা এখানেও 'তেন' পদই বেশী সঙ্গত।

তাং সং বভূব (শত, ব্রা)=তাঁহার সহিত সঙ্গত হইলেন। 'তয়া' পদই ব্যাকরণসঙ্গত।

তেহৈতাম্ এধতুম্ এধাংচক্রিরে (শতপথ)=তাহারা এই সম্পত্তি (এধতু) লইয়া বাড়িতে লাগিল।

"ষড় (ষড়ভিঃ ?) উচ্ছ্রিতো যোজনানি (যোজনৈঃ ?)" (মহাভারত)। ছয় যোজন উচ্চ।

ইহা ছাড়া ব্যাকরণের মতেই ণিজন্ত ক্রিয়ার প্রযুজ্য কর্ত্তা দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া উভয় বিভক্তিতেই স্থান পায়। সুতরাং এই সকল সাক্ষীর জবানবন্দি অনুসারে বলিতে হয় কর্ম্ম হইতে করণ প্রসূত হইয়াছে।

কর্ম্ম হইতে সম্প্রদানের উৎপত্তির বেশী প্রমাণ না দিলেও চলে, কারণ বঙ্গভাষাতে দুই কারকে ভেদ নাই।

তথাপি দু'একটা প্রাচীন সাক্ষী দেখুন।

গাং দীব্যধ্বম্ (মৈত্রায়ণী সং)—গরুর জন্য জুআ খেল। 'গাং' স্থানে 'গবে' হওয়া উচিত।

যজস্মায় দেবান্ (ঋ, সং)—দেবগণের যজন বা অর্চ্চনার জন্য। যজ্ ধাতুযোগে চতুর্থী হওয়াই শোভন ছিল।

তারপর দেখুন কর্ম্ম ও অপাদানেও ভেদ নাই।

অমুষ্ণীতং পণিং গাঃ (ঋ, সং)—তোমরা পণির নিকট হইতে গোসকল চুরি করিয়াছিলে। 'পণিং' স্থানে 'পণেঃ' হইবে না?

জিত্বা রাজ্যং নলম্ (মহাভা')—নলের নিকট হইতে রাজ্য জয় করিয়া লইয়া। 'নলাৎ' সঙ্গত পদ।

তারপর কর্ম্ম হইতে সম্বন্ধ কারকের অভেদের উদাহরণ দেখুন।

কামুকা এনং (=অস্য) স্ত্রিয়ো ভবন্তি (মৈত্রা, সং) হন্তা যো বৃত্রং (=বৃত্রস্য), সনিতোত বাজং (=বাজস্য), দাতা মঘানি (ঋক্)—বৃত্রের হন্তা, অন্নের গ্রহীতা, সম্পত্তির দাতা।

মাং কামেন (অথর্ব, সং)—আমার ভালবাসায়।

তং (=তস্য) নিবারণে (মহাভা)। স্বর্গম্ (=স্বর্গস্য) অভিকাঙ্ক্ষয়া। (রামায়ণ) বজ্রিবজ্রং (=বজ্রস্য) পপিঃ সোমং (=সোমস্য) দদি র্গাঃ (=গবাম্) (ঋক্, সং) =বজ্রের ধারণকর্ত্তা, সোমের পানকর্ত্তা, গো দাতা।

তারপর অধিকরণ।

যামস্য দিশং দস্যুঃ স্যাৎ (শতপথ)=ইহার যেদিকে দস্যু থাকিতে পারে। যাম্ দিশম্—যস্যাং দিশি।

তেনৈতাং রাত্রিং সহাজগাম (শত, ব্রা)=সেই রাত্রেই তাহার সহিত আসিলেন। এতাং রাত্রিং=এতস্যাং রাত্র্যাং

ইহা ছাড়া পরবর্ত্তী যুগের ভাষাতেও কতিপয় ক্রিয়ার অধিকরণের কর্ম্মসংজ্ঞা হয়, অর্থাৎ সপ্তমীর প্রয়োগ সেস্থলে অননুমোদিত।

এ সকল প্রাচীন সাক্ষীর জবানবন্দি উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। মনোবিজ্ঞানসম্মত চিন্তার সাহায্যেও আমরা ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

হতভাগিনী।

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু]

(১)

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া মালতী হাঁটিয়াছে। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অজানা কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল পল্লীপথে কতবার আছাড় খাইয়া আবার উঠিয়া চলিয়াছে, কত কণ্টকাকীর্ণ বনের পথে চলিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পৃথিবী হাসিয়া উঠিল, পল্লীর বংশকুঞ্জান্তরালে দুই একটী বিহঙ্গ কাকলী তান ধরিল, মালতী আরও দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে দগ্ধ হইতে হইতে মালতী বহু দূরে আসিয়া পড়িল। কত গ্রাম মাঠ ছাড়াইয়া সে আর একখানি গ্রামের নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল, আর তাহার অগ্রসর হইবার শক্তি নাই; বক্ষে তাহার অসহ্য বেদনা অস্থি-পঞ্জর যেন ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে হাঁটিতে হাঁটিতে কতবার তাহার নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তথাপি দুই হাতে বুকটী চাপিয়া ধরিয়া সে হাঁটিয়াছে, কিন্তু আর তাহার শক্তি নাই, সে

নদীতীরেই বসিয়া পড়িল। এই যে এতখানি পথ সে হাঁটিয়া আসিয়াছে, সমস্ত রজনী অবিরত হাঁটিয়া কাঁটায় দেহ ছিঁড়িয়া কত ক্রোশ পথ চলিয়া এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছে! সে ত' নিজেই ধারণা করিতে পারে না কোন্ শক্তির প্রভাবে তাহার অনাহারক্লিষ্ট রোগ-দুর্ব্বল দেহখানি এত কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম হইল! বিছানা হইতে তাহার উঠিবার শক্তি ছিল না, শাশুড়ীর তীব্র তিরস্কারে তবুও সে গতকল্য দুগ্ধ জ্বাল দিতে উঠিয়াছিল, তাহার পর সেই মূর্চ্ছা কি মরণ তাহাকে একটা আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়া একেবারে শ্মশানে আনিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর এখন তাহার পুনর্জ্জন্ম কি না তাহা ত' সে জানে না। কিন্তু সেই শ্মশান হইতে দেবতার আশীর্ব্বাদেই হউক অথবা ভয় পাইয়া কিম্বা যে কোন কারণে হউক না কেন, সে যে কতকটা নূতন শক্তি পাইয়াছিল তাহা ঠিক। তাহা না হইলে শুধু নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া এতখানি পথ অতিবাহিত করা তাহার পক্ষে সহজ হইত না। তাই মালতী ভাবিল, তাহার করুণ প্রার্থনা দেবতার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, তাই তিনি শক্তিদান করিয়াছেন। হিন্দুনারীর যে স্বামীই সর্ব্বস্ব, দেবতা। আজ পরলোকে বসিয়া কি এখানকার কোন কিছু তিনি দেখিতে পাইতেছেন না? স্ত্রীর সহিত স্বামীর জীবন-মরণ সম্বন্ধ। তাই আমি শক্তি পাইয়াছি, এ শক্তি দান দেবতা করিয়াছেন। কিন্তু প্রভু! কবে আমাকে তোমার কাছে টানিয়া লইয়া যাইবে, তোমার নিকটে যাইবার শক্তি কবে আমাকে দিবে?

মালতী বসিয়া বসিয়া কত কথা চিন্তা করিতেছিল। পিপাসা তাহার কণ্ঠটিকে শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছিল, ক্ষুধার যন্ত্রণায় সে ক্রমেই কাতর হইয়া পড়িতেছিল। এমনই ভাবে কতক্ষণ কাটিয়া গেল। অপরাহ্নের স্নিগ্ধ শীতল বায়ু তাহার সর্ব্ব দেহখানিকে শ্রান্তিদান করিয়া চক্ষের পল্লব দুটীকে নিমীলিত করিয়া দিল। পরপারে সূর্য্য অস্তগামী, তাহারই এক ঝলক স্নিগ্ধ কিরণ মালতীর মুখখানির উপর পড়িয়া সেই বিশুষ্ক পদ্মের মত মুখখানিকে আবার একটু নূতন সৌন্দর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিল। হঠাৎ কাহার স্নিগ্ধ মধুর মাতৃসম্বোধনে ধড়মড় করিয়া সে উঠিয়া বসিল, চাহিয়া দেখিল সম্মুখে এক বৃদ্ধ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। মালতী লজ্জায় মাথার কাপড় টানিয়া দিতে গিয়া দেখিল তাহার পরিধানের কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, মাথায় এতটুকু টানিয়া দিবারও কিছু নাই। সে লজ্জায় মুখ নীচু করিল।

বৃদ্ধ কহিলেন, "মা! আমাকে লজ্জার কারণ নেই, আমি তোমার সন্তান। কিন্তু কে তুমি মা? তোমার এমন অবস্থা কেন? তোমাকে দেখিয়া মনে হয় ভদ্রঘরের বধূ, কিন্তু এমন ভাবে তুমি এখানে কেন মা?"

মালতী কি উত্তর দিবে? শুধু করুণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিল। তাহাকে এমন প্রশ্ন আর কেহ ত করে নাই; উন্মাদিনী ভাবিয়া আতঙ্কে সকলে দূরে সরিয়া গিয়াছে, পল্লীর বালকগণও আনন্দে করতালি দিয়া 'পাগলী দিদি' বলিয়া ক্ষেপাইয়াছে, ঢিল ছুঁড়িয়াছে, একটু সহানুভূতি কেহ ত' দেখায় নাই। তবে এ কি অপ্রত্যাশিত স্নেহ মধুর স্বর! মালতী বিস্মিত হইল।

বৃদ্ধ আবার কহিলেন, "মা, তোমার বাড়ী কোথায় বল, আমি তোমাকে সেখানে রাখিয়া আসি।"

বাড়ী! তাহার আবার বাড়ী কোথায়? এ জগতে তাহার আপনার বলিবার যে কেহ নাই, একটু সহানুভূতি দেখাইবার মানুষ নাই। তাহার বাড়ী তাহার স্বামী শ্বশুরের সঙ্গে সঙ্গেই ত' বজ্রাঘাতে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, আছে শুধু সেই ভস্মস্তূপের উপর একটী সোণার প্রদীপ; সে তাহার সর্ব্বস্ব,—খোকা।

মালতীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বৃদ্ধ আবার কহিলেন, "মা, বল, তোমাকে কোথায় রেখে আস্ব? আমার কাছে তোমার এত লজ্জা কেন মা? যে অবস্থায় এখন তুমি প'ড়েছ ইহাতে লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে সব নির্ভয়ে আমায় বল, আমি তোমার পিতার সমান, এই কথাটা মনে ক'র মা।"

মালতীর হৃদয় আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ক্রন্দন বিজড়িত স্বরে বলিল, "কোথায় রেখে আস্বেন আমাকে? আমার যে কেউ নাই, আশ্রয়হীনা আমি, আমার স্থান কোথায়?"

বৃদ্ধ কহিলেন, "তোমার কেউ না থাকে আমার সঙ্গে চল, আমি যত্নে তোমাকে বাড়ীতে রেখে দেব,—মায়ের মত।"

কথার মধ্যেই মালতী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "না, না, আমি যাব না আমি যাব না—সংসারে কেউ আমার নাই, আমি হতভাগিনী, পৃথিবীতে থাকিবার অধিকার পর্য্যন্ত হারাইয়াছি।" মালতীর দুই নয়ন হইতে অজস্র অশ্রু গণ্ড প্লাবিত করিয়া ছুটিল।

বৃদ্ধ কহিলেন, "কিন্তু এ অবস্থায় আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না। আমার বাড়ী বেশী দূরে নয়, একটু বিশ্রাম ক'রে তারপর তুমি যথেচ্ছা গমন কর। এস মা, আপত্তি ক'রনা ক্ষুধায় তোমাকে কাতর বলে মনে হ'চ্ছে।"

মালতী আর একবার করুণ নেত্রদুটী বৃদ্ধের মুখের উপর স্থাপন করিল। তাহার পর কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'চলুন'। মালতীকে সঙ্গে করিয়া বৃদ্ধ তাহার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, 'বৌমা'! অবগুণ্ঠনাবৃতা একটী যুবতী ঘরের বাহিরে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ডাক্‌ছেন বাবা"? "হাঁ, এই দেবকন্যাকে পথে কুড়িয়ে পেয়েছি, দেখে মনে হল উন্মাদিনীর মত চেহারা হলেও এখন তা হয় নাই; আর এমন রূপ, লক্ষ্মীর মত এ দেবী প্রতিমা ভদ্রকুলবধূ ছাড়া কি হ'তে পারে? তাই মা'কে নিয়ে এসেছি। এখন তোমার উপর এর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি কি?"

পুত্রবধূ তাড়াতাড়ি মালতীর সম্মুখে আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। অস্ফুটস্বরে বলিল, এ কি, "ঠাকুরঝি"—মালতীও ব্যাকুল ভাবে বলিয়া উঠিল, —"বৌদিদি তুমি?"

মালতীর চেহারা এতই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার মাতুল তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। মালতীকে তিনি অনেক দিন দেখেন নাই। মাতুল পুত্রের বিবাহের সময় মালতী কয়েকদিনের জন্য আসিয়াছিল, সেই সময় হইতে সুলোচনার সহিত তাহার প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিয়াছিল। সুলোচনা নববধূ হইলেও অকপটে, সমস্ত মনের কথা এই কোমলপ্রাণা ঠাকুরঝিকে না বলিয়া পারিত না। কয়েকদিনের দর্শনেই মালতীও তাহার বৌদিদিকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছিল। তাহার পর সুলোচনার বৌভাত প্রভৃতি বিবাহের কার্য্য মিটিয়া গেল, মালতীও সুলোচনার নিকট বিদায় লইয়া পিতৃগৃহে যাত্রা করিল। তাহার পর সুলোচনার সহিত আর তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই, মাতুলও আর তাহাকে দেখেন নাই। আজ বহুদিন পরে সেই মালতীর অবস্থা দেখিয়া সুলোচনার চক্ষে জল আসিল। মাতুলও বিস্ময়ে বলিলেন, "তাই ত মালতী তুই! তোকে দেখে আমি চিনতে পারলুম না! কিন্তু এ অবস্থা কেন তোর?"

মালতী তাহার কোন উত্তর দিল না। সুলোচনা তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া সেই অপরাহ্ন বেলাতেও সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিল।

মালতীর মাতার যে সময় মৃত্যু হইয়াছিল সে সময় তাহার মাতুল লক্ষ্ণৌতে ডাক্তারী করিতেন। সপরিবারে সেইখানেই এতদিন তিনি বাস করিতেছিলেন। পত্নীর মৃত্যুর পর আজ ছয় মাস হইল দেশে আসিয়াছেন। ভগিনীর মৃত্যু চক্ষে না দেখিলেও সংবাদ তিনি পাইয়াছিলেন, এবং ভগিনীপতি সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া যে তীর্থবাসী হইয়াছেন তাহাও তিনি জানিয়াছিলেন, যখন মালতীর পিতা হরিদ্বার যাত্রার মুখে লক্ষ্ণৌতে নামিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান। মালতীর দুর্ভাগ্যের কথাও তাহার কর্ণ অতিক্রম করে নাই। তাই আজ যখন বহু চেষ্টা করিয়াও মালতীর মুখ হইতে তাহার এ দুর্দ্দশার একটী সদুত্তরও তিনি পাইলেন না, তখন ভাবিলেন; শ্বশুরবাড়ীর নিদারুণ অত্যাচারে দগ্ধ হইয়া হয় ত অভাগিনী গৃহত্যাগ করিয়াছে। এখন তাঁহারা ব্যতীত তাহাকে আশ্রয় দিবার আর ত কেহ নাই। আর চিরদিনই কি সে শ্বশুরঘর পরিত্যাগ করিয়া এমন ভাবে জীবন যাপন করিবে? যখন সে বুঝিতে শিখিবে তখন নিজেই আবার নিজের অধিকারটুকু লইবার জন্য সেখানে যাইবেই।

(৮)

একটী বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এতদিনের মধ্যে মালতী শ্বশুরবাড়ীর নামও কখন মুখে আনে নাই।

মাতুল ও মালতীর ভ্রাতা তাহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। সুলোচনার কিন্তু এটা ভাল লাগিল না। মালতীর উপর তাহার যে অগাধ স্নেহ বুকটাতে ভরিয়া রাখিয়াছিল এখন তাহা বিরক্তিতে ঘৃণায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। সুলোচনা নিজেই ধারণা করতে পারে না নির্ম্মলচরিত্রা মালতীর এ অন্যায় ব্যবহার কেন? শ্বশুরঘর, স্বামীর ভিটা ছাড়িয়া কোন্ রমনী এমন ভাবে পরগৃহে দিন যাপন করিতে পারে? হউক্ না কেন মাতুলগৃহ, কিন্তু স্বামীর স্মৃতি-বিজড়িত সেই পুণ্যস্থান অপেক্ষা এটা কি বেশী আপনার? শাশুড়ী ননদের শত শত বাক্যবান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সব সে সহ্য করিতে পারে, কিন্তু এমন হীন ভাবে পরের ঘরে সে ত নিজে কখন থাকিতে পারে না। সেও ত রমণী, তবে মালতী পারে না কেন? তাহার পর বিবাহের সময় সে মালতীকে যেরূপ সরলহৃদয়া কোমলপ্রাণা বলিয়া মনে ভাবিয়াছিল এখন দেখিল তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহার মুখে এক বিন্দু হাসি নাই, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর প্রদান করে না, শ্বশুরবাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে ঘৃণাভরে বলে, "ওখানকার নাম করিও না, আমার শ্বশুরবাড়ী নাই"। তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সুলোচনা স্থির করিয়াছে মালতীর শুধু মাথা খারাপ নয় হয়ত' আরও কিছু আছে। সেই নিষ্কলঙ্ক পবিত্রচরিত্র মালতীর উপর একটা অন্যায় সন্দেহ তাহার মনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতে লাগিল।

মালতী দীর্ঘ একটী বৎসর এই সংসারটার মধ্যে কাটাইয়া দিয়াছে। তাহার চক্ষের উপর সুলোচনা স্বামী শ্বশুর লইয়া সুখে ঘরসংসার করিতেছে; স্নেহ, মমতা প্রেমের মূর্ত্তিমতী হইয়া সে সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখের মুখ দেখিতেছে, বিধাতা তাহাকে সুখের উচ্চ শিখরে তুলিয়া দিয়া আদর্শ হিন্দুনারীর কর্ত্তব্য পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। সে সংসারে লক্ষ্মী হইয়া সেই পথে অগ্রসর হইতেছে।

কিন্তু মালতী! সে যে সংসার পরিত্যক্তা, পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিতা একটা ছায়া। এ অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাহার সব সুখের সাধ বুঝি মিটিয়া গিয়াছে, সকল আশার নিবৃত্তি হইয়াছে। সংসারে তাহার করিবার বুঝি কিছু নাই, ভাবিবারও কিছু নাই। কিন্তু তথাপি কি একটা দুর্নিবার চিন্তা দিবারাত্র তাহার প্রাণটাকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া দেয়। হতভাগিনী একাকিনী একঘরে শয়ন করে, অশ্রুজলে শয্যা সিক্ত হইয়া যায়, কেহ ত তাহা চক্ষে দেখে না। এখন তাহার উপর হইতে সকলেই যে স্নেহ মমতাটুকু ক্রমে ক্রমে টানিয়া লইতেছে, তাহার অন্তর্নিগূঢ় ঘনব্যথা কেহ ত বুঝিতে পারে না। একাদশীর দিন ওই বালবিধবা সমস্ত দিন উপবাস করিয়া নিশীথ রাত্রে যখন ছাদে আসিয়া বিস্তৃত নীল আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে, তাহার মনের মধ্যে স্বামীর প্রতিচ্ছবিখানি ভাসিয়া উঠে, অশ্রুজলে গণ্ড প্লাবিত হইয়া যায়, কেহ তাহা চক্ষে দেখে না ত। উপবাসক্লিষ্টা হতভাগিনীর দুঃখে সহানুভূতি দেখাইয়া কেহ ত একবার বলে না 'আহা'! কিন্তু মালতী সে সহানুভূতিটুকুও চাহে না। তাহাতে তাহার প্রয়োজন নাই, সে একাই থাকিবে। সংসারে তাহার মত নির্ব্বাসিতা আর কেহ নাই, তাই সে একা থাকিতে চায়, একা কামনা করিতে চায়। তাই মেঘমুক্ত উদার নীল অম্বরের তলে ছাদের উপর বসিয়া যুক্তকরে বলিতে থাকে, "স্বামী আমার, প্রভু আমার! কোথায় তুমি? যেখানে থাক আমাকে লইয়া যাও। আমি না থাকিলে তোমার সেবা করিবে কে? আমি ছাড়া তোমার আর ত কেহ নাই। তবে আমাকে ফেলিয়া কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত আছ তুমি? দেবতা তুমি দেবতার দেশে, আমি মহাপাপিনী বলিয়াই কি এই নরকে গলিয়া পচিয়া মরিব? আর যে পারি না প্রভু! ওগো তোমার যেটুকু পুণ্য আছে তাই দিয়া আমায় রক্ষা কর, আমাকে এখান হইতে টানিয়া লও, তোমা ছাড়া হইয়া আর যে আমি থাকিতে পারি না"। মালতী ঊর্দ্ধে চাহিয়া যখন এই সব কামনা করিত, তখন যেন দেখিতে পাইত ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশতলে স্বর্গীয় পুষ্পরথে দেবতা তাহাকে আহ্বান করিতেছেন। মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয়ে তাহার আনন্দ-লহরী খেলিয়া যাইত। তাহার পর আবার তাহার চক্ষের সম্মুখে নক্ষত্রখচিত আকাশ, পথের ধারে সারি সারি বিটপীশ্রেণী ভাসিয়া উঠিত। নিশাচর বিহঙ্গের মধুর কাকলী নদীর উচ্ছ্বসিত কলতান আবার তাহার প্রাণটাকে

জগতে ফিরাইয়া আনিত আর অশ্রুজলে তাহার বক্ষঃ ভাসিয়া যাইত। কেহ তাহা দেখিত না, কেহ বুঝিত না। শুধু কর্ম্মফলই সে ভোগ করিয়া চলিয়াছে, অদৃষ্টের নিদারুণ কষাঘাতে দিবারাত্র জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। কবে তাহার প্রার্থনা সফল হইবে; তাহার ভোগের আর কত বিলম্ব ভগবান!

(৯)

একে ত' সুলোচনা দিন দিন মালতীর উপর বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার উপর পাড়া-প্রতিবেশিনিগণও মালতীকে এমন ভাবে শ্বশুরঘর পরিত্যাগ করিয়া মামার ঘরে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া নানা রকম মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল যখন তখন সুলোচনার বুকভরা বিরক্তির আগুনটা হু হু করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। প্রতিবেশিনিগণের মালতীকে সন্দেহ করিবার কারণও যথেষ্ট ছিল। তাহারা মালতীকে শ্বশুরবাড়ী সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিত, এবং শাশুড়ী ননদ তাহাকে কিরূপ আদর যত্ন করেন তাহাও জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু মালতী সে সব কথার উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, প্রতিবেশিনীদের দেখিলেই সে অন্য স্থানে চলিয়া যাইত, ইহাতে তাহারা মনে মনে রুষ্ট হইয়া মালতীর সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা করিতেন। ঘোষেদের দীঘিতে স্নানের সময়, রায়েদের খিড়কীর পুষ্করিণীতে বাসন মাজিবার সময় প্রতিবেশিনিগণ মালতীর সম্বন্ধে কত আলোচনাই করিতেছেন, এমন কি মালতীর পবিত্র চরিত্রে নানারূপ কলঙ্কের ছাপ অঙ্কিত করিয়া সমস্ত দেশে প্রচার করিয়া দিলেন, মালতী চরিত্রহীনা। সুলোচনাকেও সকলে এ আপদ গৃহ হইতে দূর করিয়া দিতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। সুলোচনার প্রতিবেশিনিগণের নিকট মুখ দেখান ভার হইয়া উঠিল। সুলোচনাও মালতীকে দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কি উপায়ে মালতীকে এমন একটা কথা বলিবে যে কথা শুনিয়া মালতী মাতুল-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আবার শ্বশুরালয়ে যাইবে, তাহাই সুলোচনা ভাবিতে লাগিল।

মালতীর উপর সুলোচনা যথেষ্ট বিরক্ত হইলেও একেবারে যে স্নেহশূন্য হইয়াছিল তাহা নহে। তবে মালতীর ব্যবহারটা ক্রমেই তাহাকে উত্তেজিত করিয়া বিরক্তিতে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছিল। সে চায় মালতী শ্বশুর-ঘর করুক যেমন সকলেই করিয়া থাকে। এমন ভাবে পরের ঘরে হীনভাবে দিনযাপন করিয়া পাড়ার লোকের কটুকথা শুনিয়া লাভ কি? তাই সে মালতীর মঙ্গলের জন্যই তাহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে চায়। মালতীর উপর সে যতই বিরক্ত হউক না কেন, হয়ত দুমুঠা ভাত আর একটু স্থান দিতে তাহার আপত্তি হইত না, কিন্তু প্রতিবেশিনিগণের বাক্য যন্ত্রণায় সে সাহস তাহার হয় না। তাই একদিন মালতীকে ডাকিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি! এখানে এমন ভাবে থাকা আর ত' ভাল দেখায় না। তুমি শ্বশুরবাড়ী যাও ভাই।"

গ্রীবাসমুন্নত বিস্ফারিত চক্ষে বজ্রগম্ভীর স্বরে মালতী কহিল, "আমার শ্বশুরবাড়ী নেই বৌদিদি। মামার বাড়ী থাকা যদি আমার পক্ষে ভাল না দেখায়, তবে কোথায় থাকা ভাল দেখাবে তা জানি না।"

সুলোচনা নম্রস্বরে কহিল, "তোমার পক্ষে ভাল দেখাতে পারে ভাই, কিন্তু লোকের চক্ষে ত' ভাল দেখায় না। তারা অনেক কথা ব'লে যায়। তোমার মুখের উপর তোমার চরিত্রটাকেও তারা দোষ দিয়ে যায় তাত দেখ্‌তে পাচ্ছ?"

তেমনি উত্তেজিত ক্রোধ গম্ভীর স্বরে মালতী কহিল, "হাঁ, দেখ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু লোকের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ? তাদের কথায় আমার কি আসে যায়? আমি তাদের ভয় করব কেন?"

মালতীর কথা শুনিয়া সুলোচনাও উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। তাই একটু ক্রোধভরে বলিল, "তুমি তাদের ভয় না করতে পার ঠাকুরঝি, তাদের সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ না থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের ত' সম্বন্ধ আছে, তাই তাদের কথা আমাদের মানতে হয়। তোমার জন্য লোকের কাছে মুখ দেখান আমাদের ভার হ'য়ে উঠেছে! আর এমন ভাবে এখানেই বা তুমি প'ড়ে থাক্‌বে কেন? রাজার সংসার তোমার—শাশুড়ী, ননদ, ভাসুর সব আছেন। সেইখানেই যাও তুমি।"

এবার মালতীর ক্রোধ-প্রদীপ্ত মুখখানি কাল হইয়া

গেল, চক্ষু দুটী অশ্রুভরে টল টল করিতে লাগিল, আবেগ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওগো, না গো না, আমার শ্বশুরঘর কোথায়? এ সংসারে কেউ ত আমার নেই। আমার ভাসুর, আমার ননদ, আমার শাশুড়ী এ সংসারে কে আছে? ওগো বৌদিদি! এত কঠোর তুমি কেন হ'লে? রাজার সংসারই যদি আমার থাক্‌বে তাহ'লে এমন ভাবে তোমাদের ঘরে পড়ে থাক্‌ব কেন আমি? না, না, সংসার আমার নেই। বৌদিদি! হতভাগিনীকে তোমরা দয়া কর. তোমাদের ঘরে দাসীর মত একটু স্থান আমাকে দাও। আমি তোমাদের চরণ সেবা করব, তোমাদের দাসীর কাজ করব। তোমার পায়ে ধরি বৌদিদি, তোমাদের সংসার হ'তে পদাঘাতে আমাকে দূরে ঠেলে ফেলে দিও না, সে নরকে আমাকে যেতে ব'ল না। আমি বাঁচবোনা বৌদিদি"।

এমন করুণ ভাবে, অশ্রুবিগলিত নয়নে কথাগুলি বলিয়া সে সুলোচনার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিল যে, সুলোচনা বাকশক্তি রহিত—বিস্মিত স্তম্ভিত ভাবে সেই বেদনাকাতর করুণ মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল।

মালতীর মাতুল ও তাঁহার পুত্রেরও ক্রমে দেশে মুখ দেখান ভার হইয়া উঠিল। সকলেই মালতীর সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন করিয়া তাহাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাঁহারা কোন সদুত্তর দিতে পারিতেন না, মুখ বুজিয়া কত কথাই শুনিয়া যাইতেন। কেহ বলিত "যে রমণী কুলের বাহির হইয়াছে, তাহাকে কোন্ সাহসে তাহারা আশ্রয় দিয়াছেন? হউক না কেন সে পরম আত্মীয়। যদি সে পবিত্র চরিত্রাই হইবে তাহা হইলে শ্বশুর ঘর পরিত্যাগ করিবে কেন? আর যেমন তেমন ঘরে তাহার বিবাহ হয় নাই; শ্বশুর জমিদার। আজ সেই সংসার পরিত্যাগ করিয়া সুচরিত্রা নারী কি কখনও পরের ঘরে নিশ্চিন্ত মনে কাটাইতে পারে?" সকলেই পরামর্শ দিলেন, "ভাগ্নীকে অবিলম্বে শ্বশুরালয়ে পাঠান হউক, অথবা, গৃহছাড়া করিয়া যেখানে হয় পাঠাইয়া দেওয়া হউক। সমাজে অনেক কথা উঠিতেছে। অবিলম্বে প্রতিকার না করিলে সমাজ তাঁহাদের ক্ষমা করিবে না।"

মাতুল মালতীকে যতই কেন স্নেহ করুন না, সমাজের আদেশ অবনত মস্তকে বহন করিতে তিনি বাধ্য, নতুবা চিরদিনের জন্য তাঁহাকে একঘরে হইয়া থাকিতে হইবে। মালতীর মাতুল ও তাঁহার পুত্র মালতীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমাকে ঘরে রাখিতে আর আমাদের সাহস নাই, তোমার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা উঠিতেছে। এখন তোমার শ্বশুরবাড়ী যাওয়াই ভাল।"

মালতী কহিল, "সত্যই কি তোমরা আমাকে দূর করিয়া দিবে? একটা প্রাণীকে দু'মুঠা ভাত দিতে এত কাতর তোমরা? হতভাগিনী ব'লে একটু দয়া তোমাদের প্রাণে হইল না; এমন নিষ্ঠুর, এমনই প্রাণহীন! তুমি আমার মায়ের ভাই, আমার মামা আমার পিতার সমান, তোমাদের কাছেও আশ্রয় নাই আমার! তোমরা যদি আমাকে না রক্ষা কর তবে পৃথিবীতে কে আর রক্ষা করিবে? না, না, এত নিষ্ঠুর কি তোমরা হ'তে পার? পথের কুকুর বাড়ীর উপর আসিলে তাকেও যে গৃহস্থ দু'মুঠা ভাত দেয়, আর আমি তোমাদের এত পর হইয়া যাব? একটু আশ্রয় আমাকে দিতে সত্যই কাতর হবে তোমরা?"

সুলোচনা চুপ করিয়াছিল, এইবার কহিল, "ঠাকুরঝি, তোমাকে ঘরে স্থান দিতে কি আমাদের অসাধ? কিন্তু লোকে ত তা বুঝে না, তারা অনেক কথা রটাচ্ছে।"

মালতী বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উঠিল, "লোকে অনেক কল্পনা রটাচ্ছে, তাই বিশ্বাস করে তোমরা আমার বৌদিদি, দাদা, মামা আমাকে দূর ক'রে দিতে চাও? লোকের কাছে আমার জন্য তোমাদের নিন্দা শুনতে হবে। এই তোমাদের প্রাণের কথা; কিন্তু আজ যদি তোমাদের একটা মেয়ে থাকত, আর সে যদি আমারই মত এমনই নিষ্ঠুর অত্যাচারে দগ্ধ হয়ে তোমাদের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াত, তোমাদের পাদু'টা ধ'রে যদি কেঁদে বলত 'মা! একটু আশ্রয় আমায় দাও'—বল, তোমরা কি তাকে পরিত্যাগ করতে পারতে? লোকের সহস্র নিন্দা উপেক্ষা করে কন্যাকে বুকে তুলে নিতে না?"

"কি করব, দেশে বাস করতে হ'লে সমাজের

শাসন মেনে ত' নিতে হবে, দেশের নিয়ম মেনে চলতে হবে?"

"হ্যাঁ, তা হবে। এ সময় সমাজ ত মাথা উঁচু করে একটা নিরপরাধ অত্যাচার-প্রপীড়িতা অবলাকে অন্যায় সন্দেহে দোষী করবে, আর সমাজের কীর্ত্তি-পুরুষগণ সমাজের সে আদেশ মাথায় নিয়ে, সে মাতা হউক, ভগিনী হউক, পুত্রবধূ হউক, তাকে হাত ধরে রাস্তায় তুলে দিয়ে আসবে! এ যে দরিদ্র অসহায় দুর্ব্বলা রমণী, এ যে ক্ষমতাশূন্য, বাক্‌শক্তি রহিত হিন্দু কুলবধূ। এদের উপর সমাজ তার শাসনদণ্ড দিবা রাত্র যে উত্তোলন ক'রে বসে আছে। কিন্তু বসে থাকে না সে সময়, যখন শ্বশুরবাড়ীর অসহ্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে চক্ষের জলে মাটী ভিজে যায়, এক একটা দীর্ঘ-নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের হাড়গুলো মড় মড় ক'রে উঠে, সে সময় সমাজ দেখতে পায় না, অন্ধ হয়ে থাকে।"

মালতী কাঁদিতে লাগিল, দুই নয়ন হইতে স্রোতের মত অশ্রু ঝর ঝর করিয়া মাটীর উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আবেগকম্পিত কণ্ঠে আবার বলিতে লাগিল, "আমি বিধবা, সে কি আমার দোষ? আমাকে বিবাহ ক'রেই কিছু দিনের মধ্যে আমার দেবতা স্বামী স্বর্গে গেলেন, শ্বশুর সংসার পরিত্যাগ করলেন, তার জন্য কি আমি অপরাধিনী? নিষ্ঠুর নির্ম্মম বিধাতা আজ আমায় পথের ভিখারীরও অধম করেছেন, তাও কি আমার দোষ? হবে, এ যে বাঙ্গালীর সমাজ। তাই আজ আমি মাতুলগৃহ হ'তেও তাড়িতা হ'তে চলেছি, কিন্তু তাড়িয়েই যদি দেবে মামা, সমাজের ভয় যদি এতটাই ক'রেছিলে, তবে কেন আমায় সে সময় ধরে এনেছিলে? আমি যেচে ত তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ করতে চাই নাই। অতটা দয়া, মমতা, স্নেহ সে সময় দেখাবার কি প্রয়োজন ছিল? আমি যেখানকার মানুষ সেখানে চ'লে যেতাম, তোমাদের অনুগ্রহ-ভিখারিণী হ'তাম না।"

সুলোচনা কহিল, "ভাই, রমণীর শ্বশুরঘরই যে পুণ্যতীর্থ"। বাধা দিয়া মালতী বলিয়া উঠিল, "জানি, জানি বৌদিদি, সে উপদেশ তোমার কাছে চাই না আমি। আর আমার উপর মমতা দেখাতে হবে না তোমাদের। সমাজের নিষ্ঠুর অত্যাচারে দগ্ধ নিরপরাধ মা, ভগিনী, কন্যাকে যারা দূর ক'রে দিতে পারে তাদের মুখের বিষমাখা মমতায় আমার প্রয়োজন নাই। সে আমার পুণ্যতীর্থ ত বটে, কিন্তু তোমরা কি জানবে সেখানে কি রত্ন ফেলে রেখে আমি তোমাদের ঘরে প'ড়ে আছি। যার মত আপনার এ সংসারে আমার কেউ নাই, সেই আমার সর্ব্বস্ব, নয়নমণিকে আগুনের মধ্যে ফেলে চ'লে এসেছি আমি। মৃত্যু মুখটাকেও মন হতে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম শুধু তার জন্য। সেই তাকে ফেলে তোমাদের এখানে নিশ্চিন্ত মনে রয়েছি, তবু তোমরা আশ্রয় দিলে না। তবে এখন কোথায় যাব? কে একটু আশ্রয় আমাকে দেবে? আছে, আছে,—সে বড় পবিত্র, বড় তৃপ্তির আশ্রয়। সে আমার দেবতার স্নেহ শীতল বক্ষঃ। কিন্তু কেমন করে সে আশ্রয় পাব আমি? কে আমায় সে পথের সন্ধান বলে দেবে? ওগো দেবতা, বলে দাও কেমন করে ওই পুণ্যস্থানে উপস্থিত হব আমি? তোমার পবিত্র বক্ষঃ, যেখানে আমার অবারিত অধিকার, যে আশ্রয় হ'তে আমাকে নির্ব্বাসিত করবার কাহারও ক্ষমতা হবে না, সেই আশ্রয়-পথের সন্ধান তুমি আজ আমায় দাও দেবতা! আমার সময় হয়েছে, পথ দেখাও।"

বিদ্যুৎবেগে উন্মাদিনীর ন্যায় মালতী ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ঘরের মধ্যে সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত মাটীর দিকে মুখ নীচু করিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। মালতীর আবেগপূর্ণ অন্তস্তলস্পর্শী করুণ কথাগুলি তখনও যেন কক্ষটার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

(১০)

খোকার গায়ের অনেক স্থান পুড়িয়া গিয়াছিল। কলিকাতা হইতে বড় বড় ডাক্তার আনিয়া এক বৎসর ধরিয়া চিকিৎসা করান হইতেছে, কিন্তু কোনও ফল হইতেছেনা। গায়ের ক্ষত একটু শুকাইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু যে জ্বর তাহার হইয়াছিল তাহার বিন্দুমাত্র উপশম হইল-না। বিকারের ঘোরে সময় সময় সে "মা, মা" করিয়া কাঁদিতে থাকে, কত প্রলাপ বকিতে থাকে।

ডাক্তারেরা ভীত হইয়া উঠিল। তাহার দেহ শয্যার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আছে শুধু কয়েকখানি কঙ্কাল। জমীদার মহাশয় বালককে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তাঁহার পুত্র সন্তান হয় নাই, ভগিনীর পুত্রকে বুকে তুলিয়া সে সাধ মিটাইতেন, তাই খোকার অসুখে তিনিও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। জলের মত অর্থ ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু রোগ দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। কেহ কেহ বলিলেন, "ও দৃষ্টি প'ড়েছে, ওঝা দেখাও।" কেহ বলিলেন, "ভুলো জেলে ভাল জলপড়া জানে, তাহাই এনে দাও।" আবার কেহ বা বলিলেন, "পেঁচোপাঁচীর মানত কর।" যাহা হউক, সমস্তগুলি সম্পন্ন করা হইল কিন্তু কিছুই হইল না। আজ কয়েকদিন হইতে অসুখ আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা হইতে ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "অবস্থা ভাল নহে, টঙ্কার হইতে পারে। তাহা হইলে বাঁচিবার আশা নাই।"

দ্বিতলের একটী কক্ষে খোকা রোগশয্যায় পড়িয়া ছিল। কিরণ এইমাত্র পথ্য আনিবার জন্য নীচে গিয়াছে। গৃহিণীও এতক্ষণ খোকার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কত ঠাকুর দেবতার কাছে মাথা খুঁড়তেছিলেন, এখন সন্ধ্যা-আহ্নিক করিবার জন্য উঠিয়া নিজের ঘরে গেলেন। খোকার রোগ-শয্যাপার্শ্বে তখন কেহ ছিল না। খোকা চক্ষু বুজিয়া পড়িয়াছিল।

সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে নিজেকে আবরিত করিয়া মালতী কোথা হইতে খোকার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রজ্বলিত দীপালোকে খোকার শীর্ণ মুখখানি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, আহা, আজ খোকার দেহ শয্যার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে! সোণার বর্ণ কাল হইয়া গিয়াছে! যাদু আমার, বাছা আমার, আমি যে নাই, কে আর তোকে দেখবে বাবা! কে আর যত্ন করবে মাণিক! হঠাৎ খোকা নিদ্রিত অবস্থায় চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা, মা, কোলে নেনা মা।"

"আহা-হা যাদু আমার, বাছা আমার, অভাগিনীকে এখনও মনে আছে তোর?" মালতীর নয়ন দিয়া স্রোতের ন্যায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তন্দ্রাচ্ছন্ন বালক জড়িত কণ্ঠে আবার বলিল, "তোর বুঝি ঘুম পায়নি মা, আমার যে ঘুম পেয়েছে। আমার ভয় করে, তুই আমাকে কোলে কোরে নে সোনা মা।"

মালতী ভাবিল খোকা কি স্বপ্ন দেখিতেছে! সে আর থাকিতে পারিল না, তাহার হৃদয়ের স্নেহের ধারা শতগুণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। নিদ্রিত বালককে ব্যাকুল আগ্রহে দুই হস্তে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অজস্র চুম্বনে মুখখানি সিক্ত করিতে লাগিলেন। সে অমৃতধারা সিঞ্চনে খোকার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। এমন অমৃতময় দ্রব্যের অভাব সে যে এক বৎসর অনুভব করিয়াছে এ একটী বৎসরের মধ্যে কেহ ত তাহার মুখের উপর এমন পীযুষ ধারা ঢালিয়া দেয় নাই। বহুদিন পরে সেই স্নেহ সুধাধারা কে তাহার মুখের উপর ঢালিয়া দিয়া মুখখানি সিক্ত করিয়া দিল! এ যে তার মা। বালক দুই হাত দিয়া মালতীর কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কোথায় গিয়েছিলি? আমি কত ডেকেছি তবু আসস্‌নি কেন? খোকার কান্না শুনে কেমন ক'রে চুপ করেছিলি?"

"ওরে দুঃখিনীর ধন, সর্ব্বস্ব আমার! চুপ করে থাকতে পারিনি, তোর গলার স্বর দিবারাত্র আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হ'ত, আমি শুনতে পেতাম, তাই থাকতে পারলেম না বাবা!"

"তুইত' মরে গিয়েছিলি, না না? আমার কবে মরে যাবি? চল্‌না কেন আজ আমরা সেই মরার দেশে চলে যাই। এবার তোকে একা যেতে দেব না, পালিয়ে পালিয়ে আর যে মরে যাবে তা হবে না! কেমন মা; এবার মরবার সময় আমায় নিয়ে যাবি?"

মালতী কাঁদিয়া উঠিল, তাহার নয়নাশ্রু খোকার অঙ্গ প্লাবিত করিতেছিল। খোকা তাহার শীর্ণ হাত দিয়া মালতীর নয়ন মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "কাঁদিস্‌ নে মা চুপ কর। তুই কাঁদলে আমার যে কান্না পায়। এবার যখন মরার দেশে যাবি আমায় নিয়ে যাস্‌, মা, আমি তে তোকে ছেড়ে থাকতে পারব না।"

'যাব বাবা, নিয়ে যাব; এখন তুমি শোও বাবা একটু ঘুমাও।"

খোকা দৃঢ় ভাবে মালতীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'না আমি ঘুমুব না, তাহ'লে তুই মরে যাবি, আমায় নিয়ে যাবি না।''

এমনই ভাবে স্নেহের অভিনয়ে কতকক্ষণ কাটিয়া গেলে শ্রান্ত বালক মালতীর মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিল, ''মা, মা। আমার ঘুম পাচ্ছে। আর আমি থাকতে পারছিনা মা, আমার গা কেমন করছে মা; আয়, আয়"—

আবেগ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মালতী ডাকিল, ''খোকা, বাপ আমার!''

"মা, ঘুম পাচ্ছে! আয় ঘুমুতে ঘুমুতে আমরা তারার দেশে চ'লে যাই। আয় না মা—''

"এই যে যাই বাবা"। মালতী শয্যায় শয়ন করিয়া খোকাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিল, ''ভগবন্!''

গৃহিণী সন্ধ্যা করিতে করিতে খোকার কথাগুলি শুনিতে পাইয়াছিলেন। রোগের প্রলাপ মনে করিয়া তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া খোকার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলে। কিন্তু শয্যার দিকে চাহিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তাঁহার বুকের রক্ত জল হইয়া গেল, আতঙ্ক-কম্পিত কণ্ঠে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কিরণ পথ্য লইয়া উপরে আসিয়া খোকার শয্যার নিকট দাঁড়াইয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। গৃহিণীর বিকট চীৎকারে নিচে উপরে যে যেখানে ছিল, সকলেই ছুটিয়া আসিল। রুগ্ন খোকার বিছানায় দৃষ্টিপাত করিয়া সকলেই কাঁপিতে লাগিল। শয্যার সন্নিকটে যাইতে কাহারও সাহস হইল না। সকলেই বিস্মিত, স্তম্ভিত, নির্ব্বাক মন্ত্রমুগ্ধের মত চাহিয়া দেখিল, মৃতা ছোটবধূ মালতীর বুকের উপর খোকা শয়ন করিয়া আছে!

চীৎকারে, কোলাহলে, মন্ত্রণায় কিয়ৎক্ষণ কাটিয়া গেল। তাহার পর সকলে বুকে সাহস বাঁধিয়া ধীরে ধীরে শয্যার সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। জমীদার রমেশবাবু ভয়ব্যাকুল চিত্তে খোকার নিকটে আসিয়া মালতীর বক্ষঃ হইতে তাহাকে ছিনাইয়া লইতে গিয়া চমকিয়া উঠিলেন। মালতী, তাঁহার মৃতা ভ্রাতৃবধূর এ ত প্রেতাত্মা নয়ত, এ ছায়াময় দেহ নয়, এ যে সত্য সত্যই কায়া দেহ। আর সেই স্পন্দনহীন বুকের উপর খোকার প্রাণহীন দেহখানি মালতীর গলা ধরিয়া পড়িয়া আছে।

সমাপ্ত।

চাঁদপ্রতাপের * ব্রতকথা।

(১) নাটাইচণ্ডী

[শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

এদেশের সর্ব্বত্রই নানা প্রকার ব্রতের প্রচলন আছে। মঙ্গলচণ্ডী, উদ্ধারচণ্ডী প্রভৃতি ব্রতের কথা শাস্ত্রে লিখিত আছে এবং শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে চণ্ডী দেবীর অর্চ্চনা হইয়া থাকে। কিন্তু নাটাইচণ্ডীর কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। এই ব্রত অনেক স্থানেই, এমন কি, চন্দ্রপ্রতাপেরও কোন কোন বাড়ীতে হয় না। একই ব্রত নিয়মের স্থান বিশেষে ঈষৎ অনৈক্য লক্ষিত হয়। ষষ্ঠীব্রত কাহারও গৃহে, কাহারও উঠানে হইয়া থাকে; কেহ কেহ (নিজ হাতে) কাঁচা মাটির প্রতিমা গড়িয়া, কেহ কেহ কোনও গাছের ডাল রোপন করিয়া ও তৎপার্শ্বে পুকুর (আধহাত পরিমিত পুষ্করিণীর আকারে গর্ত্ত) কাটিয়া ব্রত করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রভেদ অনেক ব্রতেই একগ্রামেই ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে দেখা যায়। সকলেই 'আস্য' (পুরুষানুক্রমিক

* ঢাকা জিলার উত্তর পশ্চিমাংশে চাঁদপ্রতাপ পরগণা। ধামরাই, সাভার প্রভৃতি প্রাচীন স্থান এই পরগণায় অবস্থিত। "ঢাকার ইতিহাস" ১ম খণ্ড এই পরগণার কথা বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে।

চলিত নিয়ম) অনুসারে ক্রিয়া করিয়া থাকেন। নাটাই-চণ্ডী ব্রত ও কথারও ঐরূপ ইতর-বিশেষ সকল স্থানেই পরিলক্ষিত হয়। তবে সকল ব্রতকথারই মূল বিষয় যে এক, তাহাতে সন্দেহ নাই। চণ্ডীর নামের পূর্ব্বে নাটাই শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত এবং কোন্ সময় এই ব্রত এদেশে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা অবিদিত।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার * সন্ধ্যার পর এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ, নমঃশূদ্র প্রভৃতি সকল শ্রেণীর হিন্দুগৃহে কুললনাগণ ভক্তিপুতান্তঃকরণে নাটাই-চণ্ডী ব্রত করিয়া থাকেন। একখানা কলার 'মাইজ' (মধ্যস্থিত নবোদ্গত কলাপাতার অগ্রভাগ) সাজাইয়া উহার এক পার্শ্বে সাতখানা লবণ ছাড়া ও অপর পার্শ্বে সাতখানা লবণাক্ত 'চাপটি' (আতপ চাউলের চূর্ণ অল্প জলে গুলিয়া তেল, ঘি ছাড়া প্রস্তুত একপ্রকার পিষ্টক), উহার অগ্রভাগে সাতটী তুলসী পাতা, কয়েকটী আমনধান, সাতটী দূর্ব্বা এবং নিম্নভাগে সাতটী ভেন্নাপাতা (ভেরেণ্ডা) † রাখা হয় ও ঐ 'মাইজে'র সামনে একটী জলপূর্ণ পাত্র (মঙ্গলঘট) স্থাপন করা হয়। সামর্থ্যানুসারে অনেকেই নানাপ্রকার উপাদেয় পিষ্টকাদির আয়োজনও করিয়া থাকেন। মেয়েরাই যথাজ্ঞানে ব্রত করিয়া থাকেন; পুরোহিতের দরকার হয় না। কোন কোন ব্রাহ্মণ বাড়ীতে গৃহকর্ত্তা কিংবা আর কেহ পিষ্টকাদি চণ্ডীদেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া থাকেন মাত্র। মেয়েরা সাধারণতঃ ভক্তিসহকারে স্ব স্ব মনোভাব নাটাইচণ্ডী ঠাকুরাণীকে মাতৃভাষায় জানাইয়া থাকেন ও নিবেদ্য সামগ্রীগুলি ঐরূপেই নিবেদন করিয়া থাকেন। এই ব্রতে শঙ্খ, ঘণ্টা ইত্যাদি বাদিত হয় না; পুষ্পাদিরও দরকার হয় না। ব্রত শেষে মহিলা ও বালকবালিকাগণ হুলুধ্বনি ও প্রণাম করিয়া থাকেন। তৎপরে গৃহকর্ত্রী কিংবা অপর কেহ ব্রতকথা কহিয়া থাকেন। কথা সংক্ষেপতঃ এইরূপ :—এক সওদাগর * ছিলেন। এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া তাঁহার স্ত্রী পরলোকগতা হন। সওদাগরের তখনও যৌবনাবস্থা। প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে, নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও, পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে হইল। নূতন গিন্নী সতীন পুত্রকন্যাকে প্রথম দর্শনাবধিই মন্দ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইহা সওদাগরের নজর এড়াইল না। ছেলে-মেয়ের মুখ চাহিয়া তিনি বাণিজ্যের নিমিত্ত দেশান্তর গমনে ক্ষান্ত থাকিলেন।

অনেক কাল চলিয়া গিয়াছে। নূতন গিন্নীর যথাক্রমে একটী পুত্র ও একটী কন্যা হইয়াছে। ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া বহুদিন বাড়ী বসিয়া থাকায় সওদাগরের আর্থিক অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছে। পত্নীর কথায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বাণিজ্যে গমন করিতে হইল। রওনা হইবার পূর্ব্বে স্ত্রীর প্রতি সন্দিহান হইয়া, প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়ের খাওয়া পরার সুবিধার জন্য মোদক বাড়ীতে গোপনে টাকা রাখিয়া যান। তিনি রওনা হইবার পর হইতেই নূতন গিন্নী সতীন-পুত্রকন্যার প্রতি দুর্ব্যবহারের মাত্রা দিন দিন বাড়াইতে লাগিলেন। সৎমায়ের আদেশে তাহাদিগকে সারাদিন মাঠে মাঠে ছাগল-ভেড়া চরাইতে হইত। বিমাতা তাহাদিগকে খাইতে দিতেন দুই বেলা দুই মুষ্টি কদর্য্য খাদ্য, শুইতে দিতেন দাইয়ের (পালিকার) সঙ্গে ঢেঁকিশালে

---

* এ অঞ্চলে কোন কোন বাড়ী মাসের দুই রবিবারে দুই দিন ই ব্রত হইয়া থাকে। কোন অঞ্চলে অগ্রহায়ণ মাসের বুধবার এই ত আরম্ভ করা হয়। উপাচারাদিরও অন্য স্থানে অনৈক্য দেখা যায়। লেখিকা শ্রীযুক্তা শতদলবাসিনী বিশ্বাস মহাশয়া তাঁহার "বাঙ্গালার তকথায়" লিখিয়াছেন,—"অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম বুধবার ব্রত আরম্ভ রিতে হয়, প্রথম বুধবার তিনখানা কলার মাইজ সাজিয়ে দু'খানির কখানিতে তিনখানা লুনা পিটে আর একখানিতে চারিখানা আলুনি পটে এবং মাঝের পাতাখানিতে ২১ গাছি দুর্ব্বা ও ২১টী ধান এবং ঙ্গলঘট রেখে নাটাইচণ্ডী ঠাকরুণের কথা শুনিতে হয়।" (৪৫ পৃঃ)।

† ঢাকা সহরে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহে ভেরেণ্ডা পত্রের পরিবর্ত্তে কচুপাতা দেওয়া হয়।

* 'বাঙ্গালার ব্রতকথায়' সওদাগরের পরিবর্ত্তে রাজা লিখিত হইয়াছে। লেখিকা কথা আরম্ভ করিয়াছেন,—রাজা যাবেন বাণিজ্যে—ইত্যাদি। ইহা যেন আমাদের নিকট বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। এদেশের সেকালের রাজারা বাণিজ্যে গিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। পুরাকালে রাজারা রাজ্য শাসন করিতেন, বণিকগণই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতেন। বর্ত্তমান কালেও এদেশে উহার ব্যতিক্রম খুব কম দেখা যায়। যাহা হউক, ব্রতকথায় ইহা অবশ্যই দোষাবহ নহে।—লেখক।

তৃণ শয্যায়, আর সামান্য ত্রুটীতে দিতেন নিদারুণ শাস্তি।

দাই এই সব দেখিত শুনিত এবং তাহাদের সহিত চক্ষের জলে বুক ভাসাইত। তাহাদিগকে সকলই নীরবে সহ্য করিতে হইত। বিমাতা জানিতে পারিয়া তাহাদের মোদকবাড়ীর খাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে তাহারা বনে বনে ঘুরিয়া সুস্বাদু ফলের যোগাড় করিয়া তাহাতে ক্ষুধা দমন করিত। নূতন গিন্নী জানিতে পারিয়া সেখানকার সব ফলের গাছ সমূলে বিনষ্ট করিলেন।

অতিকষ্টে তাহারা সময় কাটাইতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহাদের ছাগল-ভেড়া হারাইয়া গেল। তাহারা খুঁজিতে খুঁজিতে এক গৃহস্থ বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি হইয়াছে। সেই বাড়ীতে তাহারা অতিথী হইল। অগ্রহায়ণ মাস। সেদিন রবিবার। হুলুধ্বনি শুনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় এক মহিলা বলিলেন যে, তাহারা নাটাইচণ্ডীর ব্রত করিলেন। এই ব্রতের ফল কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিলেন যে, যাহার যে কামনা তাহা সফল হয়।

মেয়েটী তাহাদের নিকট নিয়ম প্রণালী জানিয়া ও তাহাদের সাহায্যে, বাপ যেন শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া আইসে ও হারানো ছাগল-ভেড়া যেন ভোরেই পাওয়া যায়, এই কামনা করিয়া নাটাইচণ্ডীর ব্রত করিলেন। যথাসময়ে তাহারা ছাগল-ভেড়া পাইল। তিন চারদিন পর তাহাদের বাপও বাড়ী ফিরিলেন, এবং সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া কৌশলে তাহার স্ত্রীকে ভূগর্ভে জীবন্ত অবস্থায় প্রোথিত করিলেন। মেয়ে বড় হইয়াছে। এক সুশ্রী-বুদ্ধিমান সওদাগর পুত্রের সহিত তিনি খুব ঘটা করিয়া মেয়ের বিবাহ দিলেন।

যথাসময়ে সওদাগর-পুত্র স্ত্রীসহ বাড়ী রওনা হইল। পূর্ব্বে সে স্ত্রীর নিকট নাটাইচণ্ডীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিল। পরীক্ষার্থ স্ত্রীর অলঙ্কারগুলি একটী ঝাঁপিতে ভরিয়া জলে ফেলিয়া দিল। তাহার স্ত্রীও দেবীকে উহা ফিরিয়া পাইবার কামনা জানাইল।

কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে। সওদাগর-কন্যার একটী পুত্র হইয়াছে। ছেলের অন্নপ্রাশন ও খ[illegible] পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা খুব সমারোহে সম্পন্ন হইবে। ক[illegible] পূর্ব্বদিন শ্বশুর স্বপ্নে দেখিলেন, দেবতার আদেশ—[illegible] কাটিয়া রক্ত না দিলে পুষ্করিণীর জল শুদ্ধ হইবে [illegible] পুত্রবধূর অজ্ঞাতসারে দেবতার আদেশ পালন করা হ[illegible] কাজের দিন একটী বৃহৎ বোয়াল মাছ দেখিয়া, বধূ করিয়া উহা নিজে কাটিলেন ও উহার পেটের ভিতর হ[illegible] তাহার অলঙ্কার পূর্ণ ঝাঁপিটি পাইয়া, উদ্দেশে দে[illegible] প্রণাম করিলেন। এদিকে স্তন্য পান করাইবার [illegible] পুত্রের অনুসন্ধান করিয়া কাহারও নিকট না পাইয়া, ঘু[illegible] ঘুরিতে অবশেষে সেই পুকুরের ধারে উপনীত হইবা[illegible] দেবী তাহার পুত্রকে কোলে লইয়া জল হইতে উ[illegible] উহাকে তাহার কোলে দিলেন ও তাহাকে মিষ্ট ভৎ[illegible] করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

শ্বশুর এইসব দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইলেন ও বধূকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, নাটাইচণ্ডীর [illegible] সে পুত্র ও অলঙ্কার পুনঃ পাইয়াছে। দেবীর[illegible] সওদাগরের বিশ্বাস-ভক্তি জন্মিল ও যথানিয়মে অগ্রহা[illegible] প্রতি রবিবার নাটাইচণ্ডী ব্রত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে[illegible]

---

৮ এই ব্রতকথা 'বাঙ্গালার ব্রতকথা'য় সুবিস্তৃতভাবে [illegible] হইয়াছে। উক্ত পুস্তকে নাটাইচণ্ডী ব্রতকথার প্রারম্ভে লে[illegible] লিখিয়াছেন—"যাহা হউক, এই সকল ব্রতপ্রতিষ্ঠা দিন দিন পাইতেছে, নব্যাদিগকে আর বড় ব্রত করিতে দেখা যায় না। আর অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বোধ হয়, এই সকল ব্রত পার্ব্বণে[illegible] সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে।" লেখিকার এই মন্তব্য দেশের স্থানের পক্ষে সমীচীন হয় নাই। সহরে ব্রতনিয়মাদি লোপ পা[illegible] উপক্রম হইলেও পল্লীতে অদ্যাপি পূর্ব্ব ভাবের বিন্দুমাত্র ব্য[illegible] হয় নাই। দুর্ভিক্ষাদিহেতু ও পল্লীর অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি অবস্থান করিলেও, তথাকার গৃহস্থগণ দোলদুর্গোৎসবাদি উ[illegible] দিতেছে সত্য, কিন্তু অদ্যাবধি পল্লীর হিন্দুগৃহে ব্রতাদির পূর্ব্ববৎই আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পূর্ব্বকাল হ[illegible] মুসলমান রমণীদের কেহ কেহ নাটাইচণ্ডী ও আরও কোন কো[illegible] করিয়া থাকে। অর্দ্ধ শতাব্দী পরে ব্রতাদি দেশ হইতে সম্পূ[illegible] লোপ পাইবার কোন কারণ দেখা যায় না।—লেখক।

লক্ষ্মী।

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ]

(ক)

আমি ধনীর ছেলে—অচলপুরের বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য-বংশের একমাত্র বংশধর—পিতার ও দিদিমার সবে-ধন নীলমণি শ্রীমান প্রমোদচন্দ্র। শ্রীমান্ বলিলাম,—কেন না পিতার বৃদ্ধ বয়সের আশা ও সান্ত্বনা, তায় আবার শৈশবেই মাতৃহীন,—দুগ্ধ, ক্ষীর, নবনী ও অতিরিক্ত যত্নের কৃপায় দেহখানি ধনীদের আদুরে-গোপালের মতই বেশ মসৃণ ও গোলগাল। অনুরূপ দৈহিক বল যে ছিল না তাহা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু মানসিক বলও অন্ততঃ ছিল কি না তাহার বিচার করা বক্ষ্যমাণ বিষয়টি দ্বারা কাহারও পক্ষে কঠিন হইবে না।

কিন্তু সে কথাটা শোনার আগে আমার ছেলেবেলার ইতিহাসটাও কতক পরিমাণে আপনাদের জানিয়ে রাখা দরকার। অথচ এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টিকে ইতিহাসের নমুনায় সাজাইয়া বিবৃত করা যে কতদূর সম্ভব তাহাও বুঝিতেছি না। সুতরাং মোটামুটি রকমে যাহাতে এই জিনিষটাকে আপনাদের বোধগম্য করাইতে পারি শুধু তাহারই চেষ্টা করিব।

আমি ধনীর ছেলে—এ কথা প্রথমেই বলিয়াছি। সুতরাং সাধারণতঃ ধনীর ছেলেদের শৈশব ও বাল্য-জীবনটা—তাতে যদি সে মাতৃহীন ও একমাত্র-বংশধর হয়—, যেরূপ ভয়ানক যত্নে ও সশঙ্ক তত্ত্বতালাসিতে অতিবাহিত হইয়া থাকে, আমার বেলায়ও তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। শুধু এই যত্ন ও হারাই-হারাই ভাবযুক্ত সতর্কতা যে ভবিষ্যতের আশঙ্কায় শঙ্কিত দরিদ্র পিতার, রুক্ষ শাসনকেও হার মানাইয়া কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিল —তাহাই বলা আমার উদ্দেশ্য।

খুব ছোট সময়ের স্মৃতিটা আজ মসিলিপ্ত না হইলেও, অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু বুঝিবার ক্ষমতা হইবার পর যে দুইটী লোকের তাবেদারীতে দিনের অধিকাংশ ভাগ ব্যয়িত হইত, তাদের কথা আজও বেশ মনে পড়ে। একজন পিতার বিশ্বাসী খানসামা হরিশ আর, একজন, গোবিন্দ মুখুয্যে। ইনি একাধারে পিতার অকৃত্রিম সখা, বিশ্বাসী মন্ত্রী এবং হিতাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মচারী ছিলেন। আমার ছিলেন ইনি একমাত্র ব্যথার ব্যথী "মুখুয্যে জেঠা"।

"ব্যথার ব্যথী" কথাটায় আপনারা হয়তো একটু আশ্চর্য্য বোধ করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা ধনী তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার এ উক্তির সমর্থন করিয়া বলিবেন—"হ্যাঁ, সত্যই এক এক সময় অভিভাবকের স্নেহের শাসন মনে ব্যথাই দিয়া থাকে।"

দিদিমার পূজো আহ্নিকে পরমার্থ লাভের পথটা নাকি আমার মা "আবাগীর বেটী চলে গিয়েই" বন্ধ করিয়া গিয়াছেন। তবু বিধবার আচার বজায় রাখিবার জন্য আমার খাওয়া-পরার ভার ছিল হরিদা'র উপর। হরিদাকে এ কাজটায় কোন দিন ক্লান্তি অনুভব করিতে দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে পড়ে না। দিনে চারিবারের পরিবর্ত্তে পাঁচ সাতবার খাওয়ার অভ্যাস সে আমাকে করাইয়াছিল। ইহার উপর আবার যেদিন "বুড়ো হরেটার" আমার প্রতি অবহেলার উল্লেখ করিয়া দিদিমা বলিয়া বেড়াইতেন —"আহা, ছেলেটাকে না খাইয়ে শুকিয়ে ফেলেছে রে!—এমন হ'লে ও আর বেশীদিন মাছাড়া থাকবে না। ওলো, ও ক্ষেমী, ও হারাণের মা, দেখেছিস্ বাছাকে আর চেনার যো নেই!"—সেদিন দিদিমাতে ও আমাতে দস্তুর মত ধস্তাধস্তি চলিত। পেটটা কিছু আর রবারের তৈরীও নয়, আর যত্ন-প্রপীড়িত পেটে অগ্নিও তেমন প্রখর বোধ করিতাম না যে, দিনরাত সমান ভাবে সকলের প্রদত্ত খাবারগুলিই গিলিতে পারিব। নিরুপায় হইয়া কোন দিন হয়তো কিছু খাইতাম, কোন দিন দাঁত মুখ যথাসম্ভব

জোরে বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতাম। হতাশ হইয়া দিদিমা খেদোক্তি করিতেন—"আজকালের ছেলেগুলো এমনি পেটমরা যে সামান্য পথ্যটুকুও তাদের দাঁতে কাটান যায় না।" কিন্তু এতো গেল শুধু অসনের কথা। বসন, ব্যসন ও শয়নের কথা তো বলিই নাই। বাস্তবিক খাওয়া লইয়া যত না বিদ্রোহ মনে জাগিত, তার সহস্রগুণ জাগিত এইগুলি নিয়া। এক এক সময় কান্নাই পাইত।

আমার বাইরের জ্ঞান ছিল প্রাঙ্গণের ও ছাদের উপরের নীল আকাশ—তাও হরিদা'র কোল ছাড়া হইবার যোটি' বড় ছিল না। শীত গ্রীষ্ম বার মাস আবশ্যকের অধিক মূল্যবান্ জামায় ঢাকিয়া রাখিয়াও দিদিমার, পিতার ও হরিদা'র দুশ্চিন্তার অবধি থাকিত না—পাছে সর্দ্দি লাগিয়া কিছু একটা অনর্থ ঘটে। ঘরের বাইরে পা-বাড়ানটাকে একটা ভয়ানক আইনভঙ্গ অপরাধ বলিয়াই মনে করিতাম। কেন না—দৈবাৎ কোন দিন হরিদা'র অসতর্কতার ফাঁকে যদিবা বাহিরে যাইবার অতি বড় দুঃসাহস করিয়া ফেলিতাম, তার জন্য শাস্তিটাও বড় কম ভোগ করিতে হইত না। পিতা ও ঠানদিদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলেই 'হা-হা' করিয়া তো পড়িতেনই, অধিকন্তু কেহ বাতাস দিয়া, কেহ মুখ মুছাইয়া, কেহ মাথা তাতিয়া ওঠার কথায় আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া, কেহ বা নাক মুখের সিন্দুরত্ব প্রাপ্তির উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, আমাকে সত্যি সত্যি আধমরা করিয়া তুলিত! মনে পড়ে একবার সামান্য একটু জ্বর হওয়ায় সহর হইতে ষোল টাকা ভিজিটের বাঙ্গালী ও বত্রিশ টাকা ভিজিটের সাহেব ডাক্তারের ছড়াছড়িতে, দাসদাসীর পরিচর্য্যার হুড়াহুড়িতে এবং তোষামুদে নিকট ও দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়দের ও পাড়াপড়শির আনাগোনায়, আমাদের বাড়ীতে একটা ছোটখাট প্রদর্শনী বসিয়া গিয়াছিল। ছোট বড়, লাল নীল, হলদে সাদা কত শিশি ও কাগজের কৌটা যে টেবিলের উপর জমিয়াছিল, জ্বর সারিবার পর ঐগুলি দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলাম।

শয়নের ব্যবস্থা ছিল দিদিমার সঙ্গে—স্প্রিংএর গদি-আঁটা সুকোমল শয্যায়। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই সে ঘরের জানালা কবাট সব বন্ধ হইয়া যাইত—সে যেন বড় একটা অন্ধকূপ। রাত্রির বিশ্রামের মধ্যেও যে এঁদের তাড়নার অবধি থাকিত না, হঠাৎ কখনও গভীর রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা টের পাইতাম। প্রায়ই দেখিতে পাইতাম, পিতা কিম্বা দিদিমার উৎকণ্ঠিত মুখ আমার শিয়রে জাগিয়া আছে।

এই বয়সটা অতিক্রম করিয়া যখন কৈশোরে পা দিয়াছিলাম—তখন জীবনের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আরও দুইটি লোকের নাম জড়িত হইয়া গেল। একটী আমার মুখুয্যে জেঠার তিন বছরের একমাত্র মেয়ে লক্ষ্মী এবং অপরটি আমার "গার্জ্জেন টিউটর" রমানাথ ঘোষাল।

যে ছেলেটা কুৎসিত কালো হয়, মা বাপ যেমন 'স্বর্ণ কমল' বা 'শশধর' গোছের একটা সুন্দর নামে তার ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করেন, লক্ষ্মীর নামটাতেও মুখুয্যে জ্যেঠা ও তার পত্নীর সেই রকম কোন উদ্দেশ্য ছিল কি না জানি না; কিন্তু লক্ষ্মী মোটেই "লক্ষ্মীটি" ছিল না। তাদের একলা বাড়ীটা সামান্য সামান্য জিনিষ দ্বারা লক্ষ্মীর লক্ষ্মীপনার ক্ষুধা মিটাইতে পারিত না, তাই হাঁটিতে শেখার পর হইতে সে আমাদের বাড়ীর অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে আমার বই, খাতা, পেন্সিল ছড়াইয়া এবং সুযোগ পাইলে তাহা মসীলিপ্ত করিয়াও, লোকের কাছে বাপ মায়ের দেওয়া নামটাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে বসিয়া যাইত। বলা বাহুল্য, অন্যান্য কারও কাছ এর জন্য ধমক খাইলেও, আমার সঙ্গী সাথীহীন বিড়ম্বিত কৈশোরের দিবার আকাঙ্খাটা তাকে যথেষ্ট প্রশ্রয়ই দিত।

আমার ক্ষুধিত চিত্ত ভরিয়া ঐ এক ফোঁটা মেয়েটী যে সখীত্বের সাড়া জাগাইয়া দিয়াছিল, উত্তর কালে তাহা সার্থক হইতে যদিও পায় নাই, তথাপি এই চব্বিশের কোঠায় পা দিয়াও আজ মনে হইতেছে যেন সেটা এখনও একেবারে মরিয়া যায় নাই। সামান্য সিঞ্চনেই যে সেটা পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিতে সক্ষম, কারণে ও অকারণে নিজের গত দিনের আলোচনা করিতে বসিয়া আজও তাহা টের পাই কি না সে কথা পরে বলিব।

প্রবেশিকা পর্য্যন্ত গ্রামের স্কুলেই পড়িয়াছি। বাড়ী

হইতে স্কুল পোয়া মাইলের বেশী নয়, তবু এই পথটুকু হাঁটিয়া যাওয়ার আমার হুকুম ছিল না। হরিদা কোলে করিয়া স্কুলে রাখিয়া আসিত এবং ছুটী হইলে সে-ই গিয়া কোলে করিয়া নিয়া আসিত। এইজন্য ক্লাসের ও স্কুলের অনেক ছেলে বিদ্বেষবশেই হো'ক, অথবা আমাকে একটু খেপাইবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়াই হো'ক, আমাকে যথেষ্ট ঠাট্টা করিত। হরিদার কোলে চড়িয়া আসিতে যাইতে আপত্তি করিলে যে তাহা কোন কাজে আসিবে না, তাহা জানিতাম, কিন্তু বড় লজ্জা করিত। শেষে অনেক বলার পর হরিদা স্কুলের কাছাকাছি আসিয়া আমাকে কোল হইতে নামাইয়া দিত।

ইহাতেও নিষ্কৃতি পাইলাম না। ছেলের দল, সহপাঠীর দল, কেহ বলিতে আরম্ভ করিল, "প্রমোদ এখন বেশ হাঁটতে শিখেছে"। কেহ বলিত, "না বাপু, ঢের ঢের বড়মানুসি দেখেছি, এমনটি কথখনো দেখিনি!"—অপরে বলিত, "এ করেছিস কি রে প্রমোদ, একেবারে মাটিতে পা দিয়ে ফেলেছিস্?" সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম আশঙ্কায় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কেহ হরিদাকে সাবধান করিয়া দিত,—"এমন করে ছেড়ে দিয়েছ হরিদা, রোদে যে একেবারে গলে' যাবে!"

রাগটা পড়িত দিদিমার ওপরই বেশী। একদিন স্কুল হইতে ফিরিয়া পড়ার ঘরে গুম হইয়া বসিয়া রহিলাম, জল খাবার নিয়া হরিদা ডাকিতে আসিলে তাহাকে সোজা হাঁকাইয়া দিলাম, "আমি খাব না, আমার ক্ষিদে নেই।" মাষ্টার মহাশয় সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রোজই তো খাও প্রমোদ, আজ ক্ষিদে নেই কেন?" কিন্তু যে সব বিদ্রূপ গলাধঃকরণ করিয়া সেদিন স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি, তাহা তো আর মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলা যায় না। টপ্ টপ্ করিয়া আমার চক্ষু বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

পাশের দরজায় জ্যেঠার হাত ধরিয়া মূর্ত্তিমতি সান্ত্বনার মত লক্ষ্মী দেখা দিল। ছুটিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া—"চুপ্ টী করে আজ যে বড় পালিয়ে এসেছ —আমাকে ডাকনি? তুমি বড় দুষ্টু হয়েছ—" বলিতে বলিতে সে হঠাৎ থামিয়া গেল। আমি তখন বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া বুকভাঙ্গা কান্নার বেগটাকে চাপিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। হরিদা হাতে খাবার নিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মাষ্টার মশাই মুখুজ্যে জ্যেঠাকে দেখিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। লক্ষ্মী হয় তো মনে করিল পড়ার জন্য মাষ্টারমশাই আমাকে বকিয়াছেন। একবার আমার দিকে, একবার মাষ্টার মশাইএর প্রতি তাকাইতেই তাহার চোখ্ দুটি সজল হইয়া উঠিল। তাহার দিকে চোখ ফিরাইতেই, আমার এত অভিমানের মধ্যেও হাসিই পাইতে লাগিল।

ধীরে ধীরে উঠিয়া জ্যেঠার কোলের মধ্যে মুখ লুকাইতে লুকাইতে বলিলাম—"আপনি বাবাকে বলে দিন্—হরিদার কোলে চড়ে আর আমি স্কুলে যেতে পারব না।"

তার পরদিন হইতে গাড়ীর ব্যবস্থা হইয়া গেল। কিন্তু আমি তো তাহা চাহি নাই? ঐ আড়ম্বর আমাকে অহর্নিশি পীড়া দিত—তাহারই মধ্যে পুনরায় আমাকে নিক্ষেপ করা হইল? কি করিব!—নিঃশব্দে এই ধনীর কায়দা বরদাস্ত করিয়াই চলিলাম—আমি তো আর হেঁজিপেঁজি নই!

হেঁজিপেঁজি যে আমি নই—এ ধারণাটা সত্যি সত্যিই কালে আমাকে আর এক মানুষ করিয়া ফেলিল। এখন আর আমার কোন আড়ম্বরই আড়ম্বর বলিয়া মনে হয় না। এমনি হইয়া পড়িলাম যে শেষে সকলই আমার 'স্বভাব' হইয়া দাঁড়াইল।

সবই উল্টাইয়া গেল—গেল না শুধু লক্ষ্মীর সঙ্গে আমার হাসি খেলা ও অবাধ মেলামেশা। গ্রামের স্কুলের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে যখন পড়ি তখনকার সময়টা ঠিক কৈশোরও না যৌবনও না। আর লক্ষ্মী তখন একটী জীবন্ত কুসুম—বিশ্বের সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারে তার অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত দলগুলি মেলিয়া ধরিয়া যেন বলিতে চাহিতেছিল—'আমিও ঐ ভাণ্ডারে একটুকু স্থান চাই।' কিন্তু আমার আজিকার লক্ষ্মী ও তখনকার লক্ষ্মীতে প্রভেদ যে কতখানি তাহা দেখিবার মত দৃষ্টি তো আমার ছিল না তখন! সে যে আমার পিতার গোমস্তা, গোবিন্দ মুখুয্যের মেয়ে লক্ষ্মী!

সত্য বটে সে আমার চোখেও কম সুন্দর লাগিত না—কিন্তু তাই বলিয়া আজ তাহাকে মনের মধ্যে যেমনটি দেখিতে পাইতেছি, তখন তো কই তাকে তেমনটি দেখি নাই! অথচ সে-ই ছিল আমার ছেলেবেলাকার সুখ দুঃখের ভাগী ও একমাত্র খেলার সাথী। সকাল সন্ধ্যায় এই প্রমোদদা'র কাছে পড়া নিতে না পারিলে তার পড়া হইত না;—এই প্রমোদদা'র খাতা-বই নষ্ট করিয়া তার মৃদু ভৎ'সনা না শুনিলে তার পড়া সমাপ্ত হইত না; পুতুল খেলা হইতে সুরু করিয়া দোল্‌নায় ঝোলা অবধি যত কিছু খেলাতে তার বেশী অনুরাগ ছিল, এই প্রমোদদা'র সাথেই সবগুলি তার না খেলিলে নয়। পড়া শেষ হইলেও, গালে হাত দিয়া বসিয়া সে অবাক বিস্ময়ে ও দৃপ্ত চোখে চাহিয়া দেখিত তার প্রমোদদা'র বড় বড় ইংরাজি কেতাব পড়া ও বড় বড় আঁক কষা। আর অমন একটী ভক্ত দর্শক ও মনোযোগী শ্রোতা পাইয়া এই প্রমোদদা'রই বুকখানা গর্ব্বে আধ হাত উঁচু হইয়া উঠিত। গোবিন্দ মুখুয্যের বাহির বাটির পাশ দিয়া যে কেহ বিকালে হাঁটিত, সেই বুঝিত তাহার সপ্তম বর্ষীয়া লক্ষ্মী দরজায় বসিয়া কা'দের স্কুল-প্রত্যাগত সুদৃশ্য গাড়ীর দর্শনাশায় পথের দিকে চাহিয়া আছে। আর যে দু'চারটী পথিক কিংবা স্কুলের ছেলে ঐ বাড়ীর কাছাকাছি একখান গাড়ীর ভিতর হইতে এই দ্বাদশ বর্ষীয় প্রমোদের তরুণ মুখখানি ইহার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে দেখিত, সেই বুঝিতে পারিত বালকের চোখ দুটি কাহার স্নিগ্ধ-কোমল চোখের সাদর অভ্যর্থনার লোভে অমন করিতেছে। কিন্তু হায়—ইহার মূল্য বুঝিব, এমন অন্তর্দৃষ্টি আমার তখন ছিল না!

(খ)

বাল্যকালের চঞ্চল স্বভাবের যত প্রকার দোষই দর্শিত হউক না কেন, দৈহিক উন্নতির দিক দিয়া আরও যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছেই আছে, একথা অস্বীকার করা যে একেবারেই অসম্ভব; তাহা আমি যেমন বুঝিয়াছি তেমন বোধ হয় আর কেহ বুঝিতে পারেন নাই। কারণ স্বভাব-সুলভ চপলতাটাকে জোর জবরদস্তি করিয়া মারিয়া ফেলাতে আমি শক্তি জিনিষটার বড়ই কাঙ্গাল ছিলাম। স্বাধীনভাবে চলিয়া ফিরিয়া বেড়ান ও ছুটাছুটী লাফালাফির কল্যাণে লক্ষ্মীর বাহিরটা এবং আজ মনে হইতেছে বোধ হয় ভিতরটাও—অপর্য্যাপ্ত স্বাস্থ্যে দিন দিন লক্ষ্মীর মতই শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিতেছিল। ঐটুকু বয়সেই যে অপরূপ তেজস্বিতার আভায় তাহার মুখখানি কাহারো কাহারো কাছে 'মর্দ্দা' 'মর্দ্দা' ঠেকিত—তাহার স্বরূপটা পাঁচ বছর আগেকার একটী ঘটনায় আমাকে যেমন স্তম্ভিত ও বিস্মিত করিয়া দিয়াছিল, তেমন ব্যথাও দিয়াছিল যথেষ্ট।

সুখের বলিব কি দুঃখের বলিব বুঝিতেছি না, গ্রীষ্মের সে সন্ধ্যাটা আজও আমার মনের ডায়েরীতে উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। আমি সেবার ইণ্টারমিডিয়েট আর্টস্ পরীক্ষা দিয়া সবে মাত্র বাড়ী আসিয়া কি প্রকারে সুদীর্ঘ ছুটিটা কাটাইব মনে মনে তার একটা খসড়া করিয়া লইয়াছি। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, পিতার ও দিদিমার 'আদুরে গোপাল' হইলেও, আমার পূজনীয় গার্জ্জেন-টিউটর শ্রীযুক্ত রমানাথ ঘোষাল মহাশয়ের আন্তরিক যত্ন ও মাজা-ঘষার কল্যাণেই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ঐ সম্মানটুকু আদায় করিতে পারিয়াছিলাম এবং জ্ঞান-পিপাসা বর্দ্ধিত হইলেও কলেজে পড়িবার ইচ্ছাটা পিতার নিকট 'ইংরাজি পড়ার পরিণাম—বাতুলতা' বলিয়াই উপেক্ষিত হইত যদি না উক্ত গৃহ-শিক্ষক মহাশয় পিতার নিকট আমার হইয়া অত সুপারিস করিতেন। কেন না—দিদিমার ও পিতার মতে যার অচলা লক্ষ্মীর কৃপায় চাকুরী করিয়া খাইতে হইবে না—তার অত মাথা ঘামাইয়া বড় বড় কেতাব পড়া ও পাশ দেওয়ার কোনই প্রয়োজন থাকিতে পারে না। লেখাপড়া শিখুক গিয়া তাহারা, যাহাদের 'কেরাণীগিরি'—অন্ততঃপক্ষে 'দারোগা-গিরি' করিয়া জীবিকার সংস্থান করিতে হইবে—এইরূপই একটা উদ্ভট উত্তরের সঙ্গে ধমক্ খাইয়া আমি শেষে মাষ্টার মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম।

ধনীর একমাত্র সন্তান, সুবংশজাত এবং সুশ্রী—তাহাতে আবার সুপণ্ডিত হইতেও চলিয়াছি। পিতার,—বিশেষ করিয়া দিদিমার, আমার বিবাহে আগ্রহের কথাটাও বোধ করি কেমন করিয়া দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া

পড়িয়া থাকিবে—কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকের উমেদারী দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল। নিজেও জানিতে পারি নাই বা জানিবার আগ্রহও সত্যিই মনে জাগে নাই, কোনও ভদ্রলোকের আবেদন পিতা মঞ্জুর করিলেন কি না। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার পর আমার শোবার ঘরে প্রবেশ করিবার পথে, অন্ধকারে দাঁড়ান লক্ষ্মীর কথায় ও আচরণে বুঝিতে পারিলাম—আমার "পাড়াপড়সি"টির চোখের ঘুম ইতিমধ্যেই তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। শীঘ্রই আমার বিবাহ হইবে এই পরম শুভ সংবাদটা দিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গেই সে কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল। টেবিলের উপরের আলোটা বাড়াইয়া দিতে দিতে আমি লক্ষ্মীর দিকে না চাহিয়াই বলিলাম—"বেশ, এমন বার্ত্তাটা যে ব'য়ে আন্‌লে, তাকে পেটভরে রসগোল্লা—"

কথা শেষ করিতে না দিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল—"কে চায় তোমার পেটভরা রসগোল্লা?" কথার ঝাঁজে চমকিত ও বিস্মিত হইয়া তা'র দিকে চাহিতেই সে তা'র দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। কিন্তু উজ্জ্বল দীপালোকে তা'র চোখের জল ও কম্পিত ওষ্ঠাধর দংশন করিয়া আত্ম-সংবরণের চেষ্টা আমার অবিদিত রহিল না। তাহার হঠাৎ এই আবেগ আমাকে একেবারে বিমূঢ় করিয়া ফেলিল। বিস্মিতের মত তার কাছে গিয়া মুখখানি আলোর দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম—"কি হয়েছে তোমার, লক্ষ্মী?"

সজোরে নিজকে মুক্ত করিয়া লইয়া লক্ষ্মী তেমনি দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"কিছু হয়নি, যাও! যে ছেলেবেলার বন্ধুর কথা বোঝে না—তার মান রাখ্‌তেও শেখেনি, তার সঙ্গে আমি কথাই বলি না।"

বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। মুখ দিয়া রা'সরা দূরের কথা—নিশ্চল প্রস্তর-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া প্রাণপণ শক্তিতে আমার চেতনাকে জাগাইয়া তুলিয়া ইহাই বুঝিতে চাহিতেছিলাম যে, লক্ষ্মী এই যাহা মুখ দিয়া বাহির করিয়া ফেলিল ইহার বাহ্য অর্থ, তাহাই সে বলিল কি না। একরূপ সংজ্ঞাহীনের মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুধু এইটুকু অনুভব করিতে পারিলাম যে, লক্ষ্মীর কম্পিত দেহখানি হঠাৎ ঋজু হইয়া আসিল এবং যাহা সে ইতিপূর্ব্বে কোন দিন করে নাই—আমার পায়ের উপর তার কপোলের এবং কপোল পরিবেষ্টিত চুলের গোছার স্পর্শ রাখিয়া ঝড়ের মত ফাটিয়া পড়িতে বাহিরে ছুটিয়া গেল। আজও মনে পড়ে—সম্বিৎ ফিরিয়া আসিতেই তাহাকে প্রাণপণ বলে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া ব'লয়াছিলাম—"লক্ষ্মী কি বলে গেলি ভাল করে ব'লে যা—" তার উত্তরে কাঠের সিঁড়িটার উপরে তাহার দ্রুত পদধ্বনি ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া শেষে মিলাইয়া গিয়াছিল।

ইহার সাত আট দিন পরে হরিদার মুখে শুনিতে পাইলাম, লক্ষ্মীকে নিয়া তা'র বাপ মা পশ্চিমের কি একটা স্বাস্থ্যকর সহরে চলিয়া গিয়াছেন।

(গ)

প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া যখন কলিকাতায় পড়িতে যাই, তখন আমার বয়স সতের। সেই যাবার দিনের দৃশ্যটা আজ আমার মনের চোখে একটী করুণ কাহিনীর মত ভাসিয়া চলিয়াছে। আমার বেশ মনে পড়ে—লক্ষ্মীকে আমার এহেন আমোদের কথাটা বলিতে সে আমার হাতখানি ধরিয়া অঝোরে কাঁদিয়াছিল। কোন কথাই তাহার কম্পিত ক্রন্দনরুদ্ধ ওষ্ঠদ্বার ঠেলিয়া বাহির হইতে পারিতেছিল না। আমি সে কান্নায় বিস্মিত এবং কতকটা যেন বিরক্ত হইয়াই বলিয়াছিলাম—"এতে কান্নার কি আছে রে লক্ষ্মী! আমি যে পূজার ছুটিতেই আস্‌ছি আবার।"

উত্তরে সে যে অভিমানক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণেক আমার চোখে চাহিয়া আঁচলে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে ছুটিয়া গেল—আজকের এই দৃষ্টি তখন আমার থাকিলে, এ জীবনটা হয় তো একটা স্বর্গীয় সুধার ভাণ্ডারে পরিণত হইয়া যাইত!

পূজার ছুটী হইয়াছে—বাড়ী আসিয়াছি। দেখিলাম সকলের—বিশেষ করিয়া দিদিমা ও হরিদা'র—চোখে মুখে কিসের একটা ঔৎসুক্য খেলিয়া বেড়াইতেছে, সমস্ত ছুটিটা দিদিমা আমাকে লইয়া পড়িলেন। নানা দিক দিয়া তিনি ইহাই বুঝিতে চাহিতেছিলেন—তার আদুরে গোপালটী এই ক'মাসের মধ্যে কতটা রোগা হইয়াছে। বামুনের রান্না খাইয়া, মাষ্টারের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া, দুষ্টিঅনাশি

দেওয়ার লোকের অভাবে কি এই দুঃখের ছেলের দেহ টিকিতে পারে! যে ক'দিন বাড়ী থাকি—উহারই মধ্যে আমার আহার সম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা হইয়া গেল যে, প্রবাসের ক'টা মাসের ক্ষতি দিদিমা যে এই ক'দিনে পূরণ করিয়া নিতে চান তাহা আমার বুঝিতে বাকী থাকিল না।

অবশেষে একদিন বলিলাম—"দিদিমা, এত খেলে যে আমার পেট গরম হ'য়ে যাবে—রাতে ঘুম হ'বে না!" তিনি অবাক হইয়া বলিলেন—"ওমা, তুই বলিস্ কি রে, এই তোর এত? খেয়ে দেয়ে দেহটা ঠিক না কর্‌লে, কল্‌কাতায় গিয়ে যে ব্যামোতে পড়ে থাক্‌বি—তখন লেখাপড়া সব বন্ধ থাকবে না?" এর উপর আর কি বলিব! দিদিমার মনে তো আর কষ্ট দিতে পারি না!

দুই দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু এর মধ্যে লক্ষ্মীকে তো আমাদের বাড়ীতে আসিতে দেখিলাম না! দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইয়া গেলাম। তিনি বলিলেন—"বড় সড় হয়েছে, দুদিন পরে শ্বশুর-ঘর কর্‌তে যেতে হবে, এখন কি আর তা'র 'ধিঙ্গিপনা' ভাল দেখায় ভাই!" দিদিমা এ বলেন কি? এই তো মাস পাঁচেক মোটে হইয়াছে তা'কে দেখিয়া গিয়াছি, এরই মধ্যে সে 'বড়-সড়' হইয়া পড়িয়াছে! তাহাকে দেখিতে আমার মন তলে তলে উৎসুক হইয়া উঠিতেছিল।

সেদিন বিকেলের দিকে গাড়ী করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া তাদের বাড়ীর সাম্‌নে দেখিলাম একখানি বই কোলে, দুই হাতে চিবুকের ভর রাখিয়া গভীর মনোযোগে লক্ষ্মী তাহার মধ্যে ডুবিয়া আছে। গাড়ীর শব্দে চমকিয়া সে এই দিকে চাহিতেই আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বের অভ্যাস মত ডাকিলাম—"এই লক্ষ্মী, কেমন আছিস্ রে? ওটা কি বই রে তোর হাতে?" ভিতর হইতে কথা শুনিয়া গাড়োয়ান ঘোড়া থামাইয়া ফেলিল। হাতের বইখানির উপর সলজ্জ দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া আমার গাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া লক্ষ্মী বলিল, "আস্‌বে আমাদের বাড়ী?"

তার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া প্রশ্ন করিলাম, "এ কেমন কথা হ'ল রে?"

করুণ অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া লক্ষ্মী আমার দিকে চাহিল। আমি আজ এত দিন পরেও হলপ করিয়া বলিতে পারি, সে চাহনিতে অভিমান ছিল, আত্ম-দমন করিবার চেষ্টা ছিল এবং লজ্জার রক্তিমতাও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মূঢ় আমি, তা'র ভিতরটা তখন আমার চোখে ধরা পড়িল না। আমার দিকে চাহিয়া সে যেমন করিয়া মুখ নত করিল ও হাতের বইখানাকে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, তাহাতে আমার মনে হইল হয় তো এমন একটা কিছু হইয়াছে, যাহাতে লক্ষ্মীর মনে খুব আঘাত লাগিয়াছে। অথচ সে তাহা মুখ ফুটিয়া আমার কাছে বলিতেও পারিতেছে না। অপ্রিয় সত্য নাই বা শুনিলাম—এই মনে করিয়া তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। বিশেষ—তখন সেই "বড়-সড়" হওয়ার কথাটাও আমার মনে অনেকখানি সত্যের ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করিয়াও যে থাকা যায় না। কি করিব, কি বলিব, ভাবিতেই আমার মাথায় একটা খেয়াল চাপিল।

হঠাৎ গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া সাগ্রহে বলিলাম—"আয় না লক্ষ্মী, একটু বেড়িয়ে আসি!" সে যেন একটু চম্‌কাইয়া চারিদিকে একবার চাহিয়া লইল। তারপর খুব সহজ ভাবে সহিসকে আদেশ করিল—"দরজা খুলে দে।"

হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলাম। একটু হাসিয়া সে বলিল, "আমি অমনিই উঠ্‌তে পারতাম্।" বলার সঙ্গে সঙ্গে সে গদিটায় বসিয়া পড়িল। গাড়ী চলিতে লাগিল।

"কি রে এত ঘেমেছিস্ কেন? গাড়ীতে উঠে ভয় কর্‌ছে নাকি রে? দূর, ভয় কিরে—আমি রয়েছি যে!"

অম্লান হাসি হাসিয়া আমার চোখে পূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া সে উত্তর দিয়াছিল—"ঘাম্‌টা কিছু নয়, আর ভয়ের কথা কি বল্‌ছ? তোমার কাছে থাক্‌তে পার্‌লে যে নিজেকে সব চেয়ে বেশী নিরাপদ বলে মনে করি! মনে নেই কি, তোমার মা'র বকুনির ভয়ে তোমার কাছেই আমি পালিয়ে আস্‌তুম্?"

প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা,

কল্‌কাতা কি খুব মস্ত সহর? খুব বুঝি ভাল ভাল বই সেখানে পাওয়া যায়? আচ্ছা, তুমি খেলা কর কাদের সাথে?" প্রশ্নের ট্রেন তার হয় তো বাড়িয়াই চলিত, কিন্তু ঠিক সেই সময় একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ঘোড়ার রাশ ছিঁড়িয়া যাওয়ায় গাড়িখানা হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। টাল সামলাইতে না পারিয়া হুমড়ি খাইয়া একেবারে লক্ষ্মীর গায়ের উপর পড়িয়া গেলাম, লক্ষ্মী ছোট্ট একটু আর্ত্তনাদের সহিত আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া এলাইয়া পড়িল।

নিজকে সামলাইয়া তার অবসন্ন দেহখানি আমার হাঁটুর উপর রাখিয়া যখন ডাকিলাম—"লক্ষ্মী—লক্ষ্মী রে—এমন হ'য়ে পড়লি কেন? খুব কি চোট লেগেছে?" সে তখন চোখ মেলিয়া আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। তার সুকোমল দেহখানি ঈষৎ কম্পিত হইয়া আমার শরীরের প্রতি শিরায় যেন কি একটা শিহরণ জাগাইয়া তুলিতেছিল। কিন্তু মূর্চ্ছা যায় নাই তো? চীৎকার করিয়া আদেশ করিলাম—"এই কোচম্যান, জল্‌দি পানি লে' আও।"

দু'হাত তুলিয়া আমার গলা ধরিয়া উঠিতে উঠিতে একটু লজ্জিত ভাবে লক্ষ্মী বলিল—"জলের দরকার নেই, কিছু চোট লাগে নি আমার। শুধু ভয়ে কেমন যেন হ'য়ে গিয়েছিলাম, গাড়ীটা ভারি হঠাৎ থেমে গেল কি না।—তোমার লাগে নি তো কোথাও?"

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম—লক্ষ্মী কোন চোট পায় নাই।

বাড়ী ফিরিয়া এই ব্যাপারটাই মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছিলাম। পিতার বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বরে চমকিয়া সেই দিকে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইলাম। তিনি দিদিমাকে বলিতেছিলেন—তুমি বল কি মা—গোবিন্দের মেয়ে হবে আমার পুত্র-বধূ?—আর গোবিন্দের স্ত্রী সে প্রস্তাব করবার স্পর্দ্ধা দেখাতে পারে? এযে আমি ভাব্‌তেই পারি নে।"

লক্ষ্মীর 'বড়-সড়' হইয়া উঠিবার কথাটার ইতিহাসটা আমার চোখের সামনে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হইয়া গেল। তিলার্দ্ধ দেরী না করিয়া নিজের প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেলাম। বেড়াইতে যাওয়ার প্রস্তাবে লক্ষ্মী যে একটু চম্‌কাইয়া উঠিয়াছিল—সেটুকুরও কারণ আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না। হাসি পাইল। সত্যই ত সে গোমস্তার মেয়ে, আর আমি মনিব—আজ না হ'লেও দু'দিন পরে হব। সত্যই তো এ ভারি স্পর্দ্ধার কথাই!

ছুটী ফুরাইয়াছে; দু'একদিনের মধ্যেই কলিকাতা যাইবার জন্য আমি সেদিন দুপুরে আমার বাক্স বই গুছাইতেছিলাম, হরিদা সাহায্য করিতেছিল। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া লক্ষ্মী বোধ হয় হরিদাকে দেখিয়াই তেম্‌নি নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইতেছিল। হরিদা সস্নেহে ডাকিলেন—"কিরে লক্ষ্মী, চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছিস যে বড়?—আয় না, তোর প্রমোদদার বই-টই, কাপড়-চোপড়-গুলো একটু ভাল করে সাজিয়ে দিয়ে যা না রে।"

বই গুছান ক্ষান্ত দিয়া আমি দরজার পানে চাহিতেই লক্ষ্মী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সাগ্রহ দৃষ্টিতে অথচ যথেষ্ট কুণ্ঠার সহিত প্রশ্ন করিল—"দেব তোমার বাক্স সমান করে?"

লক্ষ্মীর কুণ্ঠিত ভাবটা দূর করিবার উদ্দেশ্যে একটু হাসিয়া বলিলাম—"ওমা, তুই আবার গুছিয়ে দিতে শিখলি কবে রে লক্ষ্মী? আমি তো দেখে আস্‌ছি তুই আমার কাগজ-পত্র-বই ছড়িয়ে এখানেরটা ওখানে টেনে ফেলে একাকার করে রাখ্‌তেই পারতিস্ বরাবর।"

সলজ্জ হাসিতে মুখখানা রাঙ্গা করিয়া সে উত্তর দিল—"ইস্, তা বই কি? আর যে কোন দিন তোমার জিনিসপত্তর গুছিয়ে দিতে পারব না।" বলিয়াই কিসের উত্তেজনায় সে এম্‌নি হঠাৎ আসিয়া আমাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া বসিয়া পড়িয়া ক্ষিপ্রহস্তে নতমুখে বাক্সে রক্ষিত দ্রব্য-সম্ভার টানিয়া বাহির করিতে লাগিল যে, আমি কোন প্রকার তামাসা করিব কি—বিস্ময়ে হত-বুদ্ধি হইয়া শুধু তাহার আনত মুখ ও কর্ম্মনিরত হাত দুটীর পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। হয় তো তাহার বাক্স সাজান শেষ করিয়া সে চলিয়া গেলেও আমি ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতাম। কিন্তু হরিদার তরল কণ্ঠস্বরে আবার পূর্ব্বের ধারায় ফিরিয়া আসিলাম। পরিহাস তরল কণ্ঠে হরিদা বলিল—"তা ঠিকই তো; লক্ষ্মী যে শীগ্‌

শীগ্রই তার নারায়ণের ঘর করতে যাচ্ছে, তখন তো আর সে প্রমোদদা'কে—"

বিদ্যুৎবেগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, লক্ষ্মী প্রায় কাঁদ-কাঁদ সুরে শুধু একটা কথাই বার বার বলিতে বলিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল—"ইস্ কখ্খনই না—কখ্খনই না—কখখনই না তা—" শেষের দিকটা তাহার দ্রুত পদ-ধ্বনির মাঝে ডুবিয়া গেল।

দেখিলাম সেই ছেলেবেলার মতই সে আমার দ্রব্য-সম্ভার শুধু ছড়াইয়া দিয়াই গেল—গুছাইয়া দেওয়া তা'র দ্বারা কোন দিনই হয় নাই, আজও হইল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সে আমার ভিতরটাকে কোনকালেই এমনি বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতে পারিল না। ধন-মদে-মত্ত আভিজাত্যাভিমানী আমার পাষাণে গড়া বুকের মধ্যটাকেও যদি এমনি করিয়া টানিয়া হেঁচড়াইয়া ছড়াইয়া দিতে পারতিস্ লক্ষ্মী—তাহা হইলে আজ আমার মত সর্ব্ববিষয়ে সুখী কে ছিল?

(ঘ)

পাঁচ বছরের আগেকার সেই গ্রীষ্ম-সন্ধ্যার পর জীবনে আরও কত গ্রীষ্ম-সন্ধ্যা, কত বাসন্তি-পূর্ণিমা, শারদ-প্রভাত, শীতের মধ্যাহ্ন ও বাদল-রাত্রি আসিয়াছে—গিয়াছে। কিন্তু আসিল না শুধু একটী মর্ম্মাহতা বালিকা। লক্ষ্মী সেই যে আমার বিবাহের সংবাদ দিতে আসিয়া আমাকে বিস্মিত অভিভূত করিয়া দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, আর সে আসে নাই। এই দীর্ঘ পাঁচ বছর কি রকম তার কাটিয়াছে—তার কোথায় বিবাহ হইল, ছেলেপেলে হইয়াছে কি না ইত্যাদি কোন কথাই আমার মনে একবারও জাগে নাই।

দেয়ালে টাঙ্গান আমার ও লক্ষ্মীর বাল্যকালের ঐ ছবিখানির দিকে চাহিয়া আজ আমার কেবলই মনে হইতেছে, কি করিয়া এতকাল আমি নিজেকে এমন নিষ্ঠুর প্রতারণা করিয়া আসিতে সক্ষম হইলাম। আমার জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে লক্ষ্মীকেই আমার সব চেয়ে বেশী দরকার ছিল—কেমন করিয়া যে এই এত বড় সত্যটা আমার বুকের মাঝে এতকাল থাকা সত্ত্বেও নিজে তার অস্তিত্ব তখন টের পাই নাই, যতই এই কথা ভাবি, ততই নিজের মাথা নিজের হাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়!

সেদিন বিকালের ডাক হাতে পাইয়া তো বুঝি নাই—সে প্যাকেটটা কি ভীষণ মর্ম্মজ্বালা বহন করিয়া আনিবে; তখন তো বুঝিতে পারি নাই—ঐ যার অস্ফুটন্ত মুখপদ্মের পাশে আমার কিশোর মুখখানি আনন্দের জ্যোতিতে ফুটিয়া আছে, সেখানি আমারই নিদারুণ অবহেলায় ও অসংশোধনীয় ত্রুটিতে অস্ফুটন্তই পৃথিবীর ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া অকালে শুকাইয়া যাইবে! ছবিখানির নীচে ছেলেবেলার সেই কাঁচা, বাঁকাচোরা অক্ষরে সযত্নে লিখিত আছে "প্রমোদ দাদা আর লক্ষ্মী।" তারই নীচে নীচে মুক্তার অক্ষরে কে লিখিয়া রাখিয়াছে—"নারায়ণ আর তাঁর দাসী লক্ষ্মী", ইহাও লক্ষ্মীরই হাতের লেখা—আজ আর আমার কিছুই চিনিতে ঠেকে না! কিন্তু উঃ—নিজেকে কি ভীষণ প্রবঞ্চনাই এতকাল করিয়া আসিয়াছি! শুধু কি নিজেকেই? না, সে কথা ভাবিতেও পারি না। সে কথা মনে হইলে আমার ভয় হয়। লক্ষ্মীর মনে, তার মা বাবার বুকে যে অপমানের আঘাত হানিয়াছি, যে ব্যথার তীব্র হলাহল আমি অম্লান বদনে তাদের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছি, যে নিরাশার গাঢ় তমসায় তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চির-অন্ধকারময় করিয়া দিয়াছি—তাহা মনে হইলে আমি সহস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় জ্বলিতে থাকি। কিন্তু তবু তো ঐ কচি মুখখানি হইতে আমার চোখ অন্য দিকে ফিরিতে চায় না। আয় লক্ষ্মী—একবার তুই দেখিয়া যা তোর "নারায়ণের" ভিতরটা আজ কি মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিস্!"

এই তো পড়িয়া আছে, তার হাতের শেষ চিহ্নটুকু! এ আহ্বান, সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের অদর্শনের পর লক্ষ্মীর এ অন্তিম আহ্বান, আমি ঠেলিতে পারি নাই! লক্ষ্মী লিখিয়াছে—নিশ্চয়ই তার নিজের হাতের লেখা—"তোমার পায়ে পড়ি তুমি এসো—পাঁচ বছর আগেকার একটা সন্ধ্যায় যে কথাটার উত্তর তুমি চেয়েও পাও নি, তা'রই উত্তর আজ মরণের কোলে বসে তোমায় শুনাতে আমার এত

টুকুও অধিকার নেই। সেবা করবার অধিকারটুকুও নাই' লেখা শেষ করিয়াছে—অভিমানপূর্ণ একটী ছোট্ট অনুরোধে—"যদি সময় অভাবে একান্তই না আস্‌তে পার—তবে সঙ্গে প্রেরিত আমার অমূল্য সম্পত্তি-খানি ফেরৎ ডাকে পাঠিয়ে দিও ; আমার শেষ বিদায়ের বেলায় ওইখানা বুকে করে না যেতে পার্‌লে, আমি স্বর্গে গিয়েও সুখ পাব না —জেনো।"

কালকে সহরের হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া অবধি সারাক্ষণ শুধু লক্ষ্মীর বিড়ম্বিত ব্যর্থ জীবনটার কথাই ভাবিতেছি। এই কি তার জীবন-ভোর একাগ্র সাধনার পুরস্কার! এত উচ্চ যার জীবনের আদর্শ—তাহার পরিণাম, অনাদৃত অনাঘ্রাত অকালে শুকাইয়া যাওয়া! অথচ ভগবানের মঙ্গলেচ্ছার প্রতি এতটুকু সন্দেহের কটাক্ষও করিতে নাই—ইহাই বিশ্ববাসী সবাই একবাক্যে মানিয়া লইতে ব্যগ্র!

কালকে নার্সের সঙ্গে লক্ষ্মীর কোঠার দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া পা আর উঠিতে চাহিতেছিল না! উঃ! শরীরে সে কি কাঁপুনি—না জানি ভিতরে কি দৃশ্যই দেখিতে হইবে মনে হইতেছিল ঐখান হইতেই ফিরি। সহসা ক্ষীণ আর্ত্ত-কণ্ঠ হইতে যে ক'টী কথা মূর্ত্তিমতী নিরাশার ছবি আমার চোখের সাম্‌নে ধরিল, তাহাকে এড়াইয়া যাই আমার এমন শক্তি রহিল না। লক্ষ্মী বলিতেছিল—"মা, কই—কেউ তো এলো না, মা!"

"তোর ফটো যখন ফিরে আসেনি, তখন সে আস্‌বে লক্ষ্মী! সে তেমন নিষ্ঠুর হ'তে পারে না! হ'লেও তাকে আস্‌তে হবে!—তোর এই কঠিন তপস্যা কি একেবারেই বিফলে যাবে মা? তাহ'লে যে ভগবানের সব নিয়মই উল্টে যাবে মা!" বলিতে বলিতে মাতার কণ্ঠ যেন এক অদৃশ্য শক্তির বলে কাঁপিয়া কাঁপিয়া স্থির হইয়া গেল।

"মা, আমার মাথার কাপড়টা টেনে দাও।"

লক্ষ্মীর মৃত্যু-জীর্ণ অস্থিসার গণ্ডের কোণেও যেন একটু রক্তিমাভা খেলিয়া গেল। তাহার রোগম্লান চোখেমুখে অস্তমিত রবির পাণ্ডুর আভার ন্যায় একটু করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহাই অনুসরণ করিয়া তাহার মা দরজার দিকে চাহিলেন। আমি তখন উভয়ের প্রসারিত দৃষ্টির সম্মুখে বিচারপ্রার্থী অপরাধীর ন্যায় দণ্ডায়মান।

আসন্ন কন্যাশোকে অধীরা জননীর দৃষ্টি সহসা কঠিন জ্বালাময়ী হইয়া উঠিল। অভিশাপাগ্নি বর্ষণোন্মুখ সে কটাক্ষের প্রচণ্ড আঘাতে আমার স্নায়ু সকল যেন শিথিল হইয়া আসিল, আমি কম্পিতদেহে বিবর্ণমুখে দাঁড়াইয়া রীতিমত ঘামাইয়া উঠিয়াছি। ব্যাধিক্লান্ত কণ্ঠে বিশ্বের ভর্ৎসনা ঢালিয়া দিয়া লক্ষ্মী ডাকিল—"মা"। কি অনুযোগ-ভরা, কাতরতাপূর্ণ সে ডাক! মুহূর্ত্তে মায়ের চোখের সে অগ্নিদৃষ্টি কোথায় মিলাইয়া গেল! নিদারুণ মর্ম্মজ্বালা তাঁহার চোখে বান ডাকাইয়া দিল—স্বীয় বসনাঞ্চলে তাহারই বেগ রোধ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে তিনি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কম্পিতপদে আবেগান্দোলিত বক্ষে লক্ষ্মীর রোগশয্যার দিকে অগ্রসর হইতেই লক্ষ্মীর শঙ্কিত কণ্ঠের অনুরোধ আমার উদ্বেল চেতনাকে সজোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া দিল।

"এ চৌকিটা তুমি ছুঁওনা, ঐ চেয়ারখানায় বস" বলিয়া একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া পুনরায় নিজের এই প্রকার অভদ্রতার কৈফিয়ৎ স্বরূপই যেন বলিতে লাগিল—"যে বিশ্রী ছোঁয়াচে ব্যামো, এতে কি তোমায় এর ত্রিসীমাও মাড়াতে দিতে পারি? মা কি বাবা তো আর তা মানতে চান না—নইলে—" প্রবল কাসির বেগে তাহার সিন্দুর বিবর্জ্জিত কপালের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল, কোটরগত চোখদুটা যেন ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল। লক্ষ্মীর এ কৈফিয়ৎ যেন সহসা চাবুকের ঘায়ে আমাকে সচেতন করিয়া দিল। নীরবে নিঃশঙ্কচিত্তে লক্ষ্মীর পাশে বসিয়া পড়িয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাহার মুখ-নিঃসৃত বিষাক্ত শোণিত বিন্দুগুলি মুছিয়া লইলাম। এবার লক্ষ্মী বাধা দিল না—সে শক্তিও তাহার তখন ছিল না। মুখের সে শঙ্কিত ভাবের পরিবর্ত্তে তথায় গভীর তৃপ্তির আভা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সহসা আমার বাঁ'হাতটা টানিয়া লইয়া লক্ষ্মী সজোরে তাহার বুকের উপর চাপিয়া ধরিল!—উঃ, সে কি উন্মত্ত নৃত্য তার রুগ্ন ভগ্ন আশাহত বুকটার তলায় তখন চলিতে-ছিল! মনে হইল, এখনই তাহার বুকের কলকব্জাগুলি

চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া এই উত্তেজনার চির অবসান হইয়া যাইবে। কিন্তু—ভগবান,—আর একটুকাল, শুধু আর পাঁচটী মিনিট অপেক্ষা কর—এখনও যে তার কাছে আমার ক্ষমা ভিক্ষা করা হয় নাই। ঐ তো তার ঠোঁটদুটী নড়িয়া উঠিয়াছে—শুধু ওই দুটীর আড়ালের কথাটীকে বাহিরে আসিবার সময়টুকু দাও!—তারপর?—তারপর জীবনভোর প্রায়শ্চিত্ত—সে তো আমার থাকিবেই।

লক্ষ্মীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম—"লক্ষ্মী! আমার সে প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়েছি—কিন্তু বড় বেশী দেরীতে; তবু তুমি বলে যাও—আমায় ক্ষমা করতে পেরেছ কি না—"

শীর্ণ হাতদুটী তাহার শিথিল হইয়া পার্শ্বে এলাইয়া পড়িল—বক্ষের স্পন্দন চিরতরে থামিয়া গিয়াছে! মুদিত চোখের পাতায় ও পাণ্ডুর অধর কোণে যে স্নিগ্ধকরুণ হাসির রেখাটী তখনও লাগিয়া রহিল—তাহাই যেন আমাকে ভাষার আকার ধরিয়া বলিয়া দিতেছিল—"তোমাকে ক্ষমা?—সে যে আমাকে বরাবরই করিয়া আসিতে হইয়াছে।"

তারপর স্বহস্তে তার দাহকার্য্য শেষ করিয়া যখন বাসায় ফিরি, তখন পূর্ব্ব আকাশে উষার হাসি কিসের যেন অসহ্য বেদনায় রাঙ্গিয়া উঠিয়া বিশ্বের আনাচ-কানাচ তাহারই নিরানন্দ স্পর্শে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছিল।

* * * *

আজ আমি লোকের চোখে সংসারী—পিতার অবর্ত্তমানে তাঁহার বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারী। ধনজন যদি লোকের সুখ শান্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আমারও সুখ শান্তির অপ্রতুলতা নাই—একথাটা অতি সত্য। কিন্তু যে ব্যথাটা আজ আমার বুকে বিশাল শৈলখণ্ডের মত চাপিয়া বসিয়াছে—তার খোঁজ কেহ জানিতে পারিল না।

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

নেপালীদের বিবাহ-প্রথা।

গুর্খালিগণের মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিধান অনুসারেও অনেক যুবক-যুবতীর বিবাহ সংঘটিত হইয়া থাকে। পাহাড়ে স্ত্রী-অবরোধ প্রথার প্রচলন না থাকায়, অবিবাহিতা যুবতীগণ প্রায়ই সমবয়স্কাদিগের সহিত হাটে-বাজারে বেড়াইতে যাইয়া থাকে। কোন যুবক কোন যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইলে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া কৌশলে তাহার মন হরণ করে, এবং তাহাকে নানা প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া নিজ গৃহে লইয়া যায়।

পিতামাতার অজ্ঞাতসারে যাহারা এইরূপ ভাবে গোপনে প্রণয়ীর সহিত পলায়ন করে, তাহাদিগের আর শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হইতে পারে না, এবং কন্যাও পিতার আমন্ত্রণ ব্যতীত পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিতা হয়। কন্যা যদি স্বজাতীয় কোন যুবককে আত্মদান করে, তাহা হইলে পিতা কন্যা-জামাতাকে নিজগৃহে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া উভয়ের কপালে "দধি ও চাউলের" টীকা পরাইয়া দেন, এবং তাহারা মস্তক অবনত করিয়া "ধোক দিন্থু", বলিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করে।

নেওয়ারগণের বিশ্বাস এই যে, অবিবাহিতা কন্যা পিতৃগৃহে রজঃস্বলা হইলে পিতামাতার দেহে পাপ স্পর্শ করে। এইজন্য কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলেই একটি বিল্বফলের সহিত তাহার উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়। পরে কন্যা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সুবিধামত কোন উপযুক্ত পাত্রের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করা হইয়া থাকে। তখন বিল্বফলটিকে জলে নিক্ষেপ করা হয়; এবং ইহাদিগের বিশ্বাস এই যে, ফলটি অনন্ত কাল সলিলগর্ভে অবস্থান করে।

এই সংস্কার অনুসারে নেওয়ার রমণীগণ কখন বিধবা হয় না; এক স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহারা স্বচ্ছন্দে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে।

লিম্বু জাতির বিবাহ-প্রথা একটু বেশ নূতন রকমের—"Romantic" তাহা বেশ। কোন লিম্বু যুবক কোন অবিবাহিতা লিম্বুযুবতীর রূপে মুগ্ধ হইলে সে সেই যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া রস-সঙ্গীত গাহিতে থাকে। সঙ্গীত-নৈপুণ্যে যুবতীর নিকট পরাজিত হইলে যুবক সে স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে; অন্যথায় যুবতীকে বিবাহার্থ বন্দিনী করিয়া গৃহে লইয়া যায়। বিবাহান্তে যুবতী বিজেতার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পিতৃ-গৃহে প্রত্যাগমন করে। কয়েকদিন পরে 'পরমি ঘটক জার মদ্য, রোপ্য মুদ্রা ও শূকর শাবকের মৃতদেহ' ইত্যাদি উপঢৌকন সঙ্গে লইয়া কন্যার গৃহে উপস্থিত হয়। তথায় কন্যার পিতা অথবা কোন গুরুজন অতিমাত্র ক্রোধের ভান করিয়া ঘটককে প্রহার করিতে উদ্যত হন। ঘটক নানারূপ অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করে, এবং কন্যার মূল্য স্বরূপ কিঞ্চিৎ রৌপ্য মুদ্রা ও একটী শূকর প্রদান করিয়া কন্যাটীকে তাহার হস্তে অর্পণ করিতে অনুরোধ করে।

লিম্বু যুবক-যুবতীর "কোর্টসিপ" করিয়াও বিবাহ হইয়া থাকে। যুবক যদি যুবতীকে অবশ্যই বিবাহ করিবে এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে যুবতীর পিতা যুবক-যুবতীর ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশায় কোনরূপ বিশেষ আপত্তি করেন না।

বর্ত্তমান যুগ-প্রসঙ্গ।

[শ্রীসাহাজী]

"সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—অনেকে মনে করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকাংশে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করত "প্রভু যা' কর" বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার এই অমৃতময়ী মহাবাণীর যথার্থ অর্থ সেরূপ নহে। "সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এখানে ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, শাশ্বত ধর্ম্ম কখনও এক ভিন্ন অনেক হইতে পারে না। সুতরাং, শ্রীকৃষ্ণ তৎকালের প্রচলিত ধর্ম্মমত অথবা প্রবর্তিত ধর্ম্মপথ বুঝাইতেই এইখানে এই ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হয়। তিনি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমতকে বর্জ্জন করত তাঁহারই শরণ লইতে অর্থাৎ তাঁহারই প্রচারিত নবধর্ম্মের আশ্রয় লইতে, তাঁহারই জীবনের অনুসরণ করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন, কারণ, তাঁহার সেই নূতন বাণীই ছিল সেই যুগের যথার্থ উপযোগী, তাঁহার জীবনের আদর্শই ছিল সেই সময়ের environments এর অনুযায়ী, তিনিই ছিলেন সেই যুগের representative man.

মানব সাধারণতঃ বদ্ধসংস্কার অল্পদর্শী জীব। তাহারা, তাহাদের পূর্ব্বসংস্কার যতই অনিষ্টকর হউক, সহজে তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহে না এবং পারেও না। "মড়া আগ্‌লাইয়া বসিয়া থাকা" তাহাদের স্বভাবগত দোষ। তৎকালের লোকসমাজকে এই কথা বুঝাইবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে ঐরূপ বলিতে হইয়াছিল। সেদিনের শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন,—যদিও তিনি সংস্কৃত ছন্দে না বলিয়া বলিয়াছিলেন সামান্য পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতদের ভাষায়,—"নবাবী আমলের টাকা একালে চলে না।" শ্রীকৃষ্ণও "মামেকং শরণং ব্রজ" বলিতে ঠিক সেই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। ভগবানের অনন্ত ভাব। মানবের হৃদয়ে তাহা অনন্ত ভাবে অভিব্যক্ত হয়। ভারতে একদিন মায়াবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। ভগবান আনন্দ স্বরূপ। কিন্তু জগতের কিছুই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দপ্রদ নহে। এইরূপে ভগবানের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল জগতের বাহিরে। ফলে, জগৎ হইয়া পড়িয়াছিল মিথ্যা অথবা গৌণ। ইহা অবশ্যই একটি ধর্ম্মমত; ইহার যৌক্তিকতা ও সারবত্তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা যে সর্ব্ব-

প্রকারে সম্পূর্ণ একমাত্র ধর্ম্মমত, এ কথা স্বীকার করা সঙ্গত হয় না। ফলতঃ ইহাতে ভগবানের অনন্তভাবের কতক অংশ মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

ইহার পর, কালক্রমে শ্রীচৈতন্যদেব আসিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করিলেন লীলাবাদের। তিনি বলিলেন, ভগবান জগতেও রহিয়াছেন, বরং জগতেই তাঁহাকে বিশেষ করিয়া থাকিতে হইবে, কারণ, যিনি যে রাজ্যের রাজা, তাঁহাকে বিশেষ করিয়া সেইখানেই থাকিতে হয়। জগতে আনন্দ নাই, কে বলিল? তাঁহাকে প্রেমের নয়নে দেখ, আপনার করিয়া লও, সচ্চিদানন্দ লাভ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে প্রেম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইল। শ্রীচৈতন্যদেব যদি পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত মায়াবাদকে একমাত্র পূর্ণতম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইলে কি তিনি এই নব বৈষ্ণব ধর্ম্মমত প্রচার করিতে অগ্রসর হইতেন? আর তাহা হইলে তাঁহার ভক্তেরাই কি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকে পঞ্চম বেদ এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মকে বেদাতীত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন? শ্রীকৃষ্ণও তাই বলিয়াছিলেন, কোনও ধর্ম্ম বিশেষকে সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করিও না। সর্ব্ব ধর্ম্মের মূল যিনি, যাঁহা হইতে কত শত সহস্র ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে, একমাত্র তাঁহারই দিকে লক্ষ্য রাখিও। "মামেকং" বলিতে শ্রীকৃষ্ণের জৈব সত্তাকে বুঝান চলিবে না। তাঁহার জৈব সত্তার চিহ্ন মাত্রও আজ আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ "মামেকং" বলিতে তিনি সেই অব্যক্ত তত্ত্বকেই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, যাহা অনন্ত ভূতে, অনন্ত বিশ্বে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেও, সমভাবে নিত্য বিদ্যমান। এই "মাং" নিরুপাধিক অনির্ব্বচনীয় সত্তা। শ্রীকৃষ্ণ সেই চরমতত্ত্বে পৌঁছিয়া যোগযুক্ত অবস্থাতেই "মামেকং" এই কথা বলিয়াছিলেন। "মামেকং শরণং ব্রজ" বলিতে তিনি আমাদিগকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন ইহাই, নতুবা কর্ম্মত্যাগ করত "প্রভু যা' কর" বলিয়া বসিয়া থাকিবার কোনও উপদেশই ইহাতে নাই।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম—এই ত্রিবিধ শাসন প্রণালীতেই "মামেকং শরণং ব্রজ" এই আত্ম-সমর্পণের মহাভাব উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এমন কি, ইহকালে সর্ব্বস্ব প্রতীচ্য জগতের কর্ম্মবীর জর্জ্জ ওয়াশিংটন এবং নেপোলিয়নও Providence এবং destinyর হস্তেই আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এইরূপ আত্ম-নিবেদনের ভাব অন্তরে না জাগিলে, সম্পূর্ণরূপে আমিত্ব গন্ধবর্জ্জিত ও নিরভিমান না হইলে কোন কার্য্যই সুখসাধ্য হইতে পারে না। * * * তবে, এই যে আত্ম-সমর্পণ যোগ;—পরমহংসদেবের ভাষায় যাহাকে বলা হয় "বকলমা দেওয়া,"—ইহা যে কি কঠিন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। "পুরুষ হয়ে হবি নারী, তবে যাবি ব্রজপুরী"। পুরুষ হইয়া আপনাকে নারী বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমিত্বের গৌরব ভুলিয়া গিয়া আপনাকে একান্ত অক্ষম—তাঁহারই হস্তের ক্রীড়নক বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইহা কি সহজ সাধনা? এমন অক্ষম হওয়া চরম ক্ষমতারই অধিকারী হওয়া। তেমন নারী হওয়া সৌভাগ্যেরই কথা। ব্রজের নারী শক্তিরূপিণী—পুরুষের জীবন স্বরূপিণী। সুতরাং এই আত্মসমর্পণ যোগে মানবকে দুর্ব্বল এবং অলস হইতে বলে না, বরং তাহাকে মহাবলী এবং কর্ম্মবীর হইবারই উপদেশ দেয়। * * * জীবের আমিত্বই তাহার অস্তিত্ব। শ্রীভগবানে সেই আমিত্বকে অর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু, জীবের পক্ষে এই আমিত্ব ত্যাগ সম্ভবপর কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। পরমহংসদেব বলিয়াছেন, নারিকেল গাছের বাল্‌তো খসিয়া যায় কিন্তু দাগ থাকে। এই সামান্য আমিত্ব কিন্তু মুক্ত পুরুষকে বদ্ধ করিতে পারে না। অন্যস্থানেও তিনি বলিয়াছেন, যাইবিই না যখন, তখন থাক তুই দাস আমি, সন্তান আমি হইয়া। সুতরাং, কর্ম্মত্যাগের অবসর এখানেও নাই। দাস হইলেই প্রভুর সেবা এবং সন্তান হইলেই পিতার সেবা কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। কর্ম্ম এখানে সেবায় পরিণত হয়, ইহাই যাহা কিছু পার্থক্য। বৈষ্ণবেরাও এই কথাই বলেন। ব্রজগোপীরাও কৃষ্ণের সঙ্গে একটুখানি ব্যবধান রাখিয়াছিলেন, কৃষ্ণসেবার জন্য। রামপ্রসাদও গাহিয়াছেন, "চীনি হওয়া ভাল নয় মন, চীনি খেতে ভালবাসি।" সুতরাং, কোনও অবস্থাতেই জীবের কর্ম্মত্যাগ হয় না। ভক্তও তাঁহার প্রিয়তমের সেবা হইতে কদাপি বঞ্চিত হইতে চাহেন না।

শ্রীভগবানে আমিত্বকে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। কিন্তু আমিত্বই যাহার নাই, সে আবার তাহা দিবে কি করিয়া? অথবা, অতি সামান্যই যাহার আমিত্ব, তাহার তাহা দেওয়ার সার্থকতা কোথায়? যাহার সম্পত্তির মূল্য অর্দ্ধ পয়সা, সে যদি কাহাকেও আমমোক্তারনামা দিতে যায়, তাহা হইলে বস্তুতঃই হাসি পায়। কোনও হৃদয়বান্ ব্যক্তি তাহার মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য দয়াপরবশ হইয়া তাহার সেই তথাকথিত আমমোক্তারনামা গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন সত্য, কিন্তু সেরূপ স্থলে তাহার নিজের কোনও মর্য্যাদাই থাকে না। পরের গলগ্রহ এবং ভিক্ষুক ভিন্ন তাহাকে আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। ফলতঃ, সে ভক্ত নহে, কর্ম্মী নহে, জ্ঞানী নহে; সামান্য বদ্ধ জীব সে; সুতরাং তাহার আবার আত্মসমর্পণ কিসের? ঐ প্রকার পরমুখাপেক্ষিতাকে আত্মসমর্পণ যোগ কহে না। * * * "পুরুষ হয়ে হবি নারী, তবে যাবি ব্রজপুরী।" যদি নারীই হইতে হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে পুরুষ হইতে হইবে। পুরুষের মত পুরুষ নহে যে, ক্লীব যে, সে আবার নারী হইবে কিরূপে? তাই, ভক্ত কবি কাঙ্গাল গাইতেন, "বৈষ্ণব হওয়া মুখের কথা নয়, যদি বৈষ্ণব হ'তে হয়, আগে শাক্ত হওয়া চাই"। প্রকৃত কথাও এই যে, শ্রীভগবানে আমিত্বই যদি অর্পণ করিতে হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে সেই আমিত্বকেই ভাল করিয়া অর্জ্জন করিতে হইবে। যাহার আমিত্ব যত বড় এবং যত ভাল, তাহার সমর্পণও তত সার্থক। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ পরম প্রিয়তম, সুতরাং দিতে হইলে তাঁহাকে ভাল জিনিস দেওয়াই আমাদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। অতএব আমিত্বকেই ভাল করা চাই সর্ব্বাগ্রে।

এইজন্যই জ্ঞানীরা বলেন, আমিত্বের চরম সীমায় পৌঁছান এবং সম্পূর্ণ আমিত্বশূন্য হওয়া একই কথা। "আমি না দেখিলে গোপালকে দেখিবে কে?" বলিয়া যশোদার সেই মাতৃত্বের গর্ব্ব, "তোমারি গরবে গরবিনী হাম" বলিয়া গ্রীবাভঙ্গি করত সদর্পে দণ্ডায়মানা শ্রীরাধার সেই ভ্রূভঙ্গি,—এ সকল কি সেই আত্ম-নিবেদনেরই অমৃতময় পরিণাম নহে? শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে এই আত্মসমর্পণের ভাব সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছিল, অথচ তাঁহারই জীবনের উদ্দেশ্য ছিল, "এই প্রেম জনে জনে বিলাইব", "জীবের উদ্ধার করিব", "হরিনামে জগৎ মাতাইব", কৈ, তিনিও ত "প্রভু, অতি ক্ষুদ্র আমি, কি করিতে পারি", ইত্যাদিরূপ ভাবিয়া কর্ম্মত্যাগ করত নীরবে বসিয়া থাকেন নাই। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা, অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" ইহার মধ্যে বিনয় কোথায়? ভাবিয়া দেখুন, এমন গর্ব্বের বাণী এক শ্রীচৈতন্য ভিন্ন জগতে আর কে শুনাইতে পারিয়াছেন? ফলতঃ, আত্মসমর্পণ যোগেও কর্ম্মত্যাগ হয় না, হইতে পারে না, হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নহে।

মহাপুরুষেরা কর্ম্মত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন সত্য, কিন্তু কর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আত্মতৃপ্তির জন্য যাহা করা যায় তাহাই কর্ম্ম। নতুবা আত্মবিস্মৃত হইয়া, বৈষ্ণবদের ভাষায়, কৃষ্ণ-তৃপ্তির জন্য যাহা করা যায়, তাহা কর্ম্ম নহে, তাহা সেবা, গীতার ভাষায় যাহাকে বলা হয় নিষ্কাম কর্ম্ম। গোপীরাও কর্ম্ম-ত্যাগ করেন নাই, তবে তাঁহারা যাহা করিতেন, তাহা কৃষ্ণ-তৃপ্তির জন্য—তাই তাঁহাদের কর্ম্মকে কর্ম্ম না বলিয়া সেবা বলা হয়। অর্জ্জুনের তুলনায় যুধিষ্ঠিরকে ত্যাগী বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃও, যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনেরও জ্যেষ্ঠ এবং ধর্ম্মরাজ, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু গীতায় "পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ" ইত্যাদিরূপ বলিয়া অর্জ্জুনকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, আত্মতৃপ্তির জন্য যে কর্ম্ম, সেই সকাম কর্ম্মকেই বর্জ্জন করিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন আচার্য্যেরা, নতুবা তাঁহারা কাহাকেও সেবার্থী হইতে নিষেধ করেন নাই, বরং সেবাধর্ম্ম গ্রহণেরই আদেশ করিয়া গিয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের "আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুনঃ। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরম মতঃ॥" শ্রীচৈতন্যের "জীবে দয়া" শ্রীবিবেকানন্দের "to serve man is to serve God", শ্রীবুদ্ধের 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ', ইত্যাদি মহাজন বাক্যই ইহার অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ। "দরিদ্র নারায়ণের সেবা করিতে গিয়া যদি অনন্ত নরক হয়, তাহাও স্বীকার", ইহাও পরমহংসদেবেরই অমৃত বাণী।

পরমহংসদেব শম্ভু মল্লিককে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন। এখানে কর্ম্ম ত্যাগ বলিতে কর্ম্মফল ত্যাগই বুঝিতে হয়। শম্ভু মল্লিক অতি উন্নত ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে কর্ম্মযোগ অতি দুরূহ সাধন। ইহাতে অহঙ্কার, যশোলিপ্সা, নিষ্ফলতাজনিত অবসাদ প্রভৃতি বশতঃ পদে পদে পথভ্রষ্ট হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা। শম্ভু মল্লিকের এই দুরূহ সাধনার যোগ্যতা ছিল না। তিনি সম্ভবতঃ সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী হইতে পারিয়াছিলেন না। কর্ম্মযোগ রহস্যও বোধ হয় তিনি অবগত ছিলেন না। কাজেই, তাঁহার কৃত কর্ম্ম সমূহ তাঁহার মুক্তির কারণ না হইয়া তাঁহাকে বদ্ধ করিয়াই ফেলিতেছিল। তাই পরমহংসদেব ঐরূপ কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দিয়া তাঁহার মোড় ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া বিবেকানন্দের কর্ম্ম সম্বন্ধেও কি এই কথাই প্রযোজ্য? তাঁহার কর্ম্ম কি সামান্য ধন জন মান আকাঙ্ক্ষার জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল? ধন, জন, মান অতীব তুচ্ছ কথা, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্তও ছিল না তাঁহার। সাধারণ কর্ম্মযোগীরা সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, মুক্তি, শান্তি অথবা নিত্যানন্দের অধিকারী হইবার জন্য। কিন্তু তিনি কর্ম্ম করিয়াছিলেন কোনও কিছুর প্রত্যাশা না করিয়া, আত্মবিস্মৃত ও একান্ত নিষ্কিঞ্চন হইয়া। ফলতঃ তিনি কর্ম্ম করেন নাই, তিনি করিয়াছিলেন তাঁহার চিরপ্রিয়তমের সেবা। তিনি জীবে দয়া করেন নাই, তিনি করিয়াছিলেন শিবের সেবা। * * * তিনি বুঝিয়াছিলেন, যিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, তাঁহাকে আমরা ভালবাসিব, তাঁহার সেবা করিব, তাঁহাকে আমরা জানিব। তাঁহাকে আমরা যতই জানিতে পারিব যতই চিনিতে পারিব, ততই তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি বর্দ্ধিত হইবে। এই কথা বুঝিতে পারিয়াই স্বামীজী জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয় সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত কথাও তাহাই।

সতী পতিকে ভক্তি করেন, কিন্তু পতি কি বস্তু, এ জ্ঞান না জন্মিলে পতির প্রতি সতীর ভক্তি আসিবে কিরূপে? আর সতী যদি পতির সেবা ও তাহার প্রিয়কার্য্য সাধন না করেন তবে তাঁহার সেই ভক্তির মূল্য কি? আবার পতি আর আমি প্রভেদ, তাঁহার কার্য্য আমারই কার্য্য, সে কার্য্য করিতে আমার স্বভাবতঃই আনন্দ হয়, এইরূপ ভক্তিভাব না থাকিলে সতীর পতিসেবা মধুরও হয় না। প্রকৃত সাধকের জীবনে তাই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, এই তিনের অপূর্ব্ব সমন্বয় হয়। আবার, জ্ঞান ও ভক্তির চরম পরিণাম কি একই নহে? শঙ্করের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" আর চৈতন্যের "যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে," এই দুই অবস্থার মধ্যে প্রভেদ কোথায়? বিরহোন্মত্ত অবস্থায় ব্রজগোপীরাও "আমিই কৃষ্ণ" এই কথাই বলিয়াছিলেন। ফলতঃ, জ্ঞান ও কর্ম্ম ব্যতীত যে ভক্তি, তাহার কোনও সার্থকতা নাই। অধিক কি, অনেক সাধুও জ্ঞান এবং কর্ম্মের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন, এবং ভক্তির গুণ-কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন। তাঁহারা বলেন, সিদ্ধ-অবস্থায় সাধকের কর্ম্ম থাকে না, এবং প্রমাণ স্বরূপ চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় বিশ্বকর্ম্মী মহাপুরুষগণের উল্লেখ করিয়া থাকেন। চৈতন্যের ক্ষুদ্র সংসারের ক্ষুদ্র কর্ম্ম ছিল না সত্য, কিন্তু বিশ্বই যাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছিল, তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগী বলিলে কি বুঝিতে হয়, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। মাঝি মজারি সুখে হালে বসিয়া থাকে, দাঁড় বাহিয়া গলদ ঘর্ম্ম হয় দাঁড়ীরা। বাড়ীর কর্ত্তা পায়ের উপর পা তুলিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া তামাক খান, ছুটাছুটি করিয়া খাটিয়া মরে বাড়ীর আর পাঁচজনে। কিন্তু তাই বলিয়া ইঁহাদিগকে নিষ্কর্ম্মা মনে করিলে চলিবে না। ফলতঃ, ইঁহারা কর্ম্মত্যাগী নহেন, বরং কর্ম্মেরই ঘন মূর্ত্তি ইঁহারা। পরন্তু, ইঁহারা কদাপি কর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হন না, কর্ম্মেরই পরিচালক ইঁহারা। কর্ম্মের দাস হওয়া এক কথা, আর জিতকর্ম্মা হইয়া কর্ম্মের প্রভু বা পরিচালক হওয়া অন্য কথা। সুতরাং কর্ম্মের পরিচালক মহাপুরুষগণকে কর্ম্মের দাস অথবা কর্ম্মত্যাগী বলিয়া মনে করা নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। বিবেকানন্দ ছিলেন এইরূপ একজন জিতকর্ম্মা কর্ম্মবীর এবং প্রত্যেক ভারতবাসীকে তাঁহারই আদর্শের অনুসরণ করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন আমাদের মুক্তির অন্য উপায় নাই।

ফলতঃ, এখন আর আমাদিগকে কর্ম্মত্যাগী হইলে চলিবে না, বরং কর্ম্মফলত্যাগী হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মযোগ,

অবলম্বন করত সেবাব্রতকেই জীবনের একমাত্র সাধনভজন স্বরূপে বরণ করিয়া লইতে হইবে। চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত সাধন প্রণালীতেও কর্ম্মের স্থান আছে, একথা আমরা অস্বীকার করি না। তবে, বর্ত্তমান সময়ে, উহাতে ভাবপ্রবণতারই আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ভাবের ঘোরে যাহা দেখা যায়, যাহা করা যায়, তাহাই সুন্দর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেই ভাব যখন কর্ম্মের মধ্য দিয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠে, তখন আর তাহাতে খুঁত বাহির হইবার অন্ত থাকে না। শিল্পী যখন তাঁহার চিত্রের বিষয় ধ্যান নয়নে নিরীক্ষণ করেন, তখন তাহা তাঁহার নিকটে কত সুন্দর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহার সেই ধ্যানের বিষয় যখন রেখাসম্পাতে চিত্রে ফুটিয়া উঠে, তখন অন্যের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার নিজেরই মনে হয়, এমন না হইয়া তেমন হইলে, তেমন না হইয়া এমন হইলে, চিত্রখানি বুঝি আরও ভাল হইত। এই জন্যই কর্ম্মযোগ অতি দুঃসাধ্য সাধন। সম্পূর্ণ সর্ব্বারম্ভত্যাগী না হইতে পারিলে, ইহাতে সিদ্ধিলাভ একান্তই অসম্ভব। সুতরাং কর্ম্মযোগী হইতে হইলে অতি উচ্চ আধারের প্রয়োজন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পুণ্যফলে; বহু শতাব্দীর অবসান অপসারিত হইবার পর, ভারতে তাই বিবেকানন্দের ন্যায় উচ্চ অধিকারীর জন্ম হইয়াছিল। ইহা হইতেই ভারতের ভাবি মহাসৌভাগ্যের সূচনা অনুমিত হয়।

মালঞ্চ।

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, বি-এ]

চুলে ভাবের অভিব্যক্তি

জাপানে যে সকল মেয়ে শীঘ্র বিবাহিতা হইতে ইচ্ছুক, তাহারা চুলের সম্মুখভাগে পাখা বা প্রজাপতির আকারে খোপা বাঁধে এবং গহনা দ্বারা উহা সুশোভিত করে। যে সকল বিধবা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা চুলের পিছনে খোপা বাঁধে, এবং যে সকল বিধবা মোটেই পুনরায় বিবাহ করিতে রাজি নয়, তাহারা চুল ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলে।

আত্মহত্যার মৌলিক উপায়

একজন ফরাসী কৃষক প্রচুর পরিমাণে 'ব্যাঙ্কনোট' গলাধঃকরণ করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। ইহাকেই বলে মৌলিকত্ব! তবে এ পথে খরচ বড় বেশী।

অমরের দেশ

আমেরিকার কালিফোর্ণিয়ার সুট্টার জেলার অন্তর্গত ক্রাণমোর নামক স্থানটিই না কি আমেরিকার সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে এই গ্রামের একজন লোকও মারা যায় নাই। সমাধি উদ্যানের এক কোদাল মাটিও খুঁড়িতে হয় নাই। ক্রাণমোরের লোকেরা এই ৬০ বৎসরের মধ্যে যে একেবারেই মরে নাই তাহা নহে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যাহারা মরিয়াছে তাহারা বিদেশে মারা গিয়াছে—এ গ্রামে নয়।

চুম্বক পরিমাপক-যন্ত্র

বিজ্ঞানের চোখে ফকিক্কারী চলিবে না। সে এবার প্রেমের ঘরেও উঁকি মারিয়াছে। কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্রেট্ওয়েসার (J. V. Breitweiser) "কিসোগ্রাফ" (Kissograph) নামক একটি চুম্বক পরিমাপক যন্ত্র বাহির করিয়াছেন। স্নেহের চুম্বন, লালসার চুম্বন, প্রেমের চুম্বন, এমন কি অনিচ্ছাকৃত চুম্বনও এই যন্ত্র সহজে ধরিয়া ফেলিতে পারে। কেহ কাহাকেও চুম্বন করিলে, চুম্বনজাত শিহরণের গভীরতা এই আবিষ্কৃত যন্ত্রটির দ্বারা লিপিবিদ্ধ হয়।

প্রাচীনতম সংবাদপত্র

প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশ হইতে "পিকিন নিউস" নামক প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। উহা

এখনও নিয়মিত ভাবে প্রচারিত হইতেছে। "লিকিন নিউস" রাজকীয় পত্র বলিয়া রাজকীয় কার্য্যবিবরণীতেই পূর্ণ। জনশ্রুতি যে, এই পত্রের মুদ্রণকার্য্যে কোন ভ্রম ঘটিলে মুদ্রাকরের না কি প্রাণদণ্ড হইত।

সংবাদপত্রের পথ-প্রদর্শক বলিয়া চীনদেশ গৌরবের দাবী করিতে পারে।

খুচরা খবর

যখন ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাজ্ঞী হন, তখন শতকরা চল্লিশজন লোক নিজের নামটি পর্য্যন্ত লিখিতে পারিত না। আর এখন এক লণ্ডনেই ছয় বৎসরের কম বয়স্ক প্রায় এক লক্ষ শিশু প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যায়।

* * *

চীনে জ্যোতিষী বিদ্যাটা বড়ই বিপজ্জনক। যদি গণনা ঠিক না হয় তাহা হইলে ভুলের জন্য অনেক সময় গণকের মাথাটি আক্কেল-সেলামী বাবদ দিতে হয়।

* * *

নরওয়েতে প্রত্যেক মেয়েকেই বিবাহের পূর্ব্বে একখানা প্রশংসা-পত্র দেখাইতে হয় যে, সে ভাল পাক করিতে পারে। তাহা না হইলে সহজে বিবাহ হয় না।

* * *

ভারতবর্ষ ও চীনের লোকসংখ্যা, সমগ্র পৃথিবীর অর্দ্ধেক জনসংখ্যা।

* * *

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কই পৃথিবীর বৃহত্তম ব্যাঙ্ক; অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রাচীনতম বিদ্যালয়; প্যারীর জাতীয় পাঠাগারই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পাঠাগার, উহাতে প্রায় ৩,০০০,০০০ পুস্তক আছে; প্যারীর "অপেরা হাউস"ই বৃহত্তম থিয়েটার, উহার পরিধি তিন একার; পেট্রোগ্রেডে পিটার দি গ্রেটের ব্রোঞ্জ মূর্ত্তিই বৃহত্তম প্রতিমূর্ত্তি, উহা ওজনে ১,১০০ টন হইবে; পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কলেজ কেইরোতে প্রতিষ্ঠিত, উহাতে ১০,০০০ এর অধিক ছাত্র এবং ৩১০ জন শিক্ষক আছেন।

কবিতা-কুঞ্জ।

পূজা।

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি-এ]

তোমার পানে ছুট্‌ব এবার
ছুট্‌ব, ওগো ছুট্‌ব—
তোমার পায়ে লুট্‌ব এবার
লুট্‌ব, ওগো লুট্‌ব।
তোমার চরণ-ধূলা মাথায় লয়ে
রইব আমি নত হ'য়ে!
অভয়-আশীর্ব্বাদে আবার
উঠ্‌ব জেগে উঠ্‌ব।
তোমার পানে ছুট্‌ব এবার
ছুট্‌ব, ওগো, ছুট্‌ব।
তোমার আসন রবে আমার
হৃদয় শতদলে,—
আমি যা কিছু মোর দেওয়ার আছে
দেবো আঁখির জলে;
দিব গন্ধ প্রেমের ধূপে
দিব আলো হাসির রূপে
তোমার পূজার কুসুম হ'য়ে
ফুট্‌ব ওগো, ফুট্‌ব।
তোমার পায়ে লুট্‌ব এবার
লুট্‌ব, ওগো, লুট্‌ব।

—•—

অস্ফুট।

[শ্রীহেমচন্দ্র বাগচি]

তোমার অস্ফুট বাণী শুনিয়াছি কাণে।
কি যে শুনিয়াছি তাহা কাণ মোর জানে।
নানা ছলে নানা কাজে শত আনাগোণা—
তারি মাঝে তোমা' সাথে আধ চেনাশোনা,

আধ পরিচয় মোর । সে সবার মাঝে
তোমার অস্ফুট বাণী চিরদিন রাজে—
পরিপূর্ণ মহিমায় হৃদয়ের তলে ।
এ জীবনে তা'রে আমি দণ্ডে পলে-পলে
চির মহীয়ান্ করি রাখিব হৃদয়ে
কে যেন গো সেই কথা কাণে যায় ক'য়ে।
ওগো মোর জীবনের চিরাগতা প্রিয়া,
কোন্ ক্ষণে মহাহর্ষে সুখস্মৃতি দিয়া
বাঁচি' তোমা উত্তরিব প্রশান্ত সন্ধ্যায়—
অস্ফুটে প্রস্ফুট করি' রাখিব হেথায় ?

অনাহূত ।

[শ্রীভক্তিসুধা রায়]

এসেছিল একদিন কুটীরের দ্বারে,
ডাকি নাই সযতনে চাহি নাই তারে ।
সজল-করুণ আঁখি কুণ্ঠিত সরমে
চাহিল সে মুখ পানে শঙ্কিত মরমে ।
আদরে বরিয়া লয়ে ধরিলাম হাতে,
সোহাগের চুম্বন বরষিয়া মাথে—
কহিলাম বুকে ধরি 'কিছু ভয় নাই,
তুমি যে গো আমাদেরি আপনার ভাই ।'
সঙ্কোচ লাজে ভরা হাসি' মধু হাসি
কহিল সে 'তোমাদেরে বড় ভালবাসি ।'
তিলেকের সে বাঁধন না হ'তে শিথিল
নিয়তির উপহাসে ভরিল নিখিল ।
জোর করি অনাথেরে কাড়ি নিল এসে
ছিঁড়ি দিল বাহুডোর নিঠুরের বেশে।
প্রেম ভরা আঁখি দুটী যেন স্নেহকামী
ফিরে ফিরে কহে শুধু 'তোমাদেরি-আমি ।'
তারপর কেটে গেছে কতদিন তার,
হৃদয়ে সে স্মৃতিটুকু জাগে অনিবার ।
অনাহূত এসে বৃথা স্নেহ অনুরাগে—
মরম রাঙিয়া গেল বেদনার রাগে ।

বন-টগর ।

[শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ]

(১)

নহ তুমি বিলাসিনী ফাগুন গোলাপ,
সুরভিত নন্দনের শুভ পারিজাত ;
তোমার সারাটি অঙ্গে শুভ্রতার ছাপ,
তোমারে আদর করে অমল প্রভাত ।

(২)

অশোক নহ ত তুমি শুধু লালে লাল,
কেতকী কদম্ব নহ বরষার সখি ;
তুমি ঘন কাননের স্নেহের দুলাল,
স্নিগ্ধ তব শান্তরূপ নিরজনে থাকি ।

(৩)

তুমি অমা রজনীর শুভ্র শুক্রতারা,
আপন গৌরব লয়ে আপনি উজল ;
বাঁধিয়া রাখেনি তোমা' উদ্যানের কারা,
স্বভাবের সোহাগেই জীবন সফল ।

(৪)

তুমি মৌন তাপসের হৃদয় অমল,
পূর্ণচন্দ্রনিভ দেব কুমার অতুল ;
কর্দ্দম আবৃত যেন মুকুতার ফল,
কাননের কানে তুমি হীরকের দুল ।

(৫)

আকাঙ্ক্ষা বিহীন তুমি নিঃস্বার্থ প্রেমিক,
আপনা বিলায়ে দাও নীরবে যতনে ;
সত্য-অনুরাগী সম প্রশান্ত নির্ভীক
মধুমাখা হাসি রাশি যুবতী আননে ।

(৬)

তুমি কবিতার রূপ ভাবময়ী ভাষা,
নিঃসঙ্গ কবির তুমি প্রেমময়ী প্রিয়া ;
তুমি ব্যথিতের শান্তি মূর্ত্ত ভালবাসা
মিটেনা পিয়াসা তব প্রেম মধু পিয়া ।

পৃথ্বীরাজ কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ।

[শ্রীমতী শিখরবাসিনী দেবী]

ইতিহাসে তব অমর কাহিনী
কনকাক্ষরে লিখিত আছে,
বীর বিনোদিনী রাঠোর নন্দিনী,
অতুলনা তুমি নিখিল মাঝে।
পুলকে পরাণ পূরিত হয়,
শুনিলে তোমার চরিত-গাথা,
দলিয়া চরণে বাধা বিঘ্ন ভয়,
রেখেছিলে নিজ পবিত্রতা।
পঙ্কে যেমন পঙ্কজ ফোটে
সাগর গর্ভে জনমে মণি,
রাঠোর কলঙ্ক কনোজ ঈশ্বর!
জয়চাঁদ সুতা তেমনি তুমি।
বিষ্ণুর পাশে লক্ষ্মীর মত
মিলেছিলে সতী পৃথ্বীরাজে,
সাধিতে ধাতার কোন্ অভিলাষ!
এসেছিলে দোঁহে মর্ত্ত মাঝে।
দেশের কল্যাণে পুণ্য 'তরায়নে,'
বীর পতি তব ত্যজিলা প্রাণ,
সার্থক হোল ঘোরীর বাঞ্ছা
মোগল পতির সে অভিযান।
আঁধার করিয়া ভারত গগন,
ভারত ভাস্কর নিভিয়া গেল,
আর্য্য ভূমির চরম পতন,
হাহাকারে দিক্ পূর্ণ হোল।
অরাতির করে সঁপিয়া স্বদেশ
জামাতা সুতায় আহুতি দিয়া,
মাখিয়া কালিমা, তিরপিত হোল,
পাষাণ পিতার পিশাচ হিয়া,
স্বরগ হইতে গরীয়সী যাহা,
ধর্ম্মরাজের বিচারালয়।
সখ্যতা পাশে বদ্ধ ছিলেন—
আপনি যেথায় জনার্দ্দন,
আর্য্য ভূমির পূত প্রিয়তর,
সেই সে স্বদেশ যবন পায়,
লুটাইয়া দিয়া কনোজ রাজার,
প্রতিশোধ-স্পৃহা মিটিল হায়
তোমরা দুজন নন্দন কুসুম,
এসেছিলে বুঝি প্লাবনে ভেসে
সুকীর্ত্তি সৌরভ ছড়ায়ে ধরায়,
চলে গেলে পুন আপন দেশে

—

পুনর্ম্মিলনে।

(উর্ম্মিলা ও লক্ষ্মণ)

[শ্রীকালিদাস রায়]

"দেবি, তোমা এ অধম লভেছিল বটে
তব যোগ্য ভক্ত তবু ছিল না তখন।
তাই ব্রহ্মচারী হয়ে বনে তীর্থে মঠে
দীর্ঘ তপঃ কৃচ্ছ্র শুল্ক করিল অর্পণ।
চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরি' রাজর্ষি আশ্রমে,
তপস্বীর পদ সেবি' দমি' দুষ্ট জন।
ক্ষুৎনিদ্রা জিনিয়া, অতি কঠোর সংযমে
বহুমূল্যে লভিয়াছে তোমা তুল্য ধন।"
"হে দুর্লভ, তা'ত নহে বল্লভা তোমার
ছিল নাক যোগ্যা তব, তাই পরিহরি'
চলে' গেলে হে বল্লভ ব্রতে আপনার
চতুর্দ্দশ বর্ষ আত্ম-নিগ্রহ আচরি'
গৃহ তপশ্চর্য্যারতা বহু অশ্রু দিয়া
সাধনার ধনে তার লইল জিনিয়া।"